যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্যাদেব প্রব্রজেদ্‌গৃহাদ্বা বনাদ্বা॥ অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাঽস্নাতকো বোৎসন্নাগ্নিকো বা যদহরেব বিরজেত্তদহরেব প্রব্রজেৎ।"—(জাবালোপনিষৎ ৪)।

সন্ন্যাসীরা কখনও রাজনীতিতে যোগ দিতেন না, তথাপি তাঁরা সম্রাটের মত সম্মানিত হতেন। কেন?—"তাঁরা স্বর্গের আলো পৃথিবীতে নিয়ে এসেছেন, অনন্ত জীবন-উৎসের রহস্য-বার্তা তাঁরা আবিষ্কার করে সকলকে সন্ধান দিয়েছেন—" (Evelyn Underhill, Mysticism p. 172).

সন্ন্যাসীরা হলেন তৃষ্ণার্তদের নিকট সহস্রার পদ্মের অমৃতধারার পরিবেশনকারী, তাঁরা হলেন আধ্যাত্মিক সুতুঙ্গ শৃঙ্গে আরোহণকারী তপস্বী ভগীরথ, দুর্গম হিমালয় শীর্ষে পুঞ্জীভূত ধর্মতুষারের তপ-উত্তাপে বিগলিত জাহ্নবীরূপে মর্ত্যলোকে পরিবহনকারী জীব-বন্ধু।

ডয়সন্ (Paul Deussen) তাঁর "উপনিষদ্ দর্শনে" নৈতিকতাটা গৌণ বলেন; কারণ ব্রহ্ম যখন স্বতঃসিদ্ধ পদার্থ, তখন উহা নিশ্চয়ই কতকগুলো নৈতিক কর্তব্যের পরিণাম স্বরূপ হতে পারে না। জীব অজ্ঞানহেতু স্ব-স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে না; এই অজ্ঞান-নাশের প্রধান কারণ জ্ঞান, অর্থাৎ মিথ্যা-দৃষ্টি অপসারিত হলেই সত্যের প্রভাত সুনিশ্চিত। সত্য-সূর্য সেখানে সৃষ্টি হয় না, সত্য সেখানে অনাদি হয়েই আছেন। নৈতিক কর্তব্য আত্মায় সচ্চিদানন্দ অনুভূতির কারণ বা ব্যাপার নয়, জ্ঞানের সহকারী মাত্র। ব্রহ্মজ্ঞান যদি কর্তাকরণোপাদানব্যাপারবৎ অর্থাৎ কার্য-কারণ সম্বন্ধে উৎপন্ন হোত, তা হলে ঘটবৎ নশ্বর হয়ে পড়ত। ডয়সন্ বলেছেন, "moral conduct cannot contribute directly but only indirectly to the attainment of the knowledge that brings emancipation. For, this knowledge is not a becoming, something which had no previous existence and might be brought about by appropriate means, but it is the perception of that which previously existed from all eternity," (পৃঃ ৩৬২)। অর্থাৎ, মুক্তি-বিধায়ক (আত্ম) জ্ঞানলাভের প্রতি নৈতিক চরিত্রের সাক্ষাৎ অবদান নেই—পরোক্ষভাবে উহা সহায়ক মাত্র। কেননা এই জ্ঞান এমন কোন বস্তু নয় যা পূর্বে ছিল না এবং এখন উপায়-বিশেষ-অবলম্বনে 'উৎপাদ্য'। এই জ্ঞান হচ্ছে অনন্তকাল ধরে বর্তমান তত্ত্বের প্রত্যক্ষীকরণ।

কিন্তু উপনিষদে জ্ঞানের তুলনায় সব কিছুই গৌণ হলেও, নিম্নাধিকারীরা উপনিষদের পূর্ব-কথিত নৈতিক তত্ত্বগুলি বাদ দিয়ে তত্ত্বজ্ঞানে কখনও উপস্থিত হতে পারে না,—

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যো ন চ প্রমাদাত্তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈর্যততে যস্তু বিদ্বাংস্তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম॥"—(মুণ্ডক উঃ—৩।২।৪)

'দুর্বল, প্রমাদশীল বা নিয়ম-শৃঙ্খলা-আচার-রহিত তপস্বী এই আত্মাকে লাভ করতে পারেনা। শাস্ত্রোক্ত প্রণালীসমূহ-অবলম্বনে যে সাধন করে সেই জ্ঞানীব্যক্তির আত্মাই, ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হয়।'

"নাবিরতো দুশ্চরিতান্নাশান্তো নাসমাহিতঃ।
নাশান্তমানসো বাঽপি প্রজ্ঞানেনৈনমাপ্নুয়াৎ॥"—
(কঠ উঃ ১।২।২৪)

'পাপাচরণ ও ইন্দ্রিয়-লোলুপতা হতে যে বিরত হয়নি, যার চিত্ত একাগ্র নয় এবং ফল-লাভের চিন্তায় অশান্ত, সে কখনও সম্যক্ জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে লাভ করতে পারে না।'

"যস্য দেবে পরা-ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"
—(শ্বেঃ উঃ ৬।২৩)

'পরমেশ্বর এবং আচার্যের প্রতি যার ভক্তি আছে সেই মহাত্মার কাছেই উপনিষদুক্ত এই সব তত্ত্ব প্রকাশিত হয়।'

আর শ্রীভগবান গীতায় (১৩।৭-১১) নৈতিক বিধি, উপাসনা বা মনঃসংযোগ বিধি এবং সদসৎ বিচারগুলিকেই "জ্ঞান" বলেছেন, আর সব অজ্ঞান। অর্থাৎ সাধনের স্তুতির জন্য সাধনকেই সাধ্যের নামে আখ্যাত করেছেন। শ্রীরামানুজাচার্যও "জ্ঞান" অর্থে "ধ্যান" বা উপাসনাকেই গ্রহণ করেছেন, (ব্রঃ সূঃ উপক্রমণিকা)।

তবে জ্ঞান ভিন্ন অন্য যা কিছু সাধন, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি সবই গৌণ, কারণ শ্রুতি বলছেন—"নান্যৈর্দেবৈস্তপসা বা"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৮); "জ্ঞানপ্রসাদেন বিশুদ্ধসত্ত্বস্ততস্তু তং পশ্যতে নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৮) —অন্য কোন দেবতা বা তপস্যা দ্বারা তিনি লভ্য নন। জ্ঞান-প্রসাদে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে ধ্যানশীলেরাই নিরবয়ব ব্রহ্মকে জানেন। এই শুদ্ধসত্ত্ব মনই হচ্ছে পাশ্চাত্ত্য রাহস্যিকদের ভারজিন মেরী, সেখানে "Divine communion" জীব ব্রহ্মের ঐক্যানুভূতি ঘটে, "যস্মিন বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা"—(মুণ্ডক উঃ ৩।১।৯)—যে চিত্ত নির্মল হলে আত্মা বিশেষ ভাবে সেখানে প্রকাশিত হন। রাহস্যিকরা এই যোগোৎপন্ন জ্ঞানকে "Spiritual birth of Christ" বলেন। একহার্ট তাঁর "আত্মার দুর্গ" (The Castle of Soul) নামক প্রবন্ধে বলেছেন, "and his substance, his nature and his essence being mine, therefore I am the son of God." মুণ্ডকোপনিষদের "বিশুদ্ধসত্ত্ব", "ধ্যায়মানঃ" হচ্ছে খ্রীষ্ট সাধকদের "রাহস্যিক জীবনের পঞ্চম স্তর", যাকে তাঁরা "union" (মিলন) বলে থাকেন। খ্রীষ্টীয় নানা সাধকেরা এটিকে নানা নামে আখ্যাত করেছেন, "Mystical Marriage" (রাহস্যিক উদ্বাহ), "Deification" (দেবভাবপ্রাপ্তি) "Divine Fecundity" (দিব্যাবির্ভাব)—এ অবস্থায় জীব কর্তৃক কেবল প্রাতিভালোকে অব্যয় জীবনের দর্শন ও স্পর্শন নয়, পরন্তু একীভূত হওয়া।

যা হোক উপনিষৎ প্রবর্তকদের জন্য কর্ম-ব্যবস্থা করেছেন, সেটাও অবিধিপূর্বক নয়, বিধি ও জ্ঞানপূর্বক—(মুণ্ডক উঃ ১।২।১-১১ দ্রঃ)। কিন্তু পরিশেষে উপনিষৎ বলছেন, তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি নেই, "এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্"—(কঠ উঃ ১।২।১৭), এই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আশ্রয়, এই হচ্ছে পরম গতি। "অশব্দমস্পর্শম্··· নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"—(কঠ উঃ ১।৩।১৫), 'অশব্দ, অস্পর্শ···সেই তত্ত্বকে জেনে মৃত্যুমুখ হতে মুক্ত হওয়া যায়।' "তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরা-স্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"—(কঠ উঃ ২।২।১২), 'যে ধীর ব্যক্তিগণ নিজের আত্মাতে সেই পরমতত্ত্বের সাক্ষাৎকার করেন তাঁরাই শাশ্বত সুখ লাভ করেন, অপরে নয়।' "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্···তদ্বিজ্ঞানার্থং গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ"—(মুণ্ডক উঃ ১।১।১২), 'সকামকর্ম-লভ্য লোকসমূহের অসারতা হৃদয়ঙ্গম করে এর অতীত ধ্রুব শাশ্বত বস্তুর জ্ঞান-লাভের জন্য গুরুর নিকট উপস্থিত হতে হবে।' "যদা চর্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেবমবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥" —(শ্বেঃ উঃ ৬।২০)—যে দিন চর্মের ন্যায় আকাশকে বেষ্টন করা যাবে সেই দিন ব্রহ্মদেবকে না জেনেও দুঃখের অন্ত হবে।

যতক্ষণ অহংকার আছে ততক্ষণ নৈতিকতার রাজত্ব, নিম্ন প্রকৃতিটাকে শাসন কোরে রাখা। কিন্তু যখন এই অহমাত্মা নিজের ভেতর চিদাত্মার সন্ধান পায়, তখনই নৈতিক রাজত্বের অবসান এবং আধ্যাত্মিক রাজত্বের আরম্ভ হলো।

আধ্যাত্মিকলক্ষ্যহীন নৈতিকতা একটা নিরুদ্দেশ সংগ্রাম, ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়া, কিন্তু কিসের জন্য তা আমরা জানি না। অর্থাৎ নৈতিক আইন-কানুন যদি অভ্যুদয় এবং নিঃশ্রেয়সের জন্য বাস্তব জীবনে প্রযুক্ত না হয়, তা হলে সেগুলো সারা জীবনের একটা উদ্দেশ্যহীন কৃচ্ছ্রতা স্বীকার ছাড়া তার আর কিছু উপযোগ্যতা থাকে না। ব্রহ্ম-তত্ত্বজ্ঞান হলেই তবে নৈতিকতার সার্থকতা, ব্রহ্মজ্ঞানেই ভালমন্দ, শুভাশুভ কর্মের, পাপপুণ্যের অবসান—"তস্মাৎ এবংবিৎ শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা আত্মনি এব আত্মানং পশ্যতি, সর্বং আত্মানং পশ্যতি, নৈনং পাপ্মা তরতি, সর্বং পাপ্মানং তরতি, নৈনং পাপ্মা তপতি, সর্বং পাপ্মনং তপতি, বিপাপো বিরজোঽবিচিকিৎসো ব্রাহ্মণো ভবতি।"—(বৃঃ উঃ ৪।৪।২৩)। 'এই জন্যই এইরূপ জ্ঞানী শান্ত, দান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হয়ে দেহেন্দ্রিয়ের মধ্যে আত্মাকে সন্দর্শন করেন—নিখিল বস্তুকে আত্মা বলে সন্দর্শন করেন; পাপ এঁকে স্পর্শ করতে পারে না, ইনি সমস্ত পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ এঁকে সন্তপ্ত করে না, ইনি সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করেন। ইনি বিপাপ, বিরজ ও বিগতসন্দেহ ব্রহ্মজ্ঞ হন।' "কেবল ব্রহ্মজ্ঞানীই 'কেন আমি সাধুকর্ম করি নি, কেন আমি পাপ করেছি' বলে অনুতাপ করে না"—(তৈঃ উঃ ২।৯)।

খ্রীষ্টীয় মরমিয়া-তন্ত্রেও (Mysticism) ভাগবত জ্ঞানে এই পাপপুণ্যের নির্লিপ্তির উদাহরণ রয়েছে। সেণ্ট ক্যাথারিনের যখন প্রথম দিব্য দর্শন হলো, তিনি চিৎকার করে উঠেছিলেন, "আর সংসার নয়! আর পাপ নয়! হে প্রেমময়! একি সম্ভব! তুমি এত ভালবেসে আমায় ডেকেছ, এবং এক মুহূর্তে এমন জিনিষ জানালে যা জগৎ প্রকাশ করতে পারে না।" অব্যয়-মূলক এই বোধির সহিত তাঁর আর একটা আন্তর দর্শন হলো, ক্রুশবাহী খ্রীষ্ট, জগতের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত; তাতে তাঁর চিত্তে এলো আরও দীনতা, আরও অনুরক্তি। "হে প্রভু! হে প্রিয়তম! আমার জন্য এত কষ্ট তোমার, আর না! আর কখনও পাপ করব না প্রভু!" এই তত্ত্বটির উপর খ্রীষ্টীয় নীতিশাস্ত্র ব্যবস্থিত, যত মহাপাপই হোক তা কখনও মুক্তির বাধা হবে না, যদি অনুতাপ আসে, যদি শরণাগতি আসে। "সাধুরেব স মন্তব্যঃ"—(গীতা ৯।৩০), "ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি"—(গীতা ৯।৩১), "তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্"—(গীতা ৯।৩২)। জ্ঞানী ভক্তের অহংকার না থাকায় তার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছায় পরিণত হয়, তার জীবনে ঈশ্বরীয় জীবন প্রকটিত হয়, পূর্ণে সংযুক্ত হওয়ায় সে পূর্ণ হয়ে যায়, তার সর্ব কর্মের প্রেরণা সেই অব্যয়-উৎস থেকেই বেরুচ্ছে।

"আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি—কেবল শক্তি। আর উপনিষৎসমূহ শক্তির বৃহৎ আকরস্বরূপ। উপনিষদ্ যে শক্তিসঞ্চারে সমর্থ, তাহাতে উহা সমগ্র জগৎকে তেজস্বী করিতে পারে। উহার দ্বারা সমগ্র জগৎকে পুনরুজ্জীবিত এবং শক্তি ও বীর্যশালী করিতে পারা যায়। সকল জাতির, সকল মতের, সকল সম্প্রদায়ের দুর্বল, দুঃখী, পদদলিতগণকে উহা উচ্চরবে আহ্বান করিয়া নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া মুক্ত হইতে বলে। মুক্তি বা স্বাধীনতা—দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে

(এক)

মহাশক্তিরূপিণী মা

শ্রীমতী মীরা দেবী

বহু জন্মের পুণ্যফলে মাকে দর্শন স্পর্শন করবার ও তাঁর স্নেহ-বিগলিত কৃপা পাবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল, কিন্তু তিনি যে ভাগবতী মহাশক্তি—যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীব-উদ্ধার কাজে সাহায্য করে তাঁর লীলা পুষ্ট করতে নারীদেহ ধারণ করেছিলেন, তা আমরা তখন কিছুই বুঝি নি। আমরা তাঁর স্নেহে ভরপুর হয়ে তাঁকে শুধু মমতাময়ী মা বলে জেনেই আনন্দে আত্মহারা হয়েছিলাম। অন্য কিছু ভাববার প্রয়োজন বা যোগ্যতাও তখন ছিল না।

মায়ের ভাণ্ডারে কত মণিরত্ন আছে আমরা সে খবর তখন রাখিনি, তাঁর কাছে গেলে জগৎ-সংসার ভুল হয়ে যেতো। সে মাত্র অনুভবের বস্তু, ভাষা তা ব্যক্ত করতে পারে না। একমাত্র ঠাকুরই দুচার কথায় তাঁর মহিমা ব্যক্ত করেছেন। তিনিই মাকে জেনেছিলেন, চিনেছিলেন, সেজন্য আমরা আজ ঠাকুরকেই মায়ের প্রথম ও প্রধান প্রচারক বলতে দ্বিধাবোধ করবো না।

মা তাঁর সাধন, ভজন, ভাব, সমাধি ইত্যাদি মহাশক্তিবলে গোপন করে রাখতে পেরেছিলেন, সর্বসাধারণ সে সব কিছুই জানতে পারে নি। সেইজন্য ঠাকুরের দেহত্যাগের পরও ভক্তদের মধ্যে এমন অনেকে ছিলেন যাঁরা ঠাকুরকে অবতার বলে পূজা করলেও মাকে একজন সাধারণ লজ্জাশীলা ধর্মপরায়ণা স্ত্রীলোক বলেই মনে করতেন। এইরকম কোন এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুরের ঈশ্বরকোটী প্রিয় সন্তানদের অন্যতম স্বামী প্রেমানন্দ (বাবুরাম মহারাজ) বলেছিলেনঃ—"মাকে কে বুঝবে? ঐশ্বর্যের লেশমাত্র নাই। ঠাকুরের তবুও বিদ্যার ঐশ্বর্য ছিল, ভাব, সমাধি লেগেই থাকতো, কিন্তু মার ঐ ঐশ্বর্য পর্যন্ত লুপ্ত,—এ কি মহা শক্তি! যে বিষ নিজেরা হজম করতে পারছি না—সব মার কাছে চালান করে দিচ্ছি, মা সব কোলে তুলে নিচ্ছেন, আশ্রয় দিচ্ছেন।"

শ্রীরামকৃষ্ণদেব সন্ন্যাসী হয়েও স্ত্রীকে ত্যাগ করেন নি; নিজ গর্ভধারিণী মাতাকে যেমন কাছে রেখে সেবা যত্ন করেছেন তেমনি স্ত্রীকেও অতি যত্নের সহিত, অত্যন্ত মান্যসহকারে নিজের কাছে রেখে তপস্যা দ্বারা তিনি যাতে নিজ মহিমায় বিকশিতা, মহিমান্বিতা হয়ে লোককল্যাণ সাধন করতে পারেন তার উপযোগী শিক্ষা ও সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং শ্রীশ্রীমাও তেমন আধার বলেই তা সম্যকরূপে গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। শিক্ষকের একার কৃতিত্ব থাকলেই শিক্ষাকার্য সুসম্পন্ন হয়না, গ্রহীতারও সমান কৃতিত্ব থাকা চাই।

পত্নীর সঙ্গে আট মাস এক শয্যায় শয়ন করে ঠাকুর নিজের মনকে বহু রকমে পরীক্ষা করেও যখন দেখলেন স্ত্রীর প্রতি শ্রীশ্রীজগদম্বা ভিন্ন অন্য কোন ভাব তাঁর মনে এলো না, তখন তিনি পরীক্ষায় নিজেকে উত্তীর্ণ মনে করে পত্নীকে

তৃতীয় মহাবিদ্যা "ষোড়শী" জ্ঞানে আলপনাযুক্ত দেবীপীঠে বসিয়ে গভীর নিশীথে ফলহারিণী কালী-পূজার দিন ষোড়শোপচারে পূজা করলেন এবং তাঁর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের কঠোরতম সাধনার সকল ফল এমন কি জপের মালাটি পর্যন্ত মায়ের শ্রীপাদ-পদ্মে সমর্পণ করলেন এবং বার বার প্রণাম করে প্রার্থনা করতে লাগলেন—যেন জীব-কল্যাণে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয়।

আমরা একবার চিন্তা করে দেখতে পারি, এই নারী-রূপধারিণী কত বড় শক্তির আধার ছিলেন! ১৮।১৯ বছরের একটি পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, শহুরে ভাব, শিক্ষা যার কিছুমাত্র জানা নেই, তিনি কেমন করে সেই 'পতি পরম গুরু'র যুগে, এক দিকে স্বামী ও অন্য দিকে এত বড় একজন গণ্যমান্য মহাপুরুষের পূজো নিঃসঙ্কোচে, অবলীলাক্রমে গ্রহণ করলেন? বর্ণিত আছে, পূজক ও পূজ্যা উভয়েই সমাধিস্থ হয়েছিলেন। এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাবার পরও আমরা মাকে দেখি তিনি পূর্বে যেমন স্বামী ও শাশুড়ীর সেবিকা ছিলেন, পরেও তেমনি সেবিকাই রইলেন। প্রাণপণে সেবাই করতে লাগলেন। কিছুমাত্র অহঙ্কার তাঁর মধ্যে মাথা তুলতে পারল না,— তাঁর মাথা বিগড়েও গেল না। তিনি যেমন ধীর, স্থির, সেবাপরায়ণা, অক্লান্ত কর্মী, নিরভিমানা, সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি ছিলেন, তেমনই থেকে গেলেন। তাঁর এই চারিত্র মাধুর্য হতে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। তিনি কথাপ্রসঙ্গে একদিন বলেছিলেন "আদর্শ হিসেবে যা করতে হয় তার বাড়া করেছি।" (অর্থাৎ অনেক বেশী করেছি)। এর থেকে বোঝা যায় তাঁর জন্ম-পরিগ্রহ করাটাই লোক-শিক্ষার জন্য হয়েছিল।

ঠাকুর তাঁর ছেলেদের কাছে বলেছিলেন, "ও যদি এত ভাল না হোত,—তা হলে দেহ-বুদ্ধি আসতো কি না কে বলতে পারে?"

ঠাকুর আরও বলেছেন, "ও সারদা, সরস্বতী, জ্ঞান দিতে এসেছে। জীবের অমঙ্গল আশঙ্কায় এবার রূপ ঢেকে এসেছে।" আবার কখনও, মহাশক্তি যে ক্ষুদ্র দেহের আবরণে লুকিয়ে আছেন তা বুঝাবার জন্যে বলেছেন, "ও ছাই চাপা বেড়াল।" আরও একটা দৃষ্টান্ত দিই:—ভাগ্নে হৃদয় আমাদের মাকে সাধারণ মানুষ, তাঁর মামী মনে করে সময় সময় মার প্রতি দুর্বিনীত ব্যবহার করতেন দেখে ঠাকুর তাঁর অকল্যাণ আশঙ্কা করে তাঁকে একদিন সাবধান করে দিয়েছিলেন। "শ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি"-রচয়িতা অক্ষয় বাবুর ভাষাতেই সে কথা বলি:—

"একদিন মিষ্ট ভাষে বিনয় করিয়া।
হৃদয়ে কহেন প্রভু মায়ে দেখাইয়া॥
ইনি যদি রুষ্ট হন রক্ষা নাহি আর।
সাবধানে কর কর্ম মিনতি আমার॥"

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ইষ্ট এবং গুরুরূপে লাভ করে মা তাঁর আমিত্ব সম্পূর্ণরূপে তাঁর মধ্যে বিসর্জন দিয়েছিলেন। ঠাকুর ছাড়া তাঁর কোন পৃথক অস্তিত্ব আছে—তা কখনও কোনও আচরণেই প্রকাশ পায়নি; তবু শেষ-জীবনে মায়ের মুখ থেকে তাঁর নিজের সম্বন্ধে ২।১ টা কথা শুনতে পাওয়া গেছে যা গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। যেমন:— "আমার জন্মও তো ঐ রকমের" অর্থাৎ ঠাকুরের জন্মের মত অলৌকিক। রোগযন্ত্রণায় কষ্ট হচ্ছে— কোন অন্তরঙ্গ শিষ্যাকে বলছেন,— "এসব শরীরে কি মা রোগ হয়, দেব শরীর, লোকের পাপ গ্রহণ করে এ-সব হয়েছে।" রামেশ্বর দর্শনের পর, কেমন দেখলেন এই প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে মা বলে ফেলেছিলেন, "যেমনটি রেখে এসেছিলাম তেমনটিই রয়েছে দেখলুম।"

ঠাকুর যদি একাধারে রাম ও কৃষ্ণের শক্তি নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকেন, তবে সীতা ও রাধিকার শক্তি একাধারে মিলিত হয়ে যে আমাদের মাতৃরূপে প্রকাশিত হয়েছিলেন—তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। কিন্তু আজকাল বিজ্ঞানের যুগ, বিদ্বান-বুদ্ধিমানের যুগ, এ যুগে কারো স্বামী পুত্র শত প্রশংসা করলেও, কিম্বা তিনি নিজের সম্বন্ধে অতি উচ্চ ভাবের শব্দ প্রয়োগ করলেও, মানুষের দৈনন্দিন কার্যকলাপ, আচার, ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষ ভাবে পরীক্ষিত না হওয়া পর্যন্ত কেউ কারো কথা বিশ্বাস করতে চায় না—শ্রদ্ধা-ভক্তির অর্ঘ্য প্রদান করা তো অনেক দূরের কথা। সুতরাং আমাদের মাতাঠাকুরাণী কি ভাবে তাঁর ৬৭ বছরের জীবন যাপন করে গেলেন, বাঙ্গলার নারী-সমাজের আজ তা ভেবে দেখার সময় এসেছে।

সাধারণতঃ নারীজীবন কন্যা, ভার্যা ও মাতা—এই তিন রূপে প্রকাশিত হয়ে থাকে। মায়ের জীবন আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, এই তিন জীবনেই তিনি লোকশিক্ষার জন্য বহু কষ্ট সহ্য করে আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। নারী-জীবনের কঠিন কঠিন পরীক্ষায় তিনি কি ভাবে উত্তীর্ণ হয়েছেন ভাবলে অবাক হতে হয়। নারী-জাতি বিশেষ করে বাঙ্গালী নারী যে অলঙ্কারে ভূষিতা হলে বিশ্বের দরবারে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, সেই দয়া, তিতিক্ষা, ক্ষমা, সংযম, নিঃস্বার্থপরতা, নিজ শরীরের সুখ-দুঃখের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, সহানুভূতি প্রভৃতি নিজ আচরণের দ্বারা মা শিক্ষা দিয়ে গিয়েছেন। বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষা তিনি দেন নি, নিজে পালন করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন।

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিতা আমরা কোন্ পথ অবলম্বন করলে প্রকৃত সুখী হবো তা ঠিক করতে পারছি না। চতুর্দিকে আপাত-মনোরম প্রলোভন আমাদের বিভ্রান্ত করে তুলেছে। এই সময় অতি সুযোগ্য কর্ণধার বিনা আমাদের জীবনতরী লক্ষ্যস্থলে পৌঁছুতে পারবে না। যতই দিন যাচ্ছে—ততই আমরা বুঝতে পারছি যে, একমাত্র তিনিই এই তরীর কর্ণধার হয়ে আমাদের দিক নির্ণয় করে দিতে পারবেন। আমরা দেখি, শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের লীলা-সহচরী রূপে এসে নারী-জাতিকে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত করতে কঠিন তপস্যা করেছিলেন। বিশ্বের নারীশক্তিকে জাগ্রত করার জন্য তিনি নারীসুলভ লজ্জা ও সেবা-ধর্ম বজায় রেখে অতি গোপনে নহবতে বসে কঠিন তপস্যা করে সিদ্ধিলাভ করেন। ঠাকুরের তো ডঙ্কামারা তপস্যা কিন্তু মায়ের তা ছিল না, অতি সঙ্গোপনে এবং গৃহস্থালীর সকল কর্তব্য অতি সুচারুরূপে সম্পন্ন করে লোক-লোচনের অন্তরালে তাঁর সাধনা। এতটুকুও তাঁহার বাহ্যিক প্রকাশ ছিল না। কখনও কোনও ভক্তের চোখে তাঁর ঈশ্বরীয় ভাবের সামান্যমাত্রও ধরা পড়লে তৎক্ষণাৎ তা সংবরণ করে ফেলেছেন। এই তো প্রকৃত নারীশক্তির বিকাশ,—মহাশক্তিকে অনায়াসে ধারণ ও প্রকাশ করতে পারা।

(দুই)

প্রথম দর্শন ও কৃপালাভ

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার

খ্রীঃ ১৯১০ সালে আমার বেলুড়মঠ দর্শনের সুযোগ ঘটে এবং তথাকার আবহাওয়ায় মুগ্ধ হই। স্বামী ব্রহ্মানন্দজী (রাখাল মহারাজ) তখন মঠের প্রথম প্রেসিডেন্ট। যদিও মহারাজকে তখন আমি দেখি নাই, তবু আমার মনে হইল তিনি যদি আমাকে কৃপা করেন তবে আমি কৃতার্থ হইব।

১৯১৩ সালে, (বাঙ্গলা ১৩২০ সন) আমি রাঁচি একাউণ্টেণ্ট্ জেনারেল আফিসে অস্থায়ী-ভাবে কেরানীর কাজ করি। বয়স ২৪।২৫ বৎসর হইবে। মন্ত্র-দীক্ষার জন্য আমার প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতা আসিল। কেবল মনে হইত গুরু-কৃপা না পাইলে আমি প্রাণে বাঁচিব না। তখন আমার অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ সেন (শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রিত সন্তান) আমাকে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য উপদেশ করেন। তাঁহার উপদেশ আমার চিত্ত আকর্ষণ করিল না। আমি কিসে রাখাল মহারাজের কৃপা লাভ করিতে পারি সেই কথাই ভাবিতে লাগিলাম। পরে ইন্দুবাবুরই উপ-দেশানুযায়ী জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষভাগে এক সুদীর্ঘ পত্রে মহারাজের কৃপা প্রার্থনা করিলাম। প্রায় তিন সপ্তাহ কাটিয়া গেল, কিন্তু মহারাজের নিকট হইতে কোন উত্তর আসিল না। আমি পাগলপ্রায় হইয়া উঠিলাম।

আষাঢ় মাসের মধ্যভাগে এক গভীরা রজনীতে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিলাম। দেখিলাম ঘর স্নিগ্ধ আলোকে আলোকিত, আর জগন্মাতা কালীঘাটের মহাকালীরূপে চারিহস্তে আমায় কোলে তুলিয়া লইয়া, "ভয় কি বাবা, আমিত রয়েছি" বলিতে বলিতে এক নারী-মূর্তিতে রূপান্তরিতা হইলেন। তাঁহার পরিধানে লাল চুলপেড়ে কাপড়, হাতে বালা। তিনি আমাকে একটি বীজসহ নাম ১০৮ বার জপ করিতে আদেশ করিয়া মধুর কণ্ঠে বলিলেন,—"তুমি ইহা করিয়া যাও, আর যাহা করিতে হয় আমিই করিব।"

হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গে আমি 'মা' 'মা' করিয়া চীৎকার করিয়া উঠি। পরে শান্ত হইয়া বাকী রাতটুকু ঐ নাম জপ করিতে করিতে আনন্দে বিভোর হইয়া যাই। এই ঘটনা কাহাকেও বলিলাম না। এমন কি ইন্দুদাদাকেও নয়। শুধু এই চিন্তাই প্রবল হইল কোথায় কিভাবে আমার এই মাতৃমূর্তির দর্শন পাইব।

রাঁচিতে তখন প্রতি শনিবারে কথামৃত পাঠ ও ঠাকুরের কীর্তন হইত এবং আমি ইহাতে যোগদান করিতাম। এক শনিবার এই পাঠ ও কীর্তনে ৺সুরেন্দ্র নাথ সরকার উপস্থিত হন। তিনি ছুটিতে ছিলেন এবং ফিরিয়া আসার পথে মায়ের শ্রীচরণ দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার নিকট মায়ের বহু কথা শুনিতে শুনিতে আমার চিত্ত আনন্দে নাচিতে লাগিল, আর মনে হইতে লাগিল এই মাই কি আমার স্বপ্নদৃষ্টা সেই মা? তাঁহার নিকট হইতে মায়ের দেশে যাওয়ার রাস্তা-ঘাট সব জানিয়া লইলাম। কিছুদিন পরে আমার মায়ের দেশে যাওয়ার সুযোগ উপস্থিত হইল। সামান্য কিছু বেলা থাকিতে জয়রামবাটী পৌছিলাম। কোয়ালপাড়া মঠ হইতে একটি ছেলে সঙ্গে গিয়াছিল। সে সোজা মায়ের বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। আমি মুখ হাত ধুইবার জন্য প্রসন্ন মামার পুকুরঘাটে গেলাম। তথা হইতে যেন শুনিতে পাইলাম, ছেলেটি বলিতেছে, "একজন ভক্ত আসিয়াছে।" হাত মুখ ধোওয়া হইলে আমি মায়ের বাড়ীর সদর দরজা পার হইয়া উঠানে প্রবেশ করিতেই দেখিলাম বারান্দায় কতিপয় মহিলা বসিয়া আছেন, আর একজন বঁটিতে তরকারী কুটিতেছেন। আমাকে দেখিয়াই উক্ত মহিলারা উঠিয়া চলিয়া গেলেন আর যিনি তরকারী কুটিতেছিলেন তিনি সেই কাজেই লিপ্ত রহিলেন। পরে যখন আমি উঠানের মধ্যভাগে উপস্থিত হইলাম তখন দেখি তিনি আমার দিকে চাহিয়া আছেন।

সেই মা! সেই চাহনি! সেই ভাব! মুহূর্তে আমার সব উলট-পালট্ হইয়া গেল। মনে হইতে লাগিল মা-ই জগজ্জননী, বিশ্বপ্রসবিনী, বিশ্বেশ্বরী। নির্বাক, নিস্পন্দ হইয়া জড়ের মতো

কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম। মা তখন বঁটিখানা কাত করিয়া উঠিলেন এবং ঘরের দরজার শিকল খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া হাতের ইশারায় আমাকে ডাকিলেন। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মত অগ্রসর হইয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলাম। সমস্ত নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"হ্যাঁগা, আমায় কি করে চিন্‌লে?" এই আমার জীবনে মায়ের শ্রীমুখ-নিঃসৃত প্রথম বাণী শোনা। আমি সাশ্রু-নয়নে রুদ্ধকণ্ঠে চীৎকার করিয়া বলিলাম,—"মা, তোমাকে চিনিবার মত আমার কি সাধ্য আছে? তবে কৃপা করিয়া যতটুকু চিনিয়েছ ঠিক ততটুকুই চিনিয়াছি।" মা হাসিলেন। সে হাসিতে আমার জড়ত্ব দূর হইয়া গেল। আমি স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়া পাইলাম, আর অমনি তাঁহার শ্রীচরণতলে পতিত হইয়া দুই হাতে চরণ দুখানি জড়াইয়া ধরিয়া রাখিলাম। মা আমাকে তাঁহার পদ্মহস্তে ধরিয়া তুলিলেন এবং বারান্দায় আনিয়া একখানি আসনে বসাইলেন, পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া এক গ্লাস ঠাকুরের প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ লইয়া আসিয়া তাহা হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। আমি সানন্দে তাঁহার ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিয়া গ্লাসটি রাখিতেই মা নিজে উহা তুলিয়া ধুইয়া রাখিলেন এবং পুনরায় বঁটি দিয়া তরকারী কুটিতে বসিলেন। আমার সঙ্গে নানা কথা হইতে লাগিল। প্রসঙ্গ-ক্রমে মা তাঁহার রাঁচির সন্তানদের নাম করিয়া কথা জিজ্ঞাসা করিলে আমি যতটুকু জানি বলিতে লাগিলাম। তাহার পর মা যেন কাহাকেও বলিলেন,—"ছেলে রুটী খাবে।" পরে আমাকে বলিলেন,—"এবার তুমি একটু ফাঁকায় যাও।" আমি সাষ্টাঙ্গে মাকে প্রণাম করিয়া আনন্দে ভরপুর হইয়া বাহিরে আসিলাম। রাত্রে মা স্বয়ং পরিবেশন করিলেন এবং নানাপ্রকার গল্প করিতে লাগিলেন। কালী-মামার বৈঠকখানায় আমার থাকার ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরের দিন কামারপুকুর দর্শন করিয়া আসিবার সঙ্কল্পের কথা বলিলে মা সম্মতি দিলেন।

পরদিন প্রাতে (৩০শে আষাঢ়) স্নান করিয়া আসিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। দীক্ষার প্রার্থনা জানাইলে মা বলিলেন, "ওর জন্যে ভাবনা নেই। ওর জন্যে ভাবনা নেই। তুমি কামারপুকুর ঘুরে এস। আজই চলে আসবে। ওখানে থেকো না।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া রাস্তার সব বিবরণ জানিয়া লইয়া মহানন্দে শ্রীধাম কামারপুকুর রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুস্মৃতি-জড়িত কামারপুকুরের দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে জয়রামবাটী ফিরিয়া আসিলাম। এক হাঁড়ি জিলিপি আনিয়াছিলাম। মা উহা নামাইয়া লইলেন। পরে আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বারান্দায় বসিলাম। মা ঠাকুরের এক গ্লাস প্রসাদী মিশ্রির সরবৎ আনিয়া উহা হইতে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। এদিনও তিনি নিজে গ্লাশটি ধুইয়া তুলিয়া রাখিলেন। পরে আমার সঙ্গে শ্রীধাম কামার-পুকুর সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল। পরে মা আমায় বলিলেন,—"কাল তোমার দীক্ষা হবে।"

পরদিন প্রাতে (১৩২০।৩১শে আষাঢ়, মঙ্গলবার, দ্বাদশী তিথি। ইংরেজী ১৯১৩।১৫ই জুলাই) আমি বাঁড়ুজ্যেপুকুরে স্নান করিয়া অপর একটি পুকুর হইতে অনেক সাদা পদ্ম সংগ্রহ করিয়া মায়ের কাছে আনিলাম। মা ঐ পদ্ম হইতে সিংহবাহিনীর জন্য কিছু, ভানুপিসীর জন্য কিছু এবং নিজের পূজার জন্য কিছু রাখিয়া অবশিষ্ট আমার জন্য রাখিয়া দিলেন। পরে বলিলেন,—"এখন একটু ফাঁকায় যাও। আমি সময় মত তোমায় ডেকে পাঠাব।" আমি মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া আসিলাম।

কিছুক্ষণ পরে মা আমায় ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঘরে যাইয়া দেখি একটি পিতলের ছোট সিংহাসনে ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত। সামনে ৪।৫টি জলের ছোট ঘট, দুইখানি আসন পাতা আর মা দাঁড়াইয়া আছেন। আমি ঘরে যাইতেই আদেশ করিলেন,—"ঠাকুর প্রণাম কর।" সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। পরে মা ঐ প্রত্যেকটি ঘট হইতে জল লইয়া আমার মস্তকে ও সর্বাঙ্গে ছিটা দিলেন এবং পুনরায় ঠাকুর প্রণাম করিতে আদেশ করিলেন। আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। তখন মা আমার মস্তক ও সর্বাঙ্গে তাঁহার পদ্মহস্ত বুলাইয়া দিলেন এবং বলিলেন,—"এখন মনে মনে ভাব, তোমার জন্ম জন্মান্তরীণ পাপ ভস্ম হয়ে গেল। তুমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মা।" আমি যেন কি রকম হইয়া গেলাম এবং মায়ের আদেশানুযায়ী ভাবিতে লাগিলাম আমার সর্ব পাপ ধ্বংস হইয়াছে। আমি শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্তাত্মা। আনন্দে আমার সর্বশরীর শিহরিয়া উঠিল। মা আমাকে পুনরায় ঠাকুর প্রণাম করিতে আদেশ করিয়া নিজে আসন গ্রহণ করিলেন। আমিও সাষ্টাঙ্গে ঠাকুর প্রণাম করিয়া আসনে উপবেশন করিলাম। মা তখন বলিলেন,—"তোমার ত হয়েই গেছে। ঐ মন্ত্রই ১০৮ বার জপ করবে। আর তোমার কিছুই করতে হবেনা, বাকী সব আমিই করব।" আমি তখন সাশ্রুনয়নে ও কম্পিত কলেবরে বলিলাম,—"মা, আমি তোমার শ্রীমুখে ঐ মন্ত্র শুনিতে চাই। মা তখন আমাকে তাঁহার স্বপ্নে দেওয়া মন্ত্র শুনাইলেন ও জপ-প্রণালী দেখাইয়া দিলেন এবং শ্রীপ্রভুর মূর্তি দেখাইয়া বলিলেন,—"ঠাকুরই সব। ঠাকুরই গুরু, ঠাকুরই ইষ্ট। ঠাকুরই ইহকাল, ঠাকুরই পরকাল। তুমি ঠাকুরের, ঠাকুর তোমার। আমাকে ও ঠাকুরকে অভিন্ন ভাববে।" আনন্দে আত্মহারা হইলাম, ধন্য হইলাম। আসন হইতে উঠিয়া মাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলাম। মাও আসন হইতে উঠিয়া তক্তা-পোশের উপর রাঙ্গা পাদুখানি ঝুলাইয়া বসিলেন। আমি তখন আমার জন্য রক্ষিত পদ্মফুল হইতে কতক লইয়া একটি বেদী সাজাইয়া তাহার উপর মায়ের চরণ দুখানি রাখিয়া অবশিষ্ট পদ্ম দিয়া তাঁহারই প্রদত্ত মন্ত্রে তিনবার অঞ্জলি প্রদান করিলাম। মা তখন সস্মিত হাস্যে বলিলেন,—"বাবা, কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরেছ। ঘুরতে ঘুরতে এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে এসে পৌঁছেছ। আর ভাবনা কি?"

"মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনিজরামৃত্যুগহনে
ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তং বহুলতরতাপৈরনুদিনম্।
অহংকারব্যাঘ্রব্যথিতমিমত্যন্তকৃপয়া
প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্মামসি গুরো॥"

'সুদীর্ঘ স্বপ্নে আচ্ছন্ন ছিলাম। মায়াকৃত জন্ম-জরা-মৃত্যু দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংসারারণ্যে কত না ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম, দিনের পর দিন বহুতর সন্তাপে কত না ক্লিষ্ট, অহংকার-ব্যাঘ্র দ্বারা কত না নির্যাতিত হইতেছিলাম। হে গুরো, আজ তুমি তোমার অপার কৃপায় আমার সেই গাঢ় মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিলে, একান্তভাবে আমায় রক্ষা করিলে।'

(শঙ্করাচার্য, বিবেকচূড়ামণি)

উদ্গীথ-আবাহন

অনিরুদ্ধ

[বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে উদ্গীথ (বেদমন্ত্রবিশেষ) গান করিয়া দেবতারা অসুরগণকে পরাহত করিয়াছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও উদ্গীথ-উপাসনার কথা বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে।—লেঃ]

জাগো উদ্গীথ উত্থান-গীত উত্তাল বেগ ভঙ্গে
ঊর্ধ্ব প্রাণের নৃত্য-ছন্দে মৃত্যু-বিজয়-রঙ্গে।
শিহরো মন্ত্র তোল উদাত্ত নিনাদ মধ্য মন্দ্রে
ভরো অভিনব সুরের বিভব অযুত হৃদয়-তন্ত্রে।
বিনাশো সুপ্তি আত্মলুপ্তি মিথ্যা-স্বপ্ন-দাত্রী
এস দিবালোক দূর হোক শোক
অন্ধ-ব্যামোহ-রাত্রি।
উদ্গীথ চলো বহি কল কল আনো দুর্বার বন্যা
যাউক ভাসিয়া যত ছল-কায়া খণ্ডিত-সীমা-জন্যা।
জাগো আনন্দ অখিল-বন্দ্য উৎসারি ছাও বিশ্ব
এস গো পূর্ণ হউক চূর্ণ দীন রিক্ততা নিঃস্ব।
উঠ গম্ভীর উদ্গীথ ধীর গহন গভীর সত্যে
ঘুচুক বিভেদ দ্বেষ-ভয়-খেদ স্বার্থ-কলুষ চিত্তে।

জ্ঞানবিজ্ঞান-যোগ ও শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীবৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, এম্-এ

গীতার সপ্তম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন যে, ভাল মন্দ সব কাজেই ভগবানের সহিত যুক্ত হও। তাঁহার সহিত যোগ না থাকিলে আমাদের কোন অস্তিত্বই থাকে না। কিরূপ ভাবে এই যোগ সাধন করিতে হয়—তাঁহাকে সর্বদা স্মরণ ও মনন করিতে হয়, তাহা বিশদভাবে বর্ণনা করিলেন। প্রথমেই বলিলেন যে, তাঁহার প্রতি অনুরক্ত নিবিষ্টচিত্ত ও তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, বিভূতি, বল, শক্তি ও ঐশ্বর্যযুক্ত এবং সর্বগুণসম্পন্ন শ্রীভগবানকে নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিবে। হাজার হাজার লোকের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তি এই আত্মজ্ঞানের

নিমিত্ত যত্নবান হয়। আবার ঐ প্রকার সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কেহ বা তাঁহাকে যথার্থ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন—"যোগং যুঞ্জন্" —"কোন রকম করে তাঁর সঙ্গে যোগ হ'য়ে থাকা। দুই পথ আছে—কর্মযোগ ও মন-যোগ। যারা আশ্রমে আছে; তাদের যোগ কর্মের দ্বারা। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস। আর যে কর্ম কর, ফল আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ কর, কামনাশূন্য হয়ে করতে পারলে, তাঁর সঙ্গে যোগ হয়। আর এক পথ মনযোগ। এরূপ যোগীর বাহিরে কোন চিহ্ন নাই। অন্তরে যোগ। কর্মের দ্বারাই যোগ হউক, আর মনের দ্বারাই যোগ হউক; ভক্তি হ'লে সব জানতে পারা যায়।" (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত; ৪।২৩৮, ২৩৯) যিনি এই সংসার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে না ভুলিয়া তাঁহার উপর মন রাখিয়া, এই সংসারে থাকিবার নাম যোগ। জীবনের সব কাজেই —আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশনে—ছোট-বড়; ভাল মন্দ সকল কাজেই আমরা তাঁহার সহিত যুক্ত থাকিব—তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না বা আমাদের কল্যাণ হইবে না—এই জ্ঞান মনে মনে সদা অনুভব করার নাম যোগ।

গীতাকার আবার বলিয়াছেন,—"আমার মায়ারূপ প্রকৃতি ভূমি, জল, অনল, বায়ু, আকাশ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এই আট প্রকারে বিভক্ত। (গীতা ৭।৪) ইয়ং-তু-অপরা (নিকৃষ্টা অপ্রধানা) অর্থাৎ এই আট প্রকারে বিভক্ত প্রকৃতি অপ্রধানা। ইতঃ অন্যাৎ—ইহা হইতে ভিন্ন ভাবাপন্না আমার আর একটি জীব-স্বরূপ পরা অর্থাৎ চেতনময়ী প্রকৃতি আছে, যাহা এই জগৎকে ধারণ করিয়া আছে। এই যে আমাদের স্থূল দেহ, ইহার অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম দেহ আছে (১৩ অঃ ৫-৬) তাহা মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, দশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র এই ১৮টি সূক্ষ্মতত্ত্বে গঠিত। "স্থূল দেহই মৃৎ পিণ্ডের ন্যায় মলিন—ইন্দ্রিয়ের গোচর। অপরা প্রকৃতি দেহ রচনা করে, পরা-প্রকৃতি সেই দেহে ভূতভাবের বিকাশ করাইয়া সর্বভূতের প্রাণ ধারণের নিমিত্তভূতা হয় ও প্রাণিগণকে প্রাণযুক্ত করে। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ভূত সকল এই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ স্বরূপ প্রকৃতিদ্বয় হইতে উৎপন্ন হইতেছে। আমিই এই সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ ও আমি ইহার প্রলয়-কর্তা। (গীতা, ৭-৬) হে ধনঞ্জয়। আমার বাহিরে, আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; যেমন সূত্রে মণি সকল গ্রথিত থাকে, তদ্রূপ আমাতেই এই বিশ্ব গ্রথিত রহিয়াছে। (ঐ ৭।৭)। হে কৌন্তেয়! আমি সলিলে রসরূপে, চন্দ্রসূর্যে প্রভারূপে, সমুদয় বেদে-ওঁকাররূপে, আকাশে শব্দরূপে ও মানুষগণের ভিতরে পৌরুষ-রূপে অবস্থান করিতেছি (ঐ ৭।৮)।

ঐ এক কথাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ সহজ ও সরল ভাবে বলিয়াছেন—"তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাড়া নয়। সৃষ্টির সময় আকাশতত্ত্ব থেকে মহৎতত্ত্ব; তার থেকে অহঙ্কার এই সব ক্রমে ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে। ঈশ্বরই মায়া জীব জগৎ এই সব হ'য়েছেন, অনুলোম তার পর বিলোম।" (কথামৃত ৩।৭৭)। "যে বিদ্যা লাভ করলে তাঁকে জানা যায়, সেই বিদ্যা—আর সব মিছে। তাঁর বিষয়ে শোনা এক, তাঁকে দেখা এক, তাঁর সঙ্গে আলাপ করা আর এক। কেউ দুধের কথা শুনেছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ বা দুধ খেয়েছে। দেখলে তবে তো আনন্দ হবে, খেলে তবে তো বল হবে—লোকে হৃষ্টপুষ্ট হবে। ভগবান দর্শন করলে তবে তো শান্তি হবে, তাঁর সঙ্গে আলাপ করলে তবে তো আনন্দ হবে, শক্তি বাড়বে। (ঐ, ৩।৬৯)। তিনিই উপাদান-কারণ তিনিই নিমিত্তকারণ। তিনিই জীব জগৎ সৃষ্টি করেছেন

আবার জীব জগৎ হয়ে রয়েছেন। যখন নিষ্ক্রিয়, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করছেন না, তখন তাঁকে ব্রহ্ম বা পুরুষ বলি; আর যখন ঐ সব কাজ করেন, তাঁকে শক্তি বলি, প্রকৃতি বলি। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যিনি পুরুষ তিনিই প্রকৃতি হয়ে রয়েছেন"। (ঐ, ৫।১৭৩)। শব্দ ব্রহ্ম; ঋষি, মুনিরা ঐ শব্দ লাভের জন্য তপস্যা করতেন; সিদ্ধ হলে শুনতে পায় নাভি থেকে উঠ্‌ছে অনাহত শব্দ।" (৫।১৪৪)

ভগবানকে তবে আমরা কোথায় অন্বেষণ করিব গীতাকার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন—"রসনায় যে রস আস্বাদন কর তিনিই সেই রস-স্বরূপ। শশীসূর্যের যে প্রভা জগৎ আলোকিত করে, সে-প্রভারূপেও তিনি। কর্ণে যে নানারূপ শব্দ শুনিতে পাও, নাসিকায় যে গন্ধ আঘ্রাণ কর, সেই শব্দ রূপে, গন্ধ রূপে তিনি বিরাজিত।" তিনিই তোমার তপঃশক্তি, তোমার বুদ্ধি ও তোমার তেজ। তিনি সকলের জীবন, সকলের সৃষ্টির বীজ। তোমরা তাঁহাকে দেখিতে জান না, তাই দেখিতে পাও না। তিনি সর্বত্র সুপ্রকাশ, তাঁহাকে সর্বত্র দর্শন কর। তিনি বলবানের কামনা- ও আসক্তি-রহিত বল এবং সর্বভূতের ধর্মানুগত কাম। জীবমাত্রেরই যে বল তাহা মূলতঃ ঐশী শক্তি কিন্তু তাহারা তাহাদের জীবনের কর্মে যখন ত্রিগুণের কবলে নামিয়া পড়ে তখনই কামরাগাদির অধীন হইয়া পড়ে। সপ্তম অধ্যায়ে ১২ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—"যে সমস্ত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভাব আছে, তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন এবং আমারই অধীন; কিন্তু আমি কদাচ ঐ সকলের বশীভূত নহি।"

তবে আমাদের কামক্রোধাদি কি যায় না? কিরূপে আমরা এই কাম ক্রোধাদির হাত হইতে মুক্ত হইতে পারিব? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন যে শুধু ঈশ্বর আছেন এইটি জানিয়া জ্ঞানী হইলে চলিবে না, তাঁহাকে সর্বত্র ও সর্বদা দর্শন করিতে হইবে। তোমাকে বিজ্ঞানী হইতে হইবে, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে হইবে। "তখন আর তোমার কোন পাশ থাক্‌বে না—লজ্জা, ঘৃণা সঙ্কোচ প্রভৃতি। ঈশ্বর দর্শনের পর এই অবস্থা হয়। যেমন চুম্বকের পাহাড়ের কাছ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে—পেরেক আলগা হ'য়ে খুলে যায়। ঈশ্বর-দর্শনের পর কাম ক্রোধাদি আর থাকে না।" (শ্রীরাঃ কঃ ৫।১৪৫)। "ঈশ্বর আছেন এইটি জেনেছে এর নাম জ্ঞানী। কাঠে নিশ্চিত আগুন আছে যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু কাঠ জ্বেলে, রাঁধা খাওয়া, হেউ ঢেউ হয়ে যাওয়া যার হয়, তার নাম বিজ্ঞানী! কিন্তু বিজ্ঞানীর অষ্ট পাশ খুলে যায়—কাম ক্রোধাদির আকার মাত্র থাকে। এ অবস্থা হ'লে কাম ক্রোধাদি দগ্ধ হয়ে যায়। শরীরের কিছু হয় না, অন্য লোকের শরীরের মত দেখতে হবে সব, কিন্তু ভিতর ফাঁক ও নির্মল। বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে তাই এরূপ এলানো ভাব। চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে—কখনও লীলা হ'তে নিত্যতে যায়।" (ঐ, ৩।৮৮-৮৯)। বিজ্ঞানী সাকার নিরাকার সাক্ষাৎ করিয়াছে। ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করিয়াছে। ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করিয়াছে। তাঁহাকে চিন্তা করিয়া অখণ্ডে মন লয় হইলেও আনন্দ—আবার মন লয় না হইলেও আনন্দ।

এমন যে ভগবান্, যিনি আছেন "বিটপী লতায়,…শশী তারকায় তপনে"—তাঁহাকে কেন আমরা জানিতে পারি না? গীতাকার এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের ত্রিগুণময়ী অলৌকিক মায়াশক্তি, জগতের সমুদয় লোককে ত্রিগুণাত্মকভাবে বিমোহিত করাতে তাঁহাকে আমরা জানিতে সমর্থ হই না। এই

অলৌকিক গুণময়ী মায়া দুস্তরা—যাহারা ভগবানকে আশ্রয় করিয়া একান্তভাবে তাঁহার শরণাগত হয়, তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হয়।

অহং করোমি—অর্থাৎ আমি কর্তা এই অহঙ্কার ত্যাগ কর। তোমার জ্ঞান-বুদ্ধির অভিমান ছাড়, তোমাকে সন্ন্যাসের পথও অবলম্বন করিতে হইবে না; কেবল তোমার অহঙ্কারের উচ্চ শিরকে নত করিয়া, তাঁহার শরণাগত হও। তাহা হইলেই তুমি মুক্তিলাভ করিবে ও মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইবে। এই মায়ার দ্বারা যাহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে এবং যাহারা অসুরভাব অবলম্বন করিয়াছে, সেই সকল দুষ্কর্মকারী নরাধম, মূর্খ কদাচ আমাকে প্রাপ্ত হয় না। আর্ত, আত্মজ্ঞান-অভিলাষী, অর্থাভিলাষী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকারের পুণ্যবান লোক আমার আরাধনা করিয়া থাকে। অসুরভাব হইলে আর ভগবানকে মনে থাকে না। তন্মধ্যে একনিষ্ঠ ভক্তি-ও যোগ-যুক্ত জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। এইরূপ জ্ঞানী আমার একান্ত প্রিয়। তিনি সদেকচিত্ত হইয়া আমাকে একমাত্র উত্তমগতি জানিয়া আমাকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন। বহুজন্ম অতিক্রম করিয়া জ্ঞানবান ব্যক্তি, বাসুদেবই এই চরাচর বিশ্ব—এইরূপ তত্ত্ববোধে আমাকে প্রাপ্ত হন।

এই মায়া কি? স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার 'জ্ঞানযোগে' লিখিয়াছেন,—"ভবিষ্যতের আশা মরীচিকার মত আগে আগে ছুটিতেছে। কখনও তাহাকে ধরিতে পারি না—আমরা তাহার পাছে পাছে ছুটিতেছি। আমরা যত যাই, সেও তত আগাইয়া যায়। এই-ভাবেই দিন যায়। শেষে কাল আসিয়া সব শেষ করে। অগ্নির অভিমুখে পতঙ্গের ন্যায়, আমরা রূপরসাদি বিষয়ের অভিমুখে অবিরত ছুটিতেছি—যদি সুখ পাই। কিন্তু সুখ কোথায়? রূপ, রস ইত্যাদি—সবই অনলরাশি, দেহ মন দগ্ধ করিতেছে। কিন্তু তথাপি নিবৃত্তি নাই। আবার আশার কুহকে নবীন উদ্যমে সেই অনলে পুড়িতে যাই। ইহাই মায়া। স্বার্থে বা নিঃস্বার্থে, সৎ বা অসৎ যাহা কিছু করিয়াছি বা করিতেছি, সেইগুলি স্থিরভাবে চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে আমরা উহা না করিয়া থাকিতে পারি নাই বলিয়াই ঐ সকল করিয়াছি ও করিতেছি। ইহাই মায়া। যে তাঁর একান্ত ভক্ত, সেই কেবল এই মায়ার প্রহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারে।"

ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"তিনি তিন অবস্থার পার; সত্ত্ব, রজ তম তিন গুণের পার। সমস্তই মায়া, যেমন আয়নাতে প্রতিবিম্ব পড়েছে; প্রতিবিম্ব কিছু বস্তু নয়। ব্রহ্মই বস্তু, আর সব অবস্তু।" (শ্রীরাঃ কঃ,৫।১৬১)। "তাঁর কৃপা হ'লে, সবই হয়। সবই ঈশ্বরের ইচ্ছায় হচ্ছে। ভক্তেরও একাকার জ্ঞান হয়; সে দেখে ঈশ্বর ছাড়া আর কিছুই নাই।" (৫।১৬২)। "ঈশ্বরের দিকে ঠিক মন রাখবে। সব মন তাঁকে না দিলে, তাঁকে দর্শন হয় না।" (৫।১০২)। "কামিনী কাঞ্চনই সংসার। এরই নাম মায়া। ঈশ্বরকে দেখতে, চিন্তা করতে দেয় না। দুএকটি ছেলে হলে স্ত্রীর সঙ্গে ভাই ভগ্নীর মত থাকৃতে হয়, আর তার সঙ্গে সর্বদা ঈশ্বরের কথা কইতে হয়। তা হলে দুজনেরই মন তাঁর দিকে যাবে। আর স্ত্রী ধর্মের সহায় হবে। পশুভাব না গেলে ঈশ্বরের আনন্দ আস্বাদন করতে পারে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে হয় যাতে পশুভাব যায়। ব্যাকুল হ'য়ে প্রার্থনা। তিনি অন্তর্যামী, শুনবেনই শুনবেন। যদি আন্তরিক হয়।"

ঈশ্বরকে জানার নামই জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা এবং তাঁকে ভালবাসার নামই বিজ্ঞান। ঠাকুর অতি সরলভাবে এই জ্ঞানের মানে

বলিয়াছেন—"ঈশ্বর আছেন এইটী যে জেনেছে সেই জ্ঞানী। কিন্তু যতক্ষণ না জ্ঞান হয়, ঈশ্বরলাভ হয়, ততক্ষণ সংসারে ফিরে আস্‌তে হয়, কোন মতে নিস্তার নাই। ততক্ষণ পরকালও আছে। জ্ঞান লাভ হলে—ঈশ্বর দর্শন হ'লে মুক্তি হ'য়ে যায়—আর আস্‌তে হয় না। সিধানো ধান পুঁতলে আর গাছ হয় না। জ্ঞানাগ্নিতে সিদ্ধ যদি কেউ হয়, তাকে নিয়ে সৃষ্টির খেলা হয় না। সে সংসার করতে পারে না। তার তো কামিনী কাঞ্চনে আসক্তি নাই! সিধানো ধান আর ক্ষেতে পুঁতলে কি হবে?" (৫ পৃঃ ৫৭)। তাঁর কি ইচ্ছা যে সকলেই শিয়াল-কুকুরের মত কামিনী কাঞ্চনে মুখ ভুবড়ে থাকে? কোন্‌টী তাঁর ইচ্ছা, কোনটা অনিচ্ছা কি সব জেনেছ? তাঁর কি ইচ্ছা মায়াতে জানতে দেয় না। তাঁর মায়াতে অনিত্যকে নিত্যবোধ হয় আবার নিত্যকে অনিত্যবোধ হয়। সংসার অনিত্য—এই আছে, এই নাই, কিন্তু তাঁর মায়াতে বোধ হয় এই ঠিক। তাঁর মায়াতে আমি কর্তা বোধ হয়, আর আমার এই সব—স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, বাপ, মা, বাড়ী, ঘর—এই সব আমার বোধ হয়। মায়াতে বিদ্যা, অবিদ্যা দুই আছে। অবিদ্যার সংসার ভুলিয়ে দেয়; আর বিদ্যামায়া—জ্ঞান, ভক্তি, সাধুসঙ্গ—ঈশ্বরের দিকে লয়ে যায়। তাঁর কৃপাতে যিনি মায়ার অতীত, তাঁর পক্ষে সব সমান—বিদ্যা অবিদ্যা সব সমান। সংসার আশ্রম ভোগের আশ্রম। কামিনী কাঞ্চন ভোগ কি আর করবে? সন্দেশ গলা থেকে নেমে গেলে টক কি মিষ্টি মনে থাকে না। (পৃঃ ৫।৭৯)।

এই সংসারে শ্রীভগবানকে দর্শন হয় না তাহার কারণ যোগমায়াতে শ্রীভগবান প্রচ্ছন্ন হইয়া আছেন। সকলের সম্মুখে কদাচ প্রকাশমান হন না। গীতাকার বলিয়াছেন যে এই জন্যই মূঢ়েরা তাঁহাকে জন্মহীন ও অব্যয় বলিয়া জানিতে পারেন না। কিন্তু এই যোগমায়া তাঁহারই শক্তি। অন্যকে মুগ্ধ করিলেও তিনি তাহাতে মুগ্ধ হন না। প্রত্যেকের অতীত-কালের ঘটনাবলী তিনি জানেন—আমাদের আগে কি হইয়াছে বর্তমানে ও ভবিষ্যতে কি হইবে, তাহা তিনিই জানেন। কিন্তু তাঁহাকে কেহই জানিতে পারে না!

তাঁহাকে কেন কেহ জানিতে পারে না? আমার হয়ত কোন বিষয়ে প্রবল অনুরাগ বা ইচ্ছা হইল এবং কোন বিষয়ে বা প্রবল বিরাগ বা বিদ্বেষ হইল—এই ইচ্ছা বা দ্বেষ রূপ দ্বন্দ্বভাব জনিত, "আমি সুখী" বা "আমি দুঃখী" এই ভাবিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়া যাই। এই যে ইচ্ছা ও দ্বেষ—ইহা জন্মকালীন সংস্কার-বশে মানুষের মনে উদিত হয়। পূর্ব সংস্কারের অনুরূপ এই যে ইচ্ছা বা অনুরাগ এবং প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ—ইহাতেই দ্বন্দ্বরূপী মোহে মানুষ মোহিত হইয়া ভগবানকে জানিতে চাহে না। এই সকল দ্বন্দ্বভাবে আমরা আজন্ম মৃত্যু পর্যন্ত মুগ্ধ আছি। এই মোহ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই, তবে তাহার পশ্চাতে ভগবানের যে পরম ভাব রহিয়াছে তাহার উপলব্ধি হয় এবং তখনই তাঁহাকে ঠিক ভজনা করা যায়। গীতাকার বলিয়াছেন,—"যাঁহারা আমাকে আশ্রয় করিয়া জরা, মৃত্যু হইতে বিনির্মুক্ত হইবার জন্য যত্ন করেন, তাঁহারাই সমগ্র জগতের পশ্চাতে যে পরম সত্য নিহিত আছে, উহা অবগত হইতে সমর্থ হন।" (গীতা, ৭।২৯)। শ্রীভগবানই যে জগৎময় বিরাজিত, স্থাবর জঙ্গম সমুদয় যে তাঁহার ভাবান্তর, ইহা জানিতে পারিয়া যে তাঁহার শরণাগত হইতে পারে, সেই তাঁহার কৃপায়, সেই মায়ার কুহেলিকা ভেদ করিয়া তাঁহাকে জানিতে পারে। এইরূপ সমাহিত-

চিত্ত ব্যক্তিরা মৃত্যুকালেও তাঁহাকে বিস্মৃত হন না। মৃত্যুর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া আমরা "গেলাম রে, মরলাম রে"—এই তো চীৎকার করি। কিন্তু যিনি তাঁহার শরণাগত, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাঁহার বিশ্বাস ও জ্ঞান, মৃত্যু-যন্ত্রণার মধ্যে ধীর ও স্থির থাকে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অমৃতময়ী বাণী আমরা স্মরণ করিব। তিনি বলিয়াছেন,—"তিনিই সব হয়েছেন—তাই বিজ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার মজার কুটি।' জ্ঞানীর পক্ষে 'এ সংসার ধোঁকার টাটি।' বিজ্ঞানী সর্বদা ঈশ্বর দর্শন করে—তাই চক্ষু চেয়েও দর্শন করে। কখনও নিত্য হতে লীলাতে থাকে—কখনও লীলা হ'তে নিত্যতে যায়। বিজ্ঞানী ঈশ্বরের আনন্দ বিশেষরূপে সম্ভোগ ক'রেছে। শুধু জ্ঞানী যারা, তারা ভয়তরাসে। যেমন সতরঞ্চ খেলায় কাঁচা লোকেরা ভাবে, যো সো ক'রে একবার ঘুঁটি উঠ্‌লে হয়। বিজ্ঞানীর কিছুতেই ভয় নাই। সে সাকার নিরাকার সাক্ষাৎকার করেছে—ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেছে—ঈশ্বরের আনন্দ সম্ভোগ করেছে। জ্ঞানীর মুক্তি কামনা, এই সব থাকে বলে দুহাত তুলে নাচতে পারে না। নিত্য লীলা দুই নিতে পারে না। আর জ্ঞানীর ভয় আছে পাছে বদ্ধ হই—বিজ্ঞানীর ভয় নাই। মৃত্যু ভয়ও নাই। কেউ দুধ খেয়েছে, কেউ দুধ দেখেছে, কেউ দুধ শুনেছে। বিজ্ঞানী দুধ খেয়েছে, আর খেয়ে আনন্দলাভ করেছে ও হৃষ্টপুষ্ট হয়েছে।

"অনেক জানার নাম অজ্ঞান—এক জানার নাম জ্ঞান—অর্থাৎ এক ঈশ্বর সত্য ও সর্বভূতে আছেন। তাঁর সঙ্গে আলাপের নাম বিজ্ঞান—তাঁকে লাভ করে নানাভাবে ভালবাসার নাম বিজ্ঞান।" (শ্রী রাঃ কঃ ৪।২৭৬)

মানবজীবনের প্রধান উদ্দেশ্যই হইল ঈশ্বরকে জানা এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে ভালবাসা। ব্যাকুলভাবে তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার দয়া হইবেই হইবে এবং আমরা প্রকৃত জ্ঞান ও বিজ্ঞান লাভ করিতে পারিব।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

[প্রথম চিঠিখানি এবং পরবর্তীটিও কাশী-নিবাসী জমিদার বাবু প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত]

(১)

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়

বরাহনগর
১৬ই বৈশাখ
(April 28 '90)

মহাশয়

গতকল্য বেলা প্রায় ১০টার সময় আমি বরাহনগরের মঠে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। রাত্রিতে যাত্রা করায় বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। রাত্রি প্রায় ৯টার সময় কাশীতে গাড়ীতে আরোহণ করি, সমস্ত রাত্রি সুখে নিদ্রা যাইয়া বেলা প্রায় ৭টার সময় Mokamah Stationএ নামি। তথায় আহারাদি করিয়া সমস্ত দিন বিশ্রাম করিয়া বেলা ৬টার সময় পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করি। সে রাত্রিতেও বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই। তৎপর দিবস বেলা প্রায় ১০টার

*শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

সময় Ballyতে নামি এবং Bally হইতে নৌকা করিয়া বরাহনগরে আসি। এক্ষণে শরীর অনেকটা ভাল আছে। ভাত খাইতেছি, কাশি প্রভৃতি যে সকল অসুখ ছিল তাহা দিন দিন কম পড়িতেছে, বোধ হয় অল্প দিনের মধ্যেই কিছু বল পাইতে পারি। বাবুরাম বাবাজী এখানে জ্বরে খুব ভুগিতেছেন, এক্ষণে একটু ভাল আছেন। নরেন্দ্র বাবাজী এই স্থানেই আছেন; তাঁহার শরীর এক্ষণে বেশ সুস্থ আছে, বোধ হয় তিনি গরমে শীঘ্র পশ্চিমে যাইবেন না। আমাকেও এক্ষণে কিছুদিন এই স্থানে থাকিয়া বিশ্রাম করিতে হইবে। আপনার স্তব পাঠ করিয়া এখানকার সকলেই অতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং আপনার পরমহংসদেবের উপর ভক্তি দেখিয়া সকলেই আশ্চর্য্য হইয়াছেন। আপনার নিকট যদ্যপি গঙ্গাধর বাবাজীর কোন পত্রাদি আইসে তাহা হইলে আমাদের সংবাদ দিবেন কারণ গঙ্গাধর বাবাজীর সংবাদ পাইবার জন্য সকলেই উৎসুক আছেন। আমাদের নমস্কার জানিবেন।—ইতি। নিঃ অভেদানন্দ

(২)

"শ্রীরামকৃষ্ণো জয়তি"

বরাহনগর
২৫শে বৈশাখ
May 7' 90

মহাশয়

আপনার পত্র পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। আপনি যে ৺বশিষ্ঠদেবের মন্দিরে প্রত্যহ যাইয়া নির্জ্জনে ভগবচ্চিন্তায় পরমানন্দ অনুভব করেন তাহা শুনিয়া অতিশয় প্রীতি লাভ করিলাম। সে স্থানটী বড়ই মনোরম এবং তথায় বসিলে (এমনি স্থানের মাহাত্ম্য) মনের স্বতঃই এক অপরূপ ভাব হয় এবং বিনা চেষ্টায় ভগবচ্চিন্তার উদয় হয়। সে স্থানটী আমি কখন ভুলিতে পারিব না। এখনও ইচ্ছা হয় যে তথায় বসি এবং আপনার সহিত ভগবৎ কথায় সময় অতিবাহিত করি। আপনি যে তথায় বসিয়া হৃষীকেশের সুখ অনুভব করেন তাহা হইতেই পারে। এমনি স্থানই বটে। যথার্থই এরূপ স্থানে কিয়ৎকাল বসিলে সাংসারিক ভাব সকল দূর হইয়া যায় এবং সাত্ত্বিক ভাবের উদয় হয়। আমি এক্ষণে এই মঠেই আছি। শরীর দিন দিন কিছু কিছু বললাভ করিতেছে। এক্ষণে শরীরে আর কোন অসুখ নাই। যাহা একটু দুর্ব্বলতা আছে তাহা বোধ হয় অল্পদিনের মধ্যেই সারিয়া যাইবে। প্রেমানন্দ বাবাজী এখন বেশ সারিয়া উঠিয়াছেন, এখন কোনও অসুখ নাই। নরেন্দ্র স্বামীর মধ্যে একটু জ্বরভাব হইয়াছিল, এক্ষণে আরোগ্যলাভ করিয়াছেন। অদ্য (বুধবার) গঙ্গাধর বাবাজীর একটী পত্র ও একটি parcel (যাহা তিনি রাওলপিণ্ডী হইতে পাঠাইয়াছিলেন) পাইলাম। পার্শ্বেলটিতে একটি শাক্যথুবা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি (যাহা তিনি তিব্বত হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন) এবং অমরনাথের ভস্ম ও বিল্বপত্রাদি পাঠাইয়াছেন। মূর্ত্তিটি অতি প্রাচীন এবং দেখিলেই বোধ হয় ইঁহার পূজা সর্ব্বদাই হইত। গঙ্গাধর ভায়া এক্ষণে রাওলপিণ্ডীতে আছেন এবং লিখিয়াছেন যে আমি শীঘ্রই এস্থান হইতে যাত্রা করিতেছি এবং অল্পদিনের মধ্যেই ৺কাশীধামে যাইতেছি। বোধ হয় এতদিনে আপনার বাটীতে আসিয়াছেন। এক্ষণে ৺কাশীধামের অসহ্য উত্তাপ তাঁহার পক্ষে অত্যন্তই কষ্টকর হইবে, কারণ তিনি বহুকাল শীত-প্রধান দেশে কাটাইয়া আসিতেছেন। যাহা হউক আপনার বাটীতে আসিলেই আপনি তাঁহাকে এখানে পাঠাইয়া দিবেন।

এ স্থানের গ্রীষ্ম তাঁহার তাদৃশ কষ্টকর হইবে না, কারণ ৺কাশীধামাপেক্ষা এ স্থানের গরম অনেক কম এবং এটি তাঁহার স্বদেশ, এ স্থানের জলবায়ু তাঁহার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কখনই অনিষ্টকর হইবে না। মঠস্থ সকলেই তাঁহার এস্থানে আসাই শ্রেয়স্কর বিবেচনা করিয়াছেন। আপনি তাঁহার যদি কোন পত্র পাইয়া থাকেন তাহা হইলে শীঘ্রই লিখিবেন এবং আপনার বাটীতে আসিলেই আমাদের সংবাদ দিবেন। মঠস্থ স্বামী সকলেই ভাল আছেন। তাঁহাদের সকলের নমস্কার জানিবেন এবং আমারও। গঙ্গাধর ভায়ার জন্য আমরা সকলেই চিন্তিত রহিলাম। এক্ষণে ৺কাশীধামে কিরূপ গরম পড়িয়াছে ও আপনি কেমন আছেন লিখিবেন।

ইতি নিঃ

অভেদানন্দ

(৩)

[স্বামী ব্রহ্মানন্দকে লিখিত]

New York

Nov. 4th 1897

My dear Rajah Saheb (প্রিয় রাজা সাহেব),

বহুকালের পর তোমার পত্র পেয়ে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না।

এখানকার কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। সপ্তাহে ৪টা lecture (বক্তৃতা) দিতেছি। লোকসংখ্যা মন্দ নহে। গত বুধবারে ৭৬ জন, তাহার আগের বুধবারে ১২৮ জন লোক আসিয়াছিল। হল পরিপূর্ণ! Subject (বিষয়) ছিল Concentration (একাগ্রতা), বোধ করি লোকের ভাল লাগিয়াছিল। যথাসাধ্য কার্য্য করিতে ত্রুটী করির না, তবে ফলাফল শ্রীশ্রীগুরুদেব জানেন।

Mr. Sturdyর অসন্তোষের কারণ কিছুই বুঝিতে পারি না। যতদিন Englandএ ছিলাম Mr. Sturdy কিছুই বলে নাই। এক্ষণে কত কথাই শুনিতেছি। কাহার মুখে হাত চাপা দিব বল? আমি যথাসাধ্য Sturdyর মতানুযায়ী কার্য্য করিতে ত্রুটী করি নাই। ইহাতেও যদি তাহার অসন্তোষ হয় তাহলে নাচার। আমার বোধ হয় এসব Mrs Sturdyর influence (প্রভাব)। Mrs Sturdy বেদান্তের উপর এবং নরেন্দ্রের উপর হাড়ে চটা; Indiaর নামে চটে; সে Mr. Sturdyকে গিলে আছে এবং সর্ব্বদাই শশব্যস্ত, পাছে Mr. Sturdy সন্ন্যাসী হয়ে পালায়।

যাহা হউক ভবিষ্যতে সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি অত্যন্ত ব্যস্ত—পত্র লিখিবার অবকাশ নাই, ক্ষমা করিবে—আমার ভালবাসা ও নমস্কার জানিও।

ইতি

দাস কালী

পথহারা

শান্তশীল দাশ

আঁধারের মাঝে ঘুরে ঘুরে মরি,
পথ পাই না যে হায়;
এমনি করেই দিনগুলি মোর
একে একে কেটে যায়।
হে প্রিয় আমার, দেবে না কি তুমি দেখা,
চলিব কি শুধু আঁধারের মাঝে একা?
পরাণ যে মোর আশাহত হয়ে
কেঁদে মরে বেদনায়।

মায়া-অঞ্জন পরায়েছ তুমি
দুইটি নয়নে মোর;
আলোকের রেখা তাই তো জাগে না
কাটে না আঁধার ঘোর।
সরাও বন্ধ, সরাও সে আবরণ,
সহজ দৃষ্টি দাও ভরে দু'নয়ন;
তোমার ধরণী চির আলোময়,
যেন সে দেখিতে পায়।

কঠোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

'বনফুল'

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় বল্লী

জন্মরহিত যিনি অকুটিল মন
যাঁর পুর একাদশ দ্বার*
ধ্যান করি যাঁরে লোকে দুঃখ নাহি পান
মুক্তি লভি হ'ন মুক্তভার
ইনি সেই ॥ ১ ॥

আকাশেতে হংস তিনি, অন্তরীক্ষে বসু
তাঁর নাম
বেদীতে তিনিই হোতা, গৃহে তিনি
অতিথি ও দ্বিজ,
মানবে দেবেতে সত্যে আকাশেতে তাঁর
অবস্থান
জলজ ভূমিজ তিনি সত্যজ অদ্রিজ
মহাসত্য তিনি সুমহান ॥ ২ ॥

প্রাণবায়ু ঊর্দ্ধলোকে সঞ্চালিত করি
অপানেরে নিক্ষেপ করিয়া অধঃস্তরে
মধ্যস্থলে যে বামন রহেন আসীন
সকল দেবতা তাঁর উপাসনা করে ॥ ৩ ॥

শরীরস্থ দেহ-স্বামী শরীর করেন যবে ত্যাগ,
সম্পর্ক করেন পরিহার,
অবশিষ্ট কিবা থাকে আর ?
ইনি সেই ॥ ৪ ॥

প্রাণ বা অপান দ্বারা কোন জীব
করে নাকো জীবন-ধারণ
প্রাণ ও অপান কিন্তু আশ্রিত যাঁহার
তিনিই তো জীবন-কারণ ॥ ৫ ॥

শোন তবে, হে গৌতম, বলিব তোমারে
সনাতন গুহ্য ব্রহ্ম কথা
এবং মৃত্যুর পর আত্মার গতি হয় যথা ॥ ৬ ॥

শরীর গ্রহণ তরে যোনিতে প্রবেশ করে
কত জীবগণ
স্থাবর কেহ বা হয় কর্ম্মফল জ্ঞানফল
যাহার যেমন ॥ ৭ ॥

বহুবিধ কামনারে করেন নির্ম্মাণ
যে পুরুষ সুপ্তি মাঝে জাগ্রত রহিয়া
তিনি শুদ্ধ, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত
সর্ব্বশাস্ত্রে গিয়াছে কহিয়া।
অতিক্রম কেহ তাঁরে করিতে না পারে
সর্ব্বলোক স্থিত সে আধারে।
ইনি সেই ॥ ৮ ॥

একই অগ্নি ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহু রূপ হ'ন
সর্ব্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী,
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন ॥ ৯ ॥

* ব্রহ্মরন্ধ্র, দুই চক্ষু, নাসিকার দুই ছিদ্র, দুই কর্ণ, মুখ, নাভি এবং মলমূত্রের দ্বারদ্বয়।

একই বায়ু ভুবনেতে প্রবেশিয়া যথা
রূপ-ভেদে বহুরূপ হ'ন
সর্ব্বভূতে প্রবেশিয়া আত্মাও অনুরূপী
অথচ আবার তিনি বাহিরেও র'ন ॥ ১০॥

সর্ব্বলোক-চক্ষু-সূর্য্য অশুচি-দর্শনে যথা
না হ'ন মলিন
সর্ব্বভূতস্থিত আত্মা নির্লিপ্ত তেমনি
জাগতিক দুঃখমাঝে স্বতন্ত্র অ-লীন ॥ ১১ ॥

সর্ব্বভূত অন্তরাত্মা, এক যিনি, নিয়ন্তা সবার,
আপনার একরূপে করেন বহুধা
তাঁহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়,—তাঁরা পান নিত্য-সুখ-সুধা ॥ ১২ ॥

অনিত্যের মধ্যে নিত্য, চেতনের চৈতন্য-স্বরূপ,
সকলের মধ্যে এক, কাম্য যিনি করেন বিধান
তাহারে যে ধীরগণ উপলব্ধি করেন অন্তরে
অন্যে নয়,—তাঁহারাই চিরশান্তি পান ॥ ১৩॥

অনির্দ্দেশ্য আনন্দ পরম
"এই তিনি"—বলি যাঁরে জানে যোগীজনে,
জানিব কেমনে তাঁরে? তিনি কি স্বয়ম্প্রভ?
অথবা প্রদীপ্ত হ'ন অন্যের কিরণে? ॥ ১৪ ॥

সূর্য্য চন্দ্র তারকার নাহি সেথা আলো
বিদ্যুৎ বা অগ্নি তাঁরে নারে প্রকাশিতে
তিনি দীপ্যমান তাই অনুদীপ্ত সব
সমস্তই উদ্ভাসিত তাঁহার জ্যোতিতে ॥ ১৫ ॥
(ক্রমশঃ)

বসুধারা

স্বামী সুত্রানন্দ

এক দিন, দুদিন—ক্রমান্বয়ে পাঁচ দিন যাবৎ বসে আছি বদ্রীনাথে, বৃষ্টি আর ধরছে না। যদি বা বৃষ্টি থামছে, পাহাড়ের গলিত বরফ ঝরে পড়ছে, কিন্তু আকাশ আদৌ পরিষ্কার হচ্ছে না। অবশেষে ষষ্ঠ দিনে ভোরবেলা অরুণোদয় হ'ল। চূড়াবলম্বী সুরঞ্জিত প্রভাত-কিরণে গিরিরাজের তুষারধবল অঙ্গে সৌন্দর্য আর ধরে না। চারিদিক আনন্দময়—যে যার কর্ম নিয়ে ব্যস্ত। 'জয় বদ্রিবিশাল লাল কি জয়' বলে দলে দলে লোক রাস্তায় বের হয়ে পড়ছে। সবাই ঘরমুখো—নীচে নামছে।

আমরাও 'জয় বদ্রিবিশাল লাল' বলে নারায়ণের উদ্দেশে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়—তবে নীচের দিকে নয়—উর্ধ্বাভিমুখী। যাব ওখান থেকে সাড়ে চার মাইল উপরে বসুধারায়। আমরা মোট যাত্রী-সংখ্যা ছিলাম এগার জন। তিনজন বেরিলি-নিবাসী এবং ৭ জন বোম্বেওয়ালা। নদীতীরস্থ রাস্তা ধরে আমরা পূর্ব দিকে রওনা হলাম, ডান পাশে 'ব্রহ্মকপাল'—যেখানে পিণ্ডদান বা তর্পণ করলে আর কোথাও করতে হয় না। গয়া আদি তীর্থস্থানের পিণ্ডদানের ফল অপেক্ষা এখানে নাকি কোটিগুণ বেশী ফল লাভ হয়। দুদিকে আবাদী জমি, তার মধ্যে প্রশস্ত রাস্তা। সেই মস্ত মাঠটার উপর থেকে হিমশিলাখণ্ড অপসারিত হতে না হতেই চাষীরা তাদের পাহাড়ীয়া লাঙ্গল দিয়ে তার বুকটাকে চিরে ফালি ফালি করে দিচ্ছে। প্রায় ১॥০ মাইল হেঁটে যখন

শস্যক্ষেত্র-বাহী সাধারণ পথ অতিক্রম করলাম তখন বাঁ দিকে পেলাম 'মাতা' মন্দির। ছোট মন্দিরের চারিদিকে তখনও কিছু কিছু বরফ রয়ে গেছে। মন্দিরে প্রস্তরমূর্তি বেশ সুন্দর, কিন্তু ইনি যে কোন্ দেবতা তা কেউ বল্‌তে পারে না। হয়তো শক্তির আরাধনাই এখানে করা হয়। দেবী দর্শন করে আমরা অগ্রসর হলাম গন্তব্যস্থলে। ডানদিকে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই পাওয়া গেল অলকানন্দার উপর ঝোলা-সেতু। অতি জীর্ণ। প্রায় সব কাঠই খসে পড়ে গিয়েছে—আছে শুধু লোহার দড়িগুলো। হাঁটতে দোলে—নীচে তরঙ্গিনীও আবার খরস্রোতা ফেনিল-কল্লোলপূর্ণ, কারণ একটু উপরেই একটি সঙ্গম। এ বৈতরণী অতিক্রম করতে হবে বলে অনেক যাত্রী এখান থেকেই ফিরে আসেন—বসুধারা যাওয়া হয় না। আমাদের ৭ জন সাথী এখানে কেটে পড়লেন। যা' হোক, বাকী চার জন কোন প্রকারে এ কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'লাম। অপর পারে মানাগ্রাম। আদিবাসী সবই তিব্বতী। এ গ্রামই এ দিককার উত্তর সীমানায় শেষ ভারতীয় জনপদ। কিন্তু সীমারেখা আরো ৩০ মাইল দূরে। শুনলাম ৫ দিনের পথ। ৫০ মাইল দূরে আছে তিব্বতের বস্তি। গ্রামের উপরের পর্বত "স্বর্গারোহিণী"তেই বিখ্যাত মানা পাস। এদিকে মানস সরোবর যাবারও একটি পথ আছে। এ পথে দূরত্ব কম কিন্তু অত্যধিক বিপদের সম্ভাবনা। প্রবাদ আছে পঞ্চপাণ্ডব এই স্বর্গারোহিণী পর্বত অতিক্রম করেই মহাপ্রস্থান করেছিলেন।

গ্রামের উত্তর সীমাতে কেশব প্রয়াগ। দক্ষিণাভিমুখা অলকানন্দার সহিত পশ্চিমগামিনী সরস্বতীর সঙ্গম। অতি মনোরম এ সঙ্গমটি। পশ্চিমে নীচু সেই আবাদী জমি—পূর্বে জনপদ আর উত্তরে তুষার-ধবলমৌলী পর্বতের শোভা—তারই মধ্যস্থলে কর্দমাক্ত সাদা অলকানন্দার সঙ্গে নীল সরস্বতীর মিলন। কিন্তু মিলিত হ'লেও কিছুদূর না যাওয়া পর্যন্ত মা সরস্বতী তাঁর নিষ্কলঙ্ক দেহ মলিন হতে দেন নি। আমরা স্কুল গৃহের পাশ দিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে আবার সরস্বতী অতিক্রম করলাম। এবার আর জরাজীর্ণ পুল নয়—এ পুল স্বয়ং বিশ্বকর্মার স্বহস্তে নির্মিত। প্রকৃতি এখানে নদী মধ্যবর্তী দুটী পাহাড়ের যোগাযোগ এমনভাবে করেছেন যে, অনেকেই বুঝতে পারে না—যে এ মানুষের হাতে-গড়া পুল নয়।

সরস্বতী পার হয়ে আমরা আবার অলকানন্দার পূর্ব তীর ধরে উত্তর দিকে চলতে লাগলাম। এখানের দৃশ্যাবলী অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর। জনমানববিহীন—এমন কি প্রায় পশুপক্ষীবিহীন হিমালয়ের এই নিভৃত প্রদেশে যেন নিজের অস্তিত্বেরও স্মৃতি বিলুপ্ত হয়ে যায়। নদীর দু পারে উচ্চ হিমগিরি—যেন গলিত রৌপ্য। রাস্তার এপাশে ওপাশে ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত ভেঙে পড়া পাহাড়ের ধ্বংসস্তূপ। তার মধ্যে মধ্যে আবার বরফের চাঙর। যেখানে পাথর নেই, বরফও নেই সেখানেই কত সদ্যপ্রস্ফুটিত রং বেরংয়ের মনোহর কুসুমনিচয়। সম্মুখে দৃশ্যপটের অন্তর্ভুক্ত যা আছে—রজতশুভ্র—একরূপ। ও রূপের অতীত ও আগামী কালেতে কোন ভেদাভেদ নেই। তখনও আমাদের সম্মুখে ২ মাইল রাস্তা। ক্রমশঃ চড়াই। সবারই বুক ধরেছে। একটু দম নিয়ে আবার চললাম। কি শীত! বেলা ১০টা বাজে—বেশ রৌদ্র। কিন্তু কন্‌কনে হাওয়া। অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যেন অবশ হয়ে আসছে। সূতী, পশমী, রেশমী কোন পোষাকেই শীত ঠেকাতে পারছে না। আরো এক মাইল চলার পর একটি তৃণাচ্ছাদিত ও কুসুমাস্তীর্ণ সুন্দর মাঠ পাওয়া গেল। সেখানে তিন চারিটা তাঁবু

খাটিয়ে তিব্বতী লোক বাস করছে। ছাগল, গরু, ঘোড়া চরাচ্ছে। বসুধারা এখান থেকে বেশ দেখা যাচ্ছে। সকলেই খুব উৎসাহের সহিত এগিয়ে যাচ্ছি।

এখানে একটি বরফের নদী অতিক্রম করতে হয়। জমাট বাঁধা তুষারের নীচে দিয়ে সেই বসুধারার প্রবাহিণী প্রবাহিত হয়ে গিয়ে অলকানন্দায় পড়েছে। সমতল নয় ঢালু। খুবই বিপজ্জনক। পা একবার পিছলে গেলেই একেবারে অলকানন্দায়! এখানে আমাদের সাথী আরো দুজন বসে পড়লেন। আমরা বাকী দুজনও যেতে পারতাম না, যদি চোখের সামনে আর একদল যাত্রীকে বসুধারা দর্শন করে ফিরে আসতে না দেখতাম এবং তাদের উৎসাহবাক্য না পেতাম। তাঁরা বললেন—"কষ্ট করে যখন এতদূর এসেইছেন, তখন এইটুকু রাস্তার জন্য ফিরে যাবেন? আমরা এ রাস্তায় ত যাতায়াত করেছিই—এই দেখুন আমাদের একজন সঙ্গী সাধু নিঃসঙ্গ হয়ে চলে যাচ্ছেন শতপন্থ।" আমরা ভয়ে ভয়ে সেই হিমানীর উপর নেমে পড়লাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই সেই ভদ্রলোক দেখি গড়িয়ে যাচ্ছেন নিম্নাভিমুখী। কোন প্রকারেই পা সামলাতে পারছেন না। হাত পা দিয়ে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করছেন —পারছেন না, উপর থেকে অন্য যাত্রীসকল চিৎকার করছে। যাক, ভাগ্য ছিল ভাল—তিনি ছিলেন আমার উপরে। গড়িয়ে এসে শেষে আমার উপর ঠেকলেন। আমিও প্রস্তুত ছিলাম। দণ্ডটি বেশ করে পুঁতে দৃঢ় হস্তে তাঁকে ধরলাম। একটু শান্ত হয়ে—আমার যষ্টীতে একে একে কায়দা মাফিক পা ফেলে দুজনই পার হলাম। তিনি ছিলেন একটু বয়স্ক। বেরিলির পশুবিদ্যালয়ের একজন উচ্চ কর্মচারী, নাম—এম, এন, উপাধ্যায়। বেশ সাহসী ও উৎসাহী।

বসুধারাতে পৌঁছলাম। প্রচণ্ড ধারা নিরবচ্ছিন্নভাবে ঝরে পড়ছে। এত উঁচু থেকে ঝরে পড়ছে যে তার অর্ধেক জল বাষ্পাকারে ও বৃষ্টির আকারে উড়ে যাচ্ছে। সে ধারাতে স্নান করবার মত সাহস হল না—তবে সে বৃষ্টিতে ভিজেছি। শীত ত ছিলই—তাছাড়া সে সময়ে বসুধারার জলে নামা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল। কিছুদিন পরে আরও বরফ গললে নামা যেতে পারে। সঙ্গে পাত্র ছিল, পবিত্র ধারার জল কিছু নিয়ে আমরা নীচে নেমে আসলাম।

বসুধারা থেকে আরও দেড় মাইল দু-মাইল উত্তরে অলকাপুরী। সে নয়নাভিরাম দৃশ্য এখান থেকে দেখেই তৃপ্ত হলাম। যেতে সাহসী ছিলাম কিন্তু প্রস্তুত ছিলাম না। ওখানে যেতে হলে সঙ্গে খাদ্যদ্রব্য, তাঁবু ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে যেতে হয়। রাস্তায় কিছু পাবার আশা নেই। এক দিনে গিয়ে বদ্রীনাথে ফিরে আসা—তাও সম্ভব নয়। অলকাপুরীর স্বর্গীয় শোভা অত্যন্ত সুন্দর। মধ্যস্থলে যেন বিভূতিভূষিত বা ঘৃত-সিক্ত হয়ে স্বয়ং কেদারনাথ বসে আছেন, অথবা সমুদ্রমন্থনের মন্থনদণ্ড পাষাণকায় মন্দরগিরিসদৃশ অচল অটল এক পর্বত ক্রমশঃ ক্ষীণকায় হয়ে ঊর্ধ্বদিকে উঠেছে। তার পূর্বে ও পশ্চিমে দুটি প্রশস্ত উপত্যকা বহুদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। পূর্ব উপত্যকাটির বুকের উপর দিয়ে নেমে এসেছে গিরিনদী অলকানন্দা। পশ্চিম উপত্যকা তার অঙ্গে শুভ্র বরফের শয্যা সাজিয়ে চলে গেছে শতপন্থ। উপত্যকা দুটির পর পর আবার হিমগিরি গগনস্পর্শী শৃঙ্গ উন্নত করে দণ্ডায়মান। সেই শোভা দেখলে মনের মধ্যে একটা কেমন পরিপূর্ণতার উদ্রেক করে, তা বর্ণনার বস্তু নয়—অনুভবের। শতপন্থ ওখান থেকে ১২ মাইল দূরবর্তী একটি মনোরম হ্রদ।

বসুধারা মাহাত্ম্য :—শাস্ত্রে আছে, অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলে ভগবান বশিষ্ঠ ক্ষণমাত্র ধ্যান করে বল্‌লেন—"এই সর্ববেদময় ও বেদধারাময় তীর্থ ব্রহ্মহত্যাদি-নিবারক, পিতৃপুরুষের মুক্তি-দাতা এবং সম্পূর্ণ পাপনাশক। পাপীদের মস্তকে উহার জলবিন্দু কখনই পড়ে না। হে বরাননে! এখানে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষরূপ ফলপ্রাপ্তি হয়। এইস্থানে ধর্মশিলা নামক শিলা আছে যেখানে আট বৎসর ধরে আট লক্ষ জপ করলে বিষ্ণুর রূপ প্রাপ্তি হয়। সর্বতীর্থফলদাতা সোমতীর্থ বিখ্যাত। চন্দ্রের সহিত ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। হে মহাভাগে! পূর্বে এখানে চন্দ্র তপস্যার প্রভাবে সর্বলোকদুর্লভ অতি সুন্দর রূপ পেয়েছিলেন। সর্বলোকদুর্লভ সত্যপদতীর্থ এখানেই অবস্থিত; স্নান, জপ ও দান করলে অনন্ত ফলপ্রাপ্তি হয়।"

গঙ্গার বাঁধ

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

ঘুচাতে দৈন্য সব মালিন্য
আবার দেশশ্রীর,
ভাগীরথী বাঁধা, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ
করণীয় বাঙালীর।
সর্ব্ব অগ্রে করিতে হইবে তাই,
তাহা বিনা আর অন্য পন্থা নাই,
অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে
পুনঃ সুরধুনী নীর।

২

পেয়েছি এ ধারা মহামানবের
কঠিন তপস্যার,
মহাকাল-জটা নিঙাড়িয়া আনা
বঙ্গের আঙিনায়।
পরাধীনতার বেড়ি খসে গেছে আজ,
ধৌত করিয়া সব গ্লানি, সব লাজ,
বহাতে হইবে দিব্য ও স্রোত
উচ্ছল মহিমায়।

৩

ভাগীরথী লয়ে ঘর করি মোরা,
আমাদের ভাগীরথী,
মর্ত্ত হইতে স্বর্গ যাবার
সোপান স্রোতস্বতী।
শ্রেষ্ঠ মোদের বিত্ত দেবোত্তর,
দাবী ও ধারার প্রতি বিন্দুর পর,
সলিলরূপা ও লক্ষ্মী মোদের
সব অগতির গতি।

৪

গঙ্গামাটির বঙ্গ মোদের
কান্তিমতী এ ধরা,
আমরা মাটির মানুষ কিন্তু
গঙ্গামাটিতে গড়া।
আমরা শরীরী জল-বিদ্যুৎ তাঁর,
আগুলি রাখিব পুণ্য সলিল ধার,
কল্পতরুর তলে বাস করি
ফলে আছে অধিকার।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি*

ইডা আন্‌সেল

(২)

[পূর্বপ্রকাশিত অংশের (উদ্বোধন, চৈত্র, ১৩৫৯) চুম্বক ঃ—

১৮৯৯ সালের শেষের দিকে স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার আমেরিকা যাবার সময় তাঁর অন্যতম গুরু-ভ্রাতা স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাশ্চাত্ত্য দেশের কাজে সহায়তার জন্য নিয়ে যান। প্রথমে ডেট্রয়েটে এবং পরে সান্‌ফ্রান্‌সিস্‌কোতে তুরীয়ানন্দজী কাজ আরম্ভ করেন। আন্তরিক আগ্রহবান ধর্মজীবনযাপনেচ্ছুগণের ধ্যানধারণাদির সুবিধার জন্য শহর থেকে দূরে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা হয়। মিস মিনি সি বুক্‌, সান্ অ্যাণ্টন উপত্যকায় পুরোণো একটি কাঠের ঘরসহ তাঁর এক খণ্ড জমি এই বাবদ দিতে চাইলেন। স্বামী তুরীয়ানন্দের কয়েকজন উৎসাহী ছাত্র ও ছাত্রী সেই জায়গায় গিয়ে আশ্রমটি গড়ে তুলতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। আচার্যকে সঙ্গে নিয়ে তল্পিতল্পা বেঁধে এক সন্ধ্যায় রওনা হলেন এই অভিযাত্রিকদল দুর্গম পথে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত পরিবেশের উদ্দেশে। লেখিকাও ছিলেন এই দলের একজন। পার্বত্য ও আরণ্য পথের বহু কষ্ট সয়ে তাঁরা চব্বিশ ঘণ্টা পরে পৌঁছুলেন গন্তব্যস্থানে। মনোরম নিস্তব্ধ প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী এবং স্বামী তুরীয়ানন্দের পবিত্র আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্বের ঘনিষ্ঠ সঙ্গ তাঁদের সকল শ্রান্তি, ক্লান্তি দূর করে দিল।]

এর পর সব কিছুরই সম্মুখীন হতে আমরা প্রস্তুত রইলাম। কাঠের একখানি ছোট কুঠরি আর একটা তাঁবু পাওয়া গেল রাত কাটাবার জন্যে। এগারো জন লোকের পক্ষে খুবই অপর্যাপ্ত; কিন্তু আমাদের সেটা সমস্যা বলেই মনে হল না। বর্ষীয়সী দুইজনকে ঐ কুঠরিটি দেওয়া হ'ল। আগুনের কুণ্ডটার পাশে কম্বল মুড়ি দিয়ে ডাঃ লোগ্যান শুয়ে পড়লেন। ধীরা (মিসেস্ বার্থা পিটারসন্) আর আমি উপত্যকাটির কিছুদূর নীচে একটা খড়ের গাদা আবিষ্কার করে ফেললাম। বললাম, ঐ খড়ের গাদাতেই আমরা শোব। অপরদেরও আমন্ত্রণ জানালাম। কিন্তু মিসেস্ এমিলি অ্যাস্‌পিনাল (Emily Aspinal) ও শ্রদ্ধা, মিস্ বুক্ আর মিস্ বেলের সাথে তাঁবুর মধ্যে থাকাই সিদ্ধান্ত করলেন। কেবল মিঃ ক্লুরব্যাক্ ও আমাদের পরম স্নেহময় আচার্য স্বামী তুরীয়ানন্দজী আমাদের আমন্ত্রণ রাখলেন। খড়ের গাদাটির এক পাশে ওঁরা দুজন এবং অপর পাশে আমি আর ধীরা শুয়ে পড়লাম। অনেকক্ষণ ধরে গল্প চলল। কারো চোখেই ঘুম নেই। সুদূর এই জনমানবহীন স্থানে আমাদের দলের অভিনব পরিস্থিতি সকলেরই চিত্তে একটা উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল। তন্দ্রা আদৌ আসবার কথা নয়। প্রত্যেকের একখানি করে পাতলা কম্বল ছিল; রাত কাটানর পক্ষে যথেষ্ট, কারণ রাতটা ছিল গরম আর পোষাক-পরিচ্ছদও আমরা কেউ খুলিনি। আমাদের যেন আনন্দের সীমা ছিল না। শেষ রাতের দিকে ঘন কুয়াসা পড়েছিল, এটা ঐ সময়ে খুবই অস্বাভাবিক।

* হলিউড্ বেদান্ত-কেন্দ্রের 'Vedanta and the West' পত্রিকার Sept-Oct, 1952 সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনূদিত।

সে রাত্রি ঐভাবে কাটলো। ঠাণ্ডায় ধীরা ও আমার স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে আশঙ্কায় পরের দিন থেকে আর আমাদের বাইরে শুতে দেওয়া হল না। অপর চার জন মহিলার সঙ্গে আমাদেরও তাঁবুতে শোবার আদেশ হল। মিঃ রুরব্যাক্ ও স্বামী তুরীয়ানন্দজী কিন্তু যথারীতি খড়ের গাদার উপরেই রাতে শুতে লাগলেন। সবদিক গুছিয়ে-গাছিয়ে ঠিক করে নিতেই কেটে গেল কয়েকদিন।

আজ বার্ধক্যের প্রান্তে এসে ভক্তদের যখন কোন ছোটখাট অসুবিধার জন্য বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখি, তখন আমার মনে মনে হাসি পায়। মনে পড়ে যায় সেই সুদূর অতীত ঘটনাগুলির কথা। কতই না অসুবিধা আমরা প্রথমে ভোগ করেছিলাম—কিন্তু ক্রমশঃ মোটামুটি সব অভাবই আমাদের কি ভাবে পূরণ হয়ে গিয়েছিল!

ছয় মাইল দূরে একটি কুয়ো থেকে পিপে ভর্তি করে জল আনা হত। এক পিপে জলের দাম পড়ত পঁচাত্তর সেণ্ট্। কয়েকদিনের মধ্যে তিনটি ঝরণার সন্ধান পাওয়া গেল। এদেরই একটাকে পরিণত করা হল কুয়োতে। আমাদের 'বালতি-বাহিনী'র সভ্যেরা রোজ সকালে প্রাতর্ভোজনের আগেই আধ মাইল সরু রাস্তা ধরে চলে যেতেন ঐ কুয়োর কাছে। সারাদিনের প্রয়োজনের জন্য প্রত্যেকেই এক এক বালতি জল বয়ে আনতেন। কাপড় জামা কাচা প্রভৃতি করতে হত ঐ কুয়োতলাতে গিয়ে আর ওসব রৌদ্রে শুকোতে দেওয়া হত ঝোপঝাড়ের উপর মেলে। স্নানাদি করতে খুব ভোরেই পুরুষেরা চলে যেতেন ঐ কুয়োতে। মেয়েরা স্নান করতেন তাঁদের তাঁবুতে।

মিস্ লুসি বেক্‌হাম্ (Miss Lucy Beckham) আর মিস্ ফ্যানি গাউল্ড (Miss Fanny Gould) কয়েকদিন পরেই এসে পৌঁছুলেন। মাউন্ট হ্যামিল্টনে আমাদের ফেলে আসা জিনিসগুলোও ক্রমে এসে গেল। ছোট একটি চালাতে আমাদের রান্নাঘর করেছিলাম, আর রান্নাঘরের ছাদ থেকে কাঠের ঘরটার উপর পর্যন্ত একটা ক্যাম্বিস কাপড় ঝুলিয়ে তার তলায় আমাদের বাইরের খাবার ঘর তৈরী হল।

মিঃ রুরব্যাক্ তক্তা দিয়ে কয়জন লোকের বসার মত একটি খাওয়ার টেবিল তৈরী করে ফেললেন। রান্না চালার তলায় জিনিসপত্র সাজিয়ে রাখার জন্য মাটি খুঁড়ে ফেলে একটা ভূগর্ভ-ভাণ্ডার তৈরী হল। প্রধানতঃ আহারের ব্যবস্থা ছিল নিরামিষ; তবে ডিম, মাছ পনীরও খাওয়া হত। দুধ পেতাম মিঃ গারবারের পাঁচ মাইল দূরবর্তী খামার থেকে। আমরা দুধ ও মাখন একটা তারের জালতির বাক্সের মধ্যে পুরে দক্ষিণ দিককার একটি গাছের নীচে ঝুলিয়ে রাখতাম। আর সেগুলো ঠাণ্ডা রাখার জন্য বাক্সটির চার পাশে জড়িয়ে দিতাম ভিজে কাপড়। রান্নাবান্না, রুটি সেঁকা এবং বাসনপত্র ধোয়ার কাজ ভাগ করা থাকত। মেয়েরা সকলে কাজ করতেন দুজন দুজন মিলে। পুরুষদের ভাগে পড়তো ভারী-ভারী কষ্টকর কাজগুলো, যেমন কাঠ জোগাড় করা, কাঠকাটা, এবং কাঠ দিয়ে আসবাবপত্র তৈরী করার জন্য মিঃ রুরব্যাককে সাহায্য করা। প্রত্যেককে নিজের তাঁবু ঠিক রাখতে হত। রাঁধুনীদের হাতে ছিল রান্নাঘরের দায়িত্ব। আমি দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠা ছিলাম বলে আমার উপর আচার্যদেবের তাঁবুর সমস্ত ভার ন্যস্ত ছিল। আসবাবপত্র ছিল ছোটখাট কয়েকটি ক্যাম্প-খাট, টুল, চেয়ার খানকতক আর কাপড়চোপড় রাখবার জন্য কাঠের দুএকটা বাক্স। ভিতরকার আলোর জন্যে ছিল মোমবাতি আর তেলের প্রদীপ বাইরে যেতে হ্যারিকেন ব্যবহার করা হত।

প্রথমেই ধ্যানঘর তৈরী করার কথা হল। অনতিবিলম্বে মিঃ ক্লরব্যাক এর নির্মাণকার্য আরম্ভ করে দিলেন। অমসৃণ তক্তার একটা চৌকো ঘর, তিন দিককার জানলাই বাইরের দিকে খোলা। পরে এই ঘরের মেঝে ঢাকবার জন্য খড়ের মাদুর পাওয়া গিয়েছিল। একটা গোলাকার ছোট কাঠের উনান জ্বেলে ঘরটি গরম রাখা হত। আমাদের উপাসনার বেদী তৈরী হল দাবাখেলার চৌনা ছক-টেবিল দিয়ে। তার ওপর ছিল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আর স্বামী বিবেকানন্দের ছবি এবং ফুলদানি আর ধূপাদি জ্বালার ব্যবস্থা। কোন আনুষ্ঠানিক পূজার্চনা হ'ত না। প্রাচ্য রীতির মধ্যে শুধু একটিই পালিত হত—বাইরে জুতো খুলে রেখে উপাসনা ঘরে প্রবেশ করা।

এর পরে দুখানা বেঞ্চ তৈরী করে ঘরের বাইরে, দরজার দুপাশে পেতে দেওয়া হয়েছিল, যাতে সবাই বসে জুতো খুলতে পারেন। আরও পরে বর্ষাকালে এই প্রবেশ-পথটির উপরে ক্যাম্বিসের একটা আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হয়। ধীরা স্বামী তুরীয়ানন্দজীর বসবার ক্যাম্বিসের কুশনটিতে 'শান্তি'—এই কথাটি সূচিকর্মসাহায্যে তুলে দেন। শিষ্যেরা আসনপিঁড়ি হয়ে বসবার জন্যে নিজ নিজ সুবিধানুযায়ী আসন পেতে বসতেন। কেউ বসতেন নীচু বাক্সর ওপর, কেউ বা পাইন পাতায় ভর্তি বিভিন্ন আকারের কুশনে। দরজার উল্টো দিকের জানলার নীচে ছিল স্বামী তুরীয়ানন্দজীর বসবার স্থান।

আমরা সকলে দেয়ালের চারদিকে বসতাম। অশ্বচালক যেমন ঘোড়াকে আয়ত্তে রাখার জন্য রাশ টেনে ধরেন, স্তবোচ্চারণের আগে স্বামী তুরীয়ানন্দ ঠিক তেমনি করেই আমাদের এই ব্যূহটার উপর দিয়ে নিজের দৃষ্টিকে সঞ্চালিত করে নিতেন। তারপর সুর করে আবৃত্তি আরম্ভ করতেন ; উপাসকমণ্ডলীর সব অস্থিরতা শান্ত না হওয়া পর্যন্ত এই আবৃত্তি চলতো। একদিন জনৈক তাঁকে শুধালেন,—"এই আবৃত্তির তাৎপর্য কি ?" তিনি উত্তর দিলেন,—"এ হচ্ছে অস্থির মনের গতিকে কশাঘাত করে আপনার বশে আনা।" আবৃত্তির ঝঙ্কারের সাথে সাথে আমাদের মনও স্থির হয়ে আসত। ঘণ্টাখানেক পরে স্বামিজীর কণ্ঠে যখন আবার স্তবধ্বনি গুণগুণিয়ে উঠত তখন মনে হত—এ সুরধারা যেন কোন এক সুদূর রাজ্য থেকে আসছে ভেসে। কদাচিৎ আমরা এই পুরো এক ঘণ্টা সময় ধীর ও শান্ত ভাবে বসে থাকতে পারতাম। মশা, মাছি এবং আরও সব পোকামাকড় আমাদের বেশ ব্যতিব্যস্ত কোরতো। কিন্তু স্বামী তুরীয়ানন্দকে এরা কখনও বিচলিত করতে পারত না। বাহ্যিক পরিবেশ সম্বন্ধে কোন হুঁশই থাকতো না তাঁর। একটা দারুণ বিষাক্ত পোকা এক দিন তাঁর হাতে দিল বিঁধে। ঐ জায়গাটা পরে ফুলে উঠ্‌তে লাগলো। পরের দিন সকালে সারা হাতখানাই স্ফীত হয়ে উঠল ভীষণভাবে। আমরা সবাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। সব চেয়ে কাছের ডাক্তারটি তো থাকেন পঞ্চাশ মাইল দূরে। সেখানে যাবার কোন যানও নেই—একটি দু-চাকার গাড়ী ছাড়া। যে ঘোড়া ঐ গাড়ী টানবে সে যথেচ্ছা ঘুরে বেড়াচ্ছে দূরের বিরাট মাঠগুলোয়। একে ধরে এনে গাড়ীতে জুততে হলে বহু লোকের সমবেত চেষ্টার দরকার ! যাহোক এই সময় হঠাৎ একটা যেন যাদুর মত ব্যাপার ঘটে গেলো। নিউইয়র্কের একটি তরুণ ডাক্তার আশ্রমে আসবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হয়ে পড়েছিলেন ; পত্রাদি লিখে যানবাহনের যথাযথ বন্দোবস্ত করার সময় পর্যন্ত তিনি অপেক্ষা করতে পারলেন না। লিভারমোর থেকে পঞ্চাশ মাইল রাস্তা হেঁটে ঠিক আমাদের এই বিপদের সময়টিতে তিনি উপস্থিত হলেন যেন দৈবপ্রেরিত হয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দের পীড়িত হাতখানির সেবার জন্যেই ! তিনি পৌঁছে তাঁর ছোট ব্যাগটি থেকে কিছু ওষুধপত্র বের করে ওঁর হাতে লাগিয়ে দিলেন। এই তরুণ ডাক্তারটি স্বামী তুরীয়ানন্দজীর একজন অত্যন্ত অনুরাগী শিষ্য হয়ে উঠেছিলেন। আচার্য এঁর নাম দেন আত্মারাম—আত্মাতেই যাঁর পরম আনন্দ।

(ক্রমশঃ)

কর্ম্মের প্রকারভেদ

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দুশাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গীতে কর্ম্ম ধর্ম্মের সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কর্ম্মানুষ্ঠান আমাদের ইহ-জীবনের অপরিহার্য্য ব্রত। কর্ম্ম প্রধানতঃ দ্বিবিধ, বৈধ ও অবৈধ। বৈধ কর্ম করিলে পুণ্য সঞ্চয় হয়; অবৈধ অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্ম্ম করিলে পাপভাগী হইতে হয়। বৈধ কর্ম্ম তিন প্রকার: (১) নিত্য, (২) নৈমিত্তিক এবং (৩) কাম্য। সন্ধ্যা-বন্দনা, পিতামাতার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি নিত্য কর্ম্ম অর্থাৎ যে কর্ম্ম না করিলে পাপ সঞ্চয় হয়। কোন নিমিত্ত বা উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের নাম নৈমিত্তিক কর্ম্ম। যে অনুষ্ঠানের দ্বারা স্বর্গাদি অভীষ্ট ফল লাভ হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম্ম। নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম করিলে কোন না কোন অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারা যায়। সর্ব্বশাস্ত্রে যাহা করিতে নিষেধ আছে, তাহাকে নিষিদ্ধ কর্ম্ম বলে, যেমন নরহত্যা, পরস্ত্রী-গ্রহণ ইত্যাদি।

বৈধ কর্ম্মের ফল,—স্বর্গ, অর্থাৎ সুখ ও শান্তি। অবৈধ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের ফল,—নরক অর্থাৎ নানাবিধ দুঃখভোগ। স্বর্গ ও নরক আমাদের মনে। ইহজীবনেই তাহার ফল ভোগ করিতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সুফল ও কুফল সদ্য সদ্য ঘটে, কোন কোন ক্ষেত্রে বিলম্বে ঘটে। সুকর্ম্ম ও কু-কর্ম্মের যে সকল ফল ইহ-জীবনে ঘটে না, বহু লোকের বিশ্বাস, তাহা পরজন্মে ঘটে। ধর্ম্মশাস্ত্রেও এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে।

পুণ্যকর্ম্ম-হেতু স্বর্গ এবং পাপকর্ম্ম-হেতু নরক,—এই দ্বিবিধ কর্ম্মবন্ধই সৃষ্টির নিমিত্ত। তদ্ভিন্ন সৃষ্টি বৈচিত্র্যবিহীন হয়। বিধাতার উদ্দেশ্য, বোধ হয়, তাহাতে সিদ্ধ হয় না। সর্ব্ব দেশে সর্ব্ব শ্রেণীর লোকের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল আছে যে, পুণ্যকর্ম্মফলে সুখ ও শান্তি এবং পাপকর্ম্মফলে দুঃখ ও দুর্দ্দশা ঘটে। এই জন্য সুখার্থী ব্যক্তি অতিশয় যত্নসহকারে পুণ্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। পাপপুণ্যের অনুষ্ঠান-ফল যদি ইহজীবনেই শেষ হইত, এবং একটি মাত্র জীবনেই জগৎ-সৃষ্টির উদ্দেশ্য সাধিত হইত, তাহা হইলে সৃষ্টির বৈচিত্র্য নষ্ট হইত। বৈচিত্র্য-হীন সৃষ্টি নিস্ফল। বৈচিত্র বিধানের উদ্দেশ্যেই বিশ্বস্রষ্টা "একমেবাদ্বিতীয়মের' এক হইতে বহু হইবার বাসনা ও বিলাস। বহুর সৃষ্টি। ইহাই তাঁহার লীলা।

এই কারণেই বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন ধর্ম্মের উৎপত্তি; এবং বিভিন্ন শ্রেণীর রুচির লোকের বিভিন্ন কর্ম্মের বিধান। এই জন্য গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ ও বৈচিত্র্য; প্রধানতঃ চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার একটি প্রধানতম শ্লোকার্দ্ধ এখানে উল্লেখযোগ্য :—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।

বিভিন্ন কর্ম্মের বিভিন্ন ফল; এবং বিভিন্ন ফলের বিভিন্ন ভোগ। সকল কর্ম্মের সর্ব্বপ্রকার ফলভোগ ইহজীবনে সম্ভবপর নহে। এই জন্য এই জগৎ-প্রপঞ্চ; অর্থাৎ, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের পৌনঃ-পুনিক লীলা-বিলাস। ইহজীবনের কৃতকর্ম্মের ভুক্তাবশেষ ফল-ভোগের নিমিত্ত পুনর্জ্জন্ম। শাস্ত্রে আছে পাপভোগের অবসানে, এই সংসারে জীবের অনেকবার জন্ম হয় এবং পুণ্যভোগের

অবসানেও জীবের অনেক পুনর্জ্জন্ম হইয়া থাকে; ইহার অন্যথা হয় না। আমরা অন্যান্য ধর্ম্ম-পুস্তকের প্রমাণ উদ্ধৃত না করিয়া সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্রের সারভূত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্তি উৎকলন করিব :

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।

জাতমাত্রের মরণ নিশ্চিত এবং মৃতেরও পুনর্জ্জন্ম নিশ্চিত। পুনশ্চ :—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

(গীতা ২।১৩)

দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে কৌমার যৌবন ও বার্দ্ধক্য, দেহান্তর প্রাপ্তি, অর্থাৎ মৃত্যু—মৃত্যুর পর পুনর্জ্জন্মও তদ্রূপ। ভারত ব্যতীত অন্যান্য অনেক দেশে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী লোকের মধ্যে পুনর্জ্জন্মে পরিপূর্ণ বিশ্বাস আছে। জন্মান্তরীণ পুণ্যবলে পুণ্যরূপ কর্ম্মের এবং পুর্বজন্মকৃত পাপানুসারে পাপ কর্ম্মের উৎপত্তি হইয়া থাকে। পুণ্যকর্ম্মের ফলে জীব স্বর্গভোগের পর পুণ্যস্থলে জন্মগ্রহণ করে এবং পাপকর্ম্মের ফলে জীব নরকভোগের পর কুৎসিতস্থলে জন্ম পরিগ্রহ করে। অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশবর্ত্তী মূঢ়গণ জন্ম-জন্ম তির্য্যক কিংবা আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়। কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের দ্বারস্বরূপ। সর্ব্ব-প্রযত্নে এই তিনটিকে সংযত করিতে না পারিলে, পুনঃ পুনঃ নরকভোগ করিতে হয়। প্রকৃতিজাত সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনের ইতরবিশেষে জীব পুণ্য ও পাপশীল হয়। সত্ত্বগুণের প্রভাবে লোকে পুণ্যশীল এবং 'সুখশান্তি ভোগ করে। রজোগুণের প্রভাবে লোকে লোভ ও প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া সৎ ও অসৎ উভয়বিধ কর্ম্মে আসক্ত হয়। তমোগুণের প্রভাবে লোকে প্রমাদ ও মোহে নিবদ্ধ হয়। রজ ও তমকে পরাভূত করিয়া সত্ত্বগুণের উদয় হয়, সত্ত্ব এবং তমোকে পরাভূত করিয়া রজোগুণের প্রাবল্য ঘটে এবং সত্ত্ব ও রজকে পরাভূত করিয়া তমোগুণের উদ্ভব হয়। সত্ত্ব জীবকে সুখে, রজ জীবকে কর্ম্মে এবং তম জীবকে মোহে নিবদ্ধ করে। এই গুণত্রয়ের ইতর-বিশেষে জীব সদসৎ কর্ম্মে নিযুক্ত হয়। স্থূলতঃ, বৈধ কর্ম্মের দ্বারা পুণ্য সঞ্চয় হয়। জীব সেই পুণ্যবলে উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া পিতৃ কিংবা দেবলোকে তাঁহাদিগের সহিত সুখভোগ করে। সাধারণতঃ জীব মিশ্র কর্ম্ম করে। সুতরাং পুণ্য কর্ম্মের যথোপযুক্ত ফলভোগের অবসানে, সে মর্ত্ত্যলোকে উত্তম গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া পুনরায় পুণ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। পক্ষান্তরে, অবৈধ এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মকারীদিগের পাপ সঞ্চয় হয়। সেই পাপের পরিমাণানুযায়ী জীব নরক ভোগ করে। তৎপরে সে ইহলোকে অধম গৃহে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পুনরায় পাপ-কর্ম্মে নিরত হয়। কিন্তু জীব যদি পাপের প্রলোভন ত্যাগ করিয়া পুণ্যকর্ম্ম করিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে তাহার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ লাভ ঘটে; এবং মোহ কিংবা প্রমাদ বশতঃ যদি যোগভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলেও তৎকৃত পুণ্য-কর্ম্মফলের কোন হানি ঘটে না। গীতায় আছে, 'কল্যাণকৃৎ' কখনও দুর্গতি প্রাপ্ত হয় না।

"যোগভ্রষ্ট ব্যক্তিগণ অর্জ্জিত পুণ্যফলে স্বর্গভোগ করিয়া পরে শুচি ও শ্রীমান, অর্থাৎ পূতচরিত্র লোকের গৃহে, অথবা যোগী ও জ্ঞানী ব্যক্তির গৃহে, দুর্লভ জন্ম লাভ করে। তথায় পূর্ব্বদেহজাত ব্রহ্মবিষয়ক বুদ্ধিসংযোগ অনুশীলন করিয়া মোক্ষ বিষয়ে অধিকতর যত্নশীল হয়। অর্থাৎ সেই পূর্ব্বদেহ-জাত অভ্যাসই তাহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ করে। কোন অন্তরায় ঘটিলেও তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সুকৃতির হানি ঘটে না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তদপেক্ষা অধিকদূর অগ্রসর

হয়।” পক্ষান্তরে পাপকর্ম্মশীল লোকের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি না হইলে, তাহার অধোগতি ঘটে।

প্রবৃত্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ অহঙ্কার, বল, দর্প, এবং ক্রোধ অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মদেহে ও পরদেহে অবস্থিত পরমাত্মাকে অগ্রাহ্য করিয়া সৎপথবর্ত্তী সাধুদিগের হিংসা করে। সেই সকল ক্রুর নরাধম ব্যক্তিগণকে পুনঃ পুনঃ তির্য্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। ঈশ্বর কাহাকেও পাপ দেন না কিংবা কাহারও পাপ গ্রহণ করেন না। কেহ তাঁহার দ্বেষ্যও নহে, কেহ তাঁহার প্রিয়ও নহে। তিনি নিরপেক্ষ। তাঁহার নিকট সকলেই সমান। জীব স্ব স্ব কর্ম্মফলে, উত্তম অথবা অধম গতি প্রাপ্ত হয়। তিনি আমাদিগকে বুদ্ধি ও বিবেক দিয়াছেন, যাহা দ্বারা আমরা সহজেই কর্ম্ম নিরূপণ করিতে পারি। কর্ম্ম-নিরূপণ হেতু, শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধই আমাদের প্রধান অবলম্বন। কর্ম্মরহস্য দুর্জ্ঞেয়। কোন্‌টি কর্ম্ম এবং কোন্‌টি অকর্ম্ম—এ বিষয়ে বিবেকিগণও বিভ্রান্ত হন। গীতায় কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম,—এই তিনের উল্লেখ আছে,—

> কর্ম্মণোহ্‌পি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
> অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ॥
> (গীতাঃ ৪।১৭)

কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্ম—এ তিনেরই তত্ত্ব জ্ঞাতব্য। কর্ম্ম বলিলে আমারা বিহিত কর্ম্ম বুঝি। বিহিত কর্ম্ম দ্বিবিধ—সকাম ও নিষ্কাম। নিষিদ্ধ কর্ম্মই বিকর্ম্ম এবং অকর্ম্ম অর্থ কর্ম্মত্যাগ। যাঁহারা মোক্ষের আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মত্যাগ করিয়া যোগাভ্যাসে নিরত হন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মত্যাগ করিতে উপদেশ দেন নাই; কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে দৃঢ় নির্দ্দেশ দিয়াছেন। ইহাকেই নৈষ্কর্ম্ম্য আখ্যা দিয়াছেন। সংসারে মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর সংখ্যা অতি অল্প। মুখ্যতঃ, জীবমাত্রই প্রবৃত্তিমার্গে অবস্থিত। সুতরাং, সকাম কর্ম্মই আমাদের উপজীব্য। গৃহীমাত্রই সকাম কর্ম্মে লিপ্ত। সকাম কর্ম্ম দ্বিবিধ, স্বাভাবিক ও শাস্ত্রীয়। স্নানাহার, শ্বাসপ্রশ্বাসাদি স্বাভাবিক কর্ম্ম। সন্ধ্যাহ্নিক, পূজা প্রভৃতি শাস্ত্রীয় কর্ম্ম। বিহিত ও নিষিদ্ধ হিসাবে, এই কর্ম্মদ্বয় শ্রৌত ও স্মার্ত্তরূপে বিভক্ত। সুতরাং কর্ম্মের বিভাগ হইল অষ্ট প্রকার। বেদোক্ত কর্ম্ম শ্রৌত; এবং স্মৃতি-বিহিত কর্ম্ম স্মার্ত্ত। ইতিহাস, পুরাণ এবং মন্বাদি প্রণীত সংহিতাদি স্মৃতি নামে পরিচিত। এগুলি বেদ-বিরুদ্ধ নহে। শাস্ত্রবিহিত শ্রৌত ও স্মার্ত্ত কর্ম্ম; উভয়ই পুনরায় চতুর্ব্বিধ—নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য ও প্রায়শ্চিত্ত। সন্ধ্যাবন্দনাদি, অগ্নিহোত্র যজ্ঞ প্রভৃতি নিত্য শ্রৌতকর্ম্ম। ব্রহ্মযজ্ঞ, দৈবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ—এই পঞ্চ যজ্ঞ স্মার্ত্ত নিত্যকর্ম্ম। শাস্ত্রের আদেশে বেদপাঠ ব্রহ্মযজ্ঞ। হোম প্রভৃতি দৈবযজ্ঞ। শ্রাদ্ধ তর্পণাদি পিতৃযজ্ঞ। অতিথি সেবা নৃযজ্ঞ। জীবোদ্দেশে অন্নদান ভূতযজ্ঞ। এই পঞ্চ যজ্ঞ দ্বারা গৃহস্থ পঞ্চ পাপ হইতে মুক্তিলাভ করে। গৃহীমাত্রই পঞ্চ পাপে পাপী। আকাশে, বাতাসে ও মৃত্তিকায় সর্ব্বদা লোকচক্ষুর অগোচরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণী বিরাজ করে। গৃহস্থ, অজ্ঞাতসারে চুল্লী, জাঁতা, উদূখল, জলকুম্ভাধার এবং সম্মার্জ্জনী—এই পঞ্চ নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু ব্যবহারে হিংসাপাপে লিপ্ত হয়। কারণ, এই সকল ব্যবহারে প্রাণীবধ অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য। এই নিমিত্ত গৃহস্থের এই পঞ্চযজ্ঞ অবশ্য পালনীয়। ব্রহ্মচারী, বিপত্নীক ও বানপ্রস্থাবলম্বী প্রথম তিনটি পালন করেন; এবং বিবিদিষা, অর্থাৎ জ্ঞান-সাধনহেতু, সন্ন্যাসী ব্রহ্মযজ্ঞ পালন করেন। পুত্রেষ্টি-যাগাদি শ্রৌত নৈমিত্তিক কর্ম্ম; অগ্নিহোত্র দশপূর্ণ শ্রৌত কাম্য কর্ম্ম। যজ্ঞাদিতে শ্রৌত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম বিহিত আছে। শিব, বিষ্ণু, সূর্য্য, শক্তি ও গণেশ,—এই পঞ্চ দেবতার উপাসনা স্মার্ত্ত নিত্য-

কর্ম্ম। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরমব্রহ্মের আরাধনা পঞ্চ দেবতার উপাসনা। ইহার মধ্যে একটি ভাব ইষ্ট; অপর চারিটি তাহার সহযোগী। গ্রহণেতে স্নান স্মার্ত্ত নৈমিত্তিক কর্ম্ম। ব্রত, দান প্রভৃতি স্মার্ত্ত কাম্য কর্ম্ম। চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি স্মার্ত্ত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্ম। এই সকল শাস্ত্রীয় বিহিত কর্ম্ম। ব্রহ্মহত্যা, চৌর্য্য প্রভৃতি নিষিদ্ধ কর্ম্ম। শাস্ত্রে ইহাদের বিস্তারিত বিবরণ আছে। শাস্ত্রসম্মত, অর্থাৎ নিয়ম ও নীতি সঞ্জাত, আহার, বিহার, নিদ্রা প্রভৃতি স্বাভাবিক বিহিত কর্ম্ম। যোগাভ্যাস কৌশলাদি ইহার অন্তর্গত। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি স্বাভাবিক নিষিদ্ধ কর্ম্ম। অতি ভোজন, অতি জাগরণ, অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবন প্রভৃতিও ইহার অন্তর্গত। স্বাভাবিক কর্ম্ম, শ্রোত ও স্মার্ত্ত উভয়বিধ। বর্ণাশ্রম ভেদে বিহিত কর্ম্মের প্রকার-ভেদ হইয়া থাকে।

কর্ম্মপ্রকরণ আমরা বর্ণন করিলাম। প্রকার-ভেদে এই কর্ম্মের প্রযোক্তা কে? জীবদেহস্থিত পরা প্রকৃতি। দেহ রথ,—দেহী রথী। পার্থসারথি যেমন স্বয়ং লিপ্ত না হইয়া, পার্থের দ্বারা যুদ্ধ করাইয়াছিলেন, আমাদের দেহের রথী আত্মাও তদ্রূপ প্রকৃতির সাহায্যে কর্ম্ম করেন।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনোবুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা॥
(গীতা ৭।৪)

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার—প্রকৃতি এই অষ্টরূপে বিভক্তা। মন, প্রাণ, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সকল আত্মার চৈতন্যধর্ম্মে সক্রিয় হয়। বুদ্ধি হইতে অহঙ্কার; এই অহঙ্কারই কর্ম্মের কর্ত্তা। মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়াদি কারণস্বরূপ। কিন্তু কর্ম্মকালে তাহারাই কর্ত্তার রূপ ধরে। আত্মা অবশ্য সর্ব্বদা নিষ্ক্রিয়। দেহাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় প্রধান। ইন্দ্রিয় হইতে মন শ্রেষ্ঠ। মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। কামাদি বিকার-বুদ্ধি প্রসূত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়সংযোগে তাহাদের উৎপত্তি। যতদিন বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও সত্ত্বাদি গুণগণের অনাদি পরিণাম বর্ত্তমান থাকে, ততদিন "আমি" ও "আমার" এই অভিমান যায় না। ফলতঃ, অহঙ্কার বশেই জীব সর্ব্ব কর্ম্ম করে; এবং কর্ম্মের নিগড়ে বদ্ধ হয়। কিরূপভাবে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মবন্ধন ঘটে না, তাহা স্বতন্ত্র প্রসঙ্গ।

গান

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

অসীমের গান মাতায় এ প্রাণ
আকুল করে গো চিত্ত,
সুরে সুরে তার মরম বীণার
পরতে জাগায় নৃত্য।

কি আবেশে মরি আঁখিধারা ঝরি'
আবেগে অপার অন্তর ভরি'
কোন্ সে অরূপে সব নামরূপে
হারাইয়ে হৃদি তৃপ্ত!

কে মিলিবে তবে নিতি উৎসবে
ধরণীর এই যত কলরবে
সে আমি তো নাই তাহারে যে পাই
'আমি'র শ্মশানে নিত্য।

শ্রীযামুনাচার্য

স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ

দক্ষিণভারতে 'শ্রী'-বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রাণস্বরূপ যে কয়জন ঐশ্বরিক পুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন তাঁদের বলা হয় 'আলোয়ার'। তাঁরা সংখ্যায় ছিলেন দ্বাদশজন। এঁদের পর বৈষ্ণবধর্মের রক্ষা ও প্রচারের জন্য আরও এক দল মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, যাঁদের বলা হয় 'আচার্য'। আচার্যদের সংখ্যা নিরূপিত হয়নি। আলোয়ারদের সর্বপ্রধান আলোয়ারের নাম নম্মালোয়ার এবং আচার্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্যরূপে এসেছিলেন শ্রীরামানুজ। শ্রীরামানুজ জন্মগ্রহণ করেছিলেন খৃষ্টীয় ১০১৭ সালে। দাক্ষিণাত্যে শ্রীবৈষ্ণবাচার্যগণের মধ্যে শ্রীরামানুজ ছিলেন চতুর্থ। এই প্রবন্ধের আলোচ্য শ্রীযামুনাচার্য শ্রীরামানুজেরই অব্যবহিত পূর্বে তৃতীয় আচার্যরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। প্রথম বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনাথমুনি ছিলেন যামুনাচার্যের পিতামহ। উত্তর ভারতে তীর্থপর্যটনকালে পূতসলিলা যমুনাতীরে ইনি মাতৃগর্ভে আসেন বলে এঁর নাম রাখা হয় যামুন। দক্ষিণ আর্কট জেলার বীরনারায়ণপুরে শ্রীঈশ্বরভট্টের পুত্ররূপে তিনি জন্মগ্রহণ করেন ৯১৬ খৃষ্টাব্দে। আচার্যকুলতিলক নাথমুনির বংশে আবির্ভূত হয়ে যামুন সে পবিত্র বংশের খ্যাতি ও মর্যাদা বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না করে তাঁর অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবন-প্রভাবে বরং উহা বৃদ্ধিই করেছিলেন। অষ্টম বর্ষে পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে উপবীত গ্রহণের পর তিনি পণ্ডিতাগ্রগণ্য শ্রীমহাভাষ্য ভট্টের নিকট বেদাধ্যয়নে রত হন। এর দুবছর পরেই তাঁর পিতা অল্পবয়সেই মানবলীলা সম্বরণ করলে পিতামহ নাথমুনিও সংসার-বিমুখ হয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। পিতা ও পিতামহের একমাত্র স্নেহের দুলাল শ্রীযামুন সামনে অকূল সমুদ্র দেখলেও অমিত তেজ ও অনন্যসাধারণ ধীশক্তি প্রভাবে অল্প কালমধ্যেই ধনাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীকে স্ববশে আনয়নে সমর্থ হয়েছিলেন। মাত্র বার বছর বয়সে কি ভাবে তিনি চোল রাজ্যের অর্ধাংশের অধীশ্বর হন সে বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হবে। অসাধারণ মেধা ও অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য অল্প বয়সেই তিনি প্রভূত খ্যাতি লাভ করলেও তাঁর আচার্য-পদবীতে আরূঢ় হওয়া এবং সকলের হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্জন করার প্রধান কারণ ভগবান বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর নিরন্তর যোগ। কথিত আছে, তাঁর হৃদয়ে শ্রীবিষ্ণু সর্বদা অধিষ্ঠিত থাকতেন, কাজেই উহা বিষ্ণুর সিংহাসনস্বরূপ ছিল এবং বৈষ্ণবগণ যামুনাচার্যকে সিংহাসনাংশ বলে পূজা করতেন।

যামুনাচার্যের শিক্ষক মহাভাষ্যভট্ট সুপণ্ডিত হলেও এবং ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তির কথা সকলে জানলেও তাঁর আর্থিক অবস্থা মোটেই স্বচ্ছল ছিল না। লক্ষ্মী ও সরস্বতী যে কদাচিৎ একত্র বাস করেন ইহা তারই প্রমাণ।

তদানীন্তন চোল রাজার রাজধানী গঙ্গাইকোণ্ডাপুরমে একজন দুর্দান্ত সভাপণ্ডিত ছিলেন, যাঁর নাম ছিল অক্কি আলোয়ান বা বিদ্বজ্জনকোলাহল। বিশেষ রাজানুগ্রহ লাভের ফলে তিনি অন্যান্য পণ্ডিতদের ওপর অযথা যে

কেবল অত্যাচারই করতেন তা নয়, পরন্তু তাঁদের নিকট হতে বার্ষিক সেলামীও আদায় করা হত। অত্যাচারে সকলে প্রতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লেও অক্কি আলোয়ান রাজানুগ্রহপুষ্ট বলে কেউ কিছু বলতেও সাহস করতেন না।

এক দিন মহাভাষ্যভট্টের অনুপস্থিতিতে অক্কি আলোয়ানের লোক সেলামী নিতে এলে বালক যামুন বলে পাঠালেন,—'সেলামী দেওয়া হবে না, তোমার মনিবকে গিয়ে বল'। এর ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করিয়ে দিলেও তেজস্বী যামুন বল্লেন,—'বিচারে তোমাদের পণ্ডিতকে আমরা পরাজিত করতে সক্ষম'। যথাকালে একথা কোলাহলের কানে গেল, তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে প্রগল্‌ভ বালককে সমুচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য এক বিতর্ক-সভার আয়োজন রাজাকে বলে করলেন। রাজ-প্রেরিত পাল্কীতে সুদর্শন ব্রাহ্মণকুমার যামুনকে সদলবলে রাজ-সভায় উপস্থিত দেখে ধর্মপ্রাণা চোলরাণী তাঁকে 'আলাওন্দার' (বিজয়ী-বীর) বলে স্বাগত জানালেন, তখন হতে তাঁকে আলাওন্দার বলেই অনেকে ডাকতেন। বিতর্কসভায় বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত—সকলেই কৌতুহলাক্রান্ত। মনে মনে সকলেই চাইলেন অহঙ্কারী অক্কি আলোয়ানের পরাজয়। রাজা ঘোষণা করলেন, বিজয়ী পণ্ডিত তাঁর অর্দ্ধেক রাজ্যের মালিক হবেন। বিতর্ক আরম্ভ হল। আলোয়ানের সব প্রশ্নের জবাব অনায়াসেই যামুন দিতে লাগ্‌লেন—প্রথম পক্ষের প্রশ্নপর্ব শেষ হলে যামুন অদ্ভুত তিনটি প্রশ্নেই অহঙ্কারী আলোয়ানকে চুপ করিয়ে দিলেন। নিম্নলিখিত তিনটি প্রশ্ন যামুন সভাপণ্ডিত কোলাহলকে করেছিলেন। যামুন তাঁকে বল্লেন, "আপনি খণ্ডন করুন (১) আপনার মাতা বন্ধ্যা নন, (২) মহারাজ ধর্মশীল ও (৩) মহারাণী সাবিত্রীর ন্যায় সাধ্বী।" এই অত্যদ্ভুত প্রশ্নত্রয় শুনে কোলাহল হয়ে গেলেন একেবারে হতবাক। নিজের গর্ভধারিণী মাতাকে কি করে তিনি বন্ধ্যা বলবেন! যে রাজা এতদিন তাঁকে পালন করেছেন, তাঁর সব রকম আবদার ও অত্যাচার সমর্থন করেছেন তাঁকেই বা কি করে তিনি অধর্মাচারী বল্‌বেন, আর সতীকুলশিরোমণি রাণীকেই বা কি করে তিনি বল্‌বেন যে তিনি সতী নন—বল্লেও তার বিষময় ফল ভেবে তিনি শিউরে উঠ্‌লেন! লজ্জায়, গ্লানিতে, ক্ষোভে তিনি অধোবদন হয়ে রইলেন। রাজা তখন বালক যামুনকে তার নিজের প্রশ্ন খণ্ডন করতে বলায় যামুন সভাপণ্ডিতকে বল্লেন,—

(১) আপনার মাতা বন্ধ্যা, কারণ তিনি একপুত্র-প্রসবিনী। এ প্রমাণ শাস্ত্রবাক্য—"অপুত্র একপুত্র ইতি শিষ্ট প্রবাদাৎ" অর্থাৎ যাঁর একপুত্র তাঁকে বন্ধ্যাই বলা হয়।

(২) মহারাজ অধর্মাচারী, কারণ রাজাকে প্রজার পাপ ও পুণ্যের ভাগ [illegible] করতে হয়। কলিতে ধর্ম একপাদ এবং অধর্ম তিন-পাদ, কাজেই রাজার অধর্মের অঙ্ক ক্রমশঃই বাড়ছে, সুতরাং তিনি অধর্মাচারী।

(৩) রাণী সতী নন, কারণ শাস্ত্রানুসারে বিবাহের পূর্বে কন্যাকে প্রথমে অগ্নি, বরুণ ও ইন্দ্রকে উৎসর্গ করার বিধি আছে। তা ছাড়া,

'সোঽগ্নির্ভবতি বায়ুশ্চ সোঽর্কঃ সোমঃ স ধর্মরাট্।
স কুবেরঃ স বরুণঃ স মহেন্দ্রঃ প্রভাবতঃ॥

(মনু ৭।৭)

অর্থাৎ রাজা প্রভাবতঃ সাক্ষাৎ অগ্নি, বায়ু, সূর্য, চন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ ও ইন্দ্র। কাজেই রাজার পাণিগৃহীতা পত্নীকে উপরোক্ত অষ্টলোক-পালেরও পত্নী বলা হয়। সুতরাং তাঁকে সতী বলব কি করে?

বালকের অদ্ভুত পাণ্ডিত্য, অমিত তেজ ও অপূর্ব মেধা দর্শনে সকলেই পুলকিত। কোলাহলের

অবস্থা তখন সহজেই অনুমেয়। পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁর মুখ হয়ে উঠ্‌ল আরক্তিম—সভাশুদ্ধ সকলে বাহবা দিয়ে জয়মাল্য যামুনের গলাতেই পরিয়ে দিলেন। রাজাও প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অর্ধেক রাজত্ব দিলেন যামুনকে। মাত্র বার বৎসর বয়সে যামুন রাজা হলেন এবং বীরদর্পে রাজ্যপালন ও প্রজাবর্গের অশেষ কল্যাণসাধনে আত্মনিয়োগ করলেন। ছড়িয়ে পড়ল তাঁর সুনাম চারিদিকে। গুণগানে সকলে হয়ে উঠল বিভোর।

কিন্তু রাজ্য পেয়ে যামুন তাঁর আদর্শ ভুলে গেলেন—বিবাহ হল, চারটি সন্তানও জন্ম নিল, এভাবে ভোগে তিনি ধীরে ধীরে ডুবে যেতে লাগলেন। তাঁর ঋষিকল্প পিতামহ আচার্য নাথমুনির কথা পর্যন্তও তিনি ভুললেন। কিন্তু বিধাতার অশেষ কৃপায় তাঁর এ মোহ অচিরেই ঘুচে গেল, তাঁর পিতামহের প্রধান শিষ্য পুণ্ডরীকাক্ষের প্রচেষ্টায়। তিনি বুঝেছিলেন ভোগসুখের জন্য যামুনের জন্ম হয়নি। অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি সহায়ে তিনি তাঁর ভেতরের সুপ্ত উচ্চ আধ্যাত্মিকতার সন্ধান পেয়েছিলেন এবং তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রামমিশ্রকে পাঠালেন তাঁকে ভোগের পথ হতে ফিরিয়ে আনতে। রাজা যামুনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাও ছিল এক কঠিন সমস্যা; কিন্তু কুশলী রামমিশ্র অশেষ ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তা সহকারে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং এক অদ্ভুত উপায়ে উভয়ের সাক্ষাৎ হল। রামমিশ্র বল্লেন,—"তোমার পিতামহের অনেক গুপ্তধন আমার কাছে গচ্ছিত আছে এবং উহা তোমারই।" যামুনেরও তখন টাকার অত্যন্ত প্রয়োজন। রামমিশ্রকে সেই প্রয়োজন সময়ে সুসংবাদ নিয়ে উপস্থিত হতে দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন এবং অবিলম্বে সেই গুপ্তধন প্রাপ্তির আশায় রামমিশ্রের অনুসরণ করতে লাগলেন। পথে যেতে যেতে সুকণ্ঠ রামমিশ্র গীতা থেকে ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক শ্লোকগুলি আপন মনে আবৃত্তি করতে লাগলেন—বিমুগ্ধ বিস্ময়ে যামুন যতই সেগুলি শুনতে লাগলেন ততই কমে আসতে লাগল তাঁর আসক্তি ও ভোগলিপ্সা। আত্মবিশ্লেষণ সুরু হল, চমকে উঠলেন তিনি এই ভেবে যে কি ছিলেন আর কি হয়েছেন! গুপ্তধনের প্রতি তাঁর স্পৃহা অন্তর্হিত হল, কিন্তু রামমিশ্রও ছাড়বার পাত্র নন। তাঁকে ত দায়মুক্ত হতে হবে, এই বলে তাঁকে নিয়ে এগিয়ে চললেন। অবশেষে তাঁরা পুণ্যতোয়া কাবেরীতটে এসে উপস্থিত হলেন। স্নানান্তে কাবেরী ও কোল্লেরুন নামক নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী সপ্তপ্রাকার বিশিষ্ট শ্রীরঙ্গনাথজীর বিশাল মন্দির প্রান্তে উপনীত হয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম পূর্বক ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলেন। আগে আগে চলেছেন রামমিশ্র, আর পেছনে যুক্ত-করে প্রেমমদিরোন্মত্ত অশ্রুপূর্ণলোচন ভক্তিগদ্‌গদচিত্ত যামুন তাঁর অনুসরণ করছেন; সে এক অপূর্ব দৃশ্য! রামমিশ্র পূর্বেই যামুনকে বলেছিলেন যে 'দুটি নদীর মধ্যস্থিত সাতটি প্রাকারের অভ্যন্তরে উক্ত অর্থ স্থাপিত আছে এবং এক মহানাগ স্বীয় ফণারূপ ছত্রদ্বারা সর্বদাই উহা রক্ষা করছে'। এক, দুই করে ছয়টি তোরণ অতিক্রান্ত হল। সপ্তম তোরণের পুরোভাগে এসেই রামমিশ্র অঙ্গুলি-নির্দেশে শ্রীশ্রীরঙ্গনাথজীকে দেখিয়ে আলোয়ান্দারকে বললেন, 'হে নির্মলাত্মন! আপনার পিতামহ-প্রদত্ত গুপ্তধন ঐ সামনে শেষ শয্যায় শয়ান আছেন, উহা গ্রহণ করুন। পিতামহ আপনার জন্য শ্রেষ্ঠ সম্পদই রেখে গেছেন! যাঁর পদসম্বাহন করছেন ধনাধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী, আদিকর্তা জগৎকারণ ব্রহ্মা যাঁর নাভিকমলে সমাসীন, সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁর মধ্যে নিহিত রয়েছে, যিনি পরম আনন্দ ও চরম শান্তির মূল উৎস, সেই শ্রেষ্ঠ রত্নেরই অধিকারী ছিলেন আপনার স্বর্গত স্মরণীয় পিতামহ।

আপনি তাঁরই বংশকুলতিলক, কাজেই এ ধনে আপনারই অধিকার; যান—গ্রহণ করে আমায় ঋণমুক্ত করুন। আপনার সাম্‌নেই সেই পরম ধন—যার জন্য রাজ্য ছেড়ে আপনি এতদূর এসেছেন।" রামমিশ্রের কথা শুন্‌তে শুন্‌তে যামুন ভাবে বিভোর হয়ে গিয়েছিলেন—ধীরে ধীরে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে আসছিল তাঁর এবং 'যান গ্রহণ করুন' বাণী কর্ণে প্রবিষ্ট হওয়ামাত্র তিনি উন্মত্তের ন্যায় মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক শ্রীরঙ্গনাথের শ্রীঅঙ্গে স্বীয় অঙ্গ এলিয়ে দিয়ে সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়লেন। দুচোখ দিয়ে অবিরলধারে অশ্রু নির্গত হতে লাগল—পিতামহপ্রদত্ত মহাধনকে তিনি মন-প্রাণ দিয়ে সর্বতোভাবেই গ্রহণ করলেন। ধীরে ধীরে তাঁর চেতনা ফিরে এল—তখন তিনি এক নূতন মানুষ—যেন পুনর্জন্ম হয়েছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অধিপতির সঙ্গে পরিচয় ও একাত্মতা লাভ করে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র জাগতিক রাজ্যে আর ফিরলেন না। সাধারণত লোকে রাজ্য হতে নির্বাসিত হয়, কিন্তু আলোয়ান্দার তাঁর মন থেকে রাজ্যকেই চিরতরে নির্বাসিত করে স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীরঙ্গনাথের সেবায় বাকী জীবন উৎসর্গ করলেন। শিষ্যের আকুতি রামমিশ্রকে মুগ্ধ করল, তিনি তাকে অষ্টাক্ষরী মহামন্ত্র "ওঁ নমো নারায়ণায়" প্রদান করলেন। জপ, ধ্যান ও সেবায় নিজেকে হারিয়ে ফেল্লেন যামুন। ক্ষুদ্র আমিত্বের বিসর্জন হলেই বৃহৎ আমিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়—এ ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না। দেবতার কৃপায় অজ্ঞান অন্ধকার সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়ে জ্ঞানের উজ্জ্বল আলোকে তাঁর হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। ফুল ফুটলে ভ্রমরের আগমনের ন্যায়, যামুনের হৃদয়-পদ্ম প্রস্ফুটিত হওয়ায় বহু ভক্ত-মধুকর ভক্তিমধু পানের আশায় তাঁর চারপাশে এসে সমবেত হলেন। রাজা যামুন পরিণত হলেন আচার্য যামুনরূপে। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর তিনি শাস্ত্রের পঠন-পাঠন, দেব-সেবায় ও গ্রন্থ-রচনায় মনোনিবেশ করলেন। তাঁর প্রথম ও সর্বপ্রধান রচনা সিদ্ধিত্রয় নামে খ্যাত। এতে আত্মসিদ্ধি, ঈশ্বরসিদ্ধি ও সম্বিৎসিদ্ধি নামে তিনটি অধ্যায় আছে।

এ ছাড়াও 'আগমপ্রামাণ্য', 'গীতার্থ-সংগ্রহ' 'মহাপুরুষ নির্ণয়,' 'স্তোত্ররত্ন' প্রভৃতি আরও অনেকগুলি পাণ্ডিত্য- ও ভক্তিরসপূর্ণ গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। শেষোক্ত পুস্তকে লেখকের হৃদয়ের প্রগাঢ় ভক্তির উচ্ছ্বাস অতি সরল ও সহজ ভাষায় অভিব্যক্ত হয়েছে যা পাঠ করলে সাধারণের মনেও সহজে ভক্তিভাব জাগরূক হয়। আচার্য যামুন ছিলেন একাধারে তীক্ষ বিচার-বুদ্ধি-সম্পন্ন পণ্ডিত, কবি, ভক্ত ও দার্শনিক। এক আধারে এত দুর্লভ গুণের অপূর্ব সমাবেশ ক্বচিৎ দৃষ্ট হয়।

শেষ জীবনে যামুনাচার্য যশের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেছিলেন। বৃদ্ধবয়সে তিনি শ্রীপদ্মনাভজীর দর্শন আশায় পশ্চিম উপকূলে ত্রিবান্দ্রমে গমন করেন এবং ফিরবার পথে টিনেভেলী, মাদুরা প্রভৃতি স্থানে বিখ্যাত বিষ্ণুমন্দির দর্শনে পরম প্রীত হন। জীবন-সায়াহ্নে তিনি কাঞ্চীপুরমে আসেন এবং তথায় নিজ অচ্ছুৎ শিষ্য কাঞ্চিপূর্ণের মারফৎ তাঁর উত্তরাধিকারী শ্রীরামানুজের সাথে মিলিত হন। জহুরী জহর চেনে—বালক রামানুজকে দেখেই আচার্য বুঝতে পেরেছিলেন যে তার মধ্যে অসীম শক্তি ও অমিত তেজ লুক্কায়িত। যদিও যাদবপ্রকাশ নামক অদ্বৈতবাদী গুরুর নিকট রামানুজ তখন শাস্ত্রাধ্যয়ন করছিলেন, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন যামুনাচার্য বুঝেছিলেন যে এই বালকই কালে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রধান সমর্থক ও প্রচারক হবে। তাই তিনি শরীর পরিত্যাগের পূর্বে শিষ্যদের কাছে তাঁর শেষ আশা ব্যক্ত করেছিলেন যাতে শ্রীরামানুজকে অচিরেই শ্রীরঙ্গমে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। সুদীর্ঘ জীবন যাপনান্তে খৃষ্টীয় ১০৪০

সালে এই মহাপুরুষ প্রায় ১২৪ বছর বয়সে শুষ্ক তৃণখণ্ডের ন্যায় শরীর পরিত্যাগ করেন। তাঁর বহু শিষ্য-গোষ্ঠীর মধ্যে মহাপূর্ণ, গোষ্ঠীপূর্ণ, শৈলপূর্ণ ও মালাধর অশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন।

মহাপুরুষেরা জগতে আসেন সকলকে শান্তির ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে। তাঁদের অলৌকিক আধ্যাত্মিক জীবনই তাঁদের শিক্ষা। শত শত জিজ্ঞাসু ও তাপিত প্রাণ এঁদের পূত সংস্পর্শে এসে অপার্থিব সুখের সন্ধান পেয়ে থাকেন; তাঁদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয়। এ সব মহাপুরুষ স্থূল শরীর পরিত্যাগ করলেও এঁদের পবিত্র আদর্শ ও মধুর স্মৃতি যুগ যুগ ধরে মানুষকে অনুপ্রেরণা দেয়—ধন্য এঁদের জীবন, সার্থক এঁদের আগমন!

আলো, গান ও প্রাণ

"বৈভব"

অরুণ আলোতে কাঁপিয়া কাঁপিয়া
তোমারি বারতা ভাসে
তোমারি হাতের অমৃত পরশ
সুদূর বাহিয়া আসে!
আমি দেখি শুধু অন্ধের চোখে
মত্ত রয়েছি কী জানি কী ঝোঁকে
বুঝেও বুঝিনা দেখেও দেখিনা
কী বা আসে যায় পাশে!

আমি জানিতাম তব আসা যাওয়া
তোমাকে আমার মাঝখানে পাওয়া
বুঝি ফুরায়েছে সব সুখ টুকু
গিয়াছে হইয়া শেষ
ভেবেছিনু আমি হে জীবন-স্বামি,
তোমার সুরের রেশ
জীবনবীণায় আর বাজিবেনা
গিয়াছে হইয়া শেষ!

আজ একি, একি! সহসা যে দেখি—
অরুণ আলোর বান
তোমারি শুভ্র পুণ্য পরশ
ধ্বনিয়া তুলিল গান!
জাগো ওগো মন, জাগো জাগো আজ
ঠেলে ফেলে দাও যত কিছু কাজ
বহুদিন পরে হৃদয়ের মাঝ
পেয়েছি হারানো প্রাণ,—
সাগ্রহে তুলি লও তারে লও
চির-প্রিয়তম-দান!

ধর্ম ও মর্ম

শ্রীউপেন্দ্র নাথ সেন শাস্ত্রী

ধর্মের কথা বলা বড় কঠিন। ধর্মের কথা বলিতে গিয়া স্বয়ং মহর্ষি কণাদকে আমাদের দেশে বিদ্রূপের কশাঘাত সহ্য করিতে হইয়াছে। "অথাতো ধর্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ"—'ধর্ম ব্যাখ্যা করিব' —এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এবং "যতোঽভ্যুদয় নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্মঃ"—যাহা হইতে 'অভ্যুদয় (সাংসারিক উন্নতি) এবং নিঃশ্রেয়স (সংসার-মুক্তি) সিদ্ধ হয় তাহাই ধর্ম'—ধর্মের এই লক্ষণ বলিয়া কণাদ তৎপরে ছয় প্রকার পদার্থের বিশদ বর্ণনা ও ব্যাখ্যান করিয়াছেন। এই অপরাধে কণাদকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—

ধর্মং ব্যাখ্যাতুকামস্য ষট্‌পদার্থোপবর্ণনম্।
সাগরং গন্তুকামস্য হিমবদ্‌গমনোপমম্॥

অর্থাৎ, ধর্মব্যাখ্যা করিব বলিয়া ষট্‌পদার্থ বর্ণনা করা ও সাগরে যাইতে ইচ্ছুক হইয়া হিমালয়ে গমন করা একই প্রকার। বলা বাহুল্য, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে উপাদানে গঠিত, এবং যে ধর্মের অনুসরণ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কার্য চলিতেছে কণাদ তাহাই বলিতে চাহিয়াছিলেন; কেন না, বিশ্বপ্রকৃতির সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিলে তবেই উহার অতীত সত্যকে ধরিতে পারা যায়। প্রথমে অভ্যুদয়, তৎপরে নিঃশ্রেয়স। কিন্তু বৈশেষিক দর্শনের উপর বিস্তর ভাষ্য ও টীকা রচিত হইলেও কণাদের বক্তব্যের যথেষ্ট মর্যাদা আমরা দিতে পারিয়াছি কিনা সন্দেহ। আমরা ধর্মের মর্ম বুঝি নাই। বুঝিলে, সত্যই আমাদের অভ্যুদয় হইত, যুগ যুগান্তর ধরিয়া বৈদেশিক আক্রমণকারীদের নিকট লাঞ্ছিত হইতে হইত না। ধর্মের ফলই অভ্যুদয়, কিন্তু আমরা ধর্ম যেভাবে বুঝিয়াছি ও অনুসরণ করিয়া চলিয়াছি তাহাতে সত্যই আমাদের কোন অভ্যুদয় হইয়াছে কি?

এখন ধর্মশাস্ত্রের ব্যবস্থা অনুসারে আমাদের 'নিষেকাদি শ্মশানান্ত' যাবতীয় কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিতে হয়। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে মনুসংহিতাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। মনু বেদের অনুবর্তন করিয়া গিয়াছেন, এই জন্য তাঁহার মতই প্রমাণ। যদি কেহ মনুর মতের বিপরীত কিছু বলেন তাহা প্রমাণ নহে—শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা অন্তত ইহা বলিয়া থাকেন। এই মনু কে? মনু নামে বহু লোক ছিলেন কি না, যে মনুর বাক্য ঔষধের ন্যায় উপকারী বলিয়া বেদ বলিয়াছেন সেই বৈদিক ঋষি ও সংহিতাকার মনু অভিন্ন কিনা, মনু সংহিতা প্রকৃতপ্রস্তাবে ভৃগুর রচনা কিনা অথবা বর্তমান মনুসংহিতা গুপ্তযুগে রচিত কিনা এই সকল জটিল আলোচনার বর্তমানে প্রয়োজন নাই,—ধর্মশাস্ত্র সমূহের মধ্যে মনুই প্রমাণ; ধর্ম বলিতে তিনি কি বুঝেন তাহাই দেখিতে হইবে। মনুর মতে সচ্চরিত্র নিরপেক্ষ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিরা যাহা বলিয়াছেন তাহাই ধর্ম। কিন্তু—'এঁহো বাহ্য'; ধর্মের শেষ প্রমাণ মানুষের হৃদয়। ধর্ম যুক্তিহীন হইলে তাহার অনুসরণ করা উচিত নহে, এবং বুদ্ধি বা হৃদয় ব্যতীত যুক্তিও সিদ্ধ হয় না। গীতায়ও ভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন—'বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ', অর্থাৎ বুদ্ধির শরণ লও, কেন না "বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি" বুদ্ধি নষ্ট হইলে বিনাশ উপস্থিত হয়।

বাঙলার পণ্ডিতগণ ধর্ম ও সমাজ শাস্ত্রের যে ব্যাখ্যা করিতেন ও যতটুকু যে ভাবে মানিতেন

আমাদের বাঙলার রঘুনন্দন স্বীয় নিবন্ধে তাহারই সংগ্রহ করিয়া গিয়াছেন। বর্তমানে রঘুনন্দনের ন্যায় পণ্ডিত বিরল হইলেও তাঁহার সময়ে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিতের অভাব ছিল না। সুতরাং স্বীয় নিবন্ধে তিনি কোন নূতন ও স্বাধীন মত প্রচার করিলে তাঁহার নিবন্ধ-সমূহ গ্রাহ্য হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। এই সকল নিবন্ধে আমরা দেখিতে পাই, বুদ্ধিবল অপেক্ষা বচনবলই অধিক মর্যাদা পাইয়াছে। গরু একটা প্রাণী, তাহার বদলে নিস্প্রাণ কড়ি দেওয়া কিরূপে সমর্থন করা যায়? পণ্ডিতেরা এই সকল নিয়া দীর্ঘ তর্ক-প্রবাহ চালাইয়াছেন, এবং শেষ পর্যন্ত কোনও পুরাণ বা সংহিতার বচন তুলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন—'বচনবলাৎ সিধ্যতি', অর্থাৎ যখন এইরূপ বচন রহিয়াছে তখন ইহা হইবেই।

মানুষমাত্রেরই ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে, মহাপণ্ডিত হইলেও রঘুনন্দন প্রভৃতি ভ্রম-প্রমাদযুক্ত মানুষই ছিলেন। হয়তো যুগোপযোগী শাস্ত্র তাঁহারাও প্রণয়ন করিতে পারেন নাই, ধর্মের উপরে মর্মের আসন দানে তাঁহারাও কুণ্ঠিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা যুগোপযোগী করিয়া শাস্ত্রালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, এই জন্যই তাঁহারা নমস্য। আমাদের বর্তমান সমাজের ব্যবস্থাপকগণকেও এইরূপ করিতে হইবে। সমাজের প্রবৃত্তি, ক্ষুধা ও পিপাসার মূল্য বুঝিতে হইবে, সমাজ যে সময়ে পিপাসার্ত হইয়া ব্যবস্থাপকগণের নিকট বিশুদ্ধ পানীয়ের জন্য আর্তনাদ করিতে থাকে, তখন তাঁহারা হয় বধিরতা অবলম্বন করেন, নতুবা প্রহারে উদ্যত হ'ন; সুতরাং সমাজকে বাধ্য হইয়াই অবাঞ্ছিত হস্ত হইতে মলিন পানীয় গ্রহণ করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতে হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কেহ সমুদ্রপারে গমন করিলে তাঁহারা কিরূপ হৈ চৈ করিতেন তাহা আমাদের বেশ মনে আছে। কিন্তু তখন সমাজ তাঁহাদের নিকট অনুমতি চাহিত, আজ আর কেহ সে অনুমতি চাহে না এবং পূর্বে ধর্ম গেল বলিয়া যাঁহারা গণ্ডগোল করিতেন এখন তাঁহারা নীরব হইয়াছেন। এখন লোকে যথেচ্ছ সমুদ্র লঙ্ঘন করে, কেহ তাঁহাদের মুখাপেক্ষ হয় না, ইহাতে কি তাঁহাদের গৌরব বাড়িয়াছে? সতীদাহের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন ইতিহাস-বিশ্রুত; কিন্তু আজ যদি আইনের দিক্ হইতে নিষেধ তুলিয়াই লওয়া হয় তাহা হইলেও কোন নিষ্ঠাবান্ পণ্ডিত পিতার শবদাহের সহিত জীবিতা মাতাকে ভস্মসাৎ করিবেন কি? ধর্ম অপেক্ষা মর্ম যে বড়—অন্তত এইরকম অনেক বিষয়ে তাঁহারা এখন বুঝিতে পারিয়াছেন। বর্তমান সমাজে জাতিভেদ, অসবর্ণ-বিবাহ, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি বহু বিষয়ে জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে। সমাজ তৃষ্ণার্ত, নব্যস্মৃতিতে এই তৃষ্ণা নিবারণের পানীয়ের ব্যবস্থা না থাকিলেও প্রাচীন স্মৃতিতে আছে; পণ্ডিতেরা তাহার মর্ম গ্রহণ করিয়া সমাজের পথ নির্দেশ করিবেন কি?

প্রয়োজনীয় সংস্কার-সাধনের প্রতিকূলে আমাদের কতকগুলি ধারণা আছে, সেই সম্বন্ধে দুই একটা কথা বলা আবশ্যক। প্রথমত অনেকে আমাদের ধর্ম সনাতন বলিয়া বিশ্বাস করেন। বলা বাহুল্য ধর্মমাত্রই সনাতন। যীশুখ্রীষ্ট বা মহম্মদ কেহই একথা বলেন নাই যে এই ধর্ম আমি আবিষ্কার বা নির্মাণ করিলাম; প্রত্যেকেই প্রাচীনের দোহাই দিয়াছেন, এবং ধর্মকে সনাতন বলিয়াছেন। অতএব একমাত্র হিন্দুধর্মই সনাতন ধর্ম নহে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ন্যায় যাহা প্রকৃত ধর্ম তাহা সনাতন, ইহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমাদের ব্যবহারিক ধর্ম সনাতন ইহা বলা প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে। যাহা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমানে একই রূপ থাকে, তাহার কখনও কোন পরিবর্তন হয় না, সনাতন শব্দের ইহাই অর্থ।

বিবাহ, জাতিভেদ, খাদ্যাখাদ্য, পুত্রোৎপাদন, ভোজ্যান্নতা প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশে ও সমাজে যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা ছিল শাস্ত্রেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। যুগে যুগে যাহার পরিবর্তন হইয়াছে তাহা কখনও সনাতন নহে। যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে শাস্ত্র-প্রদর্শিত পথে এখনও তাহার পরিবর্তন হইতে পারে। দ্বিতীয় ধারণা, শাস্ত্র ঋষিবাক্য; ঋষিবাক্য অখণ্ডনীয় ও অলঙ্ঘনীয়, এবং ভারত ভূখণ্ডের ও বৈদিক সমাজের বাহিরে কখনও কোন ঋষি আবির্ভূত হ'ন নাই। এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই, স্মৃতিশাস্ত্রে ও তাহার টীকা-টিপ্পনীতে যাঁহাদের মত উদ্ধৃত দেখা যায় তাঁহারা সকলেই যে ঋষি ছিলেন ইহার প্রমাণ নাই। দ্বিতীয়ত যাঁহারা বিভিন্ন দর্শন প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই জানেন যে এক ঋষির বাক্য অন্য ঋষি খণ্ডন করিয়াছেন। ঋষিবাক্য যদি অখণ্ডনীয়ই হইত তাহা হইলে কদাপি তাহা সম্ভব হইত না। ঋষিবাক্য আপ্তবাক্য, এবং আপ্তবাক্য বলিয়াই তাহার প্রামাণ্য। ন্যায়ভাষ্যে মহামুনি বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে অর্থের সাক্ষাৎকারই আপ্তি; যাঁহারা আপ্তিদ্বারা চালিত হ'ন তাঁহারাই আপ্ত, এবং কি আর্যঋষি কি ম্লেচ্ছ সকলেই আপ্ত হইতে পারেন। আচার্য বরাহমিহিরও "ঋষিবৎ যবনাঃ" বলিয়া যবন জ্যোতির্বিদদিগকে আপ্তোচিত শ্রদ্ধা দেখাইয়াছেন। বাগ্ভট স্পষ্টই বলিয়াছেন ঋষিবাক্যেই যদি শ্রদ্ধা থাকে তাহা হইলে চরক ও সুশ্রুত ত্যাগ করিয়া ভেল-জতুকর্ণ-হারীত ইত্যাদির অনুসরণ করিলেই তো চলে; কিন্তু তাহা তো ঠিক নহে, ভাল কথা যেই বলুক তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। বাগভট চরক ও সুশ্রুতকেও ঋষি বলিয়া স্বীকার করেন নাই, অন্তত ঋষিহিসাবে তাঁহাদের অপেক্ষা প্রাচীন ভেল প্রভৃতিকে অধিক মর্যাদা দিয়াছেন। পুত্রাদি কঠিন রোগগ্রস্ত হইলে প্রতীচ্যের ঋষিদের শিষ্যদের শরণ না লইয়া অথর্ববেদোক্ত চিকিৎসায় তুষ্ট হইয়া থাকিবেন এমন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু কেহ আছেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। সাহিত্যের আর্ষ প্রয়োগের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করি, কিন্তু তাহার অনুকরণ করি না। রক্তমাংসের শরীরটা বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে যেমন অথর্ববেদের ঋষিদের শরণ না লইয়া আধুনিক ঋষিদের দ্বারস্থ হইতে হয়, সমাজ ও জাতিকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, অভ্যুদয়-লক্ষণ ধর্মের সাধনা করিতে গেলেও অনেক ক্ষেত্রে সেই সুবুদ্ধির প্রয়োজন। সকল সময়েই মনে রাখিতে হয় "পুরাণমিত্যেব ন সাধু সর্বম্।"

বর্তমানে আমরা যে ধর্মের অনুষ্ঠান করি তাহা সম্পূর্ণরূপে বৈদিক ইহা বলাও ভুল। পঞ্চনদের আর্যসমাজ আমাদের অপেক্ষা অনেক বেশী বেদোক্ত ধর্মের অনুসরণ করে। আমাদের বর্তমান সমাজে লোকাচার ধর্মের অঙ্গীভূত হইয়াছে, এবং তাহা হওয়াও উচিত। মনু বেদের অনুসরণ করিয়াছেন; মনুর সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ স্মৃতি মান্য নহে, ইহাও সত্য নহে। অনেক স্মৃতিতেই বহু বিষয়ে মনুর সহিত অসঙ্গতি আছে—কেন না যুগোপযোগী করিয়া সংস্কার করিবার কালে এই সকল স্মৃতিনিবন্ধ প্রণেতারা বহু নূতন বিষয়ের সন্নিবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মনুসংহিতার মধ্যেও পরস্পর বিরুদ্ধ মতের অভাব নাই। ইহা হইতে এই কথাই বুঝিতে পারা যায় যে, সময়ে সময়ে প্রচলিত বহু বিধানকে স্মৃতির মর্যাদাদানের জন্য মনুসংহিতার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে। স্বয়ং কুল্লূকভট্টকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে যে মনুসংহিতায় যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায় বেদে তাহার সকল বিষয়েই অনুরূপ সমর্থক বাক্য নাই। কুল্লূক বলিয়াছেন যে সমর্থক বাক্য না থাকিলেও মনু বেদের

অনুসরণ করেন নাই ইহা বলা যায় না। কারণ বেদের সকল অংশ এখন পাওয়া যায় না। কুল্লুকের অবশ্য ইহা বিশ্বাসমাত্র, ইহা লইয়া বহু তর্কের অবকাশ থাকিলেও সেইরূপ তর্ক নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু সমাজ যতদিন বাঁচিয়াছিল ততদিন প্রয়োজনানুসারে যুগে যুগে ব্যবহারিক শাস্ত্রের সংস্কার হইয়াছে, এখনও সেই সংস্কার আবশ্যক।

ব্রহ্মস্ব অপহরণ করিলে চোর একটি সুদৃঢ় কাষ্ঠনির্মিত মুদ্গর লইয়া রাজার নিকট গমন করিয়া অপরাধ স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্তপ্রার্থী হইবে এবং রাজা এই মুদ্গরের একটি আঘাতে চোরকে বধ করিবেন, তাহা হইলেই চোরের প্রায়শ্চিত্ত হইবে। বলা বাহুল্য এমন সাধু চোর ও ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক একালে দুর্লভ, এবং কোন কালেই সুলভ ছিল কিনা তাহাতেও সন্দেহ। কিন্তু এখনও আমাদের স্মার্তগণ যত্নপূর্বক এই সকল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। শূদ্রান্ন অভোজ্য, অসবর্ণবিবাহ অকার্য, বর্ণাশ্রম ধর্ম পালনীয়; কিন্তু কাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র, বর্ণধর্ম, আশ্রমধর্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম প্রকৃতই পালিত হয় কিনা, অসবর্ণ বিবাহ সম্বন্ধে নূতন অথবা প্রাচীন কোনও বিধি অবলম্বিত হওয়া উচিত কি না এসম্বন্ধে আধুনিক স্মার্তগণের চিন্তাশীলতার কোন পরিচয় পাই না। সমাজে একদিকে যেমন দেখিতেছি উচ্চবর্ণের ব্যক্তিরাও শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে চলিতেছেন তেমনই আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, অর্ধশতাব্দী পূর্বেও বহু নিম্নবর্ণের মধ্যে যে সকল কদাচার ছিল, শিক্ষার ক্রমবিস্তারের ফলে তাহারা সেই সকল কদাচার বর্জন করিয়া উচ্চতর সংস্কৃতি গ্রহণ ও পালন করিতেছেন; ফলে আজ আর তথাকথিত উচ্চকে উচ্চ ও তথাকথিত নিম্নকে নিম্ন বলিয়া স্বীকার করা যাইতেছে না—এরূপ ক্ষেত্রে সমাজকে নূতন করিয়া নির্দেশ প্রদান করিবার সময় আসিয়াছে। যে ব্যবস্থা এখন অচল তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। পক্ষান্তরে যাহা চলিতেছে বা চলিবে, যাহা বাধা দেওয়ার শক্তি কাহারও নাই তাহাকে শাস্ত্রসম্মত করিয়া মানিয়া লইতে হইবে। যাঁহারা সমাজের শিরোভাগে আছেন সেই শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ ইহা করিতে পারিলে শাস্ত্রের প্রতি সমাজের উদাসীনতা বা শ্রদ্ধার অভাব নিশ্চয়ই দুর হইবে। সমাজকে অশাস্ত্রীয় উচ্ছৃঙ্খলপথে কাহারা ঠেলিয়া দিতেছেন ইহা ভাবিবার বিষয়। প্রাচীন শাস্ত্রকার বহু বিষয়ে "প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং নিবৃত্তিস্তু মহাফলা" বলিয়া প্রবৃত্তি স্বীকার করিয়া নিয়াছেন ও নিবৃত্তি প্রবৃত্তি হইতে উৎকৃষ্ট ইহাই বলিয়াছেন। বর্তমানে অনেকে বিবাহের জন্য ধর্ম অস্বীকার করিয়া রেজিষ্ট্রারের শরণাপন্ন হইয়া থাকেন; বলা বাহুল্য এই সকল দম্পতি নিবৃত্তিমার্গের পথিক নহেন। কিন্তু যেমন ইহাদের প্রবৃত্তিকেও অস্বীকার করা যায় না, তেমনই শাস্ত্রের সাহায্যে ইহাদের প্রশ্রয় দিলে সকলেই এই পথে ধাবিত হইবে এরূপ আশঙ্কাও অমূলক। আমাদের সমাজ তন্ত্রোক্ত শৈববিবাহ অনুমোদন করিয়া এইরূপ প্রবৃত্তিপন্থীদের আশ্রয় দিলে ইহাদের ধর্মকে অস্বীকার করিতে হইত না।

বর্তমানে স্মৃতিশাস্ত্র বলিয়া যাহা পরিচিত তাহার মধ্যে যে বহুযুগের বিভিন্ন মার্গের স্বাক্ষর রহিয়াছে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, এবং বৃথা পাণ্ডিত্যের কচ্‌কচির সৃষ্টি করিয়া গায়ের জোরে বহু প্রয়োজনীয় সংস্কার উপেক্ষা করা হইয়াছে ইহারও প্রমাণের অভাব নাই। বহু ব্যাখ্যা পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইলেও সত্যসংবাদী নহে—তাহাতেও সন্দেহ নাই। বর্তমান প্রবন্ধে নিষ্প্রয়োজনবোধে ও স্থানাভাববশতঃ ইহার আলোচনা বাঞ্ছিত নহে। শাস্ত্রের যে স্থানে

কোন আপত্তি নাই সেইরূপ বহুক্ষেত্রেও আমরা সামাজিক ঐক্যবিঘাতী কতগুলি বিধির সৃষ্টি করিয়াছি। আমাদের সমাজে যাহারা রাঢ়ি, বারেন্দ্র ও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, উত্তররাঢ়ি, দক্ষিণরাঢ়ি বা বঙ্গজ কায়স্থ, রাঢ়ি বা বঙ্গজ বৈদ্য ইহাদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধে শাস্ত্রের কোন আপত্তি নাই, অথচ সমাজ এখনও এ সম্বন্ধে কুণ্ঠিত। যাহারা আপনাদের ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যেই ঐক্য স্থাপন করিতে পারেনা বৃহত্তর গণ্ডীর মধ্যে তাহারা সংহতি আনিবে কিরূপে? ইতিহাসে দেখিতে পাই শৌর্য ও বীর্য এবং অগণিত জনবল থাকিতেও যুগোপযোগী সাংগ্রামিক রীতিনীতির পরিবর্তন করিতে পারে নাই বলিয়া বিদেশীয় ও বিজাতীয় মুষ্টিমেয় শত্রুর নিকট বার বার হিন্দুদের পরাভব স্বীকার করিতে হইয়াছে। বর্তমানেও পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অভাব না থাকিলেও সমাজের রথচক্র মনুপ্রবর্তিত রেখা ধরিয়া চালাইতে গেলে জাতিহিসাবে আমাদের মৃত্যু অনিবার্য। কালিদাস যাহাই বলুন চিরকাল এক পথে রথচক্র চলিলে এমন খাতের সৃষ্টি হয় যে, সে পথে রথ চালাইতে গেলে চাকা ডুবিয়া যায়, ঘোড়া সে রথ টানিতে পারে না, আরোহী বিপন্ন হয়। বর্তমানে ধর্মের সহিত মর্মের যোগসাধনের প্রয়োজন। নিজের হৃদয় ও সমাজের হৃদয় এই উভয় মর্মের সন্ধান লইয়া যাহাতে জাতি বাঁচিতে পারে, অভ্যুদয়ের আগম হয় সেই ব্যবস্থাই করিতে হইবে। চণ্ডীদাস যাহারা 'মরম না জানে ধরম বাখানে' তাহাদের ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। প্রাচীন-শাস্ত্র আমাদের সহায়, দেশে প্রতিভার অভাব এখনও হয় নাই। আমরা কি ধর্মের সহিত মর্মের আদর করিতে পারিব না?

শিশু-মানস

শ্রীমতী গায়ত্রী বসু

বর্তমান যুগে সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর ও র্যায়ে শিশুসাহিত্যের একটা সুনির্দিষ্ট স্থান ীকৃত হয়েছে। শিশুসাহিত্য শিশুদের নিয়ে, শিশুমানস প্রতিভার বিভিন্নরূপের বিন্যাসকে নয়ে। শিশুরা বয়স্ক মানুষের মত চিন্তা করতে ারে, কল্পনা করতে পারে, মনের মণিকোঠায় ম্ভব-অসম্ভবের ঊর্ণনাভ সৃজন করতে পারে। য়সে তারা ছোট, তাই তাদের চিন্তাধারার ধ্যে যুক্তির তীক্ষ্ণতা, বিচারের প্রখরতা কোন ীতিকে অনুসরণ করে চলে না। তবুও তাদের গতে তাদের কার্যপরম্পরার মধ্যে সামঞ্জস্য নই একথা কি করে বলি?

শিশুর মানসিক গঠন কোন ক্রমেই অবহেলা করবার মত নয়, বরং তাদের মধ্যে এমন তীক্ষ্ণ ধী-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় যে তাহা বড়দের মধ্যেও সম্ভব নয়। কারণ শৈশব অবস্থায় কৌতুহল এমনই প্রবল থাকে যে শিশু সব কিছুকেই নিজের ব'লে, আন্তরিকরূপে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। সব কিছু তার কাছে সম্ভব, সবই তার জীবনে ঘটতে পারে, সবই তার ইচ্ছার জগতে তার কাছে ধরা দিতে পারে। স্নেহ, ভালবাসা, ভয় একই সঙ্গে মনের অলি-গলির পথে এমন বিচিত্র অনুভূতি সঞ্চার করে যে কে তাকে ভালবাসে, কাকে সে ভয় করবে, কার কাছে সে তার মনের কক্ষ-বাতায়নকে উন্মুক্ত করে তার জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিবেশকে

উপভোগ করবে সবই সে তার স্বভাব থেকে বুঝতে পারে।

শিশুজীবনের মূল্যবান পাথেয় হলো কৌতূহল। মানুষের জীবন-যাত্রার সমগ্র কালেই এই কৌতূহল তার ক্রিয়া করতে সক্ষম। তবুও মানবের শৈশবজীবনাবস্থা অতিক্রান্ত হ'লে কৌতূহল ছাড়াও মানুষ অন্যান্য বহুবিধ ভাব-প্রবণতার দ্বারা চালিত হ'তে পারে—যা জানবার প্রয়োজন নেই, যা জানা অনুচিত তার প্রতি সংযম শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু শিশুর কাছে কৌতূহলের রূপ সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার। তাই শিশুকে শুরু থেকেই ঔৎসুক্য সংবরণ করতে শেখানোর অর্থ তার ভবিষ্যৎ জ্ঞানতৃষ্ণাকে চিরতরে বিনষ্ট করে দেওয়া। যাঁরা সমাজ-জীবনে পরবর্তী-কালে খুব বড় হয়েছেন বা যশস্বী হয়েছেন তাঁদের শিশু অবস্থা থেকেই সব কিছু জানবার ও বুঝবার অসীম আগ্রহের কথা আজও গল্পের আকারে আমরা ছোটদের কাছে উত্থাপন করে তাদের বিস্ময় উৎপাদন করি। গৃহে, পথে বা প্রান্তরে যেখানেই তারা তাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞানের বাইরে কোন নূতন বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, তারা তখনই সেটা কী তা জানবার জন্যে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রশ্ন ও অনুসন্ধান চালিয়েছে। আর তাদের অভিভাবক, পথপ্রদর্শক ও শিক্ষা-দাতাগণ তাদের সেই জ্ঞানপিপাসানলে যথার্থ-ভাবেই ইন্ধন যোগ করতে পেরেছেন। তবে এর মধ্যে একটা বিশেষ কথা আছে। সেটা হচ্ছে এই কৌতূহলকে ঠিক পথে চালানো। মন্দ বস্তুকে শিখতে মানুষের বিলম্ব হয় না, কারণ তার প্রতি এক অতি স্বাভাবিক প্রবণতা আছে, একটা বিশেষ ঝোঁক আছে। অবশ্য আমার মনে হয়—মন্দ বস্তু যাতে কেউ না শিখে ফেলে তার জন্যে অতি অস্বাভাবিক গোপনীয়তা মানা হয়—আর তার জন্যেই সেগুলি জানবার জন্যে আকর্ষণ ও আকুলতা এত প্রবল থাকে। যাই হোক, কৌতূহলকে যদি কল্যাণকর বিষয়-বস্তুলাভের প্রতি আগ্রহান্বিত করে তুলতে পারা যায় তবেই শিশুশক্তির সম্যক বিকাশ-সাধনের পথে সঞ্জীবনী সঞ্চারিত করা হলো বলা যেতে পারে। কেন না, যে সঞ্চয় তাদের ভবিষ্যৎ জীবনকে ভালভাবে গঠিত করতে সাহায্য করবে সেই পাথেয়কে লাভ করবার জন্যে, সেই অজ্ঞাত বস্তুকে জ্ঞানের রাজ্যে আনবার জন্যে যদি অন্তরের ঔৎসুক্য দুর্নিবার হয়ে ওঠে তবেই শিশুর জীবন-ভিত্তি ভাল ভাবে তৈরী হচ্ছে বলে মনে করা যেতে পারে।

বর্তমান যুগের শিশুসাহিত্য এই দিক থেকে কতটা কল্যাণকর গঠনমূলক কর্মধারা অনুসরণ করতে সমর্থ হয়েছে সে বিষয়ে দু'চার কথা বলা যেতে পেরে। পাশ্চাত্ত্য-সাহিত্যের আলোচনার ভাণ্ডার নানা সম্ভারে পূর্ণ, সুতরাং তাদের বিষয়বস্তুর মধ্যে বহুবিধ বস্তুর সন্নিবেশ থাকবে তাতে আর আশ্চর্য কি? আমাদের দেশের শিশুসাহিত্য প্রকৃতপক্ষে নিতান্তই শিশু। আমরা শিশুর কৌতূহলপ্রখর এই যুক্তিতে লোমহর্ষণ রোমাঞ্চকর অদ্ভুত অবিশ্বাস্য এ্যাড্‌ভেঞ্চার অভিযানকাহিনী অনেক পরিমাণে পরিবেশন করছি। তাতে তাদের পাঠতৃষ্ণা বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু জ্ঞানসঞ্চয় বাড়ছে না। রুচিবোধ, ভালমন্দের প্রতি প্রাথমিক বিচার-শক্তি, রসবোধ, সৌন্দর্যানুভূতি, কবিত্বশক্তি প্রভৃতি কিছুই লাভ হচ্ছে না। অসম্ভবের দেশে হাসি-খুশী-মন নিয়ে আনন্দের সঙ্গে তারা বিচরণ করতে পারছে সত্যি, কিন্তু তা থেকে শাশ্বত মূল্যবান কিছু আহৃত হচ্ছে বলে মনে হয় না। অতি আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে কয়েকজন সাহিত্যিক কৌতূহলকে কেন্দ্র ও বাহন করে মানবসেবা, সহৃদয়তা, পরোপকার, দয়া, আত্মত্যাগ, স্বার্থবিসর্জন প্রভৃতি

নানা সদ্প্রবৃত্তির অনুশীলন-সম্ভাবনাকে তাদের দৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার প্রয়াস করেছেন। এই ধরণের প্রচেষ্টা অবশ্যই কার্যকরী হ'বে। কৌতুহলের রথে চড়ে যেমন বিস্ময়কর রোমাঞ্চ-কাহিনীর অনুধাবন আনন্দময় তেমনি কৌতুহলের মাধ্যমে জ্ঞাতব্য বিষয়ের উপস্থাপন ভবিষ্যতের দিক হ'তে কল্যাণ-সম্ভাবনাময়। যুগটা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, চলেছে অনাগত কালকে বর্তমানের গণ্ডী দিয়ে বাঁধতে, চলেছে দূর ভবিষ্যৎকে সীমার মধ্যে আনতে। সেই যুগজয়-যাত্রার সন্ধিক্ষণে শিশু-মানস শুধু কল্পলোকের ফানুসে চড়ে মায়ার দুরবীনে তার দুনিয়াটাকে লক্ষ্য করে বেড়ালে নিরর্থক অলস ভাবপ্রবণতার আবেশজালে বদ্ধ হওয়া ছাড়া আর বেশী কী লাভ করতে পারে? তাই তার পরিক্রমার মধ্যে তাকে বস্তুর সন্ধান দিতে হ'বে, আদর্শের লক্ষ্য উদ্ঘাটিত করতে হ'বে। এরা যে শিশু, তুচ্ছতার উর্ধ্বে এদের স্থান এখনও নির্দিষ্ট হয়নি—এই দৃষ্টিভঙ্গী ওদের বুদ্ধিকে পঙ্গু করে দেবে, ব্যাহত করে দেবে। তাই তাদের কৌতুহলকে অসম্ভবের দেশ থেকে টেনে এনে সম্ভবের আনন্দমেলায় পরিবেশন করতে হ'বে।

শিশুমানসের আর একটা দিকের কথা আলোচনা করে এই প্রবন্ধের আপাত যবনিকা টানবো। সৌন্দর্যপ্রীতি শিশুর মানস লোককে একেবারে পূর্ণ করে রেখেছে। এই সূক্ষ্মরস-শিল্পকলার অনুশীলন সহজ নয় এবং বড়ই দুঃসাধ্য। কেন না সৌন্দর্যের অনুভূতি নিতান্তই আপেক্ষিক। একজন যাকে বললে সৌন্দর্যের পিরামিড, অপর একজন তার দিকে নাসিকা কুঞ্চন করলে তাকে অকিঞ্চিৎকর ভেবে। অতি স্থূল শিল্পকলা বা রসবৈচিত্র্য অনেক সময় পরিবেশ-সাহচর্যে উচ্চশ্রেণীর জাতে উঠে যায়। শিশুর মানসিক সৌন্দর্যলিপ্সার স্বাভাবিক একটা আকর্ষণ আছে। সেই আকর্ষণই বার বার অসুন্দর থেকে, সুন্দরের প্রতি টেনে নিয়ে যায়। অবশ্য এর জন্যে একটা বিশেষ ব্যবস্থা করতে হতে পারে। সেটা হ'চ্ছে কৃত্রিম পরিবেশ গঠন বা স্বাভাবিক পরিবেশের সন্ধান। আমি অতি আধুনিক নামকরা শিশুবিদ্যালয় দেখেছি। অনাড়ম্বর নীরস সজ্জাহীন কক্ষ, সাদা দেওয়াল,—শিশুর দৃষ্টি বার বার কিসের সন্ধান করে যেন ফিরে আসছে। খুঁজে বেড়াচ্ছে তার কৌতূহলী চক্ষুর্দ্বয় কোথায় তার মনের আনন্দ সৌন্দর্যের দ্বারে গিয়ে অভিনন্দন জানাবে। সাদা দেওয়ালের মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে তা নির্লিপ্ত নিরাকার। তা দিয়ে পরম ব্রহ্মের তত্ত্বানুসন্ধান যতটা সহজ, শিশুর মনোজগতে আনন্দলহরী তোলা ততটা সহজ নয়। তাকে চিনতে হবে সাদা, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে হ'বে লাল গোলাপ আর আকাশের নীলিমা। ছড়া পাঠের ধ্বনিমাধুর্য, শব্দ ঝঙ্কারের লালিত্য, সঙ্গীতের দোলা, রঙ্তুফানের বৈচিত্র্য—সকলগুলিকে বিভিন্ন, বিরুদ্ধ, সমধর্মী সর্বরকম পরিবেশের মধ্য দিয়েই পরিচিত করে তুলতে হ'বে। তারপর সেই পরিবেশ তাকে ধীরে ধীরে শিখিয়ে দেবে কোন্টা সত্যিকার আনন্দ দিতে পারে, কোন্টা মনের খুশির তারে সুর দেয় না। এই সৌন্দর্যবোধের প্রকৃত ও যথার্থ অনুশীলন যদি সার্থকভাবে তার জীবনে প্রতিক্রিয়া তুলতে পারে, শিশুমানসের প্রতি গঠনের মধ্যে, প্রতিটি অণু ও পরমাণুর মধ্যে সঞ্চারিত হ'তে পারে, তাহলে তার শিক্ষাজীবনের প্রারম্ভে সত্যিকারের সদ্গুণের বীজ একটা রোপিত হ'ল বলে মনে করা সম্ভব। সত্যিকার সৌন্দর্যজ্ঞানহীন মানুষ সমাজ-জীবনে অর্থহীন প্রহসন। সেই প্রহসন-অভিনয়ের মহলা দেবার ক্ষেত্র যদি হয় শিশুমানস তাহলে সেটা সত্যিই দুঃখের।

তাহলে দেখা যাচ্ছে কৌতুহলকে বিপথগামী আর সৌন্দর্যবোধকে দমিত না করে অনুপ্রেরণা দিয়ে কল্যাণের পথে চালিয়ে দেবার জন্য ছোট অবস্থা থেকে একটা ঠিক পথ নির্দিষ্ট করতে পারা অত্যাবশ্যক। এদেশের সঙ্গে প্রগতিশীল অপরাপর দেশের অনেক পার্থক্য। এদেশের শিশুশক্তি অবহেলিত আর শিশু-মানস অবজ্ঞাত। যখন শিশুর জীবন শৈশবের কোমলতা থেকে মুক্ত হ'বে, তখন তাকে একটু নেড়ে চেড়ে দেখা যেতেও পারে, তার আগে কিন্তু নয়। সুতরাং এর ফলাফল হচ্ছে কোমল মনের কমল-বনে কাঁটাগুলো অক্ষয় হয়ে থাকছে। মানস লোকের ভাবালোকে শিশুরা শিশু কিন্তু সম্ভাবনার ভবিষ্যৎ জগতে তারা যে অনেক বড়, অনেক দীপ্ত, জ্যোতির্ময় আর ভাস্বর। সেই দিকটা ভাববার যুগ কি আসেনি?

সমালোচনা

বেদান্ত-পরিচয় (২য় সংস্করণ)—হীরেন্দ্র নাথ দত্ত প্রণীত। প্রকাশক ঃ শ্রীকনকেন্দ্র নাথ দত্ত; ১৩৯বি, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৪; পৃষ্ঠা—২৫৭; মূল্য—২৷৹ আনা।

মনীষী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বাঙলা ভাষায় যে কয়খানি অমূল্য গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন এই বইটি তাহাদের অন্যতম। এগারো বৎসর পূর্বে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইয়া যায়। এখন ইহা পুনর্মুদ্রিত করিয়া প্রকাশক বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার ধন্যবাদ-ভাজন হইলেন। জীব, জগৎ, ব্রহ্ম, মায়া, মুক্তি প্রভৃতি সম্বন্ধে উপনিষদের বিবিধ সিদ্ধান্ত অতি প্রাঞ্জল ভাষায় সবল যুক্তিসহ গ্রন্থে আলোচিত হইয়াছে। বিভিন্ন উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র এবং কিছু কিছু অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ হইতেও সানুবাদ প্রচুর উদ্ধৃতি পুস্তকের ভাবগাম্ভীর্য বৃদ্ধি করিয়াছে। সংক্ষেপে বেদান্তের সহজ এবং সুসমঞ্জস পরিচয় উপস্থাপিত করিয়া গ্রন্থটি সত্যই সার্থক-নামা।

কর্মবাদ ও জন্মান্তর (৩য় সংস্করণ)—লেখক ও প্রকাশক—পূর্বপুস্তকোক্ত। পৃষ্ঠা—৩০৪ + ।৹; মূল্য আড়াই টাকা।

কর্মবাদ ও জন্মান্তর সম্বন্ধে হিন্দুশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত হীরেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থে বহু প্রমাণ এবং মনোজ্ঞ যুক্তিসহায়ে নানাদিক দিয়া আলোচনা করিয়াছেন। পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত তুলনামূলক নিবন্ধগুলি বিশেষ মূল্যবান। বহু স্থানে জটিল দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্যসমূহ স্বচ্ছ ভাষা এবং উপস্থাপনের গুণে উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

উপনিষদ্—জড় ও জীবতত্ত্ব—লেখক ও প্রকাশক—ঐ। পৃষ্ঠা—৫৬৪ + ॥৴৹; মূল্য—পাঁচ টাকা।

হীরেন্দ্রবাবুর পরিণত বয়সের লেখা এই বৃহৎ গ্রন্থটি তিনি জীবৎকালে প্রকাশ করিয়া যাইতে পারেন নাই। জীব ও বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে বিভিন্ন উপনিষদে যে সকল উক্তি বিকীর্ণ আছে তাহাদিগকে প্রসঙ্গানুযায়ী সাজাইয়া বিস্তারিত 'সুসমঞ্জস আলোচনা দ্বারা উহাদের তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করা হইয়াছে। ঔপনিষদ সিদ্ধান্তে জীব এবং প্রকৃতি উভয়ই তত্ত্বত ব্রহ্ম-স্বরূপ হইলেও যতদিন না আত্মজ্ঞান লাভ হইতেছে ততদিন ইহাদিগকে মানিতে হয়, উহাদের নানা স্তর অতিক্রম করিতে হয়। জীবদেহকে আশ্রয় করিয়া প্রাণশক্তির বিচিত্র অভিব্যক্তি এবং ঐ অভিব্যক্তির পথে প্রকৃতির বহুতর সূক্ষ্মস্তরে সংস্পর্শের কথা উপনিষদে বর্ণিত আছে। এই সকলের যথার্থ মর্ম প্রাচীন ভাষ্যটীকা-সমূহের ব্যাখ্যা হইতে বর্তমান পাশ্চাত্ত্য-জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিক্ষিত মন ঠিক ঠিক গ্রহণ করিতে পারে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় চিন্তাধারায় অগাধ ব্যুৎপত্তিসম্পন্ন গ্রন্থকার বর্তমান কালো-পযোগী করিয়া সেই মর্ম বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন এবং তাঁহার চেষ্টা যে বহুলাংশে সার্থক হইয়াছে তাহা বলিতে আমাদের দ্বিধা নাই। এই উৎকৃষ্ট দার্শনিক (এবং বৈজ্ঞানিকও বটে) গ্রন্থ কঠিন হইলেও উপনিষদের ভাবধারার প্রতি অনুরাগী ব্যক্তিমাত্রের অবশ্য পাঠ্য।

প্রেমাঞ্জলি (গীতি-সংগ্রহ)—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী রচিত এবং শ্রীদিলীপকুমার রায় কর্তৃক অনূদিত। প্রকাশক—এম্, সি, সরকার এণ্ড সন্স্ লিঃ; ১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২; পৃষ্ঠা—১৯৯+৪১; মূল্য—৪৲ টাকা।

পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম নিবাসিনী ভাব-সাধিকা শ্রীমতী ইন্দিরা দেবীর স্বতঃ উৎসারিত হিন্দীভজনগুলির পরিচয় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত শ্রুতাঞ্জলি বইটিতে আমরা পাইয়াছি। এই গ্রন্থের ভজনগুলিও অনুরূপ আধ্যাত্মিক দ্যোতনাপূর্ণ এবং মাধুর্যরসে ভরপুর। হিন্দী গানগুলির বাংলা গীতিকায় রূপদানে শ্রীদিলীপকুমারের আশ্চর্য দক্ষতা প্রকাশ পাইয়াছে। মূল রচয়িত্রীর স্মিতহাস্য-রঞ্জিত নিমীলিত-নয়ন 'সমাধি' মূর্তির আলেখ্যদ্বয় এবং অনুবাদকের ভাব-বিহ্বল সাধক-বেশের আলোকচিত্র পুস্তকের একটি অতিরিক্ত আকর্ষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে পীড়িত সেবা— মাদ্রাজ শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পরিচালনাধীনে সর্বসাধারণের জন্য পীড়িত-সেবা-প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে মাদ্রাজ শহরে একটি বৃহৎ চিকিৎসা-কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত। এখানে শুধু বহির্বিভাগই আছে। ১৯৫১ সালে এই চিকিৎসালয়ের সুযোগ এবং সেবা গ্রহণ করেন ৮১,৭৪২ জন রোগী। এ্যালোপ্যাথি ও হোমিওপ্যাথি, এই দুই ধারাতেই সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। সাধারণ অস্ত্রোপচারের সাহায্য লইয়াছিলেন ৩,৬২২জন রোগী; ১২,২০৪ জন দুঃস্থ স্ত্রীলোক ও শিশুকে দুগ্ধ বিতরণ করা হইয়াছিল।

আচার্য শঙ্করের জন্মস্থানে অনুষ্ঠান— শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম জয়ন্তী এবং ভগবান শংকরাচার্যের আবির্ভাবোৎসব কালাডী (ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য) অদ্বৈত আশ্রমে ১লা জ্যৈষ্ঠ (১৫ই মে) হইতে আরম্ভ করিয়া ৫ই জ্যৈষ্ঠ (১৯শে মে) পর্যন্ত সুচারুরূপে উদ্‌যাপিত হইয়া গিয়াছে। প্রথম দিন বেলা ১০ ঘটিকায় উৎসবের উদ্বোধন করেন 'মাতৃভূমি' পত্রিকার সম্পাদক ব্যারিষ্টার শ্রী কে, পি, কেশবমেনন। অপরাহ্নে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের মাননীয় মন্ত্রী শ্রী ভি মাধবনের নেতৃত্বে আয়ুর্বেদ সম্মিলনের সমারম্ভ এবং হরিপাদের রাজা-কর্তৃক আশ্রম-গুরুকুলের নবনির্মিত ছাত্রাবাসগৃহের দ্বারোদ্‌ঘাটন কার্য সম্পন্ন হয়। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান ছিল হরিজন-সম্মেলন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রী কে কোচুকুট্টন হরিজনদের সর্বপ্রকার সামাজিক উন্নতিকল্পে দেশের শিক্ষিত এবং বিত্তবানদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবেদন জানান। পরদিবস শিক্ষাবিষয়ক একটি সভার অধিবেশন বসে; উহার সভাপতি ছিলেন এরণাকুলম্ হাইকোর্টের বিচারপতি মাননীয় কে, এস্, গোবিন্দ পিল্লাই। আশ্রম হইতে প্রকাশিত মালয়লম্ মাসিকপত্র 'প্রবুদ্ধ কেরলম্' কার্যালয়ের নবনির্মিত গৃহেরও তিনি উদ্বোধন করেন। ঐ দিবসেই আয়োজিত মহিলা-সভায় ডাক্তার শ্রীমতী কমলা রামআয়ার সভা-নেত্রীর অভিভাষণ-প্রসঙ্গে শ্রীশংকর ও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে তাঁহাদের মাতা ও সহধর্মিণীর প্রভাব বিষয়ে এবং সমাজে নারীগণের স্থান-সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

বোম্বাই আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ সভাপতির পদে বৃত হইয়া চতুর্থ দিনে আয়োজিত হিন্দুধর্ম-সম্মেলনে 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' বিষয়ে এক প্রাণবন্ত আলোচনা করিয়াছিলেন। অতঃপর স্বামী পরমানন্দ তীর্থপাদ, স্বামী সিদ্ধিনাথানন্দ, পণ্ডিত গোবিন্দন্ নাম্বিয়ার, স্বামী আদিদেবানন্দ, শ্রী এ, আর দামোদরন নাম্বিয়ার এবং স্বামী শুদ্ধসত্ত্বানন্দ যথাক্রমে শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর, শ্রীরামানুজ, শ্রীচৈতন্য, এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর টি, এম, পি, মহাদেবন, শ্রীশংকরাচার্য প্রসঙ্গে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন।

উৎসবের শেষদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তবৃন্দের একটি সম্মেলন বসিয়াছিল। স্বামী নিঃশ্রেয়সানন্দ ছিলেন অন্যতম বক্তা। ঐ দিন অপরাহ্নে একটি ধর্ম সম্মেলনেরও আয়োজন হয়। পঞ্চদিবসব্যাপী উৎসবসূচির মধ্যবর্তী সঙ্গীত, হরিকথা, ভাগবৎ-পাঠ, গীতালোচনা, 'উত্তান তুলাল,' কথাকলি-নৃত্য এবং তরবারী ও বর্ষা-ক্রীড়া ইত্যাদির অবতারণা কালোপযোগী ও সর্বজনোপভোগ্য হইয়াছিল।

মহারাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ-সেবা — আহমদনগর জেলার দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলে মিশন ১৬ই মার্চ হইতে সেবাকার্য পরিচালিত করিতেছেন; উহার জুন মাসের উত্তরার্ধের বিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। প্রথম সপ্তাহে চারিটি কেন্দ্র হইতে ১০,৭৩৩ নরনারীকে রন্ধিত খাদ্য এবং ৩৫টি গ্রামের ৪৬১টি পরিবারের ১০৮৯ ব্যক্তিকে অরন্ধিত খাদ্য বিতরণ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহে এই সংখ্যাগুলি যথাক্রমে ১১,১৯৩; ৩৫; ৬৪৬ এবং ১৩৮৫।

কেদার-বদরীর পথে প্রচার—১৪ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১১ই আষাঢ় পর্যন্ত কেদারনাথ ও বদরী-নারায়ণের পথে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ ৯টি স্থানে ছায়াচিত্রযোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবালোকে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে হিন্দীতে বক্তৃতা করেন। স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে প্রচুর উৎসাহ পরিলক্ষিত হইয়াছিল। শ্রীনগরে শ্রোতৃ-সংখ্যা ছিল ৫০০, অন্যান্য স্থানে ১০০ হইতে ৩৫০ পর্যন্ত।

বালিয়াটীতে শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মবার্ষিকী—ঢাকা জিলার অন্তর্গত বালিয়াটী গ্রামে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উৎসব ১০ই জ্যৈষ্ঠ হইতে তিন দিন ধরিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে বার শতেরও অধিক হিন্দু মুসলমান নরনারীকে পরিতোষ সহকারে ভোজন করান হইয়াছে। জনসভায় স্বামী সত্যকামানন্দ,স্বামী যোগস্থানন্দ এবং স্থানীয় হাইস্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীযুত যোগেন্দ্রনাথ সরকার প্রভৃতি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারা সম্বন্ধে প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা দেন। এই সভাতে বালিয়াটী ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহ হইতে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। তৎপরদিন মহিলাবৃন্দের জন্যও একটি বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উৎসব-উপলক্ষে আশ্রম প্রাঙ্গণে বালিয়াটীর যুবকবৃন্দ কর্তৃক "মানুষ" নাটক অভিনীত হইয়াছিল।

কলম্বোয় উৎসব—কলম্বো শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশনের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ জয়ন্তী সুচারুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ২২শে মার্চ স্বামী বিবেকানন্দের স্মরণে মাননীয় মন্ত্রী মিঃ এ, রত্নায়েকের পৌরোহিত্যে একটি জনসভা হইয়াছিল। মিঃ কে, আম্বাপিল্লাই এবং মিঃ ভি সৎশিবম (তামিল ভাষায়) যথাক্রমে 'স্বামী বিবেকানন্দ ও হিন্দুধর্মের নব জাগরণ' এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ ও কর্মযোগ' সম্পর্কে সুচিন্তিত ভাষণ দেন। ডক্টর এ, সিন্নাতাম্বী সিংহল দ্বীপের নানা স্থানে মিশনের সেবাকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ২৮শে মার্চ প্রহ্লাদচরিত বিষয়ক 'কথাপ্রসংগম্' বেশ উপভোগ্য হইয়াছিল।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৮তম স্মৃতিবার্ষিকী পালিত হয় ২৯শে মার্চ। অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন মাননীয় মন্ত্রী মিঃ এস্ নটেশন্। ঠাকুরের জীবনীর বিভিন্ন দিক লইয়া বক্তৃতা দেন মুদালিয়র এস্ সিন্নাতাম্বী, মিঃ এফ রুস্তমজী, ডক্টর কুমারন্ রত্নম্ এবং মিস্ এইচ চাল টন্। ৫ই এপ্রিল রবিবার তামিল ও সিংহলী ভাষায় বক্তৃতা করেন স্বামী বরানন্দ এবং মুহন্দীরম্ পি বাকওয়েল্লা। আশ্রমে প্রায় এক সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করানো হয়। উৎসবের সঙ্গীতানুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন আশ্রম বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ, মিঃ টি, এস্ সান্দ্রশেখরম ও তাঁহার দল এবং কুমারী কমলা রত্নাকরম্ ও মিঃ কে বাকওয়েল্লা।

মার্কিণ বেদান্ত-কেন্দ্রের স্থায়ী আবাস—আমেরিকা যুক্তরাজ্যের সেণ্ট লুই বেদান্ত সমিতির নূতন গৃহ এবং উপাসনালয় উৎসর্গকল্পে গত ১০ই ডিসেম্বর একটি উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। এতদুপলক্ষে ঐদিন প্রাতে বিশেষ পূজাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বৈকালিকী জনসভায়

সভ্যবৃন্দ, পৃষ্ঠপোষকগণ, এবং বাহিরের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রতিনিধি মণ্ডলী উপস্থিত থাকেন।

বাদ্যসংযোগে উদ্বোধনী প্রার্থনান্তে স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী সমবেত অভ্যাগতদের অভ্যর্থনা জানান। অতঃপর তিনি সংস্কৃতে প্রার্থনা (ইংরেজী অনুবাদসহ) পাঠ করিয়া গৃহ ও ভজনালয়টি ভগবৎ উদ্দেশে নিবেদন করেন এবং সর্বধর্মের মহান আচার্য, সাধু-সন্ত, প্রত্যক্ষদ্রষ্টাদের ও ঈশ্বর এবং মানবের সেবায় আজীবন ব্রতী নরনারীগণের উদ্দেশে অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। তদনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সর্বাধ্যক্ষ এবং আমেরিকার অন্যান্য কেন্দ্রপরিচালকগণের প্রেরিত বাণী পাঠ করা হয়।

বোষ্টন বেদান্তকেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী অখিলানন্দজী প্রধান অতিথিপদে বৃত হইয়া 'বেদান্ত এবং চলতি সময়ের সমস্যা' সম্বন্ধে এক সুচিন্তিত বক্তৃতা দেন। ওয়াশিংটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনশাস্ত্রের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর এল পি চেম্বার্স মানবগোষ্ঠীর একের প্রতি অপরের হৃদয়-হীন আচরণের বিষয়ে আলোচনা করেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন যে যুদ্ধের এবং তদানুষঙ্গিক উৎপাতগুলির জন্য দায়ী মানুষের জঘন্য লোভ এবং দম্ভ। একমাত্র ভগবদ্‌বিশ্বাসই মানবকে প্রকৃত শান্তি এবং বিশ্বপ্রেমের পথে টানিয়া লইয়া যাইতে পারে এবং বেদান্ত এই জগৎপ্রীতির লক্ষ্যপথ সকলকে শিখাইয়া চলিতেছে। সেণ্ট লুই-এর প্রথম ইউনিটেরিয়ান গির্জার আচার্য ডক্টর থাদ্দিয়ুস্ ক্লার্ক (Thaddeus Clark) তাঁহাদের প্রতিষ্ঠান এবং বেদান্ত সমিতির মধ্যে পারস্পরিক সহানুভূতি এবং উদার ভাবের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন সমস্ত মতের এবং ধর্মের মধ্যে এইরূপই সৌহার্দ থাকা বাঞ্ছনীয়। আওয়া (Iowa) বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর এল, এ, ওয়্যার (L. A. Ware) বলেন,—"সেণ্ট লুই বেদান্ত সমিতির কর্মপরিধি এই নূতন উপাসনালয়টির নির্মাণের সাথে সাথে আরও আগাইয়া গিয়াছে। এদেশবাসীর জন্য বেদান্ত সমিতিগুলি যে কাজ করিতেছেন, তাহা আমাকে কয়েক বৎসর ধরিয়া যথেষ্ট পরিমাণে আকৃষ্ট করিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের এই সন্ন্যাসীরা যে সভ্যতার ভবিষ্যৎ আশার একটি উৎস-স্থল —একথা আমি সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি।"

নিউইয়র্ক শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ বেদান্ত কেন্দ্রের বিংশতিবর্ষ পূরণ—গত ১৬ই মে এই কেন্দ্রটির বিংশতিতম স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হইয়াছে। এইদিন সন্ধ্যা ৭টায় একটি প্রীতি-ভোজের ব্যবস্থা হয়। উহাতে ১৫০ জনেরও অধিক অতিথি যোগদান করেন।

বিখ্যাত ভারতীয় গায়ক শ্রীদিলীপ কুমার রায়ের একটি জাতীয় সঙ্গীত দ্বারা অনুষ্ঠানের উদ্বোধন হয়। প্রীতিভোজের পরবর্তী কর্মসূচী ছিল কয়েকজন খ্যাতনামা বক্তার ভাষণ। প্রধান বক্তার আসন অলংকৃত করেন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রস্থিত ভারতীয় রাজদূত মাননীয় শ্রী জি. এল. মেহতা। স্বামী নিখিলানন্দ পরিচালিত এই বেদান্ত কেন্দ্র তাহার সফল জীবনের বিশ বৎসর অতিক্রম করায় তিনি অভিনন্দন জানান। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের বাণী উল্লেখপ্রসঙ্গে শ্রীমেহতা বলেন যে প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের ঐতিহ্যানুসরণে স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন আমেরিকায় ভারতের আধ্যাত্মিক রাষ্ট্রদূত। নিউ-ইয়র্ক ক্রাইষ্ট চার্চের অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড ওয়েণ্ডেল ফিলিপ্‌স্ বর্তমান জগতে আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ হোরেস্ এল্ ফ্রীস্ বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে ঐক্যসৃষ্টিকল্পে রামকৃষ্ণবিবেকানন্দ-সমিতির কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করেন। অতঃপর স্বামী নিখিলানন্দ কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া

আমেরিকায় সদ্য আগত এবং কেন্দ্রের অতিথিরূপে অবস্থিত ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ও একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। অনন্তর সারা লরেন্স কলেজের অধ্যাপক জোসেফ ক্যাম্পবেলের ভাষণান্তে স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহার সমাপ্তি ভাষণে সমবেত বক্তাগণকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এবং কেন্দ্রের পূর্বের কয়েকজন কর্মীর পূত স্মৃতি আলোচনা করেন। পরিশেষে শ্রীদিলীপ রায় শ্রীশ্রীশংকরাচার্যের 'নির্বাণষট্‌কম্' এর সুরাবৃত্তি ও নিউইয়র্ক বেদান্ত সমিতির অধ্যক্ষ স্বামী পবিত্রানন্দ সমাপ্তি প্রার্থনা করেন।

আশ্রমের পুনর্নির্মিত উপাসনালয়টি উৎসর্গ ১৭ই মে সকালবেলা মহাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। মাননীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীজি. এল. মেটা 'ভারত এবং আমেরিকা', এই বিষয়ে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে উভয় দেশের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক সংযোগের একটি সুন্দর বিবরণা প্রদান করেন। রাষ্ট্রদূত বলেন যে, আমেরিকার নিকট ভারতবাসীর শিক্ষার দুইটি বিষয় আছে; প্রথম হইতেছে সজীব আশার ভাব, আত্মপ্রত্যয়, উদ্যম ও সাহস এবং দ্বিতীয় হইল মানব-সম্পর্কে মৌলিক প্রজাতন্ত্র এবং শ্রমের মর্যাদা।

শ্রীশ্রীমায়ের জন্মশতবার্ষিকী—শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী কার্যকরী সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিগৃহীত হইয়াছে—

(১) ১৩৬০ সালের পৌষ মাস হইতে ১৩৬১ সালের পৌষ মাস পর্যন্ত শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী-উৎসব উদ্‌যাপিত হইবে।

(২) ভারতের মহীয়সী নারীদিগের জীবনী-সম্বলিত একখানি বিস্তৃত জীবনী মুদ্রিত হইবে।

(৩) বাংলা, ইংরেজী ও হিন্দী-ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক বিস্তৃত জীবনী মুদ্রিত হইবে।

(৪) ভারতীয় ও বৈদেশিক বিভিন্ন ভাষায় শ্রীশ্রীমায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী মুদ্রণের ব্যবস্থা।

(৫) হিন্দীভাষায় "শ্রীশ্রীমায়ের কথা" মুদ্রণ।

(৬) শ্রীশ্রীমায়ের বিভিন্ন অবস্থার এবং তাঁহার স্মৃতি-জড়িত প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের ফটো সম্বলিত একখানি এল্‌বাম্ প্রকাশ।

(৭) শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি-বিজড়িত প্রসিদ্ধ স্থান-গুলিতে 'স্মৃতি-ফলক' রাখিবার ব্যবস্থা।

(৮) শ্রীশ্রীমায়ের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং পত্রাবলীর সংগ্রহ এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা।

(৯) সার্বভারতীয় নারী-কৃষ্টি-অধিবেশন এবং শিল্প ও কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইবে।

(১০) সর্বসাধারণ্যে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষার বহুল প্রচারের জন্য বিভিন্ন স্থানে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(১১) শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীমায়ের নারী-ভক্তবৃন্দের দ্বারা একটী ধর্মসম্মেলনের ব্যবস্থা।

(১২) শ্রীশ্রীমায়ের জীবনী ও শিক্ষা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা।

(১৩) মহিলা সঙ্গীত-সম্মেলনের ব্যবস্থা।

(১৪) কামারপুকুর, জয়রামবাটী এবং শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতিসংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রসিদ্ধ স্থানে তীর্থযাত্রার আয়োজন করা হইবে।

সহানুভূতিশীল জনসাধারণের নিকট এই নিবেদন জানান যাইতেছে যে, এই অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন উন্নতি বিধানের জন্য, তাঁহাদের কোন প্রস্তাব থাকিলে শতবর্ষ জয়ন্তীর সম্পাদকের নিকট যেন অনতিবিলম্বে প্রেরণ করেন।

(স্বাঃ) স্বামী অবিনাশানন্দ
সম্পাদক,
শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী
বেলুড়মঠ, হাওড়া

পরলোকে ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গমাতার বড় দুর্দিনে তাঁহার কৃতী বীর সন্তান শ্যামাপ্রসাদকে ৯ই আষাঢ় (২৩শে জুন) বঙ্গজননীর স্নেহক্রোড় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সুদুর কাশ্মীরে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল। তাঁহার ন্যায় আন্তরিক দেশপ্রেম- এবং প্রচণ্ড কর্মশক্তি-সম্পন্ন দৃঢ়চরিত্র নির্ভীক নেতার অভাব সত্যই অপূরণীয়। বাঙ্গালী আজ রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক—ত্রিবিধ জীবনেই বিবিধ সঙ্কটের উপর্যুপরি নির্মম আঘাতে মুমূর্ষু। নিঃসীম নৈরাশ্যের নীরন্ধ্র অন্ধকারে শ্যামাপ্রসাদের গগনস্পর্শী ব্যক্তিত্ব ছিল বাঙ্গালীর অন্যতম আশা-বর্তিকা। সে দীপ অকালে অপ্রত্যাশিত ভাবে নিভিয়া গেল।

শতাব্দীর প্রথম চতুর্থাংশে তাঁর মহাপ্রাণ পিতা স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রে যে উদার কীর্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন শ্যামাপ্রসাদ স্বকীয় প্রতিভা দ্বারা উহাকে শুধু সুপ্রতিষ্ঠই করেন নাই, দেশসেবার আরও বহুতর ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করিয়াছিলেন। পিতা-পুত্রের এইরূপ যুগ্ম যশস্বিতা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়।

স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশ-সেবার আদর্শে শ্যামাপ্রসাদের ছিল অগাধ শ্রদ্ধা। শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের বহু কাজে তিনি অকুণ্ঠিতভাবে যোগ দিতেন ও সহায়তা করিতেন। এই বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারী কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টি- টিউট্ হলে অনুষ্ঠিত স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিসভায় তিনি বলিয়াছিলেন,—ভারতকে আজ জগতের পথপ্রদর্শকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে, ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে ভারতের নব জাগরণের বিপ্লবী নায়ক স্বামিজীর বাণী ও আদর্শের অনুসরণই একমাত্র পন্থা।

শ্যামাপ্রসাদের গৌরবময় কর্মজীবনের অনেক কথা বিবিধ সংবাদ ও সাময়িকপত্রে বিস্তারিত- ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে এবং হইতেছে। এস্থলে আমরা আর তাহার পুনরুক্তি করিব না। প্রার্থনা,—জাতির ধর্ম ও ঐতিহ্যে অটুট- আস্থাসম্পন্ন এইরূপ স্বদেশসেবৈকলক্ষ্য অক্লান্ত কর্মযোগী বাংলা এবং ভারতে বহুসংখ্যক দেখা দিক।

বিবিধ সংবাদ

কলমা (ঢাকা) রামকৃষ্ণ সেবা-সমিতি— গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে সমিতির বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী ব্রহ্মাত্মানন্দ, স্বামী নিঃস্পৃহানন্দ, স্বামী যোগস্থানন্দ ও ব্রহ্মচারী নেপাল এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী এই উৎসবে যোগদান করেন। পাঁচ- শতের অধিক লোক বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছে। অপরাহ্নে সেবাসমিতির বাৎসরিক সভা হয়। পূর্ববংগ ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য শ্রীমুনীন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভায় সমিতির ১৩৫৯ সনের কার্যবিবরণী ও আয়ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপিত করা হয়। উপস্থিত সন্ন্যাসিগণ, ডাঃ প্রশান্তকুমার সেন, জনাব

গোলাম রসুল খন্দকার এবং সভাপতি মহাশয় সময়োপযোগী সুন্দর বক্তৃতা দান করেন। এই উপলক্ষে সপ্তাহকাল ব্যাপিয়া আশ্রম ভবনে জগতের বিভিন্ন ধর্মাচার্যগণের প্রসংগ আলোচিত হয়। ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ ও স্বামী সত্যকামানন্দ আশ্রম ভবনে পদার্পণ করেন। ২০শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে সম্বুদ্ধানন্দজী দিঘলী গান্ধী আশ্রমে "আমাদের বর্তমান কর্তব্য" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ ভাষণ দেন।

মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্— ভারতের উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সম্প্রতি চার সপ্তাহের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে এসে পূর্বাঞ্চলের ওয়াশিংটন থেকে আরম্ভ করে পশ্চিমে ক্যালিফোর্নিয়া পর্যন্ত সমগ্র দেশটির এক দিক থেকে আরেক দিককার সমুদয় বিশিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতে বক্তৃতা দিয়েছেন।

এই বিশিষ্ট ভারতীয় দার্শনিক ও রাষ্ট্রনেতা বিশ্বগণতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে বর্তমান সভ্যতার ভবিষ্যৎ পর্যন্ত বহু বিচিত্র বিষয়ে যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বক্তৃতা করেছেন তাদের কয়েকটির নাম এখানে দেওয়া যাচ্ছে: হাওয়ার্ড বিশ্ববিদ্যালয় (ওয়াশিংটনের বিখ্যাত নিগ্রো বিশ্ববিদ্যালয়); মেরি ওয়াশিংটন কলেজ, ফ্রেডারিক্সবার্গ (ভার্জিনিয়া); কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (নিউইয়র্ক সিটি); ওবের্লিন কলেজ (ওহায়ো); ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বার্কলে) এবং ক্যালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত ষ্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (পালো আল্টো); শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়; নর্থওয়েষ্টার্ণ বিশ্ববিদ্যালয় (ইলিনয়েজ) ইত্যাদি।

সানফ্রান্সিসকোতে ৫০০ নাগরিকের এক বৈঠকে ডাঃ রাধাকৃষ্ণন বলেন: পৃথিবী এক মহা সংকটের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। সর্ব বিষয়ে মানুষের অনুসন্ধিৎসা অতি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। পরমাণু-শক্তিকে আমরা কাজে খাটাতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু এ সবের চরম লক্ষ্য কি? কোন্ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হবে এই ক্ষমতাকে? এই পৃথিবীকে নিয়ে আমরা কি করবো? স্বাভাবিক বসবাসের যোগ্য ভূমি-রূপে গড়ে তুলবো অথবা একটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করবো।

বর্তমান সভ্যতার লক্ষ্য কি? এই প্রশ্নটির উত্তর অতি সুস্পষ্ট: আমাদের ধর্মানুরাগ এবং অন্তর্নিহিত শক্তিকে দ্বিগুণ বলিয়ান না করে তুললে, মানুষ তার নিজস্ব চরিত্রকে, মতামতকে সমষ্টিগত স্বার্থপরতাকে সংযত না রাখতে পারলে আমাদের এই সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা করবার কিছু নেই।

ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস অতি সুদীর্ঘ-কালের। যীশুখৃষ্টের জন্মের ২ হাজার বছর পূর্ব থেকে আজ পর্যন্ত, প্রতি পর্যায়ে পৃথিবীর ইতিহাসকে প্রভাবিত করে এসেছে এই সভ্যতা।

বন্য পশুবেষ্টিত, ধ্যানমগ্ন একটি দেবতার মূর্তি আছে; বিদেশীরা ভারতে এসে ঐ মূর্তিটির কাছে এই ইঙ্গিত লাভ করেন: নগরবিজয়ী বীরের চাইতেও শ্রেষ্ঠতর সে, যে আত্মজয়ী। এই বাণী বিতরিত হচ্ছে স্মরণাতীত কাল থেকে। ভারতের এই বাণীকে গ্রহণ করেছিলেন আলেক-জাণ্ডার। আজও বহু সুমার্জিত, ধীসম্পন্ন মনীষী এই বাণীটিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

(আমেরিকান রিপোর্টারের সৌজন্যে)

উদ্বোধন

আর্তি

জয়তি তেহধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্তাং বিচিন্বতে ॥

জন্মে তব ব্রজভূমি লভি চলে জয় হতে জয়
শাশ্বত কালের তরে সেই পুর লক্ষ্মী-অধিষ্ঠিত।
তোমা লাগি কোন মতে দেহে প্রাণ রাখি দিশ-চয়
ব্যাকুল খুঁজিয়া ফিরি, দেখা দাও জীবন-দয়িত।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসাদ্-
বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়াদ্
ঋষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ ॥

এসেছে কঠিন মৃত্যু বিষ-জলে রাক্ষসের গ্রাসে
প্রবর্ষণে ঝঞ্ঝা-বাতে অগ্নিপাতে তীব্র বিদ্যুতের;
এসেছে অনর্থ শত ধরাতলে, সুদূর আকাশে,
সব ভয় হতে প্রভু, বার বার বাঁচালে মোদের।

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবান্
অখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥

গোপিকানন্দন শুধু নহে তব এই পরিচয়
অখিল জীবের হৃদে বিরাজিছ অন্তর-চেতনা।
ব্রহ্মার আহ্বানে সখা যদুকুলে তোমার উদয়
আসিলে মানব-দেহে ঘুচাইতে বিশ্বের বেদনা।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ ॥

সুধামাখা তব কথা তাপিতেরে দেয় নব প্রাণ
নিমেষে কলুষ হরে, ধন্য করে কবির লেখনী—
শুনিলে মঙ্গল আর শান্তি, যাঁরা প্রচারিয়া যান
দিকে দিকে এ ভুবনে—তাঁহাদেরি শ্রেষ্ঠ দাতা গণি।

(গোপী-গীতি, শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৩১।১,৩,৪,৯)

কথাপ্রসঙ্গে

জন্মাষ্টমী

জন্মাষ্টমী—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-তিথি বৎসরান্তে পুনরায় হিন্দু-ভারতের হৃদয়ে বিচিত্র আবেগ-সম্ভার জাগাইবার জন্য আগতপ্রায়। শ্রীকৃষ্ণ বালক-বালিকার ক্রীড়া-সাথী, তরুণ-তরুণীর প্রেমের দেবতা, গৃহীর দুর্গম সংসার-পথে কর্তব্য-প্রেরণা- ও অভয়-দাতা, সন্ন্যাসীর মোক্ষোপদেষ্টা। শ্রীকৃষ্ণ সকলের। এই লোকোত্তর পুরুষ মানুষের জীবনের সমুদয় ক্ষেত্রে কী ব্যাপকভাবে নিজেকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার যাবতীয় সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার ভাগ গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। শ্রীকৃষ্ণ-ভগবানকে আমরা যেন দেখিয়াছি, একান্তভাবে মানুষরূপে। মা যশোদার মতো ভাবি,—গোপাল, তুমি মুখ বন্ধ কর—তোমার মুখের ভিতর 'সূর্য-চন্দ্র-বহ্নি-বায়ু-সমুদ্র-পর্বত-দ্যাবাপৃথিবী-আকাশ-সমন্বিত স্থির-জঙ্গমাত্মক' কী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড উঁকি মারিতেছে তাহা দেখিবার আমার প্রয়োজন নাই। তুমি শিশুটি হইয়া আমার কাছে থাকো। ব্রজ-গোপিকার ধারায় উদ্ধবের সহিত তর্ক করি,—তিনি নিখিল বিশ্ব-নিয়ন্তা ষড়ৈশ্বর্যশালী ভগবান হইতে পারেন, কিন্তু সে বিভূতি ভাবিয়া আমাদের প্রাণ তৃপ্ত হয় না। তিনি যে আমাদের প্রাণের কৃষ্ণ, আমাদের মনের মানুষ, আমাদের প্রিয়। অর্জুনের ন্যায় মিনতি জানাই,—হে প্রভু, তোমার বিশ্বরূপ সংবরণ কর, আমার চক্ষু তোমার যে রূপ দেখিতে অভ্যস্ত সেই 'সৌম্য মানুষমূর্তি' ধরিয়া আমায় প্রকৃতিস্থ কর।

মানুষ নিজে বহুতর দ্বন্দ্ব-সমাচ্ছন্ন জীব। যুগপৎ তাহার ভিতর আলোক-আঁধার, ভালবাসা-ঘৃণা, শৌর্য-ভয়। মানুষের এই চিরন্তন সাথীটির ব্যক্তিত্বেও প্রকট হইয়াছিল বিপুল বৈপরীত্য-চয়—সীমাহীন ক্রীড়া-চাপল্য আবার উত্তুঙ্গ গাম্ভীর্য, প্রচণ্ড কর্ম-ব্যাপৃতি আবার অদ্ভুত জ্ঞান-স্তব্ধতা, অসংখ্য পাত্রের সহিত নিবিড় সম্বন্ধ আবার সর্ববন্ধন-মুক্ত নির্মম নির্লিপ্ততা। কৃষ্ণ পীতাম্বর শিখিপুচ্ছভূষণ বংশীধর বনমালী—কৃষ্ণ রাজপরিচ্ছদ-পরিহিত শস্ত্রপাণি ধৃতাশ্ববল্গ পার্থ-সারথি। কিন্তু মানুষে আর এই পুরুষ-শ্রেষ্ঠে বৈপরীত্য-সমন্বয়ের প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। মানুষ ত্রিগুণের অধীন বলিয়া দ্বন্দ্ব তাহাকে 'আচ্ছন্ন' করে, আলোক-আঁধারে সে মিশিয়া যায়—উহাদের ঊর্ধ্বে পৃথক করিয়া সে নিজেকে তুলিয়া রাখিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন ভগবান—ত্রিগুণের অতীত; তাই ভাব-দ্বন্দ্ব তাঁহার চরিত্রে অভিব্যক্ত হইলেও তিনি উহাদের 'বশীভূত' ছিলেন না। ঐ দ্বন্দ্ব বাস্তবিক দ্বন্দ্ব নয়। তাঁহার প্রত্যেকটি ভাবই নিবিড় মঙ্গলানুস্যূত। 'যুগপৎ' তিনি কোমল-কঠোর, রুদ্র সংগ্রাম-পরিচালন-মূর্তির পাশে পাশে তাঁহার স্নিগ্ধ বেণুবাদনরত বঙ্কিম-রূপও যেন সর্বদা ভাসিয়া বেড়াইতেছে।

আমরা আজ তাঁহার কোন্ মূর্তির ধ্যান করিব? অবসর না থাকিলে খেলা জমে না, স্বাচ্ছন্দ্য না আসিলে প্রেম সুপ্রতিষ্ঠ হয় না, নির্বাধ অবকাশ না পাইলে সঙ্গীত স্বতঃস্ফূর্ত হইতে পারে না। সর্ব-সাধারণের জীবনে আজ অবসর নাই, স্বস্তি নাই, নিরাপত্তা নাই। ভিতরে বাহিরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলিতেছে। তাই বৃন্দাবন-লীলা শান্তচিত্তে এখন সকলের পক্ষে অনুভব করা সুকঠিন। সর্বসাধারণের জন্য এখন আমাদের চাই পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণকে। শ্রীকৃষ্ণের

আবির্ভাব-কালে বিশাল ভারতবর্ষে বহু মত, বহু স্বার্থ-সংঘাতের মধ্যে যে একতা আনিবার সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাঁহার নেতৃত্বে যাহা সংসাধিত হইয়াছিল আজ ভারতে সেই সমস্যাই নবতর রূপে দেখা দিয়াছে। উহা মিটাইবার জন্য যে অকুণ্ঠিত কর্মোদ্যম, দুর্বার সাহস-বীর্য, যে দূরপ্রসারী সত্যদৃষ্টি, উদার সহিষ্ণুতা-প্রেম আবশ্যক তাহা আসিবে মহা-কীর্তি, মহা-ধীর, মহা-শূর শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তায়, বাক্যে, আচরণে একান্তভাবে অনুসরণ করিয়া। আজিকার ভারতে তাই আমাদের কর্ণ উন্মুখ থাকুক পার্থ-সারথি হৃষীকেশের পাঞ্চ-জন্য-নিনাদ শুনিবার জন্য। শুনিয়া আমাদের দেহ-মন-প্রাণের সকল ক্লীবতা দূর হউক—আমরা ভারতে পুনরায় 'প্রোজ্ঝিতকৈতব শিবদ পরম বাস্তব ধর্ম'—সুপ্রতিষ্ঠার মহাব্রতে আত্ম-নিয়োগ করি। এই যুগকর্ম সংসাধন করিলে পর অবসর আসিবে—সেই শাশ্বত বেণুবাদকের বাঁশী শুনিবার অবসর। কুরুক্ষেত্র হইতে তখন আমরা পুনরায় বৃন্দাবনে ফিরিয়া যাইব। তবে এই বিশ্বাসও যেন আমাদের সুস্থির থাকে যে, শ্রীকৃষ্ণ-বিভূতির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি—তাঁহার অপার্থিব প্রেমলীলা কুরুক্ষেত্রের শ্রীকৃষ্ণ হইতে মুছিয়া যায় নাই। শ্রীকৃষ্ণের ব্যক্তিত্ব একটি সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব—তাই, তাঁহার অনুসরণকারী আমাদিগেরও জ্ঞান ও কর্ম কখনও প্রেম হইতে বিযুক্ত হইবে না।

দুই কোণ হইতে

পুরীতে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। মন্দিরের সম্মুখ-দ্বার হইতে কাতারে কাতারে নরনারী দাঁড়াইয়া—বৃহৎ প্রবেশ-প্রাঙ্গন, দূরবিস্তৃত রাজপথ, চতুষ্পার্শ্বের দ্বিতল-ত্রিতল গৃহের বারান্দা, ছাদ—সর্বত্র মানুষ, মানুষ—বসিয়া, দাঁড়াইয়া, চলিয়া-ফিরিয়া। উদগ্র-আবেগ-বিহ্বল দেবদর্শনে প্রতীক্ষমাণ বিপুল জনতা। ধনী-দরিদ্র, যুবা-বৃদ্ধ, উদাসী-গৃহী—বিভিন্ন স্তরের, বিভিন্ন প্রকৃতির প্রায় তিন লক্ষ লোকের সমাগম। এই জন-সমুদ্রের একটি কোণে দাঁড়াইয়া কলিকাতা হইতে আগত জনৈক প্রৌঢ় স্তব্ধ-বিস্ময়ে উৎসব-উত্তেজনা লক্ষ্য করিতেছিলেন। মাঝে মাঝে পুলিস আসিয়া ভিড়কে নির্মমভাবে পশ্চাতে ঠেলিয়া দিতেছে—বিগ্রহ যে রাস্তা দিয়া আসিবেন উহা ফাঁকা রাখিতে হইবে। এক একবার চাপে লোকগুলির যেন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া যাইবার অবস্থা। কিন্তু সে কষ্টের দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। দেহের আরামকে উপেক্ষা করিয়া দেহাতীত কোন অনুভূতির প্রত্যাশায় সকলে যেন ব্যাকুল। সকলেরই চোখ মন্দিরের প্রবেশপথের দিকে—কখন দ্বার উন্মুক্ত হইবে, মন্দির-বিহারী ভগবান মন্দিরের বাহিরে আসিয়া রথে উঠিবেন, তাঁহাকে লইয়া সহস্র সহস্র ভক্তকর্তৃক বাহিত রথ রাজপথ দিয়া চলিবে।

শঙ্খ ঘণ্টা তূর্য প্রভৃতি বাদ্য বাজিয়া উঠিল। মন্দিরতোরণের দিকে অভিনব উত্তেজনা। ঐ—ঐ উন্মুক্ত দ্বার দিয়া বলভদ্র আসিতেছেন। শুভ্র মূর্তি—কী নয়নাভিরাম শৃঙ্গার! মস্তকে কৌষেয় ছত্র ধরিয়া সেবকগণ ধীরে ধীরে রাস্তার উপর দিয়া হাঁটাইয়া লইয়া আসিতেছে। ক্রমশঃ রথে চড়িয়া সিংহাসনে বসিলেন। তাহার পর সুভদ্রাদেবীর বিগ্রহ সেবকগণ কোলে করিয়া লইয়া মাঝখানের রথে স্থাপন করিল। অবশেষে প্রভু জগন্নাথ আসিতেছেন। কৃষ্ণ মূর্তি। মস্তকে রাজমুকুট শোভা পাইতেছে—সারা অঙ্গে নানা আভরণ ঝলমল করিতেছে—গলায় কুসুম-মাল্য দুলিতেছে। জগতের স্বামী সম্মিলিত ভক্তের নয়ন তৃপ্ত করিয়া পদব্রজে রথের দিকে অগ্রসর হইতেছেন।

সেই কোণ হইতে কলিকাতার প্রৌঢ়টি সব দেখিতেছেন। তিন বিগ্রহকে তিনটি রথে উচ্চ সিংহাসনে স্থাপন করা হইয়াছে। দলে দলে

নরনারী কাঠের ঢালু পাটাতন দিয়া রথের উপর চড়িতেছে। বিগ্রহত্রয়কে স্পর্শ, আলিঙ্গন এবং পুষ্পমাল্যে বিভূষিত করিতেছে। দশদিকে জয়ধ্বনি—জয়, জয়, জয়, জগতের নাথ জয়। কলিকাতার প্রৌঢ়, অসংখ্যের উদ্বেল হৃদয়াবেগের মধ্যে নিজের বিচার ও অহমিকাকে হারাইয়া ফেলিয়াছেন। ভাবিতেছেন,—জড় ও চৈতন্যের, সসীম ও অসীমের এ কী অভিনব বিলাস! কে বলিবে, বিশ্বস্রষ্টা চৈতন্যঘন ভগবান আজ এই জড় কাষ্ঠনির্মিত বিগ্রহে আবির্ভূত হন নাই? কে বলিবে, লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রত্যক্ষ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আজ এই সসীম দেবমূর্তির পশ্চাতে অসীমকে বাস্তব করিয়া তুলে নাই?

* * *

রাস্তার এক পার্শ্বের একটি ত্রিতল গৃহের বারান্দার এক কোণে ২।৩টি সাহেব মেম বসিয়া আছেন। খুব সম্ভবতঃ খ্রীষ্টান মিশনরী। চোখে-মুখে অস্বাভাবিক ব্যস্ততা। বার বার ক্যামেরা ঠিক করিতেছেন। একবার মন্দিরের তোরণের দিকে, একবার সজ্জিত রথের দিকে, কখনও বা সম্মিলিত জনতার কোন একটি অঞ্চল লক্ষ্য করিয়া ক্যামেরা ঘুরাইয়া বোতাম টিপিতেছেন। নীচে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার ফটো উঠিয়া যাইতেছে। পরে হয়তো সুযোগমত কোন বৈদেশিক কাগজে সচিত্র প্রবন্ধ বাহির হইবে—হিন্দুরা কি করিয়া কাঠের পুতুল সাজাইয়া, ধূলিবিকীর্ণ রাস্তার দড়ি দিয়া টানিতে টানিতে রথে চড়ায়—ঐ পুতুল সাজাইয়া অন্ধ আবেগে হাততালি দেয়, ছুটাছুটি করে—কি করিয়া হাজার হাজার জীর্ণ-বসন, অর্ধোলঙ্গ বাল-বৃদ্ধ-বণিতা যুক্তিহীন একটা বিশ্বাসে স্থূল জড়োপাসনায় মাতিয়া ধর্মকে আদিম বর্বরতায় নামাইয়া আনে!

প্রথমোক্ত দৃষ্টিকোণ হইতে এই শেষের দৃষ্টি-ভঙ্গী কত পৃথক! খ্রীষ্টানরা প্রতিমা-পূজার পটভূমিকা ও মর্মের ভিতর আন্তরিকভাবে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন না বলিয়াই বাহিরের কতকগুলি জিনিস দেখিয়া অপসিদ্ধান্ত গঠন ও প্রচার করেন। পক্ষান্তরে হিন্দুরা কিন্তু যীশুখ্রীষ্টের জীবন ও শিক্ষাকে কখনও ভুল বুঝেন না।

প্রার্থনায় আন্তরিকতা

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিয়াছিলেন,—'মামনুস্মর যুদ্ধ চ'—নিজের কর্তব্য-কর্ম অতন্দ্রিত ভাবে করিয়া চলো কিন্তু উহার পটভূমিকা হউক ঈশ্বর-স্মরণ—তাঁহার উপর বিশ্বাস, নির্ভরতা—তাঁহাতে আত্মসমর্পণ। আধ্যাত্মিক দৃষ্টি-বিযুক্ত কর্ম ভারত-সংস্কৃতির দৃষ্টিতে অকর্ম—যত চোখ-ঝলসানোই হউক, উহার মূল্য মাত্র এক পয়সা। স্বামী বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতে গীতোক্ত এই কর্মযোগ বিশেষভাবে অনুশীলিত ও আচরিত হউক ইহাই চাহিয়াছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর সমগ্র জীবনে এই আদর্শ বিশেষভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি দেশকর্মিগণকে তাঁহাদের সেবাকর্ম ঈশ্বর-চিন্তা উপর প্রতিষ্ঠিত করিতে বলিতেন। নিে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় সকলকে লইয়া প্রার্থনা-সভ করিতেন। দেশের নানা স্থানে সহস্র সহ কর্মী এবং সাধারণ দর্শক নরনারীও গান্ধীজী সহিত বসিয়া এই প্রার্থনায় যোগ দিবা সৌভাগ্য ও আনন্দ লাভ করিয়াছেন। গান্ধীজী গভীর ঈশ্বর-বিশ্বাসের শক্তি সেই সময়ে সাময়িব ভাবে শ্রোতৃমণ্ডলীকে স্পর্শ করিত।

কিন্তু গান্ধীজীর প্রার্থনা এবং দলে পড়িয় নিয়ম-রক্ষার প্রার্থনা—এই দুইয়ে যে পার্থক কত তাহা আমাদের ভাবিবার বিষয়। আচা বিনোবা ভাবে সম্প্রতি সর্বোদয় কর্মিগণের একা সম্মিলনে এই বিষয়টি অতি সুন্দররূপে বিবৃ করিয়াছেন। হরিজন পত্রিকা (১৮ই জুলাই

৫৩) হইতে আমরা উহার অংশ-বিশেষ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"সকাল-সন্ধ্যা যে প্রার্থনা আমরা করি তাহা আনুষ্ঠানিক আচারে পরিণত হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি, বহু প্রতিষ্ঠানে সদাচার হিসাবে, দিনচর্যার অঙ্গস্বরূপে উপাসনা করা হয়। সদাচার ভাল জিনিস, কিন্তু আন্তরিকতার সঙ্গে প্রার্থনা করিলে তাহার সুখকর ফলস্বরূপে যে অভিজ্ঞতা পাওয়া যায়, মাত্র সদাচার হিসাবে প্রার্থনা করিলে তাহা পাওয়া যায় না। নিজের জীবন, এমন কি মৃত্যুর ভিতর দিয়াও বাপু এ বিষয়ে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়াছেন। মৃত্যুসময়ে তাঁর মন প্রার্থনায় নিবিষ্ট ছিল এবং প্রার্থনামগ্ন অবস্থাতেই তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। গুলিতে আহত হইয়া তিনি ঈশ্বরেরই নাম নেন। ইহা আকস্মিক কোন কিছু নয়। তাঁর মন সর্বদাই জাগ্রত থাকিত। দিনে দুইবার তিনি যে প্রার্থনা করিতেন তাহা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার ছিল না। তিনি অন্তর দিয়া উপাসনা করিতেন। তিনি বলিতেন, শ্বাসগ্রহণের সঙ্গে তাঁহার প্রার্থনা চলিতে থাকিত। ইহা কল্পনা বা অহমিকার প্রকাশ নয়। ইহা ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান চর্যা। আমাদের প্রার্থনায় আমরা অনুষ্ঠানই পালন করি, গভীরতায় প্রবেশ করি না।

ভাল করিয়া প্রার্থনা করিতে হইলে যে বাহিরের দিকের কাজ বেশি কিছু করার দরকার হয় এমন নয়। সকল প্রস্তুতিই হয় অন্তরে এবং তাহাতে বেশি সময় লাগে না; এক মিনিট সময়ের মধ্যেও তাহা ভাল করিয়া করা যাইতে পারে। ইহা আমাদের মহতী শক্তি দান করিবে। আমাদের জানা উচিত, আমাদের সামনে যে সকল কঠিন কাজ আছে, তাহাতে ঈশ্বরের কৃপা ছাড়া অন্য কোন শক্তির উপর আমরা নির্ভর করিতে পারিব না। ঈশ্বরে আন্তরিক বিশ্বাস না রাখিলে, সত্য ও অস্তেয় যে সকল সংযম আমরা নির্ভীকচিত্তে গ্রহণ করিয়াছি তাহা আমরা পালন করিতে পারিব না।"

অভিনব আত্ম-চিকিৎসা

চৌধুরী মহাশয় দীর্ঘকাল নানা অসুখে (অনেকগুলি কল্পিত) ভুগিয়া, অ্যালোপ্যাথি হো'মিওপ্যাথি আয়ুর্বেদের ইন্‌জেকশন্‌-পিল-বটিকায়, তথা, নানা স্থানে চেঞ্জে বহু টাকা খরচ করিয়া যখন কোনই আশার আলোক দেখিতে পাইলেন না তখন অবশেষে মরিয়া হইয়া স্থির করিলেন, এই ক্ষণভঙ্গুর দেহটার জন্য আর অর্থব্যয় করিবেন না, জন্মভূমি হুগলী-জেলার সেই গণ্ডগ্রামটিতে চুপচাপ পড়িয়া থাকিবেন, মরিতে হয় সেখানেই মরিবেন। কলিকাতার এক বনিয়াদী পল্লীতে তাঁহার নিজস্ব ত্রিতলবাটিতে যখন তাঁহার সহিত শেষ সাক্ষাৎ হয় তখন একপঞ্চাশৎ বৎসর বয়স্ক চৌধুরী মহাশয়কে সত্তর বৎসরের বৃদ্ধের মতো দেখাইতেছিল। শরীর কৃশ, মুখে হাসি নাই, চক্ষুর্দ্বয় দীপ্তিহীন।

সেই চৌধুরী মহাশয় চার মাস পরে যখন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন তখন তাঁহাকে প্রথমটা চেনা কঠিন হইয়াছিল। শরীরে বেশ মাংস লাগিয়াছে—যুবকের ন্যায় হাঁটিতেছেন, মনের আশ্চর্য প্রফুল্লতা—চৌধুরী মহাশয় যেন নূতন জীবন পাইয়াছেন!

কি উপায়ে এমন অদ্ভুত আরোগ্য-লাভ সম্ভবপর হইল জিজ্ঞাসিত হইলে চৌধুরী মহাশয় বলিলেন—"আত্ম-চিকিৎসা"। সেই অভিনব আত্ম-চিকিৎসার নিষ্কর্ষ এইরূপ:—

গ্রামে গিয়া প্রথম প্রথম মুক্ত আলো-বাতাসে খানিকটা মনের স্বচ্ছন্দতা বোধ করিতে লাগিলেন বটে কিন্তু ব্যাধির উপসর্গ তেমন কিছু কমিল না। কলিকাতার মতোই শারীরিক দুর্বলতা এবং প্রাণের নিস্তেজভাব লইয়া ঘরের কোণে বসিয়া নিরানন্দে দিন কাটে। এক দিন সন্ধ্যাবেলায় হঠাৎ দূরের একটি সংকীর্তনের আওয়াজ কানে আসিল। অতি মিষ্ট কণ্ঠ। খোঁজ লইয়া জানিলেন বাগ্দীপাড়ায় কীর্তন হইতেছে—মতি বাগ্দীর দল। তাহার পর প্রতি

সন্ধ্যাতেই নিজের অজ্ঞাতে চৌধুরী মহাশয় উৎকর্ণ হইয়া থাকেন কখন কীর্তনের সুর কানে আসে। বেশ লাগে। দূর হইতে শুনিয়া তেমন তেমন তৃপ্তি হয় না। আসরে গিয়া বসিতে ব্যাকুলতা জাগে। কিন্তু বাগ্দীপাড়া—তাহার পর তাঁহার প্রজা। আভিজাত্যে বাধে। কিন্তু 'ভগবানের নামে উঁচু নীচু কি?' এই বিচারই অবশেষে জয়ী হয়। এক দিন লোকলজ্জা এবং বৃথা-মর্যাদাবোধ দূর করিয়া বাগ্দীপাড়ায় গিয়া হাজির হন।' 'কর্তা'কে নিজেদের মধ্যে পাইয়া দরিদ্র প্রজাদের সে কী আনন্দ! জমিদার চৌধুরী মহাশয়েরও জীবনে যেন এক নূতন প্রভাতের উদয়। সমাজের অবহেলিত দরিদ্র নিম্নশ্রেণীর জনগণের জন্য ক্রমে ক্রমে একটি উদ্বেল সহানুভূতি তাঁহার হৃদয়ে জাগিয়া উঠে—উহা রূপ নেয় বাস্তব কর্মে। কীর্তন-উপলক্ষ্য ছাড়াও তাহাদের সহিত মিশিবার, তাহাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনিবার, শিক্ষা-স্বাস্থ্য-সমাজ-কল্যাণ সম্বন্ধে তাহাদিগকে নির্দেশ দিবার সুযোগ ও সময় চৌধুরী মহাশয় করিয়া নেন। নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের কথা, ব্যাধির কথা কোন্ ফাঁকে কবে যে ভুলিয়া গিয়াছেন, তাহা আবিষ্কার করেন চার মাস পরে কলিকাতায় ফিরিবার প্রাক্কালে। কী আশ্চর্য, বিনা ঔষধে, বিনা তদবিরে তিনি অদ্ভুত আরোগ্য লাভ করিয়াছেন!

ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া

সম্প্রতি কলিকাতায় ট্রামের ভাড়া বৃদ্ধি লইয়া কিছুদিন খুব আন্দোলন চলিল, এখনও (শ্রাবণের মাঝামাঝি) উহার জের মিটে নাই। ছাত্রসমাজকে এই আন্দোলনে বেপরোয়া ভাবে যোগ দিতে দেখিয়া এবং বিশেষতঃ তাহাদের যোগদানের প্রণালী লক্ষ্য করিয়া দেশের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে আশঙ্কা জাগিয়াছে এই ধরনের ব্যাপক বিশৃঙ্খল উত্তেজনা জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড আমাদের তরুণদিগের মধ্যে সংক্রামিত হওয়া মঙ্গলকর কি না। সংবাদপত্রে এ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়াছে। যে সময়ে শরীর-মন-হৃদয়-চরিত্রকে ব্যষ্টিগত, পারিবারিক ও সামাজিক উন্নতির যন্ত্ররূপে সুষ্ঠুভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে উহা একটি সাধনার কাল-বিশেষ। ব্যাপক দ্বন্দ্ব, ঘৃণা এবং ক্রোধ সমন্বিত নানা বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে ঐ সাধনা যে ব্যাহত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। তরুণ-মন স্বভাবতই আবেগ-প্রবণ। সেই আবেগকে অতি যত্নে কল্যাণকর শক্তিতে রূপান্তরিত করিতে হয়। একনিষ্ঠ অধ্যয়ন, উচ্চ ভাব ও আদর্শসমূহের অনুশীলন, শরীর-চর্চা, হৃদয়ের বিস্তার, চরিত্র-গঠন এই সকল ব্যাপৃতিতেই ছাত্র-ছাত্রীগণ যাহাতে সকল মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করিতে পারে ইহাই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। অবসর সময়ে কিছু কিছু জন-শিক্ষা ও পল্লী-উন্নয়নরূপ সেবাকার্যে তাহাদিগকে উৎসাহিত করা অবশ্যই বিধেয়। তাহারা তাহাদের 'বিশেষ সাধনা' সম্পন্ন করিয়া যথার্থ চরিত্রবান কর্মী হইয়া উঠুক—তাহার পরে নিজদের পরিণত বুদ্ধি-বিবেক লইয়া দেশের বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবে—এই পরিকল্পনাই কল্যাণকর। বাহ্যিক উত্তেজনা হইতে ছাত্র-ছাত্রীগণকে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল। বলিষ্ঠ রাজনীতি, সুযোগ্য নেতৃত্ব, সার্থক দেশসেবা যদি তাহাদের মধ্যে ভবিষ্যতে আমরা দেখিতে চাই তাহা হইলে এখন হইতেই উপরোক্ত সাবধানতা অবলম্বন অপরিহার্য।

স্বামী তুরীয়ানন্দের স্মৃতি*

ইডা আন্সেল

(৩)

আমাদের পৌঁছোনর প্রথম রবিবারের দু' সপ্তাহ পরেই সান্ ফ্রান্সিস্কো ক্রনিকল্ পত্রিকার তরফ থেকে একজন রিপোর্টার (নাম ব্লাঞ্চ পার্টিংটন্) এসে হাজির হলেন। তিনি এসেছিলেন এই আশ্রমের একটি বিবরণী তাঁদের কাগজের জন্য লিখে নিতে। এই সময়ে আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং ক্লাশগুলো বেশ নিয়ম-মাফিকই চলছিল। ভোর পাঁচটার সময়ে স্বামী তুরীয়ানন্দজীর স্তবপাঠে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যেতো আর নতুন উপাসনা ঘরটিতে গিয়ে আমরা এক ঘণ্টা করে ধ্যানে বসতাম। প্রাতরাশ হত বেলা আটটায়। দশটা বাজলেই চলত এক ঘণ্টা ধরে পাঠ, আলোচনা—অতঃপর আবার এক ঘণ্টা ধ্যান। বেলা একটায় মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ হয়ে যাবার পর বিকাল পর্যন্ত আমাদের আর কোন সমবেত 'রুটিন' থাকত না। দিনের শেষ দুই ঘণ্টা আবার আমাদের ধ্যানঘরেই কাটত। সকলের শয্যা নেওয়ার রীতি ছিল রাত্ত দশটায়। প্রতিটি ব্যাপারে আচার্যদেবের সঙ্গে ছিল আমাদের ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তিনি প্রত্যেক কাজে সবাইকে সাহায্য করতেন। প্রত্যেককে উৎসাহ দিতেন, আর সর্বদা থাকতেন স্তবমুখর হয়ে। সুন্দর ছন্দে, উদাত্ত সুরে এবং গুরুগম্ভীর গলায় চলত তাঁর আবৃত্তি। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম 'স্বামী'র সমর-স্তোত্র।

কেউ যদি কখনও বলতেন, "কী আশ্চর্যের ব্যাপার, স্বামি, নানা মতের ও নানান ভাবের এতগুলি পুরুষ ও নারী কী করে এমন একযোগে শান্তিপূর্ণচিত্তে জীবনযাপন করছে?" —আচার্য তুরীয়ানন্দজী উত্তর দিতেন,—"তার কারণ, সকলকে আমি শাসন করি ভালবাসা দিয়ে। তোমরা সকলেই প্রেমের গ্রন্থিতে আমার সঙ্গে আবদ্ধ। তাছাড়া কি করে এসব সম্ভব হ'ত? দেখনা, সবাইকে কী রকম বিশ্বাস করি—সকলকে কিরূপ অবাধ স্বাধীনতা দিয়েছি? এ আমি করতে পেরেছি, কারণ জানি তোমরা সবাই আমায় ভালবাস। কারুর মনে কোন খটকা নেই—সকলেই বেশ ধীর স্থির ভাবে চলেছে। কিন্তু মনে রেখো সমস্তই জগজ্জননীর কাজ। আমার কিছুই করবার নেই। যাতে তাঁর কাজ চলতে পারে সেজন্য তিনি আমাদের পরস্পরের মধ্যে দিয়েছেন ভালবাসা। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কাছে আমরা বিশ্বস্ত থাকবো ততক্ষণ কোনও রকম ভুলভ্রান্তির সম্ভাবনা নেই। যে মুহূর্তে তাঁকে ভুলে যাবো, সেই মুহূর্তেই ঘনাবে বিপদ। সেইজন্যই তোমাদের বারবার বলি মাকে মনে রাখতে।"

স্বেচ্ছা-প্রণোদিত আত্মসংযমে আচার্যদেব খুব উৎসাহ দিতেন। প্রত্যেকের নানা আধ্যাত্মিক প্রয়োজন বিষয়ে তিনি ছিলেন অত্যন্ত সচেতন এবং যথাযোগ্য নির্দেশ দিয়ে সবাইকে পরিচালিত করতেন। কিছুদিনের জন্য বিশ্রাম (তিন দিনের

* হলিউড্ বেদান্ত-কেন্দ্রের 'Vedanta and the West' পত্রিকার Sept-Oct, 1952, সংখ্যায় প্রকাশিত মূল ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীমতী সূর্যমুখী দেবী কর্তৃক অনুদিত।

বেশী নয়), অথবা কিছুকাল উপবাস, কিম্বা ধ্যানভজনে সারা এক রাত্রি কাটানো বা মানসিক জড়ত্ব দূর করবার জন্য নিঃসঙ্গে লম্বা একটি ভ্রমণ—ক্ষেত্রবিশেষে এসব ব্যবস্থায় আচার্যদেবের সহানুভূতি ছিল। চব্বিশ ঘণ্টার জন্য নীরব থাকার শপথটিও ছিল একটি সর্বজনপ্রিয় এবং উপকারী বিধান। একা অথবা সবায়ের একযোগে আপ্রাণচেষ্টায় এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করান সম্পূর্ণ নিয়মসঙ্গত বলে মানা হয়েছিল। একদিকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারিগণের উৎপীড়ন-রীতিতে সমাবেশ হত নানাবিধ কলাকৌশল—অন্যদিকে শপথকামীকেও নির্বাক থাকবার জন্য অবলম্বন করতে হত তীক্ষ্ণ সচেতনতা। ধ্যান-ধারণার ক্লাশে সকলে অফুরন্ত উপদেশ ও উৎসাহ লাভ করতেন। আচার্য তুরীয়ানন্দজী প্রত্যেককে আলাদা আলাদা শিক্ষা দিতেন, এর মধ্যে কোনও লৌকিকতার বালাই ছিল না। যে কোন মুহূর্তে এসে পড়তে পারতো তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত শিক্ষাদান, তবে সাধারণত এটা ঘটতো গোধূলিকালে বাইরের দরজার অভিমুখে বেড়াতে বেড়াতে। আবার অনেক শিক্ষোপদেশ আমরা পেতাম বিভিন্ন তাঁবুর মাচায় বসে থাকার সময় এবং প্রাতঃভ্রমণকালে।

এক দিন আমরা সকালে আমাদের আশ্রমে আসবার নানারকম কারণ নিয়ে পরস্পর আলোচনা করছি—এমন সময় আচার্যদেব সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। কি নিয়ে আলোচনা চলছে জিজ্ঞাসা করলেন। সব কথা তাঁকে বলতে তিনি উত্তর দিলেন, "তোমরা যদি নদীতে পড়ে যাও, বা নিজেরা লাফিয়ে পড় কিংবা কেউ ছুড়ে ফেলে দেয়, ফল কিন্তু একই—জলে ভিজে যাবে। আসবার কারণ যাই থাক না কেন—পালাবার কোন উপায়ই এখন আর তোমাদের নেই। গোখরো-সাপে তোমাদের দংশন করেছে—মৃত্যু সুনিশ্চিত।"

ক্লাশে তাঁর বক্তব্যের কিছু কিছু লিখে রাখতে আমায় বলেছিলেন। তদনুযায়ী প্রস্তুত হবার জন্যে একটি ভোঁতা ছুরী দিয়ে লেখার পেন্‌সিল্‌টি কেটে নিয়েছি, পেন্‌সিলের মুখটা হয়ে দাঁড়িয়েছে খাজকাটা, অসমান। ঠিক এই সময়টিতে আচার্যদেব আমার তাঁবুতে এসে হাজির হলেন। পেন্‌সিলটা তুলে নিয়ে মন্তব্য করলেন, "এই বুঝি তোমার কাজের নমুনা!" তারপর নিজেই ঐ অমসৃণ জায়গাটি সেই ছুরীটি দিয়ে কেটে ঠিক সমান ও সুচালো মুখ করে দিলেন। আমার হাতে ওটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, "যে কোনও কাজ কর না কেন, মনে করবে জগন্মাতার পূজা করছ।"

সকালে এক দিন নিজের তাঁবুতে বসে পড়ছি, আচার্যদেব এসে কি পড়ছি জিজ্ঞাসা করলেন। বইটি এমার্সনের রচনাবলী জানালাম। শুনে বললেন, "একেবারে প্রত্যক্ষ আসলটি না নিয়ে তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে গ্রহণ করছ কেন? অভিষ্টপ্রাপ্তির জন্যে মাকে জোর করে ধর।"

আর একবার তাঁবুতে আসবার সময় আবৃত্তি করছিলেন কবি লংফেলোর পদ্যাংশ:

যদিও বিদ্যা রয়েছে দাঁড়ায়ে অনন্ত
চঞ্চল কাল চলে যে নিয়ত মাতিয়া
যদিও হৃদয়ে শক্তি সাহস চূড়ান্ত
স্পন্দন তবু ঘোষিছে থাকিয়া থাকিয়া;—
শবঢাক বাজে—জীবনের হ'ল বিলয় তো
জানায় কফিন, চলিছে কবরে লুটিতে—
শুনে নে এ আয়ু সেইরূপই প্রতিনিয়ত
আগায়ে ছুটিছে মৃত্যু-সাগরে ডুবিতে।

'বিসর্জনের-ঢাকের বাজনার মত', আচার্যদেব অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করতে লাগলেন, তারপর বল্লেন—'জীবন-সঙ্গীত'।

"আচ্ছা, তুমি কি 'জীবনসঙ্গীত' কবিতাটি জানো?"—আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। তৎকালীন আমেরিকার স্কুলগুলির প্রতিটি ছাত্রীর 'জীবন-সঙ্গীত' মুখস্থ থাকতো। আমিও ঐ কবিতাটির নয়টি স্তবক তাঁকে আবৃত্তি করে শোনালাম। তিনি আমার উপর খুব খুশী হয়ে বললেন, "বেশ, বৎসে, বেশ।"

এক দিন বৈকালে আমাদের হঠাৎ দেখা হয়েছে, আচার্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, "উজ্জ্বলা, তুমি গভীর চিন্তাশীলা না লঘুচিত্তা? আজীবন শুধু কি তুমি 'কথা' নিয়েই কাটাবে, না তোমার আদর্শকে দৃঢ় আঁকড়ে ধরে থাকবে?" কি প্রত্যুত্তর দেওয়া যায় ভাবার আগেই পুনরায় বললেন, "মতামতের কথা উঠলে অপরকে সায় দেওয়ায় কোনও বাধা নেই, কিন্তু আদর্শগত বিষয়ে পর্বতের মত অটল থাকতে হবে।" ব্যস্! ঐ ক্ষণেকেই তাঁর নিকট হতে সারাজীবনের চলবার পাথেয় পেয়ে গেলাম।

(ক্রমশঃ)

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়

(এক)

অবতার

শ্রীউমাপদ নাথ, বি-এ, সাহিত্যভারতী

রূপহীন চেতনার মানস-ইঙ্গিতে
সৃজনের সংবেদনে রূপ ওঠে জেগে
মহাব্যোমে গর্জমান স্ফোট-বৃত্ত হ'তে।
সেই ক্ষুব্ধ তরঙ্গের প্রতিঘাত লেগে
চিরন্তন সৃষ্টি-রজ্জু আজো চলে বেড়ে :
ছুটে চলে সংখ্যাহীন স্থাবর জঙ্গম
প্রাক্তনের আকর্ষণে। সেই মোহ ছেড়ে
আদি আত্মরূপ সাথে অন্তিম সঙ্গম

বিধাতার অভীপ্সিত। তাই ভাঙ্গি' ভুল
ভুবনের লোকে লোকে সর্বচেত নিজে
আসে সৃষ্টি-প্রাগ্রূপে বোধি অনুকূল
ফিরাইতে আত্মজেরে সারূপ্যের বীজে।

পরম পুরুষ তাই নরনারায়ণ
যুগে যুগে মানুষের নিত্য প্রয়োজন।

(দুই)

শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে,
এই ধরণীর রবি-শশীর হাস্যমুখর শূন্য বাটে।
বাতাসে বয় সে-সুর-প্রীতি,
আকাশে রং ঝরায় নিতি,
ভুবন জুড়ি' গোপন সে যে—বাজায় বেণু ঘাট-অঘাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর-বিশাল নাটে।

গোঠে-মাঠে গো-খুর ধূলায় ঐ সে ফিরে ক্লান্তজনে,
ক্লান্ত বাঁশীর সুরের রেশে ম্লান করে সাঁজ-সন্ধ্যাথনে।
সেই বাঁশীরই সুরের নেশা
সান্ধ্য শাঁখের ধ্বনি-মেশা,
সেই সুরেতেই পোহায় দিবা—দিগ্বলয়ে নিশি কাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে।

কান থাকে ত' শুনতে পারি এই ধরণীর জীবনভোলা
বাঁশীতে তার সে-সুর ধরি' তুলছে কেমন দোদুল দোলা।
দৃষ্টিদানে দেখতে পারি
তাহার দেহ চিত্তহারী,
জগৎ-জীবন অন্তরালে কেমন বাঁকা পথ সে হাঁটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে।

জীবন জুড়ি', ভুবন জুড়ি' চলছে তাহার সুরের খেলা,
কেমন করে ভুলব তাহার বিশ্বে বিরাট শ্রীনাথ-মেলা!
সেই বাঁশীরই মোহন ডাকে,
জীবন যে মোর হারিয়ে থাকে,
শেষের খেয়ায় সব পাশরি নামিয়ে বোঝা ধরার হাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এইধরণীর বিশাল নাটে।

সেই বাঁশীরই সুরের ধারা তাই ত' আমি ভুলতে নারি,
এই ধরণীর বিশাল বুকে প্রাণের প্রণাম জানাই
তারি'।

তাহার গানে, তাহার তানে
হৃদয় আমার আপনি টানে,
তাহার চরণ স্মরণ করি বিশ্ববিহীন বিজন বাটে,
শ্যামের বাঁশী সদাই বাজে এই ধরণীর বিশাল নাটে

(তিন)

আমার কৃষ্ণ

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

আমার কৃষ্ণেরে তোরা এইরূপে কেন বার বার
অসম্ভব হীন ক'রে ছোট ক'রে করিলি প্রচার ?
ভক্তির দোহাই দিয়ে সত্যেরে যে দিলি নির্বাসন
জানি না এ ভক্তিতত্ত্ব বৈষ্ণবত্ব তোদের কেমন !
বিশ্বভারতের মহারাষ্ট্রগুরু দ্বারকাধিপতি,
অসীম অনন্ত বীর্য অফুরন্ত অনন্ত শকতি,
বিশ্বজয়ী বাসুদেবে ভুল ক'রে নন্দের দুলাল—
ননীচোরা, গোপীনাথ বলেই তো কাটাইলি কাল।

আর কেন ? চোখ মে'লে চে'য়ে দেখ্ যোগ্যতার কাছে
নিয়তির আস্ফালন কি রকম হার মানিয়াছে।
"গোপাল" যে ছিল, আজ—সে হয়েছে মহাপৃথিবীর—
মহাভারতের পতি। একখানা শুধু অঙ্গুলির
ইঙ্গিতে পৃথিবী ঘুরে ;—কাশী, কাঞ্চি, অবন্তী, মালব,
নত হয়ে জয় গায় ; ভয় পায় তার নামে সব
শিশুপাল, বক্রদন্ত। বাঁশী নয়—অসি চক্র যার
মহাবীর-কর-ভূষা। জ্ঞান-মূর্তি, শৌর্যের আধার,
প্রপন্ন-বান্ধব,—শিষ্ট-ত্রাণকারী, অশিষ্ট তাপন,
অধর্মে অশনি হানি' যুগে যুগে যে করে স্থাপন
শান্তিময় ধর্মরাজ্যে ; জয়ধ্বনি যার বিশ্বময়
সেই তো আমার কৃষ্ণ,—তো'দিগের এই
কৃষ্ণ নয়।

(চার)

ঝুলন-পূর্ণিমা

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

বাদলের মেঘ জমেছে আকাশে,
আঁধারের নাই সীমা ;
তবু মনে জাগে আজ যে তোমার
ঝুলনের পূর্ণিমা !
হে মোর কৃষ্ণ, তোমারি লাগিয়া,
অন্তর-রাধা রয়েছে চাহিয়া,
হেরিতে যে সাধ নয়ন ভরিয়া
শ্রীমুখের মাধুরিমা !

ঝর ঝর ঝর ঝরে বারি-ধারা,
কাঁদে সারা চরাচর !
তা'র সাথে কাঁদে বেদন-আতুর
আজি মোর অন্তর !
ব্যাকুল আজিকে পূবালী বাতাস,
জাগে না কোথাও পুলক-আভাস,
চাঁদের আলোকে ভরে না আকাশ,
যেন ব্যথা-জর্জর !

ব্যথার যমুনা ব'য়ে যায় আজ,
গাহে বিরহের গান,
দুকূল ছাপিয়া আকুলি' উঠিছে
উজানের কলতান !
কোথা তুমি আজ শ্যামল কিশোর,
দেখা কি দিবে না ওগো চিত-চোর,
মিলনের মধু-রজনী আজি কি
হ'বে বৃথা অবসান ?

এস এস প্রিয়, হৃদি-নীপ-তলে
এস সুন্দর শ্যাম !
নিবিড় আঁধারে ফুটাও তোমার
রূপ-ভাতি অভিরাম !
আকাশের শশী নাহি থাক্ আজ,
তবু তুমি এস হে হৃদয়-রাজ,
এস বাঁশি-হাতে মধুর ধ্বনিতে
সাধি' "রাধা" "রাধা" নাম !

প্রজাপতির সৃষ্টি-কাহিনী

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ

বৃহদারণ্যকোপনিষদে উল্লিখিত আছে—"নৈবেহ-কিঞ্চনাগ্র আসীৎ মৃত্যুনৈবেদমাবৃতমাসীদশনায়য়া, অশনায়া হি মৃত্যুঃ" (১।২।১)। এই জগৎ নাম-রূপাকারে পরিণত হইবার পূর্বে শব্দস্পর্শরূপ রস-গন্ধাত্মক কোন বিষয়ই ছিল না, সকল প্রকার অভিব্যক্তি আবৃত ছিল মৃত্যুর দ্বারা। অশনায়া—ক্ষুধারূপী মৃত্যু। প্রকাশ হইবার, বহুরূপে ব্যক্ত হইবার দুর্নিবার অব্যক্ত ক্ষুধা। আর যাহা কিছু ব্যক্ত, একদিন তাহার মৃত্যু অনিবার্য, অতএব মৃত্যু এবং ক্ষুধা অভিন্ন। এই মৃত্যুই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ—ঈশ্বরের সৃষ্টি-প্রকাশের প্রথম প্রতিনিধি। ইনি আত্মন্বী অর্থাৎ মনোযুক্ত হইয়া 'মনস্বী' হইলেন। পর্যালোচন-স্বরূপ মন সৃষ্টি করিয়া মৃত্যুরূপ প্রজাপতি এই কৃতিত্বে লাভ করিলেন প্রচুর আত্মপ্রসাদ।

তাঁহার এই আত্ম-সন্তোষের ফলে জল উৎপন্ন হইল। জল উৎপন্ন করিয়া প্রজাপতি পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। অপরের উপদেশাদি ব্যতীতই তিনি সহজাত জ্ঞান, বৈরাগ্য, এবং ধর্ম-ঐশ্বর্যযুক্ত সিদ্ধসংকল্প। ইচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেন না, মানুষের মতো তাঁহাকে বাহিরের কোন বস্তুর অপেক্ষা করিতে হয় না। তাঁহার সৃষ্টির তিনিই নিমিত্ত ও উপাদান কারণ দুই-ই।[১] এই জগতে ইহার একমাত্র দৃষ্টান্ত মাকড়সা; সে যখন তাহার জাল তৈয়ার করে তখন তাহার নিজের ভিতর হইতেই লালা বাহির করিয়া উহা সৃষ্টি করে। প্রয়োজন হইলে আবার উহা নিজের ভিতরে গুটাইয়া লয়। এই মৃত্যুরূপী প্রজাপতিও বাহিরের কোন সাহায্য না লইয়া নিজের ইচ্ছানুযায়ী সৃষ্টি ও সংহার করিতে সমর্থ হন। তিনিই সৃষ্টিকর্তা, তিনিই সংহর্তা। ক্রিয়াভেদে নামভেদ। যখন সৃষ্টি করেন তখন তাঁহাকে বলা হয় সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, প্রজাপতি, হিরণ্যগর্ভ। যখন সংহার করেন তখন মহাকাল, মহেশ্বর, রুদ্র, মৃত্যু।

পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি পরিশ্রান্ত হইলেন। পরিশ্রান্ত হওয়াতে তাঁহার শরীর হইতে তেজ নির্গত হইল। তেজরূপী অগ্নি দেবতাদিগের মুখ-স্বরূপ বলিয়া দেবতাদিগের উদ্দেশে কোন বস্তু অর্পণ করিতে হইলে তাহা হোমাগ্নিতে আহুতি দিবার বিধি। এই অগ্নিই ভূলোক দ্যুলোক অন্তরীক্ষ-লোক ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। আকাশে অবস্থিত যে বিরাট তেজঃপুঞ্জ জ্যোতিষ্মান্ সূর্যরূপে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডকে আলোকিত ও উত্তপ্ত করিতেছেন তিনিও ঐ তেজস্বরূপ অগ্নিই। আচার্য শঙ্কর এইখানে উপনিষদের ভাষ্যে বলেন—ইনিই বিরাট পুরুষ; ইনিই প্রথম শরীরী।[২]

প্রজাপতি তাহার পর ইচ্ছা করিয়াছিলেন আমার আর একটি শরীর উৎপন্ন হউক। তিনি মনে মনে বেদজ্ঞান পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। বেদ ও মনের সংযোগে তখন অণ্ডাকারে

(১) নিমিত্ত কারণ, উপাদান কারণ—যেমন ঘট গড়িবার নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার, উপাদান-কারণ মাটি।

(২) মনু-স্মৃতিতে আছে, প্রজাপতি প্রথমে জল সৃষ্টি করিয়া তাহাতে সৃষ্টির অনুকূল কর্মবীজ সন্নিবেশিত করিলেন। সেই কর্মবীজ-যুক্ত জল হইতে সহস্র সূর্য-প্রভাযুক্ত স্বর্ণময় অণ্ড উৎপন্ন হইল; সেই অণ্ড হইতে সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হইলেন।

সম্বৎসররূপী কাল আবির্ভূত হইল। ইহার পূর্বে কাল বলিয়া কিছু ছিল না। সম্বৎসর পূর্ণ হইতেই প্রজাপতি অণ্ডটি বিদীর্ণ করিলেন। তাহা হইতে বৈরাজ অগ্নি কুমাররূপে উৎপন্ন হইলেন। ক্ষুধারূপী মৃত্যু সেই কুমারকে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া মুখব্যাদান করিতেই শিশু ভীত হইয়া 'ভাণ'—এই ভীতিসূচক শব্দ করিয়াছিলেন। তাহা হইতে প্রথম বাক্য উৎপন্ন হইল।

অগ্নি-সূর্য এবং বিরাট এই ত্রিমূর্তিতে প্রকাশিত প্রজাপতি জাগতিক সর্ববস্তুর মধ্যে অনুস্যূত বলিয়া ইনি আবার সূত্রাত্মা। বিভিন্ন ফুলের মধ্যে যেমন একই সূত্র অনুস্যূত হইয়া মালা গ্রথিত হয় তেমনি এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনি সকলের মধ্যে অনুস্যূত হইয়া বায়ু বা সূত্রাত্মা নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রজাপতি সর্বনিয়ন্তা হইলেও জগতের অন্তর্গত, কারণ ইনি 'প্রথম শরীরী', ইনি 'ইচ্ছা করিলেন', একাকী 'ভীত হইলেন', 'একাকী আনন্দিত হইতে পারিলেন না'—এই সকল কথা তাঁহার সম্বন্ধে বেদে রহিয়াছে বলিয়া ইনিও পূর্ণ নহেন, জগতের অন্তর্গত। জ্ঞানকর্মোপাসনারূপ যজ্ঞাদি দ্বারা প্রজাপতিত্ব লাভ সম্ভব বলিয়া অন্যান্য কর্মফলের মত ইহাও বিনশ্বর। 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্তিনোঽর্জুন' গীতার এই কথাতে বুঝা যায়, ব্রহ্মলোক—প্রজাপতিলোকও ক্ষয়িষ্ণু। তবে এই প্রজাপতিলোক বিনশ্বর হইলেও জাগতিক অন্যান্য বস্তুর তুলনায় দীর্ঘকালস্থায়ী। আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী এই পঞ্চভূতের মিলিত অবস্থাতে জগতের সমস্ত বস্তুর উৎপত্তি। প্রজাপতি এই পঞ্চভূতেরও স্রষ্টা কারণং কারণানাম্। আমাদের অপেক্ষা প্রজাপতির জীবন সুচিরকাল-স্থায়ী। আমরা কেহই জানি না কবে পৃথিবী সমুদ্র আকাশ বাতাস অগ্নি সৃষ্টি হইয়াছে, কতকাল ঐগুলি থাকিবে, অতএব তাহাদেরও যিনি স্রষ্টা তাঁহাকে একমাত্র পরব্রহ্ম পরমাত্মার তুলনাতেই বিনশ্বর বলা হইল। জীবের তুলনায় তাঁহাকে নিত্য বলাও কিছু অন্যায় নয়।

মৃত্যুরূপী প্রজাপতি চিন্তা করিলেন যদি ক্ষুধার তাড়নায় এখনই এই শিশুকে খাইয়া ফেলি তাহা হইলে আমি আমার 'অন্ন'কে (অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুকে কম করিয়া ফেলিব। এই শিশুকে ভক্ষণ করিলে বীজ নষ্টে শস্য নষ্টের মত হইবে। এই চিন্তা করিয়া তিনি পুনরায় বাক্য ও মনের সহায়ে ঋক্ যজু সাম প্রভৃতি মন্ত্র এবং গায়ত্রী উষ্ণিক প্রভৃতি ছন্দ ও যজ্ঞ সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি যাহা যাহা সৃষ্টি করিলেন সেই সমস্তই তিনি ভক্ষণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সেইজন্য তাঁহার সৃষ্ট যাবতীয় বস্তুই তাঁহার ভক্ষ্য হইল। তিনি সকলের অত্তা, ভোক্তা বলিয়া তাঁহার অপর নাম অদিতি। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় পদার্থ—সমস্তই তাঁহার ভোগ্য। তিনিই সকলকে গ্রাস করেন, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই অত্তা। অদিতিই দ্যুলোক, অদিতিই অন্তরীক্ষ, অদিতি মাতা, অদিতিই পিতা। অদিতির এই সর্বাত্মভাব দ্বারা তিনিই তাঁহার অন্ন-স্বরূপ জগতের স্রষ্টা ও অত্তা। জগতের সমস্ত বস্তুই ভোক্তৃভোগ্যাত্মক হইলেও কেহ একাই সমস্ত বস্তু ভোগ করিতে পারে না। ভোক্তারও ভোক্তা নিশ্চয় রহিয়াছে। একমাত্র সর্বাত্মভাব প্রাপ্ত প্রজাপতির পক্ষেই ইহা সম্ভব।

প্রজাপতির অপত্য দুই শ্রেণীর—দেব ও অসুর। দেবতাগণ কনিষ্ঠ—অল্পসংখ্যক। অসুরগণ জ্যেষ্ঠ—বহুসংখ্যক। দেবতাগণ দ্যুতিমান, অসুর-গণ রাজসবৃত্তিবিশিষ্ট। দেব ও অসুর পরস্পর একে অপরকে অতিক্রম করিবার স্পর্ধা করিল। তাহাদিগকে দেবাসুর বলিয়া কিসে জানা যায়? শাস্ত্রনির্দিষ্ট জ্ঞানকর্মানুষ্ঠানলব্ধ-সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় তাঁহারা দ্যুতিমান—প্রকাশবাহুল্য-নিবন্ধন দেবতা নামে অভিহিত। লোকসিদ্ধ প্রত্যক্ষ ও

অনুমানের সাহায্যে ইহলোকের ভোগ-সাধক কর্মে সর্বদা ব্যাপৃত—কেবল মাত্র নিজ নিজ মনপ্রাণের পরিতৃপ্তির চেষ্টায় রত বলিয়া অসুর। অসুরগণ স্বাভাবিক আসক্তিমূলক ভোগে আকৃষ্ট। ইহকালের ভোগকেই শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাহারা ইহকাল-সর্বস্ব হয়। পক্ষান্তরে দেবতারা মনে করেন, শাস্ত্রনির্দিষ্ট মার্গে চলাই শ্রেয়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন না করাতেই দেবগণের দেবত্ব। দেবাসুর-সংগ্রামের মর্মকথা এই যে আমাদের মতো প্রজাপতির নিজের মধ্যে যে সদ্‌গুণ ও স্বাভাবিক গুণসকল রহিয়াছে তাহাদের উৎকর্ষ ও অপকর্ষই দেবাসুরের জয়-পরাজয়। দেবগণ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে উদ্গীথের বেদমন্ত্রবিশেষ দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইন্দ্রিয়গণ নিজেদের জন্য কল্যাণতম—শ্রেষ্ঠতম উদ্গান করিয়া যাহা সাধারণ তাহা দেবতাদিগের জন্য উদ্গান করাতে এই স্বার্থপরত্ব দোষে দুষ্ট হওয়ায় অসুরগণ তাহাদিগকে পাপবিদ্ধ করিল। দেবগণ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অসুরগণকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া মনের সাহায্যে অতিক্রম করিতে ইচ্ছা করিয়া মনকে তাহাদের জন্য উদ্গান করিতে বলিলেন। কিন্তু মনও যাহা সাধারণ তাহা দেবতাগণের জন্য উদ্গান করিয়া যাহা শ্রেষ্ঠতম, কল্যাণতম তাহা নিজের জন্য উদ্গান করিল। এই স্বার্থপরতাদোষে অসুরগণ তাহাকেও পাপবিদ্ধ করিল। মন এখনও যে অশুভ চিন্তা করে তাহা সেই পাপ। দেবতাগণ মনের দ্বারা অসুরগণকে অতিক্রম করিতে না পারিয়া মুখ্য-প্রাণকে বলিলেন, তুমি আমাদের জন্য উদ্গান কর। প্রাণ তথাস্তু বলিয়া দেবতাগণের জন্য উদ্গান করিল। অসুরগণ বুঝিল দেবতারা এই প্রাণের সাহায্যে আমাদিগকে অতিক্রম করিবে, অতএব তাহাকেও পাপবিদ্ধ করি। এই ভাবিয়া তাহাকে পাপে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিল, কিন্তু মাটির ঢেলা যেমন পাষাণে নিক্ষিপ্ত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায় অসুরগণও সেইরূপ মুখ্যপ্রাণকে আক্রমণ করিতে যাইয়া নিজেরাই বিনষ্ট হইল। এইভাবে দেবতারাই জয়ী হইলেন। বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ ও মন স্বাভাবিক প্রবৃত্তি—বিষয়াসক্তিরূপ পাপবশতঃ অসুরগণকে অতিক্রম করিতে পারিল না। কিন্তু পরিচ্ছিন্নবুদ্ধিশূন্য প্রাণ বিরাটপুরুষরূপে নিজেকে ভাবনা করিয়া অসুরগণকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিল। প্রজাপতির নিজের মধ্যে যে দৈবীসম্পদ আসুরীসম্পদরূপ[৩] শুভাশুভ মনোবৃত্তির অভিভব পরাভব হইয়াছিল তাহা এখনও মানুষ-মাত্রেই অনুভব করিতেছে ; ইহাই দেবাসুর-যুদ্ধ।

দেবতাগণ মুখ্যপ্রাণের সাহায্যে অসুরগণকে পরাভূত করিয়া তিনি কোথায় অবস্থান করিতে-ছিলেন তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়া-ছিলেন মুখের মধ্যে যে আকাশ আছে মুখ্য প্রাণ তাহাতেই অবস্থিত। এই মুখ্যপ্রাণ বাক্ প্রভৃতি কোন বিশেষ প্রকার অবস্থা অবলম্বন না করিয়া মুখের মধ্যে সাধারণভাবে বর্তমান রহিয়াছেন বলিয়া অয়াস্য এবং দেহেন্দ্রিয়সমষ্টিভূত অঙ্গসমূহের রস (সার) বলিয়া আঙ্গিরস নামে কথিত হন, কারণ প্রাণের অভাবে সমস্ত অঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়। এই প্রাণ দেহেন্দ্রিয়ের এবং মনেরও নির্বিশেষ আত্মস্বরূপ, ভোগাসঙ্গদোষ-রহিত এবং বিশুদ্ধ। যেহেতু ভোগাসক্তিরূপ পাপ ইঁহা হইতে দূরে থাকে সেইহেতু প্রাণের অপর নাম 'দূর'। এই প্রাণের তত্ত্ব যিনি জানেন তিনি পাপরূপ মৃত্যু হইতে দূরে থাকেন। এই প্রাণ স্ত্রী পুরুষ পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ পিপীলিকা মাতঙ্গ সকল শরীরের মধ্যেই সমান বলিয়া সম বা সাম। এই প্রাণ

৩ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবী সম্পদ আসুরী সম্পদের কথা বিস্তারিতভাবে বলা হইয়াছে।

বাক্ প্রভৃতি দেবতাকে অপরিচ্ছিন্ন সীমাহীন অগ্ন্যাদি দেবতাত্মভাব লাভ করাইয়াছিলেন। বাগাদি দেবতা যখন মৃত্যুপাশ অতিক্রম করিল তখন অগ্ন্যাদিস্বরূপ হইয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল। বাগাদি শব্দে চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি সকল ইন্দ্রিয়, তথা মন এবং অগ্ন্যাদি শব্দে ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বুঝিতে হইবে। মনও কলুষমুক্ত হইয়া চন্দ্রদেবতার স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

প্রজাপতির এই সকল ইন্দ্রিয় সৃষ্টি 'অতিসৃষ্টি,' কারণ, প্রজাপতি নিজে মরণশীল হইয়াও এই সকল অমরগণকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহা অতীব বিস্ময়কর ব্যাপার। এই সকল ইন্দ্রিয় বা দেবতাগণ কোন কর্মফলের দ্বারা উদ্ভূত নয়। ইহারা জীবের কর্মফল-ভোগের সহায়ক মাত্র। জীব স্বকর্মফলের বশে যেমন যেমন শরীর ধারণ করে এই ইন্দ্রিয়গণও তদনুরূপ হইয়া সেই সেই শরীরের ভোগ-সাধনের সহায়ক হয় মাত্র। শরীর নাশ হইলেও ইন্দ্রিয়ের বিনাশ হয় না, কারণ ইন্দ্রিয়গণ অবিনাশী। পার্থিব জীবদেহ পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়, পৃথিবীতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয় কিন্তু কর্মফল-ভোগের সহায়ক পঞ্চপ্রাণ, দশেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি—এই সপ্তদশ অবয়ব-বিশিষ্ট সূক্ষ্মদেহ দেহী জীবাত্মার ভোগ-সাধনের জন্য তাহার সঙ্গে স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; অতএব ইন্দ্রিয়গণ এই হিসাবে অমর।

প্রজাপতিসৃষ্ট পদার্থ-সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যাহা বলা হইল তাহা সকলই প্রজাপতির নিজ শরীর-সংক্রান্ত। এখন প্রজাপতি কর্তৃক অন্য শরীর কি ভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাই বলা হইতেছে। প্রজাপতি নিজেকে পুরুষ বলিয়া মনে করিলেন। হঠাৎ তিনি ভয়াবিষ্ট হইয়া আলোচনা করিলেন আমি কেন ভীত হইতেছি; আমি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ ত নাই, দ্বিতীয় হইতেই ভয় হয়! যাহা হউক তিনি একাকী তৃপ্ত হইতে পারিলেন না। সেইজন্য মানুষও একাকী তৃপ্ত হইতে পারে না। তিনি নিজের শরীর হইতে তাঁহার দ্বিতীয়রূপ—স্ত্রী-শরীর উৎপন্ন করিলেন। প্রজাপতি নিজেই পতি ও পত্নী এই দুইটি রূপ হইয়াছিলেন। তাই যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি পত্নীরহিত নিজ দেহকে অর্ধ-বৃগলের মত—অর্ধাংশ শূন্য শস্যবীজের মতো বলিয়াছিলেন। শূন্যপ্রায় এই দেহ স্ত্রীর দ্বারা পূর্ণতা লাভ করিয়া থাকে। এইজন্যই বৈদিক দশবিধ সংস্কারের মধ্যে পত্নী-গ্রহণ শ্রেষ্ঠ সংস্কার বলিয়া অভিহিত।

প্রজাপতিই পুরুষ-স্ত্রীরূপে—পতি-পত্নীরূপে—মনু-শতরূপা নামে অভিহিত হইলেন। নিজ শরীরার্ধভূতা স্ত্রীতে—শতরূপাতে মিথুনীভাবে উপগত হইয়াছিলেন, তাহা হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হইল। মনু-শতরূপা-রূপী পুরুষ-প্রকৃতির মিলনেই সৃষ্টি সম্ভবপর হইয়াছিল। একা পুরুষ কিম্বা একা স্ত্রী কেহই সৃষ্টি করিতে পারে না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকল প্রাণীই পিতা-মাতাস্থানীয় মনু-শতরূপা হইতে সৃষ্ট হইল। প্রথমে মনু-শতরূপা হইতে মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পর, শতরূপা মনে মনে চিন্তা করিলেন মনু নিজের দেহ হইতে আমাকে উৎপন্ন করিয়া আবার আমাতেই উপগত হইলেন, অতএব আমি অন্তর্হিত হই। এই ভাবিয়া শতরূপা নিজরূপ পরিবর্তন করিয়া গাভীর রূপ ধারণ করিলেন; মনুও তখন বৃষভরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতে উপগত হইলেন। এই মিথুন হইতে গো-জাতির উৎপত্তি হইল। শতরূপা ঘোটকীর রূপ ধারণ করিলেন, মনুও ঘোটকরূপ ধারণ করিয়া তাঁহাতে ঘোটকজাতি উৎপন্ন করিলেন। শতরূপা যে যে স্ত্রীরূপ ধারণ করিলেন মনুও নিজে সেই সেই পুরুষদেহ ধারণ করিয়া তাঁহাতে উপগত হইয়া সেই সেই জাতি সৃষ্টি করিয়া চলিলেন। মনুষ্য পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলই মনু-শতরূপা হইতে সৃষ্টি হইল। এইরূপে পুরুষ-প্রকৃতি হইতে বিশাল প্রাণিজগৎ পরিপূর্ণ হইল। এই প্রাণি-

গণকে সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতি মনে মনে চিন্তা করিলেন—আমিই এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, অতএব আমিই 'সৃষ্টি'। মাটির তৈয়ারি ঘট-শরাবাদি যেমন মাটি ভিন্ন অন্য কিছু নয় তেমন আমার সৃষ্ট পদার্থসমূহ আমিই। তাঁহার সেই চিন্তার ফলে তাঁহার 'সৃষ্টি' নাম হইল। যে ব্যক্তি প্রজাপতির এই সৃষ্টিতত্ত্ব জানেন তিনি এই প্রজাপতিসৃষ্ট জগতে প্রভুত্ব লাভ করেন।

এই যে প্রজাপতির সৃষ্টি-আখ্যায়িকা ইহা একটি বৈদিক উপাসনামাত্র। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য সৃষ্টিক্রম-বর্ণনায় নহে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ। আকাশাদ্বায়ুঃ। বায়োরগ্নিঃ। অগ্নেরাপঃ। অদ্ভ্যঃ পৃথিবী। কিন্তু পরমাত্মা হইতে পঞ্চভূত সৃষ্টির কথা বৃহদারণ্যকের এই আখ্যায়িকায় নাই। এখানে প্রথমেই জলসৃষ্টির কথা আছে। অতএব বুঝিতে হইবে প্রথমে জল সৃষ্টির কথা থাকিলেও তৎপূর্বে অন্যশ্রুতিতে উল্লিখিত আকাশ বায়ু অগ্নির উৎপত্তি নিশ্চয়ই হইয়াছে; কাজেই এই আখ্যায়িকার সৃষ্টিক্রম বর্ণনার তাৎপর্য নহে। আচার্য শঙ্করের মতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের ফলে প্রজাপতিত্ব লাভ হইতে পারে কিন্তু যাঁহারা মুক্তিকামী তাঁহারা প্রজাপতির এই তত্ত্ব জানিয়া প্রজাপতি-পদলাভেও তুষ্ট না হইয়া নির্বিশেষ ব্রহ্মপদ-প্রাপ্তির নিমিত্ত চেষ্টা করিবেন। ইহাই প্রজাপতি ও তাঁহার সৃষ্টি-বর্ণনায় শ্রুতির তাৎপর্য।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মৃতি

শ্রীমতী মৃণালিনী দেবী

শ্রীশ্রীঠাকুর যাঁকে পূজো করে নিজের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গ পাঠ অবধি তাঁর শ্রীচরণদর্শনাভিলাষ হয়। মা কেমন ও কি করে তাঁর কৃপালাভ হয়,—এ চিন্তা সব সময় আমাকে ব্যাকুল করে রাখত। থাকি দূরে, কুচবিহারে; সরকারী কাজ করেন স্বামী, সুতরাং যোগাযোগের অপেক্ষা ক'রতে হ'ল। কিন্তু বেশী দিন নয়।

১৯১৪ সাল, মার্চ (ফাল্গুন) মাস, তারিখ ঠিক মনে নেই। কলকাতায় আসা হ'ল, কিন্তু আশ্রয়স্থলের পরিবেশ তেমন অনুকূল না থাকায় কয়েকদিন বৃথাই গেল। তাগাদা দিয়ে স্বামীকে মায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন-বাড়ী) পাঠালাম। পূজনীয় শরৎ মহারাজ 'মঙ্গলবার দিন মার কাছে নিয়ে এস' বলে দিলেন।

নির্দিষ্ট দিনে বাগবাজার অন্নপূর্ণার ঘাটে সকাল সকাল স্নান সেরে উঠেছি, আজ মার চরণপ্রান্তে উপনীত হব। এমন সময় একজন স্ত্রীলোক, বেশ বড় বড় চোখ, এসে বল্লেন,—"মার কাছে যাবে? এস, আমিও যাচ্ছি।" বয়স তখন অল্প, অপরিচিতার এরূপ ভাষণে আশ্চর্য হয়ে তাঁর কথায় সায় মাত্র দিলাম। ভাল করে চিনে রাখলাম, তাঁকে মার কাছে দেখতে পাই কিনা।

গাড়ী মায়ের বাড়ীর দরজায় এসে থামল। পূঃ শরৎ মহারাজ রোয়াকেই দাঁড়িয়েছিলেন। আমাকে দেখেই বল্লেন,—"রাধু, একে মার কাছে নিয়ে যাও।" ছোট একটি মেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে এসে বল্লে,—"আসুন"। তার সঙ্গে আমি উপরে দোতলায় গেলাম।

গঙ্গাতীরে যাঁকে দেখেছিলাম, উপরে উঠে

দেখি তিনি সম্মুখে বারাণ্ডায় দাঁড়িয়ে। আমাকে বল্লেন,—"এস"। ইনিই যোগীন মা।

রাধু ঘরের মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে মায়ের শয্যাপার্শ্বে বসতে ব'লে চলে গেল। পূজার আসনে বসে মা ধ্যান করছিলেন। একটু বাদেই ফিরে চেয়ে বল্লেন,—"এসেছ? এস, তোমারই জন্যে বসে আছি, মা।" প্রাণে কি একটা আনন্দ হ'ল। আমারই জন্যে বসে আছেন? এমন মিষ্টি কথা ত কখনও শুনিনি! আনন্দে চোখে জল এল। মা আসন ছেড়ে উঠে কাছে এসে দাঁড়ালেন, আমি প্রণাম করলাম। বললেন,—"কি মা, দীক্ষা নেবে? এস।" চোখের জল মুছে বল্লাম,—"হ্যাঁ মা, আপনার কৃপা পাব বলেই এসেছি।" মা শ্রীশ্রীঠাকুরের দিকে ফিরে জোড়হাত করে বল্লেন,—"আমি কে মা কৃপা করবার? ঠাকুরই সব। এই দেখনা তোমায় আগেই কৃপা ক'রে টেনে এনেছেন এখানে।" পরে জিজ্ঞাসা ক'রলেন,—"কতদূর থেকে এসেছ মা? কোথায় থাক? কার সঙ্গে এসেছ?" ইত্যাদি। আমি যথাযথ উত্তর দিলাম। স্বামী ৺জগদ্ধাত্রী পূজার দিন জয়রামবাটীতে ৺তাঁর কাছে কৃপালাভ করেছেন শুনে মা বিস্ময় প্রকাশ করে বল্লেন,—"কি জানি কেন মনে প'ড়ছে না; কত দেশ-বিদেশ থেকে তাঁর টানে সব আসছে। নামটি তবে কেন মনে আস্ছে না।" ডাঃ কাঞ্জিলাল, স্বামী নির্ভয়ানন্দ প্রভৃতি সঙ্গীদের নাম করায় বলে উঠলেন,—"ও, সেই লোকটি কি? কি জানি মা, কি হ'ল?" আবার ঠাকুরের দিকে চেয়ে করজোড়ে বলতে লাগলেন,—"ঠাকুর, তুমি জান। কত সব টেনে আনছ।"

তারপরে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি ভাল লাগে?" বল্লাম,—"সবই ভাল লাগে মা, তবে জবা-বিল্বদলের পূজো খুব ভাল লাগে।"

"হ্যাঁ, তুমি তো শাক্তই হবে,"—মা বল্লেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য, আমি আশৈশব বৈষ্ণব আবেষ্টনীর মধ্যে লালিত-পালিত।

রাসবিহারী মহারাজকে ডেকে মা জিজ্ঞাসা করলেন,—"রাসবিহারী, মঠে ঠাকুরের পূজার কত দেরী?" উত্তর এল,—"এইবার হোম হবে।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্য-জন্মতিথি, শুভক্ষণ সমুপস্থিত। এইবার কি মা আমার বাসনা পূর্ণ ক'রবেন? দীক্ষার সময় বাঁ দিকে একখানি আসন দিয়ে বল্লেন,—'বোসো'। মা আসন দিচ্ছেন, আমি তাতে ব'সব, সঙ্কোচ হচ্ছে মনে। দেখে মা বল্লেন,—'বোসো, বোসো, তাতে দোষ নেই।" তখন আমি ব'স্লাম। গঙ্গাজল দিয়ে আচমন করতে দিলেন ও কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। বললেন, "সংসার করে কি হবে?" আমি চুপ করে আছি। "আচ্ছা, তাই যদি হয় ত এই এই ক'রবে…। এই মন্ত্র সব সময় জপ ক'রবে। আঁতুড় হলেও করবে। জানবে আজ থেকে ঠাকুর তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবেন।" তারপর নিজে প্রার্থনা করে গুরু ও ইষ্ট দেখালেন। আমার বুদ্ধিতে উদয় হ'ল গুরু-ইষ্ট একাধারে মা নিজেই।

দীক্ষার সময় জিজ্ঞাসা করলাম, কি ভাবে কি করে ঠাকুরের পূজাদি ক'রব? উত্তরে মা বল্লেন,—"যা করতে পারবে তাতেই হবে; মন্ত্র-তন্ত্র কি মা, ভক্তিই সব। তুমি ভক্তি করে বল্বে, ঠাকুর এই নাও, খাও। এই ভক্তিই সার বস্তু। আজ হ'তে ঠাকুর সব ভার নিয়েছেন, কোন ভাবনা নেই, শেষ সময় তিনি আছেন; আমি আছি।"

এমন সময় সুধীরাদি এলেন। মা তাঁকে বল্লেন,—"মেয়েটির খুব ভক্তি" ইত্যাদি। আমি লজ্জিত হয়ে মাকে প্রণাম করে পদধূলি নিলাম প্রণামী দিতে গেলে বল্লেন,—"এ কেন? ও না দিলে কি? ও দিও না।" শুনতে পেয়ে গোলাপ মা

বল্লেন,—"গুরুদক্ষিণা দেবে না ?" এই বলে এসে রেখে দিলেন, বল্লেন,—"ঠাকুর-সেবাতে লাগবে।"

পরে মা গঙ্গাস্নানে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসে কাপড় ছেড়ে আমাকে নিজ প্রসাদী ফলমিষ্টি খেতে দিলেন। আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা। কত ভক্ত আসছেন। মা খুব ব্যস্ত। মাষ্টার মহাশয় এক হাঁড়ি রসগোল্লা পাঠিয়েছেন। ঠাকুরকে নিবেদন করে প্রসাদ দিলেন। আমার সঙ্গে একটি ছোট মেয়ে ছিল। নীচে কল খুলে দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। গোলাপমার কাছে ধমক খেয়ে এখন আমার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। মা তাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন,—"মেয়েটি কে ?" আমি বল্লাম,—"আমার মেয়ে।"

"না, এত বড় মেয়ে তোমার হ'তে পারে না, কে—ভাসুরঝি ?"

আমি তখন বল্লাম,—"সৎ মেয়ে।" মা আমাকে বল্লেন,—"সৎ অসৎ কি মা ? দুষ্ট মনের কাজ। মার কোন দোষ নেই। মন্থরার কাজ, কৈকেয়ীর কোনও দোষ ছিল না।" মেয়েটির দিকে চেয়ে বল্‌লেন,—"মা, মা, মা—যে।"

ও ঘরে মেয়েরা সব পান সাজছেন। কিছুক্ষণ বারাণ্ডায় থাকার পর মাকে দেখতে না পেয়ে, সিঁড়ি দিয়ে তেতলায় উঠে গেছি। দেখি, মা একা ছাদে দাঁড়িয়ে কেশরাশি রৌদ্রে শুকোচ্ছেন। আমাকে দেখেই বল্লেন,—'এস, তোমারি কথা ভাবছিলাম।" খুব খুশী হয়ে মার কাছে দাঁড়ালাম। মা হাত তুলে ৺দক্ষিণেশ্বর মন্দির ও বেলুড় মঠের দিকে নির্দেশ ক'রে দেখালেন ; বললেন,—"ঐ দেখ দক্ষিণেশ্বর, আর ঐখানে বেলুড় মঠ। তুমি কখনও গেছ ?" "না মা।" মা বললেন,—"হ্যাঁ যাবে। জান তো, ঠাকুর নরেনকে কি বলেছিলেন ? 'তুই আমায় মাথায় করে যেখানে রাখবি, আমি সেইখানে থাকব—জগতের কল্যাণের জন্য, বহুকাল ধ'রে থাকবো।' বইয়ে পড়েছ না ? বহুজনহিতায়, বহুজনসুখায় ঐখানে তিনি থাকবেন। ওখানে তাঁর সন্তানেরা, আমার ছেলেরা সব আছেন। তুমি যাবে, অবিশ্যি অবিশ্যি যাবে।" আমি বল্লাম,—"হ্যাঁ মা, যাব।" ছাদে ইতস্ততঃ যেতে মা বললেন,—"ওদিকে যেও না, নীচে ঠাকুর আছেন।" এদিকে 'ভোগ নিবেদন করোগে মা',—বলে গোলাপ মা ডাকছেন। একটি মেয়েও মাকে এসে ডাকলেন। "এসো গো",—বলে মা নীচে দোতলায় নামলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম।

সিঁড়ির এদিকের ঘরে প্রসাদ পাবার বন্দোবস্ত হয়েছে। আলমারির দিকে দুখানি পাতা করা হয়েছে। পূর্ববঙ্গ হতে আগত একটি মহিলা ও আমি সেদিকে বসলাম। অন্য সকলের পাতে মার প্রসাদ দেওয়া হ'ল, কিন্তু আমাদের দুজনকে বাদ দেওয়া হ'ল। হাত গুটিয়ে বসে আছি। কারণ জিজ্ঞাসা করায় গোলাপ মা বল্‌লেন,—"তোমরা বামুন, তাই দিই নি।" বললাম,—"সে কি, আজ আমি মার কৃপা পেয়েছি। তিনি গুরু। বামুন বলে তাঁর প্রসাদ পাব না ?" চোখে জল এল। সকলে মুখ চাওয়াচায়ি করলেন। কথাটা খুব সম্ভব মার কানে গিয়েছিল। তখন মায়ের প্রসাদ আমাদের এনে দেওয়া হ'ল।

প্রসাদ পেয়ে মার ঘরে গিয়ে সেই দরজার কাছে বসলাম। অনেক লোক। মেয়েরা সবাই মাকে ঘিরে কথা বলছেন। মা বিপরীত দিকে দরজাটির কাছে উপবিষ্টা। দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ, সব কথাবার্তার মধ্যেও। তাতে একটু লজ্জাও হচ্ছে। ছেলেমানুষ বয়স। ভাবছি, বইয়ে ত ঠাকুরের কথা পড়লাম, মার মুখে তাঁর কথা ত শুনতে পেলাম না।

এইরূপ ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই মা বলে উঠলেন,—"আচ্ছা মা, ঠাকুর বলতেন, 'মাড়োয়ারী ভক্ত বলেছিল, সংসার করলে না, ছেলে-পুলে না হলে শেষ গতি কে করবে, দেহের শেষ কাজ ?' ঠাকুর উত্তরে উত্তেজিত হয়ে বলেছিলেন,—(সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কণ্ঠস্বরও উত্তেজিত হয়ে উঠল) 'কি, এই দেহের জন্য সন্তান উৎপাদন ?' ছিঃ ছিঃ করে থুতু ফেলতে ফেলতে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। মাড়োয়ারী ভক্ত ত দেখে অবাক ! একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বল্‌ছেন,—'দেহ পচলে আপনি টেনে ফেলে দেবে। শালা বলে কিনা দেহের জন্য সংসার। পুড়ে দেড় সের ছাই বইত নয়।' আহা, কি বৈরাগ্য তাঁর ছিল বলত, মা ? যত বড় দেহ হোক না কেন, সেই দেড় সের ছাই ! এরই এত দম্ভ—অহঙ্কার ! কিছুই কিছু না মা, ভগবানই সত্য। তবে যারা সাধন করে তাঁকে লাভ করবে, যারা তাঁর নাম করবে, তাদের দেহে যত্ন রাখা চাই। দেহকে কষ্ট দিলে কি করে হবে ? দেহকে কষ্ট দিও না, মা। কিছু কিছু খাবে। অত উপোস করা ভাল নয়, দেহে রোগ হবে। সাধনভজন করবে কি দিয়ে, দেহ না থাকলে ?" কি করে জানলেন জানি না। কথাগুলি কিন্তু মা সব আমাকেই লক্ষ্য করে বল্‌লেন।

মনে হচ্ছে, মার একটু সেবা কিছু করতে পারলাম না। অমনি উঠে এসে মা বিছানাটিতে শুলেন, চরণ দুটি একটু ঝুলিয়ে। একটি মহিলা কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে সুযোগ গ্রহণ করে সেবায় রত হলেন, আমার ভাগ্যে আর হ'লো না।

এরই মধ্যে সবাই সরে গেল। মা বললেন,—"যেখানটিতে বসেছিলাম ঐখানে একটু শুয়ে নাও।" তখন তাঁর আদেশ মতো আমি বারাণ্ডার সেই জায়গাটিতে শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। একেবারে গভীর নিদ্রা।

গায়ে রোদ এসে পড়েছে। আর কে যেন নাম ধরে বার বার ডাক্‌ছেন, তবু যেন ঘুম ভাঙ্‌ছে না। কোন রকমে উঠে চোখ মুছতে মুছতে মার কাছে গিয়ে বসলাম। দরজার কাছে মা বসে। মাষ্টার মহাশয় (শ্রীম) ওঘরে দরজার অপরদিকে উপবিষ্ট। মার সঙ্গে কথা হচ্ছে। মা বলছেন,—"হ্যাঁ বাবা, ভক্তকেই বড় করেছেন। দেখনা, সীতা উদ্ধার করতে রামচন্দ্রকে সেতু বাঁধতে হয়েছিল। আর ভক্তবীর হনুমান 'জয় রাম' বলে এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে গেলেন। ভক্ত দেখালেন, নাম—ভগবানের নামের মহিমা কত।" মাষ্টার মহাশয় সজল নয়নে শুনছেন আর 'আহা, আহা,' করছেন।

মাষ্টার মহাশয়ের সঙ্গে একটি ছোট ছেলে বসে শুনছিল। মা তার চিবুক ধরে বললেন,—"ভক্ত, ভক্ত।" এমন সময় কে যেন আমার নাম ধরে ডাকছেন খুব পরিচিতের মতো। একজন প্রৌঢ়া, লালপাড় শাড়ী পরিধানে, হাতে শাঁখা। সঙ্গে তিন চারটি মেয়ে, বড় দুটি গেরুয়া পরা। জানলাম ইনি গৌরীমা। আমায় বার বার বলছেন, "চল্, আমার কাছে যাবি চল্।"

গৌরীমা তখন হ্যারিসন রোডস্থ বাড়ীতে থাকেন। পরিচয় নেই, নামমাত্র শোনা ছিল। তা ছাড়া মা অনুমতি না দিলে যাই কি করে। তখন গৌরীমা বলছেন,—"মঠ থেকে আসছি, মাকে বল্, তাড়াতাড়ি আশ্রমে ফিরবো।" বুঝলাম মঠে আমার স্বামীর পরামর্শ মত গৌরীমা তাঁর সঙ্গে যাবার জন্য বলছেন।

বললাম,—"মা এখন কথা বলছেন, তাঁর চরণামৃত নেবো।" গৌরীমা বার বার বলছেন, কাজে কাজেই অবসরমত মাকে বল্লাম,—"আমি এঁদের সঙ্গে যাব মা ?" মা গৌরীমার দিকে চাইলেন। গৌরীমা ও তাঁর সঙ্গী মেয়েরা মাকে প্রণাম করলেন। গৌরীমা পুনরায়

বললেন,—"মাকে চরণামৃত করে দেবার কথা বল্।"

মা আমাকে বললেন,—"আমি জানি, তুমি এখানে থাকবে। তুমি কোথায় যাবে ?"

গৌরীমা শিখিয়ে দিচ্ছেন,—"বল্ না 'আবার আস্‌ব'।"

অবশেষে মা উঠে চরণামৃত করে দিলেন। প্রণামান্তে গৌরীমা এবং তাঁর সঙ্গিনীদের সঙ্গে তাঁদের আশ্রমে গেলাম। অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেতে হ'ল। তথাপি হৃদয় এক অভূতপূর্ব আনন্দে ভরপুর।

দেখতে দেখতে কয়দিন কেটে গেল।

আজ শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে মঠে সাধারণ উৎসব। মঠপ্রাঙ্গণ আনন্দে মুখরিত। গৌরীমার সঙ্গে সঙ্গে মঠে এসেছি। মঠবাড়ীর পূর্ব দিকের বারাণ্ডায় বসে কন্‌সার্ট শুনছি। এমন সময় শ্রীশ্রীমা রাধু প্রভৃতিকে সঙ্গে নিয়ে এসে দাঁড়ালেন। আমি তাঁর শ্রীচরণ স্পর্শ করে প্রণাম ক'রতে মা আমার মাথায় হাত রেখে স্নেহকরুণা-ভরে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। মঠে যাবার জন্য পুনঃ পুনঃ বলেছিলেন। আজ মঠে দেখে খুব খুশী হ'য়ে হেসে আদর করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন,—"কোথায় আছ ?" গৌরীমাকে দেখিয়ে বললাম,—"এঁদের আশ্রমে।" বল্লেন,—"যেখানে থাক ভাল থাক।"

মঠে ছাদে দাঁড়িয়ে মা কালীকীর্তন শুনছেন। এমন সময় একজন ব্রহ্মচারী এসে সংবাদ দিলেন,—"মা, এক নৌকা লোক ডুবেছে, তার মধ্যে একটি ছোট ছেলেও ছিল।" এই সংবাদে মা গঙ্গার দিকে চেয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে করতে বলতে লাগলেন,—"আজ এই শুভদিনে একি বিপদ ঠাকুর।" কিছুক্ষণ পরে সেই ব্রহ্মচারী আবার এসে বল্লেন,—"সকলে প্রাণে বেঁচেছে মা, সেই ছোট ছেলেটি পর্যন্ত।" মার মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল, নয়ন তখনও অশ্রুসিক্ত। বল্লেন,—"তাই ত বলি, আজ কি শুভদিন! মঙ্গলময়ের জন্মোৎসব, আজ কি অমঙ্গল হতে পারে ?" এই বলে চোখ মুছতে লাগলেন।

একটি মেম সাহেব এলেন (মিসেস্ বুল্?) কী ভক্তি! মার চরণ ধরে মাথা রাখলেন। সুধীরাদি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। তিনি শ্রদ্ধা ও আগ্রহ নিয়ে শুনতে লাগলেন।

মা আহার করলেন পূর্বদিকের ছোট ঘরটিতে। তাঁর আহারান্তে গৌরীমা আমায় ডেকে বললেন,—"আয় মার উচ্ছিষ্ট তোল্। নতুন দীক্ষা হ'য়েছে—মার সেবা কর্।" আদেশ পালন করলাম। পরে মাকে প্রণাম করে প্রসাদ পেতে গেলাম।

কর্মস্থলে ফিরে যাবার সময় এল। যোগসূত্র রইল পত্রাদির মারফৎ। একবার ব্যাকুল হয়ে পত্র লিখি,—"মা, আমি কি পথ হারালাম ?" উত্তরে মা লিখেছিলেন,—"পথ হারাবে কেন, পথ পাবার জন্যই ত আসা।"

"আমাদিগের সনাতন ধর্মপ্রণালীতে কতকগুলি অশাস্ত্রীয়, অযৌক্তিক, অনিষ্টকর ব্যাপার সংশ্লিষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে অনেকস্থলেই কেবল আচারের আঁটাআঁটি বাড়িয়া ধর্মভাবের অন্তঃসারশূন্যতা জন্মিয়াছে; আমাদিগের জাতীয় সমুন্নতির প্রতিবন্ধকস্বরূপ কতকগুলি কুসংস্কার সমাজের গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছে। যাঁহারা প্রকৃতপ্রস্তাবে এই সকল দোষ বুঝিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের সকলেরই কর্তব্য যে, কায়মনোবাক্যে ঐ সকল দোষের উচ্ছেদ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করেন।"

—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পারিবারিক প্রবন্ধ

সত্যানুসন্ধানী

দিবাকর সেন রায়

তোমার মহিমা কতো না রূপেই নিতি প্রকাশিত হয়—
চিরন্তনী যে একই খেলা তব—সৃজন স্থিতি ও লয়।
প্রকাশ তোমার অতি বিচিত্র—কভু সুখে কভু দুখে,
স্থান যে তোমার অন্তরে জানি, নয় মন্তরে—মুখে।
সকলেরি মাঝে পরা ও অপরা— দুইরূপ আছে জানি,
পরা-অপরার উর্ধ্বে উঠিতে পারেন যোগী ও জ্ঞানী।
অপরা-প্রকৃতি-ছলনায় বুঝি সব কিছু দেখি ভুল,
পরিণামে তাই বিচলিত হই, খুঁজে দেখিনাতো মূল।
লঙ্ঘিলে বিধি লভিতেই হবে প্রকৃতির প্রতিশোধ,
পরা যে প্রকৃতি তাইতো বলিছে—'করো প্রবৃত্তি রোধ।'
পরা-অপরার এই খেলা চলে নিতি মানুষের মাঝে—
অপরার ভুল, পরা যে শিখায় সংগতি সব কাজে।
জ্ঞানাভিমানীর জ্ঞানের গরিমা—বলাভিমানীর বল—
সৃষ্টি রাখিতে ঠেকে শিখাইতে প্রকৃতির এই ছল।
'মরা'-'মরা' বলে জানি সেই যুগে বাল্মীকি পেলো 'রাম,'
সব অভিমান শেষ হলে জ্ঞানী লভে বাঞ্ছিত ধাম।
যুগে যুগে এলো সাধকেরা কতো এই পৃথিবীর মাঝে,
তাঁহাদের মুখনিঃসৃত বাণী আজো শুনি হেথা বাজে—
'রোগ-শোক ভরা এই ধরাতেই স্বর্গ গড়িতে পারো
তার আগে কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মাৎসর্যেরে ছাড়ো।'
অজ্ঞানতা ও তামসিকতার বেড়াজালে ধরা পড়ি
মোহের রঙেতে রাঙা করে আঁখি সকলে বিচার করি।
সূর্যের আলো চাঁদে আলো দেয়—সে নহে চাঁদের আলো,
মন যা ভাবায়—চোখ যাহা দেখে—সবি কি সত্য ভালো?
রাতের আঁধারে দড়ি দেখে যদি সাপ বলে মনে হয়,
যে দেখে তারি তো মনের বিকার—দড়ি কভু সাপ নয়।
মহাপুরুষেরা বলে গেলো তাই—"স্বরূপ চিনিতে শেখো,
যার যেই রূপ সেই রূপ চিনে স্বরূপে তাহাকে দেখো।
স্বরূপেই পাবে 'সত্য'কে খুঁজে—নিজেরি ভিতরে পাবে,
চিনিলে স্বরূপ নিজেরি ভিতর গভীরেতে ডুবে যাবে।"
নিজেরে জেনে যে অপরেও জানে—মহৎ তাহারে মানি,
সকলেরি মাঝে 'সত্য'কে খোঁজে সত্যানুসন্ধানী।

বাংলার সংস্কৃতি ও প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম্-এ, সাহিত্যবিনোদ

বাংলার গঠন ও প্রকৃতি—নদীমেখলা বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। বাংলা দেশের মাটির মতো এমন শ্যামল কোমল মাটি দুর্লভ। নদীর পলিমাটিতে তৈরী বাংলা, তাই তার মাটি সরস, আর উর্বর। এই জন্যই বাংলা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। ভারতের অংশ হলেও বাঙালীর চিন্তা-ভাবনা-সংস্কৃতি স্বতন্ত্র। পুরাতনের ঐশ্বর্য তার খুবই কম। নবনব চেতনাকে আশ্রয় করে, সে নবীন জীবনস্রোতে এসে মিশেছে। বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি কি বা তার খাঁটি প্রাণধর্ম কী যার বলে বাংলার এই স্বকীয়তা, এই বৈশিষ্ট্য সেইটিই আমাদের ভালো করে বুঝে দেখা প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ বাংলার এই নিজস্ব প্রকৃতি-সম্বন্ধে বলেছেন,—

'বাংলাদেশ বিধাতার আশীর্বাদে পুরাতনের ভার হতে মুক্ত। তবে জীবন-সাধনার দায় বিধাতা তাকে বেশী করেই দিয়েছেন। তার দেশ যে পলিমাটির উর্বর ভূমি। প্রাণ এখানে ব্যর্থ হ'তে পারবে না।···প্রাণের নামে, মানবতার নামে দাবি করলে এখানে সাড়া মিল্‌বে। ···বাংলাদেশের এই উদার বিস্তৃতি দেখা যাবে সর্বক্ষেত্রে, তার শিল্পে সংগীতে সাহিত্যে সাধনায়। শাস্ত্রের বিপুল ভার নেই, অথচ কী গভীর উদার তার ব্যঞ্জনা। এদেশের কীর্তন বাউল ভাটিয়ালি প্রভৃতি গানে খুব সাদা কথায় এমন অপূর্ব মানবীয় ভাব ও রস সাধকেরা ফুটিয়ে তুলে গেছেন যে কোথাও তার তুলনা মেলে না।···

'বাংলাদেশে চিত্রে ও পাষাণ-মূর্তিতে যে প্রাণের লীলা দেখা যায় তা সর্বভাবে পুরাতন শাস্ত্র ও বৃথা ভার হ'তে মুক্ত। অথচ তাতে নূতন পুরাতন এদিক ওদিকের সবরকম জীবন্ত উপকরণগুলি প্রাণশক্তির রহস্যময় কৌশলে সংগত হয়েছে, তার মধ্যে কোনটা বাদ দিলে প্রাণধর্ম ও বাংলাদেশের সাধনার স্বধর্ম ক্ষুণ্ণ হবে।···বাংলার সকল সাধনাতেই রয়েছে প্রাণের একটি সহজ আবেদন। বাংলার সংগীত শিল্পকলা সর্বত্রই এই সত্যকেই আমরা দেখ্‌তে পাই।···

'মাধুর্যের সঙ্গে এদেশের চিরযোগ। নীরস শুষ্কপথ এদেশের নয়। জলপথের পথিক আমরা, শুষ্ক ধূলোর পথে চল্‌তে পারিনে। আমাদের পথও সরস জীবন্ত জলধারা, সর্বত্র সে প্রাণ সঞ্চার করে, শুকিয়ে মারবার নীতি সে জানে না।··· এদেশ মানবের দেশ। বাঙালী মানুষকেই জানে। দেবতাকেও সে ঘরের মানুষ করে নিয়েছে। বাংলার শিবদুর্গায় বাঙালী চরিত্রেরই প্রকাশ। গঙ্গাগৌরীর কোন্দলে আমাদের ঘরোয়া ঝগড়া। ভালো-মন্দ সব নিয়েই শিব আমাদের আপন মানুষ। বাঙালীর রাম বাল্মীকির রাম নন। আমাদের কৃষ্ণকেও শাস্ত্রে খুঁজে পাইনে। অথচ আমাদের জীবনের মধ্যে তাঁকে খুবই দেখতে পাই। দেবতায় মানুষে এখানে কোনো অনৈক্য নেই। মানবতাধর্মই যে আমাদের ধর্ম—একথা আমি দেশবিদেশে উচ্চকণ্ঠেই ঘোষণা করেছি।'

বাঙালী জাতি—বাংলার কথা বল্‌তে গেলে ভারতবর্ষকে বাদ দেওয়া চলে না। ভারতবর্ষ যেন সপ্তস্বরা বীণা, বাংলা তার মধ্যে যেন বিশিষ্ট একটি

সুর। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বৈচিত্র্যের মধ্যে সুরসংগতির সাধনাই ভারতের বিশেষ সাধনা, নানা বিরোধের মধ্যে সমন্বয়সাধনাই ভারতের ব্রত। ভারতে এসেছে নানা জাতি, নানা সংস্কৃতি। উঁচু নীচু সব ধর্ম-সাধনাই পাশাপাশি রয়েছে। ভারতের মহাপুরুষেরা নানা বিরোধের মধ্যে যোগ-সাধন করেছেন। এই যোগের সাধনার নামই মধ্যযুগের সাধকদের ভাষায় 'ভারতপন্থ'। এই সমন্বয়চেষ্টা যুগে যুগে হয়েছে, এবং বাংলার দান তাতে কম নয়। ভারতের বহুতন্ত্রী বীণায় একটি বিশিষ্ট সুর সংযোগ করলেও নিজ অন্তঃপ্রকৃতির গুণেই বাংলা ভারতীয় সাধনার ক্ষেত্রে আপন স্বাতন্ত্র্যে যে বিশিষ্ট হয়েই আছে। এই স্বাতন্ত্র্যই বাংলার সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য দুইই বহন করে এনেছে। বাঙালী চরিত্রের কী বৈশিষ্ট্য যার জন্যে বাঙালী পুরোপুরি ভারতীয় না হয়ে বাঙালীই রয়ে গেল—এই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য বুঝতে হলে বাঙ্গালীর জাতিতত্ত্ব আগে নির্ণয় করা দরকার। কিন্তু এমন কোন ঐতিহাসিক উপাদান নেই যার সাহায্যে সহজেই এ কাজ সম্পন্ন হতে পারে। কতকগুলি অনুমানের উপর নির্ভর করে পণ্ডিতেরা এই জাতিতত্ত্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে ভারতে নানা জাতির মিশ্রণ চলেছে বহু প্রাচীন কাল থেকেই, এবং এই বহু মিশ্রণের ফলে নানা জাতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি একত্র গ্রথিত হয়ে নানা বিরোধ ও বৈচিত্র্যের মধ্যে শেষ পর্যন্ত একটি সমন্বয়ের সূত্র খুঁজে পেয়েছে। সুতরাং যদি কেউ বিশুদ্ধ আর্যরক্তের গর্ব করেন, তিনি যে ভ্রান্ত সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি?

ভাষাতত্ত্ব থেকে এইটুকু অনুমান করা যায় যে, বাংলাদেশে আর্যভাষা প্রসারের আগে অষ্ট্রিক জাতীয় ভাষা ও দ্রাবিড় ভাষাই ছিল এ দেশের ভাষা। ভারতে অষ্ট্রিক জাতীয় লোকেরাই যে একটি লক্ষণীয় সভ্যতার পত্তন করেন, এ বিষয়ে বহু পণ্ডিত একমত। 'গঙ্গা' নামটি অষ্ট্রিক জাতির শব্দ বলেই ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতি বাবু মনে করেন। সুনীতি বাবুর মতে উত্তর ভারতের সভ্য কৃষি-জীবী অষ্ট্রিকেরাই পরে কিছু পরিমাণ দ্রাবিড় ও অল্পসল্প আর্যদের সহিত মিশ্রিত হয়ে হিন্দুজাতিতে পরিণত হয়। উত্তর ভারত তথা বাংলাদেশের অধিবাসীরা দ্রাবিড় তথা আর্যরক্তে ও সভ্যতায় প্রভাবান্বিত অষ্ট্রিক জাতি। ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, অষ্ট্রিক জাতির লোকেরা সরল, নিরীহ, শান্তিপ্রিয়, ভাবুক, কামপ্রবণ, কল্পনাশীল, অলস ও দৃঢ়তা-বিহীন, ও সংঘশক্তিতে হীন ছিল। অন্যপক্ষে দ্রাবিড়েরা অষ্ট্রিকদের অপেক্ষা সভ্য ও সংঘ-শক্তিতে পূর্ণতর ছিল বলেই মনে হয়। অষ্ট্রিকেরা গ্রামীণ সভ্যতার পক্ষপাতী ছিল, আর নাগরিক সভ্যতার দিকেই প্রবণতা ছিল দ্রাবিড়দের।

মহেন-জো-দাড়োর প্রাচীন কীর্তি দ্রাবিড় সভ্যতারই নিদর্শন। বিষ্ণু, শ্রী, শিব, উমা, মুখ্যতঃ দ্রাবিড়দেরই দেবতা। দ্রাবিড় সাহিত্য থেকে দ্রাবিড় চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে মনে হয় যে দ্রাবিড়েরা কর্মঠ অথচ ভাবপ্রবণ, অধ্যাত্মশিল্পী ও সংগঠনশীল জাতি ছিল। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় এই দুই সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছিল সব চাইতে বেশী। বাংলাদেশের ভৌগোলিক নামের মধ্যে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় শব্দের সন্ধান মেলে। ভাষাতত্ত্বের বিচারে মনে হয় এখন থেকে আড়াই হাজার বৎসর আগে অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় জাতি বাংলায় বসবাস করতো। তখনও এদেশে আর্য অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষার প্রসার হয়নি।

খৃঃ পূঃ ১৫০০ শতকে আর্যেরা ভারতে আসেন বলে কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান। যা'হোক উত্তর ভারত থেকেই সুরু হয় আর্য অভিযান। আর্যেরাই বৈদিক ধর্ম ও দেবতাবাদ প্রচার

করেন। আর্যদের ভাষা ক্রমে ক্রমে সমস্ত উত্তর ভারতে বিহার পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনার্য জাতি আর্যের ভাষা ও ধর্ম মেনে নিলেন, কিন্তু তাদের সংস্কৃতি নিঃশেষ হয়ে গেল না। আর্য সভ্যতার সঙ্গে সংমিশ্রণ হলো অনার্য ধর্ম ও সংস্কৃতির—এই দুয়ে মিলে হিন্দু সভ্যতার পত্তন হলো। আর্যের ভাষা হলো এই সংস্কৃতির বাহন। খৃঃ পূ ৩০০ থেকে খৃঃ জন্মের পর ৫০০ অব্দ পর্যন্ত বাংলা দেশে আর্যসভ্যতার সংক্রমণ চলে; ফলে বাংলাদেশ আর্যসভ্যতার ঐতিহ্যকে গ্রহণ করে। এইরূপে উত্তর ভারতের আর্যকৃত অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড়ের মিলনে বাঙালী-জাতির সৃষ্টি হয়। বাংলার অধিবাসী মুখ্যতঃ অনার্য। আর্যরক্ত উত্তর ভারতে পূর্বেই মিশ্রিত। সেই মিশ্রিত রক্তের সঙ্গে অষ্ট্রিক বাঙালীর যেটুকু রক্ত-সংমিশ্রণ হলো, তাতে বাঙালী পেল একটি নূতন মানস প্রকৃতি, একটি বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। আর্য discipline বা আর্য নিয়মাচারকে বাঙালী পুরোপুরি কোনকালে গ্রহণ করে নি। তাদের আপন মৌলিকতা—যা তার আদিম অষ্ট্রিক ও দ্রাবিড় রক্তের দান—সেই ভাবুকতা, সেই কল্পনাশীলতা ও হৃদয়-প্রবণতা আর্য-সংস্কৃতির মাধ্যমে বিশিষ্ট হয়েই দেখা দিল। বাংলার মাটিই এই জন্য কম দায়ী নয়। এই মিশ্রণের ফলে বাঙালীর মানস-প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনবদ্য ভাষায় যা বলেছেন তাই এখানে উদ্ধৃত করছি:

'গঙ্গা ও সাগরের সংগম ঘটেছে এই দেশে। উত্তরের আর্য ও দক্ষিণের দ্রাবিড় সংস্কৃতি মিলিত হয়েছে এই বাংলার সাধনক্ষেত্রে। এই দেশ তাই নানা দিক দিয়ে মিলনের ক্ষেত্র। দিন ও রাত্রি মেলে সকাল ও সন্ধ্যায়। সেইরূপ সন্ধ্যার মিলন ক্ষেত্র যেমন ধ্যানযোগের সময়, বাংলা দেশের মিলনতীর্থে রয়েছে তেমনি বহু তপস্যার জন্য প্রতীক্ষা। কোন লঘুতা চপলতা এখান চলবে না। এখানকার উপযুক্ত সাধনা হলো ব্যাহৃতি মন্ত্র ভূর্ভুবঃ স্বঃ। অর্থাৎ স্বর্গ মর্ত্য অন্তরীক্ষ বিশ্বচরাচরে বিস্তৃত হোক আমাদের ধ্যান। কাজেই এখানে শাস্ত্রগত বা সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার স্থান নেই।'

বাংলাভাষা ও সংস্কৃতি—বাংলার বৈশিষ্ট্য তার জীবন-সাধনার মধ্যে এ কথা সত্যি—কিন্তু ভাষা তার মস্ত বড় একটা বাহন—সুতরাং ভাষাকে অর্থাৎ তার জীবন-সাধনার একটা বিশিষ্ট বিকাশকে আমাদের ভালো করে জানা দরকার। আমরা দেখতে পাই বিজেতৃ জাতির মর্যাদা নিয়ে আর্য-ভাষা সারা উত্তর ভারতে যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, তখনও বাংলা আপনার আদিম সংস্কৃতি ও দ্রাবিড়-অষ্ট্রিক মিশ্রিত ভাষার মাধ্যমে আপন সত্তাকে প্রকাশ করে চলেছে। বাংলাদেশ আর্য ঐতিহ্যকে গ্রহণ করেও পুরোপুরি আর্য হয়ে উঠলো না। সংস্কৃত-ভাষায় গ্রথিত বেদ-পুরাণাদি পণ্ডিত সমাজে অবশ্য স্বীকৃত হলো, সংস্কৃত চর্চাও শুরু হলো, কিন্তু যা ব্যবহারিক, যা জনগণের ভাব-প্রকাশের বাহন—তা সৃষ্টি হওয়া একটু সময়-সাপেক্ষ। একটা জাতির অভ্যুত্থানের মত ভাষারও সৃষ্টি হয়—নানা ভাঙ্গা-গড়া ও বিবর্তনের ভিতর দিয়ে তার প্রচার ও প্রসার। আজ যে বাংলা ভাষার গৌরব আমরা করি, তা কিন্তু আসলে সংস্কৃত থেকে আসেনি, এসেছে মাগধী-প্রাকৃত ও প্রাকৃতের অপভ্রংশ থেকে। অবশ্য পরবর্তী কালে সংস্কৃতের আওতায় বর্ধিত হয়ে সংস্কৃতের শব্দ-ভাণ্ডার থেকে অজস্র সম্পদ আমরা আহরণ করে নিয়েছি। ভাষার ইতিহাসে এ নূতন নয়। যাহোক বাংলা ভাষার পত্তন হলো এমনি করেই। তারপর বৌদ্ধ প্রচারকদের

হাতে এই প্রাচীনতম বাংলা ভাষার মাধ্যমে দোঁহাবলী দোঁহাকোষ প্রচার ও সাহিত্যসৃষ্টি হ'তে লাগলো। অবশ্য বৌদ্ধদোঁহার ভাষার সঙ্গে আজকের বাংলাভাষার বিরাট অমিল দেখা গেলেও এ-কথা অস্বীকার করা চলে না যে, বাংলা ভাষার কাঠামো সেই আমলেই তৈরী হয়েছিল। বৌদ্ধ মহাযান ও জৈনবাদ পাশাপাশি বাংলায় স্থান পেয়েছে। মহাযান সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ গুরু জন্মেছেন এই বাংলাদেশে। নালন্দা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যক্ষ শীলভদ্র বাংলাদেশেরই ছেলে। শান্তরক্ষিত, দীপংকর, শ্রীজ্ঞান. অতীশ—সবই বাংলায় জন্মেছেন। আর্যপূর্ব বহু সংস্কৃতি ক্রমে ক্রমে পূর্বদিকে এসে স্থান পেলো—সেইগুলিই পরে জৈনধর্মের সাথে মিশে বাংলায় পাহুড় দোঁহা প্রভৃতি মরমীবাদের সৃষ্টি হলো। মহাযান বৌদ্ধধর্মেও দেখা গেল যে মানুষই সব—এই দেহেই বিশ্বলোক—"অসরির কোই সরিরহি লুক্কো" (—দোঁহাকোষ)

অথবা—

এথু সে সুরসুরি জমুনা
এথু সে গঙ্গাসা অরু।
এথ সে বা আগ বনারসি
এথু সে চন্দ দিবা অরু।

(অর্থাৎ এই দেহেই গঙ্গা-যমুনা সাগর সংগম, এই খানেই প্রয়াগ বারাণসী, এই খানেই চন্দ্রদিবাকর।)—মহাযান বৌদ্ধদের মত পরবর্তী জৈনধর্মে কায়াযোগ প্রেমসাধনাই বড় হয়েই দেখা দিল। লক্ষ্য করলে এই দোঁহাকোষের মধ্যেই বাংলাভাষার প্রথম পত্তনের সূচনা পাওয়া যাবে।

পাল ও সেনরাজাদের আমলে বাংলা সংস্কৃতির একটা মোটামুটি ভিত্তি স্থাপিত হলো। নানা সভ্যতা, নানা ভাবধারার সংমিশ্রণের ফলে বাংলা তার নিজের বিশিষ্ট পথ ক্রমাগত খুঁজে নিল—সে পথ হচ্ছে মানবতার পথ, তথাকথিত ধর্মের ঐকান্তিক বিধিনিষেধ কণ্টকিত জীবনযাত্রা নয়। এর পর বাংলার বুকের উপর দিয়ে বয়ে গেল প্রবল তুর্কী আক্রমণের ঝড়। মুষ্টিমেয় তুর্কী পারসিক ও পাঞ্জাবী মুসলমান যারা রয়ে গেল বাংলার বুকে, বাঙালীর সাহায্যেই তারা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো বাংলায়। বাঙালী রমণী বিয়ে ক'রে' তারাও বাঙালী হয়ে গেল দুই তিন পুরুষেই। অনেক হিন্দু, অনেক বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্তরিত হলেও বাংলায় যে মুসলমান ধর্মের প্রচার হলো, তা ঠিক কোরাণের খাঁটি ইসলাম নয়। বাংলাদেশে ইসলামের সুফীমতেরই বেশী প্রাধান্য। সুফীমত বাংলার চিত্তধর্মের ঠিক বিরোধী ছিলনা বলেই প্রাকৃতজনের সাথে সুফীমতবাদের একটা আপোষরফা হয়ে গেল। পরবর্তীকালে যে বাউল ও সহজিয়া সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়, তার মধ্যে দেখ্‌তে পাই হিন্দুর শিষ্য মুসলমান, মুসলমানের শিষ্য হিন্দু—এমনি করে শিষ্য-পরম্পরা নেমে এসেছে। বাংলাদেশেই এই সহজ মিলনটি সম্ভবপর হয়েছে, কারণ বৈদিক কর্মকাণ্ড মধ্যযুগেও বাংলায় তেমন করে' প্রচারিত হয়নি। সপ্তম শতকে শংকরাচার্য তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক) হয়ে পূর্ববঙ্গের পথে কামরূপ যান—বাংলায় বৈদিক ধর্ম বা শাংকর অদ্বৈতবাদ ঐ যুগে বেশী প্রচারিত হয়েছিল বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালে অবশ্য বাংলার বুধমণ্ডলী বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদ বা দর্শন আলোচনায় মনীষার পরিচয় দিয়েছেন। ১৩০০ থেকে ১৬০০ শতকের মধ্যে বাংলায় বিশেষ করে শাস্ত্রচর্চা শুরু হয়। বাঙালীর বুদ্ধির প্রকাশ যেমন নব্য ন্যায় ও স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে দেখা যায়, অদ্বৈতবেদান্তে তেমনি দেখা যায় মধুসূদন সরস্বতী, আগমবাগীশ কৃষ্ণানন্দ প্রমুখ ভাষ্য ও টীকাকারগণের মধ্যে।

(ক্রমশঃ)

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত]

New York
19 W. 38th St.
Jan. 25th, 1898

ভাই শশী

বহুকাল পরে তোমাকে পত্র লিখিতেছি, তজ্জন্য ক্ষমা করিবে। শরৎ মাতৃভূমি দর্শনে যাত্রা করিয়াছে। এ পত্র পৌঁছিবার আগে শরৎ পৌঁছিবে। শরতকে ও আমাকে তুমি এক পত্র লিখিয়াছিলে of course (অবশ্য) বহুকাল পূর্ব্বে। সেই পত্রের তারিখ 13th Oct. 1897. সেই পত্র আমি পাইলাম Jany (1898) মাসে। ইহা পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ হইল তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। ইচ্ছা করে যে সর্ব্বদাই উহা পাঠ করি। ভাই, মধ্যে মধ্যে যদি ঐ রকম দুটো সুখের দুঃখের কথা লেখ তাহ'লে বড়ই সুখী হই। আমার ঘাড়ে এত কাজ পড়িয়াছে যে চিঠি লিখিবার অবকাশ নাই। ক্রমাগত lecture, lecture. (বক্তৃতা, বক্তৃতা)। বাবা! আর পারা যায় না। তোমরা ঠেলেঠুলে পাঠিয়ে দিলে এখন আমি শালা খেটে মরি। যাহা হউক সকলি তোমারি ইচ্ছা বলে মনকে প্রবোধ দিই। তোমার কার্য্যকলাপ ও বক্তৃতাদির বিবরণ পাঠে বড়ই সুখী হইয়াছি। আমার ইচ্ছা যে তুমি এখানে এসে একবার লেগে যাও, দেখে প্রাণটা ঠাণ্ডা হউক। শরৎ ছিল, মধ্যে মধ্যে দেখা হ'ত। তাহাও ঠাকুরের প্রাণে সইল না। এখানকার লোকে বেদান্তের ভাবগুলি গ্রহণ করিতে বিশেষ প্রস্তুত। এখানে উদার ভাবের বড়ই আদর। উদার ভাবের তরঙ্গ উঠিয়াছে এবং উহার ঢেউ প্রধান প্রধান church (গির্জা)-এ লাগিতেছে। পরিণাম যে ভাল হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। Missionary (ধর্মযাজক) ও গির্জ্জাওয়ালারা উঠে পড়ে লেগেছে। নরেনের বিরুদ্ধে প্রায় প্রত্যেক Paper (কাগজ)-এ কিছু না কিছু থাকিবেই থাকিবে। * * * ইহাতে আমাদের কার্য্যের কতকটা ক্ষতি হইয়াছে। "From Colombo to Almora" নামক পুস্তকে নরেনের সমস্ত কথা না ছাপাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছাড়িয়া দিয়া ছাপাইলে অতি সুন্দর হইত। যা হবার তা হয়েছে। ভবিষ্যতে যেন এরূপ ভুল না হয়। আলাসিঙ্গা প্রভৃতিকে একটু সাবধান করিয়া দিও। আলাসিঙ্গা আমাকে প্রায়ই পত্র লিখিত। এক্ষণে বুঝি চটে গেছে। তাহাকে ও অপরাপর বন্ধুগণকে আমার ভালবাসা দিও। Miss Waldo (মিস্ ওয়াল্‌ডো) তোমাকে নরেনের London address (লণ্ডনে বক্তৃতা) এক set (খণ্ড) পাঠাইয়া দিয়াছে। * * গুপ্ত যখন মাদ্রাজে ছিল একটি ফটো পাঠাইয়াছিলাম, তাহা কি হইল জান কি? নরেন এক্ষণে কোথায় ও কেমন আছে? Goodwin (গুড্ উইন) এক পোষ্ট কার্ড Miss Waldo-কে লিখিয়াছে। তাহাতে নরেন্দ্রের Diabetes (বহুমূত্র) আবার চাগিয়াছে—ইহা লিখিয়াছে। ইহা কি সত্য? আমেরিকার সমস্ত কাগজে ছাপিতেছে যে "Swami Vivekananda is seriously ill. etc :" (স্বামী বিবেকানন্দ কঠিন ভাবে পীড়িত)। Goodwin মধ্যে মধ্যে ঐরূপ যে লেখে তাহা কতদূর সত্য জানিতে ইচ্ছা।

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

শরতের সঙ্গে Miss Ole Bull (মিস্ ওলি বুল) এবং Miss McLeod (মিস্ ম্যাক্লাউড) India (ভারতবর্ষ) দেখিতে গিয়াছে। আমার class-এ আজকাল লোক বড় মন্দ হয় না। লায়েক ছেলেই বল আর মাতব্বর পণ্ডিতই বল কিছুই কিছু নয়। আমি একটি ঘর ভাড়া করিয়া থাকি। আর একটি boarding house (ভোজনাগার)-এ আলুসিদ্ধ অথবা গাজরসিদ্ধ খাইয়া দিনাতিপাত করিতেছি। আমি Strict Vegetarian, (সম্পূর্ণ নিরামিষাশী) মাছ মাংস ছুঁই না। এখানকার climate (জলবায়ু) খুব ভাল বলিয়া টিঁকে আছি। London হইলে মারা যেতুম। অরুচি দাঁড়াইয়াছে। এবারকার শীত বড়ই mild (মৃদু)। Snow fall (তুষারপাত) নাই বলিলেই হয়। তবে February মাসে কি হয় বলা যায় না। আমি অভয়ানন্দকে[১] দেখি নাই। তাহার চেলা কে তা জানি না। কৃপানন্দ[২] এক্ষণে বেদান্তের এবং নরেনের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছে। যোগানন্দ হুজুগপ্রিয়, crystal gazing, thought reading etc. করে বেড়াচ্ছে। অতি মূর্খ, *** সরল কিন্তু common sense (সাধারণ বুদ্ধি) বড়ই অল্প। এখানে জনকতক খুব sincere (আন্তরিক) বলে বোধ হয়। Miss Waldo বুড়ো বয়সে সংস্কৃত শিখিতে কোমর বেঁধে লেগে গেছে। খুব অধ্যবসায়। * * * তোমার পত্রের খুব প্রশংসা করে। * * * শরতের মুখে সকলই শুনিবে, আমার লেখা বাহুল্যমাত্র। সত্য কথা বলে চলে যাব যাহার ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিবে। Intellectually (বুদ্ধি দিয়া) অনেকেই বেদান্ত গ্রহণ করে থাকে কিন্তু practically (বাস্তবক্ষেত্রে) বড়ই কঠিন—ঐ দশা সকলেরই।

"পুণ্যস্য ফলমিচ্ছন্তি পুণ্যং নেচ্ছন্তি মানবাঃ।
ন পাপং ফলমিচ্ছন্তি পাপং কুর্বন্তি যত্নতঃ।"

সেইরূপ বেদান্তের ফল অনেকে চায় কিন্তু অতি অল্প লোকেই উহা practise (অভ্যাস) করিতে চায়। Female education (স্ত্রী-শিক্ষা) সম্বন্ধে নরেন্দ্র কি কোন রকম movement start (আন্দোলন শুরু) করেছে? সত্বর সবিশেষ লিখিবে। Miss Muller কি করছে? মাতাজীর Girls' School (বালিকা বিদ্যালয়) কেমন চলছে? Gandhi[৩] বেদান্তের against এ (বিরুদ্ধে) বক্তৃতাদি দিয়া পয়সা উপায়ের চেষ্টায় আছে। তাহার রঙ্গ বেরঙ্গের পোষাক দেখে অবাক্। Dharmapala[৪] হিন্দুদের যৎপরোনাস্তি নিন্দা করে পলায়ন করেছে। Annie Besant এর চেলারা বিবেকানন্দের নিন্দা না করে জলগ্রহণ করে না। মিশনারীরা "Vivekananda and his Guru" বলে এক পুস্তিকা ছাপাইয়াছে, তাহা কি দেখিয়াছ? উহা এখানকার সকলের নিকট পাঠাইতেছে। উহা "The Christian Literature Society for India, London & Madras" হইতে ছাপান হইয়াছে। উহার এক কপি লয়ে যদি review (সমালোচনা) করে Brahmavadin এ ছাপাতে পার তাহলে বড় ভাল হয়। শ্রীশ্রীগুরুদেবের বিরুদ্ধে যাচ্ছেতাই করে লিখেছে। এই ত এখানকার সমস্ত খবরই দিলাম। তুমি আজকাল কেমন আছ? তোমার গায়ের সেইগুলি কিরূপ অবস্থায় আছে লিখিবে। আমার ভালবাসা ও নমস্কারাদি জানিবে এবং শ্রীশ্রীমাকে আমার অসংখ্য অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ দিবে। ইতি Yours Kali. (তোমার কালী)।

শরতের Photo (আলোকচিত্র) সাণ্ডেলের নিকট হইতে বোধ হয় এতদিনে পাইয়াছ। আমার photo চাহিয়াছিলে, পাঠাইলাম।

১ স্বামী বিবেকানন্দের জনৈকা মার্কিণ শিষ্যা
২ স্বামী বিবেকানন্দের জনৈক আমেরিকান শিষ্য
৩ বীরচাঁদ গান্ধী
৪ অনাগারিক ধর্মপাল

জড়-বিজ্ঞানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব

শ্রীসুবীর বিজয় সেনগুপ্ত

এ জগৎযন্ত্রে ঈশ্বরের স্থান কোথায় জিজ্ঞাসা করা হলে ফরাসী জ্যোতিবিদ লাপ্লেস বলেছিলেন, "ঈশ্বর নামক পদার্থের অস্তিত্ব কল্পনা করা আমার প্রয়োজন হয় নি।" আধুনিক বিজ্ঞানের সেটা ছিল প্রাথমিক যুগ, দর্শনের সীমানা ছেড়ে বিজ্ঞানের বেরিয়ে আসার সন্ধিক্ষণ। তখনকার ইউরোপীয় দার্শনিকেরা পৃথিবীকে সারা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলে ধরে নিয়ে এ জগৎযন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন যেটা ছিল বৈজ্ঞানিক ভাবধারার পরিপন্থী। বিজ্ঞান তাই তার নিজস্ব পথ বেছে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এই নূতন ভাবধারার পরিপোষক হয়ে কেউ কেউ প্রাণও হারিয়েছিলেন।

পৃথিবীকে সারা ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র বলে ধরে নেওয়ার অবৈজ্ঞানিক যুক্তির বিরুদ্ধে প্রথম আনুষ্ঠানিক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন কোপারনিকাস। তিনি বলেছিলেন যে পৃথিবী গতিহীন ত নয়ই বরং এর দু'প্রকারের গতি তাঁর গবেষণায় ধরা পড়েছে। একটা, পৃথিবীর নিজ মেরুদণ্ডকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট সময়ে ঘোরা ও অপরটা তার সূর্যের চারিদিকে নির্দিষ্ট সময়ে একবার পরিক্রমণ করে আসা। অবশ্য কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তগুলি দোষমুক্ত ছিল বলা চলে না। কারণ তাঁর মতে পৃথিবীর সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসার অক্ষপথ বৃত্তাকার ও সূর্যের অবস্থিতি এই বৃত্তের কেন্দ্রে, যা পরে ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। এটা পরে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর অক্ষপথ ডিম্বাকার বা elliptical ও সূর্য পৃথিবীর অক্ষপথের ভিতরে একপাশে অবস্থিত। সে যাই হোক্ কোপারনিকাসই প্রথম বলেছিলেন যে এ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে পৃথিবী-গ্রহের মূল্য খুবই কম। পৃথিবীর চেয়ে বহুগুণে বড় গ্রহনক্ষত্র অনেকগুলো রয়েছে। আবার আমাদের সৌরজগতের মত জগৎ আরও আছে। এ অসীম শূন্যে আমাদের সৌরজগৎ মোটেই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। গ্রহ-উপগ্রহ-সমন্বিত সূর্য কোন এক তারকাগোষ্ঠীর অন্তর্গত একটি অতি নগণ্য জ্যোতিষ্ক ছাড়া কিছুই নয় এবং এরূপ তারকাগোষ্ঠীও এ ব্রহ্মাণ্ডে শুধু একটি নয়, অসংখ্য।

এর পর গেলিলিও জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাচীন ধারণাগুলিতে এক বিপ্লব নিয়ে এলেন তাঁর নতুন আবিষ্কৃত দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে। বহু অভিনব তথ্যও তিনি আবিষ্কার করলেন। সৌর-জগৎ যে পৃথিবী-কেন্দ্রিক নয়, সূর্য-কেন্দ্রিক, কোপারনিকাসের এই মত তিনি তো সমীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করলেনই—এ ছাড়া আরও তিনিই প্রথম জানালেন যে বৃহস্পতিগ্রহেরও পৃথিবীরই মতো উপগ্রহ আছে। চন্দ্রে ঠিক এখানকারই মতো পাহাড় আছে, এবং সূর্যে তিনি কয়েকটি কালো চিহ্নের সন্ধান পেয়েছেন। খ্রীষ্টান ধর্ম-যাজকদের কাছে এসব আবিষ্কার বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বের বিরোধী বলে অসহ্য অপরাধ রূপে মনে হয়েছিল যার ফলে গেলিলিওকে এ অপরাধের জন্যে ক্ষমা চেয়ে পরিত্রাণ পেতে হয়।

দার্শনিক কান্টই সর্বপ্রথম প্রণালীবদ্ধভাবে নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর উৎপত্তিতত্ত্বের একটা পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন যে, আমাদের দৃষ্টিসীমার

অন্তর্গত সবগুলো নক্ষত্রই এক গোষ্ঠীভুক্ত যার নাম ছায়াপথ বা নেবুলা। আমাদের সৌরজগতের গ্রহউপগ্রহাদির মত এই তারকাগোষ্ঠীরও পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ আছে। আদিতে এরা সকলেই ছিল এক বাষ্পীয় পদার্থ। পরে নানা কারণে এদের ঘনত্ব বেড়ে যায় এবং ঘনপদার্থটি খুব জোরে ঘুরতে থাকে, ফলে এ গ্রহনক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়। এসব সিদ্ধান্তের গাণিতিক ভিত্তি দুর্বল ছিল বলে পরে এর কিছুটা পরিশোধন করা হয়। লাপ্লেস বলেন যে, আদি বাষ্পীয় পদার্থের ঘনত্ব বেড়ে যাওয়ায় এর কেন্দ্রাপসারী বা সেন্টি্রফিউগাল শক্তির প্রভাবে প্রথমে নক্ষত্রাদির সৃষ্টি হয়েছিল। পরে একই পদ্ধতিতে গ্রহ ও উপগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে।

কোন একটা বস্তু দেখলেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, 'কে এর সৃষ্টিকর্তা? কোন এক জন সৃষ্টিকর্তা না থাকলে ত এটা সৃষ্ট হতে পারে না।' ধরুন, কলম হাতে নিয়ে এরূপ প্রশ্ন উঠলো। এর উত্তর হিসেবে আমরা প্রধানতঃ দু'টি কারণ পাই। উপাদান এর একটি কারণ আর এর কারিগর দ্বিতীয় কারণ। কলমের ক্ষেত্রে উপাদান পৃথিবীতে প্রথম থেকেই আছে। অতএব প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ায় কারিগর। কারণ উপাদান থাকলেও কারিগর না থাকলে ত কলমটি আমাদের হাতে আসত না। এবার আমাদের চিন্তার ক্ষেত্র সারা ব্রহ্মাণ্ডে প্রসারিত করে দিলে ঠিক এরূপ একজন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। কারণ এক্ষেত্রেও একজন সৃষ্টিকর্তা না থাকলে ত জগৎ তার বর্তমান রূপ পেতে পারত না। নাস্তিক দার্শনিকরা এর উত্তরে বলেন যে শুধু উপাদানই এ বিশ্বের আদি কারণ। যে সৃজনীশক্তির জন্যে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করি সে শক্তি উপাদানগুলির একটা আভ্যন্তরীণ স্বভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। এর জন্যে পৃথক একজন কারিগর—'ঈশ্বরের' কোন প্রয়োজন নেই। বিজ্ঞানও এ যুক্তি প্রচ্ছন্নভাবে মেনে নিয়েছিল। পূর্বোল্লিখিত লাপ্লেসের জগৎব্যাখ্যায় তাই ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় নি।

এরপর জগতের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার নানা পরিবর্তন ঘটেছে। জ্যোতির্বিদেরা এতদিন যে জগতের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন প্রায় সেরূপ আরেকটি জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে—অতি ক্ষুদ্র পরমাণু জগৎ। পদার্থের পরমাণু (atom)রূপী যে সূক্ষ্মতম অংশকে অবিভাজ্য বলা হত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড দেখিয়ে দিলেন যে সেটা মোটেই অবিভাজ্য নয়। একেও ভাঙতে পারা যায়। পদার্থের সেই সূক্ষ্মতম অংশ বা পরমাণুতে তিনি সৌরজগতের অনুরূপ আর একটি জগতের অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন। আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে সেই অতি ক্ষুদ্র জগতেরও একটা গাণিতিক ব্যাখ্যা আছে। রাদারফোর্ডের এ আবিষ্কারে বিজ্ঞানজগতের প্রসারতা আরও অনেকটা বেড়ে গেল। দেখা গেল যে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে যে গ্রহ নক্ষত্রাদির জগৎ ঠিক সেরূপ অসংখ্য জগৎ পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ পরমাণুতেও রয়েছে। সৌরজগতের শৃঙ্খলা যেরূপ আকর্ষণী শক্তির আয়ত্তাধীন, পরমাণুজগতেও প্রায় সেরূপ আকর্ষণী শক্তির প্রভাব। এবার পদার্থবিজ্ঞানীরা পরমাণুজগতের প্রতি বিশেষ মনোযোগ দিলেন। পরমাণুজগতের বহু নতুন তথ্য আবিষ্কার হতে লাগল। কিন্তু দেখা গেল, যে গতিবিজ্ঞান বা ডাইনামিক্সের সাহায্যে গ্রহনক্ষত্রাদির জগৎকে ব্যাখ্যা করা যায় পরমাণুজগতে সেরূপ পারা যায় না, অনেক কিছুই অমীমাংসিত থেকে যায়। এছাড়া নক্ষত্রজগতেরও কতকগুলো ঘটনাকে পুরনো ডাইনামিক্সের

সাহায্যে ব্যাখ্যা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ালো। বিজ্ঞানের এরূপ থম্‌কে দাঁড়ানো অবস্থায় আইনষ্টাইন এক নতুন ব্যাখ্যা নিয়ে এর সমাধান করতে এগিয়ে এলেন।

প্রতিটি বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের আলোচনা হয় দেশ ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে। এতদিন দেশ ও কালের পরিমাপকে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে নিত্য (absolute) বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। আইনষ্টাইন বল্‌লেন যে দেশ ও কালের পরিমাপ আমাদের নিযুক্ত মাপকাঠির উপরই নির্ভর করে। কাজেই দেশ ও কালের ধারণা আপেক্ষিক। দেশের ধারণা নির্ভর করে পরীক্ষকের (observer-এর) গতির উপর আর কালের পরিমাপ নির্ভর করে তার বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়ার উপর।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে একটি লম্বা ধাতব টুকরোকে যদি খুব বেশী গতিশীল অবস্থায় নেওয়া যায় ও তার গতিরেখার উপর খাড়া অবস্থায় টুকরোটির মাপ নেওয়া হয় এবং পরে টুকরোটিকে গতির একই রেখায় রেখে তার দ্বিতীয়বার মাপ লওয়া হয় তা'হলে দুটি মাপ এক হয় না। দ্বিতীয় মাপ প্রথমের চেয়ে কিছুটা কম হয়। সাধারণ অবস্থায় ব্যবহারিক জগতে আমাদের এ তারতম্যটুকু চোখে পড়ে না। কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণায় এটাকে অবহেলা করা যায় না।

দু'টি জায়গার দূরত্ব মাপতে হলে আমরা সাধারণতঃ স্কেল ব্যবহার করি। কিন্তু এক্ষেত্রে স্কেলের পাশাপাশি দাগের দূরত্ব নির্ভর করবে স্কেলটির গতি ও অবস্থানভঙ্গীর উপর। কাজেই কোন এক বিশেষ দূরত্ব দুজন লোকের দু'টি বিভিন্ন স্কেলের দু'টি বিভিন্ন গতি ও বিভিন্ন অবস্থানভঙ্গীর উপর নির্ভর করবে। একই দূরত্ব দু'জন লোকের কাছে তাই দু'টি বিভিন্ন রাশিতে প্রকাশিত হতে পারে। পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে কোন এক বিশেষ দূরত্ব আমাদের কাছে যা মনে হবে অন্য কোন গ্রহস্থ জীবের তা মনে হবে না। যদি কোন এক গ্রহের গতি সেকেণ্ডে ১৬১,০০০ মাইল হয় তাহলে সঙ্কোচনের পরিমান হবে প্রায় অর্ধেক। ৮" ইঞ্চি দীর্ঘ একটি বস্তুর সঙ্কোচনের পর দৈর্ঘ থাকবে ৪" ইঞ্চি। আবার আমাদের কাছে যে গ্রহের গতি সেকেণ্ডে ১৬১,০০০ মাইল, সেই গ্রহে যদি বুদ্ধিমান জীব থাকে তা'হলে তাদের কাছে যে আবার আমাদের পৃথিবীর গতি সেকেণ্ডে ১৬১,০০০ মাইল! কার গতি ঠিক তাত বোঝার কোন উপায় নেই। কাজেই দূরত্বের ধারণা নিত্য নয়, আপেক্ষিক। দূরত্বের কোন একটি মাপকাঠিকেই নিত্য বলে ধরে নেওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন গতিশীল পরীক্ষকের কাছে তাই দেশ পরিমাপের কাঠামো বিভিন্ন।

কাল সম্বন্ধেও আমরা একই সত্যে উপনীত হই। আমাদের ধারণা—কাল একটি নিরপেক্ষ নিত্য বস্তু, আমাদের অনুভূতির উপর এটা নির্ভরশীল নয়। কিন্তু আসলে তা নয়। যদি আমাদের কোন এক যুবক বন্ধু প্রচণ্ড গতিশীল যানে আরোহণ করে পৃথিবী থেকে বহু দূরের কোন এক গ্রহে গিয়ে বেড়িয়ে আসে তা'হলে সে এসে দেখবে যে আমরা বৃদ্ধ হয়ে বসে আছি যদিও তার নিজের শরীরে জরার কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নি। আমাদের অনুভূতিতে যে সময় ষাট বা সত্তর বছর তার অনুভূতিতে সেটা হয়ত দশ বছর। এর কারণ, আমাদের সৌভাগ্যবান বন্ধুর বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া আমাদের চেয়ে মন্থর।

আমরা যখন কোন বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বস্তু থেকে আসা আলোই আমাদের সেই বস্তুটির ধারণা জন্মিয়ে দেয়; অর্থাৎ

আমাদের সম্বন্ধ বস্তুটির সঙ্গে নয়, বস্তুটি থেকে বেরিয়ে আসা আলোর সঙ্গে। বহু বছর আগে কোন এক দূরবর্তী তারকা থেকে সেখানকার তথ্যরাশি বহন করে যে আলোর তরঙ্গ রওনা হয়েছিল তা এতদিন ভ্রমণের পর আমাদের পৃথিবীতে এসে পৌঁছেছে। এই আলোর মাধ্যমে আমরা তারকার বহু বছর আগের ঘটনাটি এখন প্রত্যক্ষ করছি। কাজেই আমাদের কাছে যেটা বর্তমান, তারকাটির কাছে তা অতীত। অতীতের বহু ঘটনার স্মৃতি বহন করে আলোতরঙ্গ মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে। আমরা যদি আলোর গতির কয়েক লক্ষ গুণ অধিক গতিশীল যানে আরোহণ করে সেই আলোর পিছনে ধাওয়া করি তা'হলে কয়েক লক্ষ বছর আগের পৃথিবীর নানা ঘটনা আমাদের দৃষ্টিতে ভেসে উঠবে। কাজেই আমাদের সাধারণ অনুভূতির অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে পারস্পরিক স্বাতন্ত্র্য নেই।

উপরোক্ত বিচারগুলি থেকে আইনষ্টাইন্ তাঁর আপেক্ষিকতত্ত্বের গোড়াপত্তন করেন। তাঁর মতে দেশ ও কালের পরিমাপ স্বতন্ত্র বিচারে আপেক্ষিক। কিন্তু দেশ-কালের সমন্বয়ের কাঠামো সকল পরীক্ষকের কাছে সকল অবস্থাতেই সমান।

এরপর মিন্‌কাউস্কি দেশের তিনটি মাত্রার সঙ্গে কালের এক মাত্রা যোগ করে চতুর্মাত্রিক সত্তার সৃষ্টি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে বহু অমীমাংসিত তথ্যের উত্তর পাওয়া যেতে লাগল। মহাকর্ষ (Gravitation) সম্বন্ধে গাণিতিক বিচার করে আইনষ্টাইন্ বল্‌লেন যে, মহাকর্ষ আসলে টানাটানির ব্যাপারই নয়। দেশ এবং কাল অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশে তৈরী হয়েছে একটি চতুর্মাত্রিক সত্তা (Time-Space Continuum : দেশের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং বেধ এই তিন মাত্রা+কাল এক মাত্রা)। এই সত্তার মধ্যে যদি কোথাও কোন জড় পদার্থ না থাকে তবে তার হয় সাম্যাবস্থা এবং বিস্তার হয় অনন্ত। কিন্তু এই শূন্যের ভিতরে একবার জড়ের আবির্ভাব ঘটলে শূন্য আর অনন্তবিস্তৃত থাকে না; উহা হয়ে পড়ে সান্ত। যেখানেই জড়পিণ্ডের অবস্থান সেখানেই তার আশেপাশের সত্তা যেন বেঁকে চুরে যায়। এক গতিশীল পদার্থ যখন অপর কোন পদার্থজনিত এরূপ বাঁকাচোরার মধ্যে এসে পড়ে তখন আর ঋজুভাবে চল্‌তে পারে না, বাঁকাচোরার রকম অনুযায়ী তার গতিপথও হয়ে পড়ে কুটিল। গ্রহনক্ষত্রের কক্ষপথ রচনার উহাই আসল কারণ।

আইনষ্টাইনের এই চতুর্মাত্রিক সত্তার আবিষ্কারে বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা আবার অব্যাহত গতিতে বয়ে চল্‌ল।

যদি আমরা একটা ঢিল আকাশের দিকে ছুঁড়ে মারি তা'হলে কিছুক্ষণ পরে ঢিলটি মাটিতে ফিরে এসে আঘাত করে। ঢিলটির মাটিতে পড়ার জায়গায় যদি কোন স্থিতিস্থাপক (elastic) বস্তু না থাকে তা'হলে ঢিলটা অনেক ক্ষেত্রে ভেঙ্গে চুরমার হয়, একটা শব্দ উত্থিত হয় ও জায়গাটি কিছুটা উত্তপ্ত হয়। আকাশে থাকা অবস্থায় ঢিলটির যে 'সমষ্টিগত একতা' (organised property) ছিল তা বদ্‌লে যায় অর্থাৎ এর সংগঠনী শক্তি বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এর অণুপরমাণুগুলি একটি বিশৃঙ্খল অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যে সব পদার্থ তাপ বিকীরণ করে তাদেরও আভ্যন্তরীণ অবস্থা অনবরতই বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হয় ও তাদের শক্তি বেরিয়ে এসে অসীম শূন্যে মুক্ত অবস্থায় মিলিয়ে যায়।

থারমডাইনামিক্সের দ্বিতীয় সূত্র বলে যে, প্রতিটি উচ্চতাপবিশিষ্ট বস্তুই তার আশেপাশের অপেক্ষাকৃত নিম্নতাপবিশিষ্ট বস্তুকে তাপ বিলিয়ে

দিয়ে সারা ব্রহ্মাণ্ডে একটি 'তাপের সাম্যাবস্থা' সৃষ্টি করছে। এই সূত্র থেকেই এটা সিদ্ধান্ত করা যায় যে সময় যতই বয়ে যাচ্ছে আমাদের এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পদার্থের বিশৃঙ্খলতাও ততই বেড়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে, আমরা যতই অতীতের দিকে পিছিয়ে যাই ততই পদার্থের 'সমষ্টিগত একতা'র (organised property-র) বৃদ্ধি লক্ষ্য করি। এভাবে উত্তরোত্তর পিছিয়ে গেলে আমরা পদার্থের এমন একটি অবস্থা লক্ষ্য করব যেখানে পদার্থের বিশৃঙ্খলতা মোটেই থাকবে না। কিন্তু পদার্থের সেই আদিম সুসম অবস্থা সৃষ্টির জন্যে এক্ষেত্রে এক জন সৃষ্টিকর্তার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। Eddington এ সম্বন্ধে বলেছেন, "There is no doubt that the scheme of Physics as it has stood for the last three quarters of a century postulates a date at which either the entities of the universe were created in a state of high organisation or pre-existing entities were endowed with that organisation which they have been squandering ever since. Moreover, this organisation is admittedly the antithesis of chance. It is something which could not occur fortuitously......... It has been quoted as scientific proof of the intervention of the creater at a time not infinitely remote from today. But I am not advocating that we draw any hasty conclusions from it. Scientists and theologians alike must regard as somewhat crude the naive theological doctrine which (suitably disguised) is at present to be found in every text book of thermodynamics, namely, that some billions of years ago God wound up the material universe and has left it to chance ever since.........It is one of those conclusions from which we can see no logical escape—only it suffers from the drawback that it is incredible.*

জড়বিজ্ঞান ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে বলে কোন সিদ্ধান্ত সত্যিই করা যায় না। তবে প্রচ্ছন্নভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব বিজ্ঞানকে মেনে নিতে হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আরও উন্নত অবস্থায় হয়তো আমরা এ বিষয়ে স্পষ্টতর সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারব।

* ভাবার্থ :—

গত ৭৫ বৎসর ধরে পদার্থবিজ্ঞানের যে ধারা চলছে তা থেকে বিশ্ব-প্রকৃতির এমন একটা অতীতের আভাস পাওয়া যায় যখন সব বস্তুই অত্যন্ত সুসম্বদ্ধ অবস্থায় সৃষ্ট হয়েছিল। সেই আদিম সংহতি—যা তারপর থেকেই নষ্ট হতে আরম্ভ হয়েছে 'আকস্মিকতা'র ঠিক বিপরীত জিনিস। আপনা আপনি ঐ সংহতি কখনো ঘটে নি। তবে কি বিশ্বপ্রকৃতির সেই প্রথম অবস্থায় সৃষ্টিকর্তা এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছিলেন? কেউ কেউ এইটাকেই ঈশ্বরের বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলে উদ্ধৃত করেন। আমি এইরূপ কোন ত্বরিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলছি না। এইরূপ সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানী এবং ধর্মশাস্ত্রবিদ্‌গণেরও কাছে 'অপরিণত' বলে মনে হবে। অবশ্য থার্মডিনামিক্স-এর বইতে আজকাল এই রকম প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত দেখা যায় যে, কোটি কোটি বছর আগে ভগবান যেন জড়প্রকৃতিকে গুটিয়ে নিয়ে তারপর আকস্মিক গতিপথে ছেড়ে দিয়েছেন।...ন্যায়-যুক্তির দিক দিয়ে এ সিদ্ধান্ত দুর্বার, যদিও এর ত্রুটি এই যে, এটা আমরা বিশ্বাসে আনতে পারি না।

অর্বুদা দেবী

স্বামী দিব্যাত্মানন্দ

রাজপুতানার মরুভূমিতে সুবিখ্যাত আবু পাহাড়ের শুদ্ধ নাম অর্বুদ পর্বত। এই পর্বতের একটি গুহার মধ্যে 'অর্বুদা দেবী' বিরাজমানা। (অব্বর দেবীও বলা হয়)। এই দেবীর নাম হইতেই পাহাড়ের নাম হইয়াছে 'অর্বুদ পর্বত'। কেহ কেহ বলেন, যেমন শরীরের যে কোন স্থানে বর্ধিত মাংসপিণ্ডকে আব (টিউমার) বলা হইয়া থাকে সেইরূপ রাজস্থানের মরুভূমিতেও এই পাহাড়টি অস্বাভাবিক ভাবে সৃষ্টি হইয়া আবের মত দেখায় বলিয়াই ইহার নাম অর্বুদ পর্বত। মরুভূমির বালুকারাশির মধ্যে ফলেফুলে সুশোভিত গাছপালা, লতাগুল্ম, ছোট ছোট ঝরণা ও হ্রদ সমন্বিত সুদৃশ্য এই পাহাড়টি অতি স্বাস্থ্যকর স্থানও বটে। পশ্চিম ভারতের বহু লোক এখানে বায়ুপরিবর্তনে আসিয়া থাকেন। রাজাদের স্বাস্থ্যনিবাস আছে। দিল্‌বারা মন্দির অদ্যাবধি জৈনধর্মের অক্ষয়কীর্তি প্রদর্শন করিতেছে। পর্বত চূড়ার নাম 'গুরুশিখর'। তথায় একটি মন্দিরে গুরু দত্তাত্রেয়ের শ্রীপাদুকা পূজা হয়। আবু পাহাড়ের উচ্চতা প্রায় চার হাজার ফুট।

আবু পাহাড় সম্বন্ধে একটি ইতিবৃত্ত আছে :—

পাহাড়ের তিন মাইল দূরে বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। পুরাকালে ঐ অঞ্চল সমতল ও মুনিঋষিদের তপোভূমি ছিল। একবার বশিষ্ঠদেবের প্রিয় কামধেনু নন্দিনী, আশ্রমের কিয়দ্দূরে একটি গর্তে পড়িয়া যায়। মুনিবর তাঁহার কামধেনুকে দেখিতে না পাইয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন। বহু অনুসন্ধানের পর ঐ গর্তের ভিতর নন্দিনীকে দেখিতে পাইলেন বটে, কিন্তু তাহাকে কি উপায়ে উদ্ধার করিবেন কিছুই ঠিক করিতে পারিলেন না। নন্দিনী বলিল, প্রভো! আপনি সরস্বতীর বন্দনা করুন। তিনি আসিলেই আমি উদ্ধার হইব। বশিষ্ঠদেব সরস্বতীর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া গর্তে প্রবেশ করিলেন। নন্দিনী উদ্ধার হইল বটে, কিন্তু সরস্বতী আর উঠিতে পারেন না, ঐ গর্তেই আবদ্ধ হইয়া রহিলেন। সরস্বতী তখন ঋষিবরকে বলিলেন, আপনি আমায় উদ্ধার করুন। বশিষ্ঠদেব করযোড়ে বলিলেন, মা! আপনি আজ্ঞা করুন কি উপায়ে আপনাকে উদ্ধার করিব। সরস্বতী বলিলেন, হিমালয়ের এক ছেলে এখানে আসিলেই আমি উঠিতে পারিব। মুনিবর হিমালয়ের নিকট সব ঘটনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার এক ছেলের জন্য প্রার্থনা করিলেন। হিমালয় বলিলেন, ঋষিবর, আপনার আদেশ শিরোধার্য করিলাম। যে কোন ছেলেই আপনার কাজে যাইতে পারে, আমার কোনই আপত্তি নাই। তবে আজকাল ছেলেরা বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আমার বশ নয়। বশিষ্ঠ একে একে সকলকেই জিজ্ঞাসা করিলেন। একমাত্র ছোট ছেলে নন্দিবর্ধন বলিল, প্রভু, আমি আপনার কাজের জন্য প্রস্তুত আছি, তবে আমি পঙ্গু। বশিষ্ঠদেব তাহাকে দেখিয়া খুবই চিন্তান্বিত হইয়া ভাবিলেন যে এমতাবস্থায় তাহাকে কি করিয়া লইয়া যাইবেন। নন্দিবর্ধন মুনিবরের মনোভাব বুঝিতে পারিয়া বলিল, চিন্তার কোনই কারণ নাই। আপনার আশ্রমের নিকটে আমার

বিশেষ বন্ধু নাগরাজ নামে এক জন সদাশয় রাজা আছেন। তাঁহাকে বলিলেই তিনি আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন। বশিষ্ঠদেব নাগরাজের নিকট আসিয়া সকল ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন করিলে নাগরাজ বলিলেন, 'ঋষিবর! আপনার কাজের জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত ; তবে আমার একটি নিবেদন আছে। তাহা রক্ষা করিতে হইবে। আমি হিমালয়ের ছেলেকে কাঁধে করিয়া আনয়নপূর্বক গর্তে প্রবেশ করিলেই সরস্বতী উদ্ধার হইবেন নিশ্চিত—কিন্তু তাহাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। আমার ছেলেদের একটা ব্যবস্থা করিলেই আমি আপনার আদেশ পালন করিতে পারি'। বশিষ্ঠদেব বলিলেন, 'হ্যাঁ, তাহার ব্যবস্থা হইবে।' অতঃপর নাগরাজ হিমালয়ের ছেলেকে আনিয়া গর্তে প্রবেশ করিলেন। সরস্বতী মুক্ত হইয়া কচ্ছভূজের দিকে সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর মরুভূমির বালুকারাশিতে তিনি মিশিয়া গেলেন। অদ্যাবধি তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে গর্ত ভরিয়া গেল। কেবলমাত্র নন্দিবর্ধনের নাকটি জাগিয়া রহিল। ঐ নাকই বর্তমান আবু পাহাড় নামে খ্যাত। নাগরাজের মৃত্যু হওয়ায় পূর্ব প্রতিশ্রুতি-অনুসারে বশিষ্ঠদেব নাগরাজের চারি পুত্রকে একটি যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত করিয়া ঐ নূতন রাজ্য তাহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। পরিহর, শোলাঙ্কি, পরমার ও চৌহান—এই চারি জন নাগরাজের পুত্র। ইঁহারাই রাজপুতগণের পূর্বপুরুষ। ইঁহারা ঋষিদের যজ্ঞানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই 'অগ্নিকুল' নামে পরিচিত।

এদিকে আশ্রমে ঋষিগণ বশিষ্ঠদেবকে বলিলেন, 'এখানে আমরা আর থাকিব না। এবারে হিমালয়ে যাইয়া তপস্যাদি করিব স্থির করিয়াছি। কারণ হিমালয়ে ফলফুলের কোনই অভাব নাই।' তিনি বলিলেন, 'আচ্ছা, আমি এই পাহাড়কেই হিমালয়ের মত করিয়া দিতেছি।' অতঃপর ঋষিবর নানারকমের বৃক্ষ-লতা, আম, জাম, লিচু ও খেজুর প্রভৃতি সুমিষ্ট ফল ও সুগন্ধিযুক্ত ফুলের গাছ এবং প্রস্রবণাদি সৃষ্টি করিলেন। তাহাতেও ঋষিগণ সন্তুষ্ট হইলেন না—বলিলেন, 'হিমালয় শিবের স্থান, সেইখানেই আমরা যাইব'। তখন উপায়ান্তর না দেখিয়া মুনিবর বিশ্বনাথের বহু স্তবস্তুতি করিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'প্রভো! দয়া করিয়া আপনি এই পাহাড়ে আগমন করুন'। শিব বলিলেন, 'আমার যাওয়া অসম্ভব'। বশিষ্ঠদেব তাহাতেও পশ্চাৎপদ না হইয়া বিশেষভাবে শিবের আরাধনা করিতে লাগিলেন। পরিশেষে শিব সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, 'আমি যখন তাণ্ডব-নৃত্য করিব, তখন আমার পায়ের গোড়ালী ওখানে উঠিবে।' এই ঘটনা হইতেই অচলেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা হয়। শিবের নাম হইতেই ঐ স্থানের নাম হয় 'অচলগড়'। ইহা আবু বাজার হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।

রাজস্থানের ইতিহাসে আছে, ঋষিগণ অর্বুদ পর্বতশিখরে তপস্যা করিতেন। তাঁহারা বনের ফলমূলে জীবন ধারণ করিতেন। দৈত্যগণ তাঁহাদের তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাইত। তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিগণ যজ্ঞাদি করিলেন। তাহাতে দৈত্যগণ দমন হওয়া ত দূরের কথা বরং তাহাদের অত্যাচার আরও বাড়িয়া গেল। ইহাতেও ঋষিগণ আপন আপন ধর্মকর্ম হইতে বিরত না হইয়া হোমানল জ্বালিয়া শিবধ্যানে রত রহিলেন। ঐ হোমানল হইতে এক সুপুরুষের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ তাহার 'পরিহর' নামকরণ করিয়া তাহাকে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাহার দ্বারা কোনই কাজ সফল হইল না। পর পর আরও দুই ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাহাদের নাম হইল 'শোলাঙ্কি' ও 'পরমার'। তাহারাও ঐ কার্যে নিযুক্ত হইল।

কিন্তু তাহাদের কেহই ঋষিদের এই বিপদ হইতে মুক্ত করিতে সমর্থ হইল না। একে একে সকলেই এইভাবে অকৃতকার্য হয়। উপায়ান্তর না দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বেদমন্ত্রোচ্চারণে হোমানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শস্ত্রধারী এক বীরপুরুষ আবির্ভূত হইল। ঋষিগণ তাহাকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া 'চৌহান' নামকরণে শত্রুনিধনে আদেশ করিলেন। সেই সময় মুনিগণ সুফলাভিলাষে কালিকাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। মা স্তুতিতে সন্তুষ্টা হইলেন এবং সিংহ-বাহিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া অভয়বাণী প্রদান-পূর্বক তিরোধান করিলেন। মহামায়ার শুভাশীর্বাদে 'চৌহান' দৈত্যগণকে নিহত করিয়া শান্তি স্থাপন করিল। অতঃপর ঋষিগণও নিশ্চিন্তমনে ব্রহ্ম-ধ্যানে তৎপর হইলেন। ঐ চার পুরুষ অগ্নি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই উহাদের অগ্নিকুলোদ্ভব বলিয়া আখ্যা দেয়া হইয়া থাকে। ইহাদেরই বংশধরগণ রাজপুত নামে পরিচিত। আর ঐ দেবীই তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী বা ইষ্টদেবীরূপে পূজা গ্রহণ করিতেছেন। তিনিই অর্বুদা দেবী।

সেই অবধি পরমার রাজগণ এই আবু পাহাড়ে রাজত্ব করিতেছিল। ইষ্টদেবীকে পাহাড়ের মনোরম স্থানে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য পূজার্চনা করিত। অনন্তর তাহাদের রাজশক্তির হ্রাস হয়। সেই সময় জৈনধর্মের খুবই প্রতিপত্তি হইয়াছিল। গুজরাটের জৈনধর্মাবলম্বী রাজার মন্ত্রী এই পার্বত্য রাজ্য অধিকার করেন। পরমাররাজ উক্ত রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির জন্য প্রস্তাব করিলেন। মন্ত্রী বলিলেন, 'ওখানে জৈনধর্মের মন্দির করিতে দিলে রাজ্য ফিরাইয়া দিতে পারি।' রাজা তাহাতেই রাজী হইলেন। মন্ত্রী ঐ অর্বুদা দেবীর মন্দিরের নিকটে জৈন মন্দির নির্মাণ করিলেন। উহাই বর্তমানে 'দিল্‌বারা' মন্দির নামে বিখ্যাত। কিছুকাল পরে পরমার বংশীয় জনৈক রাজা দেবীকে অপর এক পাহাড়ের গুহায় স্থাপন করেন। ঐ গুহাতেই বর্তমানে অর্বুদা দেবীর পূজা-অর্চনা হইতেছে। পূর্ব দেবী-মন্দির অদ্যাবধি দিল্‌বারা মন্দিরের পশ্চাতে ধ্বংসাবস্থায় বর্তমান।

জৈন ধর্মের 'অর্বুদ পুরাণে' আছে,—বশিষ্ঠদেবের আবু পাহাড়ে তপস্যাকালীন এক দিন তাঁহার কামধেনু গর্তে পড়িয়া যায়। উঠিবার কোনই উপায় নাই দেখিয়া নিজের দুগ্ধে গর্তটি ভরিয়া উপরে চলিয়া আসে। কিন্তু ঐ গর্ত মানুষ ও জীবজন্তুর পক্ষে বিপদের খুবই আশঙ্কা হইয়া রহিল। তজ্জন্য উহা পূরণ করিবার মানসে বশিষ্ঠদেব হিমালয়ের নিকট তাঁহার ছোট ছেলে নন্দিবর্ধনকে প্রার্থনা করিলেন। নন্দিবর্ধন পঙ্গু ছিল। বশিষ্ঠদেব অর্বুদ নামে এক বিশাল সর্পের সাহায্যে তাহাকে আনয়ন করিলেন। কিন্তু সর্পের সহিত এরূপ প্রতিশ্রুতি ছিল যে, ঐ স্থানের নাম নন্দিবর্ধন না হইয়া অর্বুদ হইবে। সর্প নন্দিবর্ধনসহ গর্তে প্রবেশ করিল। গর্ত ভরিয়া গেল। কেবলমাত্র নন্দিবর্ধনের নাকটি জাগিয়া রহিল। উহাই পাহাড়ে পরিণত হয়। পূর্ব সর্তানুসারে ইহার নাম হইল অর্বুদ পর্বত। কেহ কেহ ইহাকে নন্দিবর্ধন পর্বতও বলিয়া থাকেন। প্রবাদ এই যে, ঐ সর্প ছয় মাস পরে পরে এক বার পাশ পরিবর্তন করে, তাই আবুতে ভূমিকম্প হয়।

আবার জৈন শাস্ত্রে আছে, ভগবান ঋষভদেব ও তীর্থঙ্কর নেমিনাথ পূজ্যপাদ-দ্বয়ের দর্শনার্থে অর্বুদ অর্থাৎ দশ কোটি ঋষি ঐ স্থানে তপস্যায় রত ছিলেন। তাই এই পাহাড়ের নাম অর্বুদ পর্বত।

কেহ কেহ বলেন, ঋষভদেব ও নেমি-নাথের সেবার্থে প্রত্যেক বস্তু যাহা অর্পিত হইত তাহার (পুণ্য) ফল অর্বুদ গুণ অর্থাৎ দশ কোটী গুণ দাতা বা সেবক পাইত-- ইহ ও পরলোকে। এই জন্যই পাহাড়ের নাম হয় অর্বুদ পর্বত। .

আবু রোড ষ্টেশন হইতে রেলপথে সিদ্ধপুর প্রায় ত্রিশ মাইল। ঐ স্থানেই অম্বাদেবীর আদি মন্দির ছিল। এক সময় দেশের শান্তি রক্ষার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণগণ মায়ের সম্মুখে যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই সময় মুসলমানগণ আক্রমণ করে। পূজারীদের মধ্যে কেহ কেহ মায়ের উৎসববিগ্রহসহ পলায়নপূর্বক ঘোর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া স্বধর্ম রক্ষা করে এবং পাহাড়ের গুহায় মায়ের পূজা-অর্চনা করিতে থাকে। এই মূর্তিই অম্বাদেবী নামে বর্তমানে পূজিত ও খ্যাত। এই দেবীস্থান আবু রোড ষ্টেশন হইতে প্রায় বার মাইল—বাসে যাইতে হয়।

এদিকে শত্রুপক্ষ মায়ের মূল বিগ্রহ ধ্বংস করিয়া ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে এবং অবশিষ্ট ব্রাহ্মণগণকে বলপূর্বক মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করে। অনতিকাল পরে তাহারা পুনরায় হিন্দুধর্মে দীক্ষিত হইবার জন্য ব্রাহ্মণগণের নিকট অভিমত প্রকাশ করে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহাতে রাজী হন নাই। এই কারণে অদ্যাবধি তাহারা ব্রাহ্মণদের জল পর্যন্ত স্পর্শ করে না। বর্তমানে তাহারা 'বোহরা' নামে পরিচিত। তাহাদের নাম ও আচার-ব্যবহার হিন্দুদের ন্যায় কিন্তু নিজেদের মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাহারা নামের পরিবর্তন করিতেছে। তাহারা সংখ্যায় খুবই কম। এই অল্প সংখ্যক লোকই সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতেছে। বিবাহাদি ক্রিয়াকর্ম এই সমাজের মধ্যেই হইয়া থাকে। এমন কি প্রত্যেকেই প্রত্যেককে নানাভাবে সাহায্য করিয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কেহই অভুক্ত থাকিতে পারে না। পরস্পরে কাজকর্মের ব্যবস্থাদি করিয়া দেয়। যাহাদের খাওয়ার কোনই সংস্থান নাই তাহাদের জন্য লঙ্গর (ছত্র) আছে। দিনান্তে যাইয়া আহার করিয়া আসে। এই সব তাহাদের সমাজ হইতেই ব্যবস্থা আছে।

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

তোমারি চরণে এনেছি আজিকে—নিঃশেষে মোরে নাও,
আকাশ-আবরী নিশি-বিভাবরী, হে তপন! তুমি চাও।
আগলবিহীন মোর খোলা দ্বার—
তোমার আসন করো অধিকার,
সকল গভীরে অমল রবিরে কিরণে আজি বিছাও;
তোমারি চরণে এনেছি আজিকে—নিঃশেষে মোরে নাও।

স্বর্ণ-উদয় অস্ত-গোধূলি এনেছি অর্ঘে তুলি',
পাবক-গরিমা আঁধার-আরতি সুর তব যায় খুলি'।
টোটে কুসুমিকা ফুলের বাঁধন
ভোলে অভিসারী কূলের কাঁদন,
জানি হয় সোনা গানে তব হাসি অতল অশ্রু—তা-ও;
তোমারি চরণে এনেছি আজিকে—নিঃশেষে মোরে নাও।

কর্ণেল টড্-মহারাণা কুম্ভ-মীরাবাঈ

শ্রীব্যোমকেশ ভট্টাচার্য, সাহিত্যভূষণ

মীরাবাঈর জীবনীলেখক ও নাট্যকারগণ অধিকাংশই রাজস্থানের ইতিহাসপ্রণেতা কর্ণেল টড্ সাহেবের অনুসরণ করিয়া মীরাবাঈ জীবনী ও নাটক লিখিয়াছেন। মহারাণা কুম্ভ মীরাবাঈর স্বামী, পরন্তু মহারাণা কর্তৃক মীরা প্রপীড়িতা হইয়াছিলেন—ইত্যাদি লেখকগণের প্রধান বিষয়বস্তু। রাজস্থানের ইতিহাস রচনায় টড্ সাহেবের অবদান যথেষ্ট। ভারতবাসী সেজন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। তবে এক জন বিদেশী লেখকের পক্ষে প্রকৃত বিষয়বস্তু সংগ্রহ করা কত দূর সম্ভব তাহা ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া যে সব ইতিহাস রচিত হইয়াছে—তাহার প্রকৃত তথ্য উদ্‌ঘাটন করা প্রত্যেক ভারতবাসীর কর্তব্য।

কর্ণেল টড্ Annals of Mewar গ্রন্থে (৩০৩ পৃষ্ঠা) লিখিয়াছেন—মহারাণা কুম্ভ মেড়তার রাঠোর কুমারীকে বিবাহ করেন। মীরাবাঈ তৎকালে সৌন্দর্য ও কবিত্বে শ্রেষ্ঠ রাজরাণী ছিলেন। তাঁহার সংসর্গে তাঁহার পতি গীত-গোবিন্দের টীকা লিখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন··· ইত্যাদি। টড্ সাহেবের মীরাবাঈর জীবন-বৃত্তান্ত—বাঙ্গালী সাহিত্যিক ও নাট্যকারগণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। রাজস্থানের ইতিহাস ও পরবর্তীকালের রাজস্থানের খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণের গবেষণা হইতে দেখা যাউক—মহারাণা কুম্ভ মীরাবাঈর পতি পরন্তু কর্ণেল টডের যুক্তি সমর্থজনক কি না?

"বীর বিনোদ" বলিতেছেন যে টড্ সাহেব মীরাবাঈকে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী লিখিয়াছেন—তাহা ঠিক নহে। যেহেতু রায় যোধাজী ১৪৫৮ খৃষ্টাব্দে যোধপুর প্রতিষ্ঠা করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে মহারাণা কুম্ভের দেহান্ত হয়। ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে রায় দুদাজী যোধাবতের মেড়তা-প্রাপ্তি ঘটে। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণা সাঁগা ও রায় দুদাজীর দুই পুত্র রায়মল ও রত্নসিংহ (মীরাবাঈর পিতা) বাবরের সহিত যুদ্ধে বীরগতি প্রাপ্ত হন। মহারাণা কুম্ভের সময়ে (জন্ম ১৪১৮—মৃত্যু ১৪৬৮) দুদাজীর মেড়তা-প্রাপ্তিই ঘটে নাই—তবে দুদাজীর পৌত্রী মীরাবাঈ মেড়তনী মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী কিরূপে হইতে পারেন? মহারাণা কুম্ভের দেহান্তের ৫৯ বৎসর পরে বাবর ও মহারাণা সাঁগার যুদ্ধে মীরাবাঈর পিতা (১৫২৭ খৃঃ) মৃত্যুমুখে পতিত হন। টড্ সাহেবের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে মহারাণা কুম্ভের সময়ে রত্নসিংহের বয়স কম পক্ষে ৪০ বৎসর হইবে। তবে রত্নসিংহের মৃত্যুকালীন বয়স এক শত হওয়া প্রয়োজন—যদি তাহাই হয় তবে এত বৃদ্ধ বয়সে সমরে সংগ্রাম করিয়া মৃত্যুবরণ কি বিশ্বাস্য ব্যাপার?

মহারাণা কুম্ভ হইতে ১০০ বৎসর পরে মীরাবাঈর খুল্লতাত ভ্রাতা জয়মল্লের মৃত্যু হয়; তাহা হইলে জয়মল্লের ভগিনী মীরা কিরূপে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী হইতে পারেন? মীরাবাঈ মহারাণা বিক্রমাজিৎ, উদয়সিংহের সময় পর্যন্ত জীবিতা ছিলেন।

টড্ সাহেব ধাঁধাতে পড়িয়া লিখিয়াছেন, মহারাণা কুম্ভ চিতোরগড়ে যে কুম্ভশ্যাম নামে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, ইহার পার্শ্বে

যে মন্দির রহিয়াছে তাহা মীরাবাঈর মন্দির নামে পরিচিত। এই দুই মন্দির পাশে পাশে থাকায় টড্ সাহেব মীরাবাঈকে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী লিখিয়াছেন। 'মীরা মাধুরী' লেখক বলিতেছেন, "রাণা কুম্ভের বিদ্বত্তা পরন্তু মীরাবাঈর কবিত্বশক্তি দেখিয়া কুম্ভের প্রতিষ্ঠিত কুম্ভশ্যাম মন্দির মীরাবাঈর মন্দির নামে খ্যাত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু দুইই প্রমাণবিহীন। দম্পতির মধ্যে যে দুই জনকেই বিদ্বান হইতে হইবে ইহার কোনো যুক্তি নাই। পরন্তু এক জন বিদ্বান হইলে অপরকেও বিদুষী হইতে হইবে—ইহাও যুক্তিবিহীন। কাহারো নির্মিত মন্দির তাহার পরবর্তীকালে অন্যের নামে প্রসিদ্ধ হইতে পারে। ইহাও অসম্ভব নহে।"

মীরাবাঈ স্বয়ং "নরসীকা মায়রা" গ্রন্থে লিখিয়াছেন—তিনি মেড়তার ক্ষত্রিয় রাজবংশের কন্যা রাঠোরবংশ-সম্ভূতা। তাঁহার বিবাহ মেবারের মহারাণার সহিত হইয়াছিল। এখন দেখা প্রয়োজন যে মেড়তায় ক্ষত্রিয় রাজত্ব কখন হইয়াছিল। রায় যোধাজীর পুত্র রায় দুদাজী—১৪৬১ ইংরেজী সালে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন ও ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে মেড়তা রাজ্যের অন্ত হয়। মাত্র ৯৩ বৎসর মেড়তা রাঠোর রাজগণের অধিকারে ছিল। ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণকারিণী মীরার ১৪৬১ খৃষ্টাব্দের পূর্বে উদ্ভব সম্ভবপর নহে। ১৪৬১ খৃঃ হইতে ১৫৫৪ খৃঃ মধ্যে জন্মগ্রহণকারিণী মীরাবাঈ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুগামী মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী কোনো প্রকারেই হইতে পারেন না।

মহারাণা কুম্ভ পঞ্চাশ বৎসরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তখন দুদাজীর প্রথম সন্তান ৬।৭ বৎসরের হইবে। মীরার পিতা রত্নসিংহের জন্ম ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে, রাণা কুম্ভের মৃত্যুর ৬ বৎসর পরে হইয়াছিল। সুতরাং মীরার রাণা কুম্ভের স্ত্রী হওয়ার নিশ্চয়তার পিছনে কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নাই।

মহারাণা কুম্ভের ইষ্টদেব 'একলিংগ' হইলেও তিনি বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তিনি গীতগোবিন্দের "রসিকপ্রিয়া" নামে টীকা লিখিয়াছেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মন্দির কুম্ভস্বামী বা কুম্ভশ্যাম নামে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের পার্শ্বেই আরো ১২টি মন্দির রহিয়াছে। ছোট একটি মন্দির মীরাবাঈর মন্দির নামে পরিচিত। এই কারণে লোকে মহারাণা কুম্ভ ও মীরাবাঈ পতি-পত্নী বলিয়া অনুমান করেন। মহারাণার গীতগোবিন্দের টীকাতে কুম্ভলদেবী ও অপূর্বদেবী নামে তাঁহার দুই রাণীর উল্লেখ রহিয়াছে। চারণ মুখে—প্যার কুঁয়র, অপরমদে, হর কুঁয়র ও নারংগদে নামে তাঁহার চার রাণীর কথা শুনা যায়। (ওঝাকৃত রাজপুতনার ইতিহাস খণ্ড ২, পৃঃ ৬৩৪) কিন্তু মীরাবাঈর নাম কোথায় নাই। পরম ভক্ত মহারাণা কুম্ভ তাঁহার সহধর্মিণী তপস্বিনী মীরাবাঈর নাম কি উল্লেখ করিতে পারিতেন না?

"মীরা মাধুরী" বলেন—রায় যোধাজীর কন্যা শৃংগার দেবীর বিবাহ—রাণা কুম্ভের পুত্র রায়মলের সহিত হয়। এই অবস্থাতে রায় যোধাজীর প্রপৌত্রী মীরাবাঈর বিবাহ মহারাণা কুম্ভের সহিত হওয়া প্রলাপ মাত্র।

"মীরা মন্দাকিনী" লেখক বলিতেছেন—মীরাবাঈকে মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী স্বীকার করিয়া তাঁহার পরম পবিত্র চরিত্রের উপর কলঙ্ক আরোপ করা হইয়াছে। পরন্তু তাঁহাকে পতিবিমুখ ও পতিদ্রোহী করা হইয়াছে। এরূপ ভ্রমপূর্ণ কথা পুষ্টিকারিগণ—অনেক পদ প্রস্তুত করিয়া তাঁহার পদাবলীতে জুড়িয়া দিয়াছেন। মীরার দ্বারা তাঁহার পতিকে এরূপ কটু বচন প্রয়োগ করা হইয়াছে যে কোনও ভারতীয় ললনা আপন পতিপ্রতি এরূপ কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে সমর্থ নহেন; যদি মহারাণা কুম্ভকে পতি স্বীকার করা যায় তবে মহারাণা

কর্তৃক এরূপ অত্যাচার সম্ভবপর নহে। যেহেতু মহারাণা স্বয়ং বিদ্বান ও পরম বৈষ্ণব ছিলেন; স্বয়ং গীতগোবিন্দের টীকা করিয়াছেন।

চিতোরগড় ভ্রমণকারী শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম. এ, বি-এল মহাশয় লিখিয়াছেন (প্রতিক আষাঢ় ১৩৫৮ বাং)—মহারাণা কুম্ভের মন্দিরে বরাহ অবতারের বিষয় বর্ণিত ছিল। ইহার দক্ষিণে মীরাবাঈর মন্দির; ইহাতে মীরাবাঈ শ্যামনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কর্ণেল টড্ লিখিয়াছেন—মীরাবাঈ রাণা কুম্ভের স্ত্রী, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে—তিনি ভোজরাজের স্ত্রী ছিলেন। রাণা কুম্ভের মন্দিরের নির্মাণকাল ১৪৪৮ খৃঃ, আর মীরাবাঈর মন্দির নির্মিত হয় ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে। প্রায় ১০০ বৎসরের পার্থক্য।

কর্ণেল টড্ সাহেবের ইতিবৃত্ত অনুসরণ করিয়া গুজরাটের গোবর্ধনরাম—মাধবরাম ত্রিপাটী তাঁহার Classical Poets of Guzrat পুস্তকে ও কৃষ্ণলাল মোহনলাল খয়েরী—"গুজরাটী সাহিত্যানো মার্গসূচক স্তম্ভো" পুস্তকে মীরাবাই—মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী লিখিয়াছেন।

রাজপুতনার প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মুন্সী দেবীপ্রসাদজী "মহকমে তয়ারীখ মেয়াড়" গ্রন্থের প্রমাণে কর্ণেল টড্ সাহেবের সব সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিয়া মীরাবাঈ ভোজরাজের যুবরাজ্ঞী প্রমাণ করিয়াছেন। মুন্সীজী লিখিত "মীরাবাঈকা জীবন চরিত্র" গ্রন্থের ৩য় পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন—"মীরাবাঈর বিবাহ ১৫৭৩ বিক্রম সংবৎ (১৫১৬ খৃঃ) রাণা সাঁগার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভোজরাজের সহিত হইয়াছিল।"

মুন্সীজীর সিদ্ধান্ত রাজস্থানের ওঝাজী, গহলৎজী, সারড়াজী প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ সমর্থন করিয়াছেন।

টড্ সাহেব রাজপুতনার ইতিহাস রচনা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পরবর্তী যুগে রাজপুতনায় বহু ঐতিহাসিকের উদ্ভব হইয়াছে। রাজপুতনা পরন্তু তৎসমীপবর্তী স্থানসমূহের ঐতিহাসিকগণ যেরূপ প্রকৃত রাজপুতনার ইতিহাস উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ—অন্যের দ্বারা তাহা সম্ভবপর নহে।

ঐতিহাসিক কালনির্ণয় পরন্তু বিশিষ্ট ঐতিহাসিকগণের সিদ্ধান্ত হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে, মীরাবাঈ মহারাণা কুম্ভের স্ত্রী কোনো প্রকারেই হইতে পারেন না। মীরাবাঈ বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব হিন্দী সাহিত্যে এক যুগান্তর সৃষ্টি করিয়াছেন। ধর্ম ও হিন্দী সাহিত্যজগতে মীরাবাঈ জয়দেব, চণ্ডীদাস, সুরদাস, কবীর প্রভৃতি সন্তের মত বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন। সুতরাং মীরাবাঈর জীবনী ও সাহিত্য আলোচনা কালে তাঁহার সম্বন্ধে প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্যের সন্ধান নেওয়া অবশ্য কর্তব্য।*

* লেখকের মীরাবাঈ গ্রন্থ হইতে প্রকাশিত।

"গোপীপ্রেমে ঈশ্বররসাস্বাদের উন্মত্ততা, ঘোর প্রেমোন্মত্ততা মাত্র বিদ্যমান; এখানে গুরু শিষ্য শাস্ত্র উপদেশ ঈশ্বর স্বর্গ সব একাকার, ভয়ের ধর্মের চিহ্ন মাত্র নাই, সব গিয়াছে—আছে কেবল প্রেমোন্মত্ততা। তখন সংসারের আর কিছু মনে থাকে না, ভক্ত তখন সংসারে সেই কৃষ্ণ, একমাত্র সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই দেখেন না, তখন তিনি সর্বপ্রাণীতে কৃষ্ণ দর্শন করেন, তাঁহার নিজের মুখ পর্যন্ত তখন কৃষ্ণের ন্যায় দেখায়, তাঁহার আত্মা তখন কৃষ্ণবর্ণে অনুরঞ্জিত হইয়া যায়।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন

অধ্যাপিকা শ্রীসান্ত্বনা দাশগুপ্ত, এম্-এ

সর্বদা পরিবর্তনশীল এই বিশ্ব-সংসারের কোথায় আরম্ভ, কোথায় অবসান—তাহা আমরা দেখিতে পাই না। এই জন্যই ইহাকে আমরা একটি রহস্য বলিয়া মনে করিয়া থাকি। এই রহস্য-ভেদে মানুষের আগ্রহ স্বাভাবিক। কেন এই পরিবর্তন? এই পরিবর্তনের রীতি নীতিই বা কি? ইহার অর্থ কি? আদিকাল হইতে মানুষ এই সকল প্রশ্ন করিয়াছে। নানা ধর্মে, দর্শনে এবং বিজ্ঞানেও এই সৃষ্টি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। পাশ্চাত্ত্য দেশে আধুনিক বিবর্তনবাদ্ (Theory of Evolution) এইরূপই একটি প্রচেষ্টা। আমাদের দেশে প্রাচীন সাংখ্যদর্শন কর্তৃক বিবৃত সৃষ্টিতত্ত্ব বহু-জন-মান্য হইয়াছে। সাংখ্য-মতে শূন্য হইতে কোনও কিছুরই সৃষ্টি হইতে পারে না। কার্য থাকিলে তাহার কারণও থাকিবে। কিন্তু কার্য ও কারণ দুটি ভিন্ন পদার্থ নয়, কারণই কার্যে বিকশিত। একই বস্তু 'অব্যক্ত' অবস্থায় কারণ এবং 'ব্যক্ত' অবস্থায় কার্য। কারণের কার্যে অভিব্যক্তিকেই আমরা বিবর্তন বলি। যাহা কিছু অভিব্যক্ত তাহা কারণে এক সময়ে বীজাকারে অথবা সুপ্তাকারে নিহিত ছিল। অভিব্যক্ত অবস্থা হইতে আবার কারণে পুনর্গুপ্তি (involution) ঘটিতে পারে। Evolution বা বিবর্তন থাকিলে involution বা ক্রমসঙ্কোচকেও থাকিতে হইবে, কারণ যাহা কিছু সৃষ্ট তাহার বিনাশ ঘটিবে। কিন্তু বিনাশ মানে নিশ্চিহ্নতা নয়—কারণে লয়। কার্য আবার গুটাইয়া কারণাকার গ্রহণ করে। অতএব, বিবর্তন ও পুনর্গুপ্তি—ইহাই সৃষ্টির মুলরহস্য। সৃষ্টির পর সৃষ্টি-ধারা চলিয়াছে, কিন্তু তাহা সরল-রেখায় নহে, তরঙ্গের ন্যায় ক্রম-প্রাপ্ত সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের উন্নতানত রেখায়। এক একটি সৃষ্টির অবস্থিতি-কালকে এক একটি কল্প (cycle) বলা হয়। অসংখ্য কল্প পুর্বে হইয়া গিয়াছে, ভবিষ্যতেও হইবে।

পাশ্চাত্ত্য দেশে বিবর্তনবাদ আবিষ্কৃত হইলে ইহা সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব আনিল। এই তত্ত্বের আলোকে ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্যে একটি পারম্পর্য, খণ্ড ও আকস্মিক পরিবর্তনের মধ্যে একটি সামঞ্জস্য দেখা গেল; ইতিহাস শুধু অর্থহীন ঘটনাপঞ্জী না হইয়া বিপুল অর্থপূর্ণ মনে হইতে লাগিল। সমাজবিজ্ঞানীরা চিরপরিবর্তনশীল সমাজের গতির রীতি ও প্রকৃতি খুঁজিয়া পাইলেন। প্রাচীন ভারতেও বিবর্তন-পুনর্গুপ্তি-তত্ত্ব তখনকার সমাজব্যাখ্যাতাগণকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। নানা গ্রন্থে তাঁহারা সমাজের পরিবর্তনের রীতি-প্রকৃতি ও ধারা সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—এই যুগাবর্তনের মধ্য দিয়া সমাজ পরিবর্তিত হয়—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। আবার কলিযুগ হইতে সত্যযুগের আবির্ভাব হইবে। এই তত্ত্বকে চক্রাকার-তত্ত্ব বা উত্থান পতনের তত্ত্ব (Theory of Cycle বা Theory of Rhythm) বলিতে পারা যায়। মনু-সংহিতায় প্রথম অধ্যায়ে (৬৯—৮৬ শ্লোক) প্রত্যেক যুগের বৈশিষ্ট্য বাখ্যা করা হইয়াছে। এই ব্যাখ্যানুসারে সত্যযুগে সকল ধর্মই সম্পূর্ণ ছিল; অধর্ম, অসত্যাচারণ ছিল না, তপস্যাই ছিল

প্রধান ধর্ম। ত্রেতায় জ্ঞানই ধর্ম, দ্বাপরের ধর্ম হইতেছে যজ্ঞ, আর কলিতে দানই ধর্ম। ত্রেতায় অধর্ম দ্বারা ধন ও অর্থদ্বারা বিদ্যাদির আগম হইতে থাকায় ধর্ম মলিন হইল। অতএব ত্রেতায় ত্রিপাদ ধর্ম, দ্বাপরে দ্বিপাদ ও কলিতে একপাদ মাত্র ধর্ম রহিল। ইহার মধ্যে একটি ক্রমাবনতির ধারণা সুস্পষ্ট। কিন্তু কলিতেও একপাদ ধর্ম অবস্থান করিল ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আধুনিক কালে ভারতবর্ষে স্বামী বিবেকানন্দ ইতিহাসের একটি ইঙ্গিতপূর্ণ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন। তাহা অনেকাংশে এই প্রাচীন তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবান্বিত। বিবেকানন্দ সমাজ-বিবর্তনের ধারা নিম্নোক্তরূপ বলিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণ যুগ ⟶ ক্ষত্রিয় যুগ ⟶ বৈশ্য যুগ ⟶ শূদ্র যুগ ⟶ ব্রাহ্মণ যুগ ⟶ এইভাবে ক্রমাগত সমাজ পরিবর্তিত হইতে থাকে। ব্রাহ্মণযুগ অর্থে আধ্যাত্মিক উন্নয়নের যুগ (ব্রাহ্মণ বলিতে বর্তমান কালের ব্রাহ্মণ জাতি বা Caste অর্থে ধরা হয় নাই)। ক্ষত্রিয়-যুগ অর্থে যে সময়ে সমাজে দেখা যায় বাহুবলের প্রাধান্য। বৈশ্যযুগে প্রাধান্য ঘটে অর্থবলের। তাহার পর শূদ্রযুগ অর্থাৎ সর্বসাধারণের অধিকারের যুগ।[১]

ইহা ছাড়া একটু ভিন্ন প্রকারে যুগাবর্তনের আর একটি ব্যাখ্যা স্বামিজী দিয়াছেন। তাহা জড়বাদের ও আধ্যাত্মিকতার ঢেউয়ের আকারে আগমন ও নিষ্ক্রমণ। ঢেউয়ের মাথা-তোলা—উন্নতি, গর্ত-সৃষ্টি—অবনতি; সমাজে আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাবে উন্নতি, উহার অবসানে অর্থাৎ জড়বাদের আবির্ভাবে অবনতি সূচিত হয়। "All progress is in successive rise and falls"[২] "Civilisation means manifestation of divinity in man"[৩] "Materialism and spirituality in turns prvail in society"[৪] অর্থাৎ, "সমস্ত উন্নতিই ঘটে ক্রমিক উত্থান-পতনের পদ্ধতিতে।"

"মানুষের মধ্যে দেবত্বের বিকাশের নামই সভ্যতা।"

১ বিবেকানন্দের নানা লেখায় এই মতের উল্লেখ দেখা যায়। তাঁহার পত্রাবলী হইতে একটি উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হইল :—

"মানব-সমাজ ক্রমান্বয়ে চারিটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়—পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেক রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্তমান। পুরোহিত-শাসনে বংশজাত ভিত্তিতে ঘোর সংকীর্ণতা রাজত্ব করে—তাঁদের ও তাঁদের বংশধরগণের অধিকার-রক্ষার জন্য চারদিকে বেড়া দেওয়া থাকে,—তাঁরা ব্যতীত বিদ্যা শিখবার কারও অধিকার নেই, বিদ্যাদানেরও কারও অধিকার নেই। এ যুগের মাহাত্ম্য এই যে, এ সময় বিভিন্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি স্থাপিত হয়—কারণ, বুদ্ধিবলে অপরকে শাসন করতে হয় বলে পুরোহিতগণ মনের উৎকর্ষ সাধন করে থাকেন।

ক্ষত্রিয়-শাসন বড়ই নিষ্ঠুর ও অত্যাচারপূর্ণ, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরা এত অনুদারমনা নন্। এ যুগে শিল্পের ও সামাজিক সভ্যতার চরমোৎকর্ষ সাধিত হয়ে থাকে।

তারপর বৈশ্যশাসন যুগ। এর ভেতরে ভেতরে শরীর-নিষ্পেষণ ও রক্তশোষণকারী ক্ষমতা, অথচ বাইরে প্রশান্ত ভাব—বড়ই ভয়াবহ! এ যুগের সুবিধা এই যে, বৈশ্যকুলের সর্বত্র গমনাগমনের ফলে পূর্বোক্ত দুই যুগের পুঞ্জীভূত ভাবরাশি চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভ করে। ক্ষত্রিয়যুগ অপেক্ষা বৈশ্যযুগ আরও উদার, কিন্তু এই সময় হতেই সভ্যতার অবনতি আরম্ভ হয়।

সর্বশেষে শূদ্রশাসন-যুগের আবির্ভাব হবে—এ যুগের সুবিধা হবে এই যে, এ সময়ে শারীরিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিস্তার হবে, কিন্তু অসুবিধা এই যে, হয়ত সভ্যতার অবনতি ঘটবে। সাধারণ শিক্ষার পরিসর খুব বাড়বে বটে, কিন্তু সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা ক্রমশঃই কমে যাবে।"

(পত্রাবলী ২য় ভাগ, ৬৫ নং পত্র)

২ Jnana Yoga

৩ Conversations & Dialogues

৪ Paramakudi Lecture

"সমাজে জড়বাদ ও অধ্যাত্মবাদ একের পর এক আসে।"

বিবেকানন্দের মতে শ্রীবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে জড়বাদের প্রভাব ভারতবর্ষে বিশেষ প্রকট হইয়াছিল। তখন 'ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ', চার্বাক দর্শনের এই ঘোষণা দেশে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল। শ্রীবুদ্ধ আবির্ভূত হইয়া অধ্যাত্মবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন। আবার প্রায় সহস্র বৎসর পরে শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের পূর্বেও এই দেহাত্মবাদের ভাব ভারতবর্ষকে প্রায় গ্রাস করে; শঙ্করাচার্য উপনিষৎ-নির্দিষ্ট বেদান্তধর্মের বহুল প্রচার দ্বারা দেশকে সেই সঙ্কট হইতে রক্ষা করেন। অতএব Rhythm অথবা ঢেউয়ের আকারে উন্নতি-অবনতি বা অধ্যাত্মবাদ-জড়বাদ আসিতেছে। ইহা হইতে বিবেকানন্দ এই একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, আধ্যাত্মিকতাই প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি, আধ্যাত্মিকতার মালিন্যে সমাজের পতন এবং তাহার বিকাশকেই সভ্যতা বলে। 'জ্ঞানযোগ' গ্রন্থের এক স্থানে তিনি বলিতেছেন :—

"প্রত্যেক সমাজেই এমন এক দল ব্যক্তি থাকেন যাঁহারা স্থূল বিষয়-ভোগে আনন্দ পান না। ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুতেই তাঁহাদের প্রীতি। মাঝে মাঝে তাঁহারা জড় অপেক্ষা উচ্চতর এক সত্যের আভাস পান। ঐ সত্যের অনুভূতিলাভের জন্য তাঁহারা অবিরাম চেষ্টা করিয়া চলেন। আমরা যদি মানব জাতির ইতিহাস পাঠ করি তাহা হইলে দেখিব যে, এইরূপ মানুষের সংখ্যা দেশে বৃদ্ধি পাইলে জাতির উন্নতি এবং যখনই তাহাদের সংখ্যা কমিয়া যায় তখনই তাহার অধঃপতন ঘটে।" 'জ্ঞানযোগ'-এর অন্যত্র আছে :—

"প্রত্যেক জাতির প্রাণশক্তি আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিহিত, আধ্যাত্মিকতা বিলীন হইয়া বস্তুবাদের প্রাদুর্ভাব ঘটিলে এই প্রাণশক্তি শুকাইতে থাকে।"

সমাজে ঢেউয়ের আকারে এই পরিবর্তনের ফলে যে কোনও প্রাচীন জাতির মধ্যে আধ্যাত্মিক সম্পদের বারবার উৎকর্ষ-সাধনের সুযোগ ঘটে। ফলে ক্রমশঃ একটি "pattern of life" বা "cultural pattern" অর্থাৎ সংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট রূপ গড়িয়া উঠে। ভারতের এই cultural pattern সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"ভালই হউক আর মন্দই হউক, হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া ভারতে ধর্মই জীবনের চরম আদর্শরূপে পরিগণিত হইয়াছে; শতাব্দীর পর শতাব্দীর দীপ্ত স্রোতপ্রবাহ বহিয়া যাইতেছে, দেখিতেছি, ভারতাকাশ ধর্মতত্ত্বের সাধনায় পরিব্যাপ্ত; ভালই বলো আর মন্দই বলো, আমাদের জীবনের আরম্ভ ও পরিণতি ঐ সমস্ত ধর্মাদর্শের সাধনক্ষেত্রে। ফলে ঐ সাধনা আমাদের রক্তে প্রবেশ করিয়াছে। প্রত্যেক রক্তবিন্দুর সহিত, শিরায় শিরায় উহা স্পন্দিত হইতেছে এবং আমাদের প্রকৃতির সহিত, জীবনীশক্তির সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে। এই অন্তর্নিহিত বিপুল ধর্মশক্তিকে স্থানচ্যুত করিতে হইলে প্রতিক্রিয়ার কি গভীর শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে ভাবিয়া দেখ! সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া যে মহানদী নিজের খাত রচনা করিয়াছে উহা না বুজাইয়া ধর্মকে পরিত্যাগ করা চলে কি? তোমরা কি বলিতে চাও, হিমতুষারালয়ে আবার ভাগীরথী ফিরিয়া যাইবে এবং পুনর্বার নূতন পথে প্রবাহিতা হইবে? তাহাও যদি বা সম্ভব হয়—তবুও জানিও, আমাদের দেশের পক্ষে পরমার্থসাধনরূপ বিশেষ জীবনখাতটি পরিহার করা অসম্ভব, এবং রাজনৈতিক বা অপর কিছুকে জাতীয় জীবনের মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব নহে।"[৫]

৫ কুম্ভকোণমে প্রদত্ত বক্তৃতা

ধর্ম-অধর্মের ক্রমান্বয়ে প্রাদুর্ভাব—এই কল্পনা দ্বারা ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে, সংস্কৃতি বা সমাজ স্থিতিশীল (static) নহে। পরিবর্তন, গতি ও অগ্রগতি, বিবর্তন ও পুনগু'প্তির ধারণার মধ্যেই রহিয়াছে। গতির মধ্যেই যে প্রাণ ইহা বেদে নানা স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। বেদের বিখ্যাত শ্লোক একটি: "চরন্ বৈ মধু বিন্দতি, চরন্ স্বাদুমুদুম্বরম্। সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং যো ন তন্দ্রায়তে চরন্॥ চরৈবেতি চরৈবেতি॥" "যে চলিতেছে সেই মধুলাভ করিতেছে, অমৃতময় ফল প্রাপ্ত হইতেছে। ঐ দেখ সূর্যের শ্রেষ্ঠত্ব, পথে চলিতে চলিতে সে কখনও তন্দ্রালু হয় না, অতএব হে মানব, পথে চল, পথে চল।" গতির মধ্যেই আছে শ্রেয়ের সন্ধান বা উন্নতি—এই বৈদিক ঘোষণার অনুবর্তন করিয়া সমাজ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন,—"Progress is its watchward"। "অগ্রগতিই সমাজের মূল কথা।" কিন্তু অগ্রগতির একটি রূপ আছে। তাহা আধ্যাত্মিকতার পথে বারংবার অনুবর্তন। ভারত-সংস্কৃতির এই রূপ (cultural pattern) চিরন্তন বটে কিন্তু static অথবা স্থিতিশীল নহে, ইহা সম্পূর্ণরূপে dynamic বা গতিময়। কারণ, অধ্যাত্ম-উপলব্ধি বা জড়বাদের প্রকাশ প্রতি অনুবর্তনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। ঠিক পূর্বের যুগের অনুরূপ হয় না।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, অধ্যাত্ম-যুগ মানেই ত 'পূর্ণতা'র বা 'আদর্শে'র ভিত্তিতে গঠিত সমাজ, অর্থাৎ সে সমাজে সবই ভাল, কিছুই মন্দ নাই। তাহা হইলে সেই আধ্যাত্মিকতা হইতে আবার বিচ্যুতি কি করিয়া ঘটে? পূর্ণতা-প্রাপ্তি ঘটিলে তাহা হইতে বিচ্যুতি আসা ত উচিত নয়। কিন্তু, এখানে মনে রাখিতে হইবে যে আধ্যাত্মিক আদর্শে গঠিত সমাজের কল্পনা পূর্ণতার কল্পনা নহে। এ বিশ্ব-সংসার কখনও যথার্থ পূর্ণতালাভ করিতে পারে না। এখানে ভালমন্দ, সু-কু চিরদিনই থাকিবে। বিবেকানন্দ এ প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—"The sum-total of good and evil in one world remains ever the same. The yoke will be lifted from shoulder to shoulder by new systems, that is all".[৬] অর্থাৎ, "জগতে ভাল-মন্দের পরিমাণ চিরদিনই সমান থাকিবে; শুধু তাহা এক শ্রেণী হইতে অন্য শ্রেণীর স্কন্ধে স্থানান্তরিত হইবে মাত্র।" অতএব সংসারে মানুষ চিরদিনই অপূর্ণ, মানুষের সমাজও অপূর্ণ। মানুষকে পূর্ণতা লাভ করিতে হইলে সংসারকে অতিক্রম করিতে হয়। "Perfection means infinity, and manifestation means limit and so it means that we shall become unlimited limits, which is self-contradictory".[৭] অর্থাৎ, "পূর্ণতার স্বরূপ অনন্ত কিন্তু বিকাশ মানেই সীমাবদ্ধতা, অতএব এই সংসারের মধ্যে আমরা পূর্ণতা লাভ করিব বলা মানে যুগপৎ আমরা অসীম ও সসীম হইব। ইহা ত পরস্পর বিরোধী।" এই বাক্যের দ্বারা বিবেকানন্দের সহিত হেগেলের আদর্শবাদের আকাশ-পাতাল পার্থক্য দেখা যাইতেছে। হেগেলের মতে মানব-সমাজ ও মানুষ এক দিন পূর্ণতা লাভ করিবে, বিবেকানন্দের মতে তাহা নহে। ভালমন্দ চিরদিন থাকিবে, শুধু তাহার রূপান্তর ঘটিবে,—কোনও অবস্থায় অনেক মানুষের আধ্যাত্মিক বিকাশ ঘটিবে, কোনও অবস্থায় তাহা ঘটিবে না। পূর্বেরটির নামই অগ্রগতি। আদর্শ সমাজেও মন্দ কিছু

৬ Letters p. 320

৭ Jnana Yoga

থাকে বলিয়াই জড়বাদের পুনরাবর্তন ঘটে। না হইলে গতি বন্ধ হইয়া যাইত।

বর্তমান-যুগ-প্রকৃতির বিশ্লেষণে বিবেকানন্দ বহুবার এই কথা বলিয়াছেন যে, ভারতে কিছুকাল জড়বাদ আধিপত্য করিয়াছে বটে, কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব তাহার অবসান সূচিত করিতেছে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বর্তমান জড়বাদের প্রাদুর্ভাব এবং তাহার সংযোগে ভারতে আলোড়ন ও সংস্কৃতি-সঙ্কট উপস্থিত হয় এবং এই সঙ্ঘর্ষের ফলেই ভারতে আবার অধ্যাত্ম-যুগ প্রকটিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পাশ্চাত্ত্য দেশকেও এবার এই অধ্যাত্মবাদ গ্রহণ করিতে হইবে। "Europe is standing on the verge of a volcano."—"ইউরোপ আগ্নেয়গিরির মুখ-সন্নিধানে অবস্থান করিতেছে।" যে কোনও দিনই ইহা ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। "Materialism prevails in Europe to-day. The salvation of Europe depends on a rationalistic religion."[৮] অর্থাৎ, "বর্তমান ইউরোপে জড়বাদের আধিপত্য। যুক্তি-প্রতিষ্ঠ একটি ধর্মের উপরই ইউরোপের মুক্তি নির্ভর করিতেছে।" মনু-সংহিতার ভাষায় বর্তমানকে 'যুগ-সন্ধ্যা' বা আধুনিক ঐতিহাসিকদের ভাষায় "an age of crisis" বলা চলে। ইউরোপের মুক্তি ভারতের বেদান্ত-ধর্ম গ্রহণে ঘটিবে। নূতন সভ্যতার উদয়ের ফলে ভারতবর্ষ এইবার জগতে প্রাধান্য লাভ করিবে। "এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ"—বিবেকানন্দের বহু-উচ্চারিত বাণী।

এই আলোচনায় মোটামুটিভাবে আমরা বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনের নিম্নলিখিত ধারা দেখিতে পাই :—

(১) জগতে আধ্যাত্মিকতা ও জড়বাদ ক্রমান্বয়ে ঢেউয়ের আকারে আসে।

(২) সকল দেশেই ইহা ঘটে।

(৩) যে দেশে ইহা বারবার ঘটে তাহার পক্ষে একটি cultural pattern (সংস্কৃতির আকৃতি) গড়িয়া উঠে। প্রাচীন দেশে উহা আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে গড়িয়া উঠা স্বাভাবিক। ভারতে তাহাই হইয়াছে। এই 'প্যাটার্ণ' স্থিতিশীল নহে; অর্থাৎ, প্রতি অধ্যাত্মযুগে আধ্যাত্মিক অনুভূতি নূতনভাবে হইবে।

(৪) আধ্যাত্মিকতার আবির্ভাবই উন্নতি, জড়বাদের প্রাদুর্ভাব অবনতি।

(৫) অতএব, সভ্যতার নিহিতার্থ আধ্যাত্মিকতার বিকাশ।

(৬) এক যুগ হইতে অন্য যুগ আবির্ভাবের সময় যুগ-সঙ্কটের সময়।

(৭) আগামী যুগে জনসাধারণের অধিকার লাভ ঘটিবে—অর্থাৎ শূদ্রযুগ আসিবে।

(৮) সংসারে কোন সমাজই পূর্ণ নয়, ভাল মন্দ সর্বত্র বিরাজ করিবে।

(৯) অগ্রগতিই সমাজের লক্ষ্য।

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের উপরোক্ত চিন্তাধারার অনুরূপ চিন্তাপ্রণালী অতি-আধুনিক কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য মনীষীর গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে রুশ দার্শনিক পিটিরিম সোরোকিন (Pitirim Sorokin), জার্মান দার্শনিক অস্‌ওয়াল্ড স্পেংগ্লার (Oswald Spengler) (1880 1936), ইংরেজ দার্শনিক টয়েন্‌বী (Toyenbee, 1889—) মার্কিণ দার্শনিক ক্রোয়েবার (Kroeber, 1876—) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। আমরা পরে ইঁহাদের মত আলোচনা করিতেছি।

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অপর একটি চিন্তাধারার গুরু কার্ল মার্ক্স।[৯]

৮ Jnana Yoga

৯ এই চিন্তাধারায় ভারতবর্ষে যাঁহারা গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে রাহুল সাংকৃত্যায়ন

সমাজ-বিবর্তন প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে বর্তমানে আরও একটি মৌলিক চিন্তাধারা দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ৺অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকারের। তাঁহার "Villages and Towns as Social Patterns," "Creative India," "Political Philosophies since 1905", "নয়া বাংলার গোড়াপত্তন" প্রভৃতি গ্রন্থে এই দৃষ্টিভঙ্গী পরিস্ফুট। তিনি মার্ক্সীয় ও অধ্যাত্ম-বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা উভয়কেই ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার Positivism বা বস্তুবাদ সেইজন্য স্বকীয় বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। তাঁহার চিন্তাধারার উপরও কিছু কিছু গ্রন্থ এদেশে রচিত হইয়াছে—যথা, সুবোধকৃষ্ণ ঘোষাল কৃত "Sarkarism," নগেন্দ্র নাথ চৌধুরী রচিত "Pragmatism and Pioneering in Benoy Sarkar's Sociology," অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় কৃত "বিনয় সরকারের বৈঠকে।"

অতএব তিনটি চিন্তাধারা বা School of thought আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে দেখিতেছি। যথা:—(১) অধ্যাত্ম-বিজ্ঞানবাদ—(এদেশে) গুরু বিবেকানন্দ, (২) মার্ক্সবাদ বা জড়বাদ—গুরু কার্ল মার্ক্স (৩) বস্তুবাদ—গুরু (এদেশে) বিনয় সরকার। বিবেকানন্দের চিন্তাধারা আমরা ইতিমধ্যেই আলোচনা করিয়াছি। এখন মার্ক্স, তৎপরে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার অনুরূপ কতকগুলি পাশ্চাত্ত্য চিন্তাধারা ও শেষে অধ্যাপক বিনয় সরকারের চিন্তাধারা আলোচনা করিব। পরিশেষে তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা সমাজ সংস্কৃতির পরিবর্তন সম্বন্ধে আমরা দিগ্‌দর্শন করিবার চেষ্টা করিব।

কার্ল মার্ক্সএর সমাজতন্ত্রের ভিত্তি তাঁহার জড়বাদ (Materialism)। তাঁহার মতে একমাত্র অর্থনৈতিক কারণে সমাজ-পরিবর্তন ঘটিয়া থাকে। এইজন্য এই মতকে 'Economic Determinism'ও বলে। আর্থিক জীবনে পরিবর্তন যন্ত্রাদির আবিষ্কার দ্বারা ঘটে—অর্থাৎ শিল্পবিজ্ঞান (technology) বা উৎপাদন প্রথার পরিবর্তনই সকল পরিবর্তনের মূল। এই পরিবর্তন ধর্ম, সাহিত্য, শিল্প, দর্শন ইত্যাদি সাংস্কৃতিক বিভাগেও পরিবর্তন আনে। মার্ক্স বলেন, সংস্কৃতির তিনটি অঙ্গ। প্রথম—বাস্তব উপকরণসমূহ (material means), দ্বিতীয়—সমাজযাত্রার ব্যবস্থা (social structure), শেষ—মানস-সম্পদ—শিল্পকলা সাহিত্য ইত্যাদি—সমাজ-সৌধের শিখর চূড়া (social super-structure)। প্রথম অঙ্গ—'বাস্তব উপকরণে'র পরিবর্তনে অপর দুটি অঙ্গের অর্থাৎ 'সমাজ-ব্যবস্থা' ও 'মানস-সম্পদে'র আমূল পরিবর্তন ঘটিবে। সমাজ-পরিবর্তনের পন্থা বা processকে তিনি দ্বন্দ্ববাদ বা ডায়েলেকটিকবাদ বলিয়াছেন। সমাজে দুই বিপরীত পরিস্থিতির (Thesis and Antithesis) সংঘাতে পরিবর্তন (Synthesis) সাধিত হয়। মার্ক্স এই সঙ্ঘাতকে 'বিপ্লব' আখ্যা দিয়াছেন। সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন যুগও তিনি নির্ণয় করিয়াছেন। যথা,— (১) আদিম সাম্যতন্ত্রের যুগ (২) দাস-প্রথার যুগ (৩) সামন্ত-তন্ত্রের যুগ (৪) পুঁজিতন্ত্রের (Capitalism) যুগ (৫) সমাজতন্ত্রের যুগ। তাঁহার মতে বর্তমান যুগ-প্রগতি আমাদিগকে এই শেষোক্ত বিবর্তনের দিকে লইয়া চলিয়াছে। এই আগামী সমাজের বৈশিষ্ট্য হইবে ইহাতে শ্রেণী-বৈষম্য থাকিবে না,

সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার 'মানব সমাজ' (মূল হিন্দীতে), 'From Volga to Ganga'; গোপাল হালদারের 'সংস্কৃতির রূপান্তর'; অমিত সেনের 'ইতিহাসের ধারা' সরোজ আচার্যের 'মার্ক্সীয় দর্শন'; অধ্যাপক সুশোভনচন্দ্র সরকারের 'মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ' প্রভৃতি গ্রন্থে জগতের তথা ভারতীয় সংস্কৃতি ও সমাজের মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি থাকিবে না, ধর্ম থাকিবে না, রাষ্ট্র থাকিবে না। মার্ক্সের মতে ধর্ম ও রাষ্ট্র অত্যাচারের যন্ত্রমাত্র। আদিম সাম্য-সমাজ বর্বর সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, পরবর্তী তিনটি যুগ ছিল শোষণ ও শ্রেণীসঙ্ঘর্ষের যুগ।

মার্ক্সবাদের বহু সমালোচনা দেশে ও বিদেশে হইয়াছে। তাঁহার সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন-সম্বন্ধীয় মতের নিম্নলিখিতরূপ সমালোচনা আমরা এই সকল পাঠে পাই :—

(১) মার্ক্স ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম, কি কারণে সাংস্কৃতিক জীবনের একদিক অর্থাৎ আর্থিক জীবনে পরিবর্তন আপনা হইতেই হয় অথচ অন্য দিকগুলি—ধর্ম, শিল্প, সাহিত্য প্রভৃতির আপনা হইতেই হয় না। সেই হিসাবে পিরামিডের আকারে সংস্কৃতির কল্পনা মনগড়া :—যথা, ভিত্তি —বাস্তব উপকরণ, সৌধ—সমাজ ব্যবস্থা, সমাজ চূড়া—মানস-সম্পদ। সোরোকিন প্রভৃতি দার্শনিকেরা দেখাইয়াছেন, সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন দিক একই সঙ্গে পরিবর্তিত হয় এবং একে অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

(২) দ্বিতীয়তঃ, মার্ক্সের বিশ্লেষণানুযায়ী প্রতীয়মান যে সমাজ-সংস্কৃতির সৌধের ভিত্তি পরিবর্তিত হইলে সমগ্র সৌধটি সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইবে। কিন্তু মার্ক্স-অনুবর্তী লেনিনের মত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একটি পরস্পর-বিরোধিতা (self-contradiction) এই মতের মধ্যে আছে। লেনিনের এর মত নিম্নোক্ত রূপ :—

"Soviet Culture, Lenin pointed out, is not an invention of experts, but a logical development of the cultural heritage which the proletariat received from preceding generations. ......Lenin relentlessly flayed the so-called Proletkutts who spurned the finest cultural creations of the past solely on the grounds that thay were produced in a slave-owning, landlord or bourgeois society. He called them utopians detatched from real life and said that their 'queer ideas' were capable of doing irreparable damage of the Soviet State and the people."[১০] অর্থাৎ, প্রাচীন সংস্কৃতির স্বাভাবিক পরিণতিই আধুনিক সোভিয়েট সংস্কৃতি, ইহা কোনও বিশেষজ্ঞের সৃষ্ট পদার্থ নহে। যাঁহারা প্রাচীন সংস্কৃতিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের দ্বারা প্রসূত বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন তাঁহাদিগকে লেনিন কাণ্ডজ্ঞানহীন কল্পনা-বিলাসী বলিতেছেন, তাঁহার বিবেচনায় এই মত দ্বারা তাঁহারা সোভিয়েট রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতে পারেন।

(৩) মার্ক্সীয় মতবাদ সরলরেখায় উন্নতি (Linear Progress) পরিকল্পনা করিয়াছে। ইহা অবৈজ্ঞানিক। কারণ, উন্নতি থাকিলে অবনতি থাকিতেই হইবে, অনুবর্তন থাকিলে পুনর্গুপ্তি থাকিবে—সৃষ্টি থাকিলে বিনাশ থাকিবেই।

(৪) মার্ক্স সাম্যবাদী সমাজকে শ্রেণীহীন আদর্শ সমাজ বলিয়াছেন। সমাজ কখনও আদর্শ হইতে পারে না, তাহাতে ভাল মন্দ উভয়ই থাকিবে। দ্বিতীয়তঃ সমাজতন্ত্রের পরিবর্তনের পরবর্তী স্তর বা বিকাশ কিরূপ হইবে মার্ক্স তাহা বলেন নাই। অর্থাৎ, এইখানেই যেন সমাজ বিবর্তনের শেষ। কিন্তু সত্যই ত মার্ক্সের

১০ Soviet Literature No. I, 1951

কথাতেই সমাজ-বিবর্তন শেষ হইবে না। তাহার রূপ কি হইবে ইহা আলোচনা না করিয়া সমাজ পরিবর্তনের রীতি প্রকৃতি নির্ণয় করা চলে না।

মার্ক্স তাঁহার অমর গ্রন্থ 'Das Capital' রচনা করেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে। তাহার প্রায় এক শত বৎসর পরে পিটিরিম্ সোরোকিন 'Social & Cultural Dynamics' (1937) লেখেন, অস্ওয়াল্ড স্পেংগ্লার 'Decline of the West' (1918) লেখেন, টয়েন্‌বী লেখেন 'A study of History' (six volumes—1934-1939), ক্রোয়েবার লেখেন, '*Configuration of Cultural Growth*' (1944)। ইহা ছাড়া আমরা নরথ্‌প (Northrop), শুবার্ট (Schubert), সুইট্‌জার (Schweitzer) প্রভৃতি দার্শনিকদেরও নাম করিতে পারি। ইঁহারা সকলেই এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া ইতিহাস আলোচনায় অগ্রসর হইয়াছেন। সোরোকিন তাঁহার ১৯৫১ সালে প্রকাশিত গ্রন্থে 'Social Philosophies of an age of crisis'এ ইঁহাদের মতামত আলোচনা করিয়াছেন। তারিখের দিকে দেখিলে বোঝা যায় এই মত সম্পূর্ণ নূতন। কিন্তু, আশ্চর্যের বিষয় ইঁহাদের মতের সহিত পূর্বোক্ত বিবেকানন্দের চিন্তাধারার প্রচুর মিল আছে। দুইটি চিন্তাধারা একেবারে এক নহে, কিন্তু একেবারে সমান্তরাল বলা চলে এবং উহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সুগভীর ঐক্য আমাদিগকে বিস্মিত করে। বিবেকানন্দ তাঁহার চিন্তাধারা ১৯০২ সালের মধ্যে দিয়া যান। অবশ্য ভারতবর্ষে এই চিন্তাধারা বহু পুরাতন, বিবেকানন্দ তাহাকে পরীক্ষা করিয়া বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সোরোকিন তাঁহার গ্রন্থাদিতে হেগেল ও ফিক্‌টে (Fichte)-র নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন, যদিও সোরোকিনের পরিবেশিত তত্ত্বে ও হেগেলের আদর্শবাদে আকাশ পাতাল পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে। এই কারণে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহিত এই সাদৃশ্য খুবই আশ্চর্য। বিবেকানন্দ হেগেলের আদর্শবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, গ্রহণ করেন নাই। সোরোকিন প্রভৃতির চিন্তাধারার সূত্র যাহাই হউক, তাঁহাদের পরিবেশিত তত্ত্বকে বলিতে হয় more Vivekanandian than Hegelian. (বিবেকানন্দেরই বেশী অনুসরণ করিয়াছে হেগেলের অপেক্ষা)। সোরোকিন ২৮০০ পাতার গ্রন্থ "Social and Cultural Dynamics"এ বিপুল পরিশ্রমসহকারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির আদিকাল হইতে বিভিন্ন বিকাশের মধ্য হইতে রচনা, শিল্প, ভাস্কর্য, চিত্র প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের (Statistics) সহায়তায় তাঁহার সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন। আর তাঁহার এই তথ্য-সংগ্রহে বিবেকানন্দ-বর্ণিত তত্ত্ব সমর্থিত হইতেছে। এই জন্য এই চিন্তাধারার আলোচনার অত্যন্ত গুরুত্ব আছে। টয়েন্‌বীও তাঁহার ছয় খণ্ডে বিভক্ত সুবিশাল গ্রন্থে বহু তথ্য-প্রমাণাদি আমদানি করিয়াছেন।

ইঁহাদের মতে[১১] সমাজ-সংস্কৃতির গতি উত্থান-পতনের নিয়মে প্রবাহিত। সোরোকিন ইহাকে Theory of Rhythm বলিয়াছেন। স্পেংগ্লার ও টয়েন্‌বী-র মতে সমাজ একটি প্রাণিদেহের মতো। একটি প্রাণিদেহের যেরূপ জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে সমাজেরও সেইরূপ জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। সোরোকিন অবশ্য সমাজকে প্রাণিদেহের অনুরূপ মনে করেন না। তাঁহার মতে সংস্কৃতি মানে যে কোনও বস্তু যাহা মানুষ মূল্যবান বা সুন্দর বা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করে; অর্থাৎ যাহা "সত্য, শিব ও

১১ এই চিন্তাধারা বর্ণনায় Cowell-প্রণীত History, Civilisation and Culture এবং Sorokin-প্রণীত Social Philosophies of an age of crisis এর সাহায্য লইয়াছি।—লেখিকা।

সুন্দর" ; যাহা কল্যাণকর তাহাই সংস্কৃতি। এই সকল মূল্য (values) মানুষের সমাজ-জীবনে লভ্য। সেইজন্য তিনি "সমাজ সংস্কৃতি" (Socio-cultural) কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। অর্থাৎ সমাজ ও সংস্কৃতি সর্বদা সংযুক্ত। বিভিন্ন দিকে এই সকল মূল্যের অভিব্যক্তিকে তিনি Cultural Systems (সংস্কৃতির শাখা) বলিয়াছেন। পাঁচটি এইরূপ শাখা আছে (১) ভাষা (২) বিজ্ঞান (৩) ধর্ম (৪) শিল্পকলা (৫) নীতি। এক 'ভাষা' ব্যতীত অপর প্রত্যেকটি শাখার নিম্নোক্ত প্রশাখা (sub-system) আছে—(১) সাহিত্য (২) সঙ্গীত (৩) স্থাপত্য (৪) ভাস্কর্য (৫) চিত্রকলা (৬) চারুশিল্প (৭) আইন (৮) নীতিশাস্ত্র। সংস্কৃতির এই বিভিন্ন দিকে বিকাশের মধ্যে একটি ঐক্য থাকিবে, সমগ্র একটি রূপ থাকিবে। এই সমগ্র একটি রূপসমন্বিত যে সংস্কৃতি তাহাই স্থায়িত্বলাভ করে বা পূর্ণবিকশিত হয়। ক্রোয়েবার ইহাকে "High-value Cultural pattern" (উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি) নাম দিয়াছেন। কিন্তু, সর্বকালে একই দেশে একই ধারা বজায় থাকিবে ইহা সোরোকিন মানেন না। টয়েন্‌বীর মতে দেশভেদে আমরা এই সংস্কৃতির বিভিন্ন রূপ দেখিতে পাই যথা, ভারতীয়, চীনা, মিশরীয়, গ্রীসীয়, রোমক ইত্যাদি। সোরোকিন কালভেদে সংস্কৃতির রূপ বিভাগ করিয়াছেন ; কিন্তু তিনি সকল দেশে একই কালে একই সংস্কৃতির রূপের অনুবর্তন ঘটিবে তাহা মনে করেন না। তাঁহাদের মতে এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে প্রভাব বিস্তার করে। টয়েন্‌বী বলেন এইরূপে প্রাচীন এক সভ্যতা অন্য সভ্যতার জন্মদান করে। এই সামগ্রিক সংস্কৃতির রূপকে সোরোকিন Cultural Super-system নাম দিয়াছেন। এই 'সুপার-সিষ্টেম্' তিনটি : (১) Ideational (অধ্যাত্ম-যুগ) (২) Idealistic (অধ্যাত্ম-বস্তুবাদী যুগ) ও (৩) Sensate (বস্তুবাদী বা জড়বাদী যুগ)। এই তিনটি অবস্থার সহিত স্পেংগ্লার ও টয়েন্‌বীর সমাজ-সংস্কৃতির শৈশব যৌবন বার্ধক্যকালের তুলনা করা চলে। শেষ অবস্থার নাম স্পেংগ্লার দিয়াছেন Civilisation (সভ্যতা)। Ideational যুগের বৈশিষ্ট্য-চিত্রনে সোরোকিন বলেন ইহা ধর্ম-বিশ্বাসের যুগ। অন্যেরাও ঐরূপ মনোভাব পোষণ করেন। এই যুগে মানুষ আধ্যাত্মিক-সত্যে বিশ্বাস করে, ঐহিক সুখ-ভোগকে বড় মনে করে না এবং তপস্যাদি ধর্মাচরণকে খুব বড় স্থান দেয়। 'Sensate' culture এর যুগ ঠিক বিপরীত। এই যুগে মানুষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সত্যকেই একমাত্র সত্য মনে করে, অতীন্দ্রিয় বা অতিমানস অনুভূতিতে বিশ্বাস করে না, ঐহিক সুখভোগকে জীবনের লক্ষ্য মনে করে, এবং মানুষের পরিবর্তনে বিশ্বাস করে না। 'Idealist' যুগে এই দুইয়ের সংমিশ্রণ দেখা যায়। এ যুগে ত্যাগ-ভোগ, যুক্তি-বিশ্বাস, ইন্দ্রিয়াতীত সত্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ উভয়েই লোকে মানে। ক্রোয়েবারের মতে প্রথম যুগে ধর্মের খুবই প্রাধান্য থাকে। টয়েন্‌বীর মতে 'সভ্যতা'র শেষ সময়ে ধর্মের প্রবল আন্দোলন দেখা দেয় এবং তাহার পরই তাহা নিশ্চিহ্নতা প্রাপ্ত হয়। ক্রোয়েবারের মতে ধর্মই প্রধান শক্তি হিসাবে এক যুগ হইতে অন্য যুগ-প্রবর্তন-কার্য সাধন করে। সোরোকিন দেখাইয়াছেন যে, এক যুগ হইতে অন্য যুগে বিক্ষিপ্ত হয় এবং এই পরিবর্তন সমগ্র সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার একত্বে একই গতিতে সাধিত হয়। টয়েন্‌বী ও স্পেংগ্লারের মতে প্রাণি-দেহের স্বাভাবিক নিয়মে একের পর এক অবস্থা আসে। যাহাই হউক, মোটের পর ইঁহাদের মতে পরিবর্তনের বীজ সে যুগের মধ্যেই নিহিত থাকে

ইহাকে ইঁহারা "Theory of Immanent Change" (আভ্যন্তরীণ শক্তিবলে পরিবর্তন) বলিয়াছেন। পরিবর্তনের বীজ সে যুগেই নিহিত থাকার কারণ—সোরোকিনের মতে, কখনও কোনও পরিবর্তন পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না। পূর্ণ পরিণতি লাভ করে না বলিয়া সত্যের পাশে অসত্য বাস করে। সেইজন্য কিছুকাল পরে অবনতি সুরু হয়। এখানে সোরোকিন কিছু অস্পষ্ট। সোরোকিনের মতে বিবর্তনের পথে অনন্ত সম্ভাবনা নাই, কাজেই Sensate যুগের পর আবার Ideational যুগ ফিরিয়া আসে। টয়েন্‌বী পরবর্তী যুগের রূপ সম্বন্ধে অত নিঃসন্দেহ নন। স্পেংগ্লারের মতে আবার নূতন এক সমাজ-সংস্কৃতি জন্মলাভ করিবে এবং তাহাতে সমাজ-সংস্কৃতির শৈশবের সকল গুণ থাকিবে। টয়েন্‌বী দেখাইয়াছেন যে, এইরূপে বহু সভ্যতা মৃত অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে। এইরূপ আবর্তন ইউরোপীয় সভ্যতায় দুইবার ঘটিয়াছে সোরোকিন ইহা প্রমাণ করিয়াছেন। Sensate যুগের শেষ অবস্থায় একটি ক্ষুদ্র বিবর্তন (minor change) হইতেছে কম্যুনিজ্‌ম্ বা জড়বাদী সাম্যবাদের বিস্তার, ইহাও সোরোকিনের অভিমত।

বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতা যে অবসান-প্রায় ইহা উঁহারা একসঙ্গে দেখাইয়াছেন। সোরোকিনের মতে বর্তমানে তিনি Ideational যুগের সূচনা দেখিতে পাইতেছেন। দুই যুগের মিলন-সন্ধিক্ষণ এই বর্তমান কালকে তিনি যুগ-সঙ্কট (age of crisis) আখ্যা দিয়াছেন। টয়েন্‌বী ধর্মগুণ-সম্ভূত নূতন সভ্যতার অভ্যুদয় সম্বন্ধে অত সুস্পষ্ট কথা বলেন নাই। তাঁহার মত—"We can only say that something which has actually happened once, in another episode of history, must at least be one of the possibilities that lie ahead of us".[১২] অর্থাৎ, যাহা একবার ঘটিয়াছে তাহা ঘটিবার পুনর্বার সম্ভাবনা আছে। ইঁহারা একমত যে, যে ভূমিতে সমাজ-সংস্কৃতির এক রূপের অবসান ঘটে, অপর রূপের আবির্ভাব সেখানেই হয় না। অর্থাৎ, আগামী নূতন সভ্যতার বিকাশ পশ্চিম-ইয়োরোপে ঘটিবে না, ঘটিবে অন্যত্র। নানা জনে নানা দেশের নাম করিয়াছেন,—যথা আমেরিকা, রাশিয়া, চীন, ভারতবর্ষ ও জাপান।

৮অধ্যাপক বিনয় সরকার তাঁহার অমূল্য গ্রন্থ "Villages and Towns as Social Patterns" এ সোরোকিন ও স্পেংগ্লারের সমালোচনা করিয়া বলিয়াছেন যে মার্ক্স, কোঁতে (Comte) ও গীতা-উপনিষদের মত ইঁহারাও পূর্ণতাবাদী (finalist)। অর্থাৎ, মানব সমাজ Ideational বা পূর্ণতার যুগে পৌঁছিবে ইঁহারা তাহাই মানেন। অতএব ইঁহারা কল্পনাবিলাসী। বিনয় সরকারের মতে কোনও সমাজ-সংস্কৃতি কখনও পূর্ণ বা দোষবিহীন হইতে পারে না; তাহার কারণ, সব সমাজেই শিব-অশিব, ভাল-মন্দ সমভাবে বিরাজমান এবং সব মানুষই পশু ও দেবতার সমন্বয়। তাঁহার বিশ্লেষণে তিনি মনোবিজ্ঞানের সাহায্যই অধিক গ্রহণ করিয়াছেন। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সত্যতায় তিনি বিশ্বাসী নহেন, সোরোকিন বিশ্বাসী। যাহাই হউক আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি সোরোকিন বলেন নাই যে 'Ideational' সমাজ একেবারে পূর্ণতার আদর্শ, সেখানেও সত্য ও অসত্য পাশাপাশিই থাকিবে। স্পেংগ্লারের প্রাণিদেহবাদ অবশ্য ত্রুটিপূর্ণ। কিন্তু, অধ্যাপক

১২ B. B. C. Reith Lectures—Toyenbee—quoted in the Bulletin of the Ramakrishna Mission Institute of Culture, May, 1953.

সরকার মার্ক্স-এর সমালোচনা ঠিকই করিয়াছেন যে, মার্ক্স পূর্ণতাবাদী, তাঁহার সমাজতান্ত্রিক সমাজে অভাব থাকিবে না, মানুষ লোভ করিবে না, মানুষ হইবে আদর্শ মানুষ—এ যুক্তি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক।

অধ্যাপক সরকার নিজস্ব একটি পরিবর্তন-তত্ত্ব (Theory of Change) উপস্থাপিত করিয়াছেন। তিনি উহার নাম দিয়াছেন "Theory of Creative Dis-equlibrium";[১৩] ইহার মূলকথা সব সমাজেই ভালমন্দ সমান থাকিবে। ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বে নূতন সমাজ সৃষ্টি হইবে এবং এই নূতন অবস্থায়ও সমান ভালমন্দ থাকিবে। শুধু তাহা পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ভালমন্দ হইতে ভিন্নরূপ। ভালমন্দের এই রূপান্তরই উন্নতি। এই দ্বন্দ্বই সৃষ্টির কারণ। নব নব সৃষ্টি ছাড়া অগ্রগতির কোনও অর্থ নাই। অধ্যাপক সরকারের এই মতের উপর বিবেকানন্দের বেদান্ত-বাদ ও আমেরিকার Pragmatism (মূল্যবাদ)এর ছায়াপাত সুস্পষ্ট। অধ্যাপক বিনয় সরকার অনেক খানিই বেদান্তবাদী। তাঁহার বস্তুবাদ ও অধ্যাত্ম-সত্যকে বাচনিক অস্বীকার সত্ত্বেও ইহাকে জড়বাদ বলা চলে না। বর্তমান সমাজ সম্বন্ধে অধ্যাপক সরকারের অভিমত এই যে, ১৯০৫ সাল হইতে নূতন উন্নতি জগতে সূচিত হইয়াছে, এবং এই উন্নতিতে এশিয়া তথা ভারতবর্ষ অগ্রণী। ইহা তাহাদের জয়যাত্রার যুগ। এই যুগের তিনি নাম দিয়াছেন 'রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ'। রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের আবির্ভাবের সহিত হিন্দুভারতের চিরন্তন "চরৈবেতি" বাণীরূপ শক্তি পুনর্বার ক্রিয়াশীল হইয়াছে এবং দেশে দেশে তাহার জয়পতাকা এইবার উড়িবে।[১৪]

১৩ Benoy Sarkar—Villages & Towns as Social Patterns Part V.

১৪ *Benoy Sarkar—Creative India.*

এই সমস্ত আলোচনার শেষে আমরা বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সহিত উপরোক্ত বিভিন্ন চিন্তাধারার সাদৃশ্য ও বৈলক্ষণ্য লক্ষ্য করিলে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার গুরুত্ব দেখিতে পাইব।

(ক) সোরোকিন প্রভৃতির চিন্তাধারা ও বিবেকানন্দের চিন্তাধারার সাদৃশ্য :—

(১) সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তন উত্থান-পতনের ধারায় সংঘটিত হয়।

(২) উত্থান-পতন অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের প্রাধান্য যথাক্রমে প্রকট করে।

(৩) আধ্যাত্মিকতা-প্রাধান্যের যুগই মানুষ কামনা করে।

(৪) উচ্চাঙ্গ-সংস্কৃতির মূলগত একটি ঐক্য বা প্রাণ থাকে।

(৫) কোনও পরিবর্তনই সম্পূর্ণ নয়। ভাল-মন্দ সব অবস্থাতেই বর্তমান।

(৬) পরিবর্তনের কারণ সমাজ-সংস্কৃতির মধ্যে নিহিত।

(৭) ইউরোপে এখন জড়বাদী সভ্যতা অবসান-প্রায়।

(৮) অধ্যাত্ম-সম্পদময় সংস্কৃতির আগমন আসন্ন বা সুরু হইয়াছে।

(৯) জড়বাদী সভ্যতার শেষকালে সর্ব-সাধারণের অধিকার-লাভ ঘটিবে।

(১০) এই নূতন অধ্যাত্ম-সভ্যতার আগমন সম্ভবতঃ প্রাচ্য ভূখণ্ডে ঘটিবে।

বৈলক্ষণ্য :—

(১) সোরোকিন প্রভৃতি Involution বা পুনর্গুপ্তিবাদের কথা বলেন নাই। সেইজন্য ইঁহাদের Theory of Immanent Change (অন্তর্নিহিত শক্তির দ্বারা পরিবর্তনবাদ) অনেকটা অস্পষ্ট। কিন্তু বিবেকানন্দের মতবাদে ইহার ছায়াপাত হওয়ায় আধ্যাত্মিকতার বারম্বার আবির্ভাবের সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়।

যাহা সৃষ্ট তাহা কারণ অবস্থায় বা বীজাকারে গুটাইয়া থাকে, একেবারে বিনষ্ট হয় না। সমাজদেহে জড়বাদের প্রসারকালেও আধ্যাত্মিকতা অন্তঃসলিলা স্রোতস্বিনীর মত প্রবাহিত হয়, আঘাতে সঙ্ঘাতে আবার পূর্ণ প্রকাশিত হয়। সোরোকিন বলিয়াছেন যে অনুবর্তনের অনন্ত সম্ভাবনা নাই, কয়েকটি 'টাইপ' বারম্বার ফিরিয়া আসে। ইহার কারণ Involution-বাদ ব্যতীত সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা চলে না। কার্য ও কারণ একই পদার্থ; কার্য কারণে গুটাইয়া যায়, আবার প্রকাশিত হইলে উহার রূপান্তর ঘটিলেও প্রকারান্তর ঘটিতে পারে না। কারণ, একই গুণান্বিত কারণ বারম্বার আত্মপ্রকাশ করিতেছে।

(২) ইঁহারা সংস্কৃতির সঙ্কটকালে প্রবল ধর্ম-আন্দোলনের কারণ যুক্তিসহকারে ব্যাখ্যা করিতে পারেন নাই। বিবেকানন্দ ইহার অতি সুন্দর ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(খ) মার্ক্সীয় চিন্তাধারার সহিত বিবেকানন্দের মতের সাদৃশ্য :—

(১) বর্তমান যুগে সর্বসাধারণ অধিকার লাভ করিবে এবং শ্রমিক শ্রেণী আধিপত্য করিবে। ইহা সমাজধর্মের স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিবেই।

(২) শ্রমিক যুগের পূর্ববর্তী যুগ বৈশ্য যুগ (Capitalist age)।

(৩) (তথাকথিত) ধর্ম পুরোহিত তন্ত্রের কালে অত্যাচারের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়।

বৈলক্ষণ্য :—

(১) মার্ক্স ধর্মকে অপরিণত মানব-মনের কু-সংস্কার ও অত্যাচারের যন্ত্রমাত্র বলিয়াছেন। বিবেকানন্দের মতে ধর্ম মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশের মাধ্যম।

(২) সমাজ-সংস্কৃতির পরিবর্তনে বিবেকানন্দ ধর্মের শক্তি প্রধান বলিয়াছেন, মার্ক্স তাহা সম্পূর্ণ অস্বীকার করিয়াছেন। তাহার কারণ মার্ক্স Sensate যুগের পরিবর্তন লইয়া অধিক বিশ্লেষণ করিয়াছেন।

(৩) মার্ক্স সরলরেখায় উন্নতির (linear progress) কথা বলেন, বিবেকানন্দ উত্থান-পতনের ধারার কথা বলেন। সরলরেখায় উন্নতির কল্পনা অবৈজ্ঞানিক ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

(৪) মার্ক্সের মতে বিবর্তনের শেষ শ্রেণী-বৈষম্যহীন সমাজ, বিবেকানন্দের মতে বিবর্তনের শেষ নাই, শূদ্র যুগের অবসানে আবার ব্রহ্মবিদ্‌গণের প্রাধান্য ঘটিবে।

(৫) মার্ক্স শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজের কথা বলিয়াছেন। বিবেকানন্দের মতে শ্রেণীবৈষম্যহীন সমাজের ধারণা কল্পনা-বিলাস-প্রসূত। সমাজের শ্রেণীবিভাগ চিরকাল থাকিবে। সাম্যতন্ত্রে বিশেষ সুবিধার (privileges) অবসান ঘটে কিন্তু শ্রেণী-বৈষম্য লোপ পায় না।

(৬) মার্ক্সের মতে আর্থিক উন্নতিতেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা, বিবেকানন্দের মতে আধ্যাত্মিকতার বিকাশেই সভ্যতার পরাকাষ্ঠা।

(গ) বিনয় সরকার ও বিবেকানন্দের চিন্তা-ধারার সাদৃশ্য :—

(১) সংসারের প্রকৃতি-নির্ণয়ে বিবেকানন্দ যাহা বলিয়াছেন বিনয় সরকার তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন মাত্র।

(২) উন্নতি মানে 'ভাল মন্দের রূপান্তর'; ইহাও বেদান্তের positivism (যাহা বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে বুঝাইয়াছেন) ছাড়া কিছুই নহে।

(৩) আগামী সমাজে এশিয়া তথা ভারতের প্রাধান্য সম্পর্কেও বিনয় সরকার বিবেকানন্দেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন।

(৪) ইতিহাসে রামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবের গুরুত্ব সম্বন্ধেও ঐরূপ।

বৈলক্ষণ্য :—

(১) বিনয় সরকার অধ্যাত্মবাদ অস্বীকার

করিয়াছেন, যদিও তাহার নিগলিতার্থ বা positivism (বাস্তব অর্থ) টুকুই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তত্ত্বটুকু বাদ দিয়া। বিবেকানন্দ পুরাপুরি অধ্যাত্মবাদে বিশ্বাসী।

(২) বিনয় সরকার বিভিন্ন সমাজের স্তর-ভেদ করেন নাই, অতএব তাঁহার ভালমন্দের রূপান্তর কি তাহা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

(৩) অধ্যাপক সরকার "Linear Progress" বা সরলরেখায় উন্নতির কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই মত ভ্রান্ত ইহা পূর্বেই দেখানো হইয়াছে।

এই সকল আলোচনার শেষে আমরা কি এই সিদ্ধান্তেই পৌছাই না যে, উত্থান-পতনের তত্ত্ব এবং অধ্যাত্মবাদ ও জড়বাদের আবর্তন-তত্ত্ব অনেক বেশী বৈজ্ঞানিক? অতি-আধুনিক বিশিষ্ট সমাজ-বিজ্ঞানীরা বহু গবেষণা সহকারে ইহা প্রমাণ সিদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই মতের উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের দেশীয় সমাজ-বিজ্ঞানীরা বিশেষ কেহ গবেষণায় অগ্রসর হন নাই, যদিও মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় বেশ কিছু গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। আমাদের দেশে ইতিহাসের রচনাই নূতন, তাহার ব্যাখ্যা আরও নূতন। আশা করা যায় যে, বিবেকানন্দের চিন্তাধারা যাহা বৈজ্ঞানিকত্বে সোরোকিন প্রভৃতির মত হইতেও শ্রেষ্ঠ এবং তাঁহাদের অনুসন্ধান দ্বারা সিদ্ধ—ভারতের সমাজ-বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করিবে।

তুমি

শ্রীমনকুমার সেন

(১)

প্রভাত-শিশির আর স্নিগ্ধ সমীরণ,
ধরণীর কোলে কে বা করে বরিষণ?
শিউলি, গোলাপ, বেল, বকুলেতে আর,
রূপ ও সৌরভ দেন কোন্ রূপকার?
রাতের বাঁধন কাটি আশায় উছল
করিছে জীবের প্রাণ, কে সে নিরমল?
দুপুরের খর তাপে প্রসন্ন প্রভাত
লুপ্ত করি দেয় কার অলক্ষিত হাত?
'জীবনে জিনিয়া লহ হয়ে দণ্ডপাণি',—
ক্ষমাহীন রুদ্ররূপে কাহার এ বাণী?
কালো আবরণে ঢাকি আভরণ কার
জাগাইছে পৃথ্বী ভরি ভাবনা উদার?
আকাশের চাঁদ আর অগণিত তারা,
কোন্ সত্য ধ্যানে নিশি যাপে তন্দ্রাহারা?

(২)

(যবে) ব্যথা আর হতাশায় ব্যর্থ হয়ে চলে
জীবনের উষ্ণধারা ভাঙে পলে পলে;
দিগন্ত-বিস্তৃত মেঘে বিদ্যুৎ চমকে
পথ খুঁজে নাহি পায় পথিক সমুখে;
ঝড়ের গর্জন-মাঝে জাগে হাহাকার,
আঘাতে আঘাতে যেন টুটিছে সংসার;
স্তব্ধ হয়ে যায় দাঁড়ী, ছিঁড়ে তার পাল,
নিশ্চিত মৃত্যুর মাঝে ভেঙে পড়ে হাল—
অকস্মাৎ কোথা হতে কাহার এ বাণী
মূকেরে মুখর করে, ভাসায় তরণী?
কল্যাণ-বিধৃত বিশ্বে তুমি লীলাময়,
এক হাতে কর সৃষ্টি, আর হাতে লয়।
সভ্যতার অভিমান নিজ-অহংকারে
বৃথাই খুঁজিছে তোমা পুঁথির আগারে!

বিবেকানন্দ-প্রসঙ্গে

শ্রীগগনবিহারী লাল মেহ্‌তা

[গত ১৬ই মে, (১৯৫৩) নিউইয়র্ক রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-কেন্দ্রের বিংশবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত শ্রীগগনবিহারী লাল মেহ্‌তা কর্তৃক প্রদত্ত ইংরেজী বক্তৃতার সারসংকলন। অনুবাদক: শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত।]

শ্রীরামকৃষ্ণ ভারতের মহান ঋষি- ও মরমি-গণের (mystics) অন্যতম। যে ভারত চৈতন্যশক্তির যথার্থ মূল্য দিয়া থাকে, যে ভারতের পুণ্যতোয়া গঙ্গা ও যমুনায় প্রচণ্ড শীতের প্রত্যুষে অগণিত নরনারীকে স্নান ও পূজা করিতে দেখি, যে ভারত, তাহার শ্রেষ্ঠ নরনারীগণের জাগতিক সর্ববস্তুতে নশ্বরত্ব-উপলব্ধির জন্যই, যুগযুগান্তর ধরিয়া অমর হইয়া রহিয়াছে—সেই ভারতের প্রতীক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

একটি প্রাচীন সংস্কৃত প্রবচনের মর্মার্থ এই: 'সর্বতঃ জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাদিচ্ছেৎ পরাজয়ম্।' অর্থাৎ, সকলের নিকট জয় ইচ্ছা করিবে কিন্তু নিজের পুত্রের নিকট চাহিবে পরাজয়—তোমার উত্তরাধিকারী তোমা অপেক্ষা মহত্তর হউক। তেমনি, শ্রীরামকৃষ্ণের অনুবর্তী ছিলেন ভারতের নব জাগরণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা স্বামী বিবেকানন্দ—যিনি অনুষ্ঠানবহুল ধর্মাপেক্ষা প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও আত্মোৎসর্গ-পূত সেবার ধর্মে অধিকতর বিশ্বাস করিতেন। বিবেকানন্দকে আমরা বলিতে পারি মার্কিনদেশে ভারতের প্রথম সংস্কৃতি-দূত। মহান বৌদ্ধ শ্রমণগণ যেরূপ শুভেচ্ছা, প্রেম ও সৌভ্রাত্রের বাণী বহন করিয়া এক দিন সুদূর বিদেশে গমন করিয়াছিলেন, বিবেকানন্দও সেইরূপ প্রতীচ্যদেশগুলিতে ভারতের আধ্যাত্মিক বার্তা লইয়া গিয়াছিলেন।

* * * কিন্তু ধর্মেরও বিভিন্ন রূপ, প্রকাশ ও দিক আছে। বিবেকানন্দের নিকট ধর্ম ছিল আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা ও সমাজের কল্যাণসাধন। হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধে প্রায়শঃ এই অভিযোগ আনীত হয় যে, ইহা অত্যধিক নির্বস্তুক-তত্ত্ববহুল, রহস্যাবৃত, অতি সূক্ষ্ম, অনুন্নত ও পরলোক-সর্বস্ব। কোন কোন সমালোচকের মতে হিন্দু-ধর্ম নির্বাণ বা পরলোকের অনুসন্ধান করিতে গিয়া জাগতিক অভ্যুদয় ও পার্থিব কর্তব্য-পালনের প্রতি জোর দেয় না। এই অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিতে আমি সমর্থ হইলেও বর্তমান উপলক্ষ তদুপযোগী নহে। তথাপি অনধিকারী হইলেও আমি বলিতে পারি, বেদান্তের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিপরীত—ইহা 'নেতি'-মূলক ও নিষ্ক্রিয় নহে; ইহা শিক্ষা দেয় যে, কেবলমাত্র প্রতি কার্যেরই নহে, পরন্তু প্রতি বাক্যের, এমন কি, প্রতি চিন্তার অবশ্যম্ভাবী ফল আছে এবং ইহলোকে বা পরলোকে মানুষ ইহার ফলভোগ করে। বুদ্ধ স্বর্গে শাশ্বত ধামের সন্ধান ও প্রচার করেন নাই—তিনি প্রচার করিয়াছিলেন ইহজন্মে ও বর্তমানেই দুঃখনাশের বাণী। বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন যে, ধর্মকে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ও আচরণে রূপায়িত করিতে হইবে, ধর্ম পৃথিবী হইতে অত্যাচার-নিপীড়ন, ভোগাধিকার ও বিরোধ-ব্যবধান দূর করিয়া দিবে। তিনি মনীষী বার্নার্ড শ'র ভাষায় বলিতে পারিতেন: যে মানুষের ঈশ্বর শুধু আকাশে থাকেন তাহার সম্বন্ধে সাবধান (Beware of the man whose God is in the skies!)। বিবেকানন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল 'জীবসেবা'র মাধ্যমেই প্রকৃষ্টতম ভগবদুপাসনা হয়; মন্দির হস্তিদন্তনির্মিত হর্ম্য হওয়া উচিত নয়।

যে 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটি গান্ধীজী জনপ্রিয় করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, উহা মূলতঃ তাঁহার পূর্বগ স্বামী বিবেকানন্দেরই শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী। 'দরিদ্রনারায়ণ' শব্দটিতে আর্ত-দুর্বল-দীন-হীনদের প্রতি বিবেকানন্দের গভীর প্রেম ও করুণা নিহিত আছে। বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জনসাধারণের উন্নতি-সাধনই বেদান্তের সর্বাপেক্ষা কার্যকর রূপায়ণ। এ বিষয়ে বিবেকানন্দ ছিলেন গান্ধীজীর যথার্থ পূর্বগামী। * * *

বিবেকানন্দ হিন্দুধর্মের সমন্বয়, পরমত-সহিষ্ণুতা, যুক্তিবাদ ও আত্মপ্রত্যয়ের উপর জোর দিতেন। ভারতীয়গণের দৃষ্টিতে ধর্ম কোন অতি-প্রাকৃত বিশ্বাসবলে লব্ধ অনুপ্রাণনা নহে; পরন্তু ইহা গভীর অপরোক্ষানুভূতি ও সৎকর্মানুষ্ঠানের ব্যাপার। এজন্যই হিন্দুধর্ম কাহাকেও নিজ বিশ্বাসানুরূপ ধর্ম অনুসরণ করিতে বাধা দেয় না এবং দলবৃদ্ধির জন্য বলপ্রয়োগেও বিশ্বাস করে না। হিন্দুধর্ম বিশ্বাস করে যে, প্রত্যেক মানুষের ঈশ্বরলাভের স্বকীয় পদ্ধতি আছে—'একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি'। কবি রবীন্দ্রনাথও বলিয়াছেন, 'পথ বিভিন্ন কিন্তু সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ এক ও অদ্বিতীয়'। ধর্ম আমাদিগকে বিনয় ও পরমতসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়। ভগবান সকলের মধ্যে বাস করেন, সেজন্যই মানুষ তাঁহাকে জানিবার জন্য নিজের সংস্কার ও রুচি-সম্মত পথ অনুসরণ করিতে পারে। ইহাতে আমাদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও গভীরতর আত্মবিশ্বাস লাভ হয়।

এরূপ 'ইতি'-মূলক ধর্ম ও সমাজ-হিতকরী বাণী প্রচার ও কার্যে রূপদান করিবার জন্যই ১৮৯৭ খৃঃ কলিকাতায় রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইয়াছে। মিশনের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সমাজ-হিতকর কর্মপ্রচেষ্টা আছে—নানাদিকে ইহার কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারিত হইয়াছে। হাসপাতাল, ডিস্‌পেন্‌সারী, শিল্প ও কৃষি-বিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, পুস্তক-প্রকাশন প্রভৃতি মিশন কর্তৃক পরিচালিত হইতেছে। বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, আধি-ব্যাধি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মিশনের কর্মিগণ আর্তসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। মিশন জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সেবাকার্য করেন—ইহা আমি ১৯৪৩ সনের বাংলার ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা-পরিভ্রমণের অনতিকাল পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক শহরে প্রথম বেদান্তকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বর্তমানে মার্কিনদেশে একাদশটি কেন্দ্রে বেদান্ত-দর্শন ব্যাখ্যাত ও প্রচারিত হইয়া থাকে। কতকগুলি দুরূহ কঠোর তত্ত্বপ্রচারের অথবা ধর্মান্তরিতকরণের কোন চেষ্টা করা হয় না। এই বেদান্তকেন্দ্রগুলি জ্ঞান, সংস্কৃতি ও শান্তির মহাপীঠস্থান—ইহারা মার্কিনজাতি ও ভারতীয়গণের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে সচেষ্ট।

সমালোচনা

নিগম-প্রসাদ—স্বামী সিদ্ধানন্দ-সম্পাদিত। প্রকাশক: সারস্বত মঠ, কোকিলামুখ, (যোরহাট) আসাম। পৃষ্ঠা—১১৪; মূল্য ১৷৹ আনা।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের উপদেশ-সংকলন। আধ্যাত্মিক আদর্শ ও সাধনা সম্বন্ধে এই স্বচ্ছ, সহজ ও সতেজ উক্তিগুলি আমাদিগকে বিশেষ তৃপ্তিদান করিয়াছে। যাঁহারা সক্রিয়ভাবে ধর্মজীবন যাপন করিতেছেন তাঁহারা বইটি পড়িয়া উপকৃত হইবেন।

মৃত্যু, পরকাল ও গতি সম্পর্কে শ্রীশ্রীঠাকুর—দক্ষিণ-বাঙ্গালা সারস্বত আশ্রম, হালিসহর (২৪ পরগণা) হইতে স্বামী সত্যানন্দ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। পৃষ্ঠা—৫৬; মূল্য—দশ আনা।

মৃত্যু মানুষের নিকট তাহার জীবনের অপেক্ষা জটিলতর প্রশ্ন। এই প্রশ্নের সমাধান সহজ নয় বলিয়াই মানুষ সাধারণতঃ উহা তাহার মনে উঠিতে দেয় না। ইহা মানুষের জীবনের এক মর্মান্তিক

প্রহসন। মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার ভাবা উচিত, উহার জন্য জ্ঞানপূর্বক প্রস্তুত হওয়া উচিত। শ্রীমৎ নিগমানন্দ পরমহংসদেবের কথিত এবং লিখিত এই উপদেশ-সংকলনে উক্ত বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাগণ প্রচুর আলোক পাইবেন।

মিলন-বাণী (দ্বিতীয় খণ্ড)—স্বামী সিদ্ধানন্দ-প্রণীত। প্রকাশক : কলিকাতা সারস্বত সঙ্ঘ, ৯৬, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, পৃষ্ঠা—৯৬; মূল্য—১৲ টাকা।

স্বরচিত কবিতা-গুচ্ছে লেখক স্বীয় গুরু শ্রীমৎ নিগমামন্দ পরমহংসদেবের কতকগুলি সুনির্বাচিত উপদেশ এই বইটিতে নিবদ্ধ করিয়াছেন। পুস্তকের 'পরিচয়ে' লেখক বলিতেছেন :—

ভোজনের সাথে ভজনের তরে, প্রধানতঃ এই
ভাবরাশি ঝরে
সম্মিলনীর মিলনানন্দ মধুর করিতে চায়।
দিকে দিকে দিকে এই ভাবরাশি, মিলনের পথ
দিবে গো প্রকাশি
এই ভাবে যেন বিশ্বসেবায় জীবন বহিয়া যায়॥

ছন্দোবদ্ধ এই সুপাঠ্য মূল্যবান উপদেশ-গ্রন্থের মাধ্যমে রচয়িতার উক্ত শুভেচ্ছা ফলবতী হউক ইহাই প্রার্থনা।

(১) 'সাধু-প্রসঙ্গ (২) আধুনিক ভক্ত-মাল (৩) ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ইতিহাস ও রূপ—শ্রীমতী সরোজবাসিনী সেন-প্রণীত; প্রকাশক—স্বর্ণময় সেন, ১১, ফার্ণ প্লেস, বালিগঞ্জ, কলিকাতা। পৃষ্ঠাসংখ্যা যথাক্রমে ৮০+৷৷০, ৩১৫ এবং ৫৮৫; মূল্য যথাক্রমে—৷৷০ আনা, ৸০ আনা এবং ১৷৷০ টাকা।

এই পুস্তকত্রয়ের মাধ্যমে বহুশ্রুতা, চিন্তাশীলা প্রবীণা লেখিকা ভারতের সনাতন ধর্ম-সাধনা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রের এবং সাধুমহাপুরুষদের বাণী অবলম্বনে সরল এবং ওজস্বিনী বিবৃতি দিয়াছেন। দ্বিতীয় বইটি কবিতার আকারে লেখা। রচয়িত্রীর চোখে-দেখা সাধু-সন্তের কাহিনীগুলি সরস এবং শিক্ষাপ্রদ। ছাপা এবং বিষয়-সজ্জার ত্রুটিগুলি খুবই চোখে পড়ে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

বৃন্দাবনে সেবাকার্য—১৯০৭ সালে স্থাপিত জনকল্যাণব্রতী প্রতিষ্ঠান—বৃন্দাবন, শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। এই সেবাকেন্দ্র ৪৬ বৎসর ধরিয়া অত্যন্ত কৃতিত্বপূর্ণভাবে শিবজ্ঞানে মানব-সেবা করিয়া আসিতেছে। ৫৫টি রোগিশয্যাযুক্ত অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বৎসরে ৮০৭ জন রোগীকে চিকিৎসার্থ গ্রহণ করা হইয়াছিল। বহির্বিভাগে নূতন ও পুরাতন চিকিৎসিতের সংখ্যা ছিল—৯৭,৬৯৮; অস্ত্রোপচারের সংখ্যা—৪,৩৯৭।

১৯৪৩ সাল হইতে এখানে চক্ষুরোগের চিকিৎসার্থে আধুনিক সাজসরঞ্জামসমন্বিত একটি পৃথক হাসপাতাল খোলা হইয়াছে। আলোচ্য বৎসরে এই 'নন্দবাবা চক্ষু হাসপাতালে'র বহির্বিভাগে ২৬,৫৯৩ জন এবং অন্তর্বিভাগে ১,১০৬ জন রোগীকে চিকিৎসা করা হইয়াছে। রঞ্জন রশ্মি এবং তড়িৎপ্রবাহ সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থাও এখানকার উল্লেখযোগ্য বিষয়। রোগ নির্ণয় এবং তৎসম্বন্ধীয় নানাপ্রকার অনুসন্ধান ইত্যাদির জন্য একটি পরীক্ষাগারও হাসপাতালটির সর্বাঙ্গীনতা প্রকাশ করে।

ভদ্রপরিবারের নিঃস্ব বিধবাদের এবং দুঃস্থদিগকেও মাসে মাসে এবং অন্যসময়েও কখনও কখনও অর্থসাহায্য করা হইয়া থাকে।

মেদিনীপুর সেবাকেন্দ্রে অনুষ্ঠান—বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সহকারী সভাপতি পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী মহারাজ গত ২৪শে আষাঢ় মেদিনীপুর শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে শুভাগমন পূর্বক এক পক্ষকাল অবস্থান করেন। ২৮শে আষাঢ় আশ্রম-পরিচালিত হাইস্কুল 'শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাভবনে'র নবনির্মিত গৃহটির দ্বারোদ্ঘাটন-অনুষ্ঠান পূজ্যপাদ মহারাজজীর দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

পূজ্যপাদ মহারাজজীর অবস্থান-কালে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ভক্ত পরিবার তাঁহার দর্শন এবং সঙ্গলাভ মানসে আশ্রমে আগমন করিয়াছিলেন। তিনি প্রত্যহ উদ্দীপনাময় ধর্মপ্রসঙ্গ দ্বারা সকলকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

ধর্ম-প্রচার—জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি হইতে আষাঢ় মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত বোম্বাই শাখা-কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ কলিকাতায় ৪টি, ঢাকা জেলার নানাস্থানে ৯টি এবং ইম্ফলে (মণিপুর) ৪টি ধর্ম এবং আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি বিষয়ে ভাষণ দিয়াছেন। আষাঢ় মাসে স্বামী প্রণবাত্মানন্দ বৃন্দাবন ও মথুরায় ছায়াচিত্রযোগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী সম্বন্ধে বাঙলা ও হিন্দীতে ৫টি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। স্বামী অচিন্ত্যানন্দ পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট, রায়গঞ্জ, কুশমুণ্ডী, গঙ্গারামপুর এবং কালিয়াগঞ্জে কয়েকটি ধর্ম-বক্তৃতা দেন।

বলরাম-মন্দিরে ধর্মালোচনা-সভা—বাগবাজার, 'বলরাম মন্দিরে' (৫৭, রামকান্ত বসু ষ্ট্রীট) সাপ্তাহিক ধর্মালোচনা সভায় প্রতি শনিবার স্বামী সাধনানন্দ, "গীতা"; স্বামী দেবানন্দ, "শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত"; স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, "উপনিষদ"; অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারি চক্রবর্তী, "মহাভারত"; অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও পণ্ডিত শ্রীবিজপদ গোস্বামী, ভাগবতরত্ন, "শ্রীমদ্ভাগবত" ধারাবাহিকরূপে আলোচনা করিতেছেন। সভার প্রারম্ভে ও অন্তে কলিকাতায় বিখ্যাত গায়কগণ ভজন ও কীর্তনাদি করিয়া থাকেন। এতদ্ব্যতীত গত কয়েকমাসে বিশেষ কয়েকটি ধর্মসভার অধিবেশনে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ, স্বামী জ্ঞানাত্মানন্দ, স্বামী বোধাত্মানন্দ, স্বামী পুণ্যানন্দ, স্বামী সৎস্বরূপানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, অধ্যাপক শ্রীসুধাংশুকুমার সেনগুপ্ত, শ্রীকুমুদবন্ধু সেন, অধ্যাপক শ্রীবিনয়কুমার সেন, দার্শনিক শ্রীরমণীকুমার দত্তগুপ্ত, শ্রীহরিকুমার কাব্যতীর্থ বাচস্পতি ও পণ্ডিত শ্রীরামনারায়ণ তর্কতীর্থ প্রভৃতি সন্ন্যাসী ও বিদ্বজ্জন ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিষয়ে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

যক্ষ্মা আরোগ্যালয়ে রাজ্যপাল—গত ২রা শ্রাবণ, বিহারের রাজ্যপাল শ্রীরঙ্গনাথ রামচন্দ্র দিবাকর মিশনের রাঁচি টি, বি, স্যানাটোরিয়াম পরিদর্শন করেন। মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনীর মধ্যে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিগণের অতন্দ্রিত উদ্যমে দ্রুত বিস্তারশীল প্রতিষ্ঠানটির পরিচ্ছন্নতা, আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসাপ্রণালী এবং কঠিন ব্যাধিতে পীড়িত শঙ্কাতুর রোগিগণের প্রতি আত্মীয়বৎ সেবাযত্নের ব্যবস্থাদি দেখিয়া রাজ্যপাল বিস্ময়াবিষ্ট হন। আরোগ্যালয়ের প্রধান সেবক স্বামী বেদান্তানন্দ, সহকারী কর্মসচিব স্বামী আত্মস্থানন্দ এবং অন্যান্য সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণের সহিত রাজ্যপাল কিয়ৎকাল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের শিক্ষা সম্বন্ধেও কথাবার্তা বলেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

Vivekananda—A vivid and authentic biography by Swami Nikhilananda.

Published from the Ramakrishna-Vivekananda Center.
17 East 94th Street, New York, U.S.A.
Cloth bound. 224 pages. Price $ 3.50

বিবিধ সংবাদ

'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'-স্মরণে—ভগবান বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর সারনাথে (মৃগদাব) তাঁহার প্রথম উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্মরণীয় ঘটনা বৌদ্ধগণ 'ধর্মচক্র-প্রবর্তন'-উৎসবের মাধ্যমে স্মরণ করিয়া থাকেন। গত ৯ই শ্রাবণ (২৫শে জুলাই) কলিকাতা মহাবোধি সোসাইটির ধর্মরাজিক বিহারে এই উৎসব বহু বৌদ্ধ এবং হিন্দু জনসাধারণেরও উপস্থিতিতে প্রভূত উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সন্ধ্যায় আহূত জনসভায় নেতৃত্ব করেন শ্রীপি, আর, দাশগুপ্ত।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুবার্ষিকী—গত ১৩ই শ্রাবণ কলিকাতা ও হাওড়ার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষায়তনের উদ্যোগে প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ৬২তম তিরোধান দিবস উদ্‌যাপন করা হয়। প্রাতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগরের কলেজ স্কোয়ারস্থিত মর্মরমূর্তিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। সায়াহ্নে বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত এক সভায় বিভিন্ন বক্তা যুগপ্রবর্তক, পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বদান্যতা, দেবদুর্লভ করুণা, দুঃস্থ ও নিপীড়িত জনগণের প্রতি পরম সহানুভূতি, কর্তব্যপালনে দৃঢ়তা ও তেজস্বিতা প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করেন। ১৩এ, চক্রবেড়িয়া রোড-স্থিত বিদ্যাসাগর হাসপাতালে এতদুপলক্ষে অনুষ্ঠিত একটি স্মৃতিসভায় কলিকাতার পৌর-সভার অধ্যক্ষ শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় সভাপতিত্ব এবং মনোজ্ঞ বক্তৃতা করেন।

পরলোকে বিশিষ্ট সেবাব্রতী—গত ৩২শে আষাঢ় জামশেদপুর বিবেকানন্দ সোসাইটির প্রাণস্বরূপ অক্লান্ত কর্মযোগী শ্রীউপেন্দ্রলাল মুখোপাধ্যায়ের হৃদ্‌যন্ত্রের দুর্বলতায় কলিকাতার আর, জি, কর কলেজ হাসপাতালে ৫৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু যেমন অপ্রত্যাশিত, তেমনিই শোকাবহ। ঢাকায় পাঠ্যজীবন হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ১৯২০ সালে কর্মস্থান জামশেদপুরে অনেকগুলি যুবককে লইয়া উপেন্দ্রলাল 'বিবেকানন্দ সোসাইটি'র মাধ্যমে নানাপ্রকার সেবাকার্যে ব্রতী হন। এই প্রতিষ্ঠান পরে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক শাখাকেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। উপেনবাবুই ছিলেন সোসাইটির সেক্রেটারী এবং তাঁহার সুযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মধারা প্রভূত প্রসার লাভ করে। অকৃতদার উপেন্দ্রলাল পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং উন্নত চরিত্র, অমায়িক ব্যবহার এবং উদার সহানুভূতির জন্য ছোটবড় সকলেরই শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতেন। শ্রীভগবান তাঁহার পরলোকগত আত্মার শান্তিবিধান করুন ইহাই আমাদের ঐকান্তিক প্রার্থনা।

স্বর্গীয় রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীমায়ের মন্ত্রশিষ্য আদর্শচরিত্র শিক্ষাব্রতী চিরকুমার অধ্যাপক রাসবিহারী চট্টোপাধ্যায় গত ২রা শ্রাবণ, কলিকাতা চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে আনুমানিক ৫০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। বাল্যকাল হইতেই তিনি বেলুড় মঠের সংস্পর্শে আসেন এবং পূজ্যপাদ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের বিশেষ স্নেহ ও আশীর্বাদ লাভ করেন। রাসবিহারীবাবু কলিকাতায় কয়েকটি কলেজে বিভিন্ন সময়ে রসায়ন-শাস্ত্রে অধ্যাপনা করিবার কালে ছাত্রসমাজের প্রভূত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। কিছুকাল তিনি বিজ্ঞানকলেজেও গবেষণা-কার্যে ব্রতী ছিলেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। পরলোকগতের আত্মার ঊর্ধ্বগতি কামনা করি।



উদ্বোধন

দুর্গা

নির্লেপা নির্মলা নিত্যা নিরাকারা নিরাকুলা। নিশ্চিন্তা নিরহংকারা নির্মোহা মোহনাশিনী।
নির্গুণা নিষ্কলা শান্তা নিষ্কামা নিরুপপ্লবা ॥ নির্মমা মমতাহন্ত্রী নিষ্পাপা পাপনাশিনী ॥
নিত্যমুক্তা নির্বিকারা নিষ্প্রপঞ্চা নিরাশ্রয়া। নিষ্ক্রোধা ক্রোধশমনী নির্লোভা লোভনাশিনী।
নিত্যশুদ্ধা নিত্যবুদ্ধা নিরবদ্যা নিরন্তরা ॥ নিঃসংশয়া সংশয়ঘ্নী নির্ভবা ভবনাশিনী ॥
নিষ্কারণা নিষ্কলঙ্কা নিরুপাধির্নিরীশ্বরা। নির্বিকল্পা নিরাবাধা নির্ভেদা ভেদনাশিনী।
নীরাগা রাগমথনী নির্মদা মদনাশিনী ॥ নির্নাশা মৃত্যুমথনী নিষ্ক্রিয়া নিষ্পরিগ্রহা ॥

নিস্তুলা নীলচিকুরা নিরপায়া নিরত্যয়া।
দুর্লভা দুর্গমা দুর্গা দুঃখহন্ত্রী সুখপ্রদা ॥

—শ্রীললিতাসহস্রনামস্তোত্রম্ (৪৪-৫০)

জগজ্জননী দুর্গা স্বরূপতঃ নিত্য নিরাকার নিরবয়ব নির্গুণ পরব্রহ্ম। কোন কিছুতেই তাঁহাকে লিপ্ত করিতে পারে না, তাই তিনি সর্বপ্রকার মালিন্য-রহিতা—কোন কিছুরই কামনা তাঁহার নাই, তাই তিনি চির-শান্তা, অক্ষুব্ধা। নিত্যই তিনি মুক্তা, নিত্যই তিনি শুদ্ধা, নিত্যই তিনি জ্ঞান-দীপ্তা। তাঁহাতে কোন বিকার নাই, ছেদ নাই, নিন্দনীয় কিছু নাই। সৃষ্টি-প্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে তিনি, তাই তাঁহার কোন আশ্রয়ের প্রয়োজন হয় না—তিনি নিরালম্বা। সব কিছুর কারণ আছে, তাঁহার আর কোন কারণ নাই; সব কিছুরই কিছু-না-কিছু কলঙ্ক আছে, মা আমার নিষ্কলঙ্কা। তাহাকে চিহ্নিত করিবার জন্য কোন পরিচায়ক (উপাধি) নাই, তাঁহাকে শাসনে রাখিবার জন্য অপর কোন ঈশ্বর নাই। নিজে রাগ (আসক্তি)-মুক্তা—সাধকের সকল বিষয়রাগ তিনিই দেন মথন করিয়া, নিজে তিনি মদশূন্যা—মুমুক্ষুর কুটিল মিথ্যাদম্ভ তাই তাঁহারই কৃপায় হয় উন্মূল।

নিশ্চিন্তা তিনি, নিরহঙ্কার তিনি। মোহ নাই, তাই মোহনাশিনী; মমত্বাভিমান নাই, তাই সংসার-মমতাহন্ত্রী; অপাপবিদ্ধা, তাই পাপ-বিদারিণী। জন্মরহিতা মা শরণাগতের জন্ম-মৃত্যুরূপ সংসারক্লেশ দূর করিয়া দেন। ক্রোধ-লোভ-সংশয় নির্মুক্তা তিনি, তাইতো (তাঁহার চরণকমল ধ্যান করিয়া) চিত্তের ক্রোধ-লোভ-সংশয় হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারি। মায়ের নির্বিকল্প স্বরূপে কোন সন্তাপ নাই, ভেদ নাই, বিনাশ নাই, ক্রিয়া নাই, পরিগ্রহ নাই। সেই স্বরূপের জ্ঞান লাভ করিলে সকল ভেদ ও মৃত্যুর অবসান হয়।

যিনি দুর্লভ, যিনি দুর্গম, সেই অবিচ্যুতা অনতিক্রম্যা মহামায়া দুর্গা ভক্তের দুঃখ হরণ করিবার জন্য অতুলনীয় ভাগবতী মূর্তিতে নীল কেশজাল বিস্তার করিয়া ভক্তের সম্মুখে প্রত্যক্ষা আবির্ভূতা।

কথাপ্রসঙ্গে

নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ

শারদীয়া দুর্গাপূজার কয়েক দিন বাঙলার আকাশ-বাতাস জগজ্জননীর প্রণাম-মন্ত্রের সুললিত গম্ভীর গীতি-ছন্দে ভরিয়া উঠে। বহু জাতি, বহু সামাজিক স্তরে বিভক্ত বাঙালী হিন্দু এখনও যে কয়েকটি বিষয় অবলম্বন করিয়া এক, তাহাদের মধ্যে বোধ করি, তাহার শক্তিপূজা—মাতৃপূজাই প্রধান। শারদীয়া দুর্গাপূজাকে বাঙালী হিন্দুর জাতীয় উৎসব বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বাঙলার যখন সুদিন ছিল তখন এই উৎসব তাহার পারিবারিক এবং সামাজিক জীবনে প্রতি বৎসর একটি নূতন প্রাণশক্তির সঞ্চার করিত, আর উহার ক্রিয়া চলিত সারা বৎসর ধরিয়া। দশভুজাকে বাঙালী পূজা করিত শুধু পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য নয়, তাহার পৃথিবীর জীবনকে সংহত, সমৃদ্ধ—অথচ সংযত, সুনিয়োজিত করিবার প্রেরণা ও শক্তিলাভ করিবার উদ্দেশ্যে। সে জানিত, মা 'ভোগ-স্বর্গাপবর্গদা'—সাংসারিক জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মৃত্যুর পরে স্বর্গসুখ, আবার ইহলোক ও পরলোক—এই দুয়ের অতীত যে তত্ত্বজ্ঞানরূপ মুক্তি, তিনটাই তাঁহার কৃপায় সে পাইতে পারে। দেবীর নিকট সে অকুণ্ঠিত চিত্তে তাই প্রার্থনা করিত—"রূপং দেহি, জয়ং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি"— রূপ দাও, জয় দাও, যশ দাও, অশুভ বিনাশ কর। "বিধেহি দেবি কল্যাণং বিধেহি বিপুলাং শ্রিয়ম্"—হে দেবী, দিকে দিকে কল্যাণ বিস্তীর্ণ কর, বিপুল শ্রীর বিধান কর। গদ্গদ-কণ্ঠে সে উচ্চারণ করিত, বিশ্বসংসারে যাহা কিছু রমণীয়, যাহা কিছু শক্তিমান, যাহা কিছু আকর্ষণীয় সবই সেই জগদম্বার বিভূতি—নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ, নমস্তস্যৈ নমো নমঃ—তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার, তাঁহাকে নমস্কার।

আজ আর বাঙালীর সে দিন নাই। দুর্গাপূজা আজও সে করে বটে, কিন্তু সে পূজায় প্রাচীন দিনের সে প্রতীক্ষা, সে হৃদয়াবেগ, সে ভক্তি-বিশ্বাস, সে আনন্দ-তৃপ্তি নাই। প্রতিমা গড়িয়া, পূজামণ্ডপ সাজাইয়া, দেবীর পূজার পদ্ম আহরণ করিয়া, ঢাকঢোল সানাইএর বাদ্য, যাত্রাগান শুনিয়া, নানা উপচার-মন্ত্র-অনুষ্ঠানযুক্ত পূজা-হোমাদি দেখিয়া, চিড়া মুড়কী নারিকেল-নাড়ুর সম্ভার সাজাইয়া, বিলাইয়া আজ আর তাহার হৃদয় পুরে না। পূজার পরিবেশ তাহার কাছে আজ মনে হয় রসহীন, অপূর্ণ। উহাকে সরস করিতে, পরিপূর্ণ করিতে তাহার তাই আমদানী করিতে হয় আধুনিক হালকা ব্যসনসমূহ—বাহ্যিক বহুতর বিলাস-আড়ম্বর। দেবী আজ আর তাহার নিকট জীবন্ত মাতৃ-মূর্তি নন্—তাহার মৃত্তিকা-শিল্পে মুন্সীয়ানা দেখাইবার মডেল মাত্র!

প্রগতি-পন্থী বাঙালীকে এই ভাব-সাঙ্কর্য হইতে সাবধান হইতে হইবে। প্রাচীনকালে পূজা ছিল, আবার অন্য দশ রকম সামাজিক আমোদ-প্রমোদও ছিল—কিন্তু পূজার পরিবেশের বিশুদ্ধতা ও গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ করিয়া আমোদ-প্রমোদকে প্রশ্রয় দেওয়া হইত না। বাঙালী বহুবার তাহার হৃদয়ের ভক্তি দিয়া, শ্রদ্ধা বিশ্বাস ব্যাকুলতা দিয়া মৃন্ময়ী প্রতিমায় চিন্ময়ীর আবির্ভাব ঘটাইয়াছে। এখনও উহা সে পারে। শুধু চাই কিছু অন্তর্মুখীনতা, বিশ্বাস, আত্মবিশ্লেষণ,

সংযম, শান্ত বিচারবুদ্ধি। উহাদের অতন্দ্রিত প্রয়োগে সে তাহার মাতৃপূজা পুনর্বার সার্থক করিয়া তুলুক— জাগ্রত জীবন্ত মায়ের বেদির সম্মুখে বাঙালীর সকল দুর্বলতা, বিচ্ছিন্নতা, ঈর্ষা, স্বার্থপরতা দূর হউক—বাঙালী আবার জীবনের সর্বক্ষেত্রে তাহার দীপ্ত গৌরব লাভ করুক।

পরধর্মে বাস্তব সহানুভূতি

স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্যদেশ হইতে ফিরিয়া তাঁহার প্রথম বক্তৃতায় (কলম্বো, জানুয়ারী, ১৮৯৭) ভারত-সংস্কৃতির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন,—

"পরধর্মে বিদ্বেষরাহিত্য এবং ধর্মভাবের উপর সহানুভূতি জগতে এখনও যতটুকু আছে তাহা কার্যতঃ এখানেই—এই আর্যভূমেই দেখিতে পাওয়া যায়—অন্যত্র ইহা দুর্লভ। এখানেই কেবল ভারতবাসীরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ এবং খ্রীষ্টানদের জন্য গির্জা নির্মাণ করিয়া দেয়—আর কোথাও নয়। যদি তুমি অন্যান্য দেশে গিয়া মুসলমানগণকে বা অন্য ধর্মাবলম্বিগণকে তোমার জন্য একটি মন্দির তৈরী করিয়া দিতে বল, দেখিও তাহারা কিরূপ সাহায্য করে! তৎপরিবর্তে তাহারা সেই মন্দির এবং পারে তো সেই সঙ্গে তোমার দেহমন্দিরটিও ভাঙ্গিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিবে। অতএব জগতের পক্ষে এই এক মহতী শিক্ষা ভারতের নিকট লওয়ার প্রয়োজন আছে—উহা এই দৃষ্টি যে, পরধর্মকে শুধু সহিয়া যাওয়া নয়, উহার উপর প্রবল সহানুভূতি।"

ধর্মের প্রতি এই উদার মনোভাব ভারতবাসী মাত্রেরই থাকা উচিত—তিনি হিন্দুই হউন বা অহিন্দুই হউন। অবশ্য হিন্দুদের ইহা অনেকটা স্বভাবসিদ্ধ—কিন্তু ভারতীয় খ্রীষ্টান, মুসলমান, পারসিক, শিখদেরও মধ্যে ইহা পরিলক্ষিত হওয়া বিচিত্র নয়। একটি সাম্প্রতিক ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডক্টর হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় গত বৎসর শরৎকালে যখন দার্জিলিং-এ অবস্থান করিতেছিলেন, তখন স্থানীয় অনেক নেপালী হিন্দুর রীতিনীতি ও আচার অনুষ্ঠানাদি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারেন হিন্দুধর্মের সম্বন্ধে তাহারা একান্তই অজ্ঞ। নেপালী ভাষায় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ছাপাইয়া নেপালী-সমাজে উহার প্রচারের সঙ্কল্প তাঁহার চিত্তে উদয় হয়। অতঃপর কি করিয়া তিনি উপযুক্ত সংস্কৃতজ্ঞ নেপালী পণ্ডিতদের দ্বারা গীতার অনুবাদ করাইলেন এবং প্রয়োজনীয় কাগজ ও মুদ্রণাদির জন্য অর্থ-সংগ্রহান্তে দশ হাজার গীতাগ্রন্থ প্রকাশ ও পাহাড়ীয়াদের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করিলেন তাহা শ্রীজীবনজী দেশাইকে লিখিত সাম্প্রতিক তাঁহার একখানি পত্রে (যাহা ৮ই আগষ্টের হরিজন পত্রিকায় ছাপা হইয়াছে) পড়িতে পড়িতে এই উদারহৃদয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী মনীষীর প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ধর্মের বহিরাবরণ ভেদ করিয়া তিনি উহার শাশ্বত সত্যকে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত 'মতুয়ার বুদ্ধি' তাঁহার নাই।

সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ

সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের সংস্কৃতানুরাগী অনেক মনীষী আগ্রহ এবং উৎকণ্ঠাও প্রকাশ করিতেছেন। সংস্কৃত জ্ঞানভাণ্ডারের মধ্যে ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির একটি বৃহৎ পরিচয় নিহিত রহিয়াছে। এই ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে জানিতে হইলে সংস্কৃত ভাষাকে অবহেলা করিলে চলিবে না, ইহা অনেকেই বুঝিতেছেন।

কিন্তু বুঝা এক, আর কার্যে পরিণত করা ভিন্ন কথা। শুধু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ধ্যানে তো পেট ভরে না, সাংসারিক অভাব মেটে না। এই পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যের যুগে সংস্কৃত শিখিয়া পয়সা রোজগার করা যায় না। অতএব সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে কার্যকরী এমন একটা কিছুও শিক্ষা চাই যদ্দ্বারা অর্থাগম হয়,

এইরূপ একটা সিদ্ধান্তে শিক্ষাবিদ্‌গণ কমবেশী একমত হইতেছেন। কিন্তু ইহার পক্ষে বাধাও আছে প্রচুর। সংস্কৃত-শিক্ষার বিষয়বস্তু এবং প্রণালী এ পর্যন্ত যাহা প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায় উহা ঐরূপই রাখিলে, শিক্ষার্থীর অবসর এবং শক্তির এমন একটা ফালতু অংশ খুঁজিয়া পাওয়া সুকঠিন যদ্দ্বারা সে সংস্কৃত-শিক্ষার রুটীন যথাযথ অনুসরণ করিবার পরও উহার বাহিরে অপর কিছুতে কার্যকরী ভাবে মন দিতে পারে। অতএব সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ লইয়া যাঁহারা চিন্তা করিতেছেন তাঁহাদিগকে সংস্কৃত-শিক্ষার বিষয়বস্তু ও প্রণালীতে কতটা কি কালোপযোগী পরিবর্তন সাধন করা যায় তাহাও ভাল করিয়া ভাবিতে হইবে। আচার্য যদুনাথ সরকার তাঁহার একটি সাম্প্রতিক প্রবন্ধে (হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড, ২৩শে আগষ্ট, ১৯৫৩) সংস্কৃত-শিক্ষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা এই বিষয়ে প্রভূত আলোকসম্পাত করে। আচার্য সরকার বলিতেছেন :—

সংস্কৃত-চর্চা যদি ভারতবর্ষে একটি জীবন্ত শিক্ষাধারারূপে চালু না থাকে তাহা হইলে ভারত তাহার আত্মাকে হারাইয়া বসিবে। * * *

সংস্কৃতের একটি চলনসই জ্ঞান, এমন কি ব্যাকরণের বা অলঙ্কারের কলাকৌশল ছাড়িয়া সহজ শুদ্ধভাবে ঐ ভাষায় কিছু কিছু লিখিতে পারা—ইহা এই দেশে আমাদের সকলের পক্ষেই একটি প্রকাণ্ড মানসিক সম্পত্তি। সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাবধারা আমাদের হৃদয়ের পরম সান্ত্বনা। আমাদের পূর্বপুরুষগণের সরল জীবন-ধারার সময়ের তুলনায় বর্তমান যান্ত্রিক যুগে ইহার প্রয়োজন কমে তো নাইই, বরং বাড়িয়াছে। সংস্কৃতকে এই দেশে একটি 'জীবন্ত' শিক্ষা-বস্তু করিয়া তুলিবার আমি পক্ষপাতী। ইহা দ্বারা আমি ইহাই বলিতে চাই যে, বহুতর শিক্ষিত নরনারী এই ভাষা একটি আনন্দের বস্তু এবং সংস্কৃতির অঙ্গরূপে চর্চা করিবেন, এই ভাষার সাহিত্য ও দর্শন হইতে তাঁহাদের অন্তর্জীবন গঠনের উপাদান এবং তাঁহাদের নিজস্ব মাতৃভাষার সমৃদ্ধিতে প্রেরণা সংগ্রহ করিবেন। * * * * *

ভারতীয় শিক্ষিত জনসাধারণকে সংস্কৃত শিখিবার উৎসাহদানের জন্য আমার কয়েকটি কার্যকরী ইঙ্গিত এই :—

(১) স্কুল এবং কলেজে সংস্কৃত-শিক্ষণরীতিতে ব্যাকরণ একান্ত যেটুকু অপরিহার্য ততটুকুই মাত্রা রাখা। মুখস্থ করার প্রয়োজন কমাইয়া আনা। ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট বিষয়বস্তুটি খুব চিত্তাকর্ষক করিয়া উপস্থিত করা, সাহিত্যের মর্মে যাহাতে তাহারা প্রবেশ করিতে পারে। কোন প্রাচীন 'ক্লাসিক'এর সম্পূর্ণটি পাঠ্য না করিয়া সুনির্বাচিত অংশবিশেষ পড়িবার ব্যবস্থা। এক একটি অধ্যায়েরও কোন কোন শ্লোক বাদ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যগুলি সহজভাষায় পুনর্লিখন। সংস্কৃত-পরীক্ষারীতিকে বর্তমান প্রণালীতে লইয়া আসা।

(২) সংস্কৃত সাহিত্যগ্রন্থগুলির দেশীয় ভাষায় অনুবাদ প্রচার। মূল সংস্কৃত, পৃষ্ঠার অপর দিকে রাখিলে চলিবে।

(৩) সংস্কৃত সাহিত্য হইতে শ্রেষ্ঠ অংশসমূহের সঙ্কলন অনুবাদাকারে প্রকাশ। এই অনুবাদ ইংরেজীতে হইলে ভারতের সকল রাজ্য এবং ইউরোপ ও আমেরিকাতেও ঐ গ্রন্থ চলিবে। যেমন—Warren's Buddhism in Translation.

(৪) সংস্কৃত গ্রন্থসমূহের মুদ্রণ এবং বিক্রয়ের জন্য একটি সর্ব-ভারতীয় ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা।

ষাট বৎসর পরে

গত সেপ্টেম্বর মাসে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো ধর্মমহাসম্মেলনে ঐতিহাসিক আবির্ভাবের ষাট বৎসর পরিপূর্ণ হইল। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর পরাধীন ভারতের ত্রিশ-বৎসর-বয়স্ক এক অজ্ঞাত অনাহূত সহায়-সম্বল-পরিচয়-হীন কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী পাশ্চাত্ত্য ঐশ্বর্য-বিভব-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্প-বাণিজ্য-দীপ্ত আমেরিকায় পৃথিবীর নানা স্বাধীন দেশের বিদগ্ধ বুধমণ্ডলীর সম্মুখে 'হে আমেরিকাবাসী ভগ্নী ও ভ্রাতৃবৃন্দ'—এই সম্বোধন এবং পরবর্তী দশমিনিটের সংক্ষিপ্ত ভাষণে চিরন্তন ধর্মের উদার সার্বভৌম দৃষ্টিভঙ্গীর

ঘোষণা দ্বারা ছয়সাত হাজার সুশিক্ষিত শ্রোতৃগণের মধ্যে যে অভূতপূর্ব বিস্ময় ও উদ্দীপনার সঞ্চার করিয়াছিলেন, তাহা মানুষের ধর্মেতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা সন্দেহ নাই। মহাসম্মেলনে স্বামিজী পরে আরও ছয়টি বক্তৃতা দিয়াছিলেন (১৫ই, ১৯শে, ২০শে, ২২শে, ২৬শে এবং ২৭শে সেপ্টেম্বর)। ১৯ তারিখের বক্তৃতাটি 'হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে তাঁহার বিখ্যাত লিখিত ভাষণ। এই সকল বক্তৃতার মাধ্যমে স্বামিজী বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন যে ধর্ম লইয়া নানা মতবাদ, আচার-অনুষ্ঠান, বাগ-বিতণ্ডা প্রভৃতির পশ্চাতে সকল জাতির সকল মানুষের মধ্যে একটি অপরিবর্তনীয় সর্বজনীন শাশ্বত সত্য রহিয়াছে; উহারই অনুসন্ধান এবং প্রত্যক্ষানুভূতি হইতেছে ধর্মের প্রকৃত লক্ষ্য। ভারতবর্ষের বেদান্ত-প্রতিপাদিত মানবাত্মার এই অমর মহিমার কথা স্বামিজীর মুখে শুনিয়া পাশ্চাত্যজগৎ যেন তাহার আত্ম-সম্বিৎ ফিরিয়া পাইয়াছিল।

"হে ভ্রাতৃগণ, 'অমৃতের অধিকারী'—এই মধুর নামে আমি তোমাদের সম্বোধন করিতে চাই।...তোমরা ঈশ্বরের সন্তান, অমৃতের অধিকারী, পবিত্র ও পূর্ণ। তোমরা এই মর্ত্যভূমির দেবতা। তোমরা পাপী? উহা অসম্ভব। মানবকে পাপী বলাই এক মহাপাপ।"

ধর্মের প্রকৃত মর্ম কি—কি প্রণালীতে বিভিন্ন দেশের বিভিন্নধর্মাবলম্বী জনগণের মধ্যে প্রেম ও পারস্পরিক সহানুভূতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে—বর্তমান জগতের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মের আদর্শ ও সাধনাকে কি ভাবে কতটা পরিবর্তিত করা প্রয়োজন—বিশ্বসভ্যতায় ধর্মের আদিজননী ভারতের অবদান কি—বর্তমান পাশ্চাত্ত্য-সভ্যতার বিপদ কোথায়—উহা হইতে উদ্ধারের উপায় কি—ইত্যাদি বিষয়ের সতেজ, সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত স্বামিজীর বাণী হইতে সকলের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। অন্তিম বক্তৃতায় তাঁহার শেষ কথাগুলি :—

পবিত্রতা, চিত্তশুদ্ধি ও দয়াদাক্ষিণ্য জগতের কোন একটি বিশেষ ধর্মের সম্পত্তি নয় এবং প্রত্যেক ধর্মেই অতি মহানুভব উন্নত চরিত্র নরনারীর আবির্ভাব হইয়াছে। এই প্রমাণ সত্ত্বেও যদি কেহ এখনও ভাবেন যে, সকল ধর্ম উচ্ছিন্ন হইবে, শুধু তাঁহারটিই থাকিবে, তবে আমি সর্বান্তঃকরণে তাঁহাকে করুণার পাত্র বিবেচনা করি ও এই কথা বলি যে, শীঘ্রই দেখিবেন, আপনার বিরুদ্ধাচরণ সত্ত্বেও সকল ধর্মের পতাকাশীর্ষে লিখিত হইবে,—'সমর নহে—সহায়তা', 'বিনাশ নহে—বরণ', 'দ্বন্দ্ব নহে—মিলন ও শান্তি।'

বিগত ষাট বৎসরে প্রাচ্যে এবং পাশ্চাত্ত্যে স্বামী বিবেকানন্দের কথিত বাণীগুলি ধীরে ধীরে মানুষের ধর্ম-সংস্কৃতিতে প্রত্যক্ষ রূপ পরিগ্রহ করিতেছে। বিশ্বসভ্যতার সঙ্কটমোচনে উহাদের উপযোগিতা গভীর ও দূরপ্রসারী। শিকাগোর ধর্ম-সম্মেলনে স্বামিজীর আবির্ভাব তাই বিশেষভাবে অনুধ্যানের যোগ্য।

ঈশ্বরের ও বিষয়ের সেবা একসঙ্গে হয় না *

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ

হৃদয়ে যথার্থ ভগবৎপ্রেমের বিকাশ না হইলে কেহ ধার্মিক হইতে পারে না। ঈশ্বরের প্রতি টান যখন সাংসারিক আকর্ষণের অপেক্ষা প্রবল হয় তখনই হয় ধর্মের আরম্ভ। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, দেহের ভিতর দুইটি চুম্বকপাথর রহিয়াছে—একটি নীচে, অপরটি উপরে। আর মাঝখানে মন যেন এক টুকরা লোহা। নীচের পাথরটির আকর্ষণ প্রবল হইলে মনকে নীচের দিকে টানিয়া আনে—আর উপরের পাথরটি যদি অধিকতর শক্তিশালী হয় তাহা হইলে উহা মনকে টানিয়া উপরে তোলে। বেশীর ভাগ লোকেরই ঐ নীচের পাথরটি সম্পূর্ণ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, তাই সহজেই মনকে নীচের দিকে টানিয়া রাখে—আর উপরের পাথরটি তমোগুণে আচ্ছন্ন—অর্থাৎ অজ্ঞান ও অশুচিতায় ধূলিধূসরিত, তাই ইহার আকর্ষণী শক্তিও সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। ঐ তমোগুণের ধূলাবালি ঝাড়িয়া ফেল, দেখিবে মন স্বতই ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হইবে।

* লেখকের ইংরেজী রচনা হইতে সঙ্কলন : সান্ ফ্রান্সিস্কো বেদান্ত সমিতি। বঙ্গানুবাদ : শ্রীনৃত্যগোপাল রায়।

বিষয়ী লোকদের সকলেরই মনের গতি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য সুখ ও সাংসারিকতার প্রতি। নীচের চুম্বকপাথরের আকর্ষণ শিথিল হইলে বুঝিতে হইবে অপর কোন প্রবলতর শক্তির ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে। একমাত্র ঈশ্বরই সেই প্রবলতব শক্তি। ঈশ্বরোন্মুখ এই আকর্ষণের নামই ধর্ম। কাজেই যাহার প্রাণে প্রবল ভগবৎপ্রেমের উদ্রেক হয় নাই, যথার্থ ধর্মজীবন তাহার পক্ষে আরম্ভই হইতে পারে না।

এই দুই আকষণকে কিন্তু মিলিত করা যায় না। যেমন আলো ও অন্ধকারের একত্রীকরণ সম্ভবপর নয়, তেমনি ভগবান ও বিষয়ের ভজনা একসঙ্গে হয় না। পার্থিব আকর্ষণ অহমিকার নামান্তর, পক্ষান্তবে ঈশ্বরানুবাগ অর্থে ভগবানে আত্মসমর্পণ। 'অহং'-'অহং'-ভাব থাকা মানেই বুঝিতে হইবে যে মানুষ পাথিব বন্ধনের দাস। 'পার্থিব' বলিতে কি বুঝায়? বুঝায় ইন্দ্রিয়ভোগ্য সুখ, ধনৈশ্বর্য, নাম ও যশ। বিষয়বস্তু নিয়তই আমাদের দৃষ্টিপথে পড়িয়া আমাদিগকে প্রলুব্ধ করে এবং আমরা বলিয়া উঠি "আমি ইহা চাই, উহা চাই।" কিন্তু আরও হয়তো এমন শতশত ব্যক্তি রহিয়াছে যাহারা ঐ একই জিনিস চায়, কাজেই আমবা উহার জন্য পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করি। এইরূপে আসে প্রতি-যোগিতা ও সংগ্রামের সূচনা। এই সংগ্রাম হইতে 'আমার' অধিকার, 'আমার' সম্পত্তি, 'আমার' সুযোগ-সুবিধা ইত্যাদি ক্রমবর্ধমান স্বার্থবুদ্ধির উদ্ভব। কিন্তু ইহা অহমিকার সক্রিয় উদগ্র অবস্থা। পরন্তু ঈশ্বরীয় আকর্ষণের সূচনায় যে ভাবের অভ্যুদয় হয় তাহা হইল পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণের। লোহ যখন চুম্বকের দিকে আকৃষ্ট হয় নিজে তখন সে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সেইরূপ মানুষ যতক্ষণ স্বীয় অধিকারের জন্য সক্রিয় সংগ্রাম করে এবং ভাবে সে-ই সর্বকর্মের নায়ক ততক্ষণ সে ঈশ্বরীয় আকর্ষণ অনুভব করিতে পারে না। যখন সে পরিপূর্ণ বিশ্বাসের সঙ্গে মনে মনে বলে,—"হে প্রভু, আমি তো শুধু যন্ত্রমাত্র—কী আমার ক্ষমতা! তুমিই যন্ত্রী, তুমি তোমার কর্ম কর"—সেই মুহূর্তেই উপরের চুম্বকপাথর স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ করে।

প্রকৃতপক্ষে আমাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই ঈশ্বরে বিশ্বাস নিরবচ্ছিন্ন। কিরূপে ইহা জানা যায়? কারণ আমরা আমাদের মনে আতঙ্ক ও ভয় উঠিতে দিই। ভগবানে এবং তাঁহার অনন্ত ক্ষমতা ও অপার করুণায় বিশ্বাস থাকিলে আমরা কখনও কোন-প্রকার ভয়ে অভিভূত হইতে পারি না। একমাত্র তিনিই আমাদিগকে বাসনা ও ভীতির নাগপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারেন। এইজন্যই তাঁহার নাম পরমপাবন। মন কিসে কলুষিত হয়? বাসনায়। মনকে বাসনামুক্ত কর—অমনি মন শুদ্ধ ও নির্মল হইয়া যাইবে। কিন্তু যাহার প্রাণে ঈশ্বরীয় ভাবের দ্যোতনা আসে নাই সে কখনও বাসনামুক্ত হইতে পারে না। সে বরং বলিবে, "বাসনাই আমার সর্বসুখের আকর। ক্ষুধার উদ্রেক না হইলে চর্ব্য-চূষ্যাদি খাদ্য আস্বাদনের সুখ পাইতাম না; তৃষ্ণা যদি না থাকিত, তাহা হইলে স্নিগ্ধ পানীয়ের আনন্দ বুঝিতাম কি? অতএব বাসনাব মাধ্যমেই আমি এই জগৎকে উপভোগ করি।" এইরূপ বিশ্বাসের ফলে সে কখনও বাসনা ত্যাগ করিতে চাহে না।

অপর পক্ষে যিনি ঈশ্বরপ্রেমিক তিনি দেখেন যে, এই সকল বাসনা সুখের আকর না হইয়া বরং মানুষকে বহুতব দুঃখে আচ্ছন্ন করে। তিনি হৃদয়ঙ্গম করেন যে, একমাত্র ভগবানই নিঃসীম আনন্দের আধার, পার্থিব অপরাপর সুখ সীমাবদ্ধ ও ক্ষণস্থায়ী। আনন্দই হইতেছে ভগবানের শ্রেষ্ঠ সংজ্ঞা। আর ভগবান যখন আনন্দস্বরূপ, তখন কেহই আর নাস্তিক নহে—কেন না, প্রত্যেকেই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দেব সন্ধানে ছুটিয়া চলিয়াছে। মানুষমাত্রেরই ঈপ্সিত আদর্শ সচ্চিদানন্দ—অনন্ত জীবন (চিরন্তন সত্তা)—অখণ্ড জ্ঞান—শাশ্বত আনন্দ। সে চাহে চিরকাল বাঁচিয়া থাকিতে, সব কিছু জানিতে—আর সর্বপ্রকারে সুখী হইতে। সুতরাং ঈশ্বরই প্রকৃতপক্ষে সকলের ঈপ্সিত আদর্শ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেন,—মানুষ তাহার অসীম স্বরূপ আগে জানুক, পরে সীমা লইয়া খেলা করিবে। আগে ভগবান চাই, তারপর সংসার। ঈশদূত যীশুও বলিয়াছিলেন,—প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের সন্ধান কর। কিন্তু আমরা ঈশ্বরের চেয়ে অহং-এর ছটাকেই বেশী করিয়া প্রদীপ্ত করিয়া তুলি এবং ঈশ্বরকে নেপথ্যে ফেলিয়া রাখি। আমরা প্রথমে ছুটি বিষয়বস্তুর সন্ধানে—পরে ভাবি

আত্মার কথা। ঠিক ইহার বিপরীত পথটিই আমাদিগকে অনুসরণ করিতে হইবে। আমাদের অন্তরকে বিষয়বস্তুর স্বার্থবুদ্ধি হইতে মুক্ত করিতে হইবে। আমাদের ঈশ্বরানুরাগের উদ্দেশ্য যদি হয় পার্থিব সুখসম্পদলাভ, তবে সেই অনুরাগ ঈশ্বরের জন্য নয়—পার্থিববিষয়বস্তুর জন্য। তবে আমরা আর যথার্থ ভক্ত হইতে পারিব না। একনিষ্ঠ ভক্তের ঈশ্বরপ্রেম অহেতুক—প্রেমের আনন্দের জন্যই সে ভগবানকে ভালবাসে—কেন না, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র প্রেমাস্পদ।

"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে"

স্বামী বাসুদেবানন্দ

(প্রশ্নোত্তর)

প্রশ্ন :—মহামায়ার উপাসনার এত কি প্রয়োজন? একেবারে ঈশ্বরকে ধরলেই ত হলো?

উত্তর :—মহামায়া পথ ছেড়ে দিলে তবে হয়, নইলে কিছুই হয় না। তিনিই জীবের বুদ্ধিরূপে আছেন, আবার ভ্রান্তিরূপে আছেন।

প্রশ্ন :—কিন্তু, ভগবান যে গীতায় বলছেন 'মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।'

উত্তর :—হাঁ বলেছেন বটে, তবে আবার এও তো বলেছেন—'মায়য়াপহৃতজ্ঞানা' (মায়া দ্বারা জ্ঞান অপহৃত) 'মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্' (গীতা, ৭।১৩)। (ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির দ্বারা মোহিত হয়ে জীব ত্রিগুণের অতীত আমার অব্যয় পরম স্বরূপ জানতে পারে না।) 'নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।' (গীতা, ৭।২৫) (যোগমায়া কর্তৃক সমাবৃত বলে আমি সকলের কাছে প্রকাশিত হই না।) ভাগবত বললেন,—

"যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসংবিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ ব্রহ্মদর্শনম্॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।৩৩)

অবিদ্যা দ্বারা আত্মাতে কল্পিত জগৎ। যখন এই সদসদ্রূপা বিক্ষেপাবরণাত্মিকা অবিদ্যা, স্বরূপের সম্যগ্ জ্ঞানের দ্বারা প্রতিষিদ্ধ অর্থাৎ বিলয়প্রাপ্ত হন, তখনই ব্রহ্মদর্শন হয়।

কিন্তু সরষের ভেতর ভূত ঢুকে থাকলে সরষে দিয়ে ভূত ঝাড়া যাবে কি করে? যে বুদ্ধি দিয়ে তাঁর ধ্যানভজন করবো তিনি যদি তাকে বিষয় দিয়ে চঞ্চল করে তোলেন তখন কি উপায়? তাঁর দয়া হলে তবে ভগবদ্ভক্তি হয় বা ব্রহ্মদর্শন করা যায়। 'বিষ্ণুভক্তিপ্রদা দুর্গা সুখদা মোক্ষদা সদা।' ভাগবতকার এই তত্ত্ব বুঝেই বলেছেন—

"যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ১।৩।৩৪)

বিশারদ্ মানে সর্বজ্ঞ ভগবান। তাঁর যে দৈবী মায়া তিনি হলেন বৈশারদী—ইনি অবিদ্যারূপে বিক্ষেপ আবরণ করেন, ততক্ষণ জীবত্ব যায় না, আর যখন ব্রহ্মবিদ্যারূপ 'কৃষ্ণমতি' রূপে প্রকাশ পান তখন অবিদ্যাকৃত জীবোপাধি নাশ পায় এবং আগুন যেমন কাঠকে দগ্ধ ক'রে নিজেও উপশম প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ এই ব্রহ্মমতি অবিদ্যোপাধি নাশ ক'রে উপরত হন, আর তখনই জীবও ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়।

ভাগবতের আর এক জায়গায় মৈত্রেয় বিদুরকে মায়ার অঘটনঘটনপটীয়সী শক্তির কথা বলছেন,—

"অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৬।৩৮)

এই ভাগবতী মায়া ব্রহ্মরুদ্রাদি মায়ীদেরও মোহিনী। এমন কি যিনি স্বয়ং পরমাত্মা শ্রীহরি তিনিও নিজের আত্মবর্ত্ম অর্থাৎ স্বীয় মায়ার গতি কতদূর তা জানেন না; অপরের আর কা কথা!

যদিও এটা অত্যুক্তি, কারণ ভগবানের ইচ্ছা বা বিভূতি বা বিস্তারই হচ্ছে মায়া, তথাপি তিনি যে কিরূপ 'দুরত্যয়া' সেইটাই জীবকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। মৈত্রেয় আবার বলছেন—

"সেয়ং ভগবতো মায়া…" (শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৭।৯)

ভগবানের এই মায়া 'নয়' অর্থাৎ যুক্তির বিরোধী। কেন না যিনি ঈশ্বর, বিমুক্ত সর্বজ্ঞ—তাঁর এই জীবভাব অর্থাৎ বন্ধন এবং কার্পণ্য যিনি ঘটান তাঁকে তর্কদ্বারা কি করে বোঝা যাবে?

তা হলে ঈশ্বর ও জীবে ব্যবহারিক জগতে ভেদ করব কি করে? ব্রহ্ম যখন বিদ্যামায়াশ্রিত হন তখন তাঁকে বলি ঈশ্বর আর তিনি যখন অবিদ্যা-মায়াশ্রিত হন তখন তাঁকে বলি জীব। অবিদ্যা-হেতু জীব প্রকৃতির ধর্ম নিজের বলে গ্রহণ করছে, আর ঈশ্বর বিদ্যামায়া আশ্রয় করাতে প্রকৃতিধর্ম তাঁতে আরোপিত—এই জ্ঞান থাকায় তাঁকে বিদ্যা বা অবিদ্যা কোন মায়াই মুগ্ধ করতে পারে না, তিনি উদাসীনবৎ, বালক্রীড়াবৎ সৃষ্টিস্থিতিলয় করছেন। মৈত্রেয় বলছেন,—

"যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৭।১১)

যেমন জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের জলোপাধিকৃত কম্পাদি দেখা যায়—জল দুলছে তাতে মনে হচ্ছে চন্দ্রও দুলছে, সেইরূপ অবিদ্যাগ্রস্ত জীব দেহ মন বুদ্ধির কম্পন নিজেরই বলে বোধ করে। সেটা অসৎ হলেও সৎ বলে দেখা যায়, কারণ আকাশের চাঁদ কখনও জলের দোলনে দোলে না; সেইরূপ দ্রষ্টা জীবাত্মার অনাত্মা প্রকৃতির গুণ নিজের বলে বোধ হয় পরন্তু ঈশ্বরের হয় না।

প্রশ্ন:—কিন্তু তার পরে যে রয়েছে,—

"স বৈ নিবৃত্তিধর্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্‌ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ৩।৭।১২)

বাসুদেবের অনুকম্পায় নিবৃত্তিধর্ম ভক্তিযোগের দ্বারা ধীরে ধীরে সেই অজ্ঞানের তিরোধান হবে?

উত্তর:—ভগবানের অনুকম্পা হলে মহামায়ার অনুকম্পা হবেই। মহামায়ার অনুকম্পা হলেই তখন ব্রহ্মমতি উপস্থিত হবে। যার ভগবানের প্রতি মন গিয়েছে তার প্রতি মহামায়া খুশী হয়েছেন বুঝতে হবে। সদ্‌বুদ্ধি যদি মা না দেন, তা হলে ভগবানকে ডাকবে কেন? মার কৃপায় সদ্‌বুদ্ধি আসায় ভগবানকে ডাকতে পারা এবং তারপর তাঁর কৃপা উপলব্ধি করতে পারা যাচ্ছে। তাঁর কৃপা ত সর্বক্ষণই রয়েছে, অথচ জীব বুঝতে পারছে না কেন? 'মায়য়াবৃতং জ্ঞানং', 'মোহিতং নাভিজানাতি'। সদ্‌বুদ্ধি না আসা পর্যন্ত ভগবান 'তদ্দূরে', কিন্তু মহামায়া যে কি, তা আমরা সকলে সর্বক্ষণ বুঝেও বুঝতে পারছি না। সেইজন্য মেধস্ ঋষি বললেন,—"সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে।" সেই মহামায়া প্রসন্ন হলেই মানুষের মুক্তির পথ পরিষ্কার হয়।

এস তুমি মংগলে

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

বিশ্বজননি জাগো, জাগো তুমি কল্যাণি!
মোহ-ঘন-আবরণ নিজ করে লও টানি!
গগনের দিকে দিকে, আঁখি মেলো অনিমিখে,
সুপ্তির ঘোর ভাঙি, দূর কর সব গ্লানি!

দানবের নিপীড়নে শংকিত চরাচর,
আর্তের হাহাকারে জাগে সকরুণ স্বর!
বেদনায় ম্রিয়মান কাঁদে তব সন্তান,
নয়নের বারিধারা ঝরে আজি ঝর্ ঝর্!

দুর্গতিহরা এস, এস মাগো চণ্ডিকা!
বুকে বুকে জ্বালো তুমি দীপ্তির হোম-শিখা!
দাও জ্ঞান, দাও বল, কর প্রাণ উজ্জ্বল,
অংকিত কর ভালে বীর্যের জয়টীকা!

হুংকারি এস তুমি, অশুভের কর নাশ,
দম্ভের শির টুটি, হও তুমি পরকাশ!
দশায়ুধ ধরি করে, এস ধরণীর পরে,
দূর কর নিখিলের সব ব্যথা, সব ত্রাস!

বোধনের ক্ষণে আজ হ'ক তব জাগরণ,
নব প্রাণ-উপচারে হ'ক পূজা-আয়োজন!
শূন্য বেদীর তলে, এস তুমি মংগলে,
দনুজদলনি এস, করি হৃদি মণ্ডন!

ঈশ্বরের মাতৃভাব

স্বামী নিরাময়ানন্দ

আবার আশ্বিন আসিয়াছে! আকাশের ছায়াপথে ও কাহার জ্যোতির্ময় পদরেণু? বাতাসে ভাসিয়া আসিতেছে ও কাহার আগমনী গান? ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোমের বিচিত্র সংমিশ্রণে ও কাহার পূজার শত-সহস্র উপচার রচিত হইতেছে? রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শের এ কি মহা-সমারোহ মানব-মনকে কাহার পূজার জন্য প্রস্তুত করিতেছে?

ছোট বড়, ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মূর্খ সকলেরই মনে কখনও না কখন একবার না একবার এই প্রশ্ন উত্থিত হয়—কে এ?—যাহাকে ঘিরিয়া আমাদের আনন্দ, আবার তিনটি দিনের পর যাহাকে ঘিরিয়া আমরা কাঁদি—কে এই আনন্দময়ী—মায়াময়ী?

'কেন—এ আমাদের মা'—এই ত সরল সহজ উত্তর। এই উত্তরেই কোটি কোটি মন নিরস্ত হইয়া যায়, শান্ত হইয়া যায়। আবার অশান্ত মনে প্রশ্ন ওঠে—কে মা?—কার মা? 'সকলের মা, জগতের মা—চিরকালের মা।'—অসীম নীরবতা হইতে এই উত্তর ভাসিয়া আসিয়া বুদ্ধি-চঞ্চল মনকে আবার শান্ত করিয়া দেয়।

একাক্ষর 'মা' শব্দটি কি অসংখ্য শব্দরাশি অপেক্ষা বেশীই প্রকাশ করে না? রহস্যময় 'মা' শব্দটি কি অব্যক্ত অনির্বচনীয়ার সহিত একার্থক নয়? এই সেই মহাশক্তি বা মহামায়া, যাহা সমস্ত সৃষ্টির ঊর্ধ্বে ও পারে—আবার সারা সৃষ্টির অণুতে মহতে অনুস্যূত, ওতপ্রোত। ইনিই সকলের মাতা, নির্মাতা; জন্মদায়িনী, জীবনবিধায়িনী; ইনিই সকলের লক্ষ্য, সকলের পথও।

আমাদের পৃথিবীর লৌকিক মায়ের কাজকর্ম ও মনোভাবের আলোচনা করিলেই আমরা বিশ্বজননীর একটি ইঙ্গিত পাইতে পারি; জল কি জিনিস জানিতে গেলে যেমন সমুদ্র মন্থন করিতে হয় না, একটি শিশির-বিন্দুই যথেষ্ট; সেখানেই সমগ্র জগৎ প্রতিফলিত—ইহাও যেন সেইরূপ।

এক কথায় বলিতে গেলে আমাদের মা বা জননী সৃষ্টি ও পালনশক্তির প্রতীক বা প্রতিমূর্তি, লয়ের ভাব এখানে অব্যক্ত। মাতা সন্তানকে স্বীয় অন্তরে ধারণ করেন, জন্ম দেন ও পালন করেন। মাতাকে প্রতিক্ষণে জীবন বিসর্জন দিতে হয় যাহাতে সন্তান জীবনলাভ করে, ইহাতেই মায়ের পরিপূর্ণতা, সফলতা; মৃত্যুর মাঝেও জীবনের আস্বাদন, এ এক অপূর্ব অনুভূতি। শিশু যে মায়েরই সত্তা—মা যে শিশুরই আত্মা! শিশুর অধরে মা যে অমৃত পান করেন—শিশুর চক্ষে তিনি অসীমের প্রতিচ্ছবি দেখেন—তাহাতে তিনি আত্মহারা হন, কিন্তু ভুলিয়া যান তিনি কোন্ মহাশক্তি!

ইহাই সেই মহামায়ার মায়া। এ কথা সত্য, বিশ্বজননী প্রতিটি জননীর মাঝে প্রতিবিম্বিত। মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ সকলের জননীর মাধ্যমে সেই এক জননীশক্তিই কাজ করিতেছে; তিনিই বিভিন্নরূপধারিণী হইয়া বিভিন্ন আকার ও প্রকারের সন্তানকে গর্ভে ধারণের কষ্ট সহ্য করিতেছেন—জন্ম দিয়া লালন পালনের জন্য কত কষ্ট স্বীকার করিতেছেন—তাই ত পদকর্তা স্বীয় অনুভূতির আতিশয্যে দ্ব্যর্থব্যঞ্জক ভাষায় দিব্য দর্শনের ইঙ্গিত দিয়াছেন—'প্রতি-মা'য় মাকে দেখ।

দেখিব সেই পালনীশক্তি কতখানি ত্যাগ ও সেবার উপর প্রতিষ্ঠিত—নিজে না খাইয়া সন্তানের মুখে আহার জোগাইতেছেন—নিজে না ঘুমাইয়া সন্তানকে পাহারা দিতেছেন, আহার নিদ্রা উভয়ই ত্যাগ করিয়া রোগে শুশ্রূষা করিতেছেন—তাই ত আদিকবি জননী ও জন্মভূমিকে কল্পিত স্বর্গের বহু উচ্চে আসন দিয়াছেন।

এইখানেই আমরা মাতৃপূজার মূল সূত্র খুঁজিয়া পাই। সভ্যতার প্রথম ঊষাতেও নারী শুধু মাত্র কুটীররাণী বা গৃহলক্ষ্মী রূপেই প্রতিভাত হন নাই, মানবীয় মূর্তিতে দেবীর গৌরব লইয়াই তিনি মহিমময়ী মাতৃমূর্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার নীরব ত্যাগ, সেবা, সহিষ্ণুতা ও সহানুভূতির জন্য না চাহিয়াও তিনি সংসারের সকলের সম্মান, শ্রদ্ধা ও পূজা পাইয়াছেন। স্বীয় রক্তধারা দিয়া মানব-সমাজকে জন্ম দিয়া তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে, তাহাকে লালন করিতে করিতে মানবের জীবন চরিত্র তিনিই গঠন করিতেছেন। তিনি শুধু জন্মদাত্রী নন, ভাগ্যবিধাত্রীও।

ঈশ্বরভাব কি? এ প্রশ্নটি যত গম্ভীর—তদপেক্ষা জটিল। এই প্রশ্নের উত্তরে পর্বত-প্রমাণ দর্শনশাস্ত্র লিখিত হইয়াছে; তাহারই দু-একটি সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিয়া আমাদের কাজ শেষ করিব।

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী; তিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কর্তা, সর্ব-নিয়ামক, বিচারক,—আরো কত কি! কেহ বা উপহাস করিয়া বলেন, তবে তিনি বিশ্ব-মুনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান—পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ইত্যাদি!!

মানুষের মস্তিষ্কের শক্তি অনুযায়ী এবং হৃদয়ের প্রয়োজন অনুযায়ী ঈশ্বরভাবও পরিবর্তিত হইয়া যায়—ধর্মেতিহাসের পাঠকের নিকট ইহা স্পষ্ট; তাই ত মানুষ আজ বলিতে শিখিয়াছে—'man made God in his own image' (মানুষ তার নিজের প্রতিরূপে ভগবানকে গড়িয়াছে)। বড় বৈজ্ঞানিক ঈশ্বরকে এক জন গণিতজ্ঞ ছাড়া আর কিছু ভাবিতে পারেন না। কবি তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই অনুভব করেন। শিল্পী সেই শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সুন্দর রচনার মুগ্ধ অনুকরণ করিয়া থাকেন। কাহারও ধারণা ঈশ্বর এক চিরশিশু—নির্জনে খেলা করিতেছে—আপন মনে বিশ্ব ভাঙিতেছে, গড়িতেছে। আবার এক শ্রেণীর দার্শনিক আছেন যাঁহাদের সিদ্ধান্তে তিনি নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় সাক্ষী মাত্র।

আমাদের মনের বিকাশ-অনুযায়ী আমরা ঈশ্বরে বিভিন্ন ভাব আরোপ করি। সত্যই ত ঈশ্বরভাবই আমাদের মনের কল্পনার আদর্শের শেষ ও শ্রেষ্ঠ পরিমাপ! ইহার পর আমরা আর কিছু চিন্তা, কল্পনা, আলোচনা করিতে পারি না।

আমাদের এই ধরার ধূলি হইতে তুলিয়া ধরিবার জন্য আমাদের একজন ঈশ্বর প্রয়োজন, যিনি আমাদের মলিনতা মুছিয়া দিয়া পবিত্র করিবেন, হৃদয়ে মনে শান্তি দিবেন, অভয় আশ্রয় দিবেন; এইখানেই দর্শনের শেষ, সাধনার আরম্ভ। বিচারের শেষ, বিশ্বাসের আরম্ভ, আচরণের আরম্ভ। এই ঈশ্বরকে পাইবার জন্য তাঁহার নিকটতা অনুভব করিবার জন্য কত মত কত পথ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে—সকলেরই সেই এক উদ্দেশ্য—মানবজীবনে ঈশ্বরানুভূতি বা মানবাত্মারই দিব্যভাব প্রাপ্তি।

মাতৃভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করিব কেন? এ প্রশ্নের উত্তর শ্রীরামকৃষ্ণের কথায়—'মা বাপের থেকে আপন—সব থেকে নিকট, মায়ের কাছে জোর চলে। মা যতটা বোঝেন কোন ছেলের কখন কি দরকার তত আর কে বোঝে?' 'আমার মা সব জানেন, সব পারেন—যাকে বলে দেব'—প্রভুপুত্রের সহিত বিবাদেও

দাসীপুত্র মায়ের বড়াই করে, দোহাই দেয়। শিশু মাকে সর্বজ্ঞতা ও সর্বশক্তিমত্তার অলঙ্কারে বিভূষিত করে—এই সূত্র হইতেই ধীরে ধীরে মাতায় ঈশ্বরভাব, এবং তাহারই অনুসিদ্ধান্তরূপে ঈশ্বরে মাতৃভাব আসিয়া যায়। মাতৃভাব প্রকৃতপক্ষে শক্তিভাব, অতএব পুরুষ অপেক্ষা নারীমূর্তিই শক্তির প্রতীক।

শিব নিষ্ক্রিয় পুরুষ মহাকাল, বিশ্বপ্রকৃতি তাঁহারই উপর সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের লীলা-নৃত্য করিতেছেন—এই ত জগতের প্রকৃত ছবি,—উদ্‌ঘাটিত মহারহস্য! পুরুষের সান্নিধ্যে প্রকৃতির উপর বিশ্ব জন্মিতেছে, ভাসিতেছে, ডুবিতেছে—আবার উঠিতেছে। তাহারই আন্দোলনে জীবজগৎ—পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, কৃমিকীট, দেবমানব—জন্ম মৃত্যুর চক্রনৃত্যে ঘুরিতেছে। আমরা যেন কাহার হাতের পুতুল, যে আমাদের নাচাইতেছে তাহার সহিত দেখা নাই; তবে—

'সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে
কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে
আসে।' (বিবেকানন্দ)

মা ত শুধু সুন্দর ও কোমলহৃদয়া নন; তিনি ভীষণা ভয়ঙ্করী নির্দয়া কঠোর—তিনিই সুখদুঃখবিধায়িনী, সম্পদ-বিপদ-স্বরূপিণী। আমরা ভুলিয়া যাই—দিন ও রাত্রির মত ভাল ও মন্দ একই কারণে সংঘটিত—বিশ্বজননীর একই মুখের দুই দিক। বিপরীতের এই মিলন হিন্দুর ঈশ্বরধারণার এক অপূর্ব বৈশিষ্ট্য। তন্ত্রের কালীমূর্তিতেই ইহা পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে। শান্ত শিবের উপর নৃত্যপরা শক্তি। সুন্দরের সহিত ভয়ঙ্করের এ কি মহামিলন! জীবের কর্মফল অনুযায়ী তিনি জন্ম দিতেছেন, তাই কটিদেশে তিনি করমালা বিভূষণা। জীবকে লালন পালন করিতেছেন, তাই তিনি পীনোন্নতপয়োধরা; আবার করাল মুখব্যাদান করিয়া মৃত্যুকালে তিনিই সংহার করিতেছেন—বিশ্বপ্রকৃতির এই নিত্যলীলার রহস্য যাঁহাদের ধ্যানদৃষ্টিতে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল তাঁহারা তাঁহাকে অসিমুণ্ডধরা বরাভয়করা রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি একাধারে জ্ঞান, ভক্তি, ভোগ ও মুক্তি সকলই দিতেছেন।

বর্তমান যুগ একটি সংকটময় সন্ধিক্ষণ। মায়ের পূজার শুভ মুহূর্ত সমাগত। জড়বাদজাত ভোগবাদের জালে মানবজীবন আজ জড়িত জর্জরিত। মদোন্মত্ত সবলের স্বার্থপরতার শোষণে দুর্বল প্রবঞ্চিত নিপীড়িত,—বারংবার বিশ্বযুদ্ধের আয়োজনে মানব আশাহত।

এ ত আজ নূতন নয়। বহুবারই অশিবকারী দানবশক্তি দেবশক্তিকে নির্জিত পরাজিত করিয়া জগতের উপর তাণ্ডবনৃত্য করিয়াছে। দেব ও ঋষিগণ নিরুপায় হইয়া জগজ্জননীর পালনীশক্তিকে আহ্বান করিয়া আরাধনা করিয়াছেন। মাও সংহত দেবশক্তিতে আবির্ভূতা হইয়া, কৃষ্টি ও সভ্যতার শত্রু দেবারি-সৈন্যসমূহ লীলাচ্ছলে নিধন করিয়াছেন। মায়ের এই নিধন-যুদ্ধে নিষ্ঠুরতার সহিত কৃপার অপূর্ব সংমিশ্রণই তাঁহার সর্বজননীত্ব প্রমাণ করিতেছে; অসুরও মায়ের সন্তান—'মায়ের দুষ্টু ছেলে'—মাকে অস্বীকার করিয়া, দৈবীশক্তিকে অস্বীকার করিয়া, স্বার্থভোগে প্রমত্ত হইয়া সে মায়ের অন্যান্য সন্তানদের বঞ্চিত বিরক্ত করে। মা তাহার আসুরী-বৃত্তি বিনষ্ট করিয়া তাঁহার দৈবী সত্তায় তাহাদের ফিরাইয়া লইলেন। জগতে স্বর্গরাজ্য, দেবরাজ্য স্থাপিত হইল—কিছুদিন বেশ চলিল; আবার নূতন উৎপাত—আবার মায়ের নূতন লীলা।...

এই চলিয়াছে—চলিবে। আধ্যাত্মিকভাবের মহাশত্রু মহাসুর নিপতিত হইলে দেব ও ঋষিগণ সেই সমরক্ষেত্রেই মহিষঘ্নী মহামায়ার স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। মাও প্রসন্না হইয়া

হাসিমুখে বলিলেন—"তোমরা কিছু বর চাও"। এত দিয়াও মায়ের আশা মিটিতেছে না—সন্তানকে সব কিছু দিয়াই যে মায়ের আনন্দ। কৃতকৃত্য দেবর্ষিগণ বলিলেন,—"কি আর বর চাহিব মা, তুমি ত আমাদের সব আশা পূর্ণ করিয়াছ, সব বিপদ দূর করিয়াছ; শুধু এইটুকু করিও যখনই আমাদের আপদ বিপদ আসিবে—আমরা যেন তোমাকে স্মরণ করি, আর তুমি আসিয়া আমাদের দুর্গতি দূর করিও।" 'তথাস্তু' বলিয়া জননী দুর্গা অন্তর্হিতা হইলেন।

সন্তান না চাহিলে মা তাহাকে সবটুকু দেন না। পরাজিত সুরথ মায়ের পূজা করিয়া হৃতরাজ্য লাভ করিলেন এবং জন্মান্তরে মানবজাতির উপর আধিপত্য লাভ করিয়া মনু হইলেন। আর সমাধি চাহিলেন 'আমি-আমার রূপ আসঙ্গবিচ্যুতিকারক তত্ত্বজ্ঞান'; মাও তাঁহাকে বলিলেন,—'তব জ্ঞানং ভবিষ্যতি'—তোমার জ্ঞান হইবে।

'সা যাচিতা চ বিজ্ঞানং তুষ্টা ঋদ্ধিং প্রযচ্ছতি।' সন্তুষ্ট হইয়া তিনি সম্পদ ঐশ্বর্য দেন—আর চাহিলে পর তিনি জ্ঞানও দিয়া থাকেন।

মা চাহেন খেলাটা চলুক। ছেলেরা মায়ায় ভুলিয়া খেলায় মজিয়া তাঁহাকে ভুলিয়া থাকুক,—যখন আর চুষিকাঠি ভাল লাগিবে না 'মা' বলিয়া শিশু কাঁদিবে, মা তখন ভাতের হাঁড়ি নামাইয়া ছুটিয়া আসিবেন, শিশুকে কোলে করিয়া স্তন্যপান করাইতে। মায়ের মত কে বোঝে সন্তানের কখন কি প্রয়োজন? তাই তো মনে হয় এই সৃষ্টিস্থিতিলয়ের পিছনে যে সনাতনী শক্তি রহিয়াছে সে কোন নির্লিপ্ত সাক্ষী নয়—নিরপেক্ষ বিচারক নয়—কোন শাসক রাজা প্রভু নয়—সে মা, সন্তানস্নেহ-বিহ্বলা, 'সর্বস্যার্তিহরা' 'পরিত্রাণপরায়ণা' মা।

মায়ের মত ভালবাসার পাত্র আর কে আছে? আর কি থাকিতে পারে?—মায়ের মত মধুর মায়ের মত পবিত্র? মায়ের মত নিশ্চিন্ত আশ্রয়? মা শক্তি ও শান্তির ঘনীভূত মূর্তি!

তাই তো সাধনার পথে মাতৃভাব সহজ ও নিরাপদ পথ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, মাতৃভাব শুদ্ধভাব। আর সকল ভাবে ভয় আছে, নয় বিপদ আছে, দেনা পাওনা আছে, কিন্তু মাতৃভাব অতি সহজ সরল, সকলের অনুভূতির মধ্যে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন এই মাতৃভাবেরই বিস্তৃত লীলা। এখনও যদি প্রশ্ন হয়—কি এই মাতৃভাব? তাহার উত্তরে বলি—

'প্রসাদ বলে মাতৃভাবে আমি তত্ত্ব করি যাঁরে।
সেটা চাতরে কি ভাঙবো হাঁড়ি, বোঝ না রে মন ঠারে ঠোরে॥

"সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম,—সুবর্ণমণ্ডিতা সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা! চিনিলাম, এই আমার জননী—জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন-ভূষিতা। * * * রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত; তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু বিমর্দিত—পদাশ্রিত বীরজন-কেশরী শত্রুনিপীড়নে নিযুক্ত! * * * দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বাণী বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতো-মধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা। * * * দেখিতে দেখিতে আর দেখিলাম না—সেই অনন্ত কালসমুদ্রে সেই প্রতিমা ডুবিল! অন্ধকারে সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশি ব্যাপিল, জলকল্লোলে বিশ্বসংসার পুরিল! তখন যুক্তকরে সজল-নয়নে ডাকিতে লাগিলাম, উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা! এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবি দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব, পরের মঙ্গল সাধিব—অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা, একা রোদন করিতেছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা!

উঠ, উঠ মা বঙ্গজননী! মা উঠিলেন না। উঠিবেন না কি?"

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। (কমলাকান্তের দপ্তর)

কঠোপনিষৎ

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় বল্লী

'বনফুল'

সনাতন এ অশ্বত্থ নিম্নে শাখা প্রসারিয়া
উর্দ্ধমূল রহে
ইনি শুক্র, ইনি ব্রহ্ম, ইনিই অমৃত
সর্ব্বশাস্ত্রে কহে
অতিক্রম কেহ এঁরে করিতে না পারে
সর্ব্বলোক স্থিত এ আধারে ॥ ১ ॥

তাঁহা হ'তে নিঃসৃত জগতে যা' কিছু সবই
প্রাণ-স্পন্দমান
উদ্যত বজ্রসম ভয়ঙ্কর তাঁরে
প্রত্যক্ষ করেন যিনি অমরত্ব পান ॥ ২ ॥

এঁরই ভয়ে অগ্নি সূর্য্য করে তাপদান
ইন্দ্র, বায়ু, পঞ্চম মৃত্যুও
এঁরই ভয়ে সদা ধাবমান ॥ ৩ ॥

শরীর-নাশের পূর্ব্বে কেহ যদি তাঁরে
না জানিতে পারে
জীবলোকে জন্ম তার ঘটে বারে বারে ॥ ৪ ॥

দর্পণে অথবা স্বপ্নে কিম্বা সলিলেতে
হয় যথা প্রতিবিম্বাভাস
আত্মায় পিতৃলোকে গন্ধর্ব্বলোকেতে
অনুরূপ ব্রহ্মের প্রকাশ
ব্রহ্মলোকে তিনি নিরুপম
আলো-ছায়া সম ॥ ৫ ॥

উৎপত্তি পৃথক জানি প্রতি ইন্দ্রিয়ের
তাহাদের উদয়াস্ত করি প্রণিধান
বীতশোক হ'ন জ্ঞানবান ॥ ৬ ॥

ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে রহে মন,
তার উর্দ্ধে বুদ্ধি উত্তম
বুদ্ধি হ'তে আরও উর্দ্ধে মহান আত্মাই
উর্দ্ধতম অব্যক্ত পরম ॥ ৭ ॥

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বব্যাপী পুরুষ অ-কায়
এঁরে জানি মুক্ত হয় জীব, অমরত্ব পায় ॥ ৮ ॥

এঁর রূপ দর্শন-অতীত
চক্ষু দিয়া দেখা নাহি যায়
হৃদয়েতে মনীষায় মানসেতে ইঁহার প্রকাশ,
যে জানে সে অমরত্ব পায় ॥ ৯ ॥

পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যবে মন সহ স্থির ভাবে করে অবস্থান
বুদ্ধি যবে অচেষ্টিত রহে
তারেই পরমাগতি কহে ॥ ১০ ॥

এই স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণ—এরই নাম 'যোগ'
অপ্রমত্ত ইহার লক্ষণ, এরও আছে উৎপত্তি বিয়োগ
॥ ১১ ॥

বাক্য দিয়া মন দিয়া চক্ষু দিয়া মেলে না তাঁহারে
"আছেন" বলেন যাঁরা তাঁহারা ব্যতীত অন্যে
উপলব্ধি করিতে না পারে ॥ ১২ ॥

আস্তিক্য-বুদ্ধি আর তত্ত্ব-রূপেতে
দুইভাবে বুঝিবার আছে অবকাশ
"আছেন" ভাবেন যাঁরা তাঁহাদেরই কাছে এঁর
প্রকৃত প্রকাশ ॥ ১৩ ॥

যে সব কামনাকুল মানবের হৃদয়ে আশ্রিত
সে সবের করিলে মোচন
মর্ত্ত্যই অমৃত হয়, ঘটে এই দেহে
ব্রহ্ম-দরশন ॥ ১৪ ॥

হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হলে এই জীবনেই
মর্ত্ত্যই অমৃত হয়—শাস্ত্রের উপদেশ এই ॥ ১৫ ॥

একশত এক নাড়ী আছে হৃদয়ের
তন্মধ্যে একটিরই * মূর্দ্ধামুখী গতি
এরই দ্বারা উর্দ্ধলোকে গমন করিয়া
পায় লোকে অমর-সঙ্গতি
ভিন্ন দিকে প্রসারিত অন্যগুলি দিয়া
হয় বহির্গতি ॥ ১৬ ॥

পুরুষ অঙ্গুষ্ঠমাত্র অন্তরাত্মা তিনি
সর্ব্বজন-অন্তর-নিহিত
মুঞ্জ শীর্ষ † সম তাঁরে দেহ হ'তে করহ পৃথক
হয়ে অবহিত
জান জান ইনি শুক্র, ইনিই অমৃত
জান জান ইনি শুক্র ইনিই অমৃত ॥ ১৭ ॥

নচিকেতা মৃত্যু-উক্ত এই বিদ্যা লভি
প্রাপ্ত হয়ে সর্ব্ব-যোগ-ফল
মৃত্যুহীন রজঃহীন ব্রহ্ম-লাভ করিলেন
পবিত্র নির্ম্মল
অন্য কেহ এ অধ্যাত্মজ্ঞান যদি লভে
তাহারও ওই গতি হবে ॥

* ইহার নাম সুষুম্না

† মুঞ্জ একপ্রকার ঘাস

সমাপ্ত

শক্তিপূজারী ভারতবর্ষ

শ্রীমতী বাসনা সেন, এম্‌-এ, কাব্য-বেদান্ততীর্থ

ভারতবর্ষ মাতৃপূজার ভূমি। পৃথিবীর অন্যান্য জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য আলোচনা করিলে দেখা যায় যে কোথাও নারীমাত্রই মাতৃদৃষ্টিতে অবলোকিত হন না। পৃথিবীর সর্বদেশেই স্ত্রীলোক ভোগ্যারূপে সর্বাগ্রে সমাদৃত হইয়া থাকেন। কিন্তু ইহা একমাত্র ভারতেরই বৈশিষ্ট্য যে, এখানে নারী জগন্মাতার অংশরূপে পূজিতা হন।

যুগযুগান্তর ধরিয়া ভারতবর্ষের ভূমিতে আধ্যাত্মিকতার অতুল সম্পদ নিহিত রহিয়াছে। ভারতীয় ধর্মসাধনায় এবং দার্শনিক চিন্তায় ব্রহ্মকেই জগৎকারণরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম শক্তিবিহীনরূপে জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয় করিতে সমর্থ নন। সুতরাং ভারতীয় অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্নরূপতা অতি পরিস্ফুট হইয়াছে। বৈদিক যুগ হইতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত ভারতবর্ষ নানাভাবে ব্রহ্ম-স্বরূপিনী শক্তির উপাসনা করিয়া আসিয়াছে। এই শক্তির উপাসনাই ভারতের প্রাণ এবং শত শত ঘাত-প্রতিঘাতে তাহার গৌরবময় ঐতিহ্য অক্ষত থাকিবার কারণ।

বেদে ঈশ্বরকে মাতৃরূপে উপাসনার কথা পাওয়া যায়। ঋগ্বেদের অষ্টম অষ্টক দশম মণ্ডলে রাত্রিসূক্তের মধ্যে দেখিতে পাই ব্রহ্ম শক্তিরূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। এখানে শক্তিরূপিণী দেবীর

যে রূপের বর্ণনা এবং উহার যে ভীষণতার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, বৈদিক যুগেও কালীরূপে শক্তির উপাসনা অবিদিত ছিল না। রাত্রিসূক্তের মধ্যে বিশ্বশক্তির বীজ নিহিত রহিয়াছে—

আ রাত্রি পার্থিবং রজঃ পিতরং প্রাযু ধামভিঃ
দিবঃ সদাংসি বৃহতী বি তিষ্ঠস আ ত্বেষং বর্ততে তমঃ
যে তে রাত্রি নৃচক্ষসো যুক্তাসো নবতির্নব।
রাত্রীং প্রপত্থে জননীং সর্বভূতনিবেশিনীম্॥ ইত্যাদি

রাত্রিদেবী আগমনপূর্বক চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছেন। তিনি নক্ষত্রসমূহের দ্বারা অশেষ প্রকার শোভা সম্পাদন করিয়াছেন। রাত্রিদেবী সকলকেই আচ্ছন্ন করিলেন। সকল ভূতবর্গ তাঁহাতে আশ্রয় লইয়াছে।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে ঋষি কন্যা 'বাক্' আত্মসাক্ষাৎকারের পর বিশ্বশক্তির সহিত নিজেকে অভিন্ন উপলব্ধি করিয়াছিলেন—রুদ্র, আদিত্য, বসু, অশ্বিনী, বিশ্বদেব, মিত্র, বরুণ প্রভৃতির প্রশাসিতারূপে নিজেকে পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। যে সৃজনী, পালনী, এবং সংহরণী শক্তি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকের সেই অনন্ত শক্তির সহিত তাদাত্ম্যবোধ হইয়াছিল। সেইজন্য তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

"অহং রাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং,
চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা,
ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্ধন্,
মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বা,
তামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥"

এই দেবীসূক্তের মধ্যে ব্রহ্মই শক্তিরূপে বিরাজমান। ঋক্ বেদের সপ্তম মণ্ডলে ৭৬, ৭৭, ৭৮ সূক্তে যে উষার স্তুতি করা হইয়াছে, তাহাতে দেবী মূর্তির কল্পনা করা হইয়াছে এবং এই শক্তিরূপিণী দেবীমূর্তি সমস্ত বিশ্বের পালয়িত্রীরূপে স্তুতা হইয়াছেন। দেবগণের চক্ষুঃস্থানীয়া সুভগা, স্বকীয় কিরণে প্রকাশিতা উষা সকলকে রমণীয় মহৎ ধন দান করেন।

উপনিষদের যুগকে বেদ হইতে পৃথক করিয়া বিচার করিলে অযৌক্তিক হইবে। কারণ বেদেরই অন্তভাগ উপনিষদ—উপনিষদে শক্তি ভিন্নরূপে উপাসিত হইয়াছে। জ্ঞানমূলক উপনিষদ শক্তিরূপিণী অবিদ্যা অথবা মায়াকে কোন বিশিষ্টরূপে রূপায়িত করিয়া আরাধনার বিধান দেয় নাই, কিন্তু এই অবিদ্যাকেই সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চের সাক্ষাৎ কারণ রূপে নির্দেশ করিয়াছে। আবরণবিক্ষেপাত্মিকা অবিদ্যাই নির্গুণ ব্রহ্মের জগৎসৃষ্টি ব্যাপারে প্রধান সহায়। মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্ম হইতে কিছু পৃথক বস্তু নহে; যদি পৃথক বস্তু হইত তবে নিত্য, নির্গুণ, অদ্বয় ব্রহ্ম জগৎ-সৃষ্টি-কার্যে অন্য নিত্য পদার্থের অপেক্ষা করিলে সেই বস্তুও নিত্য হইয়া পড়িত এবং তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বে বাধা হইত; আরও একটি নিত্য পদার্থ স্বীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি ঘটিত। সুতরাং মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের সৃজনী শক্তির রূপমাত্র। এই ব্রহ্ম ও শক্তির অভিন্নতা পরমহংসদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে অতি লৌকিক দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া গেলেন—'সাপ আর তার তির্যক্‌গতি। অগ্নি আর তার দাহিকা-শক্তি।' ইত্যাদি। বেদ এবং উপনিষদকে পৃথকরূপে গ্রহণ করিলে ভুল হইবে। কারণ, উপনিষদ অখণ্ড বেদের অংশমাত্র। কেনোপ-নিষদের মধ্যে উক্ত হইয়াছে অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি

সকলেই একে একে ব্রহ্ম কি বস্তু জানিতে যাইতেছেন, কিন্তু কেহই শেষ পর্যন্ত জানিতে পারিলেন না। অতঃপর ইন্দ্র গেলেন এবং এক স্ত্রীমূর্তি দর্শন করিলেন এবং তাঁহার নিকট ব্রহ্মের স্বরূপ জানিতে চাহিলেন। ইন্দ্র জানিতেন এই হৈমবতী মূর্তি ব্রহ্মের শক্তি। সুতরাং তিনি ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞাপনে সমর্থা হইবেন। (কেনোপনিষদ)

বৃহদারণ্যকোপনিষদে গার্গীর আখ্যায়িকা হইতে বুঝা যায় যে আত্মজ্ঞানলাভের অধিকারিণী নারী সর্বজনপূজিতা হইতেন। মৈত্রেয়ীর কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইল মনুষ্যত্বের অনন্তকালের জিজ্ঞাসা,—

'যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্।'

বহু স্ত্রী-ঋষির পরিচয় হইতে বুঝা যায় ভারতীয় ভাবধারায় শক্তির আদর প্রমাণিত হইয়াছে। ভারতীয় নারীর মধ্যে এই ব্রহ্মের শক্তি পরিস্ফুট হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনে যে পুরুষ প্রকৃতি তত্ত্ব নির্দিষ্ট হইয়াছে, বাস্তব জগতে আমরা নারীকেই এই প্রকৃতিরূপে দেখিতে পাই। দেবকুল হইতেই ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকুলে নারীমূর্তির কামগন্ধহীন পূজার প্রথম প্রচার। উপনিষদপ্রাণ ঋষি দেবীমহিমা প্রাণে প্রাণে প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া গাহিলেন—

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ॥"

শুক্লকৃষ্ণরক্তবর্ণা সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী, অনন্যসম্ভবা এক অপূর্বা নারী অনন্যসম্ভব এক পুরুষের সহিত সংযুক্তা থাকিয়া আপনার অনুরূপ বহু প্রকারের প্রজাসকল সৃজন করিতেছেন।

আত্মস্বরূপে বর্তমানা দেবীমহিমা প্রত্যক্ষ করিয়াই তাঁহার কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—

'ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি।'

(বৃঃ উঃ, ৪-৫-৬)

ঋষিবর্গের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া ভগবান মনু আবার গাহিলেন—

'দ্বিধাকৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥'

(মনু—১-৩২)

নারীর ভিতর জগৎ-প্রসূতির বিশেষ শক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়াই ভারতের ঋষিকুল উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন—নারী বুদ্ধিরূপা, শক্তিরূপা—জগজ্জননীর হ্লাদিনী, সৃজনী ও পালনী শক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্তি।

তারপর রামায়ণে ভগবানের শক্তি সীতা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। অনন্তলীলাময় ভগবান তাঁহার শক্তিকে আশ্রয় করিয়াই লীলা করিয়া থাকেন।

'প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া।'

(গীতা ৪।৬)

সীতা যে জীবন ভারতের ইতিহাসে প্রদর্শন করিলেন তাহাই ভারতবাসীর পক্ষে আদর্শ হইয়া রহিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগপ্রবর্তক স্বামিজীর কণ্ঠে ধ্বনিত হইল—'হে ভারত ভুলিও না তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী।' এই ভারতভূমি সে আদর্শ যে ভুলিতে পারে না,—ভারতভূমির আকাশে বাতাসে প্রতিটি মৃত্তিকা ও উপলখণ্ডে সীতার জীবনাদর্শের প্রাণবন্ত স্পর্শ সজীব ও সতেজ রহিয়াছে। পুনরায় স্বামিজী বলিলেন,—"যতদিন ভারতে একটি নদী বা একটি পর্বতও থাকিবে ততদিন সীতার আদর্শ চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকিবে।" এই সীতা চরিত্রকে কেন্দ্র করিয়া অন্যান্য স্ত্রী-চরিত্র সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। শৌর্য, বীর্য, দয়া, দাক্ষিণ্য, শীলতা, নম্রতা, পবিত্রতা ভারতীয় সমস্ত গুণাবলী ভিন্ন ভিন্ন

নারীচরিত্রে রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। কৌশল্যার আত্মত্যাগ, সুমিত্রার সহনশীলতা ইতিহাসে উজ্জ্বল কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। আজিও ভারতবাসী মহীয়সী নারীর চরিত্র প্রদর্শনকালে ইঁহাদেরই স্থান সর্বাগ্রে প্রদান্ করে।

মহাভারতেও এই ব্রহ্মশক্তি নানারূপ পরিগ্রহ করিয়াছে দেখিতে পাই। বিভিন্ন নারীচরিত্রে তাহার বিভিন্নরূপ বিকাশ সাধিত হইয়াছে। গান্ধারীর চরিত্রে অপূর্ব ধর্মভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে। সাহসিকতা, বীর্য, ধৃতির প্রতিমূর্তি বিদুলা,—ভক্তি ও সহনশীলতার আদর্শ কুন্তী প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে নারীচরিত্রের ঔজ্জ্বল্য ভারতীয় শক্তি বিকাশের পরিচায়ক। এতদ্ব্যতীত সাবিত্রী, শৈব্যা দময়ন্তী ইত্যাদি স্ত্রীচরিত্রে অনন্তশক্তির বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হইয়াছে।

পৌরাণিক যুগে শক্তির বিকাশ যে হইয়াছিল তাহার বিশেষ পরিচয় মার্কণ্ডের পুরাণের প্রতি লক্ষ্য করিলে বুঝিতে পারা যায়। দেবাসুর সংগ্রামে অসুরের পরাভবের নিমিত্ত মহামায়া (শক্তি) দেবতাদির তপস্যার পুঞ্জীভূত ফলস্বরূপ আত্মরূপ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন।

'অতুলং তত্র তত্তেজো সর্বদেবশরীরজম্।
একস্থং তদভূন্নারী ব্যাপ্তলোকত্রয়ং ত্বিষা॥'

সমস্ত দেবতার শরীরজাত যে তেজ তাহাই নারীমূর্তিতে পরিণত হইয়াছিল। এই দেবীমূর্তি বিশ্বের সমস্ত শক্তির আধারভূতা। সেইজন্য 'যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে ···।' ইত্যাদি শ্লোকে যে স্তুতি করা হইয়াছে তাহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়—

'সর্বরূপময়ী দেবী সর্বং দেবীময়ং জগৎ।'

তন্ত্রের যুগে শক্তির যে বিশেষ উপাসনা ভারতবর্ষ করিয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তন্মধ্যে শ্রীচক্রের প্রবর্তন নারীকে বিশ্বশক্তি রূপে পরিকল্পনা করিবারই পরিচায়ক। তন্ত্রের মধ্যে আদ্যাশক্তির বিভিন্নরূপে উপাসনার বিধান রহিয়াছে। তন্ত্রে নির্দিষ্ট মাতৃভাব, বীরভাব ইত্যাদি সাধনায় এই ব্রহ্মশক্তিকে মাতৃরূপে বা স্ত্রীরূপে আরাধনার বিধান করা হইয়াছে।

'প্রসূতে সংসারং জননি ভবতী পালয়তি চ
সমস্তং ক্ষিত্যাদি প্রলয়সময়ে সংহরতি চ।
অতস্ত্বং ধাতাঽসি ত্রিভুবনপতিঃ শ্রীপতিরহো
মহেশোঽপি প্রায়ঃ সকলমপি কিং স্তৌমি ভবতীম্॥'

ইত্যাদি স্তুতির মধ্যে শক্তিরূপিণী কালিকা দেবীকে সমস্ত জগতের স্রষ্টা, বিধাতা ও সংহর্তা রূপে স্তুতি করা হইয়াছে। ভারতের তন্ত্র নারীর মাতৃ ও জায়ারূপ উভয় ভাবের উপাসনার প্রবর্তন করিয়া নারীপ্রতীকে বিশ্বজননীর উপাসনা সর্বাঙ্গসম্পন্ন করিলেন।

বৌদ্ধযুগের প্রারম্ভে আমরা দেখিতে পাই তন্ত্রের প্রভাব সমস্ত দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কোন একটি ভাবের উত্থান হইলে কিছুকাল পরে দেশের জনগণ যখন তাহার যথোপযুক্ত মর্যাদা দিতে পারে না তখনই সেই ভাব বিকৃত হয়। কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি আধ্যাত্মিক সকল ক্ষেত্রেই কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভাবরাজ্যেও বিপ্লব সুরু হয়। ভগবান বুদ্ধ যে অমোঘ প্রেমের বাণী লইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন যুগের প্রয়োজনে তাহার আবির্ভাব এই ভারতবর্ষেই অনিবার্য ছিল। ভগবান বুদ্ধ সন্ন্যাসধর্মের উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়া গেলেন। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি, ভারতের বৈদিক যুগ হইতে অনুস্মৃত যে সকল শক্তি-উপাসনা, তাহার পক্ষে তো কোন কথাই বলেন নাই, কোন দেবদেবীর উপাসনার বিধান তো তিনি দেন নাই, এমন কি শক্তি-মূর্তির কল্পনাও তিনি করেন নাই। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ স্ত্রীলোককেও সন্ন্যাসের অধিকার

প্রদান করিয়া দেখাইলেন যে তাহাতেও চিৎশক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে। উচ্চ আধ্যাত্মিক জীবনের সুযোগ দান করিয়া নারীশক্তির মর্যাদা বাড়াইয়া গেলেন। "সর্বোপেতা চ তদ্দর্শনাৎ" (ব্রঃ সূঃ ২-১-৩০)*—আমরা এই ব্রহ্মসূত্রে দেখিতে পাই—উপেতা এখানে স্ত্রীলিঙ্গরূপে ব্যবহার হইয়াছে। দার্শনিক দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে দেখা যায় পূর্ব এবং উত্তর মীমাংসা সমস্ত কার্যের সম্পাদিকারূপে শক্তি স্বীকার করিয়াছে। কার্যের কারণের যে কারণত্ব তাহাও শক্তির সাহায্যে সম্পন্ন হইয়া থাকে। যে কার্যের অনুকূল শক্তি যাহাতে নাই তাহা সেই কার্যের কারণ হইতে পারে না। এজন্য পূর্বোত্তর মীমাংসা দর্শনে কারণতা বিচারে ইহাই সিদ্ধান্তিত হইয়াছে যে, শক্তি সমস্ত কারণের কারণত্ব-সম্পাদিকা। আর একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন যে 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে' (শ্বেতাশ্বতর উঃ)। এই শক্তির অস্তিত্ব নাস্তিত্ব সম্বন্ধে বহু বাদ-বিবাদ দর্শনশাস্ত্রে থাকিলেও পূর্বোত্তর মীমাংসা দর্শন বহুতর শ্রুতি ও যুক্তির সাহায্যে এই শক্তির অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। শঙ্করাচার্য তাঁহার আনন্দলহরীর শ্লোকে শক্তির মহিমা এইভাবে প্রচার করিয়াছেন—

'শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
ন চেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি॥'

শঙ্করাচার্য বৌদ্ধধর্মের ৫০০ বৎসরের ঘটনা-সংঘাতে যে আবিলতা ধর্মে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা দূরীভূত করিবার জন্যই যেন আবির্ভূত হইলেন। প্রপঞ্চসার তন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থে শঙ্করাচার্য শক্তিই ব্রহ্মাণ্ডের অধিষ্ঠাত্রীরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। যে শঙ্করাচার্য একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই সত্য, আর সকল বস্তুর কোন পারমার্থিক সত্ত্বা নাই এইরূপ স্বীকার করিয়াছেন তিনিই আবার দেবী-স্তুতি-রচনাকালে দেবীর উদ্দেশে বলিতেছেন—

"যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্মার্থনিষ্ঠাকরী
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্বৈশ্বর্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী

* * *

মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী * * *
ওঙ্কারবীজাক্ষরী"·· ইত্যাদি।

শঙ্করের পরবর্তী অবতারপুরুষাদির জীবনেতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহারা প্রায় সকলেই শক্তির মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য বিশেষভাবে আবির্ভূত হইয়াছেন। অন্যান্য অবতারপুরুষাদির আলোচনা না করিয়া বিশেষতঃ উনবিংশ শতাব্দীতে ভগবান যে শ্রীরামকৃষ্ণ রূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহারই বিষয় আলোচনা করিব। যে ভারতবর্ষ আবহমানকাল হইতে শক্তির উপাসনা করিয়া আসিয়াছে সেই ভারতভূমিতে শক্তির অবমাননা দেখা দিয়াছিল। ধনমদে মত্ত, ভোগৈকলক্ষ্য, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাবে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসী তাহার শাশ্বত সনাতন পন্থা পরিত্যাগ করিয়া নারীমূর্তিকে যখন সম্পূর্ণরূপে ভোগ্যদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল এবং অনন্ত-শক্তির আধার স্ত্রী-জাতির উন্নতিকল্পে কিছুই চিন্তা করিল না, তখনই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর নিজের প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া যুগের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য মানুষ-রূপধারণ করিলেন। নিজে নরলীলায় শক্তির মর্যাদা কিরূপে করিতে হয় তাহাই দেখাইয়া গেলেন। তাঁহার জীবন ও বাণীর যথোপযুক্ত

---

* এই সূত্রে ব্রহ্মকে স্ত্রীলিঙ্গ পদ দ্বারা নির্দেশ করায় শক্তিই জগজ্জননী ইহাই সূত্রকারের অভিপ্রায় প্রকটিত হইয়াছে। অন্যথা সূত্রকার কখনও স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ দ্বারা ব্রহ্মের নির্দেশ করিতেন না। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীকণ্ঠশিবাচার্য তাঁহার 'শ্রীকণ্ঠভাষ্যে' শক্তিপ্রাধান্যেই এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

টীকা ও ভাষ্য করিবার জন্য যুগপ্রবর্তক আচার্যের প্রয়োজন হইল। সপ্তর্ষিমণ্ডলের অন্যতম ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ রূপ পরিগ্রহ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণাবতারের গূঢ় রহস্য স্বামিজীর বজ্রনির্ঘোষিত কণ্ঠে ধ্বনিত হইল— "* * সেই জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে—স্ত্রীগুরুগ্রহণ, নারীভাবসাধন। সেই জন্যই মাতৃভাব প্রচার। জগতের কল্যাণ স্ত্রীজাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।" "মা ঠাকরুণ কি বস্তু বুঝতে পার নি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।"

যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আবির্ভাবে নারীপ্রতীকে শক্তিপূজা ভারতে বর্তমান যুগে আবার প্রাণবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। নারীপ্রতীকে এইরূপ শুদ্ধ ভাবের শক্তিপূজা বিশ্বের কোন জাতিই প্রত্যক্ষ করে নাই। সকল নারীর ভিতর জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করাই ভারতীয় সাধনার বৈশিষ্ট্য এবং শ্রীভগবান রামকৃষ্ণরূপ গ্রহণ করিয়া এই সাধনা অনুষ্ঠানে লোকশিক্ষা প্রদান করিলেন। এই ভারতভূমি মাতৃশক্তিতে শক্তিমতী। আবহমান কাল হইতে শক্তির পূজা করিয়া ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিক জগতে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে মহাশক্তির অনুরণন ধ্বনিত হইতেছে। মহাশক্তির আধার ভারতবর্ষের সন্তান আমরা। শক্তির মর্যাদা যথাযথ রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। এ সকল সৃষ্টির মধ্যে যে মহাশক্তির বিকাশ, তাহার নিগূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করার মধ্যেই আমাদের পরম শ্রেয় নিহিত রহিয়াছে।

অন্নদাত্রী আজি অন্ন মাগে

শ্রীপূর্ণেন্দু গুহ রায়, কাব্যশ্রী

শতাব্দীর ক্লীবতার তলে সভ্যতার কাল হলাহল,
অবিচার, অত্যাচার, ছল,
আপন শিয়রে তু'লে মরণেরে ক'রেছে বরণ,
ভুখার শ্মশান-বুকে বেঁ'চে রহে ধ্বংসের বাহন
সর্বহারা বাঙ্গালা আমার!
অবিরাম ব্যগ্রতায় খোঁজে কোথা' পথ বাঁচিবার।
জীবনের সকল আস্বাদ
নিবিড় নৈরাশ্যে শুধু আজ, তো'লে তা'র ব্যর্থ আর্তনাদ।

২

বুভুক্ষুরে করিয়া বঞ্চিত কণ্ঠে গাহে যৌবনের গান,
এ পৃথিবী নির্মম পাষাণ।
বিকৃত পৌরুষ ল'য়ে উদ্ধত সে দস্যুর গৌরবে,
সুরা ও সাকীর মোহে দৃষ্টি তা'র হারা'য়েছে কবে!
এ দশা সে দেখিবে কেমনে
দ্বারে তা'র ভিখারী বাঙ্গালা মাগিতেছে সজল নয়নে
দু'মুঠি ক্ষুধার অন্ন?…হায়!!
ক্ষুধাতুর ধূলায় লুটায় মত্তা ধরা ফিরে নাহি চায়!

৩

কিবা তা'র নাহি ছিল ওরে, জীবনের সহায়-সম্পদ
প্রেম-শান্তি বিপুল বিশদ।
বিশ্বেরে বিলা'য়ে দে'ছে আপনারে আপনার করে,
যোগা'য়ে এসেছে অন্ন যুগে যুগে সস্নেহে আদরে;
(সেই) অন্নদাত্রী আজি অন্ন মাগে,—
তা'র মুখে ওরে পৃথ্বি, অন্ন দাও, প্রাণ দাও আগে,
কণ্ঠে দাও আনন্দের গান,
স্বপ্ন ছাড়ি' চে'য়ে দেখ আজ, মা যে কাঁদে রাত্রি-দিনমান।

প্রাচীন ভারতে নারী*

স্বামী বিরজানন্দ

প্রাচীন ঋষিগণের যুগে—যে সময়ে ছিল বেদ এবং পুরাণের অভ্যুদয় ও প্রসার, সনাতন ভারত-গগনে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর ন্যায় দীপ্তিময়ী বহু প্রতিভাশালিনী মহীয়সী নারী আবির্ভূতা হইয়াছিলেন। শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে ইহার সুস্পষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। এই রমণীগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জীবন ও চরিত্রের সহিত সামান্য পরিচয় থাকিলেও ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, তাঁহারা যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—উহা নারীশিক্ষার বিশেষ অনুকূল ছিল, পুরুষের ন্যায় নারীকেও তখন বিদ্যার্জনে এবং জীবনের সর্বপ্রকার উন্নতিলাভে সমান সুযোগ দেওয়া হইত। 'পুরুষের সেবা করিবার জন্যই নারীর জন্ম ও গৃহকর্ম-সম্পাদনেই তাহার সকল সার্থকতা, অতএব তাহার শিক্ষার কোন প্রয়োজন নাই'—আজকালকার একশ্রেণীর হিন্দুগণের এই ধারণা নিতান্তই অসার। এই

* Prabuddha Bharata পত্রিকায় বহুবৎসর পূর্বে প্রকাশিত লোকান্তরিত লেখকের ইংরেজী প্রবন্ধ হইতে শ্রীমতী আশা দেবী, এম্-এ কর্তৃক অনূদিত।

শোচনীয় ভ্রান্তির মূল কারণ স্বার্থপরতা ও একদেশদর্শিতা ব্যতীত আর কিছুই নহে। উক্ত মত যাঁহারা পোষণ করেন তাঁহারা এ দেশের পূর্বতন নারীগণের কীর্তিকলাপে সমুদ্ভাসিত প্রাচীন শাস্ত্রসমূহের সহিত পরিচিত নহেন অথবা তাঁহারা কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধঃপতিত যুগের অস্বাস্থ্যকর প্রথাকে অন্ধভাবে আঁকড়াইয়া থাকিতে চান। ইতিহাসের ছাত্রেরা জানেন, মধ্যযুগে হিন্দুস্থানে মুসলমানগণের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের ফলে দেশের কোমলস্বভাবা নারী-জাতিকে কত লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। বহু শতাব্দীর সন্ত্রাস-শাসন ও অরাজকতার কুফলেই নারীগণ বর্তমান দুরবস্থায় উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, যে অবস্থার বিষময় ফলে নারীগণের প্রকৃত উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়াছিল বর্তমানে সে অবস্থা আর নাই। দীর্ঘকালব্যাপী দমন এবং নির্যাতনের পরিণামে হিন্দুনারীর জীবন-প্রগতিতে যে অচল অবনত অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে এখন আমাদিগকে তাহার সহিত দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে।

যে যুগে জীবনের সকল ক্ষেত্রেই জড়তা এবং অধোগতি হয় প্রবল, সে যুগে ইহাই বোধ করি ভবিতব্য যে, নিজেদের দুর্বল ও পঙ্গু অবস্থার জন্য যে সকল সমস্যার প্রতীকার মানুষের সাধ্যাতীত, সেই সব বিষয়ে নানা প্রকার নির্বোধ ধারণা জনসাধারণের মনকে আচ্ছন্ন করিয়া বসে। নারী প্রাচীন আর্যগণের জ্ঞান-ভাণ্ডারস্বরূপ বেদপাঠ করিবে না এবং এমন কোন কাজে ব্যাপৃত হইবে না যাহা দ্বারা তাহাদের মন ও বুদ্ধি পূর্ণভাবে বিকশিত ও উন্নত হয়, যাহাতে তাহারা উচ্চতম গুণরাজিতে পুরুষের সমকক্ষ বা তাহাদের চেয়েও বড় হইতে পারে—জনসাধারণের এই ধরনের সংকীর্ণ মনোভাবের উহাই বোধ করি প্রকৃত ব্যাখ্যা। এই ভ্রান্ত ধারণার ভিত্তি যে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে নাই ইহা অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি অনায়াসেই জানিতে পারেন।

প্রাচীনকালে পবিত্র শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপনায় নারীগণের সর্বপ্রকার অধিকার এবং সুযোগ ছিল। এখনই বরং উহা পুরুষজাতির একচেটিয়া হইয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রাচীন ভারতে নারী পুরুষের অর্ধাঙ্গরূপে বিবেচিত হইতেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা ঋগ্বেদের ৫।৬১।৬ মন্ত্র, উহার সায়ণভাষ্য; তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ৩।৩।৩ মন্ত্র এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদের ১।৪।৩ উক্তি উল্লেখ করিতে পারি। ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের অন্তর্গত ১৩১ সংখ্যক সূক্তে স্ত্রী যে স্বামীর সমান তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদের শেষে সৃষ্টিকর্তা হইতে আরম্ভ করিয়া যত ঋষি-মাতা ও তাঁহাদের পুত্রদিগের ধারাবাহিক বংশপরিচয় প্রদান করা হইয়াছে। এই অংশের উপর আচার্য শংকর তাঁহার ভাষ্যে বলেন,—"এক্ষণে বংশপরিচয় সম্পূর্ণ হইল। প্রসঙ্গপ্রাপ্ত অধ্যায়ে নারীগণের বিশেষ প্রাধান্যের জন্য মাতার পরিচয় দ্বারাই আচার্যগণের পরম্পরাক্রম বর্ণিত হইয়াছে।"

মনু বলেন—

'দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহমর্ধেন পুরুষোঽভবৎ।
অর্ধেন নারী তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥'

(মনুসংহিতা, ১।৩২)

অর্থাৎ :—সেই ব্রহ্মা নিজ দেহ দুইভাগে বিভক্ত করিয়া একার্ধে পুরুষ ও অপরার্ধে নারী হইয়াছিলেন এবং সেই নারীতে বিরাট (বিশ্বপ্রকৃতি) সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং বিষ্ণুপুরাণেও এই বিষয় বর্ণিত আছে। এইসকল শাস্ত্রীয় প্রমাণদ্বারা নরনারীর সমানত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কারণ, সাম্যনীতির মৌলিক ভিত্তি অনুসারেও সমভাবে বিভক্ত বস্তু-মাত্রের দুই অংশই উক্ত বস্তুর গুণ সমভাবে ধারণ করে। যেমন, একটি ফলকে যদি দুই

সমান অংশে ভাগ করা হয় তাহা হইলে দুই টুকরাতেই ফলটির নৈসর্গিক ধর্ম ও গুণ সমানভাবে থাকে না কি? উপরোক্ত আলোচনা হইতে নর ও নারী উভয়েরই সমান অধিকার ও সুবিধা দৃঢ়ভাবেই সমর্থিত হয়।

নারীর যে সকল অধিকার লইয়া মতভেদ আছে তাহাদের মধ্যে বিদ্যার্জনই প্রধান। এই সম্বন্ধে শাস্ত্রের কি উক্তি প্রথমে তাহা দেখা যাক্। হারীত বলেন—

'দ্বিবিধাঃ স্ত্রিয়ো ব্রহ্মবাদিন্যঃ সদ্যোদ্‌বাহাশ্চ,
তত্র ব্রহ্মবাদিনীনাং অগ্নীন্ধনং বেদাধ্যয়নং
স্বগৃহে চ ভিক্ষাচর্যেতি ॥'

অর্থাৎ পুরাকালে দুই প্রকার স্ত্রীলোক ছিলেন, ব্রহ্মবাদিনী এবং বিবাহিতা; ব্রহ্মবাদিনীগণের উপবীত ধারণ, যজ্ঞাগ্নি পরিচর্যা, বেদপাঠ এবং স্বগৃহে ভিক্ষচর্যার অধিকার ছিল।

যমস্মৃতিকার প্রায় একরূপই লিখিয়াছেন। যমস্মৃতি স্পষ্টতই নারীগণের সমগ্রবেদপাঠ অনুমোদন করেন, নতুবা, "তোমার পত্নীকে বেদশিক্ষা দান কর এবং তাহার নিকট উহা ব্যাখ্যা কর"—এই প্রকার উপদেশের কোন অর্থ হয় না। সত্য, এই বিষয়ে কোন কোন শাস্ত্রে (যথা—শ্রীমদ্ভাগবতের ১।৪।২৫ শ্লোকে) নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে, কিন্তু ঐ নিষেধাজ্ঞা কেবল অতিশয় সাধারণ নারীগণের জন্তই। তাহাদের জন্য পুরাণ এবং ইতিহাস শ্রবণের নির্দেশ করা হইয়াছে। উহার দ্বারাই তাহারা ধর্ম এবং ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু ব্রহ্মবাদিনী অর্থাৎ উন্নত প্রকৃতির নারীগণের বেদপাঠে সম্পূর্ণ অধিকার ছিল এবং তাঁহারা যে উচ্চ জীবন যাপন এবং তত্ত্বজ্ঞানও লাভ করিয়াছিলেন তাহার বহু উদাহরণ পাওয়া যায়। এ বিষয়ে ব্যোম-সংহিতার ঘোষণা যতদূর সম্ভব স্পষ্ট মনে হয়। যথা,—"রমণী, শূদ্র এবং নিম্নতর ব্রাহ্মণগণের কেবল তন্ত্রেই অধিকার। শ্রেষ্ঠতর নারীগণের বেদপাঠে অধিকার আছে। উর্বশী, যমী, শচী এবং অন্যান্য নারীগণের বিষয়ে উহা জানা যায়।" ঋগ্বেদের ৪র্থ মণ্ডলের ১৭ সূক্তে আমরা জানিতে পারি মাতাই তাঁহার পুত্রগণের বিদ্যাদানের প্রথম আচার্য। উক্ত বেদের অন্যত্র দেখিতে পাওয়া যায় যে মমতা নামে এক রমণী বেদমন্ত্র উচ্চারণে পারদর্শিনী ছিলেন। আবার অপর একটি স্থলে ধর্মশিক্ষয়িত্রীরূপে ইলা নামে জনৈক মহিলার কথা উল্লিখিত আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যের, সহধর্মিণী মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ প্রদানের কাহিনী সর্বজনবিদিত।

যদিও ঋগ্বেদে একথা বলা হইয়াছে যে, নারীগণ তাহাদের স্বামীর সহিত একত্রে ধর্মানুষ্ঠান করিবে কিন্তু বিশ্ববারার ক্ষেত্রে (ঋঃ বেঃ, ৫।২৮) দেখিতে পাই তিনি স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠানের কর্ত্রী, স্বয়ং যজ্ঞে আহুতি দিতেছেন এবং পুরোহিতগণকে অভিষিক্ত করিতেছেন। কেবল তাহাই নহে, যজ্ঞের বিশদ পরিচালনায় তিনিই পুরোহিতগণের উপদেষ্ট্রী। উক্ত বেদেই আমরা জানিতে পারি যে ঘোষা, অপালা, ঘৃতাচী, প্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ স্বাধীনভাবে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, স্ত্রীলোক যদি সমর্থা এবং কুশলা হইতেন তাহা হইলে কখনও তাঁহাকে কোন অধিকার হইতে তখন বঞ্চিতা করা হইত না।

ঋগ্বেদে (১।১২৪) নারীর দায়াধিকারের বিষয় বর্ণিত আছে। দরিদ্র নারীগণ কায়িকশ্রমের দ্বারা জীবিকা উপার্জন করিতেন, রাজাও তাঁহাদিগকে কাজ দিতেন। উক্ত বেদেই (১০।১০৮) উল্লিখিত আছে, কিরূপে সরমা নাম্নী জনৈকা মহিলা স্বামী কর্তৃক দস্যুগণের অন্বেষণে প্রেরিত হইয়া তাহাদিগকে খুঁজিয়া পাইলেন

এবং নিহত করিলেন। রাজা নমুচী তাঁহার পত্নী সৈনিকীকে শত্রুদমন করিতে পাঠাইয়াছিলেন। (ঋঃ বেঃ, ৫।৩০)। বোদ্ধৃমতী (১।১১৭) নামে অপর একজন নারীর বিষয়ও এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্যালা নাম্নী অপর একজন রমণীও শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বর্তমান হিন্দুগণের এবং হিন্দু-নারীগণের এ সকল কথা বিশ্বাস হইবে কি? ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডল ১২৬ সূক্তের ঋষি ছিলেন রোমশা। ঐ মণ্ডলেরই ১৭৯ সূক্তের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী দেখিতে পাই লোপমুদ্রা। অদিতি অপর একজন মন্ত্রদ্রষ্ট্রী ও ব্রহ্মবাদিনী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রকে ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষা দিয়াছিলেন (ঋগ্বেদ, ৪র্থ মণ্ডল, ১৮।৫,৬,৭; ও ১০ম মণ্ডল ৭২ সূক্ত)। সংক্ষেপে বিশ্বাবারা, শাশ্বতী, অপালা, শ্রদ্ধা, যমী, ঘোষা, অগস্ত্যস্বসা সূর্যা, দক্ষিণা, সরমা, যুহু, বাক্ প্রভৃতির নাম বেদের মন্ত্রদ্রষ্ট্রীরূপে প্রসিদ্ধ। ইঁহাদিগকে দেখিতে পাই ধর্মপ্রাণা, কর্তব্যপরায়ণা, পবিত্র-হৃদয়া, বেদজ্ঞা, যাগযজ্ঞাদিরতা, গৃহকর্মে দক্ষা আবার যুদ্ধশাস্ত্রেও নিপুণা, পবিত্রবেদমন্ত্রের গায়িকা এবং আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণ ও বিচারে সমর্থা। যে হিন্দুনারী অধুনা শিক্ষাদীক্ষাহীনা, 'অবলা' তাঁহারাই বৈদিকযুগে কিরূপ উন্নতির শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহার উজ্জ্বল স্মৃতিস্তম্ভ স্বরূপ এই সকল নারীগণের এবং আরও বহু নারীর নাম সমগ্র ঋগ্বেদে ছড়াইয়া রহিয়াছে।

নারীগণ যে পবিত্র বেদমন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিতেন এবং যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত ও রক্ষা করিবার অধিকারিণী ছিলেন তাহা অশ্বলায়ণ গৃহ্যসূত্র হইতেও জানিতে পারা যায়। বিবাহের সময় পুরোহিত শাস্ত্রনির্দিষ্ট আদেশসমূহ উচ্চারণ করিতেছেন, "ধর্মে চার্থে চ কামে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ম্" অর্থাৎ, এই বধূ ধর্ম, অর্থ এবং কাম এই ত্রিবর্গ লাভের জন্য কর্মানুষ্ঠানে তোমা কর্তৃক পশ্চাতে রক্ষিতা হইবেন না। বর উত্তর প্রদান করিতেছেন, "নাতিচরামি" অর্থাৎ, না, আমি তাঁহার অগ্রে যাইব না। এই কথাগুলি যথেষ্টরূপে প্রমাণ করে যে ধর্মার্থকামের জন্য কর্মানুষ্ঠানে নারীগণের পূর্ণ অধিকার ছিল। সাংখ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র এবং গৃহ্যসূত্র ও উহার ভাষ্য হইতেও ইহা দেখানো যাইতে পারে।

যজুর্বেদের তৈত্তিরীয় সংহিতায় পবিত্র অগ্নির সম্মুখে পাঠ করিবার জন্য কতকগুলি মন্ত্র ও প্রার্থনা আছে। এইগুলি বিশেষরূপে নারীদের জন্যই লিখিত (তৈত্তিরীয় সংহিতা ১।১।১০)। আপস্তম্ব গৃহ্যসূত্রের কতকগুলি মন্ত্রে (দৃষ্টান্ত-স্বরূপ যথা,—৩।৮।১০; ৩।৯।৫—৮) নারী-গণের মন্ত্রোচ্চারণের অধিকার নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাঁহারা উচ্চতর জ্ঞান, বিচার, কর্মদক্ষতা, উপাসনানুরাগ, অসৎ হইতে আত্মরক্ষার ক্ষমতা প্রভৃতি লাভ করিবার জন্য, পতির প্রিয়পাত্রী হইবার এবং ঐশ্বর্য ও সন্তানলাভ করিবার জন্য এবং আবৈধব্য আহারের পূর্বে আদিত্যের অর্চনার জন্য ঐ মন্ত্রগুলি ব্যবহার করিতেন।

আপস্তম্ব ধর্মসূত্রের (১১।৬।১৮) মতানুসারে পতি এবং পত্নীর মধ্যে স্বার্থের কোন পার্থক্য নাই (১৬)। বিবাহের সময় হইতেই সকল কার্য একত্রে অনুষ্ঠিত হইবে (১৭), ধর্মানুষ্ঠানের ফললাভের বিষয়েও তাহাই, (১৯)। পতি যদি দূরদেশে অবস্থান করেন, পত্নী দানকার্য ও প্রাত্যহিক কর্তব্য নিষ্পন্ন করিবার জন্য অর্থব্যয় করিতে পারেন এবং ঐরূপ অর্থ ব্যয়ের দ্বারা পত্নীর যাহা নিজের নহে তাহা লওয়ার অর্থাৎ চৌর্যের অপরাধ হয় না (৩০), ইত্যাদি। এই বিষয়ে উজ্জ্বলদত্ত তাঁহার ভাষ্যে বলেন,—"সম্পত্তি যদি কেবল পতির বলিয়াই গণ্য হইত তাহা হইলে এই কার্যের দ্বারা পত্নীর চৌর্যাপরাধ হইত।"

প্রাচীন ভারতে নববিবাহিতা বালিকার প্রতি কিরূপ সম্মান, স্নেহ এবং সৌহার্দ্যের ভাব

পোষণ করা হইত সে বিষয়ে সামবেদ সংহিতার কতকগুলি মন্ত্র (১, ৪, ৫) সাক্ষ্য প্রদান করে। কয়েকটি মন্ত্রের সায়নভাষ্য হইতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত অনুবাদে ইহা প্রমাণিত হইবে। "হে মহাভাগে, পবিত্রতায় সমুজ্জ্বল হইয়া শত বৎসর জীবিত থাক এবং আমার সকল ধনসম্পদ ভোগের অধিকারিণী হও (৬)। হে সর্বগুণ-সম্পন্নে বালিকে, আমার জীবন-সঙ্গিনী হও, আমি যেন তোমার সৌহার্দ্য লাভ করিতে পারি, অপর নারীগণ যেন আমাদের উভয়ের প্রীতিবন্ধন ভঙ্গ করিতে না পারেন এবং এই সৌহার্দ্য আমাদের শুভানুধ্যায়িগণ কর্তৃক বর্ধিত হউক (৭)। শ্রেষ্ঠা এই বধূ, হে ইক্ষ্বাকু, এই কন্যার প্রতি সৌভাগ্য এবং তোমার অনুগ্রহ সমর্পণ কর (৮), হে ধাত্রী এবং অন্যান্য দেবগণ, আমাদের দুইটি হৃদয়কে একত্রে মিলিত কর (৯); হে বধূ, তোমার দৃষ্টি প্রেমপূর্ণ হউক, তুমি বৈধব্যরহিতা হও, গৃহপালিতা পশুগণের রক্ষয়িত্রী হও, উচ্চহৃদয়া, মহিমান্বিতা, দীর্ঘায়ু সন্তানগণ দ্বারা পরিবৃতা, পঞ্চ-যজ্ঞানুষ্ঠান পালনের অভিলাষিণী, এবং সকলের প্রতি প্রীতিসম্পন্না হও। সংক্ষেপে, তুমি আমাদের, এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদবিশিষ্ট সকল প্রাণীর কল্যাণ-দাত্রী হও (১১)। হে বধূ, তোমার এই গৃহে তুমি সহিষ্ণুতার সহিত বিরাজ কর, এই গৃহে তুমি আত্মীয়গণের সহিত আনন্দে অবস্থান কর (১৪)।"

শতপথ ব্রাহ্মণ এবং বৃহদারণ্যকোপনিষদের ৮ম অধ্যায়ে এই কথাগুলি আছে—"যিনি ইচ্ছা করেন যে দীর্ঘায়ু এবং অগাধ বিদ্যাসম্পন্না কন্যালাভ করিবেন ইত্যাদি।"

গোভিল গৃহসূত্র, লাট্যায়ন শ্রৌতসূত্র, এবং উহাদের ভাষ্যাদি হইতে বহু অংশ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে, যাহা বিদ্যা, বেদজ্ঞান এবং স্বাধীন জীবিকা অর্জনে নারীর অধিকার সপ্রমাণিত করে। ভাষ্যকার "স্ত্রী চাবিশেষাৎ" (কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র ১।১।৭) এই সূত্রের নিম্নলিখিতরূপ ব্যাখ্যা করেন, "যে সকল ক্রিয়ার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ স্বর্গলাভের অভিপ্রায় করেন সেই সকল অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম স্ত্রীলোকগণও অবাধে তাঁহাদিগের সহিত সমভাবে অনুষ্ঠান করিতে পারেন।"

উক্ত গ্রন্থেরই অন্যান্য সূত্র এবং তাহাদের ভাষ্য হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নারীগণ বেদাধ্যয়ন করিতে পারিতেন, স্বাধীন ভাবে দ্রব্যের আদান প্রদানে তাঁহাদের অধিকার ছিল এবং পুরুষগণ যেরূপ সহধর্মিণী ব্যতীত ধর্ম-অর্থ-কামপ্রাপক কর্মের অচ্ছিদ্র অনুষ্ঠান করিতে পারিতেন না, নারীগণও সেইরূপ পতির সাহচর্য ব্যতীত ঐ সকল কর্মা-নুষ্ঠানের অধিকারিণী হইতেন না। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এই সকল কার্যে কেবল একপক্ষের একচেটিয়া অধিকার ছিল না।

আরও বলা যাইতে পারে যে, স্ত্রীলোকগণকে যদি তখন শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা না থাকিত তাহা হইলে শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস এবং পুরাণ সমূহে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে যে সকল বিধান আছে (যথা– তাহারা এই সকল কর্ম করিবে এবং উহা করিবে না, ইত্যাদি) তাহাদের কোন অর্থই হয় না, কারণ যাহাদের জন্য ঐসকল বিধানের ব্যবস্থা, তাহারা যদি উহার অর্থ বুঝিবার উপায় হইতে বঞ্চিত হয় তাহা হইলে ঐ সকল আদেশের মূল্য কি? অবশ্যই আজকাল পুরুষ ও নারী উভয় পক্ষই অনেক ক্ষেত্রে যাহা করিয়া থাকেন, সেইরূপ তোতাপাখীর ন্যায় মুখস্থ বলিয়া যাইবার উদ্দেশ্যেই ঐগুলি লিখিত হয় নাই! ঐ সকল কর্তব্য তো সামান্য ও অবহেলনীয় ছিল না এবং উহাদের দায়িত্বও সহজ এবং লঘু ছিল না; পরন্তু উহা পরিবারের যিনি নেত্রী তাঁহার উপযুক্ত সংযম এবং কর্তব্যপরায়ণতা জ্ঞাপন করিত। বাৎস্যায়ন সূত্র (২১শ অধ্যায়, অধি ৪) এবং উহার জয়মঙ্গল ভাষ্যে এই সকল কর্তব্যের বিষয় বর্ণিত

আছে। অতিশয় দীর্ঘ বলিয়া এস্থলে ঐ সকল উল্লেখ করা গেল না।

অশ্বলায়ন গৃহসূত্রে গার্গী, বাচক্নবী, বড়বা, প্রাচিতেয়ী, সুলভা, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির নাম আচার্য অথবা আধ্যাত্মিক বিদ্যাদাতৃগণের সহিত একত্রে উল্লিখিত হওয়ায় ইহা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে সেই প্রাচীন কালে ভারতীয় নারীগণও ধর্ম ও বিদ্যাদানে ব্রতী ছিলেন। অমরকোষে দ্বিতীয় কাণ্ডে মনুষ্যবর্গে 'উপাধ্যায়' শব্দের এই দুইটি বিভিন্ন স্ত্রী-আকার দেখিতে পাওয়া যায়—'উপাধ্যায়া' এবং 'উপাধ্যায়ী' ; ইহা দ্বারা যাঁহাদিগের নিকট অপরে বিদ্যালাভ করিতে আসিত এইরূপ নারী-আচার্যই বুঝায়। সিদ্ধান্ত কৌমুদীর স্ত্রীপ্রত্যয় প্রকরণে ইহা পরিষ্কাররূপে লিখিত আছে যে, যে সকল অধ্যাপিকা স্বাধীনভাবে অপরের নিকট শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতেন তাঁহারাই আচার্যা বলিয়া অভিহিতা হইতেন। উপরোক্ত বিবরণগুলি হইতে জানা যায় যে, নারীগণের কেবলমাত্র যে বিদ্যালাভের অধিকার ছিল তাহা নহে পরন্তু বিদ্যাদান এবং অধ্যাপনা করিবার অধিকারও তাঁহাদের ছিল। নারী কেবল মাত্র বিদ্যার্থিনীরূপেই গৃহীতা হইতেন না, অধিকন্তু আচার্যের সম্মানিত পদও গ্রহণ করিতেন।

ভোগবতীকূলে

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

ভাগীরথী হেথা ভোগবতী
তীরে তীরে শত শত হর্ম্যমাঝে ভোগীর বসতি।
বিরাট নগরী রাজে আঢ্য যানবাহনে মুখর,
উজ্জ্বল বিদ্যুদালোকে, পণ্যেভরা আপণনিকর,
বিলাসের লীলাভূমি, ক্রীড়াক্ষেত্র, চারু উপবন,
রঙ্গালয়, পানশালা। রাজপথ বিচিত্র শোভন
লইয়া বিরাজ করে। সহস্র সহস্র নর নারী
তার মাঝে ভোগতৃষ্ণা প্রাণপণে নিঃশেষে নিবারি
রোগার্ত হইয়া শেষে দগ্ধ হয় চিতার অনলে
ভেসে যায় ভোগবতীজলে।

লক্ষ লক্ষ দীন পুরবাসী
সে ভোগে বঞ্চিত হ'য়ে, লয়ে তৃষ্ণা ক্ষুধা সর্বগ্রাসী
পথে পথে প্রাণপণে করে সেই ভোগ্যেরই সন্ধান,
স্বস্তি নাই, শান্তি নাই, সহে লজ্জা ঘৃণা অপমান।
তারি লাগি কাড়াকাড়ি মারামারি নিয়ত সংগ্রাম,
ক্ষমা নাই দয়া নাই নাহি সন্ধি জানে না বিশ্রাম।
জানে তারা জীবনের সারব্রত ইন্দ্রিয়ের ভোগ,
তাহারি সন্ধানে করে সর্বশক্তি নিঃশেষে নিয়োগ
ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে শেষে এই ভোগবতীকূলে
অনন্ত নিদ্রায় সবি ভুলে

বহুদূরে গিরির ছায়ায়
ডাকিল আশ্রম মঠ—শান্তি চাস্ রে তাপিত আয়।
কেহ শুনিল না, কেহ ছুটিল না প্রাণের আগ্রহে,
তাই বলি সে সবের ব্রতলক্ষ্য ভুলিবার নহে।
মন্দির, আশ্রম, মঠ, সেবাসত্র, ভক্তপরিষদ্
তাই ত্যজি গিরিবন শান্তিময় দূর জনপদ,
আসে তাপিতের টানে শুনাইতে শান্তিমন্ত্র-বাণী
মাভৈঃ মাভৈঃ রবে উচ্চে তুলি আশ্বাসের পাণি,
এই তপ্ত নগরীরে একে একে ফেলিতেছে ঘিরে
যোগজালে ভোগবতী-তীরে।

এ যুগের এই ব্যতিক্রম,
যেথা মানুষের শ্রম সেথানেই তাহার আশ্রম।
যোগে ভোগে আর নাই বিভাগের প্রথা,
স্ফীত ভোগ্যরাশি সনে যুঝে নিত্য আয়ুর হ্রস্বতা।
আজিকার যোগাশ্রম নয় তাই বনে গিরিতটে,
যেথানে মানুষ করে আর্তনাদ জীবনসংকটে,
যেথানে ভোগের পঙ্কে যাপে নর শূকর জীবন,
এই ধূলিধূমক্লিন্ন, ত্বরা তপ্ত, অশুচি পবন
নগরেরই উপকণ্ঠে ভোগবতীকূলেই পেলাম
আধ্যাত্মিক সাধনার ধাম।

"কলি ধন্য, শূদ্র ধন্য, নারী ধন্য"

অধ্যক্ষ শ্রীঅক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্-এ

শাস্ত্রগ্রন্থে একটি পুরাতন প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, এক সময়ে মুনি-সমাজে একটি বিতর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, এবং বিতর্কের বিষয় ছিল তিনটি :—(১) চতুর্যুগের মধ্যে কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ? (২) চতুর্বর্ণের মধ্যে কোন্ বর্ণ শ্রেষ্ঠ? (৩) নারী ও পুরুষের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? বিতর্কটি উঠিয়াছিল দ্বাপর ও কলির যুগ-সন্ধিতে। কলিযুগ তখন আসিবার উপক্রম করিতেছে। মুনি-সমাজ আশঙ্কান্বিত। কলিযুগের অগ্রদূতেরা অভিনব ভাবধারা প্রচার আরম্ভ করিয়াছে। সমাজে বিপ্লবের লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। মুনিগণের মধ্যেও মতভেদ দেখা যাইতেছে। প্রাচীন যুগের ও সমুন্নত সমাজের প্রচলিত মতবাদের বিরোধী শক্তিসমূহ ক্রমশঃই যেন প্রবলতর হইয়া উঠিতেছে। মানবজগতের কল্যাণকল্পে আগামী যুগের সুনিয়ন্ত্রণ-উদ্দেশ্যে একটি সুমীমাংসা আবশ্যক।

তখন মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস সর্বশাস্ত্র-মর্মার্থদর্শী সর্বকালতত্ত্বজ্ঞ শ্রেষ্ঠ আচার্য বলিয়া আর্যসমাজে স্বীকৃত। তিনি সমগ্র বেদকে সংগ্রথিত ও সুসজ্জিত করিয়া এবং তাহার অধ্যয়ন-অধ্যাপনার সুনিপুণ ব্যবস্থা করিয়া আর্যসমাজের ভিত্তি সুদৃঢ় করিয়াছেন; বেদের কর্মকাণ্ড, উপাসনাকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়া এবং মানবের ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত সাধনার ক্ষেত্রে তাহাদের যথাযোগ্য স্থান নির্দেশ করিয়া, বেদবাদী ও উপনিষদ্‌বাদীদের অবান্তর কলহের সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছেন; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী ধর্ম-সাধনার পথ প্রদর্শন এবং প্রত্যেক বর্ণের স্ব স্ব ধর্মের মর্যাদাস্থাপন দ্বারা সমগ্র জাতিকে আত্মকলহ হইতে রক্ষা করিয়াছেন; মহাভারত পুরাণাদি রচনা ও প্রচার করিয়া জাতি ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় ঋষি-মুনি-যোগি-তপস্বীদের সাধনলব্ধ তত্ত্বসমূহকে কাব্য-ইতিহাস-গল্প-উপন্যাসাদির সাহায্যে জাতি ও সমাজের অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত নিম্ন নিম্নতর নিম্নতম স্তর পর্যন্ত পৌছাইয়া দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; বেদান্ত-রচনা দ্বারা আর্যসাধনার নিগূঢ় চরম কথা ব্যক্ত করিয়া সমগ্র জাতিকে অধ্যাত্মভাবমণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন। ভারতে মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়নের আচার্যত্ব অনন্যসাধারণ। ভারতীয় সাধনায় তাঁহার গুরুপদ চিরকালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত।

মুনিগণ তাঁহাদের বিতর্কের সুমীমাংসার নিমিত্ত মহর্ষির আশ্রমে উপনীত হইলেন। মহর্ষি তখন সরস্বতী নদীজলে অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় পরমাত্মার ধ্যানে চিত্তকে সুসমাহিত করিয়া পরমানন্দে বিরাজিত ছিলেন। ধ্যান কথঞ্চিৎ শিথিল হইলে, তাঁহার প্রশান্ত চিত্তে মুনিগণের জিজ্ঞাসার প্রতিক্রিয়া হইল। আপনা হইতে তাঁহার মুখ দিয়া তিনটি বাণী উচ্চারিত হইল :—(১) কলি ধন্য; (২) শূদ্র ধন্য; (৩) নারী ধন্য। বাণী তিনটি জিজ্ঞাসু মুনিগণের শ্রবণগোচর হইল। ইহা যে তাঁহাদেরই বিতর্কের মীমাংসা, তদ্বিষয়ে তাঁহাদের সন্দেহ রহিল না। কিন্তু একি! তিনটি বাণীই যে চিরকাল প্রচলিত সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত! যে কলিযুগে ধর্মের মাত্র একপাদ অবশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, যে যুগে ধর্মের গ্লানি পূর্ণমাত্রায় এবং অধর্মের প্রাদুর্ভাব ক্রমবর্ধমান, সেই যুগকে মহর্ষি ধন্য বলিয়া প্রণাম জানাইলেন! যে শূদ্র ও নারী বৈদিক জ্ঞানে ও কর্মে সম্পূর্ণ অনধিকারী, একমাত্র সেবা করাই যাহাদের ধর্ম—সেই শূদ্র ও নারীকে তিনি ধন্য বলিয়া

শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিলেন! এ যে ভীষণ বিপ্লবের বাণী! ইহাই কি নবযুগের বাণী? কলিযুগ কি এই আদর্শ লইয়াই সমাগত হইতেছে? মানবীয় সাধনার ক্ষেত্রে এই আদর্শের যথার্থ স্বরূপটি কি? মুনিগণের কতকাংশ অবশ্য এই বাণী শুনিয়া পুলকিত হইলেন, অনেকেই বিমর্ষ হইলেন। সকলেই সাগ্রহে মহর্ষির ধ্যানভঙ্গ ও আগমনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে মহর্ষি নদী হইতে সমুত্থান করিয়া প্রসন্নচিত্তে আসিয়া মুনিবৃন্দের মধ্যে আসন গ্রহণ করিলেন এবং যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মুনিগণ তাঁহাদের বিতর্কের বিষয় নিবেদন করিলেন, এবং বিতর্কের মীমাংসাও যে তাঁহার মুখ হইতে পাইয়াছেন, তাহাও জানাইলেন। কিন্তু মীমাংসা এমনই অদ্ভুত ও অপ্রত্যাশিত যে, তাহার মর্মগ্রহণের নিমিত্ত তাঁহারা উৎকণ্ঠিত চিত্তে প্রতীক্ষা করিতেছেন। তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত বাণী তিনটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দিবার জন্য তাঁহারা সবিনয়ে অনুরোধ করিলেন।

মহর্ষি বেদব্যাস হাসিমুখে মুনিগণের নিবেদন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের সংশয়ভঞ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিলেন,—"করুণাময় ভগবান্ আমার মুখকে যন্ত্র করিয়া তোমাদের নিকট যে মহতী বাণী ঘোষণা করিলেন, তাহা আপাততঃ বিপ্লবের বাণী বলিয়াই প্রতীয়মান হয় বটে; কিন্তু ভাগবতী বাণী চিরন্তন সত্য। প্রচলিত সংস্কারের বিরোধী কোন ভাব যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাহা বিপ্লবাত্মক বলিয়াই মনে হয়। প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক মতবাদ, সত্যের প্রত্যেকটি রূপ প্রথম আবির্ভাবের কালে বিপ্লব-আকারেই উপস্থিত হয়। তাহাই যখন সমাজ-মনকে প্রভাবিত করিয়া স্থায়ী আসন গ্রহণ করে, তখন প্রচলিত সংস্কাররূপে পরিণত হয়। মানবসমাজে আপাত-বিপ্লবের ভিতর দিয়াই সত্যের নূতন নূতন রূপ প্রকটিত হইয়াছে, নূতন নূতন ভাবধারা প্রবাহিত হইয়াছে, নরনারীর চিত্তে নূতন নূতন সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ এইরূপেই যুগে যুগে মানুষের নিকট নূতন নূতন বাণী প্রেরণ করিতেছেন, মানুষকে সত্যের নূতন নূতন মূর্তির সহিত পরিচিত করাইতেছেন। সুতরাং বিপ্লবের নামে ভীতচকিত হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

যে তিনটি বাণী সম্প্রতি উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা হয়ত একটি নব ভাবপ্রবাহেরই সূচনা করিতেছে। হয়ত কালক্রমে ধীরে ধীরে ইহার তাৎপর্য সমাজ-জীবনে অভিব্যক্ত হইবে। কিন্তু ইহা সনাতন সত্য ও ধর্মের বিরোধী নয়, সনাতন সত্য ও সনাতন আর্যসংস্কৃতিরই একটি নবরূপে আত্মপ্রকাশ। মুনিগণ নিজ নিজ বিচারের উপর গভীরতর বিচারের আলোক-সম্পাত করিলেই সন্দেহ ও বিবাদ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন।

ভগবদ্‌বিধানে যুগপরম্পরা প্রবাহিত হইতেছে, বর্ণবিভাগ সংঘটিত হইতেছে, পুরুষ-নারী-বিভাগ ত চিরকালই আছে; ইহার মধ্যে কোন্ যুগ শ্রেষ্ঠ ও কোন্ যুগ নিকৃষ্ট, কোন্ বর্ণ শ্রেষ্ঠ ও কোন্ বর্ণ নিকৃষ্ট, পুরুষের স্থান উচ্চে কিংবা নারীর স্থান উচ্চে—এই জাতীয় প্রশ্নের উদ্ভব হয় কোথা হইতে? তত্ত্বদৃষ্টিতে বিচার করিলে এই সব প্রশ্নের কোন সার্থকতা আছে কি? সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নিত্যানন্দময় সত্যশিবসুন্দর শ্রীভগবান্ এই বিশ্বসংসার রচনা করিয়াছেন, আপনিই এই সংসারের লালনপালন করিতেছেন, আপনারই লীলাবিধানে ইহাকে পরিচালিত করিতেছেন, আপনারই অন্তর্নিহিত আনন্দের

প্রেরণায় প্রতিনিয়ত ইহার মধ্যে কত বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিতেছেন, কত সংহার করিতেছেন, কত সংস্কার-বিকার করিতেছেন। বস্তুতঃ আপনার আনন্দে তিনি আপনিই সব হইতেছেন; আপনি বিচিত্র নাম, রূপ, উপাধি গ্রহণ করিয়া আপনারই সঙ্গে আপনি বিচিত্র ভাবের, বিচিত্র রসের খেলা খেলিতেছেন; আবার আপনার মধ্যেই সবকে সংহরণ করিয়া লইতেছেন। এখানে শ্রেষ্ঠ-কনিষ্ঠের ভেদ কোথায়? সকলের মধ্যেই ত সত্যশিবসুন্দরের আত্মপ্রকাশ, সবই ত তিনি। তিনিই সকল যুগ, তিনিই সকল মানুষ, তিনিই দেশে কালে নূতন নূতন রূপ পরিগ্রহ করেন। কাহাকে বড় বলিব, কাহাকে ছোট বলিব?

কালপ্রবাহে যুগের আবর্তন হইতেছে; প্রত্যেক যুগের প্রকৃতির মধ্যে কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। অসংখ্যপ্রকার জীব জাতির উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে; প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক শ্রেণীর, প্রত্যেক ব্যক্তির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। মানবসমাজের মধ্যেও কত প্রকার আকৃতি, কত প্রকার প্রকৃতি, কত প্রকার শক্তিতারতম্য, বুদ্ধিতারতম্য। অবিশেষের মধ্যে বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের উদ্ভব—ইহার নামই ত সৃষ্টি, ইহাই ত সংসার। এই সব বৈশিষ্ট্য নিয়াই ত ভগবানের লীলা। তাঁহার লীলাবিধানে সব বিশিষ্টতারই স্থান আছে, সার্থকতা আছে, নিজস্ব গৌরব আছে। প্রত্যেক যুগ, প্রত্যেক জাতি, প্রত্যেক বর্ণ, এমন কি প্রত্যেক ব্যক্তি, নিজের বৈশিষ্ট্যে গৌরবান্বিত। প্রত্যেকেই নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়া ভগবানের লীলার পুষ্টিসাধন করিতেছে, ভগবানের রসসম্ভোগে উপকরণ যোগাইতেছে।

তত্ত্বদৃষ্টিতে সব বৈচিত্র্যের মধ্যে ভগবানের আত্মপ্রকাশ দর্শন করিলে, সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাঁর লীলাবিলাস দর্শন করিলে, সব ভেদের মধ্যে অভেদ দর্শন করিলে, শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে বিসংবাদ কি নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না? যথার্থ সত্যদর্শীর বিচারে উচ্চ-নীচ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট, মহান্-ক্ষুদ্র, এসবের কোন ভেদ নাই। আছে শুধু অনন্ত বৈচিত্র্যের মধ্যে একের লীলাবিলাস, সর্বদ্বন্দ্বের মধ্যে দ্বন্দ্বাতীতের আত্মপ্রকাশ।

মানুষ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে, প্রয়োজনের তুলাদণ্ডে, উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ, শ্রেষ্ঠ-নিকৃষ্ট প্রভৃতি ভেদের বিচার করিতে থাকে। ব্যবহারক্ষেত্রে এই বিচারের মূল্য অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু মানব-বুদ্ধি যতই তত্ত্বের ভূমিতে আরোহণ করিতে থাকে, ততই এই সব ভেদের বিচার অকিঞ্চিৎকর বোধ হইতে থাকে। ব্যবহারিক জগতে সব প্রয়োজনের কেন্দ্রে থাকে মানুষের অহংকার ও বাসনা; ভেদের বিচারও তদনুযায়ী হইয়া থাকে। যুগে যুগে, দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে মানুষের অহংকার ও বাসনা নূতন নূতন রূপ ধারণ করে, প্রয়োজনবোধের বহুল পরিবর্তন হয়, মূল্য-নিরূপণের মানদণ্ডও বিভিন্নপ্রকার হয়। এক যুগে, এক দেশে বা এক জাতির মধ্যে যাহাদের স্থান সকলের ঊর্ধ্বে, অপর যুগে কিংবা অপর দেশে অথবা অপর জাতির মধ্যে তাহাদের সমাদর কম দৃষ্ট হইলে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। অভ্যাসের দাসত্বহেতু যাহা বিপ্লব বলিয়া মনে হয়, তাহাও ভগবানের বিধান ও প্রকৃতির নিয়ম অনুসারেই হয়। সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ব্যবহারক্ষেত্রে কোন্‌টি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয় বা সব চেয়ে বেশী মূল্যবান, তাহা নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন, অসম্ভব বলিলেও হয়। মানুষের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধির বিচিত্র প্রয়োজনের মধ্যে যখন যে জিনিসটির অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়, তখন সেইটিই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান হইয়া উঠে। যাহারা সেই অভাবের পূরণে বিশেষভাবে অগ্রণী হয়, সমাজে তৎকালে তাহাদের সম্ভ্রম ও আদর বেশী হয়।

মানবসমাজের প্রয়োজন লক্ষ্য করিলে ইহা সহজেই বোধগম্য হয় যে, মানুষের জীবনধারণের জন্য অন্ন-বস্ত্র-গৃহাদির আবশ্যকতা অবশ্য স্বীকার্য এবং তন্নিমিত্ত যাহারা পরিশ্রম করে, তাহাদের পরিশ্রমের মূল্য যথেষ্ট। সমাজের পক্ষে এই পরিশ্রমকে এবং শ্রমিকদিগকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা অবশ্য কর্তব্য। সভ্য মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনে পার্থিব সম্পদ্‌বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। যাহারা কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পাদির উৎকর্ষসাধন দ্বারা জাতি ও সমাজের ঐশ্বর্য-বৃদ্ধির কার্যে আত্মনিয়োগ করে, সমাজের পক্ষে তাহাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান-প্রদর্শন সমুচিত। জাতির মধ্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করা, বিভিন্ন-প্রকার স্বার্থের সমন্বয়-সাধন করা, বিভিন্নশ্রেণীর ও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সর্বপ্রকার বিরোধের সমাধান করিয়া তাহাদিগকে একসূত্রে গ্রথিত করা, সকলকে স্ব স্ব মর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত রাখা, দেশ-জাতি-সমাজকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত রাখা—ইহাও এক অত্যাবশ্যক কার্য। যাহারা এই কার্যে আত্মনিয়োগ করে, তাহাদের যেমন শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য ও সংগঠনশক্তি আবশ্যক, তেমনি ন্যায়নিষ্ঠা ধর্মপরায়ণতা মানবপ্রেম ও স্বার্থত্যাগ আবশ্যক। মানবসমাজে তাহাদের প্রতিও যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম থাকা বিধেয়। মানুষের যেমন বহির্জীবনের প্রয়োজন আছে, তেমনি অন্তর্জীবনের প্রয়োজন আছে। বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কলাবিদ্যা, ধর্মশাস্ত্র—এ সবই উন্নতিশীল মানবসমাজের পক্ষে অত্যাবশ্যক। যাহারা এ সকলের গবেষণায় নিরত, তাহারাও সমাজের সুমহৎ সেবায় নিয়োজিত এবং সকলের সম্মানার্হ। যাহারা মানবজাতির অন্তর্জীবনের উৎকর্ষ-সাধনের উপায়ানুসন্ধানে ডুবিয়া থাকে, তাহাদের বহির্জীবনের প্রয়োজন-সাধনের দায়িত্ব সমাজ ও রাষ্ট্রের গ্রহণীয়। সুতরাং শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ সকলেই সমাজের প্রয়োজন সাধন করিতেছে বলিয়া সমাদরণীয়।

অতএব মানবসমাজের প্রয়োজনের দৃষ্টিতে বিচার করিলেও, কোন শ্রেণীকে শ্রেষ্ঠ ও কোন শ্রেণীকে নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য করিবার কোন হেতু নাই। সকলেই স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে সমষ্টি-জীবনের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। জীবন্ত সমাজদেহের সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই শ্রদ্ধার্হ—কেহই বড় বা ছোট নয়। যে-কোন অঙ্গ বিকল হইলেই সমাজের স্বাস্থ্যহানি হয়, ধর্মহানি হয়, অভ্যুদয়ের পথে বিঘ্ন উপস্থিত হয়। প্রয়োজনের মানদণ্ডেও সকল শ্রেণীর পরস্পরের প্রতি সমদর্শিতা-অনুশীলন আবশ্যক। সমাজে পুরুষ ও নারীর মধ্যেও শ্রেষ্ঠাশ্রেষ্ঠ-বিচারের কি কোন অর্থ আছে? পুরুষ ব্যতীত যেমন নারীর নারীত্ব-বিকাশ অসম্ভব, নারী ব্যতীতও তেমনি পুরুষের পুরুষত্ব-বিকাশ অসম্ভব। পুরুষ ও নারীর মিলিত সত্তাতেই মানবত্বের বিকাশ সাধিত হয়। মুনিগণের পক্ষে সর্বতোভাবে সমদর্শিত্ব-অভ্যাস বাঞ্ছনীয়।

এখন প্রশ্ন এই যে, কলি, শূদ্র ও নারীকে যে ধন্য বলা হইল, ইহার তাৎপর্য কি? মানব-জীবনের চরম লক্ষ্য বিচার করিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, ভগবান্‌কে লাভ করাই,—জীবনের সকল ক্ষেত্রে ভগবানের সত্য-শিব-সুন্দর-স্বরূপ অনুভব করাই,—চরম ও পরম লক্ষ্য। তত্ত্ব-বিচারে নিরূপিত হইয়াছে যে, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম", ব্রহ্মই জীবজগৎরূপে আপনাকে লীলায়িত করিয়া বিচিত্রভাবে আপনাকে আপনি সম্ভোগ করিতেছেন। ভগবানের এই বিশ্বরূপের মধ্যে মানুষেরই অনন্যসাধারণ অধিকার ভগবান্‌কে লাভ করা, ভগবান্‌কে নিজের মধ্যে ও বিশ্বের মধ্যে সাক্ষাৎ অনুভব করা। তত্ত্ব-বিচারে যাহা চরম সত্য, সাধনবিচারে তাহাই,

চরম লক্ষ্য, জীবনের চরম আদর্শ। ভিতরে বাহিরে সর্বত্র ভগবান্‌কে দর্শন করিতে পারিলেই মানুষ আপনার পূর্ণ মনুষ্যত্বের অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই সাধন-সাধ্য-বিচারে যাহাদের জীবনে ভগবান্ যত সহজলভ্য, তাহারা তত ধন্য, তত সৌভাগ্যবান্, এবং যে যুগে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি ভগবান্‌কে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার পক্ষে যত অনুকূল হয়, সেই যুগকে তত ধন্য বলা চলে।

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে ইহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ভগবানকে লাভ করিবার পথে সর্বাপেক্ষা প্রবল অন্তরায় মানুষের অহংকার এবং সর্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টতম উপায় সর্বতোভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ। অহংকারই ভগবানের জগতে ভগবানকে উপলব্ধি করিতে দেয় না, ভগবানের আত্মপ্রকাশের মধ্যে ভগবানকে ঢাকিয়া রাখিয়া আপনার কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব উপলব্ধি করায়। গুরু ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান্ হইয়া এই অহংকারকে ভগবানের মধ্যে বিলীন করিয়া দিতে পারিলেই ভগবৎকৃপায় তত্ত্বদৃষ্টি খুলিয়া যায়, ভগবানের সত্যশিবপ্রেমানন্দময় সুন্দর মধুর স্বরূপ তাঁহার সকল লীলা-বিলাসের মধ্যে প্রতিভাত হইয়া উঠে। অহংকারের মধ্যেই অবিদ্যা ঘনীভূত আকারে বিদ্যমান থাকিয়া সব অনর্থ সৃষ্টি করে। ভগবানে আত্মসমর্পণ অভ্যাস দ্বারা অহংকারমুক্ত হইতে পারিলেই অবিদ্যা-নিবৃত্তি, সব অনর্থের নিবৃত্তি। অহংকারই ভগবান্ ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করে। অহংকার যেখানে যত প্রবল, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে দূরত্ব সেখানেই তত বেশী। অহংকার যত নতি স্বীকার করে, ভগবান্ তত সমীপবর্তী হন। অহংকার সম্পূর্ণরূপে ভগবদনুগত হইলে, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে কোন ব্যবধান থাকে না। মানুষ তখন 'ভাগবত' হইয়া যায়, সমস্ত বিশ্ব-জগৎই 'ভাগবত' হইয়া যায়।

প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস এই যে, অতি প্রাচীন কালে সত্য ও ত্রেতাযুগে মানুষ স্বভাবতঃ সরল ও ধর্মশীল ছিল, তাহাদের সুদীর্ঘ পরমায়ু ও বলিষ্ঠ দেহ ছিল, তাহাদের তপঃশক্তি জ্ঞান-শক্তি কর্মশক্তি যোগশক্তি অনেক বেশী ছিল, তাহারা দীর্ঘকাল বাতাহারী হইয়া তপস্যা করিতে পারিত, জ্ঞানসাধনা করিতে পারিত, যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারিত। ক্রমশঃ যুগাবর্তনে মানুষের জীবনযাত্রা জটিল হইয়াছে, পরমায়ু ক্ষীণতর হইয়াছে, দেহেন্দ্রিয়মনের শক্তি হ্রাস পাইয়াছে, কুটিলতা ও অধর্ম বৃদ্ধি পাইয়াছে, জ্ঞান-কর্ম-যোগ-তপস্যাদির সামর্থ্য কমিয়া গিয়াছে। সুতরাং শক্তি-সামর্থ্যের বিচারে এবং সরলতা ও ধর্মানুষ্ঠানাদির বিচারে সত্যযুগের মানুষ সর্বাপেক্ষা উন্নত এবং কলিযুগের মানুষ সর্বাপেক্ষা অবনত, এই ধারণা আর্যসমাজে চির-প্রচলিত। যদিও এই ধারণার অনুকূলে প্রকৃষ্ট প্রমাণ কোথাও মিলে না, তথাপি যদি এই প্রচলিত সংস্কারকে যথার্থ বলিয়াই স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও মানবজীবনের চরম কল্যাণের বিচারে কলিযুগের মানুষকে নিতান্ত দুর্ভাগ্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবার কোন হেতু নাই।

পূর্ব পূর্ব যুগের মানুষদের যেমন শক্তিসামর্থ্য, সাধনবল ও প্রাকৃতিক সম্পদ (প্রচলিত বিশ্বাস অনুসারে) যথেষ্ট ছিল, তেমনি তাহাদের অহংকারও পরিপুষ্ট ছিল। তাহাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল আপনাদের সাধনশক্তির উপর, ভগবানের করুণার উপর নয়। তাহারা তপস্যার শক্তিতে ভগবান্‌কে জয় করিতে চাহিয়াছে, যাগযজ্ঞাদির সমুচিত অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গরাজ্য অধিকার করিতে প্রয়াসী হইয়াছে, জ্ঞানসাধনার

প্রভাবে মোক্ষলাভের জন্য অগ্রসর হইয়াছে, আপনাপন সামর্থ্যের সম্যক ব্যবহার করিয়া সর্ববিধ পুরুষার্থ সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রযত্নশীল হইয়াছে। তাহাদের ধর্ম ছিল, মানবধর্ম, তাহাদের ব্রত ছিল মানব-সামর্থ্যের সম্যক বিকাশ। তাহাদের এই পুরুষকার, এই আত্ম-শক্তিতে বিশ্বাস, আত্মসামর্থ্যে পুরুষার্থ-সিদ্ধির প্রয়াস, মানবজীবনের সার্থকতা-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে নব নব উপায়োদ্ভাবন, কর্মশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও যোগশক্তির বিচিত্র বিকাশ, এ সকলই শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয় ও কীর্তনীয়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভগবৎতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব তাহারা সুনিপুণ ভাবে অনুসন্ধান করিয়াছে; চরম তত্ত্ব ছিল তাহাদের অনুসন্ধেয়, বিজ্ঞেয়, ধ্যেয়। মানবাহংকারকে ভিত্তি করিয়াই তাহাদের সর্ববিধ জ্ঞানতপস্যা, যোগাদির অনুশীলন, যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান। তাহারা ভগবৎকৃপাপেক্ষী ছিল না, স্বীয় সাধনার উপযুক্ত ফলের উপরই তাহাদের দাবী ছিল। কাজেই করুণাময় ভগবান্, প্রেমময় ভগবান্, সুন্দর মধুর ভগবান্, 'আপন-জন' ভগবানের সহিত তাহাদের বিশেষ পরিচয় হয় নাই। বিশ্বের পরম কারণ ভগবান্, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ ও ন্যায়বান্ ভগবানের সহিতই পরিচয় ছিল।

যুগাবর্তনে মানুষের শক্তিসামর্থ্য যদি ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া থাকে, তবে তৎসঙ্গে মানুষের অহংকারও দুর্বল হইয়াছে, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসও শিথিল হইয়াছে, আপন পুরুষকারের উপরে ভগবদ্‌করুণাকে স্থান দিতে মানুষ শিখিয়াছে। এটা লোকসান নয়, দুর্ভাগ্যের নিদর্শন নয়; এটা একটা মহান্ লাভ, মহা সৌভাগ্য। অহংকার প্রশমিত হওয়াতে, ভগবানের সহিত মানুষের ঘনিষ্ঠতর নিবিড়তর পরিচয় সংঘটিত হইয়াছে। মানুষ আপন অহংকারকে যে পরিমাণে ভগবৎ করুণার কাছে বলি দিতে শিখিয়াছে, সেই পরিমাণে ভগবান্ আপনার করুণাঘন প্রেমঘন সুকোমল সুমধুর মূর্তি প্রকটিত করিয়া মানুষের নিকটে নামিয়া আসিয়াছেন, মানুষের আপন-জন হইয়াছেন, মানুষের কাছে সহজ-লভ্য হইয়াছেন। পূর্বে পূর্বে পুরুষকার-প্রধান যুগ অপেক্ষা কলি-যুগের দুর্বল আত্মপ্রত্যয়বিহীন মনুষ্যের পক্ষে ভগবানে আত্মসমর্পণ অতিশয় সহজ ও স্বাভাবিক। তাহার আত্মবিশ্বাস যত কমিতেছে, চিত্ত যত দীনভাবাপন্ন হইতেছে, ভগবদ্‌বিশ্বাস তত বাড়িতেছে, ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া ভগবদ্-লাভের জন্য ভগবানেরই করুণার উপর নির্ভর করা তত সহজ হইতেছে। প্রাচীন যুগে মানুষ সাধন করিত ভগবানের সংসারোধ্র্ব স্বরূপের কাছে উপনীত হইবার জন্যে, সংসারকে পশ্চাতে ফেলিয়া ভগবানের নিত্য নির্বিকার নিষ্ক্রিয় স্বরূপের সহিত মিলিত হইবার জন্যে; কলিযুগে মানুষ আপন পুরুষকার-সামর্থ্যে আস্থাহীন হইয়া সংসারের মধ্যেই ভগবানের সহিত মিলিত হইবার জন্যে ভগবানের করুণার দিকেই একলক্ষ্য হইয়া (তৎ তেহনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণঃ) চাহিয়া থাকে, ভগবানের কাছে দেহেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি নিবেদন করিয়া দিয়া প্রতীক্ষা করিতে থাকে, এবং করুণাঘনতনুধারী ভগবান্ নিজে নামিয়া আসেন এই নিরভিমান দীনাতিদীন ভক্তের সহিত মিলিত হইবার জন্যে। এটা কলিযুগের মানুষের পক্ষে কত বড় সৌভাগ্য!

ইহা কি কল্পনা করা অসমীচীন যে, বিশ্ব-বিধাতা ভগবান্ হয়ত মানুষের অহংকারকে বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও বিচিত্র ঘাতপ্রতিঘাতের ভিতর দিয়া ক্রমশঃ প্রশমিত করিয়া, ক্রমশঃ শুদ্ধ, স্বচ্ছ, দীনভাবাপন্ন ও আত্মানুগত করিয়া মানুষের কাছে আপনার করুণাঘন প্রেমঘন

স্বরূপ প্রকটিত করিবার এবং আপনার ও মানুষের মধ্যে ব্যবধান ঘুচাইবার উদ্দেশ্যেই এই যুগাবর্তনের বিধান করিয়াছেন? ইহা কি সম্ভব নয় যে, যুগাবর্তনের ইতিহাস—মানুষের নিকট ভগবানের ক্রমশঃ নামিয়া আসারই ইতিহাস, মানুষ ও ভগবানের মধ্যে অহংকারঘটিত ব্যবধানের ক্রম-সঙ্কোচেরই ইতিহাস? সত্য-যুগের অনুসন্ধেয় ভগবত্তত্ত্ব কলিযুগে মানুষের চক্ষুর সম্মুখে সমুপস্থিত প্রেমঘনমূর্তি নরলীলাময় জীবন্ত ভগবান্।

কলিযুগে ধর্মের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট আছে বলিয়া কোন কোন শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, এ কথাও নিরর্থক নয়। কলিযুগের জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানতপস্যাময় সাধনা, যোগতপস্যাময় সাধনা, যাগযজ্ঞাদি-কর্মবাহুল্যময় সাধনা লুপ্তপ্রায় হইতেছে ও হইবে। বাকী একপাদ ভক্তিসাধনা। কলিযুগের ধর্ম পূর্বযুগানুযায়ী মানবধর্ম নয়,—কলিযুগের ধর্ম ভাগবতধর্ম। ভাগবতধর্মের মুখ্য সাধনাই হইল মানবীয় অহংকারকে ভগবানের কাছে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়া দেওয়া। এই ধর্মে ভগবান্ মানুষের ধ্যেয়, জ্ঞেয়, অনুসন্ধেয় নয়। সারা মনপ্রাণহৃদয় দিয়া ভগবান্‌কে সর্বতোভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াই এই ধর্মের প্রারম্ভ। ভগবান্‌কে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে না; ভগবান সামনে উপস্থিত, তাঁহাকে হৃদয়মনবুদ্ধিদেহ সব নিবেদন করিয়া দিতে হইবে। ধর্মের এই একপাদেরই এই মাহাত্ম্য, যে, ইহাতে ভগবান্ ও মানুষের মধ্যে সব ব্যবধান তিরোহিত। ভগবান্‌কে লইয়াই সাধনার আরম্ভ, ভগবান্‌কে লইয়াই সাধনার প্রগতি, ভগবান্‌কে লইয়াই সাধনার পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। সাধক ভগবানের করুণার কাছে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দিয়াই খালাস! তাহাকে আর কিছুই করিতে হয় না। তাহার অহংকারকে নিঃশেষে আপনার মধ্যে বিলীন করিয়া তাহাকে আপনার স্বরূপগত পূর্ণ জ্ঞান, পূর্ণ আনন্দ, পূর্ণ সৌন্দর্য-মাধুর্যে ভরপুর করিবার জন্য যাহা কিছু আবশ্যক, ভগবান্‌ই তাহার দ্বারা তাহা করাইয়া লন। ধর্মের এই একপাদেরই গৌরবে কলির মানব ধন্য ধন্য হইয়া যায়।

এই ভাগবতধর্মের গৌরবে কলির মানবের আরো কত সৌভাগ্য, তাহা বিবেচ্য। তাহার কাছে ভগবান্ শুধু নির্বিকার চৈতন্যস্বরূপও নহেন, সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-বিধাতাও নহেন, পরম ন্যায়বান্ কর্মফলদাতাও নহেন, এমন কি, অনুপম মহিমামণ্ডিত উচ্চাসনে সমাসীন করুণাবিতরণকারীও নহেন। তাহার কাছে ভগবান্ স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী জননী, সৌহার্দময় সখা ও ক্রীড়াসহচর, আনন্দঘন পুত্র ও কন্যা, প্রেমময় স্বামী বা প্রেমময়ী স্ত্রী। সংসারে যতপ্রকার সুমধুর সম্বন্ধ আছে, ভগবান্ সর্বপ্রকার সম্বন্ধে সুশোভিত হইয়া কলির আত্মনিবেদনকারী ভক্তের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সর্বপ্রকার আনন্দের আস্বাদনের ভিতর দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে আপনার করিয়া লন। আর, এ ধর্মে অনধিকারীও কেহই নয়। আত্ম-সমর্পণ করিতে আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই সমান অধিকারী। সুতরাং কলিযুগে সর্বারাধ্য ভগবান্ সবার দ্বারে উপস্থিত, সকলের সহিত সমান হইয়া উপস্থিত। তাই তো কলি ধন্য।

যে দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া কলি-যুগকে ধন্য বলা হইয়াছে, সেই দৃষ্টিকোণ হইতেই শূদ্র ও নারী ধন্য বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। জ্ঞানবল, তপোবল, বীর্যবল, ধনবল, কর্মবল প্রভৃতির প্রাধান্যে সমাজে শূদ্র ও নারীর স্থান নীচে রহিয়াছে। বৈদিক কর্মকাণ্ডাদির অনুষ্ঠানে শূদ্র ও নারীর অধিকার নাই। উপনিষদের জ্ঞান-বিচারে তাহাদের অধিকার নাই। সামাজিক

অনেক ব্যাপারে তাহারা অধিকারবঞ্চিত। কিন্তু ভগবানের অচিন্ত্য করুণাবিধানে জাগতিক উচ্চাধিকারে বঞ্চিত হইয়াই শূদ্র ও নারী ভগবানের সান্নিধ্যলাভের অধিকার সহজে অর্জন করিয়াছে। সংসারে তাহাদের অভিমান করিবার বিশেষ কিছুই নাই। জ্ঞানকর্ম্মমূলক ধর্মশাস্ত্র এবং সমাজবিধান তাহাদিগকে চিরকাল নীচে রাখিয়া তাহাদের অহংকারকে কখনও মাথা তুলিতে দেয় নাই। আত্মসমর্পণযোগ তাহাদের পক্ষে প্রায় স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। শূদ্রগণ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করিতে এবং নিরভিমানে তাহাদিগকে সেবা করিতে অভ্যস্ত। নারী স্নেহপ্রেমভক্তিনিষ্ঠার সহিত পুরুষকে সেবা করিতে এবং পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে যুগযুগান্তর অভ্যস্ত। সুতরাং অহংকারকে প্রশমিত করিতে ও আত্মসমর্পণ অভ্যাস করিতে তাহাদের বিশেষ কোন প্রয়াসই করিতে হয় না। জাগতিক জীবনে যে ভাবসাধনায় তাহারা সিদ্ধ, সেই ভাবটি ভগবানের প্রতি প্রধাবিত হইলেই তাহারা অতি সহজে ভগবান্‌কে লাভ করিতে, ভগবানের সহিত ঐকান্তিকভাবে মিলিত হইতে, সমর্থ হয়।

ভাগবত শাস্ত্রের বিচারে শূদ্র ও নারীর উন্নত অধিকার স্বীকৃত। কর্মের সাধনায়, জ্ঞানের সাধনায়, যাগযজ্ঞ যোগ তপস্যার সাধনায়, তাহারা অপেক্ষাকৃত অপটু বলিয়াই প্রেমের সাধনা, ভক্তির সাধনা, বিশ্বাসের সাধনা, সেবার সাধনা, আত্মসমর্পণের সাধনা তাহাদের পক্ষে সহজ, এবং এই সাধনাই অতি সহজে ভগবান্‌কে কাছে টানিয়া আনে, ভগবানকে অতি সহজে প্রাণের মানুষ, মনের মানুষ, নিতান্ত আপন-জন করিয়া তোলে। ভগবানের করুণাময় প্রেমমধুর স্নিগ্ধ স্বরূপ এই নিরাভিমান সেবাব্রতী একান্ত শরণাগত ভক্তদের নিকটই সহজে প্রতিভাত হয়। ভাগবত-শাস্ত্র বৃন্দাবনের গোপবালক ও গোপবালিকা-দিগকেই মানবসমাজে আদর্শরূপে উপস্থাপিত করিয়াছে। তাহারাই ভগবানকে সম্পূর্ণরূপে আপন-জন বলিয়া গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এই স্থূলদেহে স্থূলজগতে সম্যক ভাবে ভগবানের সহিত মিলিত হইতে সক্ষম হইয়াছে। আর্য-সমাজের শ্রেষ্ঠ মুনি-ঋষিতপস্বিগণও এই গোপগোপী-দিগকে আদর্শরূপে-স্বীকার করিয়াছেন। কলিযুগ এই ভাগবত ধর্মেরই যুগ,—মানুষ ও ভগবানের নিবিড়ভাবে মেলামেশার যুগ, এবং শ্রীকৃষ্ণ ও গোপগোপীর নিরাবিল প্রেমসম্বন্ধ ও প্রেমলীলা এই ধর্মের চিরন্তন আদর্শ। তাই কলি, শূদ্র, নারী ধন্য।

অভিমানের একটা স্বভাব এই যে, সে নিজের গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াই তৃপ্তিবোধ করে না; সে অপরকে ছোট দেখিতে চায়, ছোট রাখিতে চায়। নিজের সংকীর্ণ দৃষ্টিতে যাহাকে সে ছোট দেখিয়া আসিতেছে, সে যদি গৌরব অর্জন করিতে চায়, সমাজে যদি কোন দিক দিয়া তাহার গৌরব স্বীকৃত হয়, অভিমানের তখন অন্তর্জ্বালা উপস্থিত হয়, সমাজের ভিতরে তখন সে বিপ্লবের লক্ষণ দেখিয়া ভীত-চকিত হয়। কলিযুগে ভাগবতধর্মের প্রচার এবং শূদ্র ও নারীর গৌরবখ্যাপন দেখিয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি অভিজাত ও জ্ঞানকর্মধনোন্নত সম্প্রদায়সমূহের আতঙ্কগ্রস্ত হওয়ার ইহাই কারণ। ভাগবতশাস্ত্র ঘোষণা করিতেছে,—"চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ।" যে সব অন্ত্যজ জাতি আর্যগোষ্ঠীতে অস্পৃশ্য বলিয়া ঘৃণিত ও বর্জ্জিত হইয়া আসিতেছে, ভাগবতধর্ম তাহাদেরও ভগবানকে লাভ করিবার, ভগবানের লীলাসহচর হইবার, মনুষ্যোচিত অধিকার ঘোষণা করিতেছে। ভাগবতধর্মের অনুশীলনে কোন জাতিগত, বর্ণগত, সম্প্রদায়গত অধিকারভেদ নাই, বীর্যৈশ্বর্যগত ও

জ্ঞানশক্তিগত কোন অধিকারভেদ নাই, মানবমাত্রেরই ইহাতে সমান অধিকার। এই দৃষ্টিতে সব মানুষই একজাতির। ভগবান্‌কে দর্শন স্পর্শন ভজন পূজন করিতে এবং ভগবানের সহিত সম্পূর্ণরূপে মিলিত হইয়া মানবজীবনের চরম সার্থকতা লাভ করিতে, মানুষমাত্রেই অধিকারী।

ভাগবতধর্মের এই মহতী বাণী বুকে করিয়া কলিযুগ সমাগত হইতেছে। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদি অভিমানী সম্প্রদায়সমূহ সংস্কারবশে এই বাণীকে বিপ্লবের বাণী ও এই যুগকে বিপ্লবের যুগ মনে করিয়া বর্তমানে ভীত হইতে পারে; কিন্তু কালক্রমে তাহারাও এই বাণীকে হৃদয় দিয়া বরণ করিয়া লইবে, তাহারাও ভগবানের সান্নিধ্য অনুভবের নিমিত্ত যাগ-যোগ-জ্ঞান-তপস্তা অপেক্ষা ভগবানের করুণায় বিশ্বাস ও ভগবানে আত্মসমর্পণকে প্রকৃষ্টতর উপায় বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহারাও আত্মসমর্পণ-যোগ-শিক্ষার নিমিত্ত শূদ্র ও নারীর নিকট উপদেশ-প্রার্থী হইতে কুণ্ঠিত হইবে না। ভাগবতধর্মের সুমধুর আস্বাদন লাভ করিলে, তাহারাও জাত্যভিমান জ্ঞানাভিমান বীর্যাভিমান ধনাভিমান কৃতিত্বাভিমান বিসর্জন দিয়া শূদ্রচণ্ডালাদি সকল মানুষকে আপনাদের সমান বোধ করিতে শিখিবে এবং প্রেমে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া তৃপ্তি অনুভব করিবে। ভাগবতধর্ম সকল মানবজাতিকে এক জাতি করিয়া তুলিবে, এবং মানুষ ও ভগবানের মধ্যে অবিদ্যাজনিত ও অহংকারপোষিত সমস্ত ব্যবধান লুপ্ত করিয়া দিবে। মানুষ মানুষের মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিয়া মানুষের মধ্যেই ভগবান্‌কে পূজা করিতে শিখিবে, জাগতিক সকল কর্তব্য-কর্মকে ভগবৎকর্ম বোধে ভক্তিপূত দেহমনে সম্পাদন করিতে অভ্যস্ত হইবে, এবং বিশ্বের সর্বত্র ভগবানের মধুর লীলাবিলাস দর্শন করিয়া ভগবানের মধ্যে আপনার সত্তা ডুবাইয়া দিবে। তখনই কলিযুগের যথার্থ স্বরূপ প্রকটিত হইবে, কলিযুগ সার্থক হইবে, মানুষ কৃতার্থ হইবে।

মহাকবি ভাস ঃ ভাব-রূপ

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী থেকে মহাকবি ভাস ভারতীয় সুধীসমাজের হৃদয় অধিকার করে চিরসম্রাট রূপে বিরাজমান। যুগে যুগে কত কবি, কত ক্রান্তদর্শী মনীষী—তাঁর কত স্তুতি রচনা করে গেছেন। সর্বযুগের কবিসম্রাট মহাকবি কালিদাস স্বয়ং তাঁর স্তুতিগান করে গেছেন, বলেছেন প্রাচীনকবি "ভাস—সৌমিল-কবিপুত্র" তাঁর বন্দনীয়।

অথচ এ সর্বযুগের বন্দন-যোগ্য কবিকেও কতই না অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। খল কুচক্রী বিদ্বেষ্টারা তাঁকে করেছেন কটূক্তির অনলে দগ্ধ। রাজশেখর তাঁর কবি-বিমর্শে ভাসের অগ্নিপরীক্ষার কথা উল্লেখপূর্বক বলেছেন—

"ভাসনাটকচক্রেঽপি ছেকৈঃ ক্ষিপ্তে পরীক্ষিতুম্।
স্বপ্নবাসবদত্তস্য দাহকোঽভুন্ন পাবকঃ॥"

অর্থাৎ শঠেরা ভাসের নাটকচক্র পরীক্ষার জন্য অগ্নিতে নিয়োগ করলে—স্বপ্নবাসবদত্তম্ গ্রন্থ দগ্ধ হলো না, স্বগৌরবে বিরাজ করতে লাগলো। মহাকবি জয়ানকও "পৃথ্বীরাজ-বিজয়" মহাকাব্যের

প্রারম্ভিক একটী কবিতায় ভাসের এ অগ্নিপরীক্ষার কথা বলেছেন,[১] এবং টীকাকার জোনরাজ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, খলদের মুখের আগুনে ব্যাস ও ভাস উভয়েই সমান কষ্ট পেয়েছেন।[২] কিন্তু আনন্দের বিষয়, ব্যাসের মত ভাসও হয়েছেন কল্পান্তস্থায়ী। পার্থক্য এই—ব্যাসদেব সর্বদা স্বশরীরে স্বপ্রকাশ; ভাসের এরূপ সশরীরে স্বপ্রকাশত্ব সম্বন্ধে এখনও অনেকেই সন্দিহান। বর্তমানে ভাসের নামে প্রচলিত ত্রয়োদশ গ্রন্থ সকলি ভাসের কিনা, বা ভাসগ্রন্থের রূপান্তর কিনা—এ নিয়ে মতদ্বৈধের যথেষ্ট অবকাশ আছে। যুগে যুগে ভাসের সরল ভাষা, ভাষৈক্য, পদ্ধতির ঐক্য অবলম্বনে কি প্রকারের অত্যাচার যে তাঁর উপরে চলেছে—তার একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ—কিছুকাল পূর্বে গোণ্ডাল থেকে রাজবৈদ্য জীবরাম কালিদাস শাস্ত্রী প্রকাশিত যজ্ঞফল নামক গ্রন্থ। ভাসের নামে প্রচলিত এই যজ্ঞফল গ্রন্থটি যে বিংশ শতাব্দীতেও ভাসের নামে জালিয়াতির শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, সে সম্বন্ধে সন্দেহ নাই।

(১) ভাসের নাটকের উৎকর্ষ-বিষয়ে বল্‌তে গিয়ে খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মহাকবি বাণভট্ট বলেছেন—

"সূত্রধারকৃতারম্ভৈর্নাটকৈর্বহু-ভূমিকৈঃ।
সপতাকৈর্যশো লেভে ভাসো দেবকুলৈরেব॥

(হর্ষচরিত, প্রারম্ভ শ্লোক ১৬)। অর্থাৎ, ভাসের নাটকের আরম্ভ সূত্রধারের দ্বারা; তাঁর নাটকে পাত্রপাত্রী বহু; পতাকা-নায়কও অনেক। এ নাটকসমূহের দ্বারা, দেবকুলের দ্বারা যেমন, তিনি যশোলাভ করেছিলেন॥ উদাহরণ-ক্রমে বলা যেতে পারে যে, তাঁর স্বপ্নবাসবদত্তায় ১৬টী নাটকীয় চরিত্র, প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণেও ১৬টী, অবিমারক, অভিষেক এবং পঞ্চরাত্রের প্রত্যেকটীতে প্রায় ৩০টী, চারুদত্তে বার এবং বালচরিতে প্রায় ত্রিশটী চরিত্র। এরূপ বিরাট বাহিনী অন্যান্য সমাকৃতি নাটকে সাধারণতঃ দেখা যায় না। কিন্তু এ সকল চরিত্রের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরিত্র-গুলিরও বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলবার আগ্রহে ভাসের সমকক্ষ কেও নাই। অন্যদিকে চরিত্র-সংখ্যা কমানোর দিকেও ভাসের কঠোর দৃষ্টি দেখা যায়। যেমন, অবিমারকে কাশীরাজ বা সুচেতনার মঞ্চে আবির্ভাব প্রত্যাশিত হলেও, তাঁদের বক্তব্য থাক্‌লেও, তিনি তাঁদের রঙ্গমঞ্চে এনে নাটকীয় পাত্রের সংখ্যা বাড়াননি। তাঁর বাক্‌সংযমপ্রচেষ্টাও অনুকরণীয়। অভিষেক-নাটকের অন্তভাগে সীতা যদিও রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন, তথাপি তিনি কোনও ভাষণে প্রবৃত্ত হননি।

(২) ভাস বহু নাট্যগ্রন্থের রচয়িতা। রামায়ণ-অবলম্বনে তিনি রচনা করেছেন (১) প্রতিমা (২) অভিষেক। মহাভারত অবলম্বনে—(১) মধ্যমব্যায়োগ (২) দূত-ঘটোৎকচ (৩) কর্ণভার, (৪) দূতবাক্য (৫) উরু-ভঙ্গ (৬) বালচরিত ও (৭) পঞ্চরাত্র। প্রাচীনকাহিনী ও ইতিহাস অবলম্বনে রচনা করেছেন তিনি—(১) অবিমারক (২) চারুদত্ত ৩) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ ও (৪) স্বপ্ন-বাসবদত্তা। এতগুলি গ্রন্থ তিনি রচনা করেছেন —কিন্তু কোথাও জড়তা নেই, ভাবের দৈন্য নেই, নব নব চিন্তোন্মেষের বিরতি নেই, ভগীরথ-খাতাবচ্ছিন্ন গঙ্গাধারার মতই পাঠকমণ্ডলীর হৃদয়ের দুকূল প্লাবিত করে পতিতপাবনী তাঁর চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে সাগর-সঙ্গমে—অসীমের

---

১ সৎকাব্যসংহারবিধৌ খলানাং দীপ্তানি বহ্নেরপি মানসানি। ভাসস্য কাব্যংখলু বিষ্ণুধর্মান্ সোঽপ্যাননাৎ পারতবন্মুমোচ॥

২ ভাস-ব্যাসয়োঃ কাব্য-বিষয়ে স্পর্ধাং কুর্বতোঃ সর্বোৎ-কর্ষবর্তিত্বেন পরীক্ষান্তরাভাবাৎ পরীক্ষার্থমগ্নিমধ্যে তয়োর্দ্বয়োঃ কাব্যদ্বয়ং ক্ষিপ্তম্। তয়োর্মধ্যাদগ্নির্বিষ্ণুধর্মান্না-দহিতি প্রসিদ্ধিঃ। খলৈস্তু প্রাপ্তং সৎকাব্যং দহ্যতে ইত্যগ্নেঃ সকাশাৎ খলানাং দাহকত্বমিত্যর্থঃ॥—জোনরাজকৃত-বিবরণ॥

সন্ধানে। তিনি তেরটি নাটকের রচয়িতা—প্রত্যেকটীই নাট্যপ্রয়োগে, ভাবাবেগে, ভাষার সাবলীলতায় অনবদ্য। তাঁর ভাবগতির আরো বৈশিষ্ট্য এই—তা' আপন গতিতে আপনি অগ্রসর—রাখে না অপেক্ষা অন্য কারো। কেবল রামায়ণের কাহিনীমূলক নাটকদ্বয়ে তিনি খুব বেশী নাট্যবস্তুতে নব নব বস্তুকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেন নি। অন্য সব গ্রন্থে বর্ণিত নাট্যবস্তুতে মৌলিকগ্রন্থ থেকে তিনি অনেক নূতন বস্তু সংযোজন, প্রয়োজনবশে অনবদ্যভাবে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। মধ্যমব্যায়োগে মধ্যমপুত্রের আত্মত্যাগের প্রোজ্জ্বল উদাহরণ সমস্ত নাটককে একদিকে যেমন সুমধুর করে তুলেছে—তেমনি স্বামীর প্রতি হিড়িম্বার প্রেম ও পুত্রের মায়ের প্রতি আকর্ষণও নবীন রসের সঞ্চার করেছে। কর্ণভারে কর্ণের চরিত্রে অধিকতর উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে; মহাভারতের কর্ণ ইন্দ্রের কাছে স্বকীয় বর্ম উৎসর্গ করে প্রতিদানে চেয়েছিলেন অভ্রান্ত-লক্ষ্যভেদী শর; কর্ণভারে কর্ণ দান করেই মুক্ত; প্রতিদানে তাঁর কিছুই আর চাওয়ার নেই। দূতবাক্যে কৃষ্ণ ও দুর্যোধনের চরিত্রের পার্থক্য অতি পরিস্ফুট; এখানে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতাররূপে পূজিত হয়েছেন। উরুভঙ্গে দুর্যোধন-চরিত্র অতি মর্মস্পর্শী রূপে অঙ্কিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অবমাননা-প্রদর্শনের চরম শাস্তি দুর্যোধনের হয়েছে সত্য, কিন্তু তথাপি যখন মৃত্যুসময়ে নিজের প্রাণাধিক পুত্র দুর্জয়কে কোলে নিতে না পেরে তাকে সরিয়ে দিতে হয়, সে দৃশ্য সত্যি হয়ে উঠে যেন দুঃসহ—

হৃদয়প্রীতিজননো যো মে নেত্রোৎসবঃ স্বয়ম্।
সোঽয়ং কালবিপর্যাসাচ্চন্দ্রো বহ্নিত্বমাগতঃ॥ ৪৩॥

তবে এটী সত্য যে মৃত্যুকে দুর্যোধন সানন্দে নিল বরণ 'করে', তবু নিজের দর্প ছাড়েনি।

বালভারতে ভাসের কবিপ্রতিভা স্ফূর্তিলাভ করেছে অন্যভাবে। এখানে কবি দর্শকমণ্ডলীর চোখের সামনে তুলে ধরেছেন নানা বর্ণ বৈচিত্র্য—কাত্যায়নীর অনুচরবৃন্দ, বৃষ, অরিষ্ট, সর্পাসুর, কালীয়—নানা সজ্জায় সজ্জিত। কংসবধ অত্যন্ত সাধু সঙ্কল্প—তবে সে বীররসের অনেকটা শৃঙ্গার ও অদ্ভুত রসেরও ঘটেছে সংমিশ্রণ। অবিমারকে কবির একটী বৈশিষ্ট্য—তাঁর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য বিশেষ করে ফুটে উঠেছে—সেটী হচ্ছে দ্রুতগতি, কার্যে তৎপরতা ও অনবচ্ছিন্ন বেগ। সংস্কৃত নাটক অনেক সময়ে এ বিষয়ে দোষদুষ্ট; কিন্তু ভাসের নাটক—বিশেষ করে অবিমারক এ ধারার পূর্ণ ব্যতিক্রম। নিজের দৃঢ়সঙ্কল্পকে কার্যে রূপান্তরিত করার অপ্রাণ চেষ্টায় অবিমারকের নায়ক সৌবীররাজপুত্র কুন্তীরাজ ভাগিনেয় বিষ্ণুসেন কখনও বা প্রবেশ করছেন দাবাগ্নিতে, কখনও শৈলাগ্র থেকে লম্ফপ্রদানে উদ্যুক্ত। স্বীয় প্রাণ তার কাছে তৃণবৎ তুচ্ছ; মাতুলকন্যা কুরঙ্গনয়না কুরঙ্গী তার চিন্তাসর্বস্ব। অন্যদিকে নায়িকা কুরঙ্গীও মরণোদ্যতা। এ পালা দিয়ে মৃত্যুকে বরণ করে-নেওয়া প্রেমিক-প্রেমিকার শুভমিলন দর্শকমণ্ডলীর স্বতঃস্ফূর্ত আনন্দ-নির্ঝর স্বরূপ। কিন্তু মানবপ্রেম পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করেছে স্বপ্নবাসবদত্তায়। এ গ্রন্থের নায়িকা বাসবদত্তা সতী, সাবিত্রী, দময়ন্তীর মতই চিরশ্রদ্ধেয়া, চিরবন্দনীয়া। পদ্মাবতী সতীকুল-শিরোমণি, রূপে গুণে অতুলনীয়া, স্বামীর হিতসাধনমানসে আত্মবিহ্বলা। পদ্মাবতীর প্রতি উদয়ন-রাজের মমতা স্বাভাবিক; কিন্তু পদ্মাবতীর কাছে তো রাজা উদয়ন কিছুতেই ঘোষবতী বীণা বাদম করলেন না। বিদূষকের কাছে রাজা একদিন নিজের মনের কথা স্পষ্ট বললেন—পদ্মাবতী রূপ, স্বভাব মাধুর্যে সত্যি বহুমানযোগ্য, কিন্তু তাঁর প্রাণ সতত পড়ে রয়েছে সেই মুগ্ধ

চোখের প্রথম আলো, সকল ভালোর প্রথম ভালো —বাসবদত্তার কাছে :—

"পদ্মাবতী বহুমতা মম যদ্যপি রূপশীলমাধুর্যৈঃ।
বাসবদত্তাবুদ্ধং ন তু তাবন্মে মনো হরতি॥"

বাস্তবিক পক্ষে—বাসবদত্তা, পদ্মাবতী ও উদয়ন-রাজের চরিত্র সম্পূর্ণ অতুলনীয়। ভাসের অতুলনীয় লেখনী চরম সার্থকতা লাভ করেছে বাসবদত্তা-চরিত্রাঙ্কণে। বাসবদত্তায় বিকীর্ণ হয়েছে প্রেমের শ্রেষ্ঠ দ্যুতি—নিরুপম, প্রোজ্জ্বল তম, সর্বত্র রঙে রঙে আলো-করা পূর্ণ বিভা।

তাঁর চারুদত্তে চিত্রিত হয়েছে আর একটী নূতন দিক্—তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা। গণিকা, শ্রেষ্ঠী প্রভৃতির চিত্রণে এ সামাজিক নাটক উজ্জ্বলতা লাভ করেছে।

নানা ভাবে, নানারূপে, পরমসমুজ্জ্বল ভাস-নাটক-চক্রকে লক্ষ্য করে তাই দণ্ডী তাঁর অবন্তি-সুন্দরী কথায় বলেছিলেন—

"সুবিভক্ত-মুখাদ্যঙ্গৈ র্ব্যক্তলক্ষণবৃত্তিভিঃ।
পরতোঽপি স্থিতো ভাসঃ শরীরৈরিব নাটকৈঃ॥"

ভাস সর্বদা রয়েছেন আমাদের চোখের সামনে বর্তমান ; তাঁর এক একটী নাটক তাঁর অতি সুন্দর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুবিভক্ত মুখাদিযুক্ত, ব্যক্ত-লক্ষণ-বৃত্তি-সমন্বিত। তিনি চিরকাল অমর॥

(৩) মহাকবি ভাসের নাটকাবলীর যেমন অপূর্বরূপ, তেমনি রসবৈচিত্র্য ও পূর্ণতা। প্রসন্ন-রাঘবের কবি একদিন তাঁকে বড়ই আনন্দে, বড়ই গৌরবের সঙ্গে সরস্বতী দেবীর হাস্য বলে বর্ণনা করেছিলেন।[১]

কবির এ উক্তি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। এ কবির মধ্যে এমন একটি অন্তর্লীন হাস্যরস আছে, যা' কাব্যরসিকমাত্রেরই প্রভূত আনন্দ দান করে বিনা প্রয়াসে, নিমিষেই। যেমন সুভাষাবলীতে উদ্ধৃতভাসের নিম্নলিখিত কবিতায়—

"কপালে মার্জার পয় ইতি করাঁল্ লেঢ়ি শশিনঃ
তরুচ্ছিদ্রপ্রোতান্ বিসমিতি করী সংকলয়তি।
রতান্তে তল্পস্থান্ হরতি বনিতাঽপ্যংশুকমিতি
প্রভামত্তশ্চন্দ্রো জগদিদমহো বিপ্লবয়তি॥"

যে অন্তর্নিহিত হাস্য রয়েছে, তাই হয়ে উঠে সহৃদয়-হৃদয় পরিতৃপ্ত। কবি এ কবিতায় বল্‌ছেন—

"চন্দ্রের কিরণ এসে ছড়িয়ে পড়েছে মার্জারের গণ্ডস্থলে, সে তা'কে দুগ্ধভ্রমে লেহন করছে। গাছের ছিদ্রমধ্যে অবস্থিত চন্দ্রকররাশিকে মৃণাল ভেবে হস্তী তাকে কেড়ে নিতে হয়েছে উদ্যত। প্রেমবিনোদনরতা বনিতা শয্যাস্তীর্ণ চন্দ্রবিম্বকে নিজের বস্ত্রাঞ্চল ভেবে তাকে নিচ্ছে কুড়িয়ে। অহো!—প্রভোন্মত্ত চন্দ্র সমগ্র বিশ্বকে করে তুলেছে বিভ্রান্ত, বিপ্লবগ্রস্ত।" এরূপ সুদূর-প্রসারী কল্পনার মাধ্যমে সূক্ষ্মসঞ্চারী হয়েছে হাস্য-রসের উন্মেষ। বীর, শৃঙ্গার, করুণ বা অদ্ভুত রস বহুলভাবে প্রপঞ্চিত হয়েছে তাঁর নানা গ্রন্থে নানাভাবে। কিন্তু সুষ্ঠুভাবে যে রস-পরিবেশনে বড় বড় অনেক কবি প্রায় অসমর্থ, ভাস সে রস পরিবেশে একেবারে সিদ্ধহস্ত। মহাকবি ভব-ভূতি করুণরস পরিবেশনে সম্পূর্ণ অদ্বিতীয় ; কিন্তু হাস্যরসের অবতারণায় তিনি অপারগ। ভাসের রসপরিবেশনে কোনও স্থানে দৌর্বল্য নেই। ভাসের বিদূষক-চরিত্র অতি মনোরম। ভাসের নিপুণ তুলিকাঙ্কনে বিদূষক কেবল হাস্যরসপ্রবণ নায়কচ্ছায়ামাত্র নন, অবিমারকের কথায় বল্‌তে হয়—বিদূষক যুদ্ধে অস্ত্রবিশারদ, দুঃখে চরম সান্ত্বনা-দাতা, শত্রুদের দুর্ধর্ষ শত্রু—অন্যদিকে, পরম সুহৃৎ। অবিমারকে কুরঙ্গীর অশ্রুর সঙ্গে স্বীয় অশ্রু সংমিশ্রণের জন্য বিদূষক অত্যন্ত কাতর ; কিন্তু যে বিদূষক বলে যে এমন কি, নিজের পিতায়

(১) যস্যাশ্চৌরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরঃ
ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কৌতুকায়॥

মৃত্যুতেও বের হলো না এক ফোঁটা শুক্‌নো চোখের জল—তার অশ্রু-উদ্‌গমের সম্ভাবনা কোথায়? তবু পুরুষ বলে সম্বোধন করলে সে নিজকে নারীরূপে পরিচয় দিতে পরম ব্যগ্র। সে—

ধন্না সুরাহি মত্তা ধন্না সুরাহি অণুলিত্তা।
ধন্না সুরাহি হ্লাদা ধন্না সুরাহি সংঞবিদা॥[১]
(প্রতিজ্ঞা-যৌগ, ৪.১)

অর্থাৎ সুরায় যারা মত্ত, তারাই ধন্য; পানীয় দ্বারা যারা অনুলিপ্ত, তাঁরাই ধন্য; পানীয় দিয়ে যারা স্নাত—তারাই ধন্য, ইত্যাদি বলে এক দিকে সে ধেই ধেই করে নাচ্‌ছে, কিন্তু আসলে একেবারে ঠিক—নিজে এক ফোঁটা মদ কস্মিন্ কালেও সে পান করে না। পানভোজননৃত্যপরায়ণ উন্মত্তক-বেশে কূটরাজনীতিবিদ্ যৌগন্ধরায়ণের চিত্র এবং শ্রমণক-বেশে রুমণ্বানের চরিত্রও পরম কৌতুকাবহ। প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণে গাত্রসেবক এবং চাকরের দৃশ্যে উদয়ন-বাসবদত্তার নীরব পলায়নের নিমিত্ত ভদ্রবতী হস্তিনীর সাজসজ্জাকরণ অন্যতর হাস্যোদ্দীপক ঘটনা। হস্তিনীর সাজসজ্জায় মহাসেনের রক্ষিগণের সন্দেহের উদ্রেক হওয়ার কথা নয়। মধ্যমব্যায়োগে ঘটোৎকচ কর্তৃক ভীমসেনের হিড়িম্বার নিকট আনয়নেও রয়েছে কৌতুকোদ্দীপক চমৎকারিত্ব। অবিমারকের অন্ত্যভাগে সমস্ত ঘটনাসন্নিবেশে কুন্তিভোজের এমন অবস্থা হয়েছে যে তিনি নিজের সম্বন্ধে, নিজের রাজধানী সম্বন্ধে সবি ভুলে গেছেন। তাঁকে বলে দিতে হচ্ছে যে তিনি নিজেই কুরঙ্গীর পিতা, দুর্যোধনের পুত্র, এবং বৈরন্ত্যেশ্বর কুন্তিভোজ।

অদ্ভুত রসপরিবেশনেও ভাসের দক্ষতা প্রচুর এবং তাঁর উপায়ও অভিনব। অভিষেক-নাটকে শঙ্কুকর্ণকে হনুমানের বিরুদ্ধে সহস্র সৈন্য প্রেরণের জন্য আদেশ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শঙ্কুকর্ণ-এসে খবর দিল যে পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গেই তারা হয়েছে নিহত। রামায়ণ-মহাভারতে যেরূপ দৃষ্ট হয়, সে ভাবে ভাসও যাদু-অস্ত্র প্রয়োগে ব্যগ্র। দূতবাক্য, মধ্যমব্যায়োগ প্রভৃতি নাটকে এর প্রাচুর্য দৃষ্ট হয়। অবিমারকে কবি এমন এক অঙ্গুরীয়কের উদ্ভাবন করেছেন যার জোরে নায়ক শুদ্ধান্তঃপুরে সকলের অজ্ঞাতে প্রবিষ্ট হতে পারেন এবং কুরঙ্গীর সঙ্গে গোপনে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারেন। কিন্তু এ সমস্ত ক্ষেত্রেই কালিদাস এমন সহজ-সুগমভাবে সমস্ত বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যাতে দর্শকমণ্ডলী পরম বিস্ময়ে আবিষ্ট হয়ে ভাসের বর্ণিত ঘটনাকেই সত্য বলে গ্রহণ করে।

(৪) নাট্যরূপাবতারণায় ভাসের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সর্ববাদিসম্মত। তিনি নাট্যশাস্ত্রসম্মত পদ্ধতির কোনও ধার ধারেন না। মঞ্চে যুদ্ধের বা মৃত্যুর দৃশ্য তিনি অসঙ্কোচেই অবতারণা করেন, কৃষ্ণ ও অরিষ্টের যুদ্ধ নারীদেরও দর্শনযোগ্য। দশরথের মৃত্যু; চাণূর, মুষ্টিক, কংস প্রভৃতির মৃতদেহ রঙ্গমঞ্চে স্থাপন—এতে তাঁর আপত্তি নেই। বিষ্কম্ভক, প্রবেশক, স্থাপনা বা প্রস্তাবনা প্রভৃতি সর্বত্রই তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিই তাঁর একমাত্র অনুসরণীয়।

(৫) ভাসের ভাব যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, ভাষাও তেমনি অনির্বচনীয়, সরল, সাবলীল। উচ্চারণমাত্রই করে মর্মস্পর্শ—ভরতের রামভক্তি দুটী পঙ্‌ক্তিতে কি সুন্দর অভিব্যক্ত হয়েছে—

তত্র যাস্যামি যত্রাসৌ বর্ততে লক্ষ্মণপ্রিয়ঃ।
নাযোধ্যা তং বিনাযোধ্যা সাযোধ্যা যত্র রাঘবঃ॥

অর্থাৎ আমি সেখানেই যাব, যেখানে আছেন লক্ষ্মণপ্রিয় রাম। তাঁকে বিনা অযোধ্যা অযোধ্যা নয়; তিনি যেখানে আছেন, তাই অযোধ্যা॥

বর্ণনভঙ্গিমা, চরিত্রচিত্রণ, ভাবমাহাত্ম্য, শব্দপ্রয়োগকৌশল প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে একক, অতুলনীয় বরণীয় মহনীয় এ কবিসম্রাটকে আমরা হৃদয়ের অনবদ্য কৃতজ্ঞতা নিবেদন করি।

---

(১) ধন্যাঃ সুরাভির্মত্তা ধন্যাঃ সুরাভিরনুলিপ্তাঃ।
ধন্যাঃ সুরাভিঃ স্নাতা ধন্যাঃ সুরাভিঃ সংজ্ঞাপিতাঃ॥

জীবনের গুরু-লাভ

(শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে)

ডক্টর শ্রীশশিভূষণ দাশ গুপ্ত, এম্-এ,
পি-আর্-এস্, পিএইচ্-ডি

জ্যোতির্ময় সৌম্যকান্তি উদাসীন তরুণ তাপস
প্রজ্ঞামূর্তি অপ্রমত্ত—বালভাবে আনন্দ-বিবশ
ভ্রমিতেছে নিঃশঙ্ক হৃদয়
ইচ্ছামুখে—অন্যমনা—একান্ত নির্ভয়।
চারিদিকে বাসনার দাবাগ্নির মাঝে
গঙ্গানীরে ভাসমান করী হেন অসঙ্গ বিরাজে।
মর্তে তাঁর দেহের বিহার—
কোন্ ধ্রুব-একতানে চিত্ত বদ্ধ তাঁর!

ধর্মবিদ্ যদু তাঁরে শুধালেন শ্রদ্ধানত চিতে,—
এই পৃথিবীতে
স্পর্শহীন বন্ধহীন ফিরিতেছ আপনার মনে—
আনন্দ উল্লাসে ভালে—বিদ্যুৎ শিহরে নবঘনে!
কোথা হ'তে এ আনন্দ—কেমনে লভিলে তারে তুমি?
কহ যদি বিন্দুমাত্র—ও চারু চরণ দু'টি চুমি।

দীপসম আঁখি দু'টি উজ্জলিল স্নিগ্ধ স্মিতহাসে,
কহিলা তাপস মৃদু ভাষে,—
বৃহৎ জীবন-পথে যবে মোর যাত্রা হ'ল শুরু
পদে পদে লভিয়াছি গুরু;
তাঁহারা দিয়েছে জ্ঞান—নিগূঢ় অশেষ
পরমের দিয়েছে নির্দেশ;
খুলেছে আঁখির আবরণ—
অন্তরের অফুরন্ত আনন্দের তাহাই কারণ।

গুরু মোর এ পৃথিবী—গুরু মোর বায়ু ও আকাশ,
গুরু মোর জল অগ্নি—উর্ধ্বে চন্দ্র-সূর্যের প্রকাশ;
বনের কপোত গুরু—গুরু মোর সর্প অজগর,
বিরাট সমুদ্র গুরু—গুরু যে পতঙ্গ, মধুকর;
ফুলে ফুলে গুঞ্জরিছে ভ্রমর যে—সে আমার গুরু—
চকিত হরিণ গুরু—সুরে যার বুক দুরু দুরু!
গুরু মোর মীন,
পতিতা পিঙ্গলা গুরু—মোর চক্ষে সেও নয় হীন।
গুরু যে কুরর—বনপাখী,
ছোট শিশু জ্ঞান দিল ডাকি;
নবীনা কুমারী
শিক্ষা দিল আচরণে তারি;
তীর গড়ে অনন্যমানস
সেও লভে প্রাজ্ঞ-গুরু-যশ।
বিবরের সাপ
জ্ঞান দিল—নহে বিষতাপ;
উর্ণনাভ—ক্ষুদ্র কীটপোকা
প্রজ্ঞা দিল—বিমলা অশোকা!
জীবনের যেই দিকে চাই—
সত্যদাতা জ্ঞানদাতা গুরু ছাড়া নাই!

চেয়ে দেখ পৃথিবীর পানে—
সে কখনো রোষ নাহি জানে।
লক্ষ লক্ষ জীবগণ নিশিদিন করে উৎপীড়ন—
ধৈর্যময়ী মাতার মতন
সহে তাহা অকাতরে
স্থির বক্ষ 'পরে।
অচলপ্রতিষ্ঠা এই ক্ষমাব্রতে তার,
এ-শিক্ষায় গুরু সে আমার।
ওই গিরি—ওই বৃক্ষ—পৃথ্বীর সন্তান—
একান্তে নির্জনে দেখ তাহাদের শুধু আত্মদান;

পলে পলে পরহিত লাগি
অতন্দ্র রয়েছে তারা জাগি।
পরার্থে সর্বস্বত্যাগে কি মহিমা আছে
শিখিলাম তাহাদের কাছে।

সর্বত্র বিচরে বায়ু—সর্ববিধ বিষয়ে প্রবেশ—
তবু নাই আসক্তির লেশ।
ভালমন্দে উদাসীন—নির্লিপ্ত সদাই,
অনাসক্ত অনুরাগে সেও মোর গুরু হ'ল তাই।

বিপুল আকাশ
এনে দেয় সীমাহীন সর্বব্যাপী সত্যের আভাস।
ক্ষুদ্রের মাঝারে আছে—তবু আছে অনন্ত বাহিরে—
কোথা তার ছেদ নাই—কোথা তার বন্ধন নাহিরে।
বাতাসের বেগ
সহসা ছড়ায়ে দিল ঘনকৃষ্ণ মেঘ ;
মনে হয়—আবৃত অম্বর
কাঁপে থর থর ;
পরক্ষণে দেখি তার স্বচ্ছ নীল নির্মল বিস্তার—
কালহীন দেশহীন স্বপ্রকাশ সত্য নির্বিকার !

স্বচ্ছ স্নিগ্ধ জল
মুনির মানস যেন করে টলমল ;
স্পর্শে তার মহাশান্তি—দর্শনেও প্রীতি সুপ্রচুর,
মহতের প্রকৃতি যে আপনাতে এমনি মধুর।
পুণ্যতীর্থ জল,
মহতের চিত্ত তীর্থ— অবগাহি' লভি পুণ্যফল।
এই জল—তারে গুরু জানি,
কলস্বনে উপদেশ—শ্রদ্ধাসহ মানি।

অগ্নি দিল তেজোমন্ত্র—তপস্যার দীপ্তি সমুজ্জ্বল—
দিল উগ্র দুর্ধর্ষতা—মহতে পূত বীর্যবল।
সর্বগ্রাসী—সর্বভুক্—তবু
পাপলেশ নাহি স্পর্শে কভু ;
হেমকান্তি স্পর্শে দেয় সর্ব পাপ মুছি—
তপস্বী যে—নিত্যকাল অগ্নিসম শুচি।

কখনো প্রচ্ছন্ন রহি, কভু সুপ্রকাশ—
অর্ঘ্য নেয় পরেচ্ছায়—সর্ববিধ পাপ করি' গ্রাস।
অগ্নি পর-সত্যের স্বরূপ—
প্রবেশি', বস্তুর মাঝে ধরে তার রূপ ;
আপনাতে রূপহীন কায়া—
বুঝিলাম অনির্বাচ্য মায়া।

দূর নভে চন্দ্র হেরিলাম—
স্নিগ্ধজ্যোতি সৃষ্টির ললাম।
কালে কালে বাড়ে কলা—কালে কালে ক্ষয়,
বাহিরের হ্রাস-বৃদ্ধি—আপনাতে নয়।
বুঝিলাম, দেহপিণ্ড—মাটির এ ডেলা—
ভাঙে কাল—গড়ে কাল—কালের এ খেলা ;
স্থির অচঞ্চল
পিণ্ডমাঝে পুরুষ কেবল।

সূর্যের দেখেছি আচরণ—
বিকিরিয়া সহস্র কিরণ
আকর্ষণ করে বারি রাশি—
হাসি' হাসি'
পুনর্বার দেয় তারে ছড়াইয়া এ-বিশ্বভুবনে
লাভক্ষতি কিছু নাহি মনে।
নিস্পৃহ এ-যোগিচর্যা নিত্যকাল তার—
পাত্র তাই পরম শ্রদ্ধার।
আরও দেখ, সুদীপ্ত ভাস্বর
মহাব্যোমে এক দিবাকর ;
নিয়ে হের ক্ষুদ্র বড় অনন্ত আধার—
প্রতিপাত্রে ভিন্নরূপে প্রতীত অনন্ত জ্যোতি তার
মহাশূন্যে মহাকালে বিরাজিত এক জ্যোতির্ময়—
তারি পরিচয়
সৃষ্টির অনন্ত ভেদে—বৈচিত্র্যের মণিরশ্মিজালে
কালের নৃত্যের তালে তালে।
এই সূর্য—এই চন্দ্র—গুরু এরা সবে—
জ্যোতির্বাণী রূপে চিত্তে রবে।

অরণ্যের একপ্রান্তে বৃক্ষশাখে পল্লব-ছায়ায়
কপোত বেঁধেছে নীড় গভীর মায়ায়।
প্রীতিময়ী অতি
সাথী তার বনের কপোতী।
বাঁধা তারা আঁখিতে আঁখিতে—
অঙ্গে অঙ্গে—দেহে মনে,—ঠাঁই কোথা
এ প্রেম রাখিতে।
এক সঙ্গে উড়ে চলে যায়
বহুদূর ঘনবনচ্ছায়
যেথায় মন্থরা নদী আঁকাবাঁকা চলে,
তৃণে ঢাকা শ্যাম কূলে খেলা করে
স্বচ্ছ কালো জলে।
অস্ফুট কূজনে আলাপন
ঠোঁটে ঠোঁটে প্রেম-সম্ভাষণ।
এক প্রাণ বহে দুই দেহ—
সুখ-স্বপ্নে বাঁধা ছোট গেহ।
ছোট তাহাদের সুখ-নীড়,
তারি মাঝে কচি কচি শাবকের ভিড় ;
পালকের কোমল পরশ—
মুগ্ধচিত্তে গভীর হরষ !
কমকণ্ঠে অধস্ফুট কলকল ভাষা
স্পন্দিত করিয়া দেয় সুনিবিড় অচেতন আশা।

নীড়ে রাখি স্নেহের পুত্তলি
কপোত-কপোতী গেল চলি
এক দিন দূর বনে
খাদ্য অন্বেষণে।
হেন কালে
ব্যাধ আসি তার ঘনজালে
বাঁধে যত কপোত-শাবক—
জাগিল করুণ আর্তরব।
আহার লইয়া মুখে ফিরে এল বনের কপোতী—
দূরশ্রুত আর্তরবে আশঙ্কিতা অতি;

তারপরে অন্ধস্নেহভরে
ঝাঁপায়ে পড়িল তার সন্তানের পরে ;
ব্যাধ হেন কালে
কপোতী বাঁধিল তার জালে।
খাদ্যমুখে কপোত আসিল গৃহে ফিরে
করুণ ক্রন্দন শুধু জাগিয়া উঠিল তারে ঘিরে ;
নিজে আসি ধরা দিল ঘনমায়াজালে
স্নেহপাশে ব্যাধপাশ—এই ছিল ভালে !

এ-কপোত গুরু শিক্ষাদাতা ;
বলে দিল, দিকে দিকে মায়াজাল পাতা।
স্নেহপ্রীতি ডোর
নয় নয় সুকোমল—বন্ধ সুকঠোর—
যত দিন যবনিকা তুলি
না লভি সন্ধান তাঁর—যাঁরে আছি
মোহস্বপ্নে ভুলি।

শিক্ষা দিল ধৈর্যবান্ বন-অজগর—
যথালব্ধ ভোগ্যে চিত্ত পরিতৃপ্ত রাখ নিরন্তর।
অল্প হোক, বেশী হোক, যাহা আসে
তাতে রহ খুশী—
ক্ষুব্ধ খিন্ন নাহি হও অদৃষ্টেরে দুষি' ;
নিজেরে অতন্দ্র রাখ—বীর্যবান্ ওজস্বী উৎসাহী—
তবু রহ ধৈর্যবান্ বীতস্পৃহ—সন্তোষ-
সলিলে অবগাহি'।

এই বাণী স্থির জলধির—
প্রকাশে প্রসন্ন হও—চিত্তমাঝে গহন গম্ভীর !
অপার রহস্য রাখ অন্তরের অন্তস্তলে ঢাকি',
বিপুল ঔদার্যে স্তব্ধ থাকি।
মহান্ অনতিক্রম্য ধীর—
স্তিমিত-অতলস্পর্শ-নীর !
স্ফীত নহে কামনার বেগে
অভাবেও অবিকার—চিত্ত রহে এক সত্যে জেগে।

বাসনার বহ্নিমাঝে দহি'
পতঙ্গ কহিল, আমি বরণীয় নহি।
ফুলে ফুলে ভ্রমিয়া ভ্রমর
বিন্দু বিন্দু আহরণে নিজেরে করিছে মহত্তর।
জীবনের পাত্রখানি ধীরে ধীরে নিতে হবে ভরি'
যাহা বিশ্বে মধুময় তাহা হ'তে করি মাধুকরী।
দূর হোক লোভের সঞ্চয়—
লুব্ধতার ক্ষুব্ধতায় আত্মার ঘৃণিত পরাজয়।
করিচিত্তে দুর্নিবার করিণীর অঙ্গসঙ্গ-আশ—
কামনার পঙ্কগর্তে ঈর্ষাক্লিন্ন আপন বিনাশ।
সুরমোহে ব্যাধপাশে আবদ্ধ হরিণ;
সে নহে সঙ্গীত—যার সুরে চিত্ত নহে বন্ধহীন।
রসনা-মোহিতচিত্তে মীনের বন্ধন—
নির্লোভসংযতচিত্তে আনন্দ-স্পন্দন।
রূপমত্তা কামান্ধ চঞ্চলা
বিদর্ভের বিত্তলোভী পতিতা পিঙ্গলা
কাটাইল বহুকাল নিশি জাগরণে
সুখ-অন্বেষণে।
তৃপ্তিহীন শান্তিহীন দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
চিত্তের অসহনীয় নৈরাশ্যধূসর রিক্ততায়
তার বুকে নেমে এল ডাক—
থাক্ থাক্—সব প'ড়ে থাক্!—
জীবনের শূন্য অন্ধকারে
ঊর্ধ্বে তুলি দুই বাহু শুধু খোঁজ তারে—
করুণায় যে আসিবে নেমে
সর্ব তব দেহমনে—নিবিড় আনন্দে আর প্রেমে।
পতিতা পিঙ্গলা—
সেও মোর শিক্ষা-গুরু—স্নিগ্ধ সুমঙ্গলা।

ফলমূলভোজী পাখী নিরীহ কুরর,
তারা মাংসখণ্ড নিয়ে হানাহানি করে পরস্পর!
তারে ত্যজি' লভে শান্তিধন—
শিখিলাম, সুখিশ্রেষ্ঠ নিঃস্ব অকিঞ্চন।

নাহি মান অপমান—নাহি কোনো
দুশ্চিন্তা কঠোর-
আপনাতে আপনি বিভোর—
আত্মরতি সদানন্দ বালক সুন্দর
গুরু সেই গুণাতীত নর।

প্রেমোদ্ভিন্না কিশোরী কুমারী
নিজগৃহে বরিয়াছে দয়িত তাহারি;
তারি পরিতোষ-আয়োজনে
গৃহকাজ করে সঙ্গোপনে;
হাতে তার দুইটি কঙ্কণ
বাজে ঝন্ ঝন্
প্রেম-সাধনায়
'দুই' তার হ'ল অন্তরায়।
দূরে ফেলি একটি তাহারি
একান্তে সাধনমগ্ন রহিল কুমারী।
শিক্ষা দিল কুমারীর একটি কঙ্কণ—
একান্তে নিভৃতে চাই একতান মন।

মুগ্ধচিত্তে একদিন হেরিলাম শরের নির্মাণ;
নির্মাতার মনঃপ্রাণ
একাগ্র শরের সম—এক লক্ষ্যে স্থির—
সর্ব কোলাহল মাঝে অচঞ্চল ধীর!

নিকেতনহীন সর্প—বাসস্থান পরের বিবর,
নীরব অলক্ষ্যমান—সুখী স্বেচ্ছাচর—
গূঢ় মৌন স্বচ্ছন্দ বিহার
সেই সর্প—গুরু সে আমার!

হেরিলাম, শিল্পী ঊর্ণনাভ
লীলাচ্ছলে প্রকাশিছে নিখিলের অন্তর্লীন ভাব।
আপনারে ঘিরি'
নিজেরে রচিছে ফিরি' ফিরি'
নিত্য নবকালে
তন্তুময় সূক্ষ্ম জালে জালে।

পরক্ষণে কোন্ যাদুবলে
সংহারিছে সৃষ্টি তার আত্মমাঝে অপূর্ব কৌশলে!
সীমাহীন শূন্য হ'তে ঝরা
সৃষ্টির রহস্য দিল ধরা।
দেশহীন কালহীন সঙ্গহীন পরম দেবতা
চন্দ্রে সূর্যে গ্রহে গ্রহে বিঘোষিছে আপন-বারতা;
একের স্পন্দনে জাগে শূন্যে শূন্যে
স্তরে স্তরে কাল—
জাগে দেশ—জাগে বস্তু—জাগে মহা-
সৃষ্টি-বিশ্বজাল!
একের মাঝারে পুনঃ সর্ব সংহরণ—
এক মহা-উর্ণনাভ নিত্য আত্মলীলা-নিমগন!
কীট তুচ্ছ অতি
গুরু ব'লে সেও পেল মোর শ্রদ্ধানতি।
এই কীট—অপরের স্পর্শ লভি' একে
আপন বিবরে পশি ধ্যাননেত্রে শুধু তারে দেখে;
ধ্যানে মগ্ন দেহমন—নিভৃতে নিশ্চুপে
ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ পরিণতি ধ্যেয়বস্তুরূপে।
সত্য যিনি প্রেম যিনি তাঁরি শুদ্ধধ্যানে নিরন্তর
সত্যে প্রেমে দেহ-মন লাভ করে দিব্য রূপান্তর।

বাহিরে খুঁজিব কত—সর্বতত্ত্ব-গেহ
গুরু মোর আপন এ দেহ।
দেহাশ্রয়ে ক্রমে হয় লাভ
শুচিশুভ্র এ-অসঙ্গ ভাব।
এই দেহ অকুণ্ঠিত অশ্রান্ত সতত
প্রিয়জন-সেবাব্রতে রত;
তারপরে নিজে
বৃক্ষসম পরিণতি লভে নব বীজে।

এই আমি—এই বিশ্ব—যেদিকে চাহিরে—
গুরু মোর সত্যদাতা—গুরু মোর
অন্তরে বাহিরে।

"যো দেবনামান্যখিলানি ধত্তে"

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান-পরিষৎ)

জপের আধ্যাত্মিক মূল্য জীবনে উপলব্ধি করিতে এখনও সমর্থ হই নাই, কিন্তু বহুদিন হইতে কতকগুলি দেব-নাম, তৎসংশ্লিষ্ট ভাবরাজির প্রতীক রূপে আমার নিকট প্রতিভাত হইয়াছে, এই ভাবরাজির সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের প্রতীক-স্বরূপ নামগুলির মোহেও আমি পড়িয়া গিয়াছি। মালা-জপের পদ্ধতি মানুষের আধ্যাত্মিক সাধনার ইতিহাসে বোধ হয় খুব প্রাচীন নহে। বৈদিক যুগে ইহার কোনও উল্লেখ পাই না। পরবর্তী-কালে, আগম-প্রোক্ত পৌরাণিক ভাগবত ও তান্ত্রিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়াই বোধ হয় জপ এবং মালার সাহায্যে জপের রীতি সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই মালা-জপের স্থান হইয়া যায়, পরে খ্রীষ্টান ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যেও ইহার প্রচার ঘটে। মালা প্রথমটায় বোধ হয় চিত্ত-প্রসাদের সহায়ক রূপেই প্রচলিত হয়—আমি আমার প্রিয় নামটী এতবার উচ্চারণ করিলাম—মালাতেই তাহার হিসাব সহজে হইয়া থাকে। পরে এই প্রকার জপের পুণ্যফলের কথাও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু

হিসাব রাখিয়া জপ করিবার বিরুদ্ধেও সাধকদের উক্তি পাওয়া যায়—

"মালা জপে সালা। কর জপে ভাঈ।
মন মন জপে। বলিহারী জাঈ॥"

মালা, এবং মালার সাহায্যে জপ,—আমাদের এখনকার ধর্মানুষ্ঠানের বাতাবরণের মধ্যে ইহার বিশিষ্ট স্থান এবং মূল্য এখন সর্বজন-স্বীকৃত। শাক্ত ঘরের ছেলে, ছেলেবেলায় আমি ঠাকুরমাকে এবং কাশীবাসিনী বৃদ্ধা পিসিমাতাকে রুদ্রাক্ষ মালা পরিতে ও সেই মালা জপ করিতে দেখিয়াছি। কি মালা, কিসের দানা, কোন্ দেবতার জপ ঐ রূপ মালায়—অতি শিশুকালে এসব কথা মনেই হইত না। পরে দেখিলাম, বৈষ্ণব ভিক্ষুক এবং বৈষ্ণব গোস্বামীদের কণ্ঠে কাঠের দানার মালা; জানিলাম, তুলসীকাঠের মালা। বৈষ্ণবের কণ্ঠের পক্ষে তুলসী কাঠের মালার সমীচীনতা সঙ্গে-সঙ্গে বুঝিতে পারিলাম —জানিলাম, শিবকে পার্বতীকে বিল্বদলে পূজা করে, বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে তুলসীপত্র দিয়া। ক্রমে জানিলাম—রুদ্রাক্ষ হিমালয় পর্বতে জন্মে, এক প্রকার গাছের বীজ, হিমালয় বিশেষ করিয়া মহাদেবের স্থান, সেই জন্য হিমালয় অঞ্চলে জাত রুদ্রাক্ষ শৈবের কাছে মান্য। হিমালয়ের রুদ্রাক্ষ নেপাল হইতেই বেশী করিয়া আমদানী হয়, এগুলি আকারে বিশেষ বড়; রঙ্গ এগুলির কালো। আবার ছোট রুদ্রাক্ষও পাওয়া যায়, রঙ্গ বাদামী, কাশীর রুদ্রাক্ষের আড়তের মালিক-দের কাছে শুনিয়াছিলাম—বিদেশ হইতে ঐগুলির আমদানী হয়—মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ প্রভৃতি হইতে। এই কথার সত্য মিথ্যা যাচাই করি নাই।

শিবের আর শক্তির জন্য জপমালা হয় রুদ্রাক্ষের এবং কচিৎ স্ফটিকের; এবং নারায়ণের তুলসীকাঠের। বিশেষ-দেব-কল্পনা বা দেব-নাম নিরপেক্ষ এমন জপমালা কি নাই, যাহার সাহায্যে যে কোনও দেবতার নাম লইয়া জপ করা যায়? কাশীর বিশ্বনাথের গলির মালা-বিক্রেতাদের কাছে জানিলাম, একমাত্র "বৈজয়ন্তী" মালাতেই সমস্ত দেবতারই জপ করা চলে—এই বৈজয়ন্তী হইতেছে এক প্রকারের ছোট কালো দানা, কোনও ফলের বীজ। কাশীতেই এক-শ'-আট দানার এইরূপ একটী বৈজয়ন্তী-মালা কিনিলাম। পরে তাহা সরু রূপার তার দিয়া গাঁথাইয়া লইলাম। মালা হইতে মালান্তরে না গিয়া, এখন এই একই মালায়, যে শক্তি "খেলতি অণ্ডে, খেলতি পিণ্ডে", বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত করিয়া আছে এবং আমার অস্তিত্বের অন্তরতম প্রদেশেও যাহা বিদ্যমান, তাহার নাম-রূপাদির যে-সমস্ত মনোহর কাব্যময় ও আধ্যাত্মিকতাময় কল্পনা উদ্ভূত হইয়াছে, সেই কল্পনা যে কতকগুলি নামের মধ্যে সংক্ষেপে যেন ঘনীভূত হইয়া আছে—সেই নামগুলি বার বার আবৃত্তি করিয়া একটু তৃপ্তি পাই—"শিব, উমা; শ্রী, বিষ্ণু।"

কেবল "শিব, উমা; শ্রী, বিষ্ণু" নহে, আরও অনেক।

ইরান দেশ, মুসলমান ভারত ও তুর্কীস্থানকে যিনি আধ্যাত্মিকতার সূত্রে গ্রথিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই সূফী সাধক জলালুদ্দীন রূমী বলিয়াছেন—

"ব-নাম-ই-আন্, কি নামে ন-দারদ্"—

—তাঁহারই নামে, যিনি কোন নামই ধারণ করেন না।—যিনি নাম-রূপের অতীত, তিনিই তো সমস্ত নামের অধিকারী—"যো দেবনামানি অখিলানি ধত্তে।" এই যে বিভিন্ন নাম, তা তো আর কিছুই নয়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে কতকগুলি, আমাদের মানব-চিত্তে মানব-কল্পনায় যে ভাবে প্রতিভাত হয়, তাহারই নির্দেশক বা প্রতীক মাত্র। একই চিন্তা, একই কথা—সব মানুষের

সমস্ত সমাজের মধ্যে একই ভাবে প্রকাশিত হয় না, আধার বা পাত্রের প্রকৃতি অনুসারে এই প্রকাশ-ভঙ্গীতেই কিছুটা বিভিন্নতা আসিয়া যায়। ভাবের স্বরূপ এক, ভাষায় প্রকাশ বহু।

বিবেকানন্দ কোথায় যেন বলিয়াছিলেন, different Religions are like so many different Languages. অ-বাঙ্-মনো-গোচর শাশ্বত সত্তা বা সত্য স্বরূপে, "স্বে মহিম্নি" বিরাজ করিতেছে। মানুষ নিজের ভাষার দ্বারা সেই সত্যের নাগাল পাইবার চেষ্টা করিতেছে, ভাষা তাঁহাকে ধরি-ধরি করিয়াও ধরিতে পারিতেছে না, ছুঁই-ছুঁই করিয়াও ছুঁইতে পারিতেছে না। বিভিন্ন ভাষার শব্দ ও বর্ণনায় আমরা বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীরই পরিচয় পাই। হস্তিদর্শনে অন্ধের উপলব্ধির মত, বিভিন্ন ধর্মের আধ্যাত্মিক জগতের বস্তুর সম্বন্ধে প্রযুক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাষার বিভিন্ন শব্দ পুরা সদ্বস্তুকে প্রকাশিত করিতে পারিবে, এইরূপ বিচার ধৃষ্টতা মাত্র; বিশেষতঃ যখন আমরা নাম-রূপ-গুণাদির আরোপ করিয়া কল্পনার চোখে সদ্বস্তুকে নিজের বোধগম্য করিয়া ধরিবার চেষ্টা করি। পরব্রহ্ম, রাধাসোআমী, "পরমাৎমা", ঈশ্বর, কটবুল্, যাহ্‌বেহ্ বা য়িহোৱাহ্, এল্, শাঙ-তী, অল্লাহ্, খুদায়্ বা খোদা, তেন্‌রি, দেউস্, থেওস্, বোগ, গড, আদিবুদ্ধ—এ সমস্ত শব্দ যেমন ভিন্ন, সেই রকম এই সমস্ত শব্দের দ্যোতনাও ভিন্ন, যদিও সকল শব্দেরই লক্ষ্য হইতেছে বাঙ্‌মনোঽতীত শাশ্বত বস্তু। তেমনি বিভিন্ন ধর্মে যে সমস্ত দেব-কল্পনা আছে, সেগুলিও শাশ্বত সত্তাকে নব হইতে নবতর চিত্রের সাহায্যে প্রকাশের চেষ্টা মাত্র। এই-সব কল্পনা পরস্পরের পূরক—নির্গুণ মৌলিক সত্তার জন্য "নেতি", "নেতি"—ইহা নহে, ইহা নহে—শব্দের যেমন আবশ্যক, তেমনি মানুষের চিত্তের রঙ্গীন কাচের মধ্যে প্রতিভাত এই-সমস্ত কল্পনাময় প্রকাশকে "ইত্যপি", "ইত্যপি"—ইহাও, ইহাও—শব্দের প্রয়োগও আমাদের করিতে হয়। যাহা এক, এবং অজ্ঞেয় ও অজ্ঞাত, তাহাই বহু, এবং অনুভূতিগম্য ও আস্বাদনীয়।

এই জন্যই, যেমন বলে to learn a new language is to acquire a new soul; তেমনি বিশ্বমানব যেখানে যে দেব-কল্পনা তাহার মনের আকুলতা দিয়া, আবেগ দিয়া, ভাবুকতা দিয়া, তাহার জাতীয় চেতনার ভাল-মন্দ সব কিছু দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে, তাহার আংশিক উপলব্ধিও "যো দেবনামানি অখিলানি ধত্তে" সেই শাশ্বত বস্তুর সান্নিধ্যলাভের অন্যতম পথ বলিতে দ্বিধা হয় না। এই বোধের বশবর্তী হইয়া শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কেবল শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব নহে, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান পন্থ ধরিয়াও সেই সেই পন্থের বিশেষ রস আস্বাদন করিয়া পরিপূর্ণ উপলব্ধির জন্য আকুল হইয়াছিলেন।

এই জন্য আমার বৈজয়ন্তী-মালায় "অখিলানি দেবনামানি"-র স্মরণ করিয়া, কত মনোহর কল্পনার মধ্য দিয়া আমি নামরূপ-হীন, যেখানে সমস্ত নাম সমস্ত কল্পনা গিয়া মিলিয়াছে, তাহার আভাস নিজের ব্যক্তিগত কল্পনার মাধ্যমে গড়িয়া তুলিতে পারি। এবং সেই আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিশ্বমানবের হৃদয় মন্থন করিয়া আমার পরিচিত যে সমস্ত দেব-কল্পনা আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে ও এক-একটী নামকে আশ্রয় করিয়া বা সেই নামকে ঘিরিয়া রহিয়াছে, আমার জপমালায় আমি তাহাদেরও স্মরণ করি, এবং এই ভাবে বিশ্বাত্মার সর্বগ্রাহী প্রকাশকে আমার অন্তরের প্রণাম জানাই। আমার মনে হয়—এটী আমার ব্যক্তিগত কথা,

অনেকে আমার সঙ্গে একমত হইবেন, অনেকে হইবেন না—পৃথিবীর তাবৎ ধর্মের মধ্যে ঈশ্বরের যে-সমস্ত মানবধর্মানুসারী কল্পনা এক ঈশ্বরের নাম করিয়াই হউক, অথবা সেই এক ঈশ্বরের বহুবিধ প্রকাশ কল্পনা করিয়াই হউক, গড়িয়া উঠিয়াছে, ভারতবর্ষের শিব-উমার মত বিশ্বন্ধর বিশ্বন্তর সর্বগ্রাহী বিরাট্ বিশাল অতলস্পর্শী ব্যোমচুম্বী কল্পনা আর তো কোথাও দেখিনা—

"মহেশ্বরে বা জগতামধীশ্বরে
জনার্দনে বা জগদন্তরাত্মনি।
ন বস্তুভেদ-প্রতিপত্তিরস্তি মে
তথাপি ভক্তিস্তরুণেন্দুশেখরে॥"

এই কল্পনাকেই আশ্রয় করিয়া মানুষের নিঃশ্রেয়স-সাধন হইতে পারে—কিন্তু উপরন্তু আমার মানব-ভ্রাতা প্রাচীন-কালে, মধ্য-যুগে, আধুনিক যুগে, নানা ভাবের ভাবুক হইয়া যে-সমস্ত মহনীয় দেব-কল্পনা গঠিত করিয়াছে, সেই-সব দেবনাম-জপের দ্বারা বা অনুধ্যানের দ্বারা নব নব রস আস্বাদন করিতে পারিলে আমার আমিত্বের—আত্মারই প্রসার হয়—কাহাকেও নিজের থেকে পৃথক বা দূর বলিয়া মনে হয় না। এই জন্যই আমার বৈজয়ন্তী-মালায় আমি বিশ্বমানবের গঠিত সুধর্মা-দেবসভার তাবৎ দেবতাগণকে আহ্বান করি, তাঁহাদের মূল সেবকদের ভাবের আভাস-কণা পাইবার প্রয়াস করি। সুতরাং কেবল শিব উমা, শ্রী বিষ্ণু নহেন; সীতা রাম, কৃষ্ণ রাধা নহেন; উপরন্তু সব জাতির অখিল দেবনাম, আমার জপের অঙ্গ হইয়া উঠে।

এই বস্তুকে যদি ঐতিহাসিক ভাববিলাস বলা যায়, আপত্তি করিব না—কারণ ইতিহাসের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থার মধ্য দিয়া, মানব-সমাজের আবর্তন-বিবর্তনের মধ্য দিয়া চির-সারথি তাঁহার রথ চালাইয়া আসিয়াছেন; এবং প্রাচীন মানুষ যেমন আমাদের মধ্যেই বাঁচিয়া আছে, তেমনি তাহাদের দেব-কল্পনার পর্যবসানও আমাদের এ যুগের বিভিন্ন ধর্মের বা সম্প্রদায়ের দেব-কল্পনারই মধ্যে; সেই প্রাচীনকে স্বরূপে বুঝিবার চেষ্টা করিলে তাহা আত্মদর্শনেরই সহায়ক হইবে।

আমি এখানে নানা দেশের মানবের হৃদয় হইতে উত্থিত বিভিন্ন দেবতার নাম করিতে বসিব না—তাঁহাদের আশ্রয় করিয়া যে-সমস্ত ভাবরাজ্য বিদ্যমান তাহার বর্ণনা বিচার বিশ্লেষণও এখন সম্ভবপর নহে। তবে সব দেশের সব শ্রেণীর মানুষের কল্পিত দেবরূপ, সেই অব্যক্তেরই প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা হইতেই উদ্ভূত, এই বোধ লইয়া আমি নিভৃতে যথাজ্ঞান তাঁহাদের নাম উচ্চারণ করি, জপ করি, এবং বাহিরে সর্বদেবময় শাশ্বত পুরুষকে প্রণাম করি॥

"জপ করা কিনা নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে—জপ করতে করতে—তাঁর রূপ দর্শন হয়—তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে—শিকলের আর একদিক তীরে বাঁধা আছে। শিকলের এক একটী কড়া ধরে ধরে গিয়ে, ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে ধরে যেতে যেতে ঐ কড়িকাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।"

—শ্রীরামকৃষ্ণ

সঙ্গীত

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক

১

সেই সঙ্গীত শুনিবারে আমি আকাঙ্ক্ষী অভিলাষী।
—সেই সজ্জন-সঙ্গতি ভালবাসি।
পাওার মত আগুলিয়া উৎসুক,
ডাকি' যে দেখায় দেবতার চাঁদমুখ,
যার মীড়ে মীড়ে শরীর শিহরে মণিকোঠা ঘুরে আসি।

২

আপাত মধুর, লালসা-নাচানো, নহে সে চটুল সুর,
শিব-সঙ্গীত শিবেতর করে দূর।
'গোরখ্‌নাথের' মৃদঙ্গ বাজে তায়,
নগর 'কদলীপত্তন' গলে যায়,
ভোগে নিমগন যোগী মীননাথ কেঁদে মরে ব্যথাতুর।

৩

জন্মান্তর সৌহার্দের সেই দেয় সন্ধান।
সত্য, সে গীতে জাতিস্মর হয় প্রাণ।
হয় অশ্বিনী-উর্বশী উদ্দাম,
মনে পড়ে তার বৈজয়ন্ত ধাম,
সেই গীতই দেয় অভিশপ্তকে হারাণো অভিজ্ঞান।

৪

অশোক-কাননে সীতাকে স্মরায় প্রাসাদ অযোধ্যার,
স্বয়ম্বরের শুভ-সভা মিথিলার।
তপস্যা-রত ভগীরথের সে কানে,
অনাগত ভাগীরথার ধ্বনি যে আনে,
জড়ভরতের গত-মৃগ-মায়া মনে পড়ে বারবার।

৫

রিষ্টি হরে সে, সৃষ্টি করে সে, সে অনির্বচনীয়,
পথহারা সব পথিকের আত্মীয়।
যোগভ্রষ্টে ডাকে সে সাধন-পথে,
স্থানভ্রষ্ট 'মাতলি'কে তার রথে,
নির্বাপিতকে সেই করে দেয় জ্যোতির্ময়ের প্রিয়।

৬

তাহার সঙ্গে তীর্থ-ভ্রমণে বাহিরায় মোর মন,
করি ধ্রুপদের ধ্রুবলোক দর্শন।
কতই সত্য কতই স্বপ্ন সাথ,
চেনা হারাণোর পাই সেথা সাক্ষাৎ
করি সেই সুর-সাগরেতে শত জনমের তর্পণ।

ব্রহ্ম-পুরাণ

ডক্টর শ্রীরমা চৌধুরী

সংস্কৃত-সাহিত্যে পৌরাণিক সাহিত্য একটী অতি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অষ্টাদশ মহাপুরাণ এবং মতভেদে ন্যূনাধিক অষ্টাদশ উপপুরাণকে আশ্রয় করে এই সাহিত্য গড়ে উঠেছে। পৌরাণিক সাহিত্যের এরূপ কয়েকটী বৈশিষ্ট্য আছে, যা' সংস্কৃত-সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগে দেখা যায় না। প্রথমতঃ, পুরাণসমূহের ন্যায় সর্ববিদ্যা-সংগ্রহ সংস্কৃত-সাহিত্যের বিশাল ভাণ্ডারেও বিরল। একাধারে ধর্ম, দর্শন, নীতিতত্ত্ব, প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ-বিধি, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতির এরূপ অপূর্ব সমাবেশ সত্যই বিস্ময়কর। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমান হিন্দুধর্মের বহু অংশই—যথা, প্রতিমা-পূজা, এবং অন্যান্য নানাবিধ শ্রাদ্ধ, ব্রত; ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি বেদোপনিষদমূলক নয় পুরাণ-

মূলক। সেজন্য বেদোপনিষদের ন্যায় পুরাণ-সমূহও প্রাচীন ধর্মগ্রন্থরূপে যুগে যুগে সম্মানিত হয়েছে। যিনি বেদ ও মহাভারত রচনা করেন, সেই একই বেদব্যাস অষ্টাদশ মহাপুরাণ রচনা করেছিলেন এই লোকের সাধারণ বিশ্বাস, এবং মহাভারতে (১২—৩৪৯) ও বেদান্তসূত্রের শঙ্কর ভাষ্যেও (৩-৩-৩২) এই মতের উল্লেখ আছে। তৃতীয়তঃ, পুরাণসমূহের বহুস্থলেই প্রকৃত কবিত্ব-শক্তি ও সৃজনী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। সত্য ও কল্পনার এরূপ সংমিশ্রণ অতি উপভোগ্য। পৌরাণিক কাহিনীগুলি মহাভারতাদির গল্পের মতই সমান মনোরম ও চিত্তাকর্ষক।

অষ্টাদশ মহাপুরাণের তালিকায় সাধারণতঃ ব্রহ্ম-পুরাণেরই উল্লেখ আছে সর্বপ্রথম। সেজন্য ব্রহ্ম-পুরাণকে 'আদি-পুরাণ' বা প্রাচীনতম পুরাণ বলে সাধারণতঃ গ্রহণ করা হয়। পদ্ম-পুরাণের একস্থানে (১-৬২), অষ্টাদশ মহাপুরাণকে বিষ্ণুর দিব্যদেহের বিভিন্ন অঙ্গ বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সেই প্রসঙ্গে, ব্রহ্ম-পুরাণকে বিষ্ণুর মস্তক, পদ্ম-পুরাণকে তাঁর হৃদয় প্রভৃতি বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এর থেকেই, পুরাণসমূহের মধ্যে ব্রহ্ম-পুরাণের প্রাচীনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যে সাধারণে গৃহীত হ'ত, তা প্রমাণিত হয়।

অন্যান্য পুরাণের ন্যায়, ব্রহ্ম-পুরাণেও পুরাণের পঞ্চলক্ষণ দৃষ্ট হয়—যথা, সর্গ বা সৃষ্টিবর্ণন; প্রতি-সর্গ বা প্রলয়ের পরে নূতন সৃষ্টি-বিবরণ; বংশ বা দেব ও ঋষিগণের বংশবৃত্তান্ত; মন্বন্তর বা বিভিন্ন মনুসৃষ্ট বিভিন্ন যুগের মনুষ্যজাতির বিবৃতি; এবং বংশানুচরিত বা সূর্য ও চন্দ্রবংশীয় রাজগণের ইতিহাস।

ব্রহ্ম-পুরাণের প্রথম অধ্যায়ে আমরা দেখ্‌তে পাই যে, বেদব্যাস-শিষ্য সূত লোমহর্ষণ নৈমিষারণ্যে দ্বাদশ বার্ষিক যজ্ঞরত মহর্ষিগণের যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হ'লে, তাঁরা সকলেই পরমজ্ঞানী লোমহর্ষণকে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্বন্ধে যথাযথরূপে প্রকাশ করে বল্‌তে অনুরোধ করেন। সেই অনু-সারে, লোমহর্ষণ তাঁদের নিকট পুরাকালে দক্ষপ্রমুখ মুনি-শ্রেষ্ঠগণের প্রশ্নের উত্তরে পদ্মযোনি ব্রহ্মাকর্তৃক কথিত ব্রহ্ম-পুরাণ-সম্মত সৃষ্টি-রহস্য বিবৃত করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা থেকে জগৎসৃষ্টি, তাঁর দেহের একার্ধ থেকে পুরুষ ও অপরার্ধ থেকে নারীর সৃষ্টি, আদি মানব মনু ও মনু থেকে প্রজাসৃষ্টি, দেব-দানবাদির উৎপত্তি, প্রভৃতি নানারূপ সৃষ্টি-বৃত্তান্ত দ্বিতীয় থেকে সপ্তদশ অধ্যায়ে বহু বিভিন্ন আখ্যানের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। তারপরে মুনিগণ ভূমণ্ডল এবং সাগর, দ্বীপ, পর্বত, বন প্রভৃতির সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছুক হলে, সূত লোমহর্ষণ সপ্তদ্বীপ, সপ্তসাগর, পর্বত, নদী, পাতালাদি সপ্ত-লোক, নরক প্রভৃতি বিষয়ে অষ্টাদশ অধ্যায় থেকে দ্বাবিংশ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণনা করেন। ত্রয়োবিংশ ও চতুর্বিংশ অধ্যায়ে গ্রহনক্ষত্রাদির সংস্থান সম্বন্ধে বিবরণী আছে।

উপরি-উক্ত বর্ণনাসমূহ প্রায় সব পুরাণেই একই ভাবে পাওয়া যায়, এবং এগুলি অবশ্য সবই কাল্পনিক। কিন্তু, তা সত্ত্বেও, পুরাণকারদের কল্পনার এই পরিধি ও বিস্তৃতি সত্যই আমাদের মুগ্ধ করে। যে সত্য বস্তুটী তাঁরা এই কল্পনার মাধ্যমে উপলব্ধি ও প্রকাশ করে গেছেন, তা' হ'ল দেশ ও কালের কল্পনাতীত বিরাটত্ব ও অসীমত্ব। সমগ্র ভারতীয় দর্শনই এই দেশকালের অসীমত্বের ভিত্তিতেই তার তাত্ত্বিক ও নৈতিক, দু'টী দিকই গড়ে তুলছে। পুরাণমতে, একটী ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ লোক বা ভুবনের সমাহার:—ঊর্ধ্বে ভূর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপো-লোক, সত্যলোক; নিম্নে অতল, পাতাল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল—প্রত্যেকটী থেকে প্রত্যেকটীর কোটী কোটী যোজন ব্যবধান। এরূপ কোটী কোটী ব্রহ্মাণ্ডের সমাহারই হ'ল জগৎ

বা বিশ্বচরাচর। সুতরাং দেশের পরিধির শেষ নেই, দেশ অসীম, অনাদি ও অনন্ত। একই ভাবে, কাল সম্বন্ধে পৌরাণিক বর্ণনা এই যে, ব্রহ্মার এক দিন সৃষ্টিকাল, এক রাত প্রলয়কাল। এই একদিন ও একরাত প্রত্যেকটীই সহস্র যুগ বা লক্ষ লক্ষ বর্ষব্যাপী—এবং দিনের পরে রাত, রাতের পর পুনরায় দিন—এই ভাবে চলেছে অসীম, অনাদি, অনন্ত কালের অবিচ্ছিন্ন যাত্রা।

দেশ ও কালের এই অসীমত্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় সত্যদ্রষ্টা ঋষিগণ উপলব্ধি করেছিলেন বর্তমান জীবনের নিরতিশয় ক্ষুদ্রতা ও মূল্যহীনতা। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনিচয়ের মধ্যে একটী মাত্র ব্রহ্মাণ্ডের, চতুর্দশ ভুবনের মধ্যে একটী মাত্র ভুবনের, লক্ষ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে একটী মাত্র ক্ষুদ্রতম প্রাণী 'আমি' —এই অসীম দেশকালের পটভূমিকায় ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র মানবজীবনের মূল্য ও সার্থকতা কতটুকু, যদি না আত্মিক বলে সেই ক্ষুদ্রত্ব ও তুচ্ছত্ব অতিক্রম করা যায়?—এই চিন্তাই আকুল করে তুলেছে যুগে যুগে প্রত্যেক ভারতীয় মনীষীকে; এবং তারই ফলে আমরা পেয়েছি উপনিষদের সেই অপূর্ব বাণী— "যো বৈ ভূমা তৎ সুখং, নাল্পে সুখমস্তি"—যা বিরাট, তাই সুখ; যা ক্ষুদ্র তাতে সুখ নেই। দেহের দিক্ থেকে এক অতি ক্ষুদ্র পৃথিবীতে আবদ্ধ হয়ে থাক্‌লেও, আত্মার দিক্ থেকে আমরা ভূমার, অনন্ত অসীম আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী; কিন্তু যদি আমরা পার্থিব ভোগবাসনায় লিপ্ত হয়ে পার্থিব গণ্ডীতেই মাত্র পরিভ্রমণ করি, তাহলে সেই নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্বেই হ'বে আমাদের লজ্জাকর পরিসমাপ্তি—পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বের বিরাট কল্পনার মধ্যে এই সত্যেরই আভাস পেয়ে আমরা মুগ্ধ হই। আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানও দেশকালের বিশালত্ব ও সেই অনুপাতে আমাদের পৃথিবীর নিরতিশয় ক্ষুদ্রত্বের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। সেইদিক্ থেকেও পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্ব কাল্পনিক হ'লেও সম্পূর্ণ হাস্যকর নয়।

ব্রহ্মাণ্ড বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পুরাণের উনবিংশ অধ্যায়ে ভারতবর্ষের একটী সুন্দর, স্বতন্ত্র বর্ণনা আছে। পুরাণকারের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছে ভারতের সেই অতি নিজস্ব, চিরন্তন আধ্যাত্মিক রূপটী। সেজন্য তিনি শ্রদ্ধাবনত চিত্তে পুণ্য ভারত-ভূমির স্তুতি করছেন—

"অত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্মভূরেষা যতোঽন্যা ভোগভূময়ঃ॥
অত্র জন্ম সহস্রাণাং সহস্রৈরপি সত্তম।
কদাচিল্লভতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ॥
গায়ন্তি দেবাঃ কিল গীতকানি
ধন্যাস্তু যে ভারতভূমিভাগে।
স্বর্গাপবর্গাস্পদহেতুভূতে
ভবন্তি ভূয়ঃ পুরুষা মনুষ্যাঃ॥ (১৯।২৪-২৫)

অর্থাৎ জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ; কারণ এটীই হ'ল একমাত্র কর্মভূমি, অন্যান্য সকল দেশ ভোগভূমিই মাত্র। এখানে সহস্র জন্মের পরে কদাচিৎ কোনো জীব পুণ্যসঞ্চয়ের ফলে জন্মগ্রহণ করে। দেবগণও এরূপ গান করে থাকেন যে, স্বর্গ ও মুক্তির কারণস্বরূপ ভারতভূমিতে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেন, তাঁরাই ধন্য!

ব্রহ্ম-পুরাণের বহুলাংশে তীর্থ-মাহাত্ম্য বর্ণনা দৃষ্ট হয়। পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে 'তীর্থ ও পুণ্যস্থান কি', এই প্রশ্নের উত্তরে সূত সুন্দর ভাবে বল্‌ছেন—

"যস্য হস্তৌ চ পাদৌ চ মনশ্চৈব সুসংযতম্।
বিদ্যা তপশ্চ কীর্তিশ্চ স তীর্থফলমশ্নুতে॥"
(২৫।২)

"মনো বিশুদ্ধং পুরুষস্য তীর্থং
বাচাং তথা চেন্দ্রিয়নিগ্রহশ্চ।
এতানি তীর্থানি শরীরজানি
স্বর্গস্য মার্গং প্রতিবোধয়ন্তি॥" (২৫।৩)

"ইন্দ্রিয়াণি বশে কৃত্বা যত্র যত্র বসেন্নরঃ।
তত্র তত্র কুরুক্ষেত্রং প্রয়াগং পুষ্করং তথা ॥"
(২৫।৬)

অর্থাৎ, যাঁর হস্ত, পদ ও মন সুসংযত, যাঁর বিদ্যা, তপশ্চর্যা ও কীর্তি আছে, তিনিই তীর্থফল লাভ করেন। বিশুদ্ধ মন, বাক্যসংযম ও ইন্দ্রিয়-দমন—এই কয়টী মানুষের শরীরজাত তীর্থ ও স্বর্গ-লাভের উপায় স্বরূপ। যার মন অশুচি, তীর্থস্থানেও তার শুদ্ধি লাভ হয় না। আত্মসংযমী ব্যক্তি যে স্থানেই বাস করুন না কেন, সেই স্থানই তাঁর পক্ষে মহাতীর্থস্বরূপ।

পরে অবশ্য ১০৮ অধ্যায় থেকে পরবর্তী বহু অধ্যায়ে ইলা-তীর্থ, চক্রতীর্থ, পিপ্পলেশ্বর তীর্থ, নাগতীর্থ, মাতৃতীর্থ প্রমুখ বহু তীর্থস্থানের বিশদ বর্ণনা আছে।

ব্রহ্ম-পুরাণে বিষ্ণু, শিব ও কৃষ্ণ—এই তিন দেবতারই বিবরণী ও স্তুতি আছে। গ্রন্থের প্রারম্ভেই আছে সূতের মুখে এক অথচ বহু, সূক্ষ্ম অথচ স্থূল, অব্যক্ত অথচ ব্যক্ত-স্বরূপ পরমাত্মা বিষ্ণুর স্তব (১-২১)। পরে মার্কণ্ডেয় উপাখ্যানে (৫২ ও পরবর্তী অধ্যায়ে) বহু বিষ্ণু-সম্বন্ধীয় আখ্যায়িকা, স্তবস্তুতি ও বৈষ্ণব ধর্মের ক্রিয়াকলাপ প্রভৃতি সন্নিবিষ্ট আছে। ৩৪-৪০ অধ্যায়ে রুদ্রমহিমা বর্ণন, সতী ও উমার উপাখ্যান, দেবগণ কর্তৃক মহেশ্বর-স্তুতি প্রভৃতি দৃষ্ট হয়। ১৮০—২১২ অধ্যায়ে কৃষ্ণের জন্ম ও জীবন-বৃত্তান্ত, বিষ্ণুপুরাণসম্মত ভাবে, বিশদভাবে বর্ণিত হয়েছে।

অন্যান্য পুরাণের ন্যায় ব্রহ্ম-পুরাণও বহুলাংশে কাল্পনিক সৃষ্টি-প্রলয়াদি বর্ণনা, আখ্যায়িকা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হ'লেও এই গ্রন্থের শেষাংশে কিছু দার্শনিক আলোচনাও পাওয়া যায়। ২৩৩-২৩৪ অধ্যায়ে পুরাণকার বিষ্ণু-স্তুতি-প্রসঙ্গে পরম পুরুষ, পরমব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন। পরমব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। তিনিই আদি, নিত্য, শুদ্ধ, সর্বব্যাপী, অক্ষয়পুরুষ; তিনিই সর্বাধার ও সর্বভূতাত্মা। তিনি ব্যক্ত ও অব্যক্ত, উভয়স্বরূপ। সৃষ্টিকালে তিনি জীবজগতে পরিণত হয়ে ব্যক্তরূপ ধারণ করেন; প্রলয়কালে পুনরায় জীবজগৎ তাঁর মধ্যে বিলীন হয়ে যাওয়াতে তিনি অব্যক্তরূপে বিরাজ করেন। (২৩৩ অধ্যায়)।

২৩৪ অধ্যায়ে ব্রহ্ম-পুরাণকার উপনিষৎ-সম্মত ভাবে পরমাত্মাকে প্রধানতঃ নঞ্-মূলক বিশেষণ দ্বারা বর্ণনা করে বল্‌ছেন যে, যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দেশ্য, অরূপ, অপাণিপাদ, সর্বগতি, নিত্য, ভূতযোনি, কারণ, ব্যাপ্ত, ব্যাপ্য ও সর্বস্বরূপ, বিবেকী বুধগণ তাঁকেই সর্বদা দর্শন করেন। তিনিই 'ভগবান্' নামে কথিত হয়ে থাকেন। জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য, বীর্য, তেজ প্রভৃতি ভগবত্ত-প্রতিপাদক বাক্যের তিনিই একমাত্র বাচ্য। তিনি সম্পূর্ণরূপে হেয়গুণশূন্য। সর্বভূতের প্রকৃতি ও সগুণ হয়েও তিনি সমস্ত দোষগুণের অতীত।

বন্ধ-মুক্তি আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পুরাণকার ২৩৪ অধ্যায়ে বল্‌ছেন যে, সংসার অশেষ ক্লেশের আকর—জীবিত অবস্থায় যে যে বস্তু পুরুষের অতি প্রীতিকর হয়, ভাবী কালে সে সবই তার দুঃখবৃক্ষের বীজস্বরূপই হয়ে থাকে। এরূপে সংসার-দুঃখরূপ মার্তণ্ডের তাপে-তাপিত জনগণের পক্ষে—মুক্তি-পাদপের ছায়া ব্যতীত সুখ নেই। এই দুঃখোচ্ছেদের চরম ঔষধি আত্যন্তিকী ভগবৎ-প্রাপ্তি।

ভগবৎ-প্রাপ্তির উপায় কর্ম, জ্ঞান ও ভক্তি (২৩৪ অধ্যায়)। কর্ম শব্দের অর্থ এস্থলে নিষ্কাম কর্ম। সকাম কর্ম জন্ম-পুনর্জন্মের হেতু, কিন্তু নিষ্কাম ভাবে, ভোগলিপ্সাশূন্যভাবে কর্ম সম্পাদন করলে, চিত্তশুদ্ধি ও মোক্ষের পথ সুগম হয়। জ্ঞান আগমোৎপন্ন ও বিবেকজ ভেদে দ্বিবিধ (২৩৪

অধ্যায়)। আগমজ জ্ঞান শব্দব্রহ্ম ও বিবেকজ জ্ঞান পরমব্রহ্ম বিষয়ক। অজ্ঞান অন্ধতমতুল্য, বিবেকজ জ্ঞান সূর্যবৎ ভাস্বর। ব্রহ্ম দ্বিবিধ বলে বিজ্ঞেয়—শব্দব্রহ্ম ও পরমব্রহ্ম। শব্দব্রহ্মকে জেনে পরব্রহ্মকে লাভ করা যায়। দ্বিবিধা বিদ্যাই প্রাপ্তব্য। অপরাবিদ্যা ঋগ্বেদাদিময়ী, পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাই পরমাত্মা লাভের উপায়। ৫৯ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, শ্রীভগবানকে দর্শন ও ভক্তিভরে প্রণাম করলে মানবমাত্রেই সর্বপাপ-বিমুক্ত হয়ে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

২৯ অধ্যায়ে ভক্তি ও তার অঙ্গাদির স্বরূপ-বর্ণনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্ম-পুরাণকার বল্‌ছেন যে, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমাধি অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। মন দ্বারা ঈশ্বরবিষয়ক ভাবনার নাম 'ভক্তি'; সে বিষয়ে মানসিক ইচ্ছাই 'শ্রদ্ধা'; এবং ঈশ্বরধ্যানই 'সমাধি'। যিনি ভগবৎকথা শ্রবণ করেন ও অন্যকে শ্রবণ করান, যিনি ভগবদ্‌ভক্তগণকে পূজা করেন, যাঁর চিত্ত ও মন ভগবানে নিবিষ্ট, এবং যিনি সর্বদা দেবপূজা ও দেবকর্মে নিরত—তিনিই প্রকৃত ভক্ত। যিনি দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত কর্ম-সমূহ অনুমোদন করেন, সতত ভগবৎ-নাম কীর্তন করেন, এবং ভগবদ্‌ভক্তগণের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করেন না, তিনিই প্রকৃত ভক্ততর।

গ্রন্থশেষে, ব্রহ্ম-পুরাণকার জ্ঞানমূলক সাংখ্য-মার্গ ও ধ্যানমূলক যোগমার্গের মধ্যে কোন্‌টী শ্রেয়ঃ—সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন (২৩৬-২৪০ অধ্যায়)। সাংখ্যমার্গ দ্বারা মানব আত্মাকে আত্মাতেই দর্শন করে। সেই আত্মাকে চক্ষু বা অন্যান্য ইন্দ্রিয় দ্বারা দর্শন করা যায় না, কেবল মাত্র প্রদীপ্ত মন দ্বারাই সেই মহান্ আত্মা দৃষ্ট হন, এবং যে ব্যক্তি তাঁকে দর্শন করেন, তিনি ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন (২৩৬ অধ্যায়)। যোগমার্গ দ্বারা যোগী পুরুষ হৃৎপদ্মস্থ, সর্বব্যাপী নিরঞ্জন পুরুষোত্তমকে সতত ধ্যান করেন। প্রথমে কর্মেন্দ্রিয়সমূহকে ক্ষেত্রজ্ঞে বা জীবাত্মায় ও পরে ক্ষেত্রজ্ঞকে পরমব্রহ্মে যোজিত করে যোগী যোগযুক্ত হন। এই ভাবে যাঁর চঞ্চল মন পরমাত্মায় প্রলীন হয়, সেই বিষয়নিস্পৃহ যোগীই যোগসিদ্ধি লাভ করেন। যখন সমাধিমগ্ন যোগীর নির্বিষয় চিত্ত পরমব্রহ্মে লীন হয়, তখনই তাঁর পরমপদ লাভ হয় (২৩৫ অঃ)। সাংখ্য ও যোগমার্গের আপেক্ষিক শ্রেয়স্ত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্ম-পুরাণকারের মত এই যে, উভয় পথই যথার্থ ও পরমগতির সাধন, কেবল এদের দর্শনই পৃথক্ (২৩৯ অঃ)।

উপরি-উক্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকেই প্রমাণিত হবে যে, ব্রহ্ম-পুরাণে অতি উচ্চশ্রেণীর দার্শনিকতত্ত্ব প্রপঞ্চিত হয়েছে।

নীতিশাস্ত্রের দিক থেকেও, ব্রহ্ম-পুরাণ অতি বিশিষ্ট গ্রন্থ। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত আত্মসংযম, দান, দয়া, প্রভৃতি সু-উচ্চ নীতির অতি সুন্দর প্রপঞ্চনা আছে। যেমন, ২১৬ অধ্যায়ে দান ও ২১৮ অধ্যায়ে অন্নদানের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে, এবং সর্ববিধ দানের মধ্যে অন্নদানকেই সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় দার্শনিক ও নীতিতত্ত্ববিদ্‌গণের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ব্রহ্ম-পুরাণকারও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে, জ্ঞানের পথ, মুক্তির পথ, ধর্মের পথ একমাত্র নীতিরই পথ—অন্য কোনো পথ নয়। সেজন্য তিনি গ্রন্থশেষে ২৩৮ অধ্যায়ে নীতিতত্ত্বের সারাংশ বা চুম্বক বিবৃত করে বল্‌ছেন :—"একঃ পন্থা হি মোক্ষস্য"—মোক্ষের মাত্র একটীই পথ, সেই পথ হ'ল এই : জ্ঞানী ক্ষমা দ্বারা ক্রোধকে, সংকল্প-বর্জন দ্বারা কামকে, সত্ত্বসেবা দ্বারা নিদ্রাকে, সাবধানতার দ্বারা ভয়কে, ধৈর্য দ্বারা ইচ্ছা ও দ্বেষকে, জ্ঞানাভ্যাস দ্বারা চিত্তচাঞ্চল্যকে, সন্তোষ দ্বারা লোভ মোহকে, তত্ত্বানুশীলন দ্বারা বিষয়া-সক্তিকে, দয়া দ্বারা অধর্মকে, ভাবিকালের ভাবনা-

পরিহার দ্বারা আশাকে, সংসারের অনিত্যতা-চিন্তা দ্বারা স্নেহকে, মৌনতা দ্বারা বহুভাষণকে, নিশ্চয়জ্ঞান দ্বারা বিতর্ককে এবং শৌর্য দ্বারা ভয় ও মনকে জয় করবেন। এই সংযম-শুচি, জ্ঞানদীপ্ত, পরসেবাপূত পন্থাই মোক্ষলাভের একমাত্র পন্থা—"এষ মার্গো হি মোক্ষস্য প্রসন্নো বিমলঃ শুচিঃ।"

ব্রহ্ম-পুরাণকার গ্রন্থশেষে যে শাশ্বত আশীর্বাণী উচ্চারণ করেছেন,—সেই অপূর্ব সুন্দর বাণীটী শ্রদ্ধার সঙ্গে উদ্ধৃত করে শেষ করছি :—

"ধর্মে মতির্ভবতু বঃ পুরুষোত্তমানাং
স হ্যেক এব পরলোকগতস্য বন্ধুঃ।
আয়ুশ্চ কীর্তিঞ্চ তপশ্চ ধর্মঃ
ধর্মেণ মোক্ষং লভতে মনুষ্যঃ॥
ধর্মোঽত্র মাতাপিতরৌ নরস্য
ধর্মঃ সখা চাত্র পরে চ লোকে।
ত্রাতা চ ধর্মস্থিহ মোক্ষদশ্চ
ধর্মাদৃতে নাস্তি তু কিঞ্চিদেব॥"

ধর্মে আপনাদের মতি হোক্। এই ধর্মই পরলোকগত পুরুষের একমাত্র বন্ধু। ধর্ম দ্বারাই মানব আয়ু, কীর্তি, তপস্যা, ও মোক্ষলাভ করে। ইহলোকে ধর্মই মানবের মাতা ও পিতা; পরলোকে ধর্মই তার একমাত্র সখা। ধর্মই ত্রাতা, ধর্মই মোক্ষপ্রদ, ধর্ম ব্যতীত আর কিছুই নেই।"

কৃপা ও প্রার্থনা

স্বামী জগদানন্দ

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করেন, "সবই যদি আমাকে করিতে হইবে, তবে কৃপা মানেই বা কি?"

এই প্রশ্নের উত্তর বোধ করি এই যে, যতক্ষণ "সবই আমাকে করিতে হইবে" এই বুদ্ধি থাকে ততক্ষণ কৃপা সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয় নাই। যখন এই বুদ্ধি আসে যে, আমাকে কিছুই করিতে হয় নাই, কিছুই করিতে হইতেছে না, কিছুই করিতে হইবে না, তখনই কৃপার উপলব্ধি হয়। শুদ্ধা ভক্তি, শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হইলে ঐরূপ নিজকে অকর্তা বোধ হয়। ইহাই কৃপা। এই অকর্তৃত্ব-জ্ঞান কৃপা দ্বারাই লাভ হয়। ভগবান কি সাধনের অধীন যে সাধন করিয়া তাঁহাকে লাভ হইবে? গীতার ১১।৫৩-৫৪ শ্লোকে আছে, বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। অনন্যা ভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে জানা যায়। এই অনন্যা ভক্তি কেবল তাঁহার কৃপাতেই আসে। (গীতা, ১০।১০-১১)। ঐ স্থানে ১১ শ্লোকে শ্রীভগবান বলিতেছেন—তেষামেবানুকম্পার্থম্—"প্রীতিপূর্বক ভজনকারী ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ।" বলিলেন,—'প্রীতিপূর্বক ভজনকারীদের'; আর্তি-হরণের জন্য বা অর্থার্থী হইয়া ভজনকারীদের নহে। যাঁহারাই শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা এই বিষয়ে সকলেই একমত—অর্থাৎ উহা তাঁহার কৃপাতেই লাভ হয়। কঠোপনিষদেও (১।২।২৩) ধর্মরাজ যম নচিকেতাকে ইহাই বলিতেছেন।

যাঁহারই শুদ্ধা ভক্তি ও শুদ্ধ জ্ঞান লাভ হয় তাঁহারই মনে সতত উদিত হয়,—"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্। যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্॥" "যাঁহার কৃপা মূককে বাচাল করে, পঙ্গুকে গিরি লঙ্ঘন করায়, সেই পরমানন্দ মাধবকে বন্দনা করি।"

অন্নদামঙ্গলে আছে—মা অন্নপূর্ণা বলিতেছেন, "ভবানন্দ মজুমদার নিবাসে রহিব"; আবার, "যে মোরে আপন ভাবে, তারই ঘরে যাই।"

কথিত আছে, আমাদের পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণী লীলা-সম্বরণের সময় বলিয়াছিলেন,—"অমুকের হাতে খাব।" ইহা কৃপা ভিন্ন আর কি? আমাদের প্রতি কৃপাতেই তাঁহার অবতার—"অরূপ সায়রে লীলালহরী উঠিল মৃদুল করুণা বায়।" শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অহেতুক স্পর্শ (প্রার্থনা না করিয়াও) অনেক ভাগ্যবান ভক্ত স্বীয় হৃদয়ে ও মস্তকে দক্ষিণেশ্বরে ও অন্যত্র পাইয়াছেন।

কাহারও কাহারও মনে প্রশ্ন জাগে,—"প্রার্থনা কি পূর্ণ হয়?" প্রার্থনা পূর্ণ হওয়া না হওয়া বিষয়ে সন্দেহ ত দূরের কথা, তিনি যে প্রার্থনা না করিতেই পূর্ণ করিয়া দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"অন্নপূর্ণার রাজ্যে কেহ উপবাসী থাকে না।" তাঁহার দর্শন প্রার্থনা যিনিই করিবেন তিনিই যে তাঁহাকে লাভ করিবেন, ইহা অপেক্ষা নিশ্চিত সত্য আর কিছুই নাই। ভক্ত জানেন, সূর্যের উদয় এবং অস্তও অনিশ্চিত হইতে পারে কিন্তু ভগবানকে পাওয়া কখনও সন্দেহের বিষয় নহে। তাঁহাকে প্রাপ্তির প্রার্থনা কখনও নিষ্ফল হইতে পারে না।

তবে ইহাও সত্য যে, অনিত্য বস্তুর প্রার্থনা সব সময় শ্রীভগবান পূর্ণ করেন না। তিনি জানেন, কোনটি আমাদের মঙ্গল। মানুষ না জানিয়া—ভবিষ্যৎ ফল না বুঝিয়া কত কিছু পার্থিব বিষয় প্রার্থনা করে। কিন্তু দেখা গিয়াছে অভীপ্সিত বস্তু লাভ করিয়াও তাহার দুঃখের অবধি থাকে না—এমন কি কখনও তাহাকে আত্মহত্যাও করিতে হয়! শ্রীভগবান যে আমাদের সর্বজ্ঞ সুহৃৎ। আমাদের অকল্যাণকর প্রার্থনা তিনি কেন মঞ্জুর করিবেন?

কেহ হয়তো জিজ্ঞাসা করিবেন, মায়ের আকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও পুত্র মরিয়া যায় কেন? ইহার উত্তরে বলা চলে যে, পুত্র বাঁচিয়া থাকিলেই যে সত্য সত্য কল্যাণ হইত, তাহা কে বলিবে? এই পুত্রই পরে হয়তো মায়ের অশেষ যন্ত্রণার কারণ হইতে পারিত—কে জানে?

আর এক কথা—পুত্রের মৃত্যুতে মায়ের শোকার্তা না হইয়া থাকিতে পারিলেই ভাল। কারণ, মা তো জানেন না যে পুত্র কোথায় গিয়াছে। ভগবান যদি তাহাকে এই দুঃখময় সংসার হইতে ঋষিলোকে বা দেবলোকে লইয়া গিয়া থাকেন, অথবা তাহাকে তাঁহার নিকটেই পরমানন্দে রাখিয়া থাকেন, তবে মায়ের তো দুঃখের কারণ নাই। পুত্রের সুখেই তো মায়ের সুখ। ভগবান মায়েরও সুহৃৎ, পুত্রেরও সুহৃৎ।

আর সত্য কথা তো এই—তিনিই জীব, জগৎ, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হইয়াছেন। তিনিই পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই দেহত্যাগ করেন। পুত্র আর কে? ভগবানই। তিনি ত সর্বদেহে বিরাজমান। তাঁহার জন্য শোক কি? (গীতা ২।১১-১৩)।

প্রার্থনা সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে, জাগতিক বিপ্লব চণ্ডীপাঠ করিয়া কি শান্ত করা যায়? ইহার উত্তরে বলিতে হয় যে, বিপ্লবের কারণ তো ভগবানেরই ইচ্ছা। চণ্ডীপাঠের দ্বারা যে শান্তি হয়, তাহা তিনি চণ্ডীতে বলিয়াছেন। চণ্ডীপাঠের দ্বারা শান্তি করিতে ইচ্ছা করিলে তিনি চণ্ডীপাঠ করাইবেন ও শান্তি দিবেন। অন্যরূপ ইচ্ছা করিলে অন্যরূপ করিবেন। চণ্ডীপাঠক অহংকার-বশে দেখেন যে, তিনি পাঠ করিয়া শান্তি আনিলেন! কেনোপনিষদে আছে, দেবাসুরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া দেবতাদের অহংকার হইয়াছিল যে, তাঁহারা নিজের শক্তিতে জয়লাভ করিয়াছেন। এই ভ্রম তাঁহাদের ভগবান দূর করিয়া দিয়াছিলেন।

'আমরা চণ্ডীপাঠ করি', 'আমরা এই ফল পাই' 'তিনি এই ফল দেন'—এই প্রকার বুদ্ধি অহংকার হইতেই আসে। যতদিন কর্তৃত্ববুদ্ধি থাকে ততদিন ঐরূপ বোধ হইবেই হইবে এবং ততদিন যে উহা অতি সত্য, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অহংকার, অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি ও প্রাণে 'আমি ও আমার' বুদ্ধি ছাড়িয়া দেখিলেই সত্য-দর্শন নতুবা আপেক্ষিক সত্যমাত্রের জ্ঞান থাকে।

অতএব চণ্ডীপাঠের দ্বারা যে শান্তি হয় তাহাতো সত্যই।

মায়া

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

সারা পৃথিবীর যমযন্ত্রণা গুমরি গুমরি কাঁদে
ওই টুকু বুকে; অপূর্ব্ব লীলা বলিহারি ভগবান,
শ্রাবণের মেঘ ঢেকে দিতে চায় দ্বিতীয়ার ক্ষীণ চাঁদে,
সাহানার সুরে যতি কেটে যায়, ওঠে পুরবীর তান।

সপ্তসাগর মন্থনে বুঝি উঠিয়াছে হলাহল
তারই বিষাক্ত বেদনায় নীল পেলব ওষ্ঠ দু'টি,
অশ্রুবিন্দু শুষে নিল যেন তৃষার্ত্ত ধরাতল,
ক্ষণভঙ্গুর জীবনে ধরিতে খুলে গেল দুই মুঠি।

প্রভাতের বাঁশী না বাজিতে সুর আকাশে মিলায়ে যায়
বিদায় বেলায় কাঁদিছে সানাই বিজয়ার সুরে সুরে,
না ফুটিতে ফুল কোমল কোরক মাটিতে লুটাল হায়
চাপা কান্নার অসহ্য ব্যথা গুমরায় বহুদূরে।

বহুদূরে নয় এ যেন বুকের একেবারে মাঝখানে
শ্মশানের চিতা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে যায় অবিরাম
গঙ্গার জলে দু'মুঠো ভস্ম ভাসে জোয়ারের টানে
বুকের রক্ত, তার বিনিময়ে কিছু নাই তার দাম।

শোকের অশ্রু, মর্ম্মযাতনা, বুকফাটা হাহাকার
একান্ত মিছে মহাকারুণিক বিধাতার দরবারে,
নিষ্পাপ শিশু চেনে না জগৎ, জানেনাক' বিধাতার
মর্জ্জিমাফিক বিচারের ভান, নিষ্ঠুর সংসারে।

গত জন্মের পাপপুণ্যের জের টেনে মহাজন
বলেন,—"মুক্তি ইহজনমের কর্ম্মভোগের ফল,
প্রসূতির কোলে সন্তান মরে আছে তার প্রয়োজন।"
আমি বলি—মায়া-মতিচ্ছন্নে ডুবু ডুবু রসাতল।

মৃত্যুর চেয়ে আর কি সত্য অনিত্য পৃথিবীতে
অন্ধ বধির বিধাতার পায়ে মিছে মাথা খুঁড়ে মরা,
জগৎ-প্রভুর চোখে ঘুম নাই নিখিলবিশ্বহিতে
পরমদয়াল ভক্তের কাছে আপনি দিলেন ধরা।

আমরা বুঝেছি হাড়ে হাড়ে, তাই কালাপাহাড়ের দলে
নাম লেখালাম আগামী দিনের সূর্য্য সাক্ষ্য' করি'
জন্মান্তর প্রকৃতির খেলা, কি হবে কর্ম্মফলে
চির সত্যের জ্যোতিতে অন্ধ পৃথিবী উঠুক ভরি'।

শাক্তদর্শন

অধ্যাপক শ্রী শ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, এম্-এ

প্রসিদ্ধ ষড়্দর্শন বা সর্বদর্শনসংগ্রহের মধ্যে 'শাক্তদর্শন' নামে কোন দর্শনপ্রস্থান দেখা যায় না। কেহ কেহ বলেন,—শৈব, প্রত্যভিজ্ঞা ও রসেশ্বর-দর্শনের মধ্যেই শাক্তদর্শনের রূপটি লুক্কায়িত আছে। 'শাক্তদর্শন' ঠিক এই নামে উল্লিখিত না হইলেও—এই তিন দর্শনে 'শক্তি' পদার্থের স্থান আছে। কিন্তু 'শাক্তদর্শন' নামে প্রাচীনকালেও যে একটি দর্শনপ্রস্থান ছিল, তাহা অনুমান করিবার পক্ষে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রায় চারশত বৎসর পূর্বে সাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ মহাশয়-প্রণীত 'তন্ত্রসার' নামক তন্ত্র-সঙ্কলন গ্রন্থে—শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে শাক্তদর্শনের পূজার ব্যবস্থা আছে। শ্রীবিদ্যার পূজাক্রমে 'চক্রপূজা'র বিধিতে দেখা যায় যে,—'শাক্তদর্শন' চক্রের কেন্দ্রে অবস্থিত, তাহার চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ, ব্রাহ্ম, সৌর, শৈব ও বৈষ্ণব—এই পাঁচটি দর্শনের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"বৌদ্ধং ব্রাহ্মং তথা সৌরং শৈবং বৈষ্ণবমেব চ।
শাক্তং ষষ্ঠন্তু বিজ্ঞেয়ং চক্রং ষড়্দর্শনাত্মকম্॥"

কোন কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত মনে করেন যে,—ভট্ট কুমারিল ও আচার্য্য শঙ্কর কর্ত্তৃক বৌদ্ধমত খণ্ডিত হইলেও বৌদ্ধসম্প্রদায় একেবারে উৎসন্ন হয় নাই, কিন্তু তন্ত্রমত প্রবিষ্ট হইবার পর ভারতখণ্ডে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত—মাধ্যমিক যোগাচার সৌত্রান্তিক ও বৈভাসিক এই চতুঃসম্প্রদায় ধীরে ধীরে নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারাইয়া তান্ত্রিক সাধনক্ষেত্রে সমতা অবলম্বন করায় ক্রমে বৌদ্ধ-ভাব বর্জ্জন করেন। ফলে বৌদ্ধদর্শন তান্ত্রিকদর্শন-মধ্যেই পরিগণিত হইয়াছিল, এইজন্য শ্রীবিদ্যাপ্রকরণে চক্রের মধ্যে বৌদ্ধদর্শনের সমাবেশ দেখা যায়।

শাক্তদর্শনের উৎপত্তি বেদ না তন্ত্র হইতে —এ বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। বস্তুতঃ উভয়ই শ্রুতিমধ্যে পরিগণিত, মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন—'শ্রুতিস্তু দ্বিবিধা বৈদিকী তান্ত্রিকী চ।' বৈদিকী শ্রুতিই হউক বা তান্ত্রিকী শ্রুতিই হউক—শাক্তদর্শনের সিদ্ধান্তগুলি যে প্রাচীন এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। যাঁহারা তন্ত্রকে পৃথক্ শ্রুতি বলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ—অথর্ববেদকে তন্ত্রের আদিরূপ বলিয়া থাকেন। অথর্ববেদের বিস্তৃত রূপই তন্ত্র, ইহা তাঁহাদের মত। সুতরাং চতুর্বেদের অন্যতম অথর্ববেদ তন্ত্রের মূলস্থান সম্ভাবিত হইলে—বেদ ও তন্ত্রের মধ্যে একটা যে সিদ্ধান্তগত যোগসূত্র আছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

তান্ত্রিক শাক্তদর্শনের মধ্যেও দ্বৈত ও অদ্বৈত সম্প্রদায় আছে। এ প্রবন্ধে বৈদিক শাক্তদর্শনের কথাই আলোচিত হইবে। তান্ত্রিক শাক্তদর্শন বহু বিস্তৃত, ও তাহার বহু প্রস্থান—এ প্রবন্ধে সমস্ত কথার আলোচনা সম্ভবপর নহে, এজন্য বৈদিক শক্তিবাদসম্বন্ধে আলোচনা করিতেছি।

ইহা সর্ববিদিত যে, বৈদিক শাক্তদর্শনের মূল হইল—ঋগ্বেদের দেবীসূক্ত।

অম্ভৃণ নামক ঋষির কন্যা আম্ভৃণী; তাঁহার নাম 'বাক্'—তিনি স্বয়ং বাগ্দেবীরূপে এই সূক্তস্থ মন্ত্রগুলির দ্রষ্ট্রী। এই মন্ত্রগুলির তাৎপর্য্য বিচার করিলে দেখা যায় যে, একটি শক্তি,—যাহা 'অহম্' (আমি)রূপে প্রতিভাত হইয়াছিল,—তাহাই রুদ্র, বসু, আদিত্য, বিশ্বদেব, মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের অন্তর্যামিনী। ঐ শক্তি—সোম ত্বষ্টৃ প্রভৃতিকে ধারণ করিয়া

আছেন এবং সমস্ত বিশ্বের নির্মাণকর্তৃত্ব তাঁহাতেই প্রতিষ্ঠিত। এই সূক্তে যদিও শক্তি-শব্দ উল্লিখিত নাই, তথাপি তাৎপর্য্যবশে একটি মহাশক্তির সত্তা উপলব্ধ হয়। এই মহাশক্তিই যে সর্ব্বকারণ, জগতের সমস্ত উৎপন্ন ভূতগ্রামের তিনিই যে প্রেরয়িত্রী, এ তথ্যটুকু দেবীসূক্ত হইতে প্রকাশ পায়। শাক্ত অদ্বৈতবাদের ভিত্তি হইল দেবীসূক্ত। এই ঋক্‌কে অবলম্বন করিয়াই মার্কণ্ডেয় পুরাণের—সপ্তশতী প্রকাশিত হইয়াছে। সপ্তশতী (চণ্ডী) গ্রন্থে শক্তি বা মহাশক্তির মহিমা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তথাপি ইহার অন্তর্নিহিত শাক্তদর্শন বিশেষভাবে প্রচারিত হয় নাই।

শাক্তদর্শনকে ঠিক দর্শনপ্রস্থানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে—ব্রহ্মসূত্র বা উত্তরমীমাংসা সহ সামঞ্জস্য দেখাইতে হইবে এবং সমস্ত উপনিষদ্‌-বাক্যের তাৎপর্য্য উদ্ঘাটিত করিয়া শাক্তসিদ্ধান্ত-সহ বিরোধ পরিহার ও সর্ব্বত্র সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইবে।

প্রথমতঃ উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তপ্রস্থানের কথা উঠিলেই পূর্ব্বমীমাংসা স্মৃতিপথে উদিত হয়। পূর্ব্ব ও উত্তর মীমাংসা—ইহা শুনিলেই-মনে হয় যেন—একই শাস্ত্রের পূর্ব্বপীঠিকা ও উত্তরপীঠিকা। কিন্তু প্রচলিত ভাবধারার অনুবর্ত্তন করিলে সাধারণতঃ আমাদের মনে আসে—পূর্ব্বমীমাংসা কর্ম্মকাণ্ড-সম্বন্ধীয় ও উত্তর-মীমাংসা জ্ঞানকাণ্ড-সম্পৃক্ত। উভয়ের মধ্যে পূর্ব্বোত্তরভাব থাকিলেও তাহার সহিত পরস্পর সাক্ষাৎ উপকার্য্য-উপকারক ভাব নাই। কারণ, কর্ম্মকাণ্ড স্বর্গাদির হেতু, আর অদ্বৈত-তত্ত্বজ্ঞান স্বর্গাদি হইতে অনেক উৎকৃষ্ট মুক্তির হেতু। কিন্তু, শাক্তদর্শন-প্রস্থান বিচার করিলে পূর্ব্বোত্তর মীমাংসার সুন্দর সামঞ্জস্য সংসাধিত হইয়া থাকে।

মীমাংসা-দর্শন শক্তিবাদী। এই দর্শন প্রত্যেক বেদোক্তকর্ম্মের ভিন্ন ভিন্ন শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। এই খণ্ডশক্তিবাদী মীমাংসাদর্শন পূর্ব্ববর্ত্তী থাকায় পরবর্ত্তী মীমাংসাদর্শনে এক অখণ্ড মহাশক্তিবিষয়ক জিজ্ঞাসা সম্ভবপর হইতে পারে।

পূর্ব্ব-মীমাংসাদর্শন দ্বাদশ অধ্যায়ে এবং উত্তর-মীমাংসা চার অধ্যায়ে—এই মিলিতভাবে ষোড়শাধ্যায়ে সমগ্র মীমাংসাদর্শন সমাপ্ত হইয়াছে। দ্বাদশ অধ্যায়ের অন্তিম সূত্র "স্মৃতের্বা স্যাদ্ ব্রাহ্মণানাম্"—এখানে এই ব্রাহ্মণপদের মূলীভূত ব্রহ্মপদার্থ কি?—এই জিজ্ঞাসার উত্তরেই উত্তর-মীমাংসার প্রথম সূত্র—"অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা।"

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—বিষয়রূপে উপস্থিত হইলে শিষ্য-দিগের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য পরসূত্র—"জন্মাদ্যস্য যতঃ"। আদ্য—যিনি আদিতে উৎপন্ন,—সেই ব্রহ্মা (ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব) হিরণ্যগর্ভ (হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে); আদ্যের জন্ম যাঁহা হইতে, তিনিই ব্রহ্ম বা মহাশক্তি।

এখানে আপত্তি হইতে পারে—সম্প্রদায়-বিশেষের ব্যাখ্যায় 'আদ্য' শব্দে 'আকাশ' গ্রহণ করা হইয়াছে। তাঁহারাও শ্রুতিপ্রমাণ দিয়াছেন—"আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ আকাশাদ্ বায়ুঃ..." ইত্যাদি, সুতরাং আদ্যশব্দে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা না আকাশ, এ সংশয় থাকিয়া যাইতেছে।

ইহার উত্তরে বলা যায় যে,—সংশয়ের কোন কারণ নাই। কারণ,—'আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ' এই শ্রুতিবচনে আকাশসৃষ্টি বিষয়ে প্রাথম্য-সূচক কোন শব্দ উল্লিখিত না হওয়ায় এই শ্রুতি আদ্যঘটিত সূত্রের লক্ষ্য হইতে পারে না। আদৌ ভবঃ আদ্যঃ—তস্য—আদ্যস্য জন্ম যতঃ, যাঁহা হইতে আদ্যের জন্ম, এই 'আদ্য' শব্দের অর্থবলে 'অগ্রে' বা 'প্রথমে' এইরূপ শব্দ যে শ্রুতিবচনে পাওয়া না যাইবে, তাহাকে 'আদ্য' বলার কোন যুক্তি নাই। আদ্য শব্দে আকাশ ইহাও আভিধানিক অর্থ নহে। সুতরাং "ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সম্বভূব"

—দেবগণের প্রথমে ব্রহ্মা সম্ভূত হইয়াছিলেন—এই শ্রুতিবাক্য গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ' 'অসদ্বা ইদমগ্রমাসীৎ' ইত্যাদি শ্রুতিবচনে প্রাথম্যসূচক 'অগ্র' শব্দ থাকিলেও এখানে উৎপত্তির প্রসঙ্গ না থাকায় 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এখানে 'জন্ম' শব্দে উৎপত্তির প্রসঙ্গ থাকায়—উক্ত শ্রুতিদ্বয়ও এই সূত্রের লক্ষ্যের বিষয় হইতে পারে না।

ব্রহ্ম যে শক্তিস্বরূপ—ইহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে উক্ত হইয়াছে। "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্।"—ব্রহ্মবিদ্‌গণ ধ্যানযোগরত থাকিয়া সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণ দ্বারা আবৃত দেবাত্মশক্তিকে দর্শন করিয়াছিলেন।

ত্রিপুরোপনিষদে আছে—"ভগঃ শক্তির্ভগবান্ কাম ঈশ উভা দাতারাবিহ সৌভগানাম্। সমপ্রধানৌ সমসত্ত্বৌ সমোজৌ তয়োঃ শক্তিরজরা বিশ্বযোনিঃ"। ভগ অর্থে শক্তি, শক্তিমান্ বলিয়াই তিনি ভগবান্। তিনি স্বয়ং কাম-স্বরূপ, তিনি ঈশান, এই ঈশান ও তাঁহার শক্তি উভয়ই সৌভাগ্যদাতা। তাঁহারা উভয়ই সম-প্রধান, সমসত্ত্ব, সমতেজঃসম্পন্ন তাঁহাদের উভয়ের অজরা শক্তিই এই বিশ্বের আদি কারণ।

গুণনিগূঢ়া আত্মশক্তিই বলা যাউক বা ঈশ-ঈশানীর মিলিত সত্তাই বলা যাউক,—ইহাই মহাশক্তি বা পরমব্রহ্ম।

দেব্যুপনিষৎ বলিলেন—'সর্ব্বে বৈ দেবা দেবী-মুপতস্থুঃ। কাসি ত্বং মহাদেবি! সাব্রবীৎ—অহং ব্রহ্মস্বরূপিণী। মত্তঃ প্রকৃতিপুরুষাত্মকং জগচ্ছূন্যং চাশূন্যঞ্চ।...অহমখিলং জগৎ। বেদোঽহম-বেদোঽহম্। বিদ্যাহমবিদ্যাহম্' ইত্যাদি।

সমস্ত দেবতারা দেবীর নিকটে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—মহাদেবি! তুমি কে? তিনি বলিলেন,—আমি ব্রহ্মস্বরূপিণী। আমা হইতে প্রকৃতিপুরুষাত্মক এই জগৎ, আমা হইতে শূন্য ও অশূন্য উভয়ই। আমি সমস্ত জগৎ। আমি বেদ-স্বরূপা ও অবেদস্বরূপা। আমি বিদ্যা ও অবিদ্যা।

সপ্তশতীতে ইহার প্রতিধ্বনি কর্ণগোচর হইয়া থাকে—

"মহাবিদ্যা মহামায়া মহামেধা মহাস্মৃতিঃ।
মহামোহা চ ভবতী মহাদেবী মহাসুরী॥"

'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে' আবার 'যা দেবী সর্ব্বভূতেষু নিদ্রারূপেণ সংস্থিতা'।

জন্মাদ্যস্য যতঃ—এই দ্বিতীয় সূত্রে তিনি বিশ্ব-প্রসবিত্রী হইলেও যে জড়স্বরূপা নহেন, তাহা বুঝা যায় না। এজন্য তৃতীয় সূত্রের প্রয়োজন—'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'—যাহা হইতে সমস্ত শাস্ত্র প্রকাশিত, তিনি ব্রহ্ম। "এতস্য মহাভূতস্য নিশ্বসিতং যদৃগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতিদ্বারা, তাঁহারই নিশ্বাসবায়ুর মত অনায়াসে প্রকাশিত বেদচতুষ্টয়, ইহা জানা যায়। তাহা হইলে তিনি সমস্ত শাস্ত্রপ্রণেত্রী, অতএব জ্ঞানময়ী, তাহা অবধারিত হইল। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, যিনি প্রসবিত্রী, তিনি চিন্ময়ী হইলে এইরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ হইতে পারে কি? তাহার উত্তরে কথিত হইল—'তত্তু সমন্বয়াৎ'।

'তত্তু' অর্থাৎ আদ্যজন্মের কারণত্ব থাকিলেও "সমন্বয়াৎ" 'সম্' সম্যক্ 'অন্বয়' সম্বন্ধবশতঃ, দ্বিতীয় সূত্রোক্ত প্রসব-ধর্ম্মের সহিত তৃতীয় সূত্রের চিন্ময়স্বরূপের নিত্যসম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মবিষয়ে উভয় স্বরূপই সম্ভবপর। বহুশ্রুতিবচনে বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ ব্রহ্মস্বরূপে উক্ত হইয়াছে। 'মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ' (বৃহদারণ্যক) 'সংযুক্তমেতৎ ক্ষর-মক্ষরঞ্চ ব্যক্তাব্যক্তং ভরতে বিশ্বমীশঃ' (শ্বেতাশ্বতর) এবং এই সকল শ্রুতিবচনকে উপজীব্য করিয়াই পুরাণশাস্ত্র মহাশক্তির বর্ণনায় বহু বিরোধিধর্ম্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছেন।

"যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সা ত্বং কিং স্তূয়সে তদা॥"
"মহারাত্রি মহাবিদ্যে নারায়ণি নমোঽস্তুতে॥"

ইত্যাদি।

মহাশক্তিস্বরূপ ব্রহ্মপদার্থে সকল বিরোধিভাবের সম্মেলনস্থান। শাক্তদর্শনসিদ্ধান্ত বেদ হইতে এবং তন্ত্র হইতেও সংগৃহীত হইয়া থাকে। অদ্য সংক্ষেপে বেদান্তদর্শনের চতুঃসূত্রীর ভাবার্থ প্রকাশ করিলাম।

পূজ্যপাদ পিতৃদেব* তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-শক্তিভাষ্যে এ বিষয়ে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। আমি তাহার একাংশমাত্র এই প্রবন্ধে লিপিবদ্ধ করিলাম।

নিত্যসম্মিলিত চিদচিৎ সত্তাই মহাশক্তি, ইহাই শাক্তদর্শনের সিদ্ধান্ত।

* ৺মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহোদয়
—উঃ সঃ

কবিতাঞ্জলি

থাক্ সে গোপন

শ্রীচিত্ত দেব

আকাশে তুমি ছড়িয়ে দিলে আমারে
জড়িয়ে নিলে তোমার বিপুল ছন্দে—
গন্ধে গানে হরিলে আমার চিত্ত
পূরিলে পরাণ বিমল জীবনানন্দে।
পুষ্পে পত্রে আমারে তুমি এঁকেছো
তোমার গলায় মালার মতন রেখেছো।
ডাকিলে তবু সময় হলেই আসো-যে
কখনও আমি যাইনে তোমায় আন্‌তে—
আমারে তুমি কখন ভালোবাসো-যে
থাক্ সে গোপন—চাইনে আমি জান্‌তে।

"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ"

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

তোমারে স্মরণ করে আছে সাধ্য কার,
তুমি না স্মরিলে পরে করুণা-পাথার।
যাগ-যোগ জপ আদি তপস্যা কঠোর,
একাসনে শুদ্ধ ধ্যানে বসি' নিরন্তর,
দর্শন বেদান্ত শাস্ত্র পুঁথি যত সব
করায়ত্ত যদি হয় জ্ঞানীর গৌরব,
সাধি' কত ব্রত করি' তীর্থ দরশন
তবু, হায় নাহি হয় হৃদয় পূরণ।
তোমার কৃপায় দৃষ্টি মর্মে পশে যার,
অনাদি দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান সুলভ তাহার।

বিশ্বরূপ

[শ্রীঅরবিন্দের একটি সনেট অবলম্বনে]

শ্রীপৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বিমল রভসমূর্ত হে সুন্দর, স্বচ্ছ জ্যোতির্ময়,
আত্মা মোর রত আজি তব অন্বেষণে;
সর্বময় স্পর্শ তব পাই আমি ধরার ধূলায়,
ভাসে মোর প্রাণ-মন পুলকের দীপ্ত সম্মোহনে।
সকল নয়ন মাঝে নেহারি গো তব দৃষ্টি-সুধা,
সর্ব কণ্ঠে শুনি তব কম্বুস্বরধ্বনি;

প্রকৃতির পথ বাহি' তব প্রেম উজলে আমায়,
তব দিব্যছন্দে মোর সত্তা আজি উঠিছে নিস্বনি'।
জীবনের বক্ষে তব মূরতির আনন্দ অম্লান
পুষ্পে, পত্রে, প্রস্তরের অঙ্গে অঙ্গে শোভে:
বহ্নিময় পক্ষপুটে প্রতিপল তোমারেই চায়;
মর্তজীবন প্রভু উদ্ভাসিত তোমার আহবে।

যাত্রী আজি মহাকাল তব চির-প্রগতির সনে,
ভবিষ্যৎ আশাপুঞ্জ পল্লবিত তোমারই গহনে।

বিকল্প

শ্রীঅক্রূরচন্দ্র ধর

'ঈশ্বর সত্য'—এ তত্ত্ব না মানে যে,
'সত্যই ঈশ্বর'—এই যেন জানে সে।
'বিশ্বরূপের' দেখা যে না পায় খুঁজিয়া,
বিশ্বই রূপ তাঁর লয় যেন বুঝিয়া।

সাকারে যে সংশয়ী, নিরাকারে ধারণা
নাই যার, জ্ঞান নাই, প্রেম সে তো আরো না;
প্রতিরোধ যে না পায় অপরের বাণীতে,
সাধনা সে করে যেন আপনারে জানিতে।

নব আগমনী

শ্রীশৈলেশ

শত শরতের প্রথম প্রভাতে দিয়েছিনু তব চরণে
শত কামনার শত অঞ্জলি,—কহিতে মরি যে শরমে!
সব কিছু মাঝে কেবল আপন
স্বার্থ ও সুখ খুঁজেছিল মন,
তব এ বিশ্বে আর কিছু আছে জানে নাই মোর ধরমে।
অনাদি চাওয়ার স্রোতে ভেসেছিনু অন্ত কোথাও নাহি।
পূজা অর্চনা যা কিছু করেছি সবই শুধু "দেহি" "দেহি"!
রূপ, যশ, ধন, জ্ঞান ও বুদ্ধি,
সুত-পরিবার-বিভব বৃদ্ধি,—
এ ছাড়া চাওয়ার আর কিছু ছিল, মানে নাই মোর মরমে।
আজি এ শরতে চিত্তে আমার নব জাগরণী বাজিছে;
বিলীন শ্রুতির বুকেতে দীপ্ত স্মৃতির আলোক লাগিছে!
ভাঙিছে স্বপন জাগরণী গানে,
স্থূল তনু মিশে মূল উপাদানে;
একক বাসনা বিশ্বজনার হয়ে আজি মিলে পরমে!
'দেহি'-হারা মন অর্ঘ্য সাজায়ে সঁপিছে জীবন-মরণে!

গান

শ্রীরবি গুপ্ত

কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি,
আকাশ-ঝরা আলোর স্রোতে জাগে অমল শিহর তুলি'।
বাঁধন ভাঙে পলে পলে
তোরি পরশ-সোনায় জ্বলে,
আঁধার-ঢাকা আকাঙ্ক্ষা তার রূপ নিল যে ঊষায় ভুলি',
কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি।
বর্ণে যে তার লাগল প্রথম উদয়-বেলার স্বর্ণ-আভা,
চাঁদের বাঁশি মুক্ত প্রাণের গন্ধনিবিড় ছন্দে কাঁপা।
প্রতিক্ষণের নীরবতা
পায় গহনে কোন বারতা,
কোন অসীমের স্বপ্নদুয়ার মর্ত-ধুলায় যায় যে খুলি',
কোন সুরে তোর ফোটাস মাগো মলিন মাটির মুকুলগুলি।

শ্রীচৈতন্য-প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবত-জ্যোতিঃশাস্ত্রী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নবদ্বীপে গিয়া শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর যে অপূর্ব প্রকাশ দেখিয়াছিলেন ভক্তগণের নিকটে তাহাই বলিতেছেন :—

শ্রীচৈতন্যদেব অবতার

"আমারও তখন তখন ঐরকম মনে হত যে, চৈতন্য আবার অবতার। ন্যাড়া নেড়িরা টেনে বুনে একটা বানিয়েছে আর কি!—কিছুতেই ওকথা বিশ্বাস হত না। মথুরের সঙ্গে নবদ্বীপ গেলুম। ভাবলুম, যদি অবতারই হয় ত সেখানে কিছু না কিছু প্রকাশ থাকবে, দেখলে বুঝতে পারব। একটু প্রকাশ দেখবার জন্য এখানে ওখানে বড় গোঁসাইয়ের বাড়ী, ছোট গোঁসাইয়ের বাড়ী, ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখে বেড়ালুম - কোথাও কিছু দেখ্তে পেলুম না! সব জায়গাতেই এক এক কাঠের মুরদ হাত তুলে খাড়া হয়ে রয়েছে দেখলুম। দেখে প্রাণটা খারাপ হয়ে গেল! ভাবলুম কেনই বা এখানে এলুম। তারপর ফিরে আসব বলে নৌকায় উঠছি এমন সময়ে দেখতে পেলুম!

অদ্ভুত দর্শন। দুটি সুন্দর ছেলে—এমন রূপ কখনও দেখিনি, তপ্ত কাঞ্চনের মত রং, কিশোর বয়স, মাথায় একটা করে জ্যোতির মণ্ডল, হাত তুলে আমার দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আকাশ-পথ দিয়ে ছুটে আসছে। আমি ঐ এলোরে এলোরে বলে চেঁচিয়ে উঠলুম। ঐ কথাগুলি বলতে না বলতে তারা নিকটে এসে (নিজের শরীর দেখাইয়া) এর ভিতর ঢুকে গেল, আর বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। জলেই পড়তুম, হৃদে নিকটে ছিল ধরে ফেল্লে। এই রকম এই রকম ঢের সব দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলে বাস্তবিকই অবতার।"

এইরূপে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তগণকে উপদেশ-দানকালে নানাপ্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যদেবের কথা পুনঃ পুনঃ বহুবার বলিয়াছেন। এখানে কয়েকটি উল্লিখিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের হরিনাম প্রচার

"যিনি পাপ হরণ করেন তিনিই হরি। হরি ত্রিতাপ হরণ করেন। চৈতন্যদেব হরিনাম প্রচার করেছিলেন—অতএব ভাল। দ্যাখ চৈতন্যদেব কত বড় পণ্ডিত—আর তিনি অবতার। তিনি যে কালে এই নাম প্রচার করেছিলেন এ অবশ্য ভাল।"

"সংসারী লোকদের যদি বল যে সব ত্যাগ করে ঈশ্বরের পাদপদ্মে মগ্ন হও, তা তারা কখনও শুনবে না। তাই বিষয়ী লোকদের টানবার জন্য গৌর নিতাই দুই ভাই মিলে পরামর্শ করে এই ব্যবস্থা করেছিলেন—

মাগুর মাছের ঝোল
যুবতী মেয়ের কোল,
বোল হরি বোল।

প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল বলতে যেতো। হরিনাম সুধার একটু আস্বাদ পেলে বুঝতে পারতো যে, 'মাগুর মাছের ঝোল' আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে যে অশ্রু পড়ে তাই, 'যুবতী মেয়ে', কিনা—পৃথিবী। যুবতী মেয়ের কোল কিনা—ধূলায় হরিপ্রেমে গড়াগড়ি। নিতাই কোনরকমে হরিনাম করিয়ে নিতেন। চৈতন্যদেব বলেছিলেন, ঈশ্বরের নামে ভারি মাহাত্ম্য।

শীঘ্র ফল না হতে পারে কিন্তু কখনও না কখনও এর ফল হবেই হবে। কেউ বাড়ীর কার্ণিসের উপর বীজ রেখে গিয়েছিল, অনেক দিন পরে বাড়ী ভূমিসাৎ হয়ে গেল, তখনও সেই বীজ মাটিতে পড়ে গাছ হল ও তার ফলও হল। যাদের ভোগ বাকী আছে তারা সংসারে থেকেই ডাকবে।"

গৌর নিতাইএর আচণ্ডালে কৃপা

"গৌর নিতাই হরিনাম দিয়ে আচণ্ডালে কোল দিলেন। এই এক উপায়ে জাতিভেদ উঠে যেতে পারে। এই উপায় ভক্তি। ভক্তের জাতি নাই। ভক্তি হলেই দেহ, মন, আত্মা সব শুদ্ধ হয়। ভক্তি না থাকলে ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নয়, ভক্তি থাকলে চণ্ডাল চণ্ডাল নয়।"

শ্রীচৈতন্যদেব যবনকুলোদ্ভব শ্রীহরিদাস ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিতেন। সেই লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে—

হরিদাস কহে প্রভু না ছুঁইহ মোরে।
মুঞি নীচ-অস্পৃশ্য পরম পামরে॥
প্রভু কহে তোমা স্পর্শি পবিত্র হইতে।
তোমার পবিত্র ধর্ম নাহিক আমাতে॥
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি সর্ব তীর্থে স্নান।
ক্ষণে ক্ষণে কর তুমি যজ্ঞ তপ দান॥
নিরন্তর কর চারি বেদ অধ্যয়ন।
দ্বিজ ন্যাসী হৈতে তুমি পরম পাবন॥

বিজাতীয় লোকের সঙ্গত্যাগ

"ভবনাথ বল্লে, চৈতন্যদেব বলে গেছেন যে সকলকে ভালবাসবে। ভাল তো বাসবে—সর্বভূতে ঈশ্বর আছেন বোলে। কিন্তু যেখানে দুষ্ট লোক,—সেখানে দূর থেকে প্রণাম করবে। চৈতন্যদেব, তিনিও—'বিজাতীয় লোক দেখে প্রভু করেন ভাব সংবরণ'। শ্রীবাসের বাড়ীতে তাঁর শাশুড়ীকে চুল ধরে বার করা হয়েছিল।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের যে লীলার কথা বলিয়াছেন শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যলীলা, ষোড়শ পরিচ্ছেদে উহা বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

হেনমতে নবদ্বীপে বিশ্বম্ভর রায়।
ভক্ত সঙ্গে সঙ্কীর্তন করয়ে সদায়॥
দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীর্তন।
প্রবেশিতে নারে কেহ ভিন্ন লোকজন॥
একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী।
ঘরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস শাশুড়ী॥
ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে।
ডোল মুড়ি দিয়া আছে ঘরের এক কোণে॥
লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই।
অল্পভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই॥
নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘনে।
"উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণে॥"
সর্বভূত অন্তর্যামী জানেন সকল।
জানিয়াও না কহেন, করে কুতূহল॥
পুনঃ পুনঃ নাচি বলে "সুখ নাহি পাই।
কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন ঠাই॥"

* * *

মহাত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ।
"আমা সবা বিনা আর নাহি কোনো জন॥
আমরাই কোনো বা করিল অপরাধ।
অতএব প্রভুচিত্তে না পায় প্রসাদ॥"
আর বার ঠাকুর পণ্ডিত ঘরে গিয়া।
দেখে নিজ শাশুড়ী আছয়ে লুকাইয়া॥
কৃষ্ণাবেশে মহামত্ত ঠাকুর পণ্ডিত।
যার বাহ্য নাহি, তার কিসের গর্বিত॥
বিশেষে প্রভুর বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি করিলা বাহির॥
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লসিত বিশ্বম্ভর নাচে ততক্ষণে॥
প্রভু বলে—"এবে চিত্তে বাসিয়ে উল্লাস
হাসিয়া কীর্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মাতৃভক্তি

"চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বল্লেন,—'মা! আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।'

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের এই উক্তির যথার্থতার প্রমাণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের অন্ত্যলীলা, উনবিংশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে—

প্রভুর অত্যন্ত প্রিয় পণ্ডিত জগদানন্দ।
যাঁহার চরিত্রে প্রভু পায়েন আনন্দ॥
প্রতি বৎসর প্রভু তাঁরে পাঠান নদীয়াতে।
বিচ্ছেদ দুঃখিত জানি জননী আশ্বাসিতে॥
"নদীয়া চলহ মাতাকে কহিও নমস্কার।
আমার নামে পাদপদ্ম ধরিহ তাঁহার॥
কহিও তাঁহাকে তুমি করহ স্মরণ।
নিত্য আসি আমি তোমার বন্দিয়ে চরণ॥
যেদিন তোমার ইচ্ছা করাইতে ভোজন।
সেদিনে অবশ্য আমি করিয়ে ভক্ষণ॥
তোমার সেবা ছাড়ি আমি করিয়াছি সন্ন্যাস।
বাউল হইয়া আমি কৈল ধর্ম নাশ॥
এই অপরাধ তুমি না লইও আমার।
তোমার অধীন আমি পুত্র সে তোমার॥
নীলাচলে আছি আমি তোমার আজ্ঞাতে।
যাবৎ জীব তাবৎ আমি নারিব ছাড়িতে॥

* * * *

মাতৃভক্তগণের প্রভু হন শিরোমণি।
সন্ন্যাস করেন সদা সেবেন জননী॥

শ্রীচৈতন্যদেব নিজ জননীর সন্তোষের নিমিত্ত নীলাচলে অবস্থান-কালে নবদ্বীপে আবির্ভূত হইয়া জননীর দত্ত দ্রব্য ভোজন করিতেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয় পার্ষদ দামোদরকে নিজ জননীর সেবা করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপে পাঠাইবার সময়ে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন,—তুমি জননীকে আমার কোটি নমস্কার দিয়া কহিয়ো যে, তাঁহাকে আমার কথা শুনাইবার জন্য তোমাকে তাঁহার নিকট আমিই পাঠাইয়াছি। আর একটি গুহ্য কথা জননীকে স্মরণ করাইয়া দিও। মাঘ-সংক্রান্তিতে তিনি নানা ব্যঞ্জন এবং মিষ্টান্নাদি রাধিয়া যখন শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ দিবার জন্য তাঁহার ধ্যান করিতেছিলেন তখন অকস্মাৎ আমাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার চোখে জল আসিয়াছিল। আমি সেই সময় তথায় (সূক্ষ্মে) উপস্থিত হইয়া সেই সব দ্রব্য আহার করিয়াছিলাম। তিনিও (ভাবে) দেখিলেন নিমাই খাইতেছে—পাতও শূন্য; কিন্তু পুনরায় বাহ্যদশায় ফিরিয়া ঐ দর্শনকে ভ্রান্তিজ্ঞান করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ভাবের উদ্দীপন

"শুনিস্ নি—এই মাটিতে খোল হয় বলে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যে উপদেশ দিয়াছেন ইহার তাৎপর্য এই যে—ভক্তের ভগবদ্ভক্তি সম্বন্ধীয় উদ্দীপন যাহাতে হয় তাহাকে উদ্দীপন বিভাব বলে। ভক্ত হৃদয়ে ভগবৎ প্রেম বিভাবের দ্বারা উদ্দীপিত হয়। বিভাব দুই প্রকার, আলম্বন বিভাব ও উদ্দীপন বিভাব। আলম্বন বিভাব আবার দুই প্রকার, বিষয়ালম্বন এবং আশ্রয়ালম্বন। ভগবান অর্থাৎ যাঁহার প্রতি প্রেম তিনিই প্রেমের বিষয় অতএব বিষয়ালম্বন। আর যাহা দেখিয়া বা শুনিয়া ভগবানকে স্মরণ হয় তাহাই উদ্দীপন বিভাব। এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজাইয়া শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন হয়, মাটি দেখিয়া প্রেমের বিষয়ালম্বন শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ হওয়াতে শ্রীচৈতন্যদেব ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহাই ঠাকুরের উপদেশের মর্ম। এই প্রসঙ্গে ঠাকুর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন যে, বিভীষণ মানুষ দেখিয়া—আহা এটি আমার রামচন্দ্রের ন্যায় মূর্তি, সেই নররূপ—এই বলে আনন্দে বিভোর হয়েছিলেন, আর সেই মানুষটিকে উত্তম বসনভূষণ পরিয়ে পূজা আরতি করেছিলেন। এই বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—যাহার গুরুভক্তি হয় তাহার গুরুর আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখলে, তো ঐরূপ গুরুর উদ্দীপন হবেই—যে গ্রামে গুরুর বাড়ী সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে—পায়ের ধুলো নেয়, খাওয়াই দাওয়াই সেবা করে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীমা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম-এস্-সি, বি-টি

বৃন্দাবন, মধু বৃন্দাবন !

নন্দপুরচন্দ্র বিনা আজ সে বৃন্দাবন অন্ধকার। তবুও ভক্ত-প্রেমিকের কাছে কৃষ্ণচন্দ্রের পদধূলি-পূত প্রাণের তীর্থ সে বৃন্দাবন। রাধিকার অশ্রু-সিক্ত, চিরন্তন রস-রাসভূমি সে বৃন্দাবন।

সেথায়—

'চেতন যমুনা, চেতন রেণু
গহন কুঞ্জবন, ব্যাপিত বেনু।'

সেথায়—

'উজোর শশধর দীপ পজারল
অলিকুল ঘাঘর বোল।
হনয়িতে হরিণী নয়নি দরশায়ই
ওহি, ওহি পিকু বোল।'

সেখানে স্বতঃ ওঠে ধ্বনি,—

'জয় বৃন্দাবন জয় নরলীলা,
জয় গোবর্ধন, চেতন-শিলা
নারায়ণ, নারায়ণ, নারায়ণ।'

সেখানে, আকাশে কান পাতলে এখনো শোনা যায় অপূর্ব সঙ্গীত, প্রাণ-মাতান করুণ মুরলীনিনাদ, যার আহ্বানে ব্রজগোপীরা একদিন গৃহ ছেড়ে পথে বেরিয়েছিল, যমুনা প্রবাহিত হয়েছিল উজান স্রোতে।—

শ্যামকুঞ্জ রাধাকুঞ্জ গিরি গোবর্ধন,
মধুর মধুর বংশী বাজে সেই সে বৃন্দাবন।

দুঃসহ বিরহজ্বালার উপশান্তির জন্য বঙ্গদেশ ত্যাগ করে বঙ্গাব্দ ১২৯৩ এর ভাদ্র মাসের ১৫ই তারিখ,—সে পরমতীর্থভূমির উদ্দেশ্যেই যাত্রা করেছিলেন মা। সঙ্গের সাথী স্বামী যোগানন্দ, অভেদানন্দ ও লাটু মহারাজ। সঙ্গের সাথী গোলাপ-মা, লক্ষ্মীমণি ও মাষ্টার মহাশয়ের পত্নী দেবী নিকুঞ্জবালা।

পথে দেওঘরে, পথে কাশীধামে অল্প কয়েক-দিনের জন্য বাস করেছিলেন মা—দেবদর্শন মানসে, তীর্থদর্শন মানসে। তারপরই সোজা বৃন্দাবন, শ্রীচৈতন্যের প্রেমগীতি-মুখরিত বৃন্দাবন। প্রথমা-বধিই মায়ের কাছে বড় ভাল লেগেছিল সে-পুণ্যধাম। কত হরিনাম তার পথে পথে, কত অবিশ্রাম নামকীর্তন তার মন্দিরে মন্দিরে। মা এ-স্থানকে তাঁর সাধনক্ষেত্র বলেই যেন গ্রহণ করেছিলেন।

অবশ্য বিবিধ কারণ-পরম্পরায় বৃন্দাবনে খুব বেশীদিন তাঁর বাস করা হয় নি। শুধু সম্বৎসর কালের জন্য তাঁকে আমরা দেখ্‌তে পাই সেখানে। দেখ্‌তে পাই, বিরহ-ক্লিষ্টা ব্রতচারিণীর বেশে, নিঃসঙ্গ তপস্বিনীর বেশে। দেখ্‌তে পাই, কখনো দীনহীন কাঙালিনীর মত ইষ্টের মুখ চেয়ে তিনি প্রতীক্ষমাণা, কখনো অজ্ঞাত-পরিচয় অতি-সাধারণ তীর্থযাত্রীর মত পায়ে হেঁটে হেঁটে ব্রজমণ্ডল করছেন পরিক্রমা। আবার কখনো নিঃসঙ্গ অবস্থায় ধ্যানজপে একেবারে নিবিষ্টা, একেবারে সম্বিৎ-হারা। বস্তুত, মায়ের 'সাধনকাল' বলে কোন সময়কে যদি একান্তভাবে চিহ্নিত করতে হয় তবে সে এই বৃন্দাবনের জীবন, আর এর অব্যবহিত পরবর্তীকালের কামারপুকুরের জীবন।

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতকালে যে জীবন যাপিত হয়েছিল সেও অবশ্য মায়ের

তপস্যারই জীবন ছিল, শিক্ষারই জীবন ছিল। সেখানকার দৈনন্দিন বিবিধ কর্মব্যস্ততার অন্তরালেও তৈলধারাবৎ মায়ের ধ্যানপ্রবাহই সর্বদা অব্যাহত থাকত। কখনো অন্যথা হত না। তথাপি, সে সাধনজীবনের সঙ্গে বৃন্দাবনের সাধনজীবনের কোন তুলনা হয় না। দু'জীবনের অবস্থা স্বতন্ত্র, পরিবেশ স্বতন্ত্র—উদ্দেশ্য-অভিলাষও বোধ করি অনেকাংশে স্বতন্ত্র ছিল।

দক্ষিণেশ্বরের দিনগুলিতে জীবনদেবতার প্রত্যক্ষ, জীবন্ত উপস্থিতি ছিল সম্মুখে। সে-উপস্থিতি অন্তরকে সর্বক্ষণ কানায় কানায় রাখত ভরে। তখন জীবন মনে হত শুধু মধুময়, আনন্দময়। অনাগত যে-ভাবীকাল তাও যেন শত বিচিত্র কল্পনার উচ্ছলতায় ছিল রঙীন্। কিন্তু এখন? এখন অন্তরে-বাহিরে শুধু নিবিড় হাহাকার, সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত কেবল অন্ধকার, নিরন্ধ্র অন্ধকার!

একে তো শ্রীরামকৃষ্ণের অদর্শনই মায়ের জীবনে এক মর্মান্তিক বিপর্যয়। তদুপরি, মৃত্যু, 'মহীয়সী যে মৃত্যুমাতা'—তার সঙ্গেও মায়ের সেই প্রথম প্রত্যক্ষ পরিচয়। যে পরিচয়ে ধর্মের গভীর জিজ্ঞাসা উত্থিত হয় সাধকের মনে, যে-পরিচয়ে স্মরণাতীত যুগে একদা সৃষ্ট হয়েছিল ভাগবত, সৃষ্ট হয়েছিল গীতা, নচিকেতা-মুখে উত্থিত হয়েছিল প্রশ্ন,…

'যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াঽহং—' ইত্যাদি।

ঠিক সেই পরিচয়। কাজেই নিঃসঙ্গ নিরালম্ব জীবনে সাধনসমুদ্রের অতল গভীরে একেবারে ডুবে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা ছাড়া এ-কালে আর কোন আকাঙ্ক্ষা ছিল না মায়ের জীবনে। এখন ভক্ত-সংসারের কোন কাজ নেই হাতে, শ্রীরামকৃষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবা-পরিচর্যাও ইহজন্মের মত শেষ হয়ে গেছে। অখণ্ড অবসর সম্মুখে। কাজেই বৃন্দাবনে মায়ের সমগ্র অন্তর কেন্দ্রীভূত হয়েছিল শুধু একটি প্রয়াসে, একটি অখণ্ড, অকুতোভয় প্রয়াসে—'সব ছোড়্ সব পাওয়ে'। সমগ্র মন-প্রাণ নিবিষ্ট হয়েছিল শুধু একটি কামনায়, একটি উদগ্র, উৎকণ্ঠ কামনায়—যিনি সর্বদা সর্বহিতে রত তাঁকে লাভ করব, তাঁতে নিবিষ্ট হয়ে ভুলে যাব সংসার, ভুলে যাব বিরহবেদনা, ভুলে যাব দেহজ্ঞান। একটি হবে বোল্—সে-বোল, হরিবোল। একটি হবে ব্রত, সে ব্রত পরমপুরুষের শাশ্বত নির্দেশ পালনে—

'মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।'

তাই বৃন্দাবনে মায়ের যে দৈনন্দিন কার্যসূচী, সেও অনেকাংশে দক্ষিণেশ্বরের কার্যসূচী থেকে স্বতন্ত্র ছিল। আহার-নিদ্রার একান্ত অপরিহার্যতায় যে সময়টুকু অতিবাহিত হত সেটুকু ছাড়া দিনরাত্রির সমস্তক্ষণ ব্যয়িত হত একই ভাবে—ধ্যানে, জপে; ভাবে, সমাধিতে; দর্শনে, পরিক্রমায়।

দূরে যমুনাপুলিনে সহসা হয়ত কখনো বেজে ওঠে বাঁশী, যেমন বেজে উঠত একদিন, কোন্ দূর অতীত দিবসে,—যা শুনে ব্রজগোপীরা গৃহ ছেড়ে বেরিয়ে যেত, যমুনার কাল জল উজান-স্রোতে বইতে সুরু করত,—সেই বাঁশী। আর বিরহব্যাকুলা, প্রেম-উন্মাদিনী শ্রীসারদা বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ছুটে যেত সেই ধ্বনি লক্ষ্য করে। খুঁজতে খুঁজতে অনেক বিলম্বে বিজন বাপীতটে সঙ্গীরা তাঁকে দেখতে পেত ভাব-বিহ্বল, প্রেম-বিহ্বল অবস্থায়।

কখনো দেখা যায়, নিধুবনের কাছে রাধা-রমণের যে মন্দিরটি, সে-মন্দিরের বিগ্রহের সম্মুখে করজোড়ে প্রহরের পর প্রহর একইভাবে মা দাঁড়িয়ে। অথবা, গোবিন্দজীর মন্দিরের একটি পার্শ্বে কিংবা কালাবাবুর কুঞ্জের একটি কোণে

গভীর সমাধিতে সম্পূর্ণ নিমগ্ন হয়ে ধ্যানাসনে তিনি উপবিষ্ট। অনেক রাত্রে সঙ্গীরা এসে কর্ণমূলে মন্ত্রোচ্চারণ করতে করতে ধীরে ধীরে বাস্তবজগতের সজীবতায় তাঁকে ফিরিয়ে আনে।

এমনি করে কেটে যায় কত দিন, কত সপ্তাহ; বিনিদ্র রজনীর কত দীর্ঘ প্রহর। তারপর ধীরে ধীরে অরুণাভায় পূর্ব দিগন্ত রঞ্জিত হতে শুরু করে, শূন্য হৃদয় আনন্দ-নির্ঝরে উঠতে থাকে ভরে। খর উত্তাপের মহাশূন্যতাকে পূর্ণ করে, প্লাবিত করে জাগ্রত হয় মৌসুমী বায়ুর অনন্ত প্রবাহ, অনুভূত হয় সে প্রবাহের সরস, শীতল সঞ্চালন।

নানাভাবে, নানা মূর্তিতে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিয়ে, কথা কয়ে, নির্দেশ দান করে—ঠাকুর তাঁর সকল বিরহজ্বালা দূর করে দিতে শুরু করেন।

একদা দক্ষিণেশ্বরের প্রথম জীবনে যে আনন্দের পূর্ণ ঘটটি নিয়ত অন্তরে প্রতিষ্ঠিত বলে অনুভব করতেন মা, আবার যাকে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিহনে একেবারে শুষ্ক, শূন্য দেখে দেহধারণই দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল তাঁর পক্ষে, আজ আবার কতদিন পরে সেই ঘটটি শনৈঃ শনৈঃ রসে, অমৃতে পূর্ণ হয়ে উঠতে শুরু করে। বাতাস আবার মধুময় বলে মনে হয়। আকাশে আবার ধ্বনিত হয় আনন্দসঙ্গীত—

'যে বিরাট গূঢ় অনুভবে
রজনীর অঙ্গুলিতে অক্ষমালা ফিরিছে নীরবে
আলোক বন্দনা মন্ত্র জপে'—

তারই সঘন স্পন্দন সুস্পষ্ট অনুভূত হয় অন্তরে।

যিনি রসস্বরূপ, রসময়,—রসো বৈ সঃ বলে শাস্ত্রমুখে যাঁর পরিচয়, তিনি অন্তরে আসন গ্রহণ করলে বিরহ নীরসতা আর কেমন করে থাকে? এক দর্শনের সূত্র ধরে আসে আর এক দর্শন, এক অনুভূতিকে পূর্ণতর করে আসে দ্বিতীয় অনুভূতি। ক্রমে সাধন-জীবনের অবসান সূচনা করে অপ্রত্যাশিত নির্দেশ আসতে থাকে সম্মুখে, ভাবী কালের চিত্র উন্মোচিত হতে থাকে শনৈঃ শনৈঃ। মা দেখতে পান, প্রায়ই দেখতে পান ঠাকুরের ইঙ্গিত, শুনতে পান তাঁর আদেশ। বিশেষ করে একদিন।—

সেদিন, ধ্যানশেষে কতকটা আবিষ্টভাবেই আসনে বসে ছিলেন শ্রীমা। অকস্মাৎ যেন ঠাকুরের কণ্ঠধ্বনি ভেসে এল বাতাসে। মা শুনতে পেলেন তাঁর কথা,—'দীক্ষা দাও তুমি।'

দীক্ষা দাও! সে আবার কী নির্দেশ! মা বিশ্বাস করতে পারলেন না। প্রথমটায় মাথার খেয়াল বলে, দৃষ্টির ভ্রম বলে সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করতেই চাইলেন। কিন্তু অগ্রাহ্য করা চলল না শেষ পর্যন্ত। ক্রমান্বয়ে তিনদিন একই নির্দেশ পেয়ে মাকে অবহিত হতে হল। যখন পর পর তিনদিনই প্রত্যক্ষ করলেন একই দৃশ্য—সাক্ষাৎ সম্মুখে এসে সুস্পষ্ট ভাষায় একই কথা বলছেন ঠাকুর,—দীক্ষা দাও তুমি, তোমার মহতী গুরুশক্তির অভয়-আশ্রয়ে আর্ত ও জিজ্ঞাসু নরনারী পরমাশ্রয় লাভ করুক;—তখন আর মাথার খেয়াল বলে তাকে উড়িয়ে দিতে পারলেন না তিনি। আনুষ্ঠানিকভাবে বৃন্দাবনের পরমতীর্থে জীবনে প্রথম মন্ত্রদীক্ষা দান করলেন মা।

তাঁর অন্তরঙ্গ সন্তান, তাঁর প্রথম ও অন্যতম প্রধান সেবক, শ্রীরামকৃষ্ণের পার্শ্বচর যোগানন্দ, ঈশ্বরকোটি যোগানন্দ—সে দীক্ষালাভে ধন্য হলেন, কৃতার্থ হলেন।[১]

কথিত আছে দীক্ষা দিবার সময় ভাবাবিষ্ট হয়ে বিশেষ উচ্চকণ্ঠে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন মা

১। এ-দীক্ষা দানেরও পূর্বে অন্তত একজনকেও যে মা দীক্ষাদানে কৃতার্থ করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবিতকালে সে-কথা তদীয় কোন কোন জীবনীতে উল্লিখিত হয়েছে। দক্ষিণেশ্বরের নহবতগৃহে স্বামী ত্রিগুণাতীতকে অবগুণ্ঠনাবৃত থেকেই যে মা দীক্ষা দিয়েছিলেন, সে সব গ্রন্থে এ-কথা বলা হয়েছে।

এবং পাশের ঘরে যারা ছিল তারাও শুনতে পেয়েছিল সে মন্ত্র।

উত্তর জীবনে যে অগণ্য নরনারী মায়ের দিব্য গুরুশক্তির অভয় আশ্রয়লাভে কৃতার্থ হয়েছিল, উদ্বুদ্ধ হয়েছিল—ব্রজধামের পুণ্যক্ষেত্রে এই ভাবেই ঘটেছিল তার শুভ উদ্বোধন, তার জয়-যাত্রার প্রথম সূত্রপাত।

বস্তুতঃ, বৃন্দাবন থেকে দীর্ঘ এক বৎসর পরে ফিরে এসে কামারপুকুরের একান্ত বিজনতায় আরও অনেকগুলি দিন আপনভাবে যাপন করলেও দেবী সারদামণির জীবনের বিরাট রূপান্তর, গুরুশক্তির ব্যাপক প্রকাশ যে ঐকাল থেকেই আরম্ভ হয়েছিল—সেকথা পরবর্তী ঘটনাসমূহ থেকে সহজেই বুঝতে পারা যায়।

দেখা যায়, কি বৃন্দাবনের শেষদিকে, কি কামারপুকুরের নির্জনতায়—মায়ের ধ্যানচিন্তা ও প্রার্থনা-নিবেদন ঐকাল থেকে আর তাঁর নিজ জীবনের পরিধিমধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে পারেনি। অবশ্য পূর্বেও সেটা ছিল না। তবু, এখন থেকে তাদের বিশ্ববিস্তৃতির পথে নিঃশব্দ পদসঞ্চার যেন বিশেষভাবেই চোখে পড়ে। স্পষ্টই যেন দেখা যায়, পরিচিত নরনারী ও পরিচিত দেশকালের স্বাভাবিক গণ্ডী স্বতঃ অতিক্রম করে তাঁর চিন্তা ও আকূতি—সর্বলোক, সর্বকাল ও সর্বদেশের চিরন্তন কল্যাণে এখন থেকে নিয়োজিত হতে চলেছে।

জ্ঞাত ও অজ্ঞাত, স্বধর্মী ও বিধর্মী—সকলের জন্য—অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত অব্যাহত অদৃশ্যধারায় নিত্য উৎসারিত হতে শুরু করেছে তাঁর অমোঘ প্রার্থনা ও নিবেদন। কল্যাণ হোক সকলের, আধিহীন, ব্যাধিহীন হোক জীবধাত্রী বসুধা—

কালে বর্ষতু পর্জন্যঃ পৃথিবী শস্যশালিনী
দেশোঽয়ং ক্ষোভরহিতঃ লোকাঃ সন্তু নিরাময়াঃ।

ইতিমধ্যে সম্বৎসর অতীত হয়ে গেল। পরিপূর্ণ অন্তরে বিশ্বমাতৃত্বের এক উদ্বেল অনুভূতি নিয়ে বৃন্দাবন থেকে ফিরে এলেন মা বাংলায়। ফিরে এলেন রামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মভূমি, এ-যুগের নবতীর্থ কামারপুকুরে।

ভারতীয় জীবনদর্শন ও দুর্গাপূজা

অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্‌-এ, পি এইচ-ডি

সমগ্রতা বা অখণ্ডতা-বোধই ভারতীয় জীবন-দর্শনের মূলগত বৈশিষ্ট্য। উহাই তাহার শ্রেষ্ঠ মহিমা, এক আশ্চর্য অতুলনীয় মহিমা। পরিপূর্ণতা-বোধ বা ভূমাবোধ, উহারই নামান্তর। উহাই বহুর মধ্যে ঐক্যের যোগদৃষ্টি; নানা বৈচিত্র্য ও বিরোধের মধ্যে সমন্বয়ের এবং স্থিতি ও গতিতত্ত্বের মধ্যে সামঞ্জস্যের সৃষ্টিও উহা হইতেই।

যাহাদের শ্রেষ্ঠ অধ্যাত্মশাস্ত্র বলেন, ব্রহ্মবাণী হইতেছে—এক আমি, বহু হইতেছি,[১] বহুর মধ্যে এককে উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান পূর্ণ হইবে কি করিয়া? ঋষি বলেন,—এই দৃশ্যমান জগৎ সকলই ব্রহ্ম,—'তজ্জলান'; তাহা হইতে জাত, তাহাতেই জীবিত এবং

১ তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি।
—ছান্দোগ্য উপনিষৎ—৬।২।৩

তাহাতেই লীন হইতেছে।[২] ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তরূপ[৩];—অজস্র তাহার অভিব্যক্তি, রূপে রসে গন্ধে শব্দে, লোকে লোকে বিচিত্র প্রাণস্পন্দনে, সুখ-দুঃখ জীবনমৃত্যুর বিপরীত দ্বন্দ্বলীলায় অপরূপ অপরিমেয় অনন্ত তাহার প্রকাশ। এই প্রকাশকে অদ্বয় বৈদান্তিকের মায়াই বলুন, আর ভক্তবৈষ্ণবের লীলাই বলুন, ইহা অনন্ত—অনন্ত। আর মায়া বা লীলা ভক্ত জ্ঞানীর দৃষ্টিতে এক বস্তুরই এপিঠ বা ওপিঠ নয় কি? অদ্বয় সচ্চিদানন্দের সহিত এই দৃশ্যমান জগতের সমন্বয় অন্য কিরূপেই বা সম্ভবপর?

তাই সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে উপনিষৎ বলেন, এই সমগ্র দৃষ্টি বা সম্যগ্‌দৃষ্টি অত্যাবশ্যক। অবিদ্যার যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহারা অন্ধতমসে প্রবেশ করেন, অবিদ্যা বর্জন করিয়া যাঁহারা কেবল বিদ্যার আরাধনা করেম, তাঁহারা গভীরতর অন্ধতমসে প্রবেশ করেন। যাঁহারা বিদ্যা ও অবিদ্যা—উভয়কে উপলব্ধি করেন, তাঁহারাই কেবল অবিদ্যা দ্বারা মৃত্যু উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যার সাহায্যে অমৃতলাভে সমর্থ হ'ন।[৪] যিনি সকল জীবকে আত্মার মধ্যে দর্শন করেন এবং সকল জীবের মধ্যে দর্শন করেন আত্মাকে, তিনিই ঘৃণা, নিন্দা ও ভয়ের অতীত সত্যিকার দ্রষ্টা![৫]

ভারতীয় বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, সাহিত্য, এমন কি নৃত্য, গীত, চিত্র এবং মূর্তিশিল্পের মধ্যেও ভারতীয় জীবনদর্শনের এই পরম বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়িয়াছে। প্রাচীন কালের ন্যায় আধুনিক কালের শ্রেষ্ঠ ভারতীয়গণের জীবনেও এই স্বরূপের আশ্চর্য প্রকাশ দেখা যায়।

সমগ্র বেদরাশির কথাই আগে আলোচনা করা যাক্‌। কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড—এই দুই কাণ্ড লইয়া উহা সম্পূর্ণ। জ্ঞানকাণ্ড আবার সম্পূর্ণ ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষৎ—এই তিন ভাগ লইয়া। এক উন্নততর মহত্তর বলিষ্ঠ মানব-সমাজের তেজ বীর্য আনন্দ ও অমৃতের ধর্মে বিরাট সৃষ্টির সঙ্গে জীবনের নিত্য সম্পর্কের মধ্য দিয়া শুরু কর্মসাধনায় যাহার আরম্ভ, পরম-জ্ঞানের সোঽহম্‌-মন্ত্র-সাধনায় তাহার সমাপ্তি। ঋষি কর্ম ও জ্ঞানের সুশোভন সমন্বয়মূর্তিতে নিজ জীবনকে সমাজের আদর্শরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেন। শ্রুতির এই কর্ম ও জ্ঞানের সমন্বয়ই গীতায় কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়ে অপূর্ব ব্রহ্মবিদ্যারূপে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। স্মৃতির যুগে যোগবাশিষ্ঠ স্পষ্ট বলিয়াছেন,—দুই পক্ষ লইয়া আকাশে যেমন পক্ষীগণের গতি সম্ভবপর হয়, সেইরূপ যুগপৎ জ্ঞান ও কর্মের সাধনায় পরমপদ লাভ হইয়া থাকে।[৬]

রামায়ণ-মহাভারতের সমগ্রত্বও এই প্রকার বটে, আবার অন্য প্রকারও বটে। উহা এক বিরাট মহাকাব্যের বিশাল পরিপ্রেক্ষিতে ভারত-বর্ষের ব্যক্তির ও জাতির আদ্যন্ত জীবনদর্শন। উহা গ্রীক্‌ ইলিয়ড মহাকাব্যের ন্যায় কেবল যুদ্ধ-প্রধান নয়; সে তো রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড অথবা মহাভারতের ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-শল্যপর্ব। যাঁহারা ইলিয়ড কাব্যকে রামায়ণ-মহাভারতের সহিত কেবল কাব্যাংশে নয়, সর্বাংশে তুলিত করিতে

২ সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত।—ছান্দোগ্য

৩ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম।—তৈত্তিরীয়

৪ অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥
বিদ্যাং চাবিদ্যাঞ্চ যস্তদ্ বেদোভয়ং সহ।
অবিদ্যয়া মৃত্যুং তীর্ত্বা বিদ্যয়াঽমৃতমশ্নুতে।
—ঈশাবাস্য

৫ যস্তু সর্বাণি ভূতানি আত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।—ঈশাবাস্য

৬ উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং যথা খে পক্ষিণাং গতিঃ।
তথৈব জ্ঞানকর্মাভ্যাং জায়তে পরমং পদম্॥

চাহিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। এই দুই বৃহৎ মহাকাব্যে আমরা পাই,—বংশাবলীর মহত্ত্বময় ঐতিহ্য বর্ণনা হইতে আরম্ভ করিয়া আদিপর্ব, ক্রমে যুদ্ধপর্ব শান্তিপর্ব অতিক্রম করিয়া মহাপ্রস্থান ও স্বর্গারোহণ পর্ব পর্যন্ত জন্ম, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব ও চরম পরিণামের বিরোধ ও শান্তির বিচিত্র লীলাময় শাশ্বত মানবজীবনের এক অখণ্ড ইতিহাস।

ভারতীয় সাহিত্যে মহাকবি কালিদাসের কাব্য ও নাটকে এই একই জীবনদর্শনের পূর্ণ প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। অননুকরণীয় ভঙ্গীতে ভক্তিবিমুগ্ধ চিত্তে রবীন্দ্রনাথ তাহা ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়াছেন।[৭] শকুন্তলায় শেষ অঙ্কে 'বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি।' রবীন্দ্রনাথ শকুন্তলা-নাটককে বলিয়াছেন, —একসঙ্গে একটি Paradise Lost এবং Paradise Regained। গেটে বলিয়াছেন শকুন্তলায় 'তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল এবং মর্ত্য ও স্বর্গলোকের একত্র সমাবেশ।' কুমারসম্ভব কাব্যও অনেকটা এইরূপ। রবীন্দ্রনাথ যথার্থ মন্তব্য করিয়াছেন,—"মহাভারতকে যেমন একই কালে কর্ম ও বৈরাগ্যের কাব্য বলা যায়, তেমনি কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগবিরতির কবি বলা যাইতে পারে।" কুমারসম্ভব কাব্যই হইল মদনকে ভস্মীভূত করিয়া কঠোর তপস্যার অন্তে শিব ও শক্তির অচ্ছেদ্য মিলন, মঙ্গল ও সৌন্দর্যের অক্ষয় পরিণয়। বহু শতাব্দী পরে রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীতেও রাধাকৃষ্ণের প্রণয়লীলায় আদ্যন্ত এই সমগ্রতা বা সম্যগ্‌দর্শন উপলব্ধি করা যায়। পূর্বরাগ, অভিসার ও মিলনের পর বিরহে এই লীলার অবসান নহে, মাথুরের পরে দিব্যোন্মাদ ও ভাবসম্মিলনে ইহার চরমোল্লাস ও চিরন্তন বিলাস।

৭। 'প্রাচীন সাহিত্য' দ্রষ্টব্য।

ভারতীয় সাহিত্যে কেন ট্র্যাজিডি নাই, তাহার রহস্যটিও এখানে ধরা পড়িবে। যাঁহারা সুখ ও দুঃখ উভয়কে তুল্য জ্ঞান করিয়াছেন, বলিয়াছেন দুইই আত্মার বন্ধনের কারণ, যাঁহারা নির্লিপ্ত দৃষ্টি লইয়া লাভ-ক্ষতি বা জয়-পরাজয়ের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানেন নাই এবং দেখিয়াছেন সকলের উর্ধ্বে পরম শিব, পরম আনন্দ ও পরম শান্তিকে, তাঁহারা দুঃখকে প্রবলভাবে স্বীকার করিলেও, তাহার বিশেষ মূল্য দিবেন কেন? দুঃখ নয়, পরম মিলন ও পরম আনন্দই তাঁহাদের জীবনদর্শনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সাহিত্যকে তাঁহারা প্রকৃতির দর্পণ মাত্র মনে করেন নাই, অভিনব সমাজ গঠনকল্পে আদর্শনিষ্ঠ বুদ্ধি লইয়া তাঁহারা সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে পরম মঙ্গল ও পরম মিলনকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। এই অখণ্ড সত্য বা পরিপূর্ণ জীবনদর্শনকে ভারতবর্ষ কদাচ বাস্তবসত্যের অতীত বলিয়া অবিশ্বাস করেন নাই। তাই তাঁহাদের কাব্য বা নাট্যে সন্ধিগণনায় পাওয়া যায় বিমর্ষের পরে উপসংহার। সমস্ত খণ্ডতা অখণ্ড পরিণামের মধ্যে স্থির সুষমা লাভ করিয়া অপূর্ব অমৃতরস পরিবেশন করিয়া দেয়।

ভারতবর্ষের চতুরাশ্রম কল্পনার মধ্যেও এই সত্যের স্বীকৃতি রহিয়াছে। সুখের বিষয়, আধুনিক জগতে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উদ্দেশ্যরূপে যে 'Integrated way of Life'-এর কথা বলা হইতেছে, তাহা এই জীবনদর্শনের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ।

ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ পুরুষ শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীরামচন্দ্রের বহুভঙ্গিম জীবনের কথা সকলেরই পরিজ্ঞাত। আর শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলা, মথুরা-লীলা, দ্বারকালীলা ও কুরুক্ষেত্রের লীলার কথা স্মরণ করিলে সে বিরাট মহিমার ক্ষীণ উপলব্ধিতেও স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়। দেবতামণ্ডলীর মধ্যে শিব, আশ্চর্য তাঁহার ভাব ও কল্পনায় সমৃদ্ধি!

কত ঐতিহ্য সেখানে অবিচ্ছেদে মিলিত হইয়া এক হইয়া গিয়াছে। শিবের চাইতে বড় গৃহী কে? শিবের চাইতে বড় সন্ন্যাসী কে? অন্তরের গহন গুহায় নিত্য ধ্যান-লীন থাকিয়াও তিনি তাণ্ডবোন্মত্ত প্রলয়রসিক। নটরাজ, আবার শিব শম্ভু শঙ্কর! আধুনিক কালের রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দ, কিংবা গান্ধীজী—ইঁহাদের চিন্তক্ষেত্র বা কর্মক্ষেত্রের অবাধিত প্রসার কাহার না বিস্ময় উদ্রেক করে!

কলা ও শিল্পের মধ্যে এই স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধে একমাত্র মূর্তি-শিল্প বা উহার পরিকল্পনা লইয়া দু'একটি কথা বলা যাইতে পারে। এই মূর্তি বা প্রতীক বা প্রতিমা আমাদের দৃষ্টিতে পুতুল নহে, ইহা ভাবধৃত ভাব-বিগ্রহ পূজার্হ দেবতা। হর-পার্বতী বা উমা-মহেশ্বর, অর্ধনারীশ্বর, হরিহর, শ্যাম-শ্যামা বা কালীকৃষ্ণ—কতরূপেই এই সমগ্রতা সমন্বয়ের প্রকাশ ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ গৌড়বঙ্গে দেখা গিয়াছে। সীতা-রাম বা রাধা-কৃষ্ণ ঐ একই তত্ত্বের প্রচার করে। আবার সুপ্রাচান কোণার্কের সূর্যমন্দিরে আর এক সমন্বয়ের দৃশ্য। মন্দিরের বহির্গাত্রে ও চক্রাঙ্গে চলমান বিশ্বজগৎ, তরুলতা মানব পশু বিরাট বিশ্বজীবনের প্রচ্ছন্ন ও প্রকাশ সমগ্রলীলা প্রকটিত, অভ্যন্তরে মহাকালের নিয়ামক দেবতা প্রসন্ন মহিমায় শান্ত ও স্থির।

বাঙ্গালী মনীষার পরিকল্পিত দুর্গামূর্তিতে ভারতীয় জীবনদর্শনের সেই পরিপূর্ণ প্রকাশ উপলব্ধি করা যায়। মধ্যে মহাশক্তি দুর্গা দশভূজা দশ দিকে দশ ভুজ প্রসারিত করিয়া বিরাট দেশ ও কালকে পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন; বামে লক্ষ্মী সৌন্দর্য-সৌভাগ্য-সম্পৎ-স্বরূপা; দক্ষিণে বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী সরস্বতী মেধা-স্মৃতি প্রভা-পুষ্টি প্রভৃতি অষ্ট তনু লইয়া দীপ্তি পাইতেছেন; একদিকে বলরূপী দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, অপরদিকে সর্বসিদ্ধিদাতা গণাধিপতি হেরম্ব গণেশ; চরণতলে অমঙ্গলরূপী মহিষাসুর সিংহবীর্যে বিমর্দিত হইতেছে। ইহা মহেশ্বরী মহাশক্তির পরিবৃত অবস্থায় সর্বাত্মক লীলা। তত্ত্বদৃষ্টিতে কিন্তু ইহাও অসম্পূর্ণ লীলা। সম্পূর্ণতার জন্য ঐ দেখুন উর্ধ্বে প্রতিমার পশ্চাদ্পটে সাক্ষাৎ শঙ্কর স্বমহিমায় বিরাজমান। এই শিবাধিষ্ঠিত শক্তিই আমাদের অর্চনীয়। শিবশূন্য শক্তি ভয়ঙ্করী, পাশ্চাত্যে স্বার্থলুব্ধ ঐশ্বর্যগর্বিত মদান্ধ ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহার প্রকাশ দেখিয়া বিশ্ববাসী পুনঃ পুনঃ ভয়বিমূঢ় হইয়াছে। আসুন, আত্মবিস্মৃত জাতি আমরা, আমাদের জীবনদর্শনকে উজ্জীবিত করিয়া শিবাধিষ্ঠিত দুর্গার অর্চনায় এই সঙ্কটক্ষণে পুনরায় ব্রতী হই।

স্বামী প্রেমানন্দ

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

১৯১১ সালের গ্রীষ্মকাল। গঙ্গার পশ্চিম তীরে বেলুড়ে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মঠ। পথ ঘাট কিছু জানা নেই। মঠের কাউকে চিনি না। কয়েকবার বড়দাদার সঙ্গে বাগবাজার শ্রীশ্রীমার বাড়ীতে গিয়েছি এই পর্যন্ত। বেলুড় ষ্টেশনে নেমে পূবমুখো হেঁটে চলেছি। প্রখর রৌদ্রে চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে—পথ জনশূন্য। পথ জিজ্ঞাসা করবার মত লোক পাইনে। অবশেষে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড্ পার হয়ে কতকগুলো কুটিরের মধ্য দিয়ে একটা ইটখোলায় এসে পড়লাম। এইখানে

মঠের হদিশ পাওয়া গেল। উত্তর পশ্চিম কোণের খিড়কীর দরজা দিয়ে বহু মহাপুরুষের সাধনায় পবিত্র শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর পুণ্যতীর্থ বেলুড় মঠে প্রবেশ করলাম। বামে ঠাকুর ঘর রেখে মঠ বাড়ীর পশ্চিমের বারান্দায় উঠে দেখি, একটা লম্বা টেবিলের দু'দিকে দু'খানা বেঞ্চ, পূবদিকের বেঞ্চে পশ্চিমাস্য হয়ে একজন সন্ন্যাসী বসে আছেন। সম্মুখে গিয়ে প্রণাম করতেই "জয় রামকৃষ্ণ" বলে আশীর্বাদ করে পাশে বসালেন। "আহা, এই গরমে ঘেমে নেয়ে উঠেছে"—বলে সস্নেহে হাতের তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করতে লাগলেন। কুণ্ঠায় লজ্জায় আপত্তি করতে পারলাম না। কিছুক্ষণ পর তাঁর আদেশে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। এইবার তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতে লাগলেন। বল্লাম,—কোচবিহারের রাজ-বাড়ী থেকে আসছি, আমি শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের ছোট ভাই।

"শৌর্যেন্দ্র অনেকদিন মঠে আসেনি, কেমন আছে?"

আমি বললাম,—দেশের বাড়ীতে গেছেন।

এমনি সব টুকি-টাকি কথা হচ্ছে, এমন সময় তরুণ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা আসতে লাগলেন। এসে বসলেন স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র নাথ দত্ত। এলো এক বৃহৎ কেটলি চা। তিনি চটা-ওঠা এনামেলের বাটিতে চা ঢেলে নিলেন আর একবাটি আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন,—খোকা চা খাও। তখন আমার যা বয়স তাতে খোকা বলে ডাকলে লজ্জা পাই। হাত বাড়িয়ে বাটিটা নিলাম। সন্ন্যাসী বললেন, ওরা রাজবাড়ীতে থাকে, অমন একটা পেয়ালায় ওকে চা দিচ্ছ! মহেন্দ্র হেসে বল্লেন, দেখ বাবুরাম, এটা যে 'সাধুসন্ন্যাসীর মঠ সেটা জেনেই এসেছে।

ইনিই বাবুরাম মহারাজ! বড়দাদা বৈঠকখানায় ভক্ত-সম্মেলনে এঁর কথা ক শুনেছি। কথামৃতে এঁর সম্বন্ধে ঠাকুর বলেছেন বাবুরামকে 'দেখলাম, দেবীমূর্তি, গলায় হার বিস্ময়ের অন্ত রইল না। মাথায় ঘনকৃষ্ণ চু ছোট করে ছাঁটা, নির্মল ললাটের নীচে ভাবে আবেশভরা উজ্জ্বল দুটি চোখ, সৌম্য মুখমণ্ডলে করুণা ও প্রেমের স্নিগ্ধ দীপ্তি—তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সুঠাম দেহ, পৌরুষের কাঠিন্যবর্জিত সর্বাবয়বে যেন একটা অপার্থিব মাধুর্য। ইনিই স্বামী প্রেমানন্দ। মানুষের মধ্যে ভূমাকে প্রত্যক্ষ করা এক দুর্লভ সৌভাগ্য। সেই মহাসৌভাগ্যের স্মৃতি চিত্তপটে আজো অম্লান হয়ে আছে।

আমার মত একজন সামান্য বালকের প্রতি তাঁর স্নেহ দেখে অভিভূত হলাম। মনে হ'ল আমি রামকৃষ্ণ-ভক্ত-পরিবারের ছেলে বলেই এতটা সমাদর করলেন। তাঁর কথা বলার ভঙ্গী এক জ্বলন্ত বিশ্বাসের প্রত্যয়ে ভরা। এমন অদ্ভুত দেবমানবের সম্মুখে কখনো দাঁড়াইনি। আদর করে প্রসাদ খাওয়ালেন, ঠাকুর ও স্বামিজীর কথা প্রাণের সমস্ত আবেগ ঢেলে বল্‌তে লাগলেন। সকলে তাঁকে ঘিরে সেই অমৃত-মধুর কথা শুনতে লাগলেন। বেলা গড়িয়ে পশ্চিম আকাশ লাল হয়ে উঠ্‌লো। নিজে এসে গঙ্গার ঘাটে নৌকায় তুলে দিলেন। কাঁধের উপর হাত দিয়ে বল্লেন,—মাঝে মাঝে এসো।

বাবুরাম মহারাজের সঙ্গে সেই আমার প্রথম দেখা। তারপর কতদিন কত বর্ষ তাঁকে দেখেছি; অপার তাঁর স্নেহ, অসীম তাঁর করুণা। মনে হয়েছে, এমন মানুষকে ভালবাসা চলে, ভক্তি করা চলে—কিন্তু অনুসরণ করা কঠিন। সমস্ত অন্তর যাঁর সারাক্ষণ সচ্চিদানন্দ সাগরের তরঙ্গে তরঙ্গে অপার্থিব আনন্দরসে ডুবে আছে, এমন মানুষের প্রতি হৃদয়াবেগের দিক দিয়ে আকৃষ্ট হওয়া

সহজ, কিন্তু যুক্তি ও বুদ্ধিদ্বারা তাঁর অন্তর্লীন মহাভাবের পরিমাপ করা কঠিন। ভক্তির পথ আমার পথ নয়, ব্যক্তিবিশেষ ঈশ্বরের প্রতি পঞ্চভাবের অনুরাগ আমার মনে কোনদিনই রেখাপাত করেনি। কিন্তু যাঁর মন-বুদ্ধি শুদ্ধা-ভক্তিতে ভরপুর, যিনি শিশুর মত সরল বিশ্বাসী —তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর কথা শুনবার জন্য সেকালে কেন উতলা হতাম, তার কোন যুক্তিযুক্ত কারণ আজো খুঁজে পাইনি। যাঁরা সর্বভূতে ঈশ্বর দর্শন করেন, হয়তো তাঁরা এমনি ভাবেই সকল শ্রেণীর সকল স্তরের মানুষকে আকর্ষণ করেন।

মঠে যাতায়াত করি। মাঝে মাঝে কয়েকদিন থেকেও যাই। শিক্ষিত সেবাব্রতী সাধু ব্রহ্মচারী অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল। প্রবীণ সাধুরাও স্নেহ করতেন। এই সময় যে সব যুবক ও ছাত্র মঠে যেতেন, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই পরিচয় হল। কলকাতাতেও বিবেকানন্দ সোসাইটি, ও বাগবাজারে মায়ের বাড়ীতে অনেকের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত। পূর্ব থেকে কথাবার্তা বলে আমরা গঙ্গার ঘাটে জমায়েৎ হ'তাম, তারপর নৌকা ভাড়া করে যাত্রা করতাম। সেইসব পরিচিত বন্ধুদের মধ্যে আজ অনেকেই রামকৃষ্ণ-বিবেকা-নন্দের আদর্শ প্রচারের মহাব্রতে যোগ দিয়েছেন, অনেকে দেশসেবা ও রাজনীতিতে বরণীয় হয়েছেন। এই সময় ছাত্র সুভাষচন্দ্রও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গী হত।

এমনিভাবে এক রবিবার আমরা মঠে চলেছি। নানা আলোচনার মধ্যে একজন জিজ্ঞাসা করলেন,—আচ্ছা আমরা মঠে যাই কেন? অমনি উত্তর,—বাবুরাম মহারাজকে দেখতে, তাঁর কথা শুনে শান্তি পেতে। যাদের মন বৈরাগ্য-প্রবণ, যারা ভক্ত, যারা বেদান্তী, যারা রাজ-নৈতিক বিপ্লবী, যাদের সমাজসেবা শিক্ষাপ্রচারের আগ্রহ আছে, এমন নানাভাবের যুবক চলেছে, প্রেমানন্দজীর স্নেহে সকলেই কৃতার্থ। প্রতি শনিবার ও রবিবার প্রায় একশ' যুবক মঠে যেত, এছাড়া গৃহীভক্ত নরনারীদেরও সমাগম কম ছিল না। বাবুরাম মহারাজকে ঘিরে এক এক অপরাহ্নে আমরা আনন্দের হাট জমিয়ে তুলতাম। সহসা কথা বলতে বলতে তিনি উত্তেজিত ভাবে দাঁড়িয়ে পড়তেন। (হয়তো দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরও ত্যাগী যুবকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এমনিভাবে বিচলিত হতেন, এমনিভাবেই হেলে দুলে মহাভাব সম্বরণ করে কথা কইতেন।)—"তোমরা ভাব আমি কেবল ভক্তির কথা বলি! জ্ঞান কর্ম এও চাই। ধর্ম বলতে কেবল তাঁর নাম নিয়ে কাঁদা নয়, ধর্ম মানে কর্ম। স্বামিজী যে নারায়ণজ্ঞানে মানুষের সেবার কথা বলেছেন, তাই হ'ল যুগধর্ম। ওতেও ঈশ্বরেরই সেবা হয়। দুঃখী অজ্ঞ মানুষের তোরা সেবা কর, জ্ঞান দে, বিদ্যা দে, ওদের চোখ খুলে দে, এই বিরাট জাতির সেবায় সমস্ত শক্তি নিয়োজিত কর। শক্তি, শক্তি! কেন নিজেকে দুর্বল ভাবিস? মহান যুগে তোরা জন্মেছিস, স্বামিজী তোদের মানবজীবনের মহোচ্চ ব্রত গ্রহণের জন্য ডাক দিয়েছেন।"—এমনি সব কথা বলতে বলতে তাঁর দিব্যবিভায় মণ্ডিত মুখ এক অপূর্ব বিভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌তো। তখন মনে হত আমরা যেন প্রত্যেকেই অসাধ্য সাধন করবার জন্য জন্মগ্রহণ করেছি।

শ্রীরামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের এক এক জনের মধ্যে এক একটি ভাব বিশেষ পরিস্ফুট ছিল। বাবুরাম মহারাজের ছিল, মাতৃভাব প্রবল। মঠের তিনি জননীস্বরূপা ছিলেন। এতগুলি সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর খাওয়ানোর ভার তাঁর ওপর, এ ছাড়া ভক্তদের প্রসাদ দিতেন। কিন্তু এর

ব্যবস্থা করতে তিনি হিমসিম খেতেন। বাইরের লোকেরা মনে করতো, সন্ন্যাসীরা ভাল খায়। হায়রে ভাল খাওয়া! সকালে জলতোলা, বাগানের কাজ—কায়িক শ্রম কম নয়। জলখাবার মুড়ি, কয়েক টুকরো নারকেল আর একটু গুড়। দুপুরে জোটে একটা তরকারী, ডাল আর টক। এক চামচে দৈ হলে তো খুবই হল। রাতে রুটি, উপকরণ ঐ। রোগীরা একটু দুধ পেতেন। একদিন প্রেমানন্দজী দুঃখ করে বল্‌লেন, গৃহী ভক্তেরা ছুটির দিনে আসে সন্দেশ রসগোল্লা ঠাকুরকে দেবার তরে। যদি আলু, বেগুন, চাল আনিতো! এরা ঠাকুরকে উত্তম সামগ্রী দিতে চায়, ঠাকুরের ছেলেদের ডালভাতের ব্যবস্থা করতে ভুলে যায়। তিনি মঠ থেকে কাউকে অভুক্ত ফিরে যেতে দিতেন না। অর্থকৃচ্ছ্রতা আর মনমত উপকরণের অভাবে মাঝে মাঝে বিমর্ষ হতেন। আবার পরক্ষণেই বলে উঠতেন,—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা, আমি কে? আমি কে, কথাটির মধ্যে তাঁর আমিত্ব যে সসীম-প্রসারিত, তার রেশ আমার মত মূঢ়জনের মনেও বাজতো। তিনি একদিকে যেমন তাঁর গুরুভ্রাতাদের সেবা-যত্নের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন, তেমনি প্রত্যেকের প্রতি তাঁর ছিল সমান মমতা। এক রাতের কথা বলি। পুরাতন মঠবাটির একতলার হল ঘরে তরুণ ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে আমরা শয়নের আয়োজন করছি, এমন সময় দেখি বাবুরাম মহারাজ আলো হাতে দোতলা থেকে নেমে আস্‌ছেন। আমরা কলরব থামিয়ে আদেশের প্রতীক্ষা করতে লাগ্‌লাম। তিনি একজন ব্রহ্মচারীকে ডেকে বল্‌লেন, ওরে সতুকে একটা লেপ দিস, তোদের মোটা কম্বলে ওর কষ্ট হবে। কি স্নেহ, কি বিবেচনা! আমি রাজবাড়ীতে ভাল বিছানায় শুই, এখানে কষ্ট হতে পারে, শয়নের পূর্বে এই কথাটি তাঁর মনে পড়েছিল। অতি সামান্য ঘটনা। কিন্তু বহু বর্ষ পরে এক শীতের রাতে প্রেসিডেন্সী জেলের সেলে অস্পৃশ্য কম্বল গায়ে দিতে গিয়ে সেই কেরোসিনের আলোয় স্নেহকাতর রক্তিম মুখখানি মনে পড়লো—সেদিন নিঃশব্দ একাকীত্বের মধ্যে তাঁর মমতা স্মরণ করে আমার চক্ষু বাষ্পার্দ্র হয়ে উঠলো।

শুনেছি, মহাপুরুষ-সঙ্গ অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু এই দুর্লভের সন্ধানে আমাকে সচেতন ভাবে কোন চেষ্টাই করতে হয়নি। আমার যখন কিশোর বয়স, তখন রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর পরিধি ছিল সীমাবদ্ধ। এমনি একটা পরিবারের বালক-রূপে সহজেই তাঁদের দর্শন ও স্নেহ পেয়েছিলাম। শ্রীশ্রীমা থেকে তাঁর সন্তানমণ্ডলীকে একান্ত সহজ ভাবেই পেয়েছিলাম, যেমন শিশু বড় হয়ে পায় বৃহৎ আত্মীয়-মণ্ডলী। এঁরা যে মহাপুরুষ এমন ধারণাও ছিল না। থাকবার কথাও নয়। যার যা প্রাপ্য নয়, সে যদি স্বচ্ছন্দে তা পায়, তার মূল্যবোধ হবে কেমন করে! বিনা চেষ্টায় অর্জিত সম্পদের মূল্য মূঢ়র কাছে যা, মহাপুরুষদের স্নেহ আমার কাছে সেদিন পার্থিব আর দশটা সম্পর্কের মতই সহজলভ্য ছিল।

আমার গুরুভাইরা এই সব কথা লিখবার জন্য অনেক অনুরোধ ও ভর্ৎসনা করেছেন। কিন্তু লেখার বাধা কোথায়, সঙ্কোচ কি, তা এঁদের বোঝাতে পারিনি। হয়তো আমার এই লেখা পড়ে তাঁরা বুঝবেন, তাঁদের অনুভূতির রাজ্যে আমার প্রবেশাধিকার নেই। নিতান্ত লৌকিক দৃষ্টিতে যা দেখেছি, তা লৌকিক ভাবেই প্রকাশ করতে পারি, তার বেশী নয়। এটা বিনয়ের কথা নয়, স্পষ্ট স্বীকারোক্তি।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

রাঁচিতে রামকৃষ্ণ মিশনের যক্ষ্মা-সেবাকার্য

ডাঃ শ্রীযাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়

বিদেশী সরকার কর্তৃক বাঙ্গলাদেশ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া যখন রাঁচিতে বসবাস স্থাপন ও চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিলাম, তখন এখানে যক্ষ্মারোগীদের জন্য একটি স্বাস্থ্যনিবাস স্থাপনের সঙ্কল্প আমার মনে উদিত হইয়াছিল। যক্ষ্মারোগের চিকিৎসা সম্পর্কে বরাবর আমার একটা বিশেষ আগ্রহ ছিল। এই রোগের চিকিৎসা বিষয়ে ইংরেজ ও ফরাসী গ্রন্থকারদের লিখিত বহু পুস্তক ও পত্রিকাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং ইংরেজিতে এই রোগের চিকিৎসা বিষয়ক একখানা পুস্তকও রচনা করিয়াছিলাম। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমার সহযোগী বহু বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান যুবকের যক্ষ্মারোগে অকালমৃত্যু আমাকে এই রোগের চিকিৎসা বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনায় প্রণোদিত করিয়াছিল।

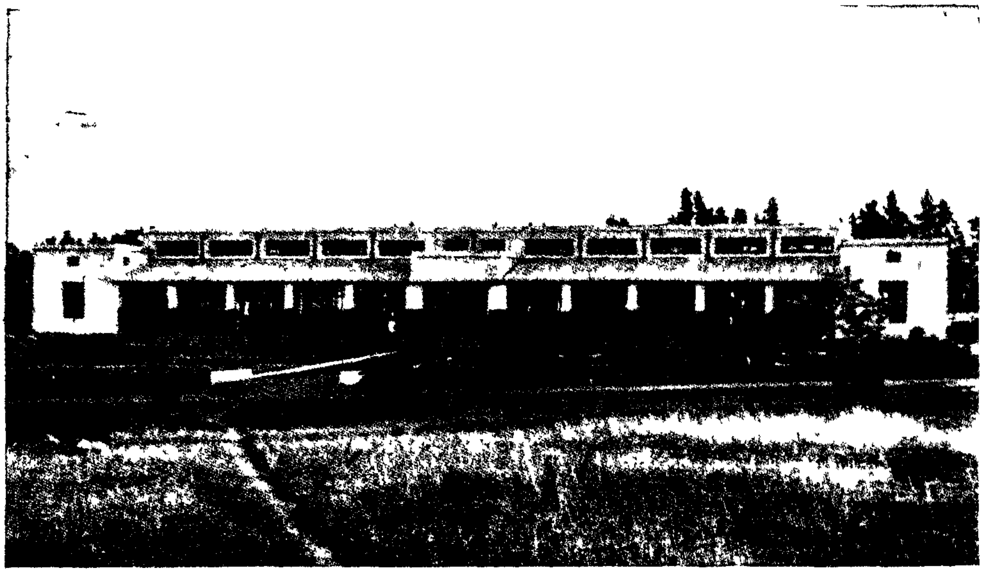
দশ-পনর বৎসর পূর্বে বর্তমান কালের ন্যায় যক্ষ্মা-চিকিৎসার সুগম পন্থা আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু তখন আমাদের দেশে এই রোগের বিস্তারও বর্তমান কালের ন্যায় ভয়াবহ আকার ধারণ করে নাই। আর্থিক অবনতি ও অন্যান্য নানা কারণে এই রোগ মারাত্মকরূপে বিস্তারলাভ করিয়াছে। বর্তমানে ভারতবর্ষে বৎসরে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং প্রায় পাঁচ লক্ষ লোক ইহার আক্রমণে অকালে প্রাণ হারায়। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয়, সারাদেশের বিভিন্ন হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামে এই রোগের চিকিৎসার জন্য মাত্র এগার হাজারের কিছু বেশী বেড্ আছে।

আমার পূর্বোক্ত সঙ্কল্প রূপায়িত হইবার পূর্বেই রামকৃষ্ণ মিশনের কয়েকজন সন্ন্যাসী রাঁচি অঞ্চলে একটি যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের শুভ সঙ্কল্প লইয়া আমার সমীপে যখন উপস্থিত হইলেন, তখন আমার আনন্দের পরিসীমা রহিলনা। এই ত্যাগব্রতী সেবাপরায়ণ সন্ন্যাসিগণের চেষ্টা ব্যর্থ হইবার নহে বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাদের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে যত্নশীল হইলাম।

যেসব কারণে মিশন কর্তৃপক্ষ রাঁচি-হাজারিবাগের সন্নিহিত কোন স্থানে যক্ষ্মা-সেবাশ্রম স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, সেগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। প্রথমতঃ, বাঙ্গলাদেশে যক্ষ্মানিবাস-স্থাপনের উপযোগী তেমন শুষ্ক স্বাস্থ্যকর স্থানের অভাব। দার্জিলিঙ্গের ন্যায় পার্বত্য অঞ্চলে যক্ষ্মানিবাস স্থাপনের অসুবিধা এই যে, ঐরূপ উচ্চ ও শীতপ্রধান পার্বত্যস্থানে চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্যলাভান্তে হঠাৎ আর্দ্র সমতল দেশে ফিরিয়া আসার পর রোগিগণ বিশেষ অসুবিধায় পড়েন ও কষ্ট অনুভব করেন। দ্বিতীয়তঃ, রাঁচি অঞ্চলের জলবায় যক্ষ্মারোগ নিরাময়ের পক্ষে বিশেষ অনুকূল। এই অঞ্চলের উচ্চতা সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে দুই হাজার ফুটের কিঞ্চিৎ অধিক। এখানে বৎসরের মধ্যে অতি অল্পসময়েই গ্রীষ্মের তীব্রতা অনুভূত হয় এবং সেরূপ দুঃসহ শীতও এখানে পড়ে না। বার্ষিক বারিপাত কলিকাতা অঞ্চল অপেক্ষা অধিক নহে এবং বর্ষাকাল ব্যতীত অন্য সব সময় বায়ু বিশেষ শুষ্ক থাকে। এই অঞ্চলে জনবসতি কম হওয়ায় এবং

কলকারখানা না থাকায়, এ অঞ্চলের বায়ু বিশেষ নির্মল। তৃতীয়তঃ, বাঙ্গলা, বিহার, উড়িষ্যা এবং যুক্তপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে রাঁচিতে যাতায়াত সুগম ও স্বল্পব্যয়সাধ্য।

নানা কারণে যক্ষ্মানিবাসের জন্য স্থান সংগ্রহ বড় সহজে সম্ভব হয় নাই। ইহার জন্য রাঁচি ও হাজারিবাগ জেলার বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করিতে এবং সে সকল স্থানের অধিবাসীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিতে হইয়াছিল। মনোমত স্থানের সন্ধান মিলিলেও তাহা আয়ত্তের বাহিরে বলিয়া মনে হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রীজহরলাল নেহেরু ও ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের সহায়তায় রাঁচি শহর হইতে দশ মাইল দূরে রাঁচিচাইবাসা রোডের পার্শ্বে দুই শত চল্লিশ একর ভূমি সংগ্রহ করা সম্ভব হয়। ইহা ১৯৩৯ সালের কথা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর অস্বাভাবিক অবস্থার দরুণ যক্ষ্মা-সেবাশ্রমের গৃহাদি নির্মাণকার্য ১৯৪৮ সালের পূর্বে আরম্ভ করা সম্ভবপর হয়

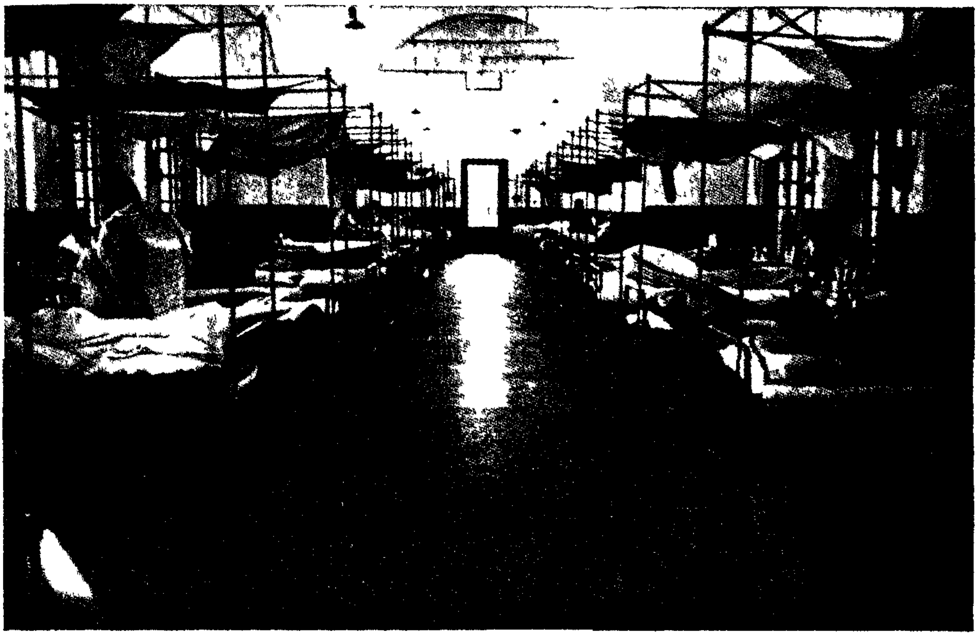


সাধারণ ওয়ার্ড

নাই। সেবাশ্রমের চারিদিকের উচ্চাবচ অরণ্যভূমির শোভা দেখিলে নয়ন জুড়াইয়া যায়। বহিরাগত দর্শকগণ এইস্থানের প্রাকৃতিক শোভা সন্দর্শনে পরম প্রীতিলাভ করেন। জমির এক প্রান্তে একটি বৃহৎ সরোবর আছে। পরবর্তী কালে আরও দশ বার একর ভূমি সংগৃহীত হওয়ায় সেবাশ্রমের আয়তন বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং অদূর ভবিষ্যতে রোগমুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়স্থল নির্মাণের জন্য আরও ত্রিশ একর জমি প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে।

এই সেবাশ্রম (স্যানাটোরিয়াম) স্থাপনের জন্য লক্ষ্ণৌনিবাসী সেবাব্রতী শ্রীভিক্টর নারায়ণ বিদ্যান্ত মহাশয় প্রথমে পঁচিশ হাজার টাকা দান করেন। এই প্রসঙ্গে রাঁচির অধিবাসী ৺ক্ষীরোদচন্দ্র রায় মহাশয়ের স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা সরযূবালা রায়ের পঁচিশ হাজার টাকা দানও উল্লেখযোগ্য। ত্রিশ জন রোগীর উপযোগী গৃহাদি নির্মিত এবং একান্ত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হওয়ার পর ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে রোগীদের সেবাকার্য আরম্ভ হয়।

যে সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির অকুণ্ঠ বদান্যতায় এই কার্যের প্রসার হইতেছে তাঁহাদের মধ্যে কলিকাতা-নিবাসী জনৈক যুবক ব্যারিষ্টার ভদ্রলোকের নাম সর্বাগ্রে স্মৃতিপথে উদিত হয়। তিনি তাঁহার নাম লোকসমাজে প্রচারে একান্ত অনিচ্ছুক। রামকৃষ্ণ মিশনের রিক্ত সন্ন্যাসিগণ যখন ঈশ্বরের



সাধারণ ওয়ার্ডের ভিতরকার একটি দৃশ্য

কৃপামাত্র সম্বল করিয়া বহুব্যয়সাধ্য এই সেবাকার্যে হস্তক্ষেপ করেন, সেই সময় তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া নিজস্ব পৈত্রিক বহুমূল্যবান সমগ্র স্থাবর সম্পত্তি মিশনের সেবাকার্যে সমর্পণ করেন। কলিকাতাস্থ এই সম্পত্তি হইতে বার্ষিক যে লক্ষাধিক টাকা আয় হয়, তাহার অর্ধাংশ এই যক্ষ্মা-সেবাশ্রমের ব্যয় নির্বাহের জন্য পাওয়া যায়। এই সম্পত্তি প্রাপ্তির ফলে স্যানাটোরিয়ামটিকে প্রারম্ভ হইতে আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মতভাবে সুপরিচালিত করা এবং এখানে অনেকগুলি রোগীকে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা সম্ভব হইয়াছে।

বর্তমানে এখানে ৬০ জন রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। আরব্ধ কয়েকটি গৃহ আর এক বা দুই মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ হইয়া গেলে, আরও ৩০ জন রোগীকে এখানে স্থান দেওয়া সম্ভব হইবে।

পূর্বে কয়েকজন দাতার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যান্য যে সকল মহানুভব ব্যক্তির অকুণ্ঠ বদান্যতায় এই সেবাপ্রতিষ্ঠানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে তাঁহাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করিতেছি। (১) কলিকাতা নিবাসী ৺সন্তোষ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহাদের পিতৃদেবের স্মরণার্থ একটি ওয়ার্ড নির্মাণের জন্য কুড়ি হাজারের কিঞ্চিৎ অধিক টাকা এবং ঐ ওয়ার্ডের প্রয়োজনীয় শয্যাদি দান করিয়াছেন। (২) ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্ত স্মৃতিসমিতির ন্যাসরক্ষকগণ তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ একটি শল্য-চিকিৎসাগার (Operation Theatre) নির্মাণ

ও উহার জন্য প্রয়োজনীয় সমুদয় আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং আটটি কেবিন-সমন্বিত একটি ওয়ার্ড নির্মাণের জন্যও অর্থদান করিতেছেন। এই সকল উদ্দেশ্যে তাঁহারা প্রায় এক লক্ষ টাকা দিতেছেন। ক্যাপ্টেন দত্তের নির্মিত গৃহগুলি রোগার্তের সেবার সহায়ক হইয়া সুচিরকাল তাঁহার কীর্তিকাহিনী লোকসমাজে ঘোষণা করিবে। (৩) কলিকাতার স্বনামধন্য দাতা ৺মহেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয়ের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থ তাঁহার কৃতী পুত্র শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্য মহাশয় পিতার পদাঙ্কানুসরণ করিয়া শল্য চিকিৎসাধীন রোগীদের আশ্রয়ের জন্য একটি ওয়ার্ড নির্মাণের উদ্দেশ্যে চল্লিশ হাজার টাকা এবং রুগ্ন সাধুদের ওয়ার্ড নির্মাণের আংশিক সহায়তাবাবদ সাড়ে ছয় হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীবিধান চন্দ্র রায় মহাশয়ের নাম স্মরণীয়। তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টায় স্যানাটোরিয়াম কর্তৃপক্ষ বহুমূল্য আধুনিক যন্ত্রপাতি নামমাত্র অর্থে সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের জন্য স্যানাটোরিয়ামের নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে। বৈদ্যুতিক পাম্পের সাহায্যে পাইপের মধ্য দিয়া স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন গৃহে জল সরবরাহ করা হয়। জলের জন্য কয়েকটি গভীর কূপ খনন করা হইয়াছে। মিশনের ত্যাগী সেবকদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে স্যানাটোরিয়ামের রন্ধনশালায় চিকিৎসাবিজ্ঞানসম্মত বিবিধ পথ্য প্রস্তুত এবং পর্যাপ্ত

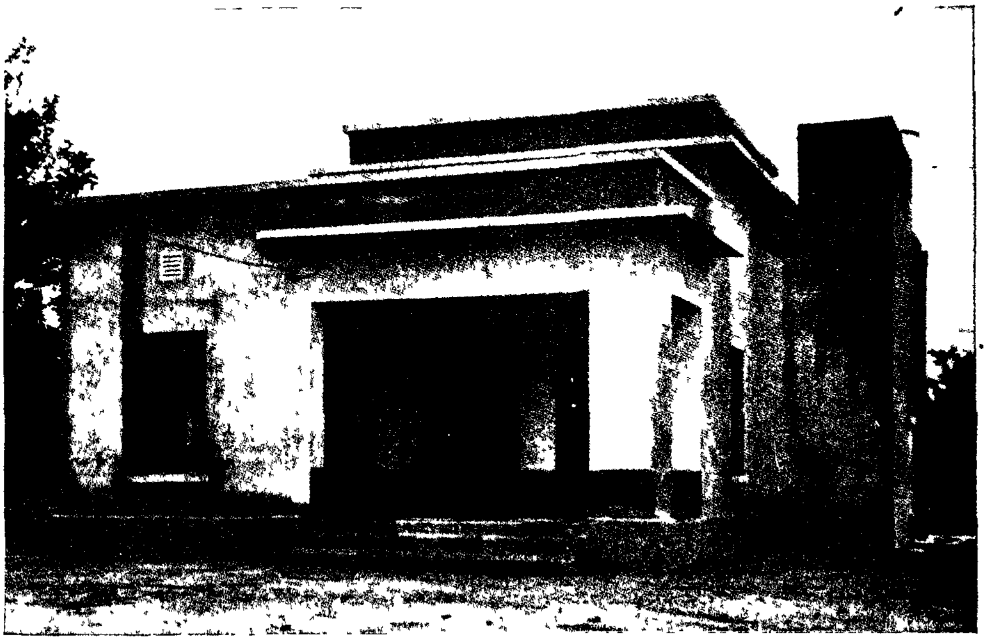


আরোগ্য নিবাসে হ্রদের দৃশ্য

পরিমাণে রোগীদিগকে প্রদান করা হয়। বিশুদ্ধ দুগ্ধ নিজস্ব গোশালায় পাওয়া যায়—কিছু তরকারী এবং ফলও স্যানাটোরিয়ামের বাগানে উৎপন্ন হয়। এ অঞ্চলে জলের বিশেষ অভাব। আজ পর্যন্ত জলের জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করা হইলেও প্রয়োজনানুরূপ জলের ব্যবস্থা করা এখনও

সম্ভব হয় নাই। পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা করিতে পারিলে প্রয়োজনীয় সমস্ত দুগ্ধ, মাখন, ঘৃত এবং শাকসব্জী ও ফল প্রভৃতি স্যানাটোরিয়ামেই উৎপাদনের পরিকল্পনা আছে।

এখানে আধুনিক চিকিৎসার উপযোগী সর্ববিধ উত্তম শ্রেণীর যন্ত্রপাতি সংগৃহীত হইয়াছে। উপযুক্ত শল্যচিকিৎসাগারের অভাবে এতকাল পর্যন্ত কেবল এ-পি, পি-পি, থোরাকোস্কোপি, কটাবাইজেশন এবং ফ্রেণিক অপারেশন সম্ভব হইত। ক্যাপ্টেন দত্ত স্মৃতিরক্ষাসমিতি এবং শ্রীহেরম্ব চন্দ্র ভট্টাচার্যের অর্থানুকূল্যে সুন্দর ও সুসজ্জিত শল্যচিকিৎসাগার নির্মিত হওয়ার ফলে বর্তমান মাস হইতে থোরাকোপ্লাষ্টি অপারেশন করাও সম্ভব হইবে। এখন তিনজন প্রবীণ বিশেষজ্ঞ যক্ষ্মা-চিকিৎসক সর্বক্ষণ স্যানাটোরিয়ামে থাকেন—ইঁহাদের একজন রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী। এই চিকিৎসকগণের দুইজন বিলাতে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন এবং চিকিৎসাব্যাপারে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়



একটি 'এ' টাইপ 'কটেজ'

করিয়াছেন। এই তিনজন ছাড়া একজন বেতনভুক এবং তিনজন অবৈতনিক বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাঁচি হইতে আসিয়া স্যানাটোরিয়ামের কাজে প্রয়োজনানুরূপ সহায়তা করিয়া থাকেন।

এখানে নানাশ্রেণীর বেড্ আছে। অধিকাংশ বেড্ জেনারেল ওয়ার্ডে আর সাতটি বেড্ একটি স্পেশাল ওয়ার্ডে। ইহা ব্যতীত ৮টি কেবিন এবং কয়েকটি কটেজও আছে। বর্তমানে কমপক্ষে পঁচিশজন রোগীকে কিছু টাকা-পয়সা না লইয়া এখানে চিকিৎসা করা হয়। এই ২৫ জনের মধ্যে পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা ১০ জন রোগীর চিকিৎসার আংশিক ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করেন এবং বিহার সরকার তাঁহাদের মনোনীত পাঁচজন রোগীর চিকিৎসার জন্য বার্ষিক সাহায্য প্রদান করেন। এই ২৫ জন ব্যতীত বিভিন্ন সংস্থার মনোনীত আরও কয়েকজন রোগীর

জন্য এখানে বেড্ আছে। যথা—ইষ্টার্ণ রেলওয়ের কর্মচারীদের জন্য পাঁচটি বেড্, পাটনা দিঘা-ঘাটের বাটা ওয়ার্কার্স টি. বি. প্রোটেকশন সোসাইটির সভ্যগণের জন্য ২টি বেড্, বেঙ্গল ইনকম-ট্যাক্স এসোসিয়েশনের সভ্যগণের জন্য একটি বেড্ এবং বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিমিটেডের কর্মীদের জন্য দুটি বেড।

দিনের পর দিন রোগীদের নিকট হইতে ভর্তির জন্য আবেদন আসিতেছে। কিন্তু এই অল্পসংখ্যক বেডের দ্বারা কয়জনের বা দাবী মিটানো সম্ভব? অধিকন্তু, বেডের সংখ্যা অচিরে বাড়াইতে না পারিলে রোগীদের জন্য মাথাপিছু ব্যয়ের হার কমান যায় না এবং এই স্যানাটোরিয়ামটিকে একটি আদর্শ চিকিৎসা-গবেষণা-কেন্দ্ররূপে গড়িয়া তোলার পরিকল্পনাও সার্থক হইয়া উঠে না।

যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা ব্যবস্থা অপেক্ষা ঐ রোগমুক্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বড় কম প্রয়োজনীয় নহে। এই রোগ হইতে মোটামুটি আরোগ্য লাভ করার পরও রোগীদের পক্ষে দীর্ঘকাল নিয়মিত জীবন যাপনের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বেডের স্বল্পতাবশত প্রায় সকল হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামের কর্তৃপক্ষ রোগীর যখন আর বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন থাকে না—এমন কি, যখন রোগীর থুথু কিছুকালের জন্য যক্ষ্মাজীবাণুমুক্ত দেখা যায়, তখনই রোগীকে স্বগৃহে ফিরিয়া গিয়া অন্য রোগীর জন্য স্থান করিয়া দিতে বলেন। কিন্তু অধিকাংশ রোগীরই স্বগৃহে স্বতন্ত্রভাবে আরামে থাকিয়া পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের ও বিশ্রাম গ্রহণের সামর্থ্য নাই। ফলে, হাসপাতাল বা স্যানাটোরিয়াম হইতে ফিরিয়া অনেকেই পুনরায় রোগাক্রান্ত হন। আর এক শ্রেণীর রোগমুক্ত ব্যক্তির নানা কারণে স্বগৃহে ফিরিয়া স্বচ্ছন্দে বাসের বা জীবিকার্জনের যথেষ্ট সুযোগ সামর্থ্য থাকে না। তাঁহারা অন্তত কয়েক বৎসর হাসপাতালের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া নিরাপদে নিজেদের সামর্থ্যানুযায়ী জীবিকার্জন করিয়া নিরাপদে কালাতিপাত করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু এইরূপ ব্যক্তিদের জন্য উপনিবেশ-স্থাপনের চেষ্টা আমাদের দেশে আজও কোথাও উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে নাই।

প্রাক্তন রোগীদের জন্য একটি সর্বাঙ্গসম্পন্ন উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনা লইয়া স্যানাটোরিয়াম স্থাপনের প্রারম্ভ হইতে কাজ আরম্ভ হইয়াছে। বর্তমানে সাতজন রোগমুক্ত ব্যক্তি স্যানাটোরিয়ামের বিভিন্ন কাজে নিযুক্ত রহিয়াছেন। বিবিধ প্রকারের শিল্প, কৃষি এবং পশুপালনের বিভাগ-সমন্বিত এই উপনিবেশ স্থাপনের পরিকল্পনাকে সাফল্যমণ্ডিত করিতে পারিলে বহু হতাশ প্রাণে আশার সঞ্চার হইবে। কিন্তু ইহার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন।

আজ পর্যন্ত এই কাজের জন্য ভারত সরকার এককালীন এক লক্ষ টাকা এবং বিহার সরকার এক লক্ষের কিছু অধিক টাকা দিয়াছেন। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট দান হিসাবে প্রায় ছয় লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তথাপি পঞ্চাশ হাজার টাকার ঋণ এখনও পরিশোধ করা সম্ভব হয় নাই।

আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে যক্ষ্মারোগ মহামারী আকারে দেখা দিয়াছে। যে বয়সে নবযুবকগণ বিদ্যাভ্যাস ও অর্থার্জন করিয়া জীবনের সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিবে, সেই সুকুমার বয়সে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ তরুণ-তরুণী এই দারুণ রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে। এই রোগের আক্রমণে কত সোনার সংসার যে ছারেখারে যাইতেছে তাহার

ইয়ত্তা নাই। এই রোগের ব্যয়বহুল চিকিৎসাভার বহনের সহায় সম্বল অনেকেরই নাই। যাঁহাদের সামর্থ্য আছে, তাঁহারাও হাসপাতাল হইতে হাসপাতালে আবেদন করিয়া চলিয়াছেন। কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যক বেডের অভাবে কোন প্রতিষ্ঠানে আবেদন পত্র গৃহীত হইয়া সেখান হইতে আহ্বান আসিবার পুর্বেই তাঁহাদের অনেকের জীবনদীপ নির্বাপিত হইতেছে; কাহারও বা রোগ চিকিৎসার অসাধ্য হইয়া পড়িতেছে। স্বল্পপরিসর অস্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করার ফলে কেবল যে রোগীর রোগযন্ত্রণা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহা নয়, অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইবার পুর্বেও তাঁহারা অনেক আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এই রোগের বিষ ছড়াইয়া যাইতেছেন। অথচ বর্তমান কালে চিকিৎসা বিজ্ঞানের যেরূপ উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে সময়মত চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলে রোগীকে নিরাময় করা বিশেষ কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যক্ষ্মারোগে মৃত্যুর হার দ্রুত কমিয়া আসিতেছে। এই রোগের প্রতীকারের জন্য আমাদের দেশে একমাত্র প্রয়োজন রাষ্ট্রের এবং জনসাধারণের সমবেত ব্যাপক প্রচেষ্টা।

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের এই নূতন সেবা-প্রচেষ্টার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থাকিতে পারিয়া আমি নিজেকে বিশেষ গৌরবান্বিত বোধ করিতেছি। সহৃদয় দেশবাসিগণও এই মহতী প্রচেষ্টার সহিত নিজদিগকে আন্তরিকভাবে যুক্ত করিয়া অসংখ্য যক্ষ্মারোগাক্রান্ত ব্যক্তির ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের ধন্যবাদ ভাজন হউন।

কবি ইকবাল

অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল্

কবি আর ডিপ্লোম্যাট এক বস্তু নহে। কবি যদি কবিত্ব ছাড়িয়া ডিপ্লোম্যাসিতে যোগদান করেন তবে তাহাতে শুধু কাব্যেরই ক্ষতি হয় না, ডিপ্লোম্যাসিরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়। কবির রাজনীতি সাময়িক ব্যাপার। রাজনীতির জন্য কবি অমরতা লাভ করেন না। কবির অমরতা কাব্যে। ক্রমওয়েলের অধীনে প্রজাতান্ত্রিক সরকারের লাটিন সেক্রেটারী মিল্টনের যদি কোন কাব্যগুণ না থাকিত তবে সমসাময়িক আরও অনেক খ্যাত-নামা অখ্যাতনামা লোকের মতই তাঁহার নাম মানুষের অন্তর হইতে বেমালুম নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইত। কিন্তু মিল্টন ছিলেন মহাকবি। তাঁহার রাজনীতি বুদ্বুদের মতই অস্থায়ী। তাই আজ তাঁহার রাজনীতি চলেনা। চলে তাঁহার কবিতা।

কবি ইকবাল বহু রাজনীতি করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার রাজনীতি সাময়িক ও অস্থায়ী ব্যাপার। রাজনীতি তাঁহাকে উচ্চাসন দেয় নাই। কাব্য-গুণেই তিনি সর্ব্বত্র সমাদৃত। কাব্যই তাঁহাকে অমরত্ব দান করিয়াছে। দার্শনিক ও কবি ইকবাল কিছুদিন সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিন্তু তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব রাজনীতিতে নহে, তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব কবিতায় ও দর্শনে। নানা বিষয়েই তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। ধর্ম্ম, নীতি, আত্মা, স্বদেশপ্রেম, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অজস্র কবিতা আছে। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পার্শ্বেই তাঁহার স্থান। তিনি ইংরেজি ভাষায়ও সুপণ্ডিত ছিলেন। দর্শন সম্বন্ধে তিনি ইংরেজি

ভাষায় যে সব প্রবন্ধ রচনা করিয়াছেন, তাহা অমূল্য। সাধারণতঃ উর্দ্দু ও ফারসী ভাষায় তিনি কবিতা রচনা করিতেন। উর্দ্দ ভাষার কবিতাগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ইরাণে তাঁহার ফারসী কবিতাগুলি সমুচিত মর্য্যাদালাভ করে নাই। হাফেজ, রুমী, ওমরখাইয়ামের দেশে বিদেশী কবির কাব্য সে মর্য্যাদা পাইতে পারেনা। উর্দ্দু কবিতাই তাঁহাকে অমরতা দান করিবে। আজ এই প্রবন্ধে ইকবালের কবিতার একটা দিক লইয়া আলোচনা করিব।

কবি ইকবালের কবিতা পাঠ করিলে একটা বিষয় খুব বড় হইয়া দেখা দেয়। সেটা হইতেছে যে তাঁহার কবিতা জোরাল ভাষায় মানুষের মর্য্যাদাকে ফুটাইয়া তুলিয়াছে। ইকবাল রবীন্দ্র-নাথের মত আশাবাদী কবি। মানুষের মর্য্যাদা ও মহিমায় তিনি চরম বিশ্বাসী। তাঁহার নানা মতবাদের মধ্যে মানুষের মর্য্যাদাটাই তাঁহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। কাব্য রচনা করিয়া তিনি চরম সাফল্য লাভ করিয়াছেন। মানুষ সম্বন্ধে এই মর্য্যাদাবোধই তাঁহাকে সফলতা দান করিয়াছে। শেষের দিকে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া তিনি কিছুটা সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সেই চরম সঙ্কটের যুগেও তিনি সকলশ্রেণীর মানুষের মর্য্যাদার কথা বিস্মৃত হন নাই। মানুষ বলিতে তিনি কোন জাতি ও সম্প্রদায়ের কথা ভাবেন নাই। সমস্ত মানব সমাজকে তিনি একই ভ্রাতৃসঙ্ঘের অন্তর্গত বলিয়া বুঝিতেন। মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক ও মানুষের সহিত ঈশ্বরের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি একটা নূতন ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই সম্পর্ককে একটা নূতন মূল্যবোধ দিয়াছেন। মানুষকে তাহার মহৎ মর্য্যাদায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়াছিলেন। সমগ্র মানব সম্প্রদায় এক সমাজভুক্ত। মানব সমাজের মধ্যে একটি সার্ব্বজনীন সহানুভূতির ভাব সর্ব্বদাই সক্রিয় হইয়া আছে। কবি ইকবাল সত্যই সর্ব্বজাতিক মানুষকে ভালবাসিতেন। মানুষের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য সাধনা করিয়াছেন। তাঁহার কবিতা এই মানব-প্রেমের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত।

ইকবালের কবিতার শিল্পগুণ অসাধারণ। অপূর্ব্ব শব্দযোজনা, ছন্দের দীপ্তি, ভাষার যাদু তাঁহার কবিতাকে অত্যন্ত সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। আর্টের দিক দিয়া তিনি বর্ত্তমান যুগের একজন শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁহার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ যে তিনি উদ্দেশ্যমূলক কবিতা লিখিয়াছেন। এই অভিযোগ যে কতকটা সত্য তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের খুব কম কবিই "প্রচারক" হইবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন। এ যুগের যে কোন কবির কাব্য পড়িলেই দেখা যাইবে যে উহার অনেকগুলি উদ্দেশ্যমূলক। নিছক "আর্টের জন্য লেখা" এই নীতি আজকাল অনেকেই মানিয়া চলেন না। ইকবালের মধ্যেও এই "উদ্দেশ্য"-প্রবণতা যথেষ্ট আছে। কিন্তু এ কথাও ভুলিলে চলিবে না যে তাঁহার কবিতার প্রধান কথা হইতেছে মানুষের মর্য্যাদা। মানব-জাতিকে আহ্বান করিয়া তিনি বলিতেছেন :

Thou art neither for Earth nor for
Heaven.
The Universe is for thee, thou art
not for the Universe.

হে মানুষ! তুমি পৃথিবীর জন্য নহ, অথবা স্বর্গের জন্যও নহ, সমগ্র বিশ্বই তোমার জন্য—তুমি বিশ্বের জন্য নহ।

ইকবালের বহু কবিতায় এইভাবে মানুষকে উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন :

"বিধাতার নিকট দেবদূতগণ ইকবালের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিল যে, ইকবাল অশিষ্টাচারী ও

বেআদব, কারণ, যদিও। তিনি মৃত্তিকা হইতে সৃষ্ট হইয়াছেন, তবুও তাঁহার এরূপ ঔদ্ধত্য যে, তিনি তাঁহার সামান্য ক্ষমতার সাহায্যে প্রকৃতিকে সুশোভিত করিতে চান। তিনি আনাটোলিয়ান নহেন, তিনি সিরিয়ান নহেন। তিনি কাশীর নহেন, অথবা সামারকান্দের নহেন। তিনি দেবদূতগণকে মানুষের চাঞ্চল্য শিক্ষা দিয়াছেন, এবং মানুষকে দেবত্বে দীক্ষা দিয়াছেন।" ইকবালের মতে দেবদূতগণকেও মানুষের নিকট শিক্ষা লইতে হইবে। তাঁহার মতে মানুষের যদি ইচ্ছাশক্তি ও সাধনা থাকে তবে সেও দেবত্ব পাইবার অধিকারী। মানুষ তাঁহার দৃষ্টিতে বিরাট শক্তিসম্পন্ন আত্মা। তিনি আর একটি কবিতায় বলিয়াছেন :

"মানুষ তাহার কর্তৃত্বে সমগ্র বিশ্বকে আনিতে পারে—তবুও সমগ্র বিশ্ব মানুষের জন্য বিরাট স্থান নহে। বিরাটত্বে মানুষ আকাশ অপেক্ষাও বড় —নিশ্চয় জেনো যে, মানুষকে শ্রদ্ধা করার মধ্যে নিহিত আছে প্রকৃত কাল্‌চার।"

বিশ্বের চতুর্দিকে যখন যুদ্ধের দামামা বাজিয়া উঠিল, তখন প্রকট মূর্ত্তিতে দেখা দিল আদর্শের সংঘাত। এই সময় পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ কেবলমাত্র জাতীয়তার গৌরব গাহিতেই ব্যস্ত। বিশ্বমানবতার কথা চিন্তা করিতে সকলেই কুণ্ঠিত। মানবসভ্যতার এই সঙ্কটকালে যে সব সাধক ও মানবপ্রেমিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জাতি অপেক্ষা সমগ্র মানবসমাজের মঙ্গলের কথা ভাবিয়াছেন, তাঁহারা সকল দেশের নমস্য। একজন রবীন্দ্রনাথ, একজন রমা রঁলা একজন রাসেল,—ভাবিয়াছেন মানবসমাজের মুক্তির কথা। আমরা নিশ্চয় সেই সব কবি শিল্পীর নিকট কৃতজ্ঞ, যাঁহারা ভৌগোলিক সীমা, জাতিগত সীমা অতিক্রম করিয়া বিশ্বমানবের উদার সভাতলে সকল মানুষকে আহ্বান করিয়াছেন। এই সব মানবপ্রেমিকগণ কখনও ভুলেন নাই যে, এই বিরাট মানবসভ্যতা হইতেছে সকল দেশের সকল জাতির যুক্ত প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ। ইহা কাহারও একার নহে। ইহাতে সকলের সমান অধিকার ও সমান দান আছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন :

হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে
নমি নরদেবতারে,
উদার ছন্দে পরমানন্দে
বন্দন করি তাঁরে।

কবি ইকবালও একদিক দিয়া বিশ্বপ্রেমিক। তাঁহার কবিতা পড়িলে তাঁহার রাজনীতির কথা ভুলিয়া যাই। তিনি বলিতেছেন :

"আমরা আফগানী নহি, তুর্কি নহি, তাতারী নহি, আমরা একই উদ্যানে জন্মিয়াছি—আমরা একটি শাখার ফুল। বর্ণ ও গন্ধের পার্থক্যবোধ আমাদের জন্য নিষিদ্ধ—আমরা একই বসন্তে ফুটিয়াছি—একটি বৃন্তেরই ফুল।"

(ক্রমশঃ)

ঠাকুরের কতিপয় পার্ষদের জন্মতারিখ ও জন্মতিথি

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের যে কয়জন ত্যাগী সন্তানের জন্মতারিখ ও সময় পাওয়া গিয়াছে তাহা পরীক্ষা করিলে দেখা যায় যে, স্বামী শিবানন্দ এবং স্বামী যোগানন্দ, এই দুইজন মহাপুরুষের সৌর জন্মমাসকে চান্দ্র মাস ধরিয়া তাঁহাদের জন্মতারিখ স্থির করা হইয়াছে এবং

জন্মতিথি প্রতিপালিত হইতেছে। ইহা সঙ্গত নহে। স্বামী প্রেমানন্দের জন্মতিথি প্রাচীন মতাবলম্বী এবং বিলাতী পঞ্জিকা (এফেমেরিস্) মতে বিভিন্ন। এইরূপ স্থলে বিলাতী পঞ্জিকার মত গ্রহণ করাই শ্রেয়ঃ মনে করি। স্বামী সুবোধানন্দের প্রচলিত জন্মতিথি ভ্রমাত্মক। স্বামী বিবেকানন্দের প্রকৃত জন্মতারিখ এবং সময় সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়, কিন্তু এই বিষয়ে মতভেদের কোন কারণ নাই।

এই বিষয়গুলি বুঝিতে হইলে সৌর ও চান্দ্র মাস এবং তিথি সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা থাকা প্রয়োজন। রবির একরাশি ভোগ-কালকে এক সৌর মাস বলে; ইহার দিন-সংখ্যাকে তারিখ বলা হয়। বাংলা দেশে সৌর মাস প্রচলিত এবং জন্মমাস বলিতে সৌর মাসই বুঝায়। শুক্লা প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত এই ত্রিশটি তিথিতে এক চান্দ্র মাস হয়। চান্দ্র মাস হিসাবে জন্ম-তিথি প্রতিপালিত হয়। তিথির সংখ্যা—শুক্লা প্রতিপদ ১, শুক্লা দ্বিতীয়া ২, পূর্ণিমা ১৫, কৃষ্ণা প্রতিপদ ১৬, এইরূপ গণনায় অমাবস্যা ৩০ সংখ্যক হয়। সৌর মাসের কোন্ তারিখে কোন্ চান্দ্র মাস যাইতেছে তাহা জানিবার সহজ উপায় এই—সৌর মাসের তারিখ অর্থাৎ দিনসংখ্যা অপেক্ষা তিথির সংখ্যা অধিক হইলে সেই তারিখে চান্দ্র তৎপূর্ব্ব মাস হইবে, এবং সৌর মাসের দিনসংখ্যা অপেক্ষা তিথির সংখ্যা কম হইলে চান্দ্র সেই মাসই হইবে। যথা, ১০ই বৈশাখ শুক্লা দ্বাদশী (১২ সংখ্যক) তিথি হইলে চান্দ্র তৎপূর্ব্ব মাস অর্থাৎ চান্দ্র চৈত্র মাস; কিন্তু উক্ত তারিখে শুক্লা পঞ্চমী (৫ সংখ্যক) তিথি হইলে চান্দ্র সেই মাস অর্থাৎ চান্দ্র বৈশাখ মাস বুঝিতে হইবে। সৌর মাসের দিনসংখ্যা ও তিথির সংখ্যা সমান হইলে মলমাস হইবে। রাশিচক্রে রবি এবং চন্দ্রের অবস্থিতি হইতে তিথি গণনা করা হয়। রাশিচক্রে ৩৬০ অংশ বা ডিগ্রি থাকে, এবং তিথির সংখ্যা ৩০; সুতরাং প্রতি ১২ অংশে এক একটি তিথি হয়। যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের চন্দ্রস্ফুট-রাশ্যাদি হইতে রবিস্ফুট-রাশ্যাদি বাদ দিলে যে রাশ্যংশাদি হইবে, তাহাকে অংশে (৩০° অংশে এক রাশি) পরিণত করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল হইবে সেই সময়ের গত তিথির সংখ্যা, এবং ভাগশেষ পরবর্ত্তী তিথির ভোগ নির্দ্দেশ করিবে। ইহার উদাহরণ যথাস্থানে দেওয়া হইবে।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজের দুইটি জন্ম-তারিখ ও সময় প্রচলিত আছে—

(১) শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় প্রণীত "বিবেকানন্দ চরিত" গ্রন্থ-মতে ২৮শে পৌষ, ১২৬৯ সাল, রবিবার, রাত্রিশেষে ৬টা ৩৩ মিঃ ৩৩ সেঃ, ধনু লগ্ন।

(২) শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের এবং "শ্রীরামকৃষ্ণ ভক্তমালিকা" গ্রন্থ-মতে ২৯শে পৌষ, ১২৬৯ সাল, সোমবার, সূর্য্যোদয়ের এক মিনিট পরে ৬টা ৪৯ মিঃ, মকর লগ্ন।

সূর্য্যোদয় হইতে বার ও তারিখ আরম্ভ হয়। জন্মসময় সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে ও পরে বলিয়া জন্মতারিখের প্রভেদ হইয়াছে। দ্বিতীয়টি সংশোধিত জন্মতারিখ ও সময়। শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের একখানি পত্রে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই পত্রখানি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বসু মহাশয় প্রণীত "স্বামী বিবেকানন্দ" নামক পুস্তকের শেষভাগে দেওয়া আছে। ইহাতে স্বামিজীর প্রকৃত জন্মতারিখ ও সময়ের স্পষ্ট উল্লেখ নাই; কেবলমাত্র বলা হইয়াছে যে,

কোষ্ঠী-মতে তাঁহার জন্ম সূর্য্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে ও ধনু লগ্নে, এবং ইহা তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর অনুমোদিত। কিন্তু তাঁহার জীবনের সহিত কোষ্ঠীর ঐক্য-সম্পাদন জন্য জন্মসময়ে ৬ মিনিট যোগ করিয়া সূর্য্যোদয়ের (অর্থাৎ ৬টা ৪৮ মিনিটের) এক মিনিট পরে সংশোধিত জন্মসময় ৬টা ৪৯ মিঃ ও মকর লগ্ন ধরা হইয়াছে। জন্মসময় সূর্য্যোদয়ের পরে ধরায় জন্মতারিখ ২৯শে পৌষ হইয়াছে। পুরাতন পঞ্জিকা এবং আধুনিক বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত ও গুপ্তপ্রেশ এই তিনটি পঞ্জিকা-মতে ২৯শে পৌষ সূর্য্যোদয় যথাক্রমে ৬টা ৩৯ মিঃ ৩৩ সেঃ ; ৬টা ৪৪ মিঃ, এবং ৬টা ৪৮ মিঃ। সুতরাং স্বামিজীর তিন প্রকার জন্মসময় (৬টা ৩৪ মিঃ ৩৩ সেঃ, ৬টা ৩৯ মিঃ এবং ৬টা ৪৩ মিঃ) হইতে পারে। কিন্তু দেখা যাইতেছে "বিবেকানন্দ চরিত" গ্রন্থে পুরাতন পঞ্জিকার সূর্য্যোদয় হইতে ৫ মিনিট স্থলে ৬ মিনিট বাদ দিয়া জন্মসময় ধরা হইয়াছে, এবং রাজেন্দ্র বাবু জন্মসময় সংশোধন করিতে আধুনিক গুপ্তপ্রেশ পঞ্জিকার সূর্য্যোদয় গ্রহণ করিয়াছেন। স্বামিজীর জন্মসালে এবং তাহার পরেও কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত গুপ্তপ্রেশ কিম্বা অধুনা প্রচলিত কোন পঞ্জিকার অস্তিত্ব ছিল না। সুতরাং এই সকল আধুনিক পঞ্জিকার সূর্য্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে স্বামিজীর জন্মসময় হইতে পারে না। তাঁহার জন্মকালে প্রচলিত পুরাতন পঞ্জিকার সূর্য্যোদয়ের পাঁচ মিনিট পূর্ব্বে, অর্থাৎ ২৮শে পৌষ, রবিবার, রাত্রিশেষে ৬টা ৩৫ মিঃ (৬টা ৩৪ মিঃ ৩৩ সেঃ) সময়ে ধনু লগ্নে যে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহা যে তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর অনুমোদিত ও মূল কোষ্ঠীতে ছিল, এই বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই। ইহা ভিন্ন অন্য তারিখ ও সময় ব্যক্তিগত মতামত মাত্র, এবং ফলবিচারে তাহা গ্রহণ করিতে বহু বাধা আছে। রাত্রিশেষে ৬টা ৩৬ মিঃ সময়ে ধনু লগ্নের বর্গোত্তম নবাংশ পড়ে ; এইজন্য জন্মসময় ৬টা ৩৬ মিঃ ধরা যাইতেও পারে।

স্বামী শিবানন্দ

স্বামী শিবানন্দ মহারাজের প্রচলিত জন্মতিথি চান্দ্র অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী। "মহাপুরুষ শিবানন্দ" নামক পুস্তকের ২৯৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় দেখা যায় যে, হস্তরেখা হইতে নির্দ্ধারিত তাঁহার জন্মতারিখ ২০শে পৌষ, ১২৬২ সাল, বৃহস্পতিবার। মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার জন্ম অগ্রহায়ণ মাসে, কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে এবং বেলা দুপুরের মধ্যে। ইহা অবশ্যই সৌর অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি। বাংলা দেশে জন্মমাস বলিতে সৌরমাস বুঝায়। চান্দ্র অগ্রহায়ণ হিসাবে হস্তরেখা হইতে নির্দ্ধারিত জন্মতারিখ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। "শিবানন্দ বাণী" নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ডে ২৫।২৬ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ১৩৩০ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখে মহাপুরুষ মহারাজ বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার "দেহের বয়স" বোধ হয় "৭০।৭২ বৎসর হবে"। তাঁহার উক্তি এবং জীবনের ঘটনা হইতে তাঁহার জন্মতারিখ পাওয়া যায় ২রা অগ্রহায়ণ, ১২৬১ সাল, বৃহস্পতিবার, বেলা প্রায় ১১টা ১০ মিঃ (ইং ১৬ই নভেম্বর ১৮৫৪ খৃঃ)। জন্মসময়ে সায়ন চন্দ্রস্ফুট ৬।০।৫৪ এবং রবিস্ফুট ৭।২৩।৩৪ এবং চন্দ্র হইতে রবিস্ফুট বিয়োগ করিয়া ৩০৭ অংশ ২০ কলা পাওয়া যায়। ইহাকে ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল হয় ২৫ এবং ৭ অংশ ২০ কলা অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং জন্মসময়ে ২৫ তিথি গত হইয়া ২৬ অর্থাৎ কৃষ্ণা একাদশী তিথি চলিতেছিল। সৌর অগ্রহায়ণ মাসের দিন সংখ্যা ২

অপেক্ষা তিথির সংখ্যা ২৬ অধিক হওয়ায় চান্দ্র তৎপূর্ব্ব অর্থাৎ চান্দ্র কার্ত্তিক মাসে জন্ম হইয়াছে। তাঁহার জন্মতিথি হইবে চান্দ্র কার্ত্তিক কৃষ্ণা একাদশী।

স্বামী যোগানন্দ

"শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা" গ্রন্থে স্বামী যোগানন্দ মহারাজের জন্মতারিখ ১৮ই চৈত্র ১২৬৭ সাল, ফাল্গুনী কৃষ্ণা চতুর্থী দেওয়া আছে। চান্দ্র ফাল্গুন হিসাবে এই জন্মতারিখ স্থির করা হইয়াছে। বাংলা দেশে জন্মমাস বলিতে সৌরমাস বুঝায়। সৌর ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী হিসাবে তাঁহার জন্মতারিখ ১৭ই কিম্বা ১৮ই ফাল্গুন হইবে। বর্ত্তমানে চান্দ্র ফাল্গুন কৃষ্ণা চতুর্থী তিথিতে তাঁহার জন্মতিথি প্রতিপালিত হইতেছে, কিন্তু সৌর ফাল্গুন মাসের দিনসংখ্যা ১৭ই কিম্বা ১৮ই অপেক্ষা কৃষ্ণা চতুর্থী তিথির সংখ্যা ১৯ অধিক হওয়ায় তাঁহার জন্মতিথি চান্দ্র মাঘ কৃষ্ণা চতুর্থী হইবে। ফল বিচারে ১৮ই ফাল্গুন তাঁহার জন্মতারিখ হয়, এবং তাঁহার যে জন্মসময় ও এফেমেরিস্-মতে তৎকালীন যে রবি ও চন্দ্রস্ফুট পাওয়া যায়, তদনুসারেও তাঁহার জন্মতিথি চান্দ্র মাঘ কৃষ্ণা চতুর্থী হয়।

স্বামী প্রেমানন্দ

তাঁহার জন্ম শকাব্দাদি ১৭৮৩।৭।২৫।৪৩।৫।০, মঙ্গলবার, অর্থাৎ জন্ম ২৬শে অগ্রহায়ণ, ১২৬৮ সাল (ইং ১০ই ডিসেম্বর ১৮৬১ খৃঃ) ৪৩ দণ্ড ৫ পল। স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের এই জন্মতারিখ ও সময় তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু শান্তিরাম ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। এই দিন পুরাতন পঞ্জিকা মতে সূর্য্যোদয় ঘ ৬।৪০।৪৮ সময়ে হইয়াছিল এবং শুক্লা নবমী তিথি ৫০ দণ্ড ২ পল পর্য্যন্ত ছিল। ঘড়ির সময় অনুসারে জন্মসময় রাত্রি ১১টা ৫৫মিঃ এবং নবমী তিথির স্থিতিকাল রাত্রি ২টা ৪২ মিঃ পর্য্যন্ত হয়। সুতরাং পুরাতন পঞ্জিকা মতে শুক্লা নবমী তিথিতে তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং ইহাই তাঁহার প্রচলিত জন্মতিথি।

জন্মসময়ে এফেমেরিস্-অনুসারে সায়ন চন্দ্রস্ফুট ০।৬।৫২ এবং রবিস্ফুট ৮।১৮।৪৫ ; চন্দ্র হইতে রবিস্ফুটের বিয়োগফল ১০৮ অংশ ৭ কলা। ইহাকে ১২ দিয়া ভাগ দিলে ভাগফল ৯ হয় এবং ৭ কলা অবশিষ্ট থাকে। সুতরাং জন্মসময়ে নবমী তিথি গত হইয়া দশমী তিথি চলিতেছিল। এফেমেরিস্-অনুসারে তিনি শুক্লা দশমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তারিখের সংখ্যা ২৬ অপেক্ষা তিথির সংখ্যা ১০ কম হওয়ায় স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের জন্মতিথি চান্দ্র অগ্রহায়ণ শুক্লা দশমী হইবে।

উপরি লিখিত রবি ও চন্দ্রস্ফুট হইতে দেখা যায় যে, নবমী তিথি রাত্রি প্রায় ১১টা ৪১ মিঃ পর্য্যন্ত ছিল, এবং পুরাতন পঞ্জিকার সহিত ইহার প্রায় তিন ঘণ্টা প্রভেদ। এফেমেরিসের তিথির সহিত বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত পঞ্জিকার তিথির মিল হয়, এবং ইহার সহিত প্রাচীন মতাবলম্বী-পঞ্জিকার তিথি-স্থিতিকালের প্রায় চারি পাঁচ ঘণ্টা পর্য্যন্ত প্রভেদ এখনও দেখা যায়।

স্বামী সুবোধানন্দ

তাঁহার জন্ম ২৩শে কার্ত্তিক, ১২৭৪ সাল, শুক্রবার, ইং ৮ই নভেম্বর, ১৮৬৭ খৃঃ, রাত্রি ১০টা ৩০ মিনিট। স্বামী সুবোধানন্দ মহারাজের এই জন্মতারিখ ও সময় তাঁহার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু সিদ্ধেশ্বর ঘোষ মহাশয় এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত বাবু অনন্তরাম ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে প্রাপ্ত। তাঁহার প্রচলিত জন্মতিথি চান্দ্র কার্ত্তিক শুক্লা একাদশী। পুরাতন পঞ্জিকা মতে এই তারিখে শুক্লা একাদশী তিথি দিবা ৮ দণ্ড ৩৬ পল অর্থাৎ বেলা প্রায় ৯টা ৫৪ মিঃ পর্য্যন্ত ছিল। সুতরাং তাঁহার জন্মসময়ে শুক্লা দ্বাদশী তিথি হয়। জন্মসময়ে এফেমেরিস্-অনুসারে সায়ন চন্দ্রস্ফুট ০।২।৪০ এবং রবিস্ফুট ৭।১৬।৫০ ; ইহা হইতেও গণনায় জন্মসময়ে শুক্লা দ্বাদশী তিথি পাওয়া যায়। দেশী ও বিলাতী উভয় পঞ্জিকা-মতে তাঁহার জন্মতিথি চান্দ্র কার্ত্তিক শুক্লা দ্বাদশী হইবে।

আশা করি স্বামিজীর প্রকৃত জন্মতারিখ ও সময় এবং উপরোক্ত মহাপুরুষগণের জন্মতারিখ ও জন্মতিথি সম্বন্ধে পাঠক-পাঠিকাগণ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

হের ঐ কাঙ্গালিনী মেয়ে

অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন, এম্-এ, পি-আর্-এস্

পূজা ও শারদীয় উৎসব আগতপ্রায়। কানে ভাসে, কবিগুরুর কথা—

"আনন্দময়ীর আগমনে
আনন্দে গিয়াছে দেশ ছেয়ে—"

কিন্তু বিরস বদনে কাঙ্গালিনী মেয়ে দাঁড়াইয়া। এ উৎসবে কেহ তো তাহাকে আপনার মনে করিয়া আদর করে না। মাতৃহারা যদি মা না পায়, কবি ক্ষোভে বলিতেছেন, তবে আজ কিসের উৎসব, কেন এই মঙ্গল কলস, সহকার পল্লব! উৎসবের দিনে চিত্ত উদার ও প্রশস্ত হওয়ার কথা, শুধু কাঙ্গালী-ভোজন নয়, দরিদ্রদের এক দিন—কি তিন দিনই হউক—এক মুঠা আহার দেওয়া নয়, তাহাদের সঙ্গে একাত্মবোধই উৎসবের দিনে প্রয়োজন। শারদীয় উৎসবে বাঙ্গালীর মন আনন্দে বিভোর; 'মা এসেছেন', 'বৎসরের এই কয়টা দিন'—'সার্বজনীন' হইলেও লোকের অনুভূতির মধ্যে ফাঁকি নাই, কপটতা নাই। কিন্তু এই অনুভূতি কেন সুপরিচালিত হইয়া আমাদের আরও কল্যাণের পথে অগ্রসর করে না? অর্থের কথাই বলিতেছি—অর্থ আমাদের কলিকাতা শহরেই কম ব্যয় হয় না। কিন্তু সেই অর্থ কি একটু হিসাব করিলে জাতীয় কল্যাণের পথে কিছু ব্যয় করা যায় না? সমবায়ে, লোকের সঙ্গে অন্যান্য পল্লীর সঙ্গে হাত মিলাইয়া কাজ করিতে পারিলে আমাদের জাতীয় অর্থাৎ সার্বজনীন উন্নতি হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই—উৎসবের আনন্দ আরও জমাট হইবে।

আনন্দ বিলাইতে হইবে; কিন্তু ঐ যে বাস্তহারা ভূমিহীন কৃষক রাষ্ট্রে আশ্রয় খুঁজিয়া ফিরিতেছে, কি করিয়া উহার মনের আনন্দের বাস্তব ভিত্তি দেওয়া যায়, বলিতে পারেন? মানুষের যে তিনটি পরম প্রয়োজন—দুমুঠো ভাত, পরিবার কাপড়, মাথা গুঁজিবার ঠাঁই—কে তাহাকে দিবে, কি করিয়া সে অর্জন করিবে? মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়াও, প্রাণপাত করিয়াও যে এই তিনটি সে জোগাড় করিতে পারে না! সন্ত বিনোবা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ফিরিতেছেন, মুখে তাঁহার ঐ ধ্বনি—সমস্ত ভূমি গোপালের। এ যেন ঈশোপনিষদেরই অনুরণন—

ঈশা বাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ ধনম্॥

সমস্ত জগৎ তো আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। সুতরাং ত্যাগ করিয়া ভোগ কর, অন্যের ধনে লোভ করিও না। কোন্‌টি অন্যের ধন? উত্তর তো আছেই—"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?" "সর্বভূমি গোপালকা হৈ।" মনে পড়ে নোয়াখালীর সাম্প্রদায়িক লুঠতরাজ হত্যাকাণ্ড-অনুষ্ঠানের বহুপূর্বে গান্ধীজী ঐ কথাই জানিতে চাহিয়াছিলেন—জমি কি ভাবে কাহার, কোন্ সম্প্রদায়ের অধিকারে আছে। তাঁহার কথাই মনে পড়ে, যখন দেখি গ্রামে গ্রামে পথে পথে সন্ত বিনোবা ভূমি চাহিয়া ফিরিতেছেন। কৃষক, অথচ কৃষির জমি নাই; এর চেয়ে দারুণ পরিহাস আর কি হইতে পারে? দরিদ্র, তুমি অন্তত দরিদ্রের জন্য দান কর। ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ক্রমবর্ধমান ব্যবধান আছে, তাহা কি কেহ মিটাইতে পারিবে না? পাশ্চাত্ত্যে চেষ্টা চলিতেছে, সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে, বিশেষ করিয়া ধার্য করের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া; কিন্তু তাহাতে কি সেই সমানুভূতি আসে, যাহা পরিণামে

আমাদের কাম্য? শুনিতে পাই, একদিকে যেমন ট্যাক্সের পরিমাণ বাড়িতেছে, অন্যদিকে তেমনই তাহা এড়াইবার চেষ্টা তাল রাখিয়া চলিতেছে। জোর করিয়া ধর্ম হয় না, দান হয় না, 'ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্' প্রাণে অনুভব করা চাই। সন্ত বিনোবা মানুষের কাছে সপ্রেমে চাহিতেছেন ভূমি-দান। কে দিবে? দেওয়ার ক্ষমতা এই নিঃস্ব জাতির আছে কি?

দেখা যাইতেছে, তাহাও আছে, এবং প্রচুর আছে। তেলিঙ্গানায় দেখা গিয়াছে, এখন বিহারেও দেখা যাইতেছে। তেলিঙ্গানায় যাহারা মানুষের সমতা আনিতে চাহিয়াছিল জোরজবর-দস্তিতে বেদখল করিয়া, লুটপাট মারধর করিয়া, তাহাদের কর্মের পরিমাণ ও অল্প সময়ের মধ্যে সেই একই ক্ষেত্রে বিনোবাজী যে সাড়া পাইয়াছিলেন তাহার পরিমাণ তুলনা করিলে আশ্চর্য হইয়া যাইতে হয়। যে বিহারে জমিদারী-বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভূম্যধিকারীর ধর্মবুদ্ধি বিলোপ হইয়া যাইতেছিল, সেখানে আজ বিনোবাজী সুন্দরভাবে কাজ চালাইয়া যাইতেছেন! তাঁহার গতিবেগ সামান্য নয়। আর আজ তিনি ভূমিদানেই নিজেকে সীমিত করেন নাই। যাহার বিত্ত আছে, তাহাকেও যে তাহা ভাগ করিয়া লইতে হইবে। ইতিপূর্বে আর্থিক সমতা আনিবার জন্য শ্রীকুমারাপ্পা প্রভৃতি যে আন্দোলন চালাইতেছিলেন, তাহার গুরুত্ব এই ভূমিদানের সঙ্গে সঙ্গে আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আয়ের ষষ্ঠ ভাগ দান কর—ব্যক্তি বিশেষকে নয়, জাতীয় কল্যাণের জন্য দান কর—এই আহ্বানের দ্বারা আমাদের চিত্ত উদ্বোধনের চেষ্টা চলিতেছে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের মন্ত্রে ভাবিত আমেরিকান মহিলা-কবি এলা হুইলার উইলকক্সের একটি কবিতা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে। শ্রীমতী উইলকক্সের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা এককালে আমাদের দেশে বেশ প্রচলিত ছিল। তাহার একটি Poems of Power এর অন্তর্নিবিষ্ট The Voices of the People নামে কবিতা। ১৯১৪ সালের যে প্রতিলিপিটি আমার কাছে আছে, তাহা উনবিংশ সংস্করণের। তাহার ভূমিকাতেও আছে ঐ ঈশোপনিষদের কথা—The Divine Power in every human being, ঘটে ঘটে নারায়ণের কথা। কি আশ্চর্যভাবে তিনি বিশেষ করিয়া এই ভূদানের কথাই বলিয়াছেন, আমাদের কথারই অনুরূপ ভাষায় বলিয়াছেন,—জগৎকে যদি সংকট হইতে উদ্ধার করিতে চাও, তবে স্বেচ্ছায় ভূমি দান কর—

I

Oh! I hear the people calling through
the day time and the night time,
They are calling, they are crying for
the coming of the right time.
It behoves you, men and women,
it behoves you to be heeding,
For there lurks a note of menace
underneath their plaintive pleading.

2

Let the land-usurpers listen, let the
greedy-hearted ponder,
On the meaning of the murmur, rising
here and swelling younder!
Swelling louder, waxing stronger, like
a storm-fed stream that courses
Through the valleys, down abysses,
growing, gaining with new forces.

3

Day by day the river widens,
that great river of opinion,
And its torrent beats and plunges
at the base of greed's dominion.

Though you dam it by oppression
 and fling golden bridges o'er it,
Yet the day and hour advances
 when in fright you'll flee before it.

4

Yes, I hear the people calling,
through the night time and the day time,
Wretched toilers in life's autumn,
 weary young ones in life's May time—
They are crying, they are calling
 for their share of work and pleasure;
You are heaping high your coffers
 while you give them scanty measure,
You have stolen God's wide acres,
 just to glut your swollen purses—
Oh! restore them to His children
 ere their pleading turns to curses.

কবি উইলকক্সের এই কবিতা সময়োপযোগী হইবে বলিয়া ইহা সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি যেন বর্তমান ভূদান-আন্দোলন প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কাব্য রচনা করিয়াছেন। ভগবানের সন্তানদিগকে বঞ্চনা করিয়া আমরা যে জমি ভোগ করিতেছি, আমাদের পরস্বাপহরণের সেই ফল পুনর্বণ্টন করিয়া না দেওয়া পর্যন্ত তাহার প্রায়শ্চিত্ত হইবে না, জগতেও এই অস্বাভাবিক বৈষম্য দূর হইয়া স্থায়ী ভিত্তিতে শান্তিসৌধ নির্মিত হইবে না। তার জন্য ঐ মন্ত্রেরই অনুধ্যান চাই—ঈশা বাস্যমিদং সর্বম্।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

নূতন দিল্লী শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন—এই শাখা-কেন্দ্রের ১৯৫২ সালের কার্যবিবরণী আমাদের হস্তগত হইয়াছে। দিল্লীতে মিশনের কর্মধারা প্রধানতঃ তিন প্রকার :—(১) ধর্মপ্রচার (২) লোক-শিক্ষা (৩) পীড়িত-সেবা

প্রতি রবিবারে আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী রঙ্গনাথানন্দ কর্তৃক ব্যাখ্যাত ভগবদ্গীতা বিষয়ক একটি ক্লাশে শহরের সর্বস্তরের শত শত শিক্ষিত নরনারী সাগ্রহে আসিয়া থাকেন। শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে অনেক ছাত্র-ছাত্রীও থাকে। পুরাতন দিল্লীতেও প্রতি শনিবার অপরাহ্ণে ধর্মসম্বন্ধীয় আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণের সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার জন্যও প্রতি রবিবার একটি ক্লাশ বসে; আলোচ্য বর্ষে ১২০ জন শিক্ষার্থী ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী, খ্রীষ্ট-জয়ন্তী, বুদ্ধ-পূর্ণিমা এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ১১৭তম তিথি ও স্বামী বিবেকানন্দের ৯০তম জন্মবার্ষিকী মহা সমারোহে উদ্যাপিত হইয়াছিল। শেষোক্ত উৎসবে স্কুল এবং কলেজের ছাত্রদের ভিতর 'বিশ্বসৌভ্রাত্রে স্বামী বিবেকানন্দ'-সম্বন্ধে রচনা আবৃত্তি এবং বক্তৃতা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্মোৎসবে অন্যতম উল্লেখ-যোগ্য বিষয় ছিল—শিশুদিবস এবং মহিলাদিবস। শিশুদিবসে দশ বৎসর বয়সেরও কম বয়স্ক বালক-গণ কর্তৃক শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের কয়েকটি ঘটনার অভিনয় প্রদর্শন অত্যন্ত চিত্তগ্রাহী হইয়াছিল। এই শিশুদিবস ও মহিলাদিবস স্থানীয় সারদা মহিলা সমিতি কর্তৃক আয়োজিত এবং উদ্যাপিত হয়। আলোচনা-সভার পরিচালনা করেন শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী।

আশ্রমের পাঠাগারে বর্তমানে ৪৭৯৪টি পুস্তক আছে। সর্বসাধারণের পড়িবার জন্য ১১টি সংবাদপত্র এবং ৭১টি সাময়িক পত্রিকা লওয়া হয়। এখানে প্রচুর পাঠক আসিয়া থাকেন।

দাতব্য চিকিৎসালয়ে এ বৎসরে ৫৪,৫৫৪ জনের চিকিৎসা করা হয়; তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ১২৬৪১। সাধারণত হোমিওপ্যাথি মতেই ঔষধ দেওয়া হয়। মিশন পরিচালিত 'টিউবার-কিউলোসিস্ ক্লিনিক'টি বহুপ্রকার আধুনিক সাজ-সরঞ্জাম-সমন্বিত। আলোচ্য বৎসরে ৬১,৪৭২ জন রোগীর চিকিৎসা করা হইয়াছে—তন্মধ্যে নূতন রোগীর সংখ্যা ছিল ১৪২৯।

দুর্ভিক্ষে এবং বন্যায় সেবাকার্য—মহারাষ্ট্রে (আহমদনগর জেলায়) সমারব্ধ দুর্ভিক্ষ-সেবাকার্য সেপ্টেম্বরের প্রথমে সমাপ্ত হইয়াছে। ২০শে জুলাই হইতে ২১শে আগষ্ট পর্যন্ত ৫৯,৫৯৭ জন নরনারীকে ৪টি কেন্দ্র হইতে রন্ধিত খাদ্য বিতরণ করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া বিতরিত কাঁচা খাদ্যশস্যের পরিমাণ ছিল ২৯৪ মন।

দ্বারভাঙ্গা জেলায় বন্যাপীড়িত অঞ্চলে মিশনের পাটনা কেন্দ্র সেবাকার্য আরম্ভ করিয়াছেন। পূর্ব গোদাবরী জেলায় বন্যাবিধ্বস্ত এলাকাতেও মিশন দুর্গত অধিবাসিদিগের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের কাজ করিতেছেন।

প্রভিডেন্স্ বেদান্তকেন্দ্রে অনুষ্ঠান—আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের প্রভিডেন্স্ শহরস্থিত বেদান্ত-কেন্দ্রের পঞ্চবিংশতিবর্ষ পূরণ উপলক্ষে গত ২০শে সেপ্টেম্বর উক্ত আশ্রমে একটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। খ্রীষ্ট ও য়াহুদী ধর্মের কয়েকজন ধর্মনেতা এবং সিয়েট্‌ল্ (ওয়াশিংটন), সেন্ট লুই ও নিউইয়র্ক কেন্দ্রের অধ্যক্ষত্রয় (যথাক্রমে: স্বামী বিবিদিষানন্দজী, স্বামী সৎপ্রকাশানন্দজী ও স্বামী পবিত্রানন্দজী) বক্তার আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিউইয়র্ক মেথডিষ্ট চার্চের রেভারেণ্ড অ্যালেন ই ক্ল্যাক্স্‌টন, ডি-ডি বলেন যে, ব্রাউন, বোষ্টন এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভিডেন্স্ 'কেন্দ্রের সুযোগ্য নেতা স্বামী অখিলানন্দজীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আগত অনেকগুলি অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়াছেন। আমেরিকার ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের এখন বেদান্তের পঠন-পাঠন হইয়া থাকে। স্বামী বিবিদিষানন্দজী তাঁহার ভাষণে প্রসঙ্গত বলেন, আমেরিকায় বেদান্ত কাহাকেও ধর্মান্তরিত করিতে আসে নাই। ইহা সকল ধর্ম ও মতকেই গ্রহণ করে। য়াহুদী রাবী উইলিয়ম জি ব্রড এবং ব্রাউন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক কুর্ট জে ডুকাস্ স্বামী অখিলানন্দজীর শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব এবং বহু-সমাদৃত কাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র চৌধুরী প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয়। পৃষ্ঠা:—(ডিমাই) ৩০০; মূল্য: ৫৲ টাকা। শ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গাদি প্রামাণিক আকরগ্রন্থ-অবলম্বনে সর্বসাধারণের উপযোগী জীবনী-গ্রন্থ। ছয়টি চিত্রে শোভিত।

কৈলাস ও মানসতীর্থ—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। উদ্বোধন কার্যালয়। পৃষ্ঠা: ২২০; মূল্য: ২৷৷০ টাকা।

সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ—স্বামী অপূর্বানন্দ প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, মুঠি-গঞ্জ, এলাহাবাদ পৃষ্ঠা: ২৫০; মূল্য: ৩৲ টাকা।

The Cultural Heritage of India—Second Edition: Revised and Enlarged, Volume III. (The Philosophies) Published by the R. K. Mission Institute of Culture, 111, Russa Road, Calcutta-26. Double Crown 8vo Size (10" × 7½").720pages.Price;Rs. 30/-.

Talks on Jnana-Yoga—By Swami Iswarananda. Published by Sri Ramkrishna Ashrama, The Vilangans, Trichur (Travancore & Cochin). Price Rs. 1-8-0.

উদ্বোধন

দুর্বার বিষয়-তৃষ্ণা

ভ্রান্তং দেশমনেকদুর্গবিষমং প্রাপ্তং ন কিঞ্চিৎ ফলং
ত্যক্ত্বা জাতিকুলাভিমানমুচিতং সেবা কৃতা নিষ্ফলা।
ভুক্তং মানবিবর্জিতং পরগৃহেষ্বাশঙ্কয়া কাকবৎ
তৃষ্ণে জৃম্ভসি পাপকর্মপিশুনে নাদ্যাপি সংতুষ্যসি ॥

উৎখাতং নিধিশঙ্কয়া ক্ষিতিতলং ধ্মাতা গিরের্ধাতবো
নিস্তীর্ণঃ সরিতাং পতির্নৃপতয়ো যত্নেন সন্তোষিতাঃ।
মন্ত্রারাধনতৎপরেণ মনসা নীতাঃ শ্মশানে নিশাঃ
প্রাপ্তঃ কাণবরাটকোঽপি ন ময়া তৃষ্ণে সকামা ভব ॥

—ভর্তৃহরি, বৈরাগ্যশতকম্ (২, ৩)

অর্থের আশায় অনেক বিপৎসঙ্কুল দুর্গম স্থানে ঘুরিয়া মরিলাম, কিন্তু কোন ফলই হইল না; জাতিকুলের যথোচিত মর্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া ধনীজনের সেবা করিয়া ফিরিলাম, কিন্তু বৃথা—সবই বৃথা। আত্মসম্মান-বর্জিত দীন প্রত্যাশায় পরের গৃহে কাকের মতো ভয়ে ভয়ে উদরপূর্তি করিয়া বেড়াইতে হইল। হীন-কর্মের প্ররোচক হে তৃষ্ণে, তুমি তো এখনও তুষ্ট হইলে না, তোমার বিলাস-চাতুরী তো ক্রমাগত বাড়িয়াই চলিয়াছে!

মণিরত্নের লোভে ক্ষিতিতল খনন করিয়াছি, পাহাড় কাটিয়া ধাতব পাথর গলাইয়াছি, সমুদ্র ডিঙাইয়াছি। কত রাজা-রাজড়ার তোষামোদ করিয়া বেড়াইয়াছি, আবার মন্ত্রজপ ও দেবারাধনায় শ্মশানে কত রাত্রি কাটাইয়া অলৌকিক উপায়ও অবলম্বন করিয়া দেখিয়াছি; কিন্তু হায়, একটি কানাকড়িও তো মিলিল না। হে তৃষ্ণে, এইবার তুমি শান্ত হও।

কথাপ্রসঙ্গে

একতার স্লোগান

সময়ে সময়ে এক একটি স্লোগান বা বাঁধাবুলি এক এক মানবগোষ্ঠিকে এক একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও ব্যাপৃতিতে মাতাইয়া তুলে। ঐ স্লোগানকে অবলম্বন করিয়া মানুষ পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা (সাময়িকভাবে হইলেও) ভুলিয়া যায় এবং সকলের মধ্যে একটি একতার বন্ধন বেশ দৃঢ় হইয়া উঠে। স্লোগানের শক্তি কম নয়। এই জন্যই বোধ করি, মানবসমাজের যাঁহারা নেতৃত্ব করিতে চান তাঁহাদিগকে সর্বাগ্রে একটি চিত্তাকর্ষক স্লোগান আবিষ্কার করিতে হয়।

স্লোগান কিন্তু সব সময়ে সত্যে প্রতিষ্ঠিত নয়—সত্যের মুখোস পরিয়া আসে মাত্র। অনেক সময়েই উহা আলেয়ার আলো—বহু আশা দেখায়, অনেক দূর হাতছানি দিয়া ডাকিয়া লইয়া যায় - অবশেষে একদিন আশার প্রাসাদ ধসিয়া পড়ে, পথিক দেখে—বিজন প্রান্তরে সে একান্তই একা—নিঃসহায়, নিরুপায়।

ধর্ম লইয়াও বহু স্লোগান ইতিহাসে তাহার ক্রিয়াশীলতার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছে—বিরাট সঙ্ঘবদ্ধতা, অবিশ্বাস কর্মোদ্যম, সমাজের বিস্তৃত কল্যাণ—আবার ভয়াবহ বিদ্বেষ, বিশাল ক্ষতিও। অবিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' 'জেহাদ'—এ সব গুলিরই পশ্চাতে ছিল স্লোগানের শক্তি। সহস্র সহস্র লোক জাতি কুল ঐশ্বর্য ভুলিয়া এক ধর্মের নামে এক হইয়াছে, সমধর্মাশ্রয়ীদের জন্য বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়াছে, আবার অপর ধর্মাবলম্বীদের সহিত লড়িয়াছে, মারিয়া কাটিয়া পৃথিবীতে রক্তের নদী বহাইয়াছে। একতার স্লোগান একতা আনিয়াছে বটে, কিন্তু সীমাবদ্ধ একতা —যেখানে প্রেম এবং বিদ্বেষ দুইই একই সঙ্গে মিশিয়া আছে, কল্যাণ এবং অকল্যাণ দুইই যুগপৎ প্রভাব বিস্তার করিতেছে। বলিও না, ইহাই জগৎ-রীতি—আলোক-আঁধার-যুক্ত মায়িক ঘটনার লক্ষণ। বরং, ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ, ঐ অদ্ভুত দ্বন্দ্বের জন্য দায়ী মানুষেরই ভুল—তাহার স্বার্থ-বুদ্ধি, অহংকার, দম্ভ – তাহার অপরিণত, আংশিক সত্যে স্থাপিত স্লোগান।

খ্রীষ্টধর্ম এবং ইসলাম দুইই বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা বলিয়া থাকেন, উহাদের স্ব স্ব প্রচারকগণ দেখাইতে চান, মানুষের মধ্যে একতা সংস্থাপন করিতে ঐ ঐ ধর্মের কী অদ্ভুত শক্তি। সত্য; কিন্তু বিশ্লেষণী চশমার তেজ একটু বাড়াইয়া যখন তাঁহাদের কথা ও কাজ নিরীক্ষণ করি তখন দেখিতে পাই, তাঁহাদের বিশ্বভ্রাতৃত্বের স্লোগানে একটি বৃহৎ ফাঁক রহিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের বিশ্ব খ্রীষ্টান-বিশ্ব, মুসলমান-বিশ্ব। যাহারা যীশুকেই একমাত্র ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া স্বীকার করে না অথবা মসজিদে গিয়া কলমা পড়ে না তাহারা এই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আলোক ও উত্তাপ হইতে প্রায়শই বঞ্চিত।

ভগবান বুদ্ধ একদা তাঁহার মানব-প্রেমে বিশ্বজনকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। মানব,—জগতের সকল মানবেরই জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল। শাস্তার বাণী—সরল চতুরার্য সত্য—অষ্টশীলমার্গ—অপ্রতিহত শক্তিতে দিকে দিকে সকলের অন্তর স্পর্শ করিয়াছিল, কেন না, উহাতে শাস্ত্র-দেবতা-পুরোহিতের নির্মম বন্ধন ও অত্যাচার ছিল না। ত্রিশরণমন্ত্রের স্লোগান (বুদ্ধং সরণং গচ্ছামি, ধম্মং সরণং গচ্ছামি, সঙ্ঘং সরণং গচ্ছামি)—কে অবলম্বন

করিয়া অভূতপূর্ব ধর্মীয় একতা গড়িয়া উঠিল। কিন্তু এ স্লোগানেও ফাঁক ছিল। তাই, বুদ্ধোত্তর বৌদ্ধধর্মের একতা আপন ধর্মের গণ্ডীতেই সীমাবদ্ধ রহিল। সমগ্র মানবকে আলিঙ্গন করিবার সত্য উহার স্লোগানে ছিল না।

শ্রীচৈতন্যদেব বাঙলায়, উড়িষ্যায়, বৃন্দাবনে ধর্মজীবনের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে একটি বিস্ময়কর একতা আনয়ন করিয়াছিলেন। স্লোগান—হরিনাম; জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণবসেবন। জাতি ভুলিয়া, আভিজাত্য ভুলিয়া হাজার হাজার লোক নাম সংকীর্তনে পরস্পর পরস্পরের সহিত নিবিড় ঐক্য অনুভব করিয়াছিল, এখনও করে। কিন্তু একথাও সত্য যে পরবর্তী শ্রীচৈতন্যানুগগণ বৌদ্ধ ও শিবভক্তকে 'কৃষ্ণসংকীর্তন' করাইতে উৎসাহবোধ করিয়াছিলেন। (শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ৯ম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবের একতা সেইজন্য হইয়া দাঁড়াইল বৈষ্ণবেরই একতা—সর্বমানবের জন্য নহে। যদি বল, সকল মানুষকে বৈষ্ণব করিয়া লইয়া তবে কোল দিব, তাহার উত্তর—এই বৈচিত্র্যময় পৃথিবীতে উহা হইবার নয়; উপনিষদের ঋষি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন—'অনন্তং বৈ নামা'—অনন্ত অভিব্যক্তি, অনন্ত সংজ্ঞা, অনন্ত রুচি—সকলেই এক পথে যাইবে কেন?

ধর্ম বাঁধে, আবার বিচ্ছিন্নও করে; সে বোধ করি, একটা নির্দিষ্ট মতকে না মানাইয়া, একটি বিশেষ পতাকাকে সেলাম না করাইয়া বাঁধিতে পারে না। তাই, বিশ্বমৈত্রীকামী কোন কোন চিন্তানায়ক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, ধর্মের কর্ম নয় বৃহত্তম সংগঠন—জীবন-তান্ত্রিক অন্য কোন স্লোগান চাই,—যাহা মানুষের দৈনন্দিন সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষার সহিত নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত—অতীন্দ্রিয়—কুয়াসা—বিমুক্ত। উহা মানুষ সহজেই বুঝিবে—বুঝিয়া জীবন্তভাবে অনুসরণ করিবে। 'Workers of the world unite' (পৃথিবীর সকল শ্রমিক এক হও)—সাম্প্রতিক কালের এইরূপ একটি শক্তিশালী স্লোগান। এই স্লোগানের ক্রিয়া আমরা বর্তমান দুনিয়ায় অহরহ প্রত্যক্ষ করিতেছি। শ্রমিকরা সকলে সঙ্ঘবদ্ধ হইতেছে—সমান জীবনসমস্যায় পড়িয়া পারস্পরিক সহানুভূতিতে পৃথিবীর দূর দূরান্তরের লোক একতা অনুভব করিতেছে (জাতি, দেশ এমন কি, ধর্মেরও গণ্ডী ছাড়াইয়া)। সত্য; কিন্তু এখানেও সঙ্ঘর্ষের বিরাম নাই, স্বধর্ম-বিধর্ম-বোধের চেয়েও প্রখরতর বিদ্বেষ মাথা তুলিতেছে। বৈষয়িক স্বার্থবোধ এখানে প্রবল; এই হেতু স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হইলে একশ্রেণীর শ্রমিক অপর শ্রেণীর শ্রমিককে দাবাইতে, পিষিয়া ফেলিতে পশ্চাৎপদ হয় না যদিও উভয়েই তাহারা একই স্লোগানের উপাসক। তাই বলিতে হয়, বিশ্বের সকল মানুষকে এক করা তো দূরের কথা, শুধু শ্রমিক-মানুষকেও স্থায়ী মৈত্রীতে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রেরণা উপরোক্ত স্লোগানে নাই।

যথার্থ একতার স্লোগান তবে কি? কোন্ পথে উহা আসিবে? মানুষের মানুষকে এক বলিয়া গ্রহণ করিবার বিবিধ বাধা কি ভাবে অপসারিত হইবে? বর্ণ নাই, জাতি নাই, দেশ নাই, সামাজিক পরিচয় নাই, কোনও প্রকার মতবাদ নাই—আছে শুধু মানুষের মনুষ্যত্ব—এমন একটি সত্যবোধ কবে মানুষের বুদ্ধিকে স্তম্ভিত করিবে? মানুষ মানুষ বলিয়াই মানুষকে মর্যাদা দিবে, আলিঙ্গন করিবে?

ব্যাধিক্লিষ্ট মানব এক সময়ে জড়ি-বুটি, মন্ত্র-তন্ত্র করিয়া নিরাময় হইবার চেষ্টা করিত। উহাতে বিশ্বাসের প্রয়োজন হইত, একটা নির্দিষ্ট মানসিক প্রবণতা না থাকিলে ঐ উপায়ে আরোগ্যলাভ সম্ভবপর হইত না। তাই ঐ চিকিৎসা-প্রণালী সর্বজনীন ছিল না—উহা ছিল সংস্কার-গত,

গোষ্ঠীগত। এখনকার ব্যাধি-প্রতীকারসমূহ ঐরূপ সীমাবদ্ধ নয়। পেনিসিলিন বর্ধমানের শক্তিগড়েও চলে, সীমান্তের পেশওয়ারেও চলে। ইন্দোনেসিয়া, চীন, সুইডেন, পেরু, সব দেশের রোগীকে দায়ে পড়িলে পেনিসিলিন ঠুকিয়া দেওয়া হয়—সব দেশের পীড়িতই চাঙ্গা হইয়া উঠে। শারীর-বিজ্ঞান সকল মানুষের ক্ষেত্রেই এক ; ঐ বিজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ চিকিৎসা-ধারা তাই মানুষে মানুষে বিভিন্ন নয়। আমরা যখন পৃথিবীবাসীর মধ্যে মৈত্রীর কথা বলি তখন উহার উপায়কেও সর্বজনীন মানব-বিজ্ঞানে অধিশ্রিত করা প্রয়োজন। যে স্লোগান মানুষের কোন বাহিরের পরিচয়কে ঘোষণা না করিয়া তাহার অন্তরতম সত্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে উহাই যথার্থ একতার স্লোগান। প্রাচীন-কালে ভারতবর্ষে এই স্লোগান আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উপনিষদ যখন 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা' বলিয়া ডাক দিয়াছিলেন তখন তিনি কোন এক নির্দিষ্ট ধর্মাবলম্বীকে, কোন এক বিশেষ মতানুসারীকে ডাকেন নাই—আহ্বান করিয়াছিলেন বিশ্বের সকল মানুষকে। সকল মানুষের মধ্যে এক আত্মিক সত্য রহিয়াছে, এক অমৃতত্ব রহিয়াছে। সকল মানুষই তাই তাঁহার চোখে ছিল এক। শাস্ত্র নাই, পুরোহিত নাই, স্বর্গ নাই, নরক নাই, জাতি-জীবিকা-বর্ণ, মতবাদ-কল্পনা নাই—আছে শুধু অবিসংবাদিত, অসন্দিগ্ধ, অতি-স্পষ্ট, অতি-ভাস্বর মানব-সত্য—নিকটে আবার দূরে, আজ আবার কাল, ব্যষ্টিতে আবার সমষ্টিতে। 'অমৃতস্য পুত্রা'—ইহাই সর্বকালের বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠ একতার স্লোগান।

দুর্গোৎসবের শিক্ষা

জ্ঞানবৃদ্ধ প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যসেবক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'দুর্গোৎসবের শিক্ষা'র দিকে চিন্তাশীল দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন (দৈনিক বসুমতী, ৮ই কার্তিক, রবিবার)। পল্লীতে পল্লীতে সর্বজনীন দুর্গাপূজার আয়োজন। বহু আড়ম্বর, গানবাজনা, আলোকসজ্জা। আবার মণ্ডপের পার্শ্বেই ফুটপাথে গৃহচ্যুত, অন্নহীন সর্বহারাদের ভিড়। শুধু পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু নয়—পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের দুর্ভিক্ষপীড়িত কৃষক-পরিবারের পুরুষ-স্ত্রী-শিশুগণও।

আমি বহু প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম—উৎসবের জন্য সংগৃহীত অংশের সামান্য অংশও হাসপাতালে দান করুন ও দরিদ্রদিগের জন্য কয়খানি বস্ত্রে ব্যয় করুন। কেহ কেহ সে অনুরোধ রক্ষা করিয়াছেন—সকলে করেন নাই। অথচ কেহই এই অনুরোধ যে অযৌক্তিক এমন বলেন নাই।

মানুষের পক্ষে আনন্দের প্রয়োজন কেহ অস্বীকার করে না। কিন্তু যে আনন্দ অপরের সহিত—সকলের সহিত ভাগ করিয়া সম্ভোগ করা যায়, তাহার সার্থকতা অধিক ; সুতরাং উপযোগিতাও অধিক।

এ ক্ষেত্রে তাহাই হইতেছে না।

হেমেন্দ্রবাবু বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, বর্তমান পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার গুণে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে হৃদয়ের ব্যবধান ক্রমশই বৃদ্ধি পাইতেছে। "শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না।" সমাজের সকল স্তরে সমবেদনা যতদিন না দেশবাসীর মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে ততদিন সমাজের কল্যাণ নাই। স্বামী বিবেকানন্দের 'নীচজাতি, মুর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর' প্রভৃতিকে 'নিজের রক্ত, নিজের ভাই' জ্ঞান করিয়া সেবার বাণীর প্রতি সর্বজনীন পূজার উৎসাহিবৃন্দকে হেমেন্দ্র বাবু অবহিত হইতে বলিয়াছেন।

স্বামীজীর স্বপ্নের—দেশভক্তের সাধনার সেই ভারত যে এখনও স্বপ্নলোক ত্যাগ করিয়া বাস্তবলোকে সমাগত হয় নাই, তাহাই ভারতবাসীর দুর্ভাগ্য। তাহার কারণ, শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, ধনীতে দরিদ্রে, ক্ষমতামদমত্তে ও গণসমাজে—সমবেদনার অভাব ; একের দুঃখ-দুর্দশা অন্তকে বেদনা দেয় না। * * *

সর্বজনীন দুর্গোৎসবে অনেক স্থানেই দরিদ্র, নিরন্ন, বস্ত্রহীন, রোগাতুর বাঙ্গালী নরনারী সমাজের সমবেদনার পরিচয় পায় নাই—যে সমবেদনা বেদনার প্রলেপ, জাতির ঐক্যের বন্ধন সেই সমবেদনা তাহাদিগকে আকৃষ্ট করিতে পারে নাই। সেই সকল ক্ষেত্রে উৎসবের সর্বজনীনতা ব্যাহত হইয়াছে।

রাজপথে উৎসবানন্দের পার্শ্বেই পথের উপর নিরন্নের জীবনান্ত—ইহা সমবেদনার অভাব ব্যতীত সম্ভব হয় না—হইতে পারেও না। যতদিন এই অবস্থা সম্ভব থাকিবে, ততদিন দেশের উন্নতি অসম্ভব, ততদিন জাতির বিপদ অনিবার্য। ততদিন নবীন ভারতের জয়ধ্বনি করিবার সময় আসিবে না।

আজকালকার সর্বজনীন পূজাসমূহের প্রতিমা-সম্বন্ধেও বাঙলার এই প্রবীণ চিন্তানায়কের মন্তব্যগুলি বিশেষ অনুধাবনযোগ্য :—

পূর্বে বাঙ্গালার দুর্গাপ্রতিমার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—নূতন আর্টের নামে তাহার নানারূপ পরিবর্তন হইয়াছে। পূর্বে প্রতিমা ছিল একত্রিত—মহাশক্তি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত—তাঁহার দশ বাহু দশ দিকে প্রসারিত এবং তাহাতে নানা অস্ত্র শোভিত; তিনি পশুবলের উপর পদ রাখিয়া শূলে অসুরের বক্ষ বিদ্ধ করিতেছেন—নিয়ন্ত্রিত পশুবল সুপ্রযুক্ত হইয়া শত্রুবধে নিযুক্ত; সঙ্গে লক্ষ্মী সমৃদ্ধির প্রতীক ও সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী, কার্তিকেয়—বলরূপী ও গণপতি। কার্তিকেয়ের বাহন ময়ূর, যে বিষধর সর্পকে গলাধঃকরণান্তে জীর্ণ করিতে পারে, গণপতির বাহন ইন্দুর—নিঃশব্দে কাজ করে—মন্ত্রগুপ্তির প্রতীক। গণপতি বিজ্ঞ—তিনি দ্বিজ। উপরে "চালচিত্রে" বহু দেবতা অঙ্কিত—মধ্যস্থলে মহাদেব—যিনি অকল্যাণ বিষ ভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইয়া সৃষ্টি রক্ষা করিয়াছেন। ধর্মকে মাথার উপর রাখিয়া শক্তির সাধনা করিতে হয়। এখন বাঙ্গালীর একান্নবর্তী পরিবার যেমন শিক্ষার ফলে ও অর্থনৈতিক কারণে বিচ্ছিন্ন—প্রতিমায় দেবদেবীরাও তেমনই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে অবস্থিত—হয়ত হিমাচলের এক একটি শৃঙ্গে।

সর্বজনীন দুর্গোৎসবে—ভক্তির স্থান সাজসজ্জার বাহুল্য অধিকার করে এবং দায়িত্ব কেন্দ্রীভূত হয় না।

সেবার আদর্শ

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার একখানি পত্রে (চিকাগো, ২৮।৫।১৮৯৪) জনৈক মাদ্রাজী যুবক-কর্মীকে লিখিয়াছিলেন—

"কাজের আরম্ভ খুব সামান্য হইল বলিয়া ভয় পাইও না। এই ছোট হইতেই বড় হইয়া থাকে। সাহস অবলম্বন কর। নেতা হইতে যাইও না, সেবা কর।"

উক্ত যুবককেই লিখিত অপর একখানি পত্রে (ওয়াশিংটন, ২৭।১০।১৮৯৪) আছে—

"মূর্খদিগকেও যদি প্রশংসা করা যায়, তবে তাহারাও কার্যে অগ্রসর হইয়া থাকে। যদি সব দিকে সুবিধা হয়, তবে অতি কাপুরুষও বীরের ভাব ধারণ করে। কিন্তু প্রকৃত বীর নীরবে কার্য করিয়া যান। একজন বুদ্ধ জগতে প্রকাশ হইবার পূর্বে শত শত বুদ্ধ নীরবে কার্য করিয়া গিয়াছেন।"

শ্রীচন্দ্রনাথ সৎপতি মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রাম থানার কোন গণ্ডগ্রামে প্রাইমারী স্কুলের একজন দরিদ্র শিক্ষক। কঠিন পীড়ায় অসুস্থ হইয়া চিকিৎসার্থ কলিকাতায় কয়েক মাস কাটাইতে হয়। দেশে ফিরিয়া দেখেন, অজন্মার জন্য দারুণ অন্নকষ্ট অনেকগুলি গ্রামকে এককালে আচ্ছন্ন করিয়াছে। গভর্নমেণ্ট কি করিবে, বিত্তবান জমিদারদের কাছে কবে কৃপাভিক্ষা সার্থক হইবে এ সকলের প্রতীক্ষা না রাখিয়া তিনি তাঁহার নিজের সামান্য শক্তিরই পূর্ণ ব্যবহার করিয়া কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। লিখিতেছেন—

"শ্রীভগবানের আশীর্বাদ মস্তকে ধারণ করিয়া যে মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি ১লা আশ্বিন হইতে তাহা একনিষ্ঠভাবে পালন করিয়া চলিতেছি, আজ পর্যন্ত (১৮ই আশ্বিন) ৯৬৪ জন বুভুক্ষু শিশুর মুখে খাদ্য দিতে পারিয়াছি। এ পর্যন্ত বাহিরের কিছু সাহায্য পাই নাই। নিজেই ঋণ করিয়া চালাইতেছি এবং শেষ পর্যন্ত চালাইয়া যাইবার সঙ্কল্প আছে, কিন্তু সেব্যসংখ্যা যে পরিমাণে বাড়িতেছে, তাহাতে ভগবানের আশীর্বাদ ছাড়া আর কিছু উপায় নাই। সাহায্যপ্রাপ্তির আশায় বহুস্থানে আবেদন জানাইয়াছি, জানি না, কিছু ফলোদয় হইবে কি না।"

এই দরিদ্র পল্লীসেবকের সেবার আদর্শ বাঙলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জড় ও চেতন

'অনিরুদ্ধ'

জড় ও চেতন পর পর আসে,
পর পর মোরে টানে,
আপনারে কভু দেখি জড়-রূপে
কখনো স্বচ্ছ জ্ঞানে।
কভু মোর ধরা শুধু কালি-ভরা
আকাশে কেবলি মেঘ
বাতাস শুধুই হানি উত্তাপ বহিছে তীব্র-বেগ।
জলে নাই রস, সূর্যে দীপ্তি,
চন্দ্রে স্নিগ্ধ আলো
অখিল সৃষ্টি যেন প্রাণহীন অবশ কঠিন কালো।

চকিতে আবার নেহারি পৃথিবী
ভরিল আলোক-বানে
ঊর্ধ্ব গগনে হাসে তারাদল
সমীর শান্তি আনে।
দিবস-যামিনী নাচে পুনরায় আপন ছন্দ পেয়ে
অনাদি অসীম পুলক-চেতনা রহে চরাচর ছেয়ে।

জড়ের দৃষ্টি চোখে যবে লাগে
মানুষ মহিমা-হারা
তারে শুধু দেখি মাংস-পিণ্ড
দেহের জীবনে সারা।
জড়ের প্রবাহে প্রাণের স্পন্দ
নহে অভিনব কিছু
জীবনতৃষ্ণা জড়েরি ধর্ম, মনও বাঁধা জড়-পিছু।
নাহিরে বিশ্বে সত্য, শান্তি,
নাহিরে বিবেক, নীতি
ক্ষণিক বিষয়-সুখ-সম্ভোগ এই তো মানব-রীতি!

কোথা হতে পুনঃ চেতন-পরশ
নয়নে পশিল চুপে
মানব দাঁড়ায় অতিভাস্বর
দেহাতীত কোন্ রূপে।
পৃথিবীর মাটি ডিঙায়ে তাহার গৌরব ছুটে দূর
সপ্তভুবনে ধ্বনিল মানব-সত্য-গীতির সুর:

"ধন্য আমি যে মানুষ, নাহিরে জনম-মরণ-ভীতি
পরম-শুদ্ধি-জ্ঞান-আনন্দ আমারি স্বরূপে স্থিতি।
আমি তো ভিতর, আমিই বাহির, আমিই বৃহৎ অণু
আমিই সূর্য আমিই চন্দ্র আমি প্রজাপতি-মনু।
স্থির জঙ্গম ভূচর খেচর দূর ও নিকটে যারা
দানব দেবতা সকলি হয়েছে আমারি প্রকাশে হারা।"

জড়-চেতনের দ্বন্দ্ব এমনি রয়েছে সতত ঘিরে
আলোক আঁধার সাধক জীবনে পরপর আসে ফিরে।
কোন্ শুভ ক্ষণে তত্ত্বের ভানে এই খেলা হবে শেষ?
অখিল সৃষ্টি মাঝারে কোথাও রহিবে না জড়-লেশ।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের পত্র*

(১)

[স্বামী বিবেকানন্দকে লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ]

নিউইয়র্ক
102, 58th St.
৮ই অক্টোবর, ১৯০১

পূজ্যপাদ স্বামিজী,[১]—

তোমার ১৬ই মে'র কৃপাপত্রটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। এইমাত্র আমি কালিফোর্ণিয়া থেকে ফিরছি—সানফ্রান্সিসকোর বেদান্ত সমিতি বেড়ে চলেছে; কিন্তু জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দিতে সক্ষম এরকম আর একজন সন্ন্যাসী ওখানে দরকার। ডাঃ লোগান আমার ওপর বেশ সদয় ব্যবহার করেছেন। আশ্রমের অবস্থান ঠিক করতে আমি খুবই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। ওখানে পৌঁছুনো বেজায় দুঃসাধ্য ব্যাপার; গ্রীষ্মে ভয়ঙ্কর গরম, শীতকালে তেমনি ঠাণ্ডা। আশ্রমবাসীরা কৌটোয় সংরক্ষিত শাকসব্জী এবং ফল খেয়ে থাকে। ওখানে কিছুই উৎপাদন করতে পারে না, আশে পাশেও কিছু পাওয়া যায় না। ওদের দরকারী জিনিসপত্র সব আসে চল্লিশ মাইল দূরবর্তী সান্ জোস্ (San Jose) থেকে। আমার মনে হয়, ওখানে আশ্রমটি কার্যকরী হবে না।

"জ্ঞানযোগ"-এর বিষয়ে তোমাকে মিঃ লেগেটকে লিখতে হবে। পাণ্ডুলিপি সব প্রস্তুত। বই ছাপাবার জন্য আগাম টাকা দিতে মিঃ লেগেটকে মিস্ ওয়াল্ডো বলেছিলেন, কিন্তু কোন কাজ হয় নি। মিঃ লেগেটের সঙ্গে তুমি কি ব্যবস্থা করেছ, আমি তা জানি না। তুমি তো জানো তোমার সব বইএর ভার তুমি মিঃ লেগেটকেই দিয়েছিলে, আমরা মিঃ লেগেটের কাছে অন্যান্য পুস্তক-বিক্রেতাদের মতো পাইকারী হারে তোমার বই কিনে খুচরো বিক্রি করে থাকি। মিঃ লেগেটকেই তোমার বইএর হিসাবাদি রাখতে হয়। এ বিষয়ে আমাদের কিছু করার হাত নেই। তোমাকেই ঐ সম্বন্ধে মিঃ লেগেটকে লিখতে হবে। তিনি আর কারুর কথা শুনবেন না।

আশা করি তুমি ভাল আছ। আমার সাষ্টাঙ্গ এবং ভালবাসা নিও। ইতি

—দাস কালী

(২)

[স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিত ইংরেজী পত্রের অনুবাদ]

নিউইয়র্ক
102E 58th St.
২৪শে নভেম্বর, ১৯০১

প্রিয় শশী,

তোমার সস্নেহ পোষ্টকার্ডটির জন্য অশেষ ধন্যবাদ। হরিভাই[২]এর বেশ দুঃসময় গিয়েছে। তাকে পাথুরী রোগে ভীষণভাবে আক্রমণ করেছিল, তবে বর্তমানে ক্রমশঃ আরোগ্যের দিকে। হরি ভাই এখন সান্ ফ্রান্সিসকোতে। সম্প্রতি তোমার খবরাখবর দিয়ে তাকে চিঠি দিয়েছি। আমাদের প্রিয় সুহৃৎ কিডি[৩] আর ইহলোকে নেই শুনে খুবই দুঃখিত হলাম।

১ এই সম্বোধনটি মূল বাংলায় লিখিত।

২ স্বামী তুরীয়ানন্দ

৩ স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম মাদ্রাজী শিষ্য অধ্যাপক সিঙ্গারভেলু মুদালিয়র।

* শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজীর নিকট প্রাপ্ত।

আমাদের ঠাকুরের আগামী জন্মতিথির তারিখটি সময়মত জানানর জন্ত তোমাকে বহু ধন্তবাদ।

আমি বর্তমানে সাংঘাতিক কর্মব্যস্ত। আশা করি তোমার ক্লাশগুলি বেশ ভালই চলছে।

আমার প্রীতি ও দণ্ডবৎ নিও।

ইতি দাস কালী

পুনশ্চ :— ইংরেজীতে লিখলাম বলে ক্ষমা কোরো। এটাই তাড়াতাড়ি আসে।

(৩)

[মূল ইংরেজীতে লিখিত]

বোম্বাই
৯ই নভেম্বর, ১৯০৬

প্রিয় শশী ভাই,

তোমার ৭ই নভেম্বরের স্নেহপত্রটি এই মাত্র হাতে পৌঁছুল। ধন্তবাদ। মাদ্রাজে মঠটি এখনও তৈরী হয় নি জেনে দুঃখিত। আশা করি গুরুমহারাজ শীঘ্রই সব কিছু ঠিক করে দেবেন।

আমি আগামী কাল P. & O. S. S. Marmora জাহাজে রওনা হচ্ছি ; সঙ্গে বসন্ত যাচ্ছে। বসন্ত[৪] এবং আমাকে আশীর্বাদ করবার জন্যে শ্রীশ্রীমাকে লিখছি। আমার মনে হয়, সঙ্গে যে বসন্ত যাচ্ছে এ শ্রীশ্রীপ্রভুর এবং স্বামিজীরই ইচ্ছা। ওকে এখন কিছুদিন কাছে কাছেই রাখব এবং আমেরিকায় আমাদের কাজের জন্ত ভাল করে গড়ে তুলব। শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট প্রার্থনা কোরো তার সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ এবং কর্মজীবন সফল হোক ; আর তাকে তোমার আশীর্বাদও পাঠিও।

কলকাতা থেকে বোম্বাই অবধি সর্বত্র আমরা খুব সুন্দর অভ্যর্থনা পেয়েছি। এখানে আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের একটি কেন্দ্র এবং স্থায়ী ভাবে বাস করবে এরকম একজন সন্ন্যাসীর অত্যন্ত চাহিদা রয়েছে। * * * এখানে আমি দুটো বক্তৃতা দিয়েছি, আজকের সান্ধ্য বক্তৃতাটি হবে তৃতীয়। গতকাল সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন এলফিন্‌ষ্টোন কলেজের অধ্যাপক মিঃ উড্‌হাউস্। তিনি ইংরেজ এবং আমাদের দর্শনশাস্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল। আমার ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল— 'ভারতীয় যুবকগণের দায়িত্ব'। সভায় ছাত্রদের এবং বোম্বাইয়ের প্রতিনিধি-স্থানীয় বহু লোকের ভিড় হয়েছিল। আজকে সভানেতৃত্ব করবেন মাননীয় শ্রীগোকুল দাস পরেখ্ ; বিষয়বস্তু—'বাস্তব জীবনে বেদান্ত'।

খগেন অসুস্থ শুনে দুঃখিত। তাকে আমার ভালবাসা ও সহানুভূতি দিও। আশা করি তুমি ভাল আছ। তোমাকে এবং খগেন ও অন্যান্ত বন্ধুদের বিদায়-ভাষণ জানাই। ভালবাসা ও নমস্কার।

তোমার স্নেহের
অভেদানন্দ

৪। পরে স্বামী পরমানন্দ।

ক্ষুদ্রতা

শ্রীব্রহ্মানন্দ সেন

যাহা কিছু প্রয়োজন নিত্য মোর কল্যাণ লাগিয়া,
একে একে তাই দেব তুমি মোরে চলেছ যে দিয়া।
কিছু সুখ সিদ্ধি দিলে, কিছু দিলে দুঃখ বিফলতা,
ঋদ্ধি ও রিক্ততা দিলে, প্রিয়জন-বিরহের ব্যথা।
দুঃখ ও বেদনা ভারে যবে মোর ভেঙে পড়ে হিয়া,
তোমারে যে দোষ দিই মায়াহীন নিষ্ঠুর বলিয়া।
সম্পদের মাঝে বসি' সুখে,যবে পূর্ণ প্রাণমন,
বলিনা তো, 'এই থাক্, আর মোর নাহি প্রয়োজন'।
বলি শুধু, 'দাও দাও, আরো দাও ওহে দয়াময়,
দাও অর্থ, দাও মান, দাও যশ অতুল অক্ষয়'।
আকাঙ্ক্ষার শেষ নাই, যত পাই তত বেড়ে যায়,
হীনতার বোধ নাই, লজ্জা নাই নিজ ক্ষুদ্রতায়।
কামনার মোহবশে ভুলে যাই আপন মঙ্গল ;
বিশ্বাস হারায়ে ফেলি, ভাবিনা কো বিপরীত ফল।
ক্ষুদ্রতার গণ্ডী রচি' তোমারেই রাখি দূরে ঠেলি',
হৃদয় দেবতা তুমি, তোমারেই ছোট করে' ফেলি।

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য স্মৃতি

(এক)

শ্রীঅনুকূল চন্দ্র সান্যাল, এম-এ, বি-এল্

১৩১৫ সনের কথা। চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে। হেমন্তের এক কুহেলীময় প্রভাতে গোমো-হাওড়া প্যাসেঞ্জারে তিনটি বন্ধুসহ রওনা হইয়াছিলাম বর্তমান জগতের পুণ্য তীর্থদ্বয়—কামারপুকুর ও জয়রামবাটি দর্শন করিবার উদ্দেশ্যে। বন্ধুত্রয়ের মধ্যে দুইজন এখন বেলুড়-মঠের প্রাচীন সন্ন্যাসী, আর একজন হইতেছেন বর্তমানে কলিকাতা হাইকোর্টের জনৈক প্রাচীন উকীল।

বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে এক ভদ্রলোক (ট্রেনের কামরায় তাঁহার সহিত আমাদের জীবনে সর্ব-প্রথম পরিচয় হইয়াছিল সেই দিনই) আমাদিগকে তাঁহার বাসায় জলযোগ করাইয়া কামারপুকুরে লইয়া যাইবার জন্য রাত্রিতে গরুর গাড়ীর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। পরের দিন কামার-পুকুরে পৌছিতে পৌছিতে অপরাহ্ণ প্রায় অতীত হইয়া গেল। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। মুস্কিল হইল কামারপুকুর গ্রামের ভিতর প্রবেশ করিয়া। যাহাকে জিজ্ঞাসা করা যায়,—"রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের বাড়ীটি কোথায়?"—সে-ই বলে একই কথা,—"বলতে লারবো বাবু।" আজ লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে ভগবান ঈশার বাণী—"For verily I say unto you, a prophet is without honour in his own land." (আমি তোমাদের বলে রাখি শোনো, অবতার তাঁর নিজের জন্মভূমিতে সম্মান পান না)। জনৈক বন্ধু রহস্য করিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর জিলিপি খেতে ভালবাসতেন, এই ত সামনে জিলিপির দোকান, দোকানদারের বাবা কিংবা ঠাকুরদাদা নিশ্চয়ই তাঁকে জিলিপি তৈয়ারী করে খাইয়েছেন, ওকেই জিজ্ঞাসা করা যাক না কেন।" জিজ্ঞাসিত হইয়া কিছুক্ষণ চুপ থাকিবার পর সেই ব্যক্তি বলিয়া উঠিল—"ও বুঝতে পেরেছি বাবু, চাটুজ্যেদের বাড়ী—তাই বল না বাবু—উ-ই যে বটেক, উ-ই দেখা যাচ্ছে।" মুস্কিলের আসান হইয়া গেল। ঠাকুরের বাড়ীতে পৌছিয়া শিবুদাকে পাইলাম। আর পরিচয় হইল শ্রীবিজয়রত্ন মজুমদারের সহিত। আজ তিনি পরলোকগত। তিনিও কলিকাতা হইতে আমাদের অগ্রে কামারপুকুর দর্শনার্থ আসিয়াছিলেন। বিজয় বাবু তখন ভক্তশ্রেষ্ঠ মহাত্মা রামচন্দ্র দত্তের প্রবর্তিত এবং কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যান হইতে প্রকাশিত 'তত্ত্বমঞ্জরী'র সম্পাদক ছিলেন। কামারপুকুরে শ্রীশ্রীঠাকুরের স্মৃতিজড়িত স্থানগুলি দেখিয়া পরদিন অপরাহ্ণে হাঁটিয়া আমরা জয়রামবাটি রওনা হইলাম। শ্রীশ্রীমা তখন তাঁহার ভাইয়ের বাড়ীতেই থাকিতেন। হাতমুখ ধুইবার পর আমি দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলাম বলিয়া বিনা দ্বিধায়, বিনা সঙ্কোচে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম। বন্ধুরা তখন বহির্বাটিতে বসিয়া মামাদের এবং গাড়ার লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলিতেছিলেন। আমি যে কখন হঠাৎ বাড়ীর ভিতর গিয়া বসিয়াছি, তাহা তাঁহারা লক্ষ্যই

করেন নাই। ভিতরে গিয়া মাকে প্রণাম করিলাম। তিনি তখন বারান্দায় বসিয়াছিলেন। আমাকে বসিতে বলিয়া মা কিছুক্ষণ আমার চোখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, তোমার বে হয়েছে ?"

আমি বলিলাম,—"না।"

মা তখন বলিলেন,—"বাবা, মহীন্দর বই পাঠিয়ে দিয়েছে, তুমি একটু পড়ে শোনাও তো।" এই বলিয়া তিনি ঘরের ভিতর হইতে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, তৃতীয়ভাগ, একখানি বাহির করিয়া আমার হাতে দিলেন। ঐ বই তখন সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে এবং শ্রদ্ধাস্পদ মাষ্টার মহাশয় (শ্রীমহেন্দ্র নাথ গুপ্ত—শ্রীম) সর্বাগ্রে একখানি শ্রীশ্রীমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন। আমি পড়িতে আরম্ভ করিলাম—"প্রথম পরিচ্ছেদ, শ্রীযুক্ত বিদ্যাসাগরের বাটী।" তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ দিকে যেখানে আছে—"ঘি কাঁচা যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণই কলকলানি। পাকা ঘির কোন শব্দ থাকে না; কিন্তু যখন পাকা ঘিয়ে আবার কাঁচা লুচি পড়ে—তখন আর একবার ছ্যাঁক্ কল্ কল্ করে"—সেই জায়গাটি যখন পড়ি, তখন মা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ঠাকুর ঐ কথাটি খুব বলতেন, কাঁচা লুচি পড়লে আবার পাকা ঘি ছ্যাক্ কল্ কল্ করে।" তৃতীয় ভাগের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের শেষভাগে যেখানে আছে 'শ্রীরামকৃষ্ণ (মণির প্রতি)' সেখানে মা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা, মণি কে জানো ?" আমি উত্তর করিলাম,—না, মা, জানিনা তো।" মা হাসিয়া বলিলেন,—"মণি, উটি হচ্ছে মাষ্টার মশায় নিজে।" সন্ধ্যা হইয়া গেল। পাঠ বন্ধ হইল। ইতিপূর্বে বন্ধুরাও আমি বাড়ীর ভিতরে গিয়াছি জানিতে পারিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পর, মা তাঁহার ঘরের ভিতর তক্তাপোশে উপবিষ্টা আছেন, মাটিতে কয়েকটি গ্রাম্য বালক ও বালিকা বসিয়া। আমি ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া কোথায় বসিব ইতস্ততঃ করিতেছি, কারণ, শহরে শিক্ষার প্রভাবে একদম মাটিতে বসিতে দ্বিধা বোধ হইতেছিল অথচ ঘরে মাটির মেজেতে কোন রকম আসনও তখন ছিল না। শেষে অনেকটা হতভম্ব হইয়া মাকে বলিলাম,—"মা, আমি আপনার কাছে বসতে পারি এখানে ?" মা বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ,—বাবা, বোসো, বোসো।" আমি গিয়া তক্তাপোশের উপর মায়ের নিকটে বসিলাম। এ কাণ্ডজ্ঞান তখনও হয় নাই যে মায়ের সহিত এক আসনে বসিতে নাই। মা ঐ সব গ্রাম্য বালক-বালিকাদিগকে তাহাদের আত্মীয়-স্বজন কে কেমন আছে, ক্ষেতে কি পরিমাণ ধান জন্মিয়াছে—এই সব কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, এরা সব কে ?" উত্তর দিলেন,—"এই সব আশেপাশের গ্রামের।" দেখিলাম ঐ সকল বালকবালিকা প্রণাম করিয়া উঠিয়া যাইবার সময় প্রত্যেকেই কিছু না কিছু প্রসাদ লইয়া যাইতেছে।

রাত্রির আহারের পর তখনই আমরা ঘুমাইয়া পড়িলাম, কারণ সকলেরই শরীর খুব ক্লান্ত ছিল। ভোরে উঠিয়া বাড়ীর ভিতরে গেলাম। মাকে তাঁহার শয়নকক্ষের পার্শ্ববর্তী অন্য একটি অপেক্ষাকৃত বড় ঘরের ভিতর পাইলাম। তিনি তখন দাঁড়াইয়া, আমিও তদ্রূপ। হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"বাবা, তোমাকে এই নাম দিলাম।" ব্যাপারটি যেন এক মুহূর্তে ঘটিয়া গেল। কি যে হইল, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এতই বোকা ছিলাম যে, আমি কিছুক্ষণ পরেই বাহিরের ঘরে আসিয়া, বন্ধুত্রয়ের একজনকে বলিতে উদ্যত হইলাম,—"ছাখ্, আজ ভোরে মা ঘরের ভিতর দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমাকে বলে উঠলেন 'ছাখো বাবা, তোমাকে এই নাম—'।" এই কথাটি এই পর্যন্ত

বলা হইলেই বন্ধুবর আসল ব্যাপারটি বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন,—"ওরে চুপ্ চুপ্ ও কথা কাউকেও বলতে নেই, বলতে নেই।" আমি তো আরও হতভম্ব হইয়া গেলাম। জীবনের সেই শ্রেষ্ঠতম দিনে, অতি প্রত্যুষ হইতেই আমার একের পর এক কারণে হতভম্ব হইবার পালা চলিতেছিল! পরবর্তী কালে পুস্তকে পড়িয়াছি, মা একবার বিষ্ণুপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের প্ল্যাটফরমে একটি হিন্দুস্থানী নারীকে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মন্ত্রদান করিয়াছিলেন।

দ্বিপ্রহরে আমরা আহার করিতে বসিলাম। সেই দিনই বিকাল বেলা আমাদের কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিবার কথা। মা স্বহস্তে নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি রন্ধন করিয়া আমাদের খাওয়াইলেন। দু'এক গ্রাস মাত্র ভাত খাইয়াছি, এমন সময় বন্ধুদের একজন হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন,—"অনুকূল বাবু, মাকে গিয়ে বলুন, আমরা তাঁর প্রসাদ খাবো।" উচ্ছিষ্ট হাতে সেই অবস্থায় মা যেখানে ছিলেন, আসন হইতে উঠিয়া তথায় গিয়া মাকে ঐ কথা বলিলাম। করুণাময়ী সেই অবস্থায়ই একটি বাটির ভিতর ভাত, ডাল, তরকারি সব একত্রিত করিয়া উহাকে ভক্তের জন্য প্রসাদে পরিণত করিয়া, আমরা যেখানে খাইতেছিলাম নিজেই সেখানে লইয়া আসিলেন এবং বাটিটি হইতে সেই প্রসাদ কিয়ৎ পরিমাণে আমাদের প্রত্যেকের পাতে পরিবেশন করিলেন। আমার আজও এই সুদীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর অতীত হওয়া সত্ত্বেও, অতি সুস্পষ্টভাবে মনে আছে যে, সে দিন জয়রামবাটিতে খাইতে বসিয়া মায়ের হাতের রান্না পায়েস যেমন খাইয়াছিলাম, অমন সুস্বাদু পায়েস ইহজীবনে আর কোথাও খাই নাই। বিকাল বেলা রওনা হইবার প্রাক্কালে মাকে একান্তে বলিলাম,—"মা, আপনার একটু প্রসাদ সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই কলকাতায়।" অমনি মা বেঁধে প্রসাদ করিয়া দিলেন, অনেকদিন অবিকৃত অবস্থায় থাকিবে বলিয়া। তাহা ছাড়া সঙ্গে আরও মিষ্টি দিয়া দিয়াছিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া সেই প্রসাদের কিয়দংশ আচার্য স্বামী সারদানন্দজীকে এবং ভক্তকুলচূড়ামণি গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়কে দিয়াছিলাম।

শ্রীশ্রীমায়ের যে মূর্তি আমি দেখিয়াছি, তাহা স্মরণপথে উদিত হইলেই স্বতঃই মনে আসে আচার্য স্বামী প্রেমানন্দের কথা—"রাজরাজেশ্বরী ঘর নিকুচ্ছেন, ছেলেদের এঁটো পাড়ছেন।" আমার দেখা মা হইতেছেন মা-ই, সন্তানের সর্বাঙ্গীন কল্যাণকামনায় সর্বদা ব্যাপৃতা। তাঁহার ঐশী ভাবের প্রকাশ দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। এই প্রসঙ্গে আবার স্বভাবতঃই মনে পড়ে শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা—'যার যা পেটে সয়। * * * মা ছেলেদের জন্য বাড়ীতে মাছ এনেছে। সেই মাছে ঝোল, অম্বল, ভাজা আবার পোলাও করলেন। সকলের পেটে কিছু পোলাও সয় না; তাই কারু কারুর জন্য মাছের ঝোল করেছেন —তারা পেটরোগা। আবার কারুর সাধ অম্বল খায় বা মাছ ভাজা খায়। প্রকৃতি আলাদা— আবার অধিকারী ভেদ।"

বিকাল বেলা আমরা যখন কলিকাতা আসিবার জন্য রওনা হইলাম, তখন মা বাড়ীর বাহিরে একটুখানি দূর পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। কিয়দ্দূর আসিয়া আমি পিছনে ফিরিয়া দেখিলাম, তিনি তখনও দাঁড়াইয়াই আছেন আমাদের দিকে চাহিয়া। করুণাময়ী, অপার তোমার করুণা—যে যত অযোগ্য, যে যত অধম, তাহারই প্রতি তোমার তত অধিক করুণা!

কয়েক বৎসর পরে আবার কলিকাতায় মায়ের বাড়ীতে (উদ্বোধন আফিসে) পুনরায় তাঁহার শ্রীচরণ দর্শন লাভ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল। একবারের কথা সুস্পষ্টভাবে

মনে আছে। সেবার স্বামী— দোতালায় মায়ের ঘরের দ্বারে উপস্থিত ছিলেন। আমি দোতালায় গিয়া সেই ঘরের দিকে অগ্রসর হইতেই তিনি মাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন —"মা, এই যে অনুকূল এসেছে। সেই আমরা একত্রে জয়রামবাটি গিয়েছিলুম।" আমি ঘরে প্রবেশ করিয়াই প্রথমে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মা তখন বসিয়াছিলেন ঘরের পশ্চিম পার্শ্বে তক্তাপোশের উপরে। তারপর আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মা, আমি কি এখন আপনার পা ছুঁয়ে প্রণাম করতে পারি?" যতদূর মনে পড়ে, আমি তখন অস্নাত ছিলাম এবং বাস করিতেছিলাম কলেজের মেসে। ঈষৎ হাসিয়া মা বলিয়া উঠিলেন—"হাঁ, বাবা, এস, এস।" আশ্বাসিত হইয়া তাঁহার পাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া পুনরায় প্রণাম করিলাম। কেন বলিতে পারি না, এবারও মা সর্বপ্রথম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন সেই পূর্বেকার প্রশ্ন,—"বাবা, তোমার বে' হয়েছে?"—যে প্রশ্ন আমার মানব-জীবনের পরম মাহেন্দ্রক্ষণে এক অপরাহ্ণে জয়রামবাটিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। এবার অতি অল্পক্ষণ কথাবার্তা হইয়াছিল, কারণ বহু ভক্ত একের পর এক তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিতে সেই সময় আসিতেছিলেন।

আজ মনে হয়—তখন অবশ্য বয়সের অল্পতার দরুণ কিছুই বুঝিতে পারি নাই—মহাশক্তি-স্বরূপিণী হইয়াও নিজের স্বরূপকে সম্পূর্ণরূপে চাপিয়া রাখিয়া, কি ভাবে সাধারণ পল্লীবধূরূপে তুচ্ছাদপি তুচ্ছ দৈনন্দিন কর্ম করিতে হয়, তাহার তুলনারহিত, উপমারহিত দৃষ্টান্ত জগতের সমক্ষে, ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রশক্তি মদমত্ত নরনারীর সম্মুখে জননী সারদাদেবী রাখিয়া গিয়াছেন—আর রাখিয়া গিয়াছেন, অপার করুণার, অসীম কৃপার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

(দুই)

শ্রীমানদাশঙ্কর দাশগুপ্ত, এম্-এ, বি-এস্‌সি, বি-এল্

ইংরেজি ১৯১৭ খ্রীঃ, বাঙ্গলা ১৩২৩ সাল। ঐ বৎসর আমি আর তিনজন সঙ্গীসহ ভাঙ্গা (ফরিদপুর) হইতে যাত্রা করিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির ঠিক্ আট দিন পূর্বে বেলুড়মঠে পৌছাই। তখন বেলা আন্দাজ আড়াইটা হইবে। পূজ্যপাদ বাবুরাম মহারাজ (স্বামী প্রেমানন্দজী) নীচে সামনের বারান্দাতেই বসিয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম,—"আমরা ভাঙ্গা থেকে উৎসব দেখ্‌তে এসেছি।" তিনি হাসিয়া বলিলেন,—"ও বাবা! এত আগে?" এবং তাহার পরই আমাদের আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আমরা মঠে কোনও সংবাদ না দিয়াই আসিয়াছিলাম। কিন্তু বাবুরাম মহারাজের স্নেহ-যত্নে আমরা তখন বুঝিতেই পারি নাই যে, আমরা ঐরূপ করিয়া কোনপ্রকার অন্যায় বা অবিবেচনার কার্য করিয়াছি।

আমাদের ভাঙ্গার দলের অপর একজন আর দুই তিন দিন পরে আসিয়া আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমাদের এই পাঁচজনের মধ্যে 'প্রিয়নাথ দা' ছিলেন বয়স্ক লোক। তিনি বহু পূর্বেই ঠাকুরের কোনও গৃহী শিষ্যের নিকট হইতে মন্ত্র লইয়াছিলেন। এবার মঠে তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য ছিল মহারাজদের ও সম্ভবপর হইলে শ্রীশ্রীমায়েরও দর্শন-লাভ।

আমাদের বাকী চার জনের উদ্দেশ্য ছিল দীক্ষা-গ্রহণ।

আমরা পূর্বেই শুনিয়াছিলাম যে, রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দজীর) অনুপস্থিতির জন্য ঐ বৎসর মঠে কোন দীক্ষা দেওয়া হইবে না। মঠে পৌঁছিয়া সেই সংবাদ সত্য জানিয়া আমরা জয়রামবাটি যাইবার বিষয় বিবেচনা করিতে লাগিলাম, কারণ শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটিতে এবং বাবুরাম মহারাজ বা হরি মহারাজ (তিনি তখন মঠে ছিলেন) ইঁহারা কেহই দীক্ষা দিতেন না। এই জন্য আমরা আমাদের উদ্দেশ্যের বিষয় প্রথম দিন কাহাকেও কিছু বলি নাই। কিন্তু পরদিন সকালবেলা দোতলার (পুরাতন) লাইব্রেরী ঘরে বাবুরাম মহারাজকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি তিনি যেন সবই জানেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, তিনি প্রথম নিকটে দণ্ডায়মান হরি মহারাজকে দেখাইয়া আমাদের বলিলেন,—"এঁর নাম হরি মহারাজ, তোমরা যাঁর কথা বইতে তুরীয়ানন্দ স্বামী ব'লে পড়েছ।" এই বলিয়া তিনি আমাদের হরি মহারাজকে প্রণাম করিতে ইঙ্গিত করিলেন। আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে, বাবুরাম মহারাজ আমাদের দেখাইয়া হরি মহারাজকে বলিলেন,—"এরা সব সাধু হ'তে এসেছেন।" এবং সেই সঙ্গে আমাদের দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—"তোমাদের যা বলার আছে, এঁকে বল।" আমরা বাবুরাম মহারাজের কথায় যার-পর-নাই বিস্মিত হইয়া হরি মহারাজের সঙ্গে পূর্বদিকের বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। সেখানে তিনি আমাদের দিকে ফিরিয়া সর্বপ্রথম বলিলেন,—"সাধু হবার ইচ্ছা—সে তো ভাল কথা। যার সাধু ইচ্ছা ভগবান তার সহায়।—ইত্যাদি।" তাহার পর আমার final law examination (শেষ আইন পরীক্ষা) দেওয়া বাকী আছে জানিয়া বলিলেন,—"আরব্ধ কাজটা শেষ কর, তা শেষ ক'রতে হয়।" কিন্তু কাজের কথা কিছুই হইতে পারিল না, কারণ স্বামী নির্ভয়ানন্দ মহারাজ* ঝড়ের মত কোথা হইতে আসিয়া হরি মহারাজের সঙ্গে অন্য আলাপ জুড়িয়া দিলেন।

যাহা হউক, কয়েকদিন অনিশ্চিত ভাবে কাটাইয়া আমরা জয়রামবাটি যাওয়া চূড়ান্তভাবে স্থির করিলাম। ইহারই মধ্যে একদিন সন্ধ্যার পূর্বে দেখি বাবুরাম মহারাজ কাহাকে যেন উচ্চৈঃস্বরে তিরস্কার করিতেছেন। আমি নিকটে যাইতেই তিনি আমাকে আমাদের সঙ্গের একটি ছেলেকে দেখাইয়া বলিলেন,—"তোমরা এই সব ছেলে নিয়ে মঠে আস, মঠ কি শেষে গরুর গোয়াল হবে?" ছেলেটি স্কুলে পড়িত, লেখাপড়ায় মোটেই ভাল ছিল না। আমি অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম উনি কিসের দ্বারা বুঝিলেন যে, ছেলেটি মঠেই থাকিয়া যাইবে। কিন্তু আর একদিন তিনি আমাদেরই সমক্ষে উত্তেজিত ভাবে বলিতে থাকেন, "দীক্ষা দেব না ব'ল্লেই হ'ল, জোর ক'রে দীক্ষা নেব।" তাঁহার এই সব কথার তাৎপর্য আমরা তখন কিছুই বুঝি নাই। বুঝিয়াছিলাম কতক মায়ের বাড়ী গিয়া এবং কতক তাহারও পরে।

তিথিপূজার দিন ক্রমে নিকটে আসায় আমরাও খুব ব্যস্ত হইয়া উঠিলাম। অথচ তখন মঠে এত লোক ও কাজের ব্যস্ততা যে বাবুরাম মহারাজকে কিছু বলারও সুযোগ পাইতেছি না। অনুপায় হইয়া আমরা হরি মহারাজের শরণাপন্ন হইলাম। তিনি আরাত্রিকের সময়ে ঠাকুরঘরে যাইতেন না। তাই, একদিন সন্ধ্যার পরে যখন আর সকলে ঠাকুরঘরে গিয়াছেন, তখন আমি আমার একজন সঙ্গীসহ দোতলায় হরি মহারাজের সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি তখন সামনের বারান্দায় তাঁহার আসন হইতে উঠিতেছিলেন। আসনখানি

* স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম শিষ্য।

তাঁহার হাতেই ছিল। আমাদের দেখিয়া উহা পুনরায় পাতিয়া বসিলেন। আমি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—"দুটি কথা ব'লব?"

হরি মহারাজ বলিলেন,—"বল।"

আমি।—"আমরা দীক্ষার জন্য এসেছিলাম। কিন্তু রাজা মহারাজ এখানে নেই।"

হরি মহারাজ (চিন্তিতভাবে)।—"দীক্ষা,—তা আমি তো দি না। বাবুরাম কি দেয়?"

আমি।—"তুই একজনকে গোপনে দিয়েছেন শুনেছি, তবে ঠিক জানি না।"

হরি মহারাজ।—"আচ্ছা, আমি বাবুরামকে জিজ্ঞেস ক'রব।"

ইহা বলিয়াই তিনি পুনরায় বলিলেন,—"শুধু দীক্ষা নিয়ে কি হবে, ভজন ক'রতে হয়। ঐ যে (ঠাকুরঘরে) ভজন হ'চ্ছে।"

আমি।—"দীক্ষা নিয়ে ভজন ক'রলে ভাল হয় না?"

হরি মহারাজ।—"তা বটে, তা বটে। আচ্ছা বাবুরাম মহারাজকে ব'লে দেখি।"

আমরা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নীচে নামিয়া আসিলাম। আমরা জানিতাম, রাজা মহারাজ বর্তমান থাকিতে বাবুরাম মহারাজ কিছুতেই আমাদের দীক্ষা দিতে সম্মত হইবেন না এবং মায়ের বাড়ী যাওয়া ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নাই। এদিকে সময়ও আর বড় নাই, পরের দিনই শিবরাত্রি। যাহা হউক, ঐ শিবরাত্রির দিন দুপুরবেলা হঠাৎ দেখি বাবুরাম মহারাজ একতলার সামনের বারান্দায় একা বসিয়া আছেন। আমি তখন আমার সঙ্গের একটি ছেলেকে তাড়াতাড়ি তাঁহার নিকট গিয়া আমাদের জয়রামবাটি যাওয়ার অনুমতি চাহিতে বলিলাম। এই ছেলেটি কলেজে পড়িত ও বাবুরাম মহারাজের প্রিয় ছিল। কিন্তু ছেলেটি অনুমতি চাহিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, "কি ক'রে অনুমতি দি? মা (রাধুর অসুখের জন্য) এক রকম পাগলের মত হ'য়ে দেশে গেছেন।" ইহা বলিয়াই তিনি এত অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন যে, ছেলেটি তাঁহাকে আর কিছুই বলিতে সাহসী হইল না।

এই সময়ে আমরা একতলার 'ভিজিটরস্ রুমে' অপেক্ষা করিতেছিলাম। খবরটি শুনিয়া আমরা যার-পর-নাই বিচলিত হইয়া পড়িলাম। বাবুরাম মহারাজ তখন সামনের বারান্দায় বসিয়া থাকায়, আমরা তাঁহার দৃষ্টি এড়াইয়া ভিজিটরস্ রুমের জানালা দিয়া বাহির হইয়া মঠবাড়ীর পশ্চাতের দিক দিয়া স্বামিজীর সমাধিমন্দিরের পিছনে গিয়া বসিলাম এবং উপায় আলোচনা করিতে লাগিলাম। কিন্তু অল্প পরেই বিশেষ আশ্চর্য হইয়া দেখি বাবুরাম মহারাজ আমাদের দিকে আসিতেছেন। তিনি আমাদের কিছু না বলিয়া আমাদেরই পাশ দিয়া ধীরে ধীরে স্বামিজীর সমাধিমন্দিরটি প্রদক্ষিণ করিলেন। তখন তাঁহাকে আমাদের অত্যন্ত গম্ভীর ও উপবাস-ক্লিষ্ট বলিয়া মনে হইতেছিল। পরে তিনি ঐ রকম ধীরে ধীরেই ফিরিতে আরম্ভ করিলে, আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম ও মায়ের বাড়ী যাইবার অনুমতি চাহিলাম। তিনি এইবার বিনা দ্বিধায় এবং বিশেষ সন্তোষের সহিত অনুমতি দিলেন এবং আমরা কবে ও কোন পথে যাইব জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি আমাদের তারকেশ্বরের পথে গিয়া তিথিপূজার দিন জয়রামবাটিতে পৌছাইতে বলিলেন। কিন্তু আমাদের আর দেরী সহিতেছিল না। আমরা কাহাকেও কিছু না বলিয়া ঐ দিন রাত্রেই হাওড়ায় গিয়া গাড়ীতে বিষ্ণুপুরের পথে রওনা হইলাম।

ভোরের বেলা বিষ্ণুপুর ষ্টেশনে নামিলাম এবং সেখান হইতে তখনই গরুর গাড়ীতে উঠিয়া রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটার সময়ে কোয়ালপাড়া

আশ্রমে পৌঁছিলাম। সে রাত্রি আমরা সেখানেই কাটাইলাম।

পরদিন আসিল আমাদের জীবনের মহাসুপ্রভাত। আমি ও আমার চারজন সঙ্গী অতি প্রত্যুষে স্নানাদি করিয়া কোয়ালপাড়া আশ্রম হইতে পায়ে হাঁটিয়া জয়রামবাটিতে মায়ের বাড়ীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলাম। আমাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল পাতায় মোড়া কিছু ফুল। আমাদের মুখে চোখে শুধু আশা আর আনন্দ।

অল্পপরেই মায়ের জনৈক সেবক সাধুর সাক্ষাৎ মিলিল। তাঁহাকে বলিলাম,—"মাকে বলুন, আমরা দীক্ষা নিতে এসেছি।" তিনি আমাদের অপেক্ষা করিতে বলিয়া ভিতরে গেলেন এবং একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"মা জিজ্ঞেস করলেন আপনারা স্নান ক'রে এসেছেন কি?" আমরা হাঁ বলায়, সেবকটি আমাদের বাহিরের ঘরখানিতে বসাইয়া আমাদের হাতের ফুলগুলি লইয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বুকের পাথর নামিয়া গেল। আমরা সেখানে বসিয়া স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিলাম। বহুদূর হইতে অনেক পথ ও বিস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া মায়ের দুয়ারে আসিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা কেহই মা বা তাঁহার সেবকদের পরিচিত ছিলাম না। আমরা তাঁহাদের কোন সংবাদ দিয়াও আসি নাই। তাই, আনন্দের সহিত ভাবিতে লাগিলাম, 'কি আশ্চর্য! দীক্ষা দিবার পূর্বে মা একবার জিজ্ঞাসাও করিলেন না যে, আমরা কাহারা বা কোথা হইতে আসিয়াছি।' কথাটি বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়নাথ-দাকে বলিলে তিনি হাসিয়া কহিলেন,—"জিজ্ঞেস আবার করবেন কি? ও তো আমরা বেলুড়ে থাকতেই এখানে টেলিগ্রাম এসেছে।" তাঁহার কথার অর্থ এই ছিল যে, প্রেমানন্দ স্বামিজী আমাদের আগমনের বিষয় মাকে সূক্ষ্মভাবে জানাইয়াই আমাদের জয়রামবাটি আসিবার অনুমতি দিয়াছেন। প্রিয়নাথ-দা পল্লীগ্রামের লোক ও ঠাকুরের পুরাতন ভক্ত। তাঁহার অন্তরের সরল ভক্তি-বিশ্বাস তখন তাঁহার মুখ, চোখ ও দীর্ঘ শ্মশ্রু বাহিয়া যেন উপচাইয়া পড়িতেছিল।

বেলা আন্দাজ আটটার সময় সেবক মহারাজ আসিয়া বলিলেন,—"আপনারা একজন আমার সঙ্গে আসুন।" দীক্ষাপ্রার্থীদের মধ্যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ থাকায় আমিই আগে গেলাম। মায়ের ঘরে গিয়া দেখি, তিনি পূজা শেষ করিয়া আসনে বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়া পার্শ্বের একখানি আসনে বসিতে বলিলেন। আমি বসিলে আমাকে প্রথমে আচমন করিতে বলিলেন এবং পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা শাক্ত না বৈষ্ণব?" আমি উত্তর দিলে তিনি যথারীতি মন্ত্র দীক্ষা দিয়া কয়েকটি কথা বলিলেন। * * * আমরা মার জন্য কিছুই লইয়া যাই নাই। তাই দীক্ষার সময়ে মা আমার হাতে কিছু দিয়া দক্ষিণা গ্রহণ করিয়াছিলেন! দীক্ষান্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। মা একটু হাসিলেন। প্রণাম করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলে তিনি আমাকে আর একজনকে পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। আমার সমস্ত মনঃপ্রাণ যেন আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

এইভাবে মা পর পর আমাদের তিনজনকে কৃপা করিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি চতুর্থ-জনকে আর কিছুতেই দীক্ষা দিতে সম্মত হইলেন না। ইহাতে ছেলেটি যেন ভাঙ্গিয়া পড়িল। আশ্চর্যের বিষয়, এই ছেলেটির সম্পর্কেই বাবুরাম মহারাজ বেলুড়ে আপত্তি তুলিয়াছিলেন এবং তাহাকে মঠে আনার জন্য আমাদের তিরস্কার করিয়াছিলেন!

ছেলেটির জন্য আমরা সকলেই খুব ব্যথিত বোধ করিতেছিলাম। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের কোন হাত ছিল না। আমরা সকলে মিলিয়া তাহাকে যথাসাধ্য সান্ত্বনা দিলাম এবং অনেক করিয়া বুঝাইলাম যে, তাহার দীক্ষা পরেও হইতে পারিবে। ঐ সময়ে সেবক সাধু মহারাজ আমাদের বলিলেন, "আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি মা যাহাকে দীক্ষা দিতে অস্বীকার করেন, মায়ের দৃষ্টি তাহার উপরেই বেশী থাকে।"

দুপুরবেলা আহার করিতে বসিয়া দেখিলাম মা আমাদের দিকে পিছন রাখিয়া পার্শ্বের একখানি চালাঘরে বসিয়া পায়স বাঁধিতেছেন। দীক্ষার সময়ে আমি সঙ্কোচে মায়ের মুখের দিকে ভাল করিয়া তাকাইতে পারি নাই। সে জন্য মনে খুব দুঃখ হইয়াছিল। তাই আহারের সময়ে মাকে নিকটে দেখিয়া কেবলই মনে হইতে লাগিল মা যদি দয়া করিয়া তাঁহার মুখখানি আমাদের দিকে একবার ফিরান তবে একটু ভাল করিয়া দেখিয়া লই। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে মাথা নীচু করিয়া খাইতে লাগিলাম। তারপর হঠাৎ মাথা উঁচু করিতেই দেখি মা আমাদের দিকে ফিরিয়া বসিয়াছেন। আমি তাঁহার মুখের দিকে একবার তাকাইয়া দেখিতেই আমার মাথাটি আপনিই নীচু হইয়া গেল। কিন্তু তাহার পরই আবার মাথা উঁচু করিতেই দেখি মা পূর্বের মত আমাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়াছেন।

ঐ দিন আমরা জয়রামবাটির আমোদর নদীতে স্নান করিয়াছিলাম এবং মায়ের জন্মস্থান ও প্রসিদ্ধ সিংহবাহিনীর মূর্তি দর্শন করিয়া শেষোক্ত স্থানের মাটি সঙ্গে আনিয়াছিলাম। পরদিন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথি পূজা ছিল। আমাদের ইচ্ছা ছিল যে, আমরা বেলুড়মঠের উৎসবের পূর্বেই কলিকাতায় ফিরিয়া ঐ উৎসব দেখিব। কাজেই আমরা আমাদের দীক্ষার দিনই অপরাহ্নে মায়ের নিকট হইতে বিদায় লইলাম।

মা তখন তাঁহার শুইবার ঘরে তক্তাপোশের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়াছিলেন। তাঁহার পার্শ্বেই অসুস্থ রাধু শুইয়াছিল। আমি মাকে আমার দীক্ষা-সম্বন্ধীয় কোন একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলায়, মা সেবক সাধুটিকে বাহিরে যাইতে বলিলেন। আমি মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—"মা, সাধন-ভজন আর কি করব?" মা উত্তর দেন, "যা ব'লে দিয়েছি তাতেই সব হবে। আর কিছুই ক'রতে হবে না।"

যে ছেলেটিকে মা সকালবেলা দীক্ষা দিতে রাজি হন নাই, সে প্রণাম করিতে গেলে তিনি তাহাকে একটি নাম দিয়া তাহা জপ করিতে উপদেশ দেন। সর্বশেষে প্রিয়নাথ দা যান। তিনি প্রণাম করিয়া ফিরিলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"আপনি মাকে কি বল্লেন?" প্রিয়নাথ-দা একটি পরিতৃপ্তির হাসি হাসিয়া বলিলেন,—"আমি মায়ের দুই পা জড়িয়ে ধ'রে ব'ললাম, মা আমার যেন বিবেক-বৈরাগ্য লাভ হয়।" আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম,—"তাতে মা কি বল্লেন?"

প্রিয়নাথ-দা উত্তর দিলেন—"মা বললেন, তাইই হবে।"

এই অল্প-শিক্ষিত ও স্বল্পভাষী পল্লীবাসী লোকটি এক নিমেষে যাহা করিয়া আসিলেন, তাহা আমি অনেক বেশী সুযোগ পাইয়াও যে করিতে পারি নাই তজ্জন্য মনে একটু দুঃখ হইল। তবে আমি তাঁহার সৌভাগ্যে বিশেষ সুখীও হইয়াছিলাম। কারণ তিনি সমস্ত দিন শুধু আমাদের সৌভাগ্যেই আনন্দিত ছিলেন।

ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার রূপ

অধ্যাপক শ্রীনীরদবরণ চক্রবর্তী, এম্‌-এ

স্বাধীনতা ব্যতীত নীতিশাস্ত্র অর্থহীন। মানুষের কাজকর্মে স্বাধীনতা আছে বলেই মানুষকে তার কাজের জন্য দায়ী করা হয়। যে কাজে দায়িত্ব নেই তার নৈতিক বিচার চলে না। যে যে-কাজের জন্য দায়ী নয়, সে কাজের ভালো-মন্দ দিয়ে তার বিচার করা চল্‌বে কেন? মানুষ স্বেচ্ছায় কাজ করতে পারে। কর্মে কর্মীর চরিত্র প্রকাশ পায়। সেজন্যই মানুষের কাজের বিচার করে তার নৈতিক মান নির্ধারণ করা হ'য়ে থাকে। সুতরাং যে কর্মে স্বাধীনতা নেই, সে কর্ম নীতিশাস্ত্রের আলোচনায় স্থান পায় না।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকেরা নৈতিক স্বাধীনতা-সম্বন্ধে বহু আলোচনা করেছেন। অদৃষ্টবাদের দেশ বলে কুখ্যাত আমাদের ভারতবর্ষ। ছেলে-বেলা থেকে শুনে এসেছি, পুরুষকার এবং স্বাধীনতার স্থান আমাদের শাস্ত্রে নেই। ভগবদ্‌-গীতায় কর্মফলের মহিমা কীর্তন করে অদৃষ্টবাদের জয়ধ্বনি করা হয়েছে বলে সাধারণ লোকের বিশ্বাস। এই অদৃষ্টবাদের দেশে কর্মফলের মহিমা কীর্তনকারী ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, তার আলোচনা কৌতুহলো-দ্দীপক হবে সন্দেহ নেই, সাহস করে তাই বর্তমান নিবন্ধ আরম্ভ করা যাচ্ছে।

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল—নৈতিক স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝবো কি? নৈতিক স্বাধীনতা দু'টি ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করা যেতে পারে। স্বাধীনতা বল্‌তে —আত্মার স্বাধীনতা বোঝাতে পারে—আবার মানুষের কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার (Freedom of will) স্বাধীনতাও হতে পারে। যদি স্বাধীনতা বল্‌তে আত্মার স্বাধীনতা বুঝি,—তবে প্রশ্ন হবে —মানুষ কি স্বাধীন? আর যদি স্বাধীনতা বল্‌তে মানুষের কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার স্বাধীনতা বুঝি—তবে প্রশ্ন হবে—মানুষের কর্ম-কৃতি ও চেষ্টায় কি স্বাধীনতা আছে?

পাশ্চাত্ত্য-দর্শনের ইতিহাস আলোচনা করে দেখি—যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা (Rationalists) সাধারণতঃ নৈতিক স্বাধীনতার প্রথম ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেছেন; দ্বিতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছেন প্রত্যক্ষবাদী (Empiricists) এবং অপরোক্ষানু-ভূতিবাদী দার্শনিকেরা (Intuitionists)। স্পিনোজা, কাণ্ট, হেগেল এবং ইংরেজ হেগেলপন্থী দার্শনিকেরা স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝেছেন—আত্মার স্বাধীনতা। হিউম এবং মিলের মত প্রত্যক্ষ-বাদী দার্শনিকেরা এবং মার্টিনিউ সাহেবের মত অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকেরা স্বাধীনতা বল্‌তে বুঝেছেন—ব্যক্তির কর্মকৃতি এবং চেষ্টার স্বাধীনতা। যুক্তিবাদী দার্শনিকদের কাছে মুখ্য প্রশ্ন—আমরা কি স্বাধীন? প্রত্যক্ষবাদী এবং অপরোক্ষানুভূতিবাদী দার্শনিকদের কাছে প্রশ্ন —বিভিন্ন সম্ভাব্যতার (possibility) মধ্যে কোন একটিকে বেছে নেবার ক্ষমতা কি মানুষের আছে?

যুক্তিবাদী দার্শনিকপ্রধান কাণ্টের স্বাধীনতা-প্রত্যয় (Concept of freedom) এস্থলে বিশেষভাবে আলোচনা করা যেতে পারে। ভগবদ্‌গীতায় নৈতিক স্বাধীনতার রূপ অনেকাংশে

কাণ্টের স্বাধীনতা-প্রত্যয়সদৃশ। কাণ্ট কার্য-কারণনির্দিষ্ট জাগতিক বস্তুনিচয়ের বাইরে স্থান নির্দেশ করেছেন মানুষের। কাণ্টের মতে প্রাকৃতিক সমস্ত বস্তুই কার্যকারণ-নিয়মাধীন। প্রকৃতির রাজ্যে স্বাধীন কারণের কোন স্থান নেই। সমস্ত কার্যই কারণ-নিয়ন্ত্রিত। কার্য কারণ ব্যতিরেকে অসম্ভব, কারণ পুনরায় অন্য কোন কারণনির্দিষ্ট কার্যস্বরূপ। একমাত্র মানুষের ক্ষেত্রেই এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছে। মানুষ স্বাধীন কারণ (Free cause); তার কারণত্ব অন্য কারণ-নির্দিষ্ট হ'য়ে কার্যরূপ গ্রহণ করে না। প্রাকৃতিক বস্তু স্বাতিরিক্ত অন্যবস্তু নির্দিষ্ট। মানুষ কিন্তু অন্যবস্তু নির্দিষ্ট নয়; মানুষ স্বয়ং সাধ্য (end in itself)। এই ধারণাকে ভিত্তি করেই কাণ্টের নীতিশাস্ত্র গড়ে উঠেছে।

যেহেতু মানুষ স্বাধীন কারণ, সুতরাং সে স্বয়ংসাধ্য; অন্যবস্তু দ্বারা সাধ্য নয়। কাণ্ট তাই নীতিশাস্ত্রের নিয়ম করেছেন—"নিজেকে এবং অন্য মানুষকে স্বয়ংসাধ্য ধরে নিয়ে কাজ করবে —অন্যবস্তু-সাধ্য মনে করে নয়।" (So act as to treat humanity, whether in thine own person or in the person of any other, as an end withal, never as means only).

কাণ্টের বিশ্বাস—সুখাদর্শের (Pleasure principle) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া পরাধীনতার নামান্তর। কাণ্ট পরাধীনতার পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন—"If the will seeks the law which is to determine it anywhere else than in the fitness of its maxims to be universal laws of its own dictation, consequently if it goes out of itself and seeks the law in the character of any of its objects, then always results heteronomy." (Metaphysics of Morals, Vide Abbott's Kant's theory of Ethics p59). সুতরাং আমরা বলতে পারি, কাণ্টের মতে যুক্তির নির্দেশ মেনে চলাই একমাত্র স্বাধীনতা। কর্মফলের বাসনা ত্যাগ করে নিষ্কাম কর্ম করে যাওয়াই কর্মজীবনের আদর্শ। কাজের জন্যই কাজ করতে হবে; কাজেই কাজের সমাপ্তি এবং পরিপূর্তি। এস্থলে কাণ্টের নৈতিক স্বাধীনতার ধারণায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। পূর্বে কাণ্ট স্বাতিরিক্ত কোন বস্তু-নির্দেশ ভিন্ন স্ব-অধীনতাকেই নৈতিক স্বাধীনতার স্বরূপ বলে ঘোষণা করেছেন। এখন কিন্তু তিনি বলছেন—শুদ্ধ যুক্তির নির্দেশ মেনে চলাই স্বাধীনতা। সর্বপ্রকার অনুভূতির দাসত্বই পরাধীনতা। মানুষের ভেতর যুক্তি এবং অনুভূতি দুইই কাজ করে। অনুভূতির নির্দেশ অমান্য করে যুক্তির অনুগামী হওয়াই নৈতিক স্বাধীনতার মূল কথা। সুতরাং পূর্বে স্বাধীনতা এবং পরাধীনতার পার্থক্য নির্ভর করছিল—স্বনির্দেশ এবং স্বাতিরিক্ত বস্তু-নির্দেশের উপর;—এখন তা নির্ভর করছে—আমাদের জীবনে ক্রীড়াশীল দু'টি বিশেষ বৃত্তি—যুক্তি এবং অনুভূতির উপর।

কাণ্টের স্বাধীনতা সম্বন্ধে শেষের মতটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এখানেই আমরা কাণ্টের এবং প্রাচীন যুক্তিবাদী দার্শনিকদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে মতবাদের মধ্যে যোগসূত্র খুঁজে পাই। প্লেটো এবং স্পিনোজার মত যুক্তিবাদী দার্শনিকদের মতে ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব-মুক্তিই স্বাধীনতা। প্লেটো তাঁর Phaedo নামক গ্রন্থে এই মতবাদ অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন—দেহের বন্ধন মুক্তি এবং সর্বপ্রকার ইন্দ্রিয়াসক্তি হ'তে মুক্তিই স্বাধীনতা।

সেজন্যই দার্শনিকেরা মৃত্যুকে ভয় না করে তাকে 'শ্যামসুন্দর' বলে আহ্বান করে থাকেন। তিনি আরও বলেন—দর্শন মানুষকে দেহের বন্ধন-মুক্তির জন্য জ্ঞানে দীক্ষা দিয়ে থাকে। বন্ধন অজ্ঞানতার ফল; সুতরাং মুক্তি জ্ঞানের অনুগামী।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক স্পিনোজা নৈতিক স্বাধীনতা অনুরূপ অর্থেই গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'Ethica'র চতুর্থখণ্ডে ৫৭নং সূত্রে বলেছেন—"A free man, that is to say, a man who lives all to the dictates of reason alone, is not led by the fear of death" (স্বাধীন মানুষ অর্থাৎ এমন মানুষ যিনি কেবলমাত্র যুক্তির নির্দেশ মেনে চলেন, তিনি মৃত্যুভয়ে ভীত হন না)।

নীতিশাস্ত্রবিদ্ সিজ্উইক্ স্বাধীনতার দু'টি রূপের সন্ধান দিয়েছেন—(১) নির্বিকার স্বাধীনতা (Neutral Freedom) এবং (২) যৌক্তিক স্বাধীনতা (Rational Freedom)। ভালো এবং মন্দ দুই করবার স্বাধীনতাকে বলা যেতে পারে—নির্বিকার স্বাধীনতা। কান্ট স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে দু'টি ভিন্ন মতবাদ প্রকাশ করেছেন—তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে নির্বিকার স্বাধীনতা। দার্শনিক গ্রীনের মতবাদেও এই প্রকার স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া যায়। মানুষ যখন একমাত্র যুক্তির নির্দেশেই কাজ করে তখন সে মুক্ত—স্বাধীনতার এই ধারণার নাম যৌক্তিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতা সম্বন্ধে কান্টের দ্বিতীয় মতবাদ এবং যুক্তিবাদী দার্শনিকদের স্বাধীনতার ধারণা এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের স্বাধীনতা সম্বন্ধে বিভিন্ন মতবাদ আলোচনা করা গেল। আশা করি, এই আলোচনার আলোতে ভগবদ্গীতার নৈতিক স্বাধীনতার রূপ সহজবোধ্য হবে। ভগবদ্গীতায় স্বাধীনতা বল্তে যৌক্তিক স্বাধীনতাই ধরা হয়েছে। মানুষ যখন যুক্তির নির্দেশ মেনে চলে তখনই সে স্বাধীন। ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগ-বাসনা হ'তে মুক্ত হ'য়ে দৈবী আত্মার (Rational Self) অনুগামী হওয়াই স্বাধীনতা। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

দুঃখে অক্ষুভিত চিত্ত, সুখে স্পৃহাহীন, অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হ'তে মুক্ত ব্যক্তিই স্থিতধী। (২।৫৬)

দ্বাদশ অধ্যায়ে ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

যাঁহা হ'তে লোক উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি লোকের নিকট হ'তে উদ্বেগ প্রাপ্ত হ'ন না, যিনি হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হ'তে মুক্ত—তিনিই ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি (১২।১৫)

দ্বাদশ অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে অনাসক্ত ব্যক্তিকেই ভগবৎপ্রিয় বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

স্থিতপ্রজ্ঞ ও ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তির আলোচনাতেই মুক্তপুরুষের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। যিনি ভক্তিমান্ এবং স্থিতপ্রজ্ঞ তিনি নিঃসন্দেহে মুক্ত-পুরুষ। সুখে স্পৃহাহীন, দুঃখে নিরুদ্বিগ্নচিত্ত এবং সর্বব্যাপারে অনাসক্ত ব্যক্তিই মুক্ত। সহজ ভাবে বল্তে গেলে যিনি বদ্ধ নন, তিনিই মুক্ত। "অনাসক্তি" গীতার মূল আদর্শ। সমস্ত গীতায় বারবার এই অনাসক্তির উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

যে পুরুষ সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করে নিস্পৃহ, নিরহঙ্কার ও নির্মম হ'য়ে বিচরণ করেন, তিনি শান্তি লাভ করেন। (২।৭১)

চতুর্থ অধ্যায়ে পাচ্ছি—

যিনি কর্ম ও ফলে আসক্তি ত্যাগ করে নিত্যানন্দে পরিতৃপ্ত হ'ন তিনি সমস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হ'য়েও কিছুই করেন না।

যিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হ'ন তাতেই

সন্তুষ্ট হ'ন, সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত নন, মাৎসর্যকে দূর করেন এবং কার্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি, তিনি কর্ম করেও তাতে বদ্ধ নন। আর দৃষ্টান্ত দিয়ে লাভ নেই। আমরা বুঝ্‌তে পেরেছি—ভগবদ্গীতায় অনাসক্তিই স্বাধীনতার স্বরূপ।

পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদী দার্শনিকেরা নৈতিক স্বাধীনতা বল্‌তে আত্মার স্বাধীনতা বুঝেছেন। ব্যক্তির কর্ম-কৃতি এবং চেষ্টার স্বাধীনতা তাঁদের মতে স্বাধীনতা পদবাচ্য নয়। ভগবদ্গীতাতেও এই মন্তব্যেরই প্রকাশ দেখা যায়। গীতায় বার বার বলা হয়েছে—যিনি আত্মবান্ অর্থাৎ যিনি আত্মাকে জেনেছেন তিনিই মুক্ত।

যে মানব আত্মাতেই প্রীত, আত্মাতেই তৃপ্ত ও আত্মাতেই সন্তুষ্ট, তার কোন কর্তব্য কর্ম নাই। (৩।১৭)

বেদ সকল ত্রিগুণাত্মক, তুমি সুখ-দুঃখাদি-দ্বন্দ্ব-রহিত, নিত্য ধৈর্যশীল, যোগক্ষেমরহিত আত্ম-বান্ হ'য়ে নিষ্কাম হও। (২।৪৫)

আত্মবান্ হ'য়ে মুক্ত হওয়ার ক্ষমতা প্রত্যেক মানুষেরই আছে। আবার আত্মবান্ হওয়ার পথে মানুষই বাধাস্বরূপ।

বিবেকবুদ্ধিদ্বারা আত্মাকে সংসার হ'তে উদ্ধার করবে, আত্মাকে কখনও অধঃপাতিত করবে না, আত্মাই আত্মার বন্ধু, আত্মাই আত্মার রিপু। (৬।৫)

ইন্দ্রিয়াসক্তি ও ভোগবাসনা মানুষের আত্ম-প্রাপ্তিতে বাধা জন্মায়। মানুষ স্বচেষ্টায় অতিক্রমও করতে পারে এই বাধা। সুতরাং আমরা বল্‌তে পারি, স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ স্বরূপতঃ স্বাধীন। মনুষ্যত্বে বন্ধন নেই, বন্ধন মানুষের। অর্থাৎ মানুষের যা স্বরূপ—তার মনুষ্যত্ব—তা মুক্ত; মানুষের যা বাইরের জিনিস—তার আসক্তি—তাতেই বন্ধন।

এখানে প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে—গীতা যেমন আত্মপ্রাপ্তিতে মানুষের স্বাধীনতা দিয়েছেন, তেম্‌নি কি মানুষের অধঃপাতে যাওয়ার স্বাধীনতাও স্বীকার করেছেন? অনেকে বলেন, যে স্বাধীনতায় অধঃপাতে যাওয়ার স্বাধীনতা নেই, তা এক-প্রকার পরাধীনতার নামান্তর। পাশ্চাত্ত্য নীতি-শাস্ত্রবিদ্ সিজ্‌উইক্ যাকে নির্বিকার স্বাধীনতা বলেছেন, ভগবদ্গীতায় তারই স্বীকৃতি আছে। ভগবদ্গীতায় এমন স্বাধীনতা স্বীকার করা হয়েছে—যাতে করে মানুষ ভালও করতে পারে, মন্দও করতে পারে;—আত্মপ্রাপ্তিও হয় আবার অধঃ-পতনও হ'তে পারে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্লোকে স্পষ্টই বলা হয়েছে—আত্মাই মানুষের বন্ধু—আত্মাই মানুষের শত্রু। মানুষ এমনভাবে কাজ করতে পারে যাতে আত্মা তার বন্ধু হয়, আবার এমন কাজও করতে পারে যাতে আত্মা তার শত্রু হয়। মানুষ নিজেকে উন্নীতও করতে পারে, অধঃপাতিতও করতে পারে।

মানুষ স্বেচ্ছায় পাপের পথ বা পুণ্যের পথ অবলম্বন করতে পারে। পাপপথাশ্রয়ী মানব নীতি উপদেশে পুণ্য কার্যে ব্রতী হয়। মানুষের যদি এ স্বাধীনতা না থাক্‌তো, তবে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'ত। অর্জুন যখন যুদ্ধক্ষেত্রে হত-বুদ্ধি হ'য়ে পড়েছিলেন, শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁকে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। অর্জুনকে কর্তব্য কর্মে উদ্বুদ্ধ করাই গীতার আসল উদ্দেশ্য। এতেই বোঝা যাচ্ছে—মানুষের স্বেচ্ছায় কাজ করবার স্বাধীনতা আছে। অর্জুন তাঁর ইচ্ছামত কাজ করতে পারতেন। শ্রীকৃষ্ণ বল্‌ছেন—ও রকম না করে এরকম করাই তোমার উচিত। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে—মানুষ উপদেশ প্রভাবে অন্যায় হ'তে ন্যায়পথে অগ্রসর হ'তে পারে। গীতায় সকলের জন্যই মুক্তির ব্যবস্থা আছে। হীন, পতিত, ভণ্ড, পাষণ্ড—কারও চিরকালের জন্য নরক-

ভোগের নির্দেশ নেই। মানুষ চেষ্টা করলেই তার স্বভাবের পরিবর্তন করতে পারে। অপবিত্রের পক্ষে পবিত্রতা চেষ্টাসাধ্য, অসম্ভব অলীক স্বপ্ন নয়।

মানুষ তার ভাগ্যস্রষ্টা এবং ভগবান নীরব দর্শকমাত্র, এমন কথাও কিন্তু ভগবদ্‌গীতায় নেই। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বলা হয়েছে—

অন্তর্যামী ভগবান সর্বজীবের হৃদয়মধ্যে অবস্থান করে নিজ শক্তি দ্বারা তাদের পরিচালিত করেন।

এই শ্লোকে কিন্তু মানুষের স্বাধীনতা অস্বীকার করা হয়নি। বলা হয়েছে—মানুষ নিঃসন্দেহ স্বাধীন, কিন্তু সর্বকর্মনিয়ন্তা ভগবান তার হৃদ্দেশে অবস্থিত আছেন, একথাও অস্বীকার করা যাবে না। এখানে প্রশ্ন উঠ্‌বে—হৃদ্দেশস্থিত ভগবানের কাজ কি? তিনি মানুষের স্বকৃত কর্মানুসারে তাদের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম নির্দিষ্ট করে থাকেন। আবার প্রশ্ন করা যেতে পারে—মানুষের কর্ম যদি তার পূর্বকৃত কর্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তবে তার স্বাধীনতা কোথায়? এখানে ভুল্‌লে চল্‌বে না যে—কর্মের ফল দু'টি—একটি মুখ্য, আর একটি গৌণ। মুখ্য হচ্ছে—কর্মফল, আর গৌণ হচ্ছে—সংস্কার। কর্মফল কর্মান্তে সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত হয়। একে কেউ রোধ করতে পারে না। সংস্কার আমাদের চিত্তে পূর্বকৃত কর্মের পুনরাবৃত্তির বাসনা জাগ্রত করে। আমরা ইচ্ছা করলে এই বাসনা রোধ করতে পারি। সুতরাং কর্মের সংস্কার ব্যাপারে আমাদের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সুখ-দুঃখাকারে প্রকাশিত কর্মফলে আমাদের কোন হাত নাই। আবার এ কর্মফল আমাদেরই কৃতকর্মের ফল। সুতরাং এর উপর প্রত্যক্ষ না হোক্ পরোক্ষভাবে আমাদের একেবারেই হাত নেই—একথাও কিন্তু বলা চলে না।

সসীম মানুষ অসীম অনন্ত পুরুষের মত স্বাধীন—একথা গীতার কোথায়ও নাই। মানুষ যদি সর্বব্যাপারেই ভগবৎনির্দেশনিরপেক্ষ স্বাধীন হয়—তবে ভগবানকে সর্বশক্তিমান বলা যায় না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক লাইব্‌নিজের মত আমাদের ভগবদ্‌গীতা এমন অশ্রদ্ধেয় মত পোষণ করেন না। জীব এবং শিব উভয়েই যদি সর্বক্ষম হয়, তবে তাদের পার্থক্য থাকে না। কিন্তু আমরা জানি—জীব পার্থিব জীবাবস্থায় শিব নয়; শিব সর্বক্ষম, জীবের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ।

গীতায় বলা হয়েছে—ভগবান মানুষের হৃদ্দেশে অবস্থিত হ'য়ে তাকে চালিত করেন। সেজন্য মানুষের স্বাধীনতা গীতায় খর্ব করা হয়েছে—এমন কথা বলা চল্‌বে না। সংসারবদ্ধ সসীম জীবের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা থাক্‌তে পারে না। কারণ, তার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা উচ্ছৃঙ্খলতার নামান্তর হ'য়ে দাঁড়ায়। স্বাধীনতা শোভনতা ও শালীনতার সীমার দ্বারা নির্দিষ্ট। যে স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ নয়, সে স্বাধীনতা ভয়ঙ্কর। বর্তমান সভ্যজগতে বিনাসর্তে স্বাধীনতা (Unconditional Freedom) বল্‌তে কিছু নেই। পৌর বিজ্ঞানের মূল নীতি—"নিয়ম শৃঙ্খলা স্বাধীনতার সর্তস্বরূপ" (Law is the Condition of Liberty)। শাসন আছে বলেই স্বাধীনতা আছে। শাসনশূন্য স্বাধীনতা অর্থহীন প্রলাপমাত্র। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতায় রাষ্ট্র আইন ক'রে স্বাধীনতাকে সীমাবদ্ধ করে। এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতাই বর্তমান সভ্যজগতের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আদর্শ। নৈতিক স্বাধীনতার বেলাতেই বা এই সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা আদর্শ হবে না কেন? রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার নিয়ন্তা রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের ফলেই রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সুন্দর ও শোভন হয়। নৈতিক স্বাধীনতার নিয়ন্তা মানুষের হৃদ্দেশস্থিত হৃষীকেশ। অন্তর্যামী অন্তর-পুরুষের নির্দেশেই নৈতিক স্বাধীনতা হয় সার্থক এবং পূর্ণ। রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ নির্ভুল এবং পক্ষপাতহীন হওয়া অসম্ভব না হ'লেও অস্বাভাবিক।

দোষক্রটীলেশশূন্য বিধাতার নির্দেশ নির্দোষ এবং পক্ষপাতহীন হওয়াই একমাত্র সম্ভব এবং স্বাভাবিক। সুতরাং আমাদের নৈতিক স্বাধীনতা অন্তর-পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হ'য়ে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ এবং সার্থক।

ভগবদগীতায় ঈশ্বরের নির্দেশে পরিচালিত হওয়াকেই আখ্যা দেওয়া হয়েছে স্বাধীনতা। এ ঈশ্বর স্বর্গরাজ্যবাসী আমাদের সঙ্গে সম্পর্ক-শূন্য ভয়ঙ্কর ঈশ্বর নন। তিনি আমাদের অন্তর-স্থিত প্রেমময় অন্তরপুরুষ। বাংলার অশিক্ষিত সাধক বাউলেরা এরই নাম দিয়েছেন—'মনের মানুষ'। তিনি জীবের ভিতরে শিব, নরের ভিতরে নারায়ণ এবং নারীর অন্তরে নারীশ্বর-স্বরূপ। জীব স্বরূপতঃ শিবস্বভাব। ভোগ্যবস্তুর বন্ধনে বদ্ধ শিবই জীব। জীব যখন শিবের নির্দেশে চলে—তখন সে মুক্ত; যখন সে তার শিবসত্তা বিস্মৃত হ'য়ে ভোগাসক্ত হয়—তখন সে বদ্ধ। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কাণ্ট যখন যুক্তির নির্দেশে চালিত হওয়াকেই মুক্তি বল্‌ছেন—তখন যে তিনি ভিন্ন ভাষায় ভগবদ্‌গীতার আদর্শই ঘোষণা করছেন, তাতে আর সন্দেহ নেই। ভগবদগীতা যাকে বল্‌ছেন হৃদ্দেশস্থিত হৃষীকেশ, কাণ্ট তাকে বল্‌ছেন—"যুক্তি", বাউলেরা বল্‌ছেন "মনের মানুষ", মহাত্মা গান্ধী বল্‌ছেন—"শুভবুদ্ধি" আর স্বামী বিবেকানন্দ বল্‌ছেন—"মানুষের দেবত্ব" (Divinity in man)। যে যে-ভাবেই বলুন না কেন—বক্তব্য তাঁদের এক, পার্থক্য শুধু কথায়। মানুষ যখন তার মনের মানুষটিকে জানে—নিজেকে তাঁর জন্য বিলিয়ে দেয়—তখন সে মুক্ত। সেখানে অন্ধকার নেই, দুঃখ নেই, বিচ্ছেদ নেই—কেবলই স্বাধীনতা, কেবলই শান্তি, কেবলই আলো।

তৃপ্ত জীবন

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়

মান্ যশ, উচ্চপদ, ধনরত্ন মণি
যদি কিছু না জুটে জীবনে
আপনারে হতভাগ্য তবু নাহি গণি
তবু ভালবাসি এ ভুবনে।

দুর্লভ বিধির দান এ ইহজীবন
জীবনই বা ক'দিনের তরে,
সেটুকুর উপভোগে এত আয়োজন?
এত ভার সে জীবন' পরে?

জন্মাবধি নীলাকাশ তারকাখচিত
পূর্ণিমার চারুচন্দ্রালোক,
বনশ্রী পুষ্পিত শ্যাম শোভায় রচিত
আজো মোর জুড়াতেছে চোখ।

মেঘের গম্ভীর মন্দ্র, বিহগের গান
তটিনীর মৃদু কলস্বন।
অলির গুঞ্জন মোর জুড়াতেছে কান,
আজো কেহ' নয় পুরাতন।

গাহন গহন নীরে, সুরভি সমীর,
বটচ্ছায়া শীতল মধুর।
স্নিগ্ধস্পর্শে আজো মোর জুড়ায় শরীর
আজো মোর শ্রান্তি করে দূর।

জলধরে, রবিকরে দান বিধাতার
পুষ্পে ফলে রয়েছে সঞ্চিত
অফুরন্ত নিত্য নব বৈচিত্র্য তাহার
এই দানে কে করে বঞ্চিত?

সুলভ বিধির দান দুর্লভ জীবনে
হ্রদনদে মীনের সমান
তার মাঝে আছি আমি, রাশীকৃত ধনে
এর বেশি কি করিবে দান?

নিরুদ্বেগ উপভোগ তৃপ্তি সুখময়
স্বল্প শ্রমে প্রচুর বিশ্রাম,
অযাচিত মিলে বলি, তুচ্ছ তাহা নয়
জানি আমি কত তার দাম।

নারী

শ্রীমতী ঊষা দত্ত, বি-এ, কাব্যতীর্থ, ভারতী

নারীর প্রকৃতি এবং জীবন-লক্ষ্য সম্বন্ধে প্রাচীনকাল থেকে বহু গবেষণা হয়ে গিয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। অনেক মনীষী এবং মনীষিণীদের সুচিন্তিত যুক্তি ও মত সমাজে নারীর যথার্থ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য নিয়োজিত হয়ে আসছে। তবুও কিন্তু নারীর আদর্শ সম্বন্ধে একটা সুস্থির সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই আমরা করে উঠতে পারি না। বিশ্বের শুভদিন উদিত হয় সমগ্র মানবের শুভ চেষ্টার দ্বারা, তাতে নারীর ব্যষ্টিগত দানও যেমন উপেক্ষণীয় নয়, তেমনি জাতির দুর্দিনে সমাজের পতনে নারীর কার্যও সমানভাবে দায়ী। বর্তমান যুগে মানুষের জীবনে যেন একটা বিপ্লব চলছে। সমাজগৃহ আপনগৃহ সর্বত্রই দুর্নীতি দুষ্টাচরণে মানব আজ যেন শান্তিহারা, পথহারা। পিতাপুত্র, স্বামীস্ত্রী, ভ্রাতাভগিনী, প্রভুভৃত্য পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিহিত কর্তব্যের সুষ্ঠু প্রকাশে বিমুখ। একটা দারুণ নৈরাশ্যের অন্ধকার যেন বর্তমান বিশ্বকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। পৃথিবীর এই অশান্ত বিক্ষুব্ধ অবস্থায় নারীর ভ্রান্তি, নারীর আত্মবিস্মৃতিও বোধ করি বহুলাংশে দায়ী।

আপাতদৃষ্টিতে নারী, বিশেষ করে ভারতের নারী—হিন্দুনারী জগতের সম্মুখে আপনাকে 'অবলা'-রূপে প্রকটিত করে বহু বন্ধনে আবদ্ধা এবং অপরের ভারস্বরূপ পরিদর্শিতা হয়ে এসেছে অনেক যুগ ধরে। বোঝা হতে গেলেই বাহকের দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয় বহু প্রকারে—এ অতি সত্য কথা। তাই পুরুষের অধীনা হয়ে নারী লাঞ্ছিতা হয়েছে নানা ভাবে এবং বহুকাল হ'তেই মধ্যযুগের যে নারীচিত্র আমরা দেখি তা' অতিশয় করুণ, বেদনাময়। প্রত্যুষ হতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত রন্ধনশালায় নানা ব্যঞ্জনাবৃতা, অগণিত পুত্রকন্যা-বেষ্টিতা, স্বামীর ভ্রূকুটি-কটাক্ষে সদা-শংকিতা নারীর "অবলা", "দুর্বলা" নামের যথার্থ আলেখ্যই আমাদের মানস চক্ষে প্রতিফলিত হয়। এই অসূর্যম্পশ্যা, স্বামীর প্রভূত খেয়ালতৃপ্তির যন্ত্রী কেবলমাত্র গৃহসীমান্তের জড়ঐশ্বর্যের নিয়ন্ত্রীরূপেই আমরা নারীর অস্তিত্ব অনুভব করি। বহির্জগতের সঙ্গে কোন আদান-প্রদানই নাই তার। পিতার বোঝা, স্বামীর বোঝা, সর্বশেষে পুত্রের বোঝারূপেই তার শেষ পরিণতি। সর্বপ্রকারে পুরুষের সহস্র বন্ধনের দ্বারা বন্দিনী নারী আপন অস্তিত্ব পুরুষের সত্তায় সম্পূর্ণ বিলোপ করে বিশ্বে স্থানহারা হয়ে প্রকাশিতা হয়েছিল।

তারপর শিক্ষার ক্রমবিকাশে মানবমনের সূক্ষ্ম স্তরগুলির হয় উন্মেষ। কালের প্রভাবে শিক্ষা দীক্ষা আচার-নীতি সমাজ-সংস্কার, সবই হয় পরিবর্তিত বা সংস্কৃত। তাই মধ্যযুগের বন্দিনী নারীকে আজ আমরা বর্তমান প্রগতিযুগের স্বাধীন নারীরূপে দেখতে পাই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এতকাল পরে এই বর্তমান যুগে নারী কি সত্যই স্বাধীনতা লাভ করলো? সত্যই কি নারীর বক্ষপঞ্জর হতে এতদিনকার পরাধীনতার, দাসত্বের গ্লানি-ব্যথা বিদূরিত হয়ে শান্তির স্বস্তির নিশ্বাস উত্থিত হ'ল? বিজয়ের নাদ ধ্বনিত হ'ল? কিন্তু কই বিজয়িনী নারীর সেই মুক্ত স্বাধীন সত্তার উজ্জ্বল বিকাশ! আপন মহিমায়, আপন সত্তাপ্রতিষ্ঠার সেই গৌরবপূর্ণ দাবী তো আমরা দেখতে পাই না!

বন্ধন হতে মুক্তি পেতে গিয়ে নারী আজ

বহু বন্ধনে আবদ্ধা হয়ে পড়েছে ; কেবল পুরুষের কাছেই তারা আবদ্ধ নয়, নিজেদের কাছেও তারা আবদ্ধ হয়ে পড়েছে বহুপ্রকারে। মুক্তির পথে নেমে আজ তারা নিত্যনূতন সাজসজ্জার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রাণহীন ভাবুকতার স্রোতে প্রগতির পথে ভেসে চলেছে। রন্ধনগৃহের মোহ কাটিয়ে অগণিত বিলাসের জড় ভোগের বন্ধনে নারী আপনাদের জড়িয়ে ফেলে তাদের যা ছিল তাও হারিয়েছে। হারিয়েছে তাদের নারীধর্মের প্রধান বৃত্তি সেবা-ধর্ম, তাদের পরার্থপরতা, অন্তর্নিহিত প্রেম, স্নেহ, দয়া, কোমলতা, ক্ষমা প্রভৃতি সুকুমার সম্ভার! হারিয়েছে তাদের লজ্জাশীলতা, তাদের গৌরবময়ী মাতৃত্বের প্রশস্তি! পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় অনুপ্রাণিত নারীর ভোগের সূক্ষ্মতম বৃত্তিগুলি হয়েছে মার্জিত। আপন ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য আপনাকে প্রগতিপন্থী পুরুষের ভোগের পূর্ণ যোগ্যা করবার জন্য নারীকে যে সকল পন্থা অবলম্বন করতে হয়, তা নারীর নারীত্ব-প্রকাশের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। বর্তমান বাস্তবের কঠিন প্রতিযোগিতার আসরে বিজয়িনী হবার জন্য নারীকে কত ভাবের অভিনয়ই না করতে হয়! আয়ত্ত করতে হয় মনভুলানো দৃষ্টিভংগী, ছেদহীন উদ্দামগতি, প্রাণহীন ভাবুকতা! এই রূপের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, চপল ভাব-বিলাসের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, ঐশ্বর্যের কপটতার প্রতিদ্বন্দ্বিতায়—প্রতিযোগিতায় আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে নারী আজ আত্মহারা। মুক্তি কোথায়? স্বাধীনতা কোথায়? কঠিনতম বন্ধনে বদ্ধ নারী! তথাকথিত শিক্ষা নারীর জীবনের দৈনন্দিন অভাব বৃদ্ধি করে তাদের বিশ্রামহীন, শান্তিহীন করে তুলছে। সরল সুন্দর জীবন-যাত্রার পথ আজ বহু বাহ্য আড়ম্বরের আবর্জনায় পূর্ণ। অন্তরের সম্পদকে উপেক্ষা করে নারীর মন আত্মপ্রতিষ্ঠায় বহির্মুখী। আপন স্বাধীন জীবনলাভের জন্য অন্তঃপুর ত্যাগ করে নারী পুরুষের কর্মক্ষেত্রে আপনার শক্তি নিয়োজিত করে চলেছে বটে, কিন্তু নিত্যনূতন অভাবের দাস হয়ে বাইরের জগতের একটু মুগ্ধদৃষ্টি-প্রসাদের আশায় তাদের কতই না প্রয়াস। নামযশাকাংক্ষা অপরিমেয় স্বার্থসিদ্ধির নিপুণ কৌশল তাদের সংখ্যাতীত সমস্যাজালে আবৃত করেছে। এই প্রগতির বেগে চলতে গিয়ে নারী আজ ক্লান্ত শ্রান্ত, শ্রীহারা, স্নিগ্ধ অভয়প্রদ মাতৃত্বহারা—কেবলমাত্র বাহ্য উপায় দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করতে গিয়ে নারী আজ পথভ্রষ্টা হয়ে জগতে আপনাদের নিরাপদ শান্তিময় আশ্রয়লাভের ব্যর্থ প্রয়াসে রত।

বর্তমান যুগে তাই আমরা সর্বচেতনাময়ী নারীর বিকাশ তো দেখতে পাই না—দেখি সেই মধ্যযুগের জড়নারীরই একটু সূক্ষ্মপ্রকাশ!

তবে কি নারী সত্যই যুগযুগের ভাবপ্রবাহের দাস? সত্যই কি নারীর ভাগ্যনিয়ন্তা পুরুষ? কখনও "নারী স্বর্গের দ্বার" "নারী নরকের দ্বার" রূপে পুরুষের হাতের পুত্তলিকা হ'য়ে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশ করছে?

না, তা কখনই নয়। সর্বচেতনাময়ী, সর্বশক্তিময়ী জগন্মাতার অংশ নারী চিরমুক্ত, চিরস্বাধীন! নারীর স্বরূপ জানতে হলে আমাদের সৃষ্টি-রহস্যের প্রতি দৃক্‌পাত করতে হবে। পরম কারুণিক সৃষ্টিকর্তার শ্রেষ্ঠ অবদান এই মানবজাতি! হিন্দুধর্ম বলে—বহু লক্ষ কোটি জন্মের পর জীবাত্মা মানবদেহ ধারণ করে। ক্ষুদ্র হতে বৃহত্তম সত্তা লাভ—এই নিয়ত পরিবর্তনশীলতা এ বড়ই বেদনাময়। প্রেমময় ঈশ্বর আপন প্রেমলীলা প্রকটিত করবার জন্য আপন অংশ দিয়ে জীব সৃষ্টি করেছেন। এই জগৎপ্রপঞ্চ সেই স্থির ব্রহ্মের সৃষ্ট বলে, জীবাত্মার সাহজিক গতিও সেই কূটস্থের প্রতি। তাই এই বারংবার গমনাগমন—আপন স্রষ্টা হতে এই বিচ্ছেদ এ জীবের অতি দুঃসহ বেদনা।

পৃথিবীর বুকে জীবাত্মার এই নিরন্তর ক্লেশজনক ভ্রমণ, এই আত্মবিস্মৃতি, এই বিরহ-বেদনা নিরোধ করবার জন্য ঈশ্বর আপন শ্রেষ্ঠাংশ দিয়ে যাকে সৃষ্টি করলেন—সে হ'ল মানবজাতি।

শাস্ত্র বলে, মানবের এই আত্মোদ্ধারের উপায়, আপন স্রষ্টার সাথে চিরমিলনের একমাত্র উপায় কর্মানুষ্ঠান। এই পার্থিব জগতের কর্মের সম্যক অনুষ্ঠানের দ্বারা মানব আপন আত্মপরিচয়-লাভে সমর্থ হয়।

এই কর্মানুষ্ঠান মানব বহুপ্রকারে বিভিন্ন-রূপে সম্পাদন করতে পারে। পিতারূপে, মাতারূপে, জায়ারূপে। রাজা, প্রজা, যোদ্ধা বহু-রূপেই মানব স্ব স্ব জীবনের কর্তব্য সাধন ক'রে দেহাবদ্ধ আত্মার মুক্তি সাধন করতে পারে। তাহলে নারীরূপেও মানবের সকল কর্তব্য সাধনের একমাত্র মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল তার আত্মোদ্ধার। এই মায়িক জগতের কন্যারূপে, জায়ারূপে, মাতারূপে, নারী বীরদর্পে আপন উদ্দেশ্য সাধনে অগ্রসর হতে আবির্ভূতা! নারী কখনও কারো অধীনা বা ভোগ্যবস্তু নয়। পুরুষের মত নারীও আপন কর্তব্যসমূহ প্রকটিত ক'রে আপন সাধনপথে আপনি পূর্ণা, জয়শ্রীমণ্ডিতা! নারী ও পুরুষ সংসারা-শ্রমে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ক'রে আপন আপন মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। এখানে কেউ কারো অধীন বা গলগ্রহ হতে পারে না।

শোনা যায়, সৃষ্টি-পত্তনের প্রথমে পুরুষ সৃষ্ট হয়েছিল আগে; কিন্তু পুরুষ তার সমস্ত কাজে—সর্ব অনুষ্ঠানে অনুভব করতো একটা বিরাট শূন্যতা—অনুভব করতো বিষাদময় ক্লেশ! বহুবিধ কর্মানুষ্ঠান দ্বারা আপন মুক্তিসাধনের চেষ্টা মানবের হয়তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোতো, যদি প্রেমময় ঈশ্বর আপন প্রেম-পারিজাতের দ্বারা বিশ্ব-সৌন্দর্যের সারভূতারূপে নারীকে না সৃষ্টি করতেন! পুরুষের সকল কর্মের প্রেরণা সকল শক্তির আধাররূপে তাদের কঠোর কর্ম-চক্রকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার জন্য যে নারীর সৃষ্টি, সে কি কখনও পুরুষের অধীনা হতে পারে? এই নারীশক্তি-বিহনে পুরুষের সকল কর্ম স্তব্ধ হয়ে যেতো। স্বয়ং শংকরই শক্তির পদতলে আপনাকে পতিত ক'রে কর্মপ্রেরণা ভিক্ষা করেছিলেন। আর নারী সেই শক্তি—সেই জগন্মাতারই খণ্ডীকৃত মূর্তি! জাগতিক ভোগে মোহাচ্ছন্ন পুরুষ আপন ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করবার জন্য সেই পবিত্র শক্তির অবমাননা করে আপন মুক্তির পথই রুদ্ধ করে চলেছে। আর নারীও আপন জীবনলাভের উদ্দেশ্য ভুলে অন্তরের শিবশক্তিকে বিস্মৃত হয়ে কন্যারূপে, জায়ারূপে, মাতারূপে পুরুষের দাস হয়ে যুগ যুগ ধরে নির্যাতন ভোগ ক'রে বদ্ধ হতে বদ্ধতর স্তরে উপনীতা হচ্ছে। তাই তো নারী পুরুষের ভোগের বস্তু হয়ে, তাদের কৃপাকটাক্ষ লাভের জন্য আপন অন্তরজাত সম্পদকে উপেক্ষা ক'রে বহুবিধ বাহ্যবিষয়ে আবদ্ধ হয়ে স্বীয় মুক্তির পথ রুদ্ধ করেছে। আপন জীবনোদ্দেশ্য-ভ্রষ্টা মধ্যযুগের বহুবিধ ব্যঞ্জনাবৃতা রন্ধনগৃহের সম্রাজ্ঞী নারীকে আমরা বর্তমান যুগে দেখতে পাই বিবিধ সাজসজ্জায় মগ্না। ছলনাময় বাকপটুতা লাভে চঞ্চলা। অনার্যোচিত স্বেচ্ছাতন্ত্রে নিমজ্জিত হয়ে আপনাদের প্রকৃষ্ট গতিকে রোধ করে প্রগতির পথে ধাবমানা তাহলে কোথায় নারীর স্বাধীনতা? এই যুগযুগের ভাবপ্রবাহের দাস পুরুষের পেছনে গাধাবোটের মত ধাবমান নারীর এই গতির কী ছেদ নাই? বিরাম নাই?

আছে, নিশ্চয় আছে। বিশ্বসৃষ্টির সৌন্দর্যের সার—জগন্মাতার অংশ সর্বশক্তির আধার নারীর জড় আবরণের অভ্যন্তরে তার চেতনাময়ী সত্তা সতত বিরাজমান। নারীকে তার সেই সত্তাকে

জাগ্রত করতে হলে তার জীবনলাভের উদ্দেশ্য আবার স্মরণ করতে হবে। নারীকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে, সে কারো দাস নয়—তার এই মানবজন্ম-লাভ, এই জগৎরূপ নাট্যমঞ্চে কন্যা, ভার্যা, মাতারূপে কর্তব্যসাধন—এ কেবল তারই স্রষ্টার প্রসাদলাভের জন্য—তার দেহাবদ্ধ আত্মার মুক্তি সাধন ক'রে সেই প্রেমময় স্থির সত্তার সঙ্গে চিরমিলনের জন্য! মধ্য-যুগের জড়পুত্তলিকাবৎ বা বর্তমানযুগের বিলাস-প্রতিদ্বন্দ্বিতার আসরে বিজয়িনী হবার ব্যর্থ প্রয়াসে রত নারীর সকরুণ আলেখ্য তো নারীর প্রকৃত পরিচয় নয়। নারী এই বাহ্যজগতের কারো কৃপা-প্রসাদের ভিখারিণী নয়। কন্যারূপে, জায়ারূপে, মাতারূপে, সেবিকারূপে, সর্বরূপেই নারী স্বাধীনভাবে সগৌরবে পুরুষকে সাহায্য ক'রে আপন মুক্তির পথে অগ্রসর হোক। ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ উপাদান দ্বারা নারী সৃষ্ট। বাহ্য সকল প্রকার উপাদানকে উপেক্ষা ক'রে নারী তার অন্তরজাত সেইসকল—প্রেম, দয়া, ক্ষমা, তেজস্বিতা, মাতৃত্বের প্রশস্তি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির অনুশীলন দ্বারা আপন স্বাধীন সত্তার জাগরণ সাধন ক'রে সর্বপ্রকার স্বাধীনতা লাভে সমর্থা! নারী তার প্রতিটি কাজে জগতকে বুঝিয়ে দেবে তারা জড়পুত্তলিকাবৎ পুরুষের ভাবের দাস নয়। তারা তাদেরই মতো একই স্রষ্টার দ্বারা সৃষ্ট, একই মহান উদ্দেশ্যে প্রেরিত —আপন কর্তব্যসাধনে রত মহিমান্বিত স্বাধীন কর্মী! আপনাতে আপনি মগ্না, পূর্ণা সে।

এইরূপে সরল সুকুমার হৃদয়জাত সৌন্দর্যের অনুশীলন দ্বারা আপন আভ্যন্তরিক চিরমুক্ত সত্তার উন্মেষ সাধনপূর্বক স্বাধীনতালাভে অগ্রসর হতে হবে নারীকে। তার বহির্মুখী সর্বকার্যের মধ্যে সর্বদা তাকে চিন্তা করতে হবে তার জীবন-ধারণের প্রকৃত উদ্দেশ্যের কথা, পাশ্চাত্যভাবের পরিবেশের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিকে ফেরাতে হবে তাকে তাদের গৌরবময় প্রাচীন ও বৈদিক-যুগের নারীচিত্রের প্রতি। বৈদিক যুগের বেদমন্ত্ররচয়িতা জ্ঞানজ্যোতি-বিভাসিতা লোপা-মুদ্রা, যমী, শ্রদ্ধা, বাক্, অপালা, শাশ্বতী প্রভৃতি মহীয়সী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রকেই তাদের সশ্রদ্ধায় বরণ করে নিতে হবে। বালব্রহ্মচারিণী সুলভার মত, মহীয়সী গার্গীর মত তাদের পুরুষের সাথে ধর্মব্যাখ্যানে শাস্ত্রবিচারে অবতীর্ণ হতে হবে। বলতে হবে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীর মত উদাত্ত ওজস্বিনী ভাষায় "যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্"। এই হল নারীর মুক্তিলাভের—শাশ্বত আনন্দলাভের একমাত্র উপায়। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

পওয়ালী

স্বামী সুত্রানন্দ

এমন এক দিন ছিল—যখন হিমালয়ের উত্তরা-খণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রী যাওয়া সর্বত্যাগী সাধুসন্ত ছাড়া অপরের কাছে খুবই ভয়ানক ব্যাপার বলে মনে হত। রাস্তায় চলা, খাওয়া, থাকা প্রভৃতি তখন ছিল খুবই কষ্টকর। কিন্তু আজকাল আর সেদিন নেই। অনেক পথেই মোটর চলে, তাছাড়া দোকান-হাট আছে, জলের কল আছে,

ডাক্তারখানা আছে। ডাকখানা, কেতাবখানাও রয়েছে!

গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পথ অবশ্য এখনও বেশ দুর্গম। কোন কোন স্থানে রাস্তাই নেই—ভেঙ্গে গিয়েছে। পাথর বেয়ে উঠতে হয়—হামাগুড়ি দিয়ে নামতে হয়। তার প্রধান কারণ হল, এ দিকটা ছিল স্বাধীন গাড়োয়াল—টিহ্‌রী রাজার অধীন। তাই আর পাঁচ দশটা দেশীয় রাজ্যের মত এটাও পিছিয়ে আছে অনেক। কেদারনাথ ও বদ্রিনাথ ছিল বৃটিশ গাড়োয়াল, কাজেই বিংশ শতাব্দীর ডাক ওদিকে পৌঁছেছে অনেকটা আগেই। বর্তমানে সবটাই উত্তর প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। আশা করা যায়, অদূর ভবিষ্যতে সর্বত্রই সর্ববিষয়ে সুব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে।

দুর্গম—কষ্টকর হ'লেও এ গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর পঁচিশ দিনের ভ্রমণ আমাদের খুবই উপভোগ্য ছিল। দুটি রাস্তারই দৃশ্যাবলী অতি চমৎকার। সকল পাহাড়ই ঘন বনে আবৃত। কেবল গাছ আর গাছ—গাছের মেলা। কেদার-বদ্রির রাস্তার মত রুক্ষ, নেড়া বা টাক্‌পড়া পাহাড় এ অঞ্চলে নেই। তাছাড়া এদিকে প্রচুর ফল পাওয়া যায়—যেমন আখরোট, আলুবখরা, আপেল, বাদাম ও পিচ্‌ ইত্যাদি।

হিমালয়ের এ চারটি বিখ্যাত তীর্থস্থান—কেদারনাথ, বদ্রিনাথ, গঙ্গোত্রী ও যমুনোত্রীকে 'চারধাম' বলে। উত্তরাখণ্ডের এই 'চারধাম' বৎসরে ছয় মাস খোলা থাকে—অক্ষয় তৃতীয়া থেকে দীপান্বিতা পর্যন্ত। তবে তার কিছু এদিক সেদিক যে না হয়, এমন নয়। এ-ছ'মাসের মধ্যে চার মাসই—বৈশাখ থেকে শ্রাবণ—যাত্রী সমাগম হয়। অন্য সময় অত্যধিক বৃষ্টিতে পাহাড়ের ধস নেমে রাস্তা প্রায় বন্ধ হয়ে আসে। শীতের ছ'মাস বরফে রাস্তা একেবারেই অগম্য থাকে। তখন চার ধামের চলন্তমূর্তি নীচে পূজা-অর্চনা করা হয়। যমুনার পূজা হয় জানকীচটির নিকটস্থ গ্রামে, গঙ্গার পূজা হয়—মুখিমঠে, কেদারনাথের—উখিমঠে ও বদ্রিনাথের—জ্যোশীমঠে। হৃষীকেশ থেকে উত্তর-পূর্ব কোণে যথাক্রমে ১৪৩ ও ১৮৩ মাইল দূরবর্তী স্থানে সুপ্রসিদ্ধ কেদারনাথ ও বদ্রিনাথ পুরী অবস্থিত। অনেকটুকু পথ, প্রায় শতেক মাইল একই রাস্তায় গিয়ে, পরে দুদিকে দুধামে যেতে হয়। এবং হৃষীকেশ থেকে সোজা উত্তর দিকে যথাক্রমে ১৩০ ও ১৫৮ মাইল দূরে অবস্থিত যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী। এদিকেও প্রায় ৮২ মাইল একই রাস্তায় যেতে হয়। তাই যাত্রীরা এক বৎসরে কেদার-বদ্রি ও অন্য বৎসরে গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী দর্শন করে থাকেন। এক বৎসরে 'চারধাম' ঘুরে আসা সময়সাপেক্ষ তো বটেই, তাছাড়া পরিশ্রমও হয় অত্যধিক। মোটর ছাড়া শুধু হাঁটাপথই ৪৫০ মাইল। মোটরে যাতায়াত করা যায় ২১৪ মাইল। একই বৎসরে যারা 'চারধাম' করবার দুঃসাহস্‌ করেন—তাদের পক্ষে দুধাম করে হৃষীকেশে নেমে এসে আবার ওঠা সেও সম্ভব নয়, কারণ দুবার চড়াইয়ের পরিশ্রম করতে হয় এবং সময়ও লাগে দ্বিগুণ। দুধাম করে অন্য দুধামে যেতে পাহাড়ের উপর দিয়েই একটি রাস্তা আছে। কিন্তু তা ভয়ানক বিপজ্জনক—যেমন চড়াই, তেমনি তুষারাবৃত এবং তেমনি নির্জন। অর্থাৎ পথিকের যাত্রাপথের যাবতীয় অন্তরায়ের সমন্বয় ঘটেছে ওখানে। এ পথের উঁচু পাহাড়টির নাম পওয়ালী। 'চারধাম' যারা একসঙ্গে করেন তারা খারাপ রাস্তাই—অর্থাৎ গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রীর রাস্তাই আগে ধরে চলেন।

হৃষীকেশ-এ যেদিন চারধামের কুলি করলাম, সেদিন থেকে শুনছি—"পওয়ালীকা চড়াই আউর কাবুলকা লড়াই"। হয়ত কাবুলের যুদ্ধে গাড়োয়ালী সৈন্যেরা মার খেয়েছিল অধিক তাই এ বাক্যটা ডাকে

পরিণত হয়েছে। যাক্‌গে, এ পাহাড় অতিক্রম না করা পর্যন্ত দীর্ঘ এক মাসের মধ্যে এমন দিন অল্পই বাদ গিয়েছে যেদিন পওয়ালীর ভীতিপ্রদ দু'একটি কথা কর্ণগোচর না হয়েছে।

হৃষীকেশে মোটর ধরে গেলাম গাড়োয়ালের রাজধানী টিহ্‌রী। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে যমুনোত্রী ও গঙ্গোত্রী দর্শন করে, একই পথে চল্লিশ মাইল নীচে নেমে এসেছি ভাটোয়ারী চটিতে। এটি একটি বড় চটি। দোকান, ধর্মশালা, ডাকবাংলা, ডাকঘর, স্কুল, শিবমন্দির ইত্যাদি এখানে আছে। এ পর্যন্ত আমরা পায়দলে ২১৫ মাইল চলেছি। এখান থেকে মাইল দেড় এগিয়ে, মানে নীচে নেমে এলাম মল্লা চটিতে। এর পরেই পড়লাম প্রখ্যাত সে পওয়ালীর নূতন রাস্তায়। প্রথমেই লোকালয়বিহীন গহন বন। এত ঘন বৃক্ষরাজি যে অনেক স্থানেই সূর্যালোকের প্রবেশ নিষেধ। উপরে স্নিগ্ধ শ্যামলিমা—নীচে ঘুমন্ত ছায়া। ক্বচিৎ কোথাও বা এক দু'টা ঝরণা বা নির্ঝরিণী কলহাস্যে প্রবাহিত। আর সে তানে সুর মিলিয়ে গান গেয়ে যাচ্ছে কত রকমারি মধুরকণ্ঠ পাখী। আমরা দশ মাইল চড়াই ভেঙ্গে অতিকষ্টে ছুনা নামক পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি চটিতে আশ্রয় নিলাম। তখন বেলা প্রায় দুটা। চারদিকে দুর্ভেদ্য জঙ্গল। আর একটি গাছ যদি জন্ম নেয় তাহলে তাকে অনশন করে মরতে হবে। দুপুরের বেলা, নিঝুম···নিঃস্তব্ধ। দু'একটা ঝিঁ ঝিঁর ডাক —সে একটানা ডাকে নীরবতাটাকে আরো বাড়িয়ে তোলে। এ-হেন গহন বন-পথে সকলেই এক বেলা চলেন। তাই আমরা রাত্রিবাস ওখানেই করলাম।

পরদিন ভোরে রওনা হলাম। তখনও অন্ধকার কাটেনি। আজও পূর্বদিনের মত কেবল চড়াই। রাস্তায় পাতা পড়ে আধ হাত উঁচু গদির মত হয়ে আছে। পাঁচ মাইল উঠে পেলাম পাহাড়ের চূড়ায় বেলকচটি। ইহা ৯৭৩০ ফুট উঁচু। ওখানে রুটি দুধ খেয়ে আবার চার মাইল উৎরাই করে এলাম "পৎরানায়"; দোকানদার দু'একদিন হল চটির পত্তন করেছে। বেশ লেপা পোঁচা পরিষ্কার এ ঘরগুলি লতাপাতা দিয়ে যা তৈরী করেছে কোনপ্রকারে এক রাত্রি কাটিয়ে দেখা যায়। কিন্তু মুস্কিল করেছে, এ হিমের আলয়ে একটা দিক রেখে দিয়েছে একেবারেই ফাঁকা। উৎরাইয়ের মুখে চটির অবস্থানটি বেশ সুন্দর। খোলা জায়গা—সম্মুখের মাঠে নলকূপের মত একটি ক্ষীণকায়া ঝরনা। আর তার পদতল বিধৌত করে যাচ্ছে পুণ্যতোয়া নদী ধর্মগঙ্গা। তার নিরবচ্ছিন্ন সুমধুর তান যেন সামগান। ঐ চটিতে সেদিন আমরা খুব আনন্দ পেয়েছিলাম। চটিতে মোষ এনেছিল অনেক—খাঁটি দুধ, দৈ, ঘি কিছুরই অভাব ছিল না।

পরদিন আরো দশ মাইল উৎরিয়ে "বোড়কেদার"। ধর্মগঙ্গা ও বালগঙ্গার সঙ্গমস্থল—এই স্থানটি অতি মনোহর। নীচু জায়গা, ৫০০০ ফিট। চারদিকে গ্রাম, চাষ-আবাদ, ব্যবসা-বানিজ্য বেশ চলছে। এখানে প্রাচীন শিবদুর্গার মন্দির বিখ্যাত। দোকান, চটি, ধর্মশালা, এখানে প্রচুর। গ্রামের দক্ষিণে ভৃগুপাহাড় ও পূর্বে স্বর্গারোহিণী পাহাড় দণ্ডায়মান। বোড়কেদার—শিলামূর্তি—পাহাড়াকৃতি। তাঁর গায় এগারটি চিত্র অঙ্কিত। শিব, দুর্গা, গণেশ, নারায়ণ, ভৈরব, পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী। লোকে বলে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর পাণ্ডবগণ স্বর্গারোহণের পথে শিব-সন্দর্শন-মানসে এখানে এসেছিলেন।

বোড়কেদার থেকে তার পরদিন গেলাম ভট্টচটীতে। এদিকে লোকালয় আছে, তাই দোকানও পাওয়া যায়। পরবর্তী চটির নাম ভৈরব চটী। প্রকাণ্ড একটি সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠের মধ্যে মন্দির অবস্থিত। এভাবে চারধামের পথেই চার জন ভৈরব আছেন। এ জায়গাটি বেশ সুন্দর। পাণ্ডাজী অনেক গল্প বলে যেতে লাগলেন। তার

ারমর্ম হল—একজন ইংরেজ সেনাপতি সদলবলে একবার এ পথে যাচ্ছিলেন। গোরাদের অনাচারে ও মন্দিরে অশ্রদ্ধ ব্যবহারে দেবতা রুষ্ট হন এবং অনেক সাহেব নানারূপ অলৌকিক দৃশ্য দেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। সেই দলে যে সৈন্য সামন্ত ছিল, তাদের প্রায় সকলেই মৃত্যুর মুখে না পড়লেও একেবারে মরণাপন্ন হয়ে যায়। যাই হোক্, শেষ পর্যন্ত সাহেব তাম্রপাতে গড়া বাবার মন্দির ও পুজা ভোগ দিয়ে নিষ্কৃতি পেয়েছিলেন। সেই সেনাপতির স্বহস্তে লিখিত বর্ণনা প্রমাণপত্র হিসাবে এখনও আছে। পাণ্ডাজীর আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও সময় সাপেক্ষ বলে আমরা তা দেখতে রাজি হইনি। তারপর আমরা মৌঠ, ধুতু ইত্যাদি রাস্তায় ফেলে রায়পুরে এসে রাত্রিবাস করলাম। রায়পুর হ'ল বিখ্যাত পওয়ালী পাহাড়েরই অংশবিশেষ। আরো নয়টি মাইল উঠতে পারলে পাওয়ালী চটীতে পৌঁছুব।

পরদিন অন্ধকার যেতে না যেতেই আমরা হাঁটতে আরম্ভ করলাম পওয়ালী জয়ের আশায়। যেমনি ভয় তেমনি আনন্দ, "টেরিব্‌ল্ বিউটিফুল।" একটি শিখায় উঠেছি—দেখছি পশ্চাতে ফেলে আসা কত দূরদূরান্তরের বনানী, তরুলতা, গ্রাম, পাহাড়, নদী, নালা। একদৃষ্টে দৃশ্যমান সে চিত্র অতি মনোরম। কিন্তু সম্মুখে তাকাতেই দেখি আর একটি অধিক উঁচু চূড়া দণ্ডায়মান। যেন আক্রমণোদ্যত শত্রুর সম্মুখীন বিরাটকায় আফ্‌গান শান্ত্রী। কিছুতেই সে রাস্তা ছাড়বে না। আমরা বুক বেঁধে যখন তারও মাথা দলিত করলাম—তখন হতভম্ব। দেখি কি না, ততোধিক উঁচু আর একটি সম্মুখে। কেবল এখানেই শেষ নয়, এরূপ ভাবে পর পর আরো তিনটি পর্বতারোহণ করে যখন দেখলাম যে আর শেষ নেই, তখনও সুমুখে আর একটি—একটু বিচলিত হয়ে গেলাম। শৌর্য বীর্য আগেই শেষ। এখন শুধু আপোষ করে চলা। বুঝলাম, হাঁ সত্যিই "কাবুলকা লড়াই—পাওয়ালীকা চড়াই"। কি জন্য যে এ রাস্তা সম্বন্ধে এত ভীতিপ্রদ জনরব তা বুঝতে আর বাকী নেই। কি করা যায়? এসেছি যখন, যেতেই হবে। নিরুৎসাহ-ভাঙ্গামন ও ক্লান্ত দেহকে কোন প্রকারে টেনে সম্মুখ-শিখরে উঠালাম। দেখি অনন্ত বিস্তৃত আকাশ—সামনে আর পাহাড় নেই। দিগন্তে শুভ্র হিমগিরি ও মেঘ এক হয়ে আছে। প্রকৃতি তার শোভা এখানে দু'হাতে বিলিয়ে দিচ্ছেন। বিচিত্র সৌন্দর্যের অবাধ আনন্দ। দিকে দিকে অপূর্ব শ্রী উদ্ভাসিতা হয়ে উঠল। সমস্ত দুঃখের, সমস্ত ব্যথার যেন অবসান হয়ে গেল। কি তৃপ্তি! কি আনন্দ! হাতে স্বর্গলাভ। সবই মধুময়—বায়ু মধুময়, নদীসকল মধুময়, ওষধিসকল মধুময়, রাত্রি ও ঊষা মধুময়, পৃথিবীর ধূলি মধুময়, দ্যোরূপী পিতা মধুময়, বনস্পতি মধুময়, সূর্য মধুময় এবং গোসকল মধুময়। ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

ঐ পাহাড়ের সানুদেশে তিন চারিটি ছোট মাঠ আছে। একটি সম্পূর্ণ বরফাবৃত। অতি সাবধানে রাস্তা নির্ণয় করে পদক্ষেপ করতে হয়। উচ্চতা ১১০০০ ফুট। এখান থেকে চির হিমগিরির যে মনোরম রূপ দৃষ্ট হয় তা অতুলনীয়। গাছপালা কিছুই নেই। চারদিকে কেবল ঢেউখেলান স্ফটিকের পাহাড়। মাঝে মাঝে চূড়াগুলি যেন ধারাল তীক্ষ্ণ ফলকের ন্যায় চক্ চক্ করছে সূর্যকিরণে। নীচে কোথাও বা অল্পবিস্তর ঘাস আছে। যেখানে বরফ নেই, গলে গিয়েছে—সেথায় লাফিয়ে উঠেছে ফুল। গাছ পরে বেরুচ্ছে। কত রঙবেরঙের ফুল! যেন গালিচা বিছান। শুনেছি শ্রাবণ মাসে ফুলের আধিক্য আরো বেশী। তখন ব্রহ্মকমল নামে একপ্রকার পদ্ম ফোটে—অত্যন্ত সুগন্ধযুক্ত। শুভ্রবর্ণ, আকার মেগ্নোলিয়া গ্রেণ্ডিফ্লাওয়ারের মত। সে সময় ফুলের গন্ধে অনেক যাত্রী নেশাগ্রস্ত হয়ে যায়। আমরা যতটা আভাস পেয়েছি তাতে অবিশ্বাসের কোনই কারণ নেই। সেদিন পাহাড়ের শীর্ষদেশেই রাত্রিবাস করলাম। পরদিন প্রভাতে সূর্যোদয়ের যে দৃশ্য দেখলাম, তা কখনও ভুলতে পারব না—চিরকালের জন্য সে মনের কোণে স্থান দখল করে নিয়েছে।

কবীর বাণী

শ্রীযোগেশচন্দ্র মজুমদার

('সতগুরু সোঙ্গ দয়া কর দীনহা'—বাণীর অনুবাদ)

অজানা যিনি চিনেছি তাঁরে
পেয়েছি পরিচয়,
এ কেবলই দয়াল গুরুর
করুণা মনে হয়।
চরণ বিনা চলিতে আমি
শিখেছি তাঁর কাছে,
পক্ষবিহীন যদিও আমি
উড়েছি গাছে গাছে।
নয়ন বিনা দেখেছি আমি
শুনেছি বিনা কানে,
বদন বিনা আহার করি
হয়েছি সুখী প্রাণে!
চন্দ্র সূর্য দিবস রাতি
সেথায় নাহি রহে,
যেথায় মোর ভক্তি-ধ্যানের
সদাই স্রোত বহে!
অন্ন বিনা অমৃত-রসে
আমার প্রাণ ভরে,
সলিল বিনা সদাই দেখি
আমার তৃষা হরে।
পুলক রাজে পরম রসে
পূর্ণরূপে যথা,—
কাহারে কহি মর্ম ইহার
কে বুঝিবে কথা!
কবীর কহে সত্য গুরু
তাঁহারে বলিহারি,
ধন্য হল শিষ্য, তাহার
জীবন মনোহারী!

বাংলার সংস্কৃতি ও প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য

শ্রীকালীপদ চক্রবর্তী, এম্-এ

(পূর্বানুবৃত্তি)

একটু তলিয়ে বিচার করলেই দেখা যায় যে, বাংলার শিবশক্তিবাদ অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা স্বতন্ত্র। বেদের রুদ্র আর বাংলার শিব যে এক নয় তা পূর্বেই বলা হয়েছে। শিব ছিলেন বাঙালী দ্রাবিড়দের দেবতা। বৌদ্ধযুগে বজ্রযানের সঙ্গে শিববাদ একভাবে মিলেমিশে রয়েছে। মহাযানী বৌদ্ধধর্ম বাংলার তান্ত্রিকতার দ্বারা প্রভাবান্বিত। বৌদ্ধের ধর্মমূর্তি বাংলার বহুস্থানে আজও শিবরূপে পূজা পাচ্ছেন। শাক্তদর্শন ও তান্ত্রিকতার জন্য বাংলাদেশেই দুই এক জন

বিদেশীয় পণ্ডিত (প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ উইনটারনিজ্) এই মতের পক্ষপাতী। বাংলার শাক্তদর্শনের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের তান্ত্রিকতার খানিকটা প্রভেদ আছে। প্রভাস, মালাবার, অন্ধ্র-কোচিন প্রভৃতি নানা স্থানে তন্ত্রের নানা রূপ দেখা যায়। বাংলার বহু তন্ত্রাচার্য বাংলার বাইরেও প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, প্রমাণ আছে। বাংলায় শাক্তদর্শনের রূপ কি, তা প্রাকৃত-জনের ধর্মাচরণের মধ্যেই দেখা যায়। শক্তি চিন্ময়ী মূর্তি ত্যাগ করে মানবীয়রূপে ঘরে ঘরে বিরাজমানা। বাঙালী শাক্ত তার দেবীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রেম-সম্বন্ধে যুক্ত। সে প্রেম মানবীয় স্তরে নেমে এসেছে। আগমনী ও বিজয়া গানে তা পরিস্ফুট। শাক্তভক্তেরা মাতারূপে কন্যারূপে শক্তিকে অভিনন্দন করেছেন। বাংলার প্রাকৃতজনের ধর্মও এই ভাবধারার প্রভাবান্বিত। ভক্ত রামপ্রসাদ, রামলোচন, কমলাকান্ত প্রভৃতি শাক্তভক্তদের মাতৃ-বন্দনার গানে যে মানবীয়তা ফুটে উঠেছে পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ পরমহংস সেই ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন বিশেষভাবে। বাউলদের মধ্যে ভগবানকে যেমন মানবীয়ভাবে দেখা হয়েছে, বাংলার শাক্তভক্ত চিন্ময়ী মাকে মানবীয় সম্বন্ধের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই তান্ত্রিকতাই আনন্দ-মঠে মাতৃবন্দনার গানে দেশজননীরূপে পরিস্ফুট। মাতৃমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ বাঙালীর ছেলে দেশজননীর জন্য যেভাবে আত্মাহুতি দিয়েছে, অন্যান্য প্রদেশে ঠিক এই ভাবটি আর দেখা যায় নি।

বাংলার বৈষ্ণবতাও অন্যান্য প্রদেশের বৈষ্ণবতা অপেক্ষা স্বতন্ত্র। রামানুজ মাধ্ব ও নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব বাংলাদেশে আছেন, কিন্তু আধুনিক কালে বাংলার বৈষ্ণবতা বল্‌তে মহাপ্রভু-প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মকেই আমরা বুঝি। শ্রীক্ষিতি-মোহন সেন বলেন যে, বাংলার বৈষ্ণবধর্ম অতি পুরাতন। পাহাড়পুরে বৈষ্ণবধর্মের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা অন্তত দেড় হাজার বছরের পুরানো অর্থাৎ এইসব মত থেকে প্রাচীনতর। তাতে বাংলাদেশে প্রচলিত কৃষ্ণলীলাই বেশী চিত্রিত। যা হোক মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাভেদ ও নিত্য বৃন্দাবনলীলা তার আপন জিনিস। মাধ্বাচার্য, নিম্বার্ক ও রামানুজের ভালো ভালো কথা মহা-প্রভু ও বৈষ্ণবাচার্যেরা গ্রহণ করেছেন, তবু একথা না বলে উপায় নেই যে, মহাপ্রভুর বৈষ্ণবতা বাংলার প্রাচীন বৈষ্ণবভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশের বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশের নিজস্ব। বাংলার বাইরে অন্য কোন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধাঁচে তাকে ফেলা যায় না। যে মরমীবাদ ও মানবতাবাদের ধারা নানা সাধনার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবাহিত মহাপ্রভুর মধ্যে সেই ধারার স্বরূপ দেখতে পাই। সেইজন্য বাংলার বাউলেরা তাকে আপনজন বলে মেনে নিয়েছেন। জয়দেব-চণ্ডীদাস-কৃত কৃষ্ণলীলার কীর্তন মাধ্ব ও অন্যান্য সম্প্রদায়-বিরোধী, কিন্তু মহাপ্রভুর তাই উপজীব্য। মাধ্ব-মতে বর্ণভেদ আছে, মহাপ্রভুর মতে মানুষ সবই সমান, কৃষ্ণভক্তিতে সকলের সমান অধিকার। মহাপ্রভুর মতে 'রাগানুগা' ভক্তিই আসল। প্রেমই মান্য। ভগবানের সর্বোত্তম স্বরূপ মানবস্বরূপ। 'কৃষ্ণের যতেক লীলা, সর্বোত্তম নরলীলা'। বাংলার বাউলদের সঙ্গে এই বিষয়ে মহাপ্রভুর যথেষ্ট মিল আছে। বাউল সাধক বলেন, 'মানুষই সারতত্ত্ব'—'আদ্য অন্ত এই মানুষে বাইরে কোথাও নাই'। এই প্রসঙ্গে চণ্ডীদাসের বিখ্যাত পদাবলী স্মরণীয়—'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই',—এই মানবতা বা মানবতত্ত্বই বাংলার খাঁটি বৈষ্ণবধর্ম বা বাউলদের সাধনা বা তান্ত্রিকতার মর্মবাদ। এই তত্ত্বই বাংলার প্রাণধর্ম।

বাংলার প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্য:

এ কথা সত্য যে, ভারতীয় আর্যদর্শনই মানব-

সত্য আবিষ্কার করেছে। দর্শন ও ধর্মে তাই এখানে ওতঃপ্রোত সম্বন্ধ। দর্শনের দ্রষ্টাই ভারতীয় ঋষি, যিনি সৃষ্টির অন্তস্থলে প্রবেশ করেছেন—সর্বজ্ঞ হয়েছেন। বৈদিক ঋষিরা প্রথম দিকে এই বিশ্বচরাচরের মধ্যে সার্থকতা খুঁজেছেন—অথর্ববেদে দেখি মানুষ ও পৃথিবীর দিকে সকলে শ্রদ্ধার চোখে তাকালেন—

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদু।
স্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনম্॥

অর্থাৎ যে মানুষের মধ্যে ব্রহ্মকে দেখ্লো, সে ঠিক জায়গাটিতেই তাকেই সংস্থিত দেখলো। তারপর বেদান্তদর্শনে এই মানব-সত্যেরই জয়গান। বৃহদারণ্যক ঘোষণা করলেন—'অয়মাত্মা ব্রহ্ম'। অথর্ববেদ বল্লেন—ঋক যজু সাম, সবই এই মানুষের মধ্যে—ভূত ভবিষ্যৎ সর্বলোক সর্বকাল সবই এক মানুষে—(অথর্ব ১০ম কাণ্ড)। রবীন্দ্রনাথ 'মানুষের ধর্ম' বক্তৃতায় এই মানব-সত্যের কথাই প্রচার করেছেন। মানবসত্যই শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার। 'মানুষ আপন মানবিকতারই মাহাত্ম্যবোধে আপন দেবতায় এসে পৌঁছেছে। মানুষের মন আপন দেবতায় আপন মানবত্বের প্রতিবাদ করতে পারে না, করা তার পক্ষে সত্যই নয়। ঈশ্বরের কল্পনে মানুষ আলোকত্ব আরোপ করে না, তাকে স্বতঃই আলোকরূপেই অনুভব করে, আলোকরূপে ব্যবহার করে, ক'রে ফল পায়। এও তেমনি।' বাংলাদেশে বেদান্তের এই মানবসত্য-প্রচারের আগেও বাংলার নিজস্ব জীবন-দর্শনের মধ্যে মানববাদ দেখতে পাওয়া যায়। নাথযোগ, মহাযান বৌদ্ধমত ও জৈন মরমীবাদ যা বাংলার মাটির রসে জারিত হয়ে বিশেষভাবে প্রকট হয়েছিল, এই সব মতবাদ বেদবিরোধী হলেও মানুষকে বিশিষ্ট শ্রদ্ধার আসন দিয়েছে। এই ধর্মমতগুলির প্রাণবস্তুই বাংলার সাধনাকে পুষ্ট করে এসেছে—এ, থেকেই সৃষ্টি হয়েছে বাউল ও সহজিয়া ভাব—যার আসল কথাই হচ্ছে মানুষ, এই মানুষের মধ্যেই সব :

'জীবে জীবে চাইয়া দেখি
সবই যে তার অবতার।
ও তুই নতুন লীলা কী দেখাবি
যার নিত্যলীলা চমৎকার।'

'আমার আঁখি হতে পয়দা
আসমান আর জমীন।'

বাংলার গম্ভীরা গাজন ও নীলের গানে শিব-পার্বতীর মানবলীলাই পরিস্ফুট। শিবপার্বতী আমাদের ঘরের মানুষের মত আপনজন হয়ে আছেন। পার্বতী প্রাকৃত জনের মত বাগদিনী সেজে মাছ ধরেছেন, শিব কৃষক সেজে চাষ আবাদ করেছেন। বাংলার শিব যোগীশ্বর শিব নহেন, তিনি আমাদের ঘরের মানুষ। কন্যারূপে, মাতা-রূপে গৌরী আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজমানা। বাঙালী হৃদয়ের এ নিজস্ব সৃষ্টি।

বাংলার বৈষ্ণবধর্ম বাংলার নিজস্ব সৃষ্টি—এ কথা পূর্বেই বলেছি। দেবতাকে প্রিয় ও প্রিয়কে দেবতা করার সাধনাই বাংলাদেশের বৈষ্ণব সাধনা। এই প্রেমের মধ্যেই দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের সমস্যা মিটে গেছে। 'দ্বৈতাদ্বৈত নিত্য ঐক্য প্রেম তার নাম।' বাউলরাও বলেন, 'প্রেমে দ্বৈতাদ্বৈত ভেদ ঘুচেছে।' বৈষ্ণবেরাও বলেন—জ্ঞানবৈরাগ্য ভক্তির নহে কভু অঙ্গ (শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত)। প্রেমের কাছে জ্ঞান বৈরাগ্য তুচ্ছ। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতে উপাস্য উপাসক ভিন্ন। উপাস্য বিষ্ণু বৈকুণ্ঠেশ্বর ত্রিভুবনের অধিপতি—সকল দেবতা অপেক্ষা তাঁর স্থান অতি উচ্চে। এই ধারণার বশেই স্বয়ং রামানুজ দক্ষিণ ভারতের বহু শিব মন্দির থেকে শিব-বিগ্রহ উৎখাত করে বিষ্ণু-বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন—দক্ষিণ ভারতে শৈব-বৈষ্ণব বিরোধ তাই অত্যন্ত প্রকট। কিন্তু বাংলাদেশে সকল ধর্ম সকল সত্য পাশাপাশি

অবিরোধী চলেছে। ষোড়শ শতকে প্রবল বন্যাবেগের মত বৈষ্ণব ধর্মের অভ্যুদয়, কিন্তু কাউকে সে আঘাত করে নি। মহাপ্রভুর নিজ জীবন এই ভাবেরই লীলা। মহাপ্রভু নিজে জ্ঞানী ও নৈয়ায়িক ছিলেন, কিন্তু প্রেমের তিনি মূর্তবিগ্রহ। বাউলরাও তাই তাঁকে আদিগুরু বলেছেন। এই প্রেমলীলার আর একটি বিশেষত্ব তার ঐশ্বর্য। রাজরাজেশ্বর যখন সামান্যা রমণীর সঙ্গে প্রেমে যুক্ত হন, তখন সে অসামান্যা। মহাপ্রভু তাই বলেছেন—'ঐশ্বর্য শিথিল প্রেমে নহে মোর প্রীত'। প্রেমে ভক্ত ভগবানে ভেদ নেই, উপাস্য উপাসক ব্যবধানও লুপ্ত।

মহাপ্রভু-প্রচারিত প্রেমধর্ম বাংলা পেরিয়ে পুরী, গয়া, বৃন্দাবন, জয়পুর এবং আরও পশ্চিমে প্রসারিত হল। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে সারা ভারতের বুকে এক গৌরবময় ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত হল। বাংলার কীর্তন ও বৈষ্ণব-সাহিত্যও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা করল। ধর্ম-সংস্কৃতির এইরূপ প্রাণময় আন্দোলন বাংলাদেশে আর কখনো হয় নি। ষোড়শ শতকের বাংলার সেই প্রাণময়তা ও মানবতার ধারা আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত ও সংস্কৃতিকে যে কতভাবে পুষ্ট করেছে তার ইয়ত্তা হয় না।

পূর্বেই বলেছি বাংলার মুসলমান মনে প্রাণে বাঙালী থাকায় সংস্কৃতিগত কোন বিরোধ দেখা দেয় নি। সাধারণ মুসলমানের দৃষ্টি সেকালে মক্কার দিকে ছিল না। বাংলাই ছিল তার মক্কা-মদিনা। অতি আধুনিক কালেই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংস্কৃতিগত ভেদবুদ্ধি নানাভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে, নইলে সহজ বাঙালীত্বের দাবীতে বাঙালীর ছেলে বলে বাঙালী সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের উপরও তার সহজ অধিকার। এই বোধটুকু তার নষ্ট হয়েছে সাম্প্রতিক কালে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনে। নাহলে সুফীমতের উদারতা ও মর্মবাদ বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে একটা আপোষ রক্ষা ক'রে পাশাপাশি চলে এসেছে।

বাঙালীমনের এই ভাবধারা কি নিঃশেষ হয়ে গেছে? উনবিংশ শতক থেকে সুরু করে যে ইউরোপীয় ভাববন্যা বাংলার উপর দিয়ে বয়ে গেল তাতে বাংলার সংহত জীবনযাত্রাকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে বটে, কিন্তু তার প্রাণশক্তিকে নষ্ট করতে পারে নি। মরমী বাঙালী, ভাবুক বাঙালী এক নতুন আলোর সংঘাতে চমকিত হল। নব নাগরিক সভ্যতার আঘাতে ভেঙে গেল তার পল্লীপ্রাণতা, টুটে গেল তার মনোময় জগৎ। এক কথায় তার জীবনের মর্মমূলে নেমে এল প্রচণ্ড আঘাত। সে আঘাতে বাঙালী আবার নতুন করে জাগল। তার বুদ্ধিও ধাবিত হলো নতুন খাতে। মানবতা রূপ নিল নানা সাংস্কৃতিক ও ধর্মান্দোলনে। রামমোহন এলেন মানবতার প্রথম দূত, তারপর বাংলার রঙ্গমঞ্চে একে একে দেখা দিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, শিবনাথ ও কেশবচন্দ্র সেন। কিন্তু এই প্রবল পরিবর্তনের যুগে সমন্বয়-সাধনার যে বিরাট শক্তি প্রয়োজন, সে শক্তির অভ্যুদয় হল দক্ষিণেশ্বরে, এক গেঁয়ো ব্রাহ্মণের মূর্তিতে। ইনিই সমন্বয়-সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস। ইনিই উনিশ শতকের বাংলার ভাবঘন বিগ্রহ। রামকৃষ্ণ একাধারে তান্ত্রিক, যোগী, জ্ঞানী, ভক্ত ও সাধক—হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান—সব মতবাদে সিদ্ধ পুরুষ—এ এক আশ্চর্য সম্মিলন—বাংলার মাটিতেই এ বিকাশ সম্ভব। হৃদয়বত্তা ও মানবতার দিক দিয়ে চৈতন্যের সঙ্গে এঁর তুলনা করেছেন অনেকে। এই হৃদয়ধর্মই বাংলার নিজস্ব অবদান। সর্বমানবে ঐক্যবুদ্ধি ও নারায়ণ-ভাবে জীবে সেবা—এই শিক্ষাই রামকৃষ্ণের প্রধান শিক্ষা। পরবর্তী কালে এই শিক্ষা প্রচার করেছেন স্বামী বিবেকানন্দ। সংস্কৃতির রেনেসাঁস্ সুরু

হল এই বিরাট অভ্যুদয়ের সাথে, বাঙালীর বাঙালীত্বকে সর্বভারতীয়ত্বে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিবেকানন্দ। এর আগে চেষ্টা করেছেন রামমোহন, চেষ্টা করেছেন কেশবচন্দ্র। তাই রবীন্দ্রনাথ এই সব মহাপুরুষদের আখ্যা দিয়েছেন 'ভারত পথিক'। চৈতন্যের যুগে বাঙালীর প্রসারতা দেখতে পেয়েছি একবার, আর একবার বাঙালী প্রসারিত হল উনিশ শতকে সাহিত্যে, শিল্পে, জ্ঞানে, বিজ্ঞানে, ধর্মে। বাঙালীর মনোময়তা, মনীষা ও আত্মদানে এক বিরাট মহাভারতের সূচনা।

ইউরোপীয় ভাবধারার সংঘাতে বাঙালীর প্রান্তিকতা ঘুচল, জীবন দর্শনে এল এক অভিনব দৃষ্টি। মুসলমান শাসনের প্রভাবে বাঙালী ধীরে ধীরে সমাজ-জীবনে যে কূর্মবৃত্তিকে আশ্রয় করেছিল, তা থেকে মুক্তি পেল বাঙালী মন—বাঙালীর মনোময়তা ও প্রাণময়তা নিরন্তর রসের সাধনায় যে বিকৃতি প্রাপ্ত হয়েছিল, সেই বিকৃতিই তাকে দুর্বল ক'রে সর্বভারত থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে রেখেছিল। সেই দুর্বলতা, সেই প্রান্তিকতা ঝেড়ে ফেলে উঠে দাঁড়াল বাঙালী। রাষ্ট্রজীবনে সমাজচেতনায় নব উদ্বোধিত বাঙালী ভারত-নেতৃত্বের জন্য প্রস্তুত হল। জাতীয়তার 'বন্দে মাতরম' মন্ত্র ভেরী-নিনাদে বেজে উঠল বাংলার অঙ্গনে অঙ্গনে। সে ভেরীনিনাদ স্পর্শ করল সারা ভারতের হৃদয়। সংস্কৃতির নব অভ্যুদয় বাঙালীকে দিল যেমন নব চেতনা, জীবনদর্শনেও দিল এক অভিনব দৃষ্টি। রসের সাধনায় আত্মহারা বাঙালীর ছেলে মেতে উঠল বীর্যের সাধনায়। বিংশ শতকের প্রথম পাদে বাঙালী এক নতুন আদর্শ প্রতিষ্ঠা করল সারা ভারতে। তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে বাঙালীর আবেগময় মন ও স্বাধীন চিন্তাধারাই এর মূলে। জাতির ভাবমূর্তি পরিগ্রহ করে এলেন রবীন্দ্রনাথ। বাঙালী-জীবনে যেটুকু প্রান্তিকতা ছিল, তাকে ধুয়ে মুছে প্রতিষ্ঠিত করলেন বিশ্বমানবতার স্তরে। বিশ্বমানবতার বাণী ধ্বনিত হলো রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে। বাউল বৈষ্ণবের মানবতা তাকে শেষ পর্যন্ত মানব-সত্য প্রচারে প্রেরণা দিয়েছে। উপনিষদের ভাবধারায় উজ্জীবিত রবীন্দ্রনাথ এক সংহতি খুঁজে পেয়েছেন বাংলার মানবতা-ধর্মের সাধনপীঠে, বাংলারই মর্মবাণীর মধ্যে।

বর্তমান সংকট ঃ

মানবধর্মের সাধনপীঠ বাংলা কি আজ নানা বিপর্যয়ের মধ্যে নিষ্প্রাণ নিঃশেষিত হতে থাকবে? এতদিনকার এত মহাপুরুষ ও সাধকের তপস্যা ও আত্মাহুতি কি ব্যর্থ হবে? বাংলা আজ সত্যই দুরূহ সমস্যার সম্মুখীন—সমস্যার যেন অন্ত নেই। দেহ যখন দুর্বল হতে থাকে, রোগ-জীবাণুর আক্রমণও তত প্রবলতর হয়ে দেখা দেয়। বহুদিন থেকে বাংলা এই দুর্বলতার প্রশ্রয় দিয়ে চলেছে অন্তরে ও বাইরে, তাই বৃটিশ রাজশক্তির শেষ ও চরম আঘাতের মুখে বাংলার আর আত্মরক্ষা করার দৃঢ়তা ছিল না। খণ্ডিত হৃতশক্তি বাংলা তার মহৎ আদর্শ থেকে আজ ভ্রষ্ট হয়ে চলেছে। রাষ্ট্র ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে বাংলা আজ হৃতগৌরব। কোথায় গেল সেই অপরিমেয় প্রাণশক্তি, চিন্তার স্বাধীনতা ও অপরিসীম হৃদয়বত্তা? বাঙালীমনের সূক্ষ্মতা, কমনীয়তা, অনুভবপ্রবণতা ও কল্পনার সাবলীলতা—যা বাঙালী চরিত্রকে একদা গৌরব-মণ্ডিত করেছিল, কোথায় গেল সেই চিত্তবৃত্তির সহজ বিকাশকুশলতা?

বারবার বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে বাংলা-দেশ। কিন্তু সে বিপর্যয়ের আঘাতকে অতিক্রম করে নতুন প্রাণশক্তির পরিচয় দিয়েছে বাঙালী। রাষ্ট্রনৈতিক সংঘাত অর্থনৈতিক শোষণ—কিছুতেই বাংলাকে তার প্রাণধর্ম থেকে বিচ্যুত করতে

পারে নি। আজ আমাদের জীবনের মূলে উদ্দীপনা নেই, জয়ের মনোভাব ও আনন্দ নেই। তাই আমরা সৃষ্টি-প্রতিভা হারিয়েছি। আজ আমরা আদর্শভ্রষ্ট স্বধর্মে আস্থাহীন। নির্যাতিত হয়েও প্রতিকারের জন্য মহৎ আত্মত্যাগে আর আমরা প্রস্তুত নই। ঈর্ষা দ্বেষ পরশ্রীকাতরতায় আমরা জর্জরিত। যে মানবতাধর্মের সাধনপীঠ এই বাংলা সেই মানবতাধর্ম আজ লাঞ্ছিত। সংঘ-শক্তিতে তাই আমরা পশ্চাৎপদ হয়ে চলেছি। প্রেম-হৃদয় মানবতা আমাদের কাছে আজ অভিধানের বুলি, জীবনধর্মের মধ্যে তার বিকাশ নেই। রসবোধের বিকৃতিকে পরম আনন্দে আজ আমরা রোমন্থন করে চলেছি। বর্তমানের কবি সাহিত্যিক শিল্পী সেই বিকৃতিকে পরমোৎসাহে প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন। আর অবাঙালী চতুর বণিক, ব্যবসায়ী আমাদের নিষ্ক্রিয় অবস্থার সুযোগে মুখের গ্রাস লুণ্ঠন করে চলেছে।

দুর্বলতার ভিতর দিয়েই সূচিত হয় জাতির সর্বনাশ। বাংলার সর্বনাশ তাই হঠাৎ একদিনে হয়নি। ধীরে ধীরে চিত্তবিকৃতির ভিতর দিয়ে জীবনদর্শন থেকে ভ্রষ্ট হয়েছি আমরা—তাই চারিদিকে এই নৈরাশ্য ও পরাজয়ী মনোবৃত্তি। মুসলমান শাসনের বিজাতীয় আঘাত অতিক্রম করেও বাংলা ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে এক গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করেছিল। বাঙালী চিত্তের এই প্রবলতা, এই বলিষ্ঠতা যা ইউরোপীয় প্রভাবের প্রথম যুগেও জীবনের ক্ষেত্রে স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত দেখতে পাই, সেই দীপ্তি ও প্রাণময়তা কি বাংলার জীবন-দর্শনকে আবার উদ্ভাসিত করবে না?

"বন্ধু সে যে তোমার আশ্বাস"

শ্রীঅজিতকুমার সেন, এম্ এ

জানি আছে আবিলতা,—আছে চিত্তে কলুষ কালিমা;
জীবন প্রবাহে জানি আবর্তের নাহি মোর সীমা!
কামনা প্রমত্ত জানি,—জানি সে যে দুরন্ত, দুর্বার;
আছে মদোদ্ধত দম্ভ, দুর্বিনীত মিথ্যা অহঙ্কার!
আছে দ্বিধা, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অবিশ্বাস,—বিচ্যুতির গ্লানি;
অসম্বিৃত বাসনার আছে বক্ষে তীব্র হানাহানি!
আছে বিক্ষেপের দাহ,—অসঙ্গতি বিভ্রম সংশয়;
সর্পিল বন্ধুর পথে স্খলনের নিত্য আছে ভয়!
আমার সমুখ পথে তবু যেন শুনি ক্ষণে ক্ষণে—
নূপুর নিক্কন রোল বাজে কার অলক্ষ্য চরণে!
বিপর্যয়ে,—দুর্দৈবের পুঞ্জীভূত ঘন কৃষ্ণ মেঘে
আশার দামিনীচ্ছটা আচম্বিতে কভু ওঠে জেগে!
তোমার সঙ্কেত সে যে—বন্ধু, সে যে তোমার আশ্বাস!
ঝঞ্ঝাহত সিন্ধুবক্ষে সে যে আনে তীরের আভাস!

জীবনের গতিপথ

স্বামী ধ্রুবাত্মানন্দ

সকল মানুষেরই জীবনের গতিপথ স্থিরীকৃত হয় নিজ নিজ আচরণানুযায়ী।

"তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ—৫।১০।৭)

যে জীবের এ জগতে ভাল আচরণ অভ্যাসে পরিণত হয়, সেই জীব ভাল যোনিতে জন্মগ্রহণ করে—তার আবির্ভাব হয় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় কিংবা বৈশ্যরূপে। আবার খারাপ আচরণ যার অভ্যাসে পরিণত হয়, সে জন্ম নেয় খারাপ যোনিতে—আসে কুকুর, শূকর কিংবা চণ্ডালরূপে।

গীতাতে রয়েছে :—যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তম্ তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥—মরণের সময় যার যে সংস্কার প্রবল হয়, সে সেই সংস্কারানুযায়ী সেইভাবে ভাবিত হয়ে এ জগতে জন্ম নেয়।

'অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম শুভাশুভম্।
নাহভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম কল্পকোটি শতৈরপি॥'

ভালমন্দ কর্মফল জীবকে অবশ্যই ভোগ করতে হয়। এই কর্মফল ভোগ না করা পর্যন্ত কোটি কোটি বর্ষেও সেই কর্মের ক্ষয় হয় না। কর্ম জীবকে নিয়ে চলে জন্ম হতে স্থিরীকৃত গতিপথ ধরে, যেন জীবনের প্রতি ব্যাপার একেবারে আগে থেকে ছক্‌কাটা হয়ে থাকে। মানুষের জীবনে যখন দুর্ভোগ আসে বর্তমান জীবনের কর্ম বিশ্লেষণ করে কিছুতেই তার থই পাওয়া যায় না। তাই বিবশ হয়ে জীবকে পূর্বজন্মকৃত কর্মফল মানতে হয়। ভূতনাথের জীবন-কাহিনী থেকে কর্মফলে স্থিরীকৃত জীবনের গতিপথের সন্ধান পাব আমরা।

ভূতনাথের জন্ম হয় এক মধ্যবিত্ত বৈশ্য-পরিবারে। সংসার স্বচ্ছল, টাকা পয়সা, জায়গা জমি রয়েছে যথেষ্ট। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই দেনার দায়ে সমস্ত সম্পত্তি বিকিয়ে যায়। নিলামে তারই বড় কাকা তাদের সম্পত্তি কিনে নেয়। অবস্থার বিপর্যয়ে ছেলেপিলের বড় পরিবার নিয়ে বিপদগ্রস্ত হয়েছেন বাবা। কোন রকমে কষ্টে সৃষ্টে সংসার প্রতিপালন কচ্ছেন।

ছোটবেলা থেকেই ভূতোর মনের গড়ন আলাদা। ভায়ের ছোট মেয়েকে নিয়ে পুকুর ধারে বসে মেঘ ভেসে চলেছে আকাশের গায়ে, তাই দেখতে থাকে একমনে এবং মেয়েটিকেও দেখায়। মেঘ ভেসে চলেছে—সঙ্গে সঙ্গে তার মনও ভেসে যাচ্ছে কোন এক অজানা দূর দেশে। গ্রামের স্কুলে পড়ে ভূতো—পড়াশুনোতে বেশ ভাল। ভূতোর সঙ্গে একটি মুসলমান ছেলে একই শ্রেণীতে পড়ে। সেই ছেলেটিও পড়াশুনোতে ভাল। দুজনে বেশ ভাব রয়েছে। কখন কখন দুজনে মিলে পরামর্শ করে পাহাড়ে পর্বতে যেখানে জটাজুটধারী সন্ন্যাসী ফকির ভগবানের আরাধনা কচ্ছে সেখানে চলে যেতে। একদিন ভূতোদের গ্রামে এক সৌম্যদর্শন, সুকণ্ঠ সন্ন্যাসী এসে হাজির হয় ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে—গান গেয়ে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করতে থাকে। ভূতো তাঁকে দেখে আকৃষ্ট হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্বারে দ্বারে গিয়ে সকলকে বলে বেশী করে

সংগ্রহ করে দেয় ভিক্ষা। পরে তাঁকে একান্তে পেয়ে বলে—"আমি আপনার সঙ্গে চলে যাবো।" "বড় হও, পড়াশুনো কর—তারপরে যাবে" এই বলে সন্ন্যাসী তাকে প্রবোধ দেয় এবং বিদায় নেয়। এক ভক্তিমতী বৈষ্ণবী ভূতোদের বাড়ীতে প্রায়ই আসেন। থাকেন বাইরের দিকে দূরে একটি ঘরে। এক সুন্দর গোবিন্দ বিগ্রহের সেবাপূজা, ভোগরাগ, আরতি ইত্যাদি নিয়ে বৈষ্ণবী ভরপুর হয়ে থাকেন। সেই গোবিন্দ-মন্দিরের দাওয়ায় বসে বসে ভূতো বৈষ্ণবীর কথায় রামায়ণ, মহাভারত পড়ে আর প্রতিবাসী সকলে সেখানে বসে নিবিষ্ট মনে শোনে।

ভূতোদের গ্রামের অনতিদূরে অন্য এক গ্রামে একজন সজ্জন গৃহস্থ বাস করেন। গৃহস্থ হলেও তাঁকে দেখলেই মনে হয় গৃহের বাহিরে তাঁর মন চলে গিয়েছে—সমাহিত মনে আপন ভাবে হয়ে আছেন বিভোর—দেখেই হয় শ্রদ্ধা, ভক্তিঅর্ঘ নিয়ে পূজো করতে ইচ্ছে হয় তাঁকে। ভূতো মাঝে মাঝে সারদাকে নিয়ে সেই মহাপুরুষের নিকট যায়—তাঁর কথা শুনে পায় পরম আনন্দ। সারদা তার মামার ছেলে তারই বয়সী, এক স্কুলে পড়াশুনো করে আর সৎপ্রসঙ্গে সময় কাটায়। বড়ই সরল সারদা, সংসারের আবিলতা তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। অল্প বয়সেই মারা যায় সে। সাথী মরে যাওয়ায় ভূতোর মনে আসে এক উদাসীনতা—আপনা থেকেই মনে একটা ভাব খেলে যায়—তাকেও সংসার ছেড়ে চলে যেতে হবে দূরে—অপরের মত সংসারে সংসারী সাজতে হবে না। বয়স হলেও শিশুমনের এ সংস্কার ঘুচে যায় না বালকের—বড় হয়ে একাকী ঘরে শুয়ে জানালা দিয়ে জ্যোৎস্নাস্নাত রাত্রে আকাশের দিকে আপন মনে তাকিয়ে থাকে আর পূতভাবে পূর্ণ হয় তার হৃদয়—রসনা আপনা থেকে জপে হরিনাম—সেই হরিনামে দুই গণ্ড আপ্লুত হয় অশ্রুধারায়। অশ্রুধারায় সিক্ত হয়ে মনের ময়লা ধুয়ে যায় আর যেন এক অপূর্ব লোকে বিচরণ করতে থাকে সে। বালক জীবনের অনেক রাত্রি এইভাবে কেটেছে—আনন্দধারায় পূত হয়েছে তার জীবনের এক অধ্যায়।

শ্বেতদলবাসিনী, বিদ্যাদায়িনী মা সরস্বতীর আগমনে বালকের মন নেচে ওঠে এক আনন্দ তরঙ্গে। সকালেই স্নান করে পূজোয় দেবার বই, খাগের কলম ইত্যাদি হাতে নিয়ে চলে যায় গ্রামের স্কুলে। পুজো শেষে অঞ্জলি দিয়ে সকলের সঙ্গে বসে প্রসাদ পায় খিচুড়ি, লুচি ইত্যাদি।

সহপাঠী মুসলমান ছেলেটি এবং ভূতো দুজনেই মধ্য ইংরেজী বৃত্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে—কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভূতোকেই পরীক্ষার্থী স্থির করা হয়। তার সুন্দর ইংরেজি reading শুনে জিলা স্কুলের পরীক্ষক-শিক্ষক উচ্চ প্রশংসা করেন অন্য শিক্ষকের নিকট। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভূতো মাসিক চার টাকা করে বৃত্তি পায়। বৃত্তি নিয়ে গ্রাম থেকে দূরে শহরে এক উচ্চ ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হয়। কিছু দিন যেতে না যেতেই শহরের স্কুল ছেড়ে ভূতোকে চলে যেতে হয় একটি দ্বীপে অন্য এক স্কুলে। দ্বীপটি ছোট—নারিকেল, সুপারি বৃক্ষে পরিশোভিত। ষ্টীমারে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পৌছুতে হয় ওখানে। দ্বীপে প্রায়ই প্রবল ঝড়বৃষ্টি দেখা দেয়। সেই ঝড়বৃষ্টিতে আনন্দে উদ্বেলিত হয় ভূতোর মন। দ্বীপ থেকে ভূতো ছুটিতে বাড়ী আসে একাকী। একবার ঐরূপ বাড়ী আসবার সময় পায় প্রবল ঝড়বৃষ্টি—ষ্টীমারের ঘাটে গিয়ে দেখে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ—ঢেউর পর ঢেউ চলেছে উঁচু হয়ে অবিরাম গতিতে। ভূতোর মনও সঙ্গে সঙ্গে ভেসে চলে অসীম সাগরের অনন্ত পথে—অনন্তের পরশে হৃদয়-তরী দুলে উঠেছে। ছুটিতে বাড়ী এসেছে। গ্রামে

নদীর ধারে খোলামাঠে শ্মশানকালীর পুজো—পুজো হয় মহাসমারোহে সারা রাত্রি। প্রকাণ্ড শ্মশানকালীর মূর্তি। সঙ্গে সঙ্গে দু'সারিতে রয়েছেন দুদিকে কালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, ছিন্নমস্তা, বগলামুখী, ধূমাবতী, মাতঙ্গী এবং কমলা—দশমহাবিদ্যা। সকলেই খুব আনন্দ করে এই পুজোতে। বাড়ী থেকে চাঁদা দিয়েছেন মা—কম দেখে ওরা ফিরিয়ে দিয়েছে। চাঁদা সংগ্রহকারী একজন ভূতোকে দেখে বলছে—'তোদের চাঁদা নেওয়া হবে না।' বেশী না দিলে সামাজিক শাস্তি দেওয়া হবে বলে শাসাতে থাকে—তাতে ভূতোর হয়েছে বড় অভিমান—এ কি অন্যায়, যার যেমন সামর্থ্য তাইতো দেবে—তাতে কেন অবিচার। নির্ভীক বালক ক্ষুণ্ণ মনে চলে যায় গ্রামের মাতব্বরদের নিকট—খুলে বলে সব কথা। ভূতোর কথা শুনে আশ্বাস দিয়ে মাতব্বরেরা ওকে শান্ত করে এবং সেই চাঁদাই গ্রহণ করে। সেই দিন বালকের মনে অন্য ভাব দেখা দিয়েছে—জগজ্জননীর প্রতি এসেছে অভিমান—সকলের সাথে মিশে পুজোর জায়গায় গিয়ে আনন্দ পাচ্ছে না। তাই দূরে নদীর ধারে একা আপনমনে বসে আত্মভোলা হয়ে জগন্মাতাকে স্মরণ করে—দুঃখতারিণী, পতিতপাবনী মায়ের স্মরণে প্রাণে পায় এক নির্মল আনন্দ। পরের দিন মাঠে বসে সকলের সঙ্গে আনন্দ করে মায়ের প্রসাদ পায়।

জন্ম থেকেই ভূতোর রাশি নক্ষত্রের এমন অপূর্ব সমাবেশ যে এক জায়গায় তার স্থিতি হয় না বেশী দিন। এমনি ঘটনা ঘটে যায় যে তাকে স্থান থেকে স্থানান্তরে যেতে হয়। কিছু দিনের মধ্যেই ভূতোকে দ্বীপ ছেড়ে চলে আসতে হয় শহরে জিলাস্কুলে। সেখানে হেডমাষ্টারের বিপুল বপু, গম্ভীর চেহারা, দরাজ আওয়াজ। দূর থেকে দেখেই প্রাণপাখী খাচা ছেড়ে চলে যাবার উপক্রম করে ভয়ে। কিন্তু এই বিপুল বপুর মধ্যেও ফল্গুনদীর মতো ভেতরে বইতে থাকে প্রেমবারি। ভাল ছেলে বলে ভূতোকে দেখেন স্নেহের চোখে। ব্রাহ্মণ হেড্‌পণ্ডিত মশায় ভূতো সংস্কৃতে সকলের চেয়ে বেশী নম্বর পায় বলে বরদাস্ত করতে পারেন না—ব্রাহ্মণ ছেলেদের দেন গালি। অন্য সংস্কৃত অধ্যাপকগণ ভূতোকে উৎসাহ দেন, আদর করেন। ভূতো শহর থেকে দূরে গ্রামে এক আত্মীয়বাড়ী থেকে স্কুলে আসে। যত জোর জলঝড় তত আনন্দ পায় সে রাস্তায় ভিজে ভিজে আর স্মরণ করে বালক জটিলের মত মধুসূদনদাদাকে। এই ভাবে স্থান হতে স্থানান্তরে গিয়ে অদৃষ্ট-পরিচালিত ভূতো বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। বি, এ পাশ করে চাকুরী পাবার আশায় চলে যায় সুদূর বর্মাপ্রদেশে ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায়। অচেনা অজানা জায়গা। কোন এক সূত্র ধরে ওঠে গিয়ে বর্মার বিখ্যাত এক বড় মুসলমান ব্যবসায়ীর ঘরে। কাঠের ইজারা রয়েছে তার। ইরাবতী নদীতে যত লোক কাঠনিয়ে যায় তাকেই দিতে হয় ট্যাক্স। সেই নৌকোতে নদীতে ঘুরে ঘুরে যুবক ট্যাক্স আদায় করতে থাকে আর কিছু সাহায্য পায় সেই ব্যবসায়ীর কাছ থেকে। এতে অপর ট্যাক্সআদায়ীর ব্যবহারে দেখতে পায় জালজুয়াচুরি—শিক্ষিত যুবকের ঘৃণা ধরে যায়, ছেড়ে দেয় ঐ আদায়ের কাজ। অতঃপর চাকুরীর সন্ধানে রেঙ্গুনে থাকে এক চাকুরে বাবুদের মেসে তিনতলা বাড়ীতে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই যুবকের পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে আসে আর হয়ে পড়ে অসহায়। তখন একদিন হঠাৎ অসহায়ের সহায় সর্বশক্তিমান কৃপাময় ভগবানের কৃপায় এক ব্যক্তি এসে অযাচিত-ভাবে তাঁর ছেলেদের পড়াতে বলেন। এই গৃহ-শিক্ষকের কাজ অবলম্বন করে আরও কিছুদিন ভূতো কাটায় সেই মেসে। সঙ্গে সঙ্গে চাকুরীর সন্ধানও চলতে থাকে। অনুসন্ধানে সুযোগ ঘটে না

কিছু—ভূতো নিরাশ হয়ে ফিরে আসে কলকাতায়। এখানে হোষ্টেলে থেকে এম্, এ পড়তে থাকে। এই সময়ের মধ্যে যুবক পিতৃহীন হয় এবং অনেক আত্মীয়স্বজনকে হারায়। আত্মীয়স্বজনের বিরহে এবং সংসারে আরও ঘাতপ্রতিঘাত খেয়ে ভূতোর হৃদয়-নিহিত বৈরাগ্য-বহ্নি প্রজ্বলিত হয়। সংসারে আসে বিতৃষ্ণা, খোঁজে শান্তির সন্ধান।

যন্ত্রবৎ চালিত হয়ে ভূতো চলেছে চৌরঙ্গী পার হয়ে ধর্মতলা ষ্ট্রীট ধরে। হঠাৎ পেছনে হৈ হৈ রব শোনা গেল। সবলোক প্রাণভয়ে ছুটে পালাচ্ছে—ছুটো ঘোড়া ছাড়া পেয়ে সব তছ্‌নছ্‌ করে ছুটে আসছে পাগলের মতো। ভূতোও পালাবে, এমন সময় সামনে দেখলো একটি ৮ বৎসরের বালক যাচ্ছে—তাকে গেল টেনে উঠিয়ে নিতে, এমন সময় ঘোড়া এসে তার উপরেই পড়লো। বালক গেল বেঁচে, কিন্তু ভূতোর পায়ের একটি হাড় ভেঙ্গে গেল ঘোড়ার পায়ের আঘাতে। এক ডাক্তার ভদ্রলোক গাড়ীতে আসছিলেন পেছনে। এই অবস্থা দেখে ভূতোকে গাড়ীতে উঠিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। সেখানে মাসাবধি কাটিয়ে ভূতো ফিরে এল হোষ্টেলে। আর একদিন সন্ধ্যায় আবছায়া অন্ধকারে ভূতো চলেছে এক গলি ধরে। দূরে দেখতে পেল কতগুলো লোক একটি যুবতী মেয়েকে ঘিরে রয়েছে। তাদের হাতে লাঠি ছোরা—উন্মুক্ত ছোরা উদ্যত মেয়েটির ঘাড়ের কাছে। নিজের প্রাণের মায়া পরিত্যাগ করে ছুটে গিয়ে ভূতো লোকটির হাত থেকে ছোরা ছিনিয়ে নিল আর মেয়েটি ইত্যবসরে ছুটে গিয়ে এক বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। কিন্তু ভূতোর পিঠে পড়তে লাগলো লাঠির ঘা—ঘায়ে ঘায়েল হয়ে লুটিয়ে পড়লো রাস্তার উপর, মুখ দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো আর অবশ হয়ে অচৈতন্য হয়ে গেল সে। এই সময় এক সদাশয় মহাপ্রাণ ব্যক্তি রাস্তায় আসতে আসতে তাকে দেখতে পেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। মাথায় জল ইত্যাদি দিতে দিতে চৈতন্য ফিরে এল তার। সে যেতে চাইল হোষ্টেলে ফিরে, তখনও লাঠির ঘায়ের আঘাত থেকে দরদর্ করে রক্তধারা বয়ে যাচ্ছে। সদাশয় ব্যক্তির নিঃসন্তান স্ত্রী কিছুতেই ভূতোকে যেতে দিলেন না এই অবস্থায়। দুদিন পরে দেখা গেল পুঁজ ইত্যাদি দেখা দিয়েছে ঘায়ে, মায়ের অপার ভালবাসা ঢেলে দিয়ে অতি যত্নে সেবাশুশ্রূষা করে কিছু দিনের মধ্যেই ভূতোকে নিরাময় করে হোষ্টেলে ফিরে পাঠালেন ভদ্রদম্পতী।

হোষ্টেলের ছেলেদের অসুখে বিসুখে শিয়রে বসা দেখা যাচ্ছে ভূতোকে। তাদের আপদে বিপদে, অভাবে ভূতোর সাহায্য আসছে অযাচিত-ভাবে। তাই ছেলেরা সকলে তাকে বড় ভাল-বাসে, আপনার বোধ করে। ভূতোর পাশের গ্রামের এক বাল্যবন্ধু সহপাঠী থাকে সেই হোষ্টেলে। ভূতোকে সকলে ভালবাসে, সেটা তার বরদাস্ত হয় না, সহ্য হয় না—মনে জ্বলে ওঠে এক ঈর্ষাবহ্নি। ভূতো কিন্তু বাল্যবন্ধু বলে সেই ছেলেটিকে বড় আপনার বলে জানে এবং তাকে ভালবাসে। ভালবাসে সকলের চেয়ে বেশী। আর অসুখে বিসুখে অস্থির হয়ে পড়ে—সদাই করে তার মঙ্গল কামনা। ঈর্ষাবহ্নিতে দগ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছে বাল্যবন্ধুর ভেতরে ভূতোর অনিষ্ট কামনা। খোঁজে সুযোগ কি করে তাকে সকলের নিকট খাটো করা যায়, হীন প্রতিপন্ন করা যায়। হোষ্টেলের ছেলেদের সন্ধ্যার পরে বিনা অনুমতিতে বাইরে থাকবার নিয়ম নেই। কলেজের এক গরীব ছেলে গ্রামের পরিচিত এক ভদ্রলোকের বাড়ী থেকে এম্, এ পড়ছে। টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে অনেকদিন ধরে ভুগছে সেই ছেলেটি—আত্মীয় স্বজনের অভাবে বড় অসহায় অবস্থায় পড়েছে। ভূতো রোজই তার সেবা-

শুশ্রূষা করছে কিন্তু সেদিন হঠাৎ অবস্থা খুব খারাপ হওয়াতে রাত ১০টাতেও ফিরে আসতে পারেনি হোষ্টেলে। অনুপস্থিতির এই সুযোগ নিয়ে বাল্যবন্ধু হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে জানিয়ে এক মিথ্যা অপবাদ রচনা করে। তখনই ভুতোর ডাক পড়ে হোষ্টেলে সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের ঘরে—ভুতো সব খুলে বলে এবং হোষ্টেলের ছেলেরাও পীড়িত বন্ধুর সেবায় গিয়েছিল বলে এক বাক্যে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু হোষ্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট কারও কথা কানে না নিয়ে তাকে তখনই হোষ্টেল ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করেন। বাল্যবন্ধু—যাকে ভুতো অত আপনার মনে করতো, তার নিকট হতে কল্পনাতীত এই দুর্ব্যবহার পেয়ে ভুতোর প্রাণে আসে বিষম যাতনা—একেবারে মুষড়ে পড়ল সে। অনাথশরণ ভগবানের শরণ নিতে তখনই হোষ্টেল থেকে বের হয়ে পড়ে। রাস্তায় যেতে যেতে গড়ের মাঠে গিয়ে হাজির হল। দূরে দেখতে পেল এক গৌরবর্ণ সন্ন্যাসী আপন মনে এক বেঞ্চিতে বসে আছেন—কাছে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করে ভুতো নিজের দুঃখের কাহিনী নিবেদন করে। সন্ন্যাসী যাচ্ছেন পুরীতে জগন্নাথ দর্শনে—পরে ফিরে যাবেন নিজের গুরুস্থানে হিমালয়ের বিজন প্রদেশে। ভুতোর কাহিনী শুনে সান্ত্বনা দিয়ে তাকে সঙ্গে নিয়ে চললেন পুরীতে। ভুতোর দাদা জানতেন তার সংসারে বিতৃষ্ণার কথা—তাই ভাইয়ের খোঁজে এসে হোষ্টেলে দেখতে না পেয়ে তাড়াতাড়ি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে তাকে দেখতে পেলেন ঐ অবস্থায় সাধুর সঙ্গে। বাড়ী ফিরিয়ে নেবার জন্যে নানারকমে বুঝাতে লাগলেন কিন্তু ভুতো মনকে স্থির করে নিয়েছে—রইলো তার সংকল্পে অচল অটল, কিছুতেই সাধুর সঙ্গ ছাড়লে না। পুরীতে কয়দিন মহানন্দে কাটল।

সাধু হিমালয়ের পথে ভুতোকে নিয়ে নানা স্থান ঘুরে অবশেষে এসে হরিদ্বারে পৌঁছুলেন। অনভ্যস্ত পথশ্রমে ভুতো খুব পীড়িত হয়ে পড়ল। যাহোক কিছু দিনের মধ্যেই সেরে উঠল। সবল হলে সাধু তাকে নিয়ে পাহাড়ে পায়ে-হাঁটা পথে গুরুর আশ্রমের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন হরিদ্বার ছেড়ে। যেতে যেতে পথ আর ফুরোয় না—চড়াই উৎরাইতে অনভ্যস্ত ভুতো ক্লান্ত হয়ে পড়ে কিন্তু মনের আনন্দে এলিয়ে পড়ে না। এইভাবে তরঙ্গের মত সজ্জিত পাহাড়শ্রেণী ভেদ করে সাত দিন পরে পৌঁছুলো আশ্রমে। বাবা রাঘব স্বামী সন্ন্যাসী মহারাজের গুরুদেব। আশ্রমের চারদিকে দেবদারু, চীর, রডো ইত্যাদি অনেক গাছ রয়েছে। রডোডেনড্রন্ গাছ গুলো লালফুলের স্তবকে পরিশোভিত। বাগানে নানারকমের ফুল ফুটে শোভায় সকলের নয়ন পরিতৃপ্ত করছে, গন্ধে মন আকুল করছে। আশ্রমের আওতায় এলেই বুঝা যায় ঈর্ষা, দ্বেষ, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ ষড়রিপুনিচয় এখানে আশ্রয় না পেয়ে সরে পড়েছে দূরে। এখানে সকলেই প্রেম, প্রীতি, ভালবাসার সূত্রে গ্রথিত। সকলেই চায় ভেতরের সারবস্তু; তাই বাহিরের খোলা নিয়ে নেই পরস্পরের মধ্যে দ্বন্দ্ব। এক সুর, একলয়ে বাঁধা সকলের মন। এক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণত্বলাভ। তাই অংশ ছেড়ে নিরংশের খোঁজে সকলে তন্ময়। কেউ জ্ঞানপথে বেদান্তের অন্ত নির্ণয় করছে, কেউ বা ভক্তি-পথে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরুর ভাবে বিভোর। কেউ যোগপথে আসন, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, সমাধি অভ্যাস করছে আবার কেউ নিষ্কাম কর্ম-পথ ধরে শিবজ্ঞানে জীবসেবায় রত।

ভুতো সন্ন্যাসীর সঙ্গে মন্দিরে গিয়ে প্রথমে কারণত্রয়হেতু শান্ত সত্যং শিবং সুন্দরম্ শিব-লিঙ্গের সম্মুখে প্রণত হয়ে আত্মনিবেদন করল—নিজের নিজত্ব নিঃশেষে ছেড়ে দিয়ে শরণ গ্রহণ করল শিবের। তারপর ধীর পদবিক্ষেপে এগিয়ে চলল গুরুদেবের কুটিরের দিকে। বাবা রাঘব স্বামী ব্যাঘ্রচর্মাসনে সমাসীন—হিমালয়ের

মত অচল অটল, প্রশান্ত মহাসাগরের মত গভীর ধীর স্থির মুর্তি—মুখমণ্ডলে অসীম আনন্দের আভা ফুটে বের হচ্ছে। সন্ন্যাসী-শিষ্য প্রণত হয়ে শ্রীগুরুর পাদবন্দনা করল, সঙ্গে সঙ্গে ভূতোও প্রণত হয়ে মনে মনে শ্রীগুরুর পাদপদ্মে নিজেকে দিল বিলিয়ে। বাবা রাঘব স্বামী অনেক দিন পরে সন্ন্যাসী-শিষ্যকে প্রত্যাগত দেখে কুশল-প্রশ্নে আপ্যায়িত করলেন, আর নবাগত ভূতোর দিকে বহুদিনের পরিচিতের মত প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকালেন। সেই দৃষ্টিতেই ভূতোর মন আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল, অশান্ত মন হল শান্ত আর যেন অপূর্ব অজানা এক শক্তি তড়িতের মত খেলে গেল তার সমস্ত দেহ-মনে। ভূতোর স্থান হল ছোট একটি 'কুঠিয়া'তে। সর্বস্ব সমর্পণ করে গুরু-সেবায় মন-প্রাণ ঢেলে দিল ভূতো। সকাল সন্ধ্যায় সব সন্ন্যাসী শিবমন্দিরে সমবেত হয়ে সমস্বরে মহিম্নস্তোত্রপাঠ করে, আর অন্য সকলে করে স্তবগান। সেই স্তব-গানের উদাত্ত সুর পাহাড়ের ঢেউ ধরে অনেক দূরে চলে যায়।

বাবা রাঘব স্বামী ভূতোর চালচলনে, কথায় বার্তায়, সেবায় খুব পরিতুষ্ট হলেন। কিছুদিন এই-ভাবে কেটে গেলে শুভদিন দেখে ভূতোর ভাবানুযায়ী মন্ত্রে দীক্ষিত করলেন তাকে। ভূতো শ্রীগুরু-নির্দিষ্ট সাধনপথে অগ্রসর হতে লাগল; ক্রমেই বাহিরের বস্তুতে বিতৃষ্ণা এল। মন হল অন্তর্মুখী, অন্তরে খুঁজে পেল আনন্দের ফোয়ারা। এই ভাবে দশ বৎসর গুরুসান্নিধ্যে সেবায় তৎপর হয়ে শ্রীগুরুর আদেশে বারাণসীতে গিয়ে ভূতো জীবসেবা বরণ করে নিল। বারাণসীতে বাবা রাঘব স্বামীর প্রতিষ্ঠিত বিরাট প্রতিষ্ঠান। রয়েছে আদর্শ মহাবিদ্যালয়—গরীব, দুঃস্থ, অসহায় ব্রহ্মচারী বালকেরা সেখানে শিক্ষালাভ ক'রে সংসার-পথে এগুবার সম্বল সংগ্রহ করছে। আর রয়েছে সেবাসদন। সেখানে অনাথ, আতুর, সম্বলহীন পীড়িত সকলে পাচ্ছে আশ্রয়। সেবার সকল ব্যবস্থা পরিপাটিরূপে সাধিত হচ্ছে। ভূতো এই সেবার কাজে নিজের জীবন করল উৎসর্গ। দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অতি নিষ্ঠার সহিত সেবাব্রত উদ্‌যাপনান্তে পরপারে তার প্রয়াণের সময় এল। মা এবং দাদা কাশীনাথ কাশীতে এসেছেন বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা দর্শনে। হঠাৎ দেখা হল দশাশ্বমেধ ঘাটে। কাশীর যত দ্রষ্টব্য স্থান ভূতো একে একে তাঁদের সব দর্শন করিয়ে দিল এবং কয়দিন আদর যত্নের সহিত দাদা ও মায়ের সেবা করল। সেবায় সন্তুষ্ট হয়ে দাদা ও মা অন্তরের আশীর্বাদ ভূতোকে জানিয়ে স্বদেশে প্রস্থান করলেন। কিছু দিন পরেই একদিন দশাশ্বমেধ ঘাট থেকে আসবার পথে পথিপার্শ্বে দেখতে পেল এক অসহায় ব্যক্তি রোগের যাতনায় ছটফট করছে, সে হয়েছে বিসূচিকা-রোগে আক্রান্ত। পথ থেকে কুড়িয়ে রিক্স করে ভূতো লোকটিকে নিয়ে এল সেবাসদনে আর প্রাণপাত পরিশ্রম করে, দিবারাত্র সেবায় তৎপর হয়ে তাকে করল রোগমুক্ত। কিন্তু ভাগ্যের বশে নিজে সেই ভীষণ ব্যাধির কবলে পতিত হল। ক্রমেই অবস্থা হল শোচনীয়, জীবনের আর আশা রইল না। জীবনদীপ নির্বাপিত হবার সময় ভূতো ভগবানের নাম করতে করতে পরলোকের সজ্ঞানে ইহলোকে অজ্ঞান হয়ে পড়ল রাত্রি ১২টায়। শেষ সময়ে উপস্থিত গুরুভাইয়েরা সকলে হরি ওঁ রাম বলে সারারাত কাটাল। সকালে শবদেহ চন্দন পুষ্পে সুশোভিত করে নিয়ে চলল মণি কর্ণিকা ঘাটে। সেখানে যথাকৃত্য সমাপন করে গঙ্গায় ভূতোর দেহ বিসর্জন দিল।

ভূতোর জীবনের প্রতিটি ঘটনা ঘটেছে এক অদৃশ্য শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়ে। তার কর্মফল তাকে নিয়ে চলেছে পূর্ব হতে নির্ধারিত এক নির্দিষ্ট গতিপথে। সে পথ ছেড়ে বিপথে চলবার তার কোন উপায়ই ছিল না।

অসম্বদ্ধ

শান্তনীল দাশ

কোন পথে আজ চ'লেছে মানুষ,
কোথা এর পরিণতি ?
কেন উন্মাদ গতি ?
জীবনের পথ এ নহে বন্ধু,
এ যে মৃত্যুর পানে,—
ক্রমাগত ছু'টে চলেছে সবাই মৃত্যুর আহ্বানে।
মৃত্যুরই হ'বে জয় !
মৃত্যুর কাছে অমৃত-পুত্র মে'নে নেবে পরাজয় !
দীর্ঘ দিনের সাধনা ব্যর্থ হ'বে ?
আলোক-তীর্থযাত্রী কি শেষে
আঁধারে শরণ ল'বে ?

যে-দিকে তাকাই বন্ধু, কোথাও
পাইনা কো খুঁজে আলো,
চারিদিকে শুধু দেখি ধরণীর
সীমাহীন ঘন কালো।
মানুষের ধরাতলে,
বন্য শ্বাপদ ঘু'রে ফেরে দেখি বীভৎস কোলাহলে।
স্বার্থলোভীর বিষাক্ত নিঃশ্বাসে,
ব্যথিত ধরণীতল ;
করুণ কাতর ক্রন্দন ভেসে আসে,
আকাশ বাতাস বেদনায় চঞ্চল !
মানুষের মন ভ'রে আছে আজ হিংসা ও বিদ্বেষ,
দয়া, মায়া, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা হ'য়ে গে'ছে নিঃশেষ।
শ্বাপদেরে করি ভয়,
আবরণ-মাঝে শ্বাপদবৃত্তি সে-যে আরও ভয়াবহ,
যেথা নেই সংশয়,
সেথায় আঘাত হে'নে যে জীবন ক'রে তোলে দুঃসহ।

বন্ধু, ক্লান্ত আমি :
কার অভিশাপে ধরণীর বুকে
এলো দুর্দিন নামি'—
ভে'বে পাইনা কো, বেদনায় ভরে মন ;
শুনি কান পে'তে দিকে দিকে শুধু অশ্রান্ত ক্রন্দন।
আর্ত ধরণী কাঁদে,
শোণিত-সিক্ত হল ধরাতল এ কাহার অপরাধে ?

যুগে যুগে এ'ল কত মহাজন—অমৃতের সন্তান,
কণ্ঠে তাদের মহাজীবনের বাণী ;
দিয়ে গেল তারা ধরার মানুষে অমৃতের সন্ধান,
ব'লে গেল তা'রা—"জানি
আঁধারের পারে আদিত্যরূপ সেই দেবতার বাস,—
আমরা জেনেছি তাঁরে,
তাঁর কাছে সেই আঁধারের লেশ,—জীবনের আশ্বাস
আলো সেথা শত ধারে।"

সেই পথ ধরে চলেনি মানুষ, বৃথা অভিমান ভরে
হয়েছে বিপথগামী ;
আলোকের পথ তাই গেছে দূরে স'রে,
আঁধারের বুকে তাই চলা দিনযামী।
আঁধারের অনুচর
আঁধার পথের হয়েছে সংগী ; মানুষের অন্তর
হয়েছে আঁধারে ভরা,
সেই আঁধারের ঘন কালিমায়
কালো হয়ে গেছে ধরা।

* * * *

বন্ধু, স্বপ্ন দেখি :
ঝড়ের আঘাতে কালো মেঘ গে'ছে স'রে,
সুনীল আকাশ,—উজ্জ্বল আলোকে
ধরাতল গে'ছে ভ'রে ;
স্বপ্ন আমার সত্য হবে না সে কি ?
কান পে'তে আমি শুনি বারে বারে—
ভয় নাই—নাই ভয়,
আঘাতে আঘাতে সকল বেদনা
নিঃশেষে হ'বে ক্ষয়।
বেদনার আঁখিজল
ধরনীর বুক হ'তে মু'ছে দেবে
বেদনার হলাহল।
টু'টে যা'বে সব আবরণ তার,
ঘুচে যা'বে অভিমান,
আলোকের হ'বে জয় ;
অমৃতের সন্তান
অমৃত-তীর্থ যাত্রী সে হ'বে নাহি কোন
সংশয়।

কবি ইকবাল

অধ্যাপক রেজাউল করীম, এম্-এ, বি-এল

(শেষাংশ)

নিম্নের কয়েকটি পংক্তি হইতে ইকবালের বিশ্ব-মানবতার আদর্শ বুঝা যাইবে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বর্গ হইতে বিদায়' কবিতার সহিত ইহার কতকটা সাদৃশ্য আছে। স্বর্গ হইতে মানুষের আদি জনক আদম পৃথিবীতে আসিতেছেন। সেই সময় ধরিত্রী জননী আদমকে অভিনন্দন জানাইতেছেন। বাস্তবিকই এই কবিতাকে বলা যাইতে পারে "The Testament of Humanity."

ধরিত্রী বলিতেছেন ঃ

হে আদম, এ পৃথিবীর সব কিছুই তোমার অধীনে আসিবে। ঐ দেখ মেঘমালা, ঐ বজ্র, ঐ স্বর্গের উচ্চ মিনার, ঐ আকাশ, ঐ অনন্ত শূন্যের বিস্তৃতি, এই পর্ব্বত, এই মরুভূমি, সমুদ্র, এই সর্ব্বব্যাপী বায়ু—এ সবই তোমার। গতকাল পর্য্যন্ত দেবদূতদের সৌন্দর্য্য তোমাকে মোহিত করিয়া রাখিয়াছিল। আজ কালের দর্পনে দেখ এই পৃথিবীতে কি বিরাট সম্ভাবনা ও গুরুত্ব রহিয়াছে তোমার জন্য।"

চিন্তাক্ষেত্রে ইকবাল যথেষ্ট দান করিয়াছেন। ইকবালের দর্শন ও কবিতা পরস্পরের সহিত যুক্ত। তাঁহার দর্শনের মূলকথাটা না বুঝিলে তাঁহার কবিতার সম্যক উপলব্ধি হইবে না। ইকবালের দর্শন ও কবিতা দুইই বিরাট সমুদ্র। তাঁহার দর্শন বিশাল, কারণ সেই দর্শনের বাহন হইতেছে তাঁহার অপূর্ব্ব কবিতা। আবার তাঁহার কবিতাও বিশাল, কারণ তাহার ভিত্তি হইতেছে তাঁহার অগাধ দর্শন। ইকবালের দর্শনের একটা বড় অংশ হইতেছে Egoর দর্শন বা ব্যক্তিত্বের দর্শন। বহু কবি দয়িতের নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিয়া তৃপ্তি পান। কিন্তু এইভাবে মানুষের মহৎ মর্য্যাদাকে লঘু করিয়া দেওয়া হয়। ইকবাল এই ধরনের আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন নাই। যাঁহারা সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে চাহেন, ইকবালের আত্মদর্শন যেন সেই আদর্শের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ। ইকবাল বলেন যে, পৃথিবীতে মানুষের Egoর ব্যক্তিত্বের একটা বিশেষ দায়িত্ব আছে। এই ব্যক্তিত্বকে সর্ব্বদাই তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। শুধু সংগ্রাম নয়, সংগ্রাম করিয়া জয়ী হইতে হইবে। এই ভাবে সংগ্রামে জয়লাভ করিয়া ব্যক্তিত্ব পায় স্বাধীনতা। এবং তারপর পায় ঈশ্বরের সান্নিধ্য যে ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা স্বাধীন সত্তা। এই ব্যক্তিত্ব Constant state of tension (অর্থাৎ সর্ব্বদাই একটা চাঞ্চল্য, উত্তেজনার মধ্যে) কার্য্য করে। এই জন্য সে বিশ্রাম পায় না। এই ভাবে সর্ব্বদাই সক্রিয় থাকার ফলে ব্যক্তিত্ব পায় অমরত্ব। ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা ও অমরত্ব পাইয়া একদিকে সমগ্র স্থানের বিস্তৃতিকে (Space) জয় করে, আর অন্যদিকে কালকেও (Time) জয় করে। ব্যক্তিত্ব মানুষের ক্রমবিকাশ ও ক্রমোন্নতিকে সতত সাহায্য করে। এইভাবে ব্যক্তিত্ব হইতে পূর্ণ মানুষ (Perfect Man) আবির্ভূত হয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ দ্বারা পূর্ণ মানুষের সাধনা সমগ্র জীবন-ব্যাপী করিতে হয়। ইহাই হইল ইকবালের আত্ম বা ব্যক্তিত্ব-দর্শনের সারমর্ম্ম। ব্যক্তিগত স্বাধীনতা,

ব্যক্তিগত অমরত্ব, ও পূর্ণমানুষ-সৃষ্টি—এই তিনটি বিষয়ই হইতেছে ইকবালের ব্যক্তিত্ব-দর্শনের মূল কথা।

প্রশ্ন এই যে, এই তিনটির বিবর্ত্তন (Evolution) কেমন করিয়া সম্ভব হইবে ? ইকবাল বলেন, সর্ব্বপ্রকারে ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করিয়া একটা মানুষের মর্য্যাদাকে বৃদ্ধি করিয়া ইহা সম্ভব হইবে। তাঁহার মতে মানুষের ব্যক্তিত্বকে সুরক্ষিত করিবার শ্রেষ্ঠ শক্তি হইতেছে 'ইশ্‌ক্' বা প্রেম, এবং 'ফাকর' বা ধনসম্পত্তিতে অনাসক্তি ; ভারতীয় পরিভাষায় ইহার নাম—"প্রেম এবং অস্বাদ ও অপরিগ্রহ।" ফলাফলের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব দেখাইতে না পারিলে প্রেম সার্থক হয় না, পূর্ণ হয় না। ইকবাল "ইশ্‌ক্" বা প্রেম কথাটিকে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করেন নাই, তিনি ইহাকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার মতে 'ইশ্‌ক্' কথাটির অর্থ হইতেছে Desire to assimilate, আপনার করিয়া লইবার ইচ্ছার নামই প্রেম। আর "ফাকর" বলিতে ইকবাল বুঝাইতে চাহিয়াছেন, ইহজগতে ও পরজগতে কি ফল পাওয়া যাইবে সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব অবলম্বনের নামই 'ফাকর' বা অস্বাদ ও অপরিগ্রহ। তাঁহার মতে সত্যিকারের মর্য্যাদা পাইতে হইলে ব্যক্তিকে অপরের সহিত সহযোগিতা করিতে হইবে। একাকী নির্জ্জনে বসিয়া ইহা সম্ভব নহে। ব্যক্তিকে সমাজে থাকিয়া কর্ম্ম করিয়া যাইতে হইবে, ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করিলে চলিবে না। প্রেম দ্বারা আত্মার উন্নতি করিতে হইবে। ব্যক্তির কাজকে সমাজের অপর সকলের সহিত খাপ খাওয়াইতে না পারিলে তাহা স্বার্থপরতায় কলুষিত হইয়া পড়ে। সমাজের মঙ্গলের সহিত নিজেকে যুক্ত করিতে না পারিলে মানুষ চরম কল্যাণ পাইতে পারে না। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "যুক্ত কর হে সবার সঙ্গে মুক্ত কর হে বন্ধ"—রবীন্দ্রনাথও এইভাবে একক বহুর মধ্যে ও বহুকে একের মধ্যে দেখিতে চাহিয়াছেন। ইকবালও বলেন, আদর্শ সমাজ গঠিত হইবে আধ্যাত্মিক আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া। এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত এই আধ্যাত্মিক আদর্শ সার্থক হইতে পারে না। ইহাকেই তিনি বলেন "তৌহিদ" বা একেশ্বরবাদ। "তৌহিদ" মানেই হইল "বিশ্বঐক্য" অর্থাৎ সমগ্র মানুষ এক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ, এই নীতি হইতেছে বিশ্বঐক্যের প্রধান কথা। তাঁহার একত্ববাদ গোঁড়াধর্ম্মীয় একত্ববাদ নহে। সমাজের সকলের জন্য চিন্তা ও কর্ম্মের একত্ব ও বিশ্বমৈত্রী তাঁহার একত্ববাদের মূল কথা।

বাঙ্গলা ভাষায় ইকবাল-সাহিত্যের চর্চ্চা হয় না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে জানিবার ও বুঝিবার সুযোগ পায় না। তাঁহার বহু কাব্যের ইংরাজি অনুবাদ হইয়াছে। সে সব পড়িলে তাঁহার কাব্যের রস সাহিত্যামোদী বাঙ্গালী পাঠক পাইতে পারে। ইকবাল ভারতীয় প্রতিভার উজ্জ্বল রত্ন। তাঁহার রাজনীতি স্থায়িত্বলাভ করিবে না। আমির খোসরু, গালেব, চন্দ্রভান, পণ্ডিত চকব্য উর্দ্দু-সাহিত্যে যে স্থান পাইয়াছেন, কবি ইকবাল তাঁহাদের পার্শ্বেই স্থান পাইবেন। আমাদের ভারতমাতা বন্ধ্যা নহে। ভারতের সন্তান ইকবাল প্রত্যেক ভারতবাসীরই গৌরবের সম্পদ।

শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীদ্বিজপদ গোস্বামী, ভাগবত-জ্যোতিঃশাস্ত্রী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমোন্মাদ

"যদি প্রেমোন্মাদ হয়, তাহলে কে বাপ, কে বা মা, কে বা স্ত্রী। ঈশ্বরকে এত ভালবাসা যে, পাগলের মত হয়ে গেছে। তার কিছুই কর্তব্য নাই। সব ঋণ থেকে মুক্ত। প্রেমোন্মাদ কি কম? সে অবস্থা হলে জগৎ ভুল হয়ে যায়।

চৈতন্যদেবের হয়েছিল। সাগরে ঝাঁপ দিয়ে পড়লেন, সাগর বলে বোধ নাই। মাটিতে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ছেন—ক্ষুধা নাই তৃষ্ণা নাই নিদ্রা নাই, শরীর বলে বোধ নাই।"

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের সাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়ার যে লীলাকথার উল্লেখ করিয়াছেন —সেই লীলা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অন্ত্যলীলা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। ঐ লীলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ—

শরৎকালের চন্দ্রিকোজ্জ্বল রাত্রি নীলাচল-বিহারী শ্রীগৌরহরি নিজগণ সঙ্গে রাসলীলার গীত শ্লোক পড়িতে পড়িতে এবং ভক্তমুখে শুনিতে শুনিতে কৌতুকে উদ্যান ভ্রমণ করিতেছেন, এবং প্রেমাবেশে কীর্তন-নর্তন করিতেছেন। কখনও ভাবোন্মাদে এদিক ওদিক ধাবিত হইতেছেন, কখনও ভূমিতে আছাড় খাইয়া পড়িয়া গড়াগড়ি দিতেছেন, কখনও বা মূৰ্ছিত হইতেছেন। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত রাসলীলার প্রত্যেকটি শ্লোক আস্বাদন করিতেছেন, এবং কখন হর্ষভরে আনন্দিত কখনও বা বিরহভরে ব্যাকুল হইতেছেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু এইরূপে রাসলীলার শ্লোকগুলি পড়িতে পড়িতে অবশেষে গোপীগণ সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জলকেলির শ্লোক পড়িতে লাগিলেন এবং সমুদ্রতীরবর্তী 'আইটোটা' নামক উদ্যানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

এইমত মহাপ্রভু ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
আইটোটা হৈতে সমুদ্র দেখে আচম্বিতে॥
চন্দ্রকান্ত্যে উথলিল তরঙ্গ উজ্জ্বল।
ঝলমল করে যেন যমুনার জল॥
যমুনার ভ্রমে প্রভু ধাইয়া চলিলা।
অলক্ষিতে যাই সিন্ধুজলে ঝাঁপ দিলা॥
পড়িতেই হৈল মূর্ছা কিছুই না জানে।
কভু ডুবায় কভু ভাসায় তরঙ্গের গণে॥
তরঙ্গে বহিয়া ফিরে যেন শুষ্ক কাঠ।
কে বুঝিতে পারে এই চৈতন্যের নাট॥
কোনার্কের দিকে প্রভুকে তরঙ্গে লইয়া যায়।
কভু ডুবায়ে রাখে কভু ভাসায়ে লইয়ে যায়॥
যমুনাতে জল কেলি গোপীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ করে মহাপ্রভু মগ্ন সেই রঙ্গে॥

এদিকে স্বরূপদামোদর প্রভৃতি প্রভুর পার্ষদগণ প্রভুকে না দেখিয়া চমকিত হইলেন, আচম্বিতে মহাবেগে প্রভু কোথায় গেলেন তাহা কেহই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। প্রভুকে না দেখিয়া সকলে সংশয় করিতে লাগিলেন। প্রভু কি জগন্নাথ দেখিতে গমন করিলেন, অথবা অন্য দেবালয়ে গমন করিলেন! কিম্বা অন্য উদ্যানে গিয়া প্রেমোন্মাদে অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, অথবা গুণ্ডিচা মন্দিরে কিম্বা নরেন্দ্র সরোবরে, কি চটক

পর্বতে, না কোণার্কে গমন করিলেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সকলে ব্যাকুল হইয়া চতুর্দিকে প্রভুকে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন! এই প্রকার অন্বেষণ করিতে করিতে স্বরূপদামোদর কয়েকজনের সঙ্গে সমুদ্রের তীরে আসিলেন এবং সেখানে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এই প্রকারে রাত্রি শেষ হইল। তখন তাঁহাদের মনে হইল প্রভু নিশ্চয়ই অন্তর্ধান করিয়াছেন।

এইরূপে প্রভুর বিরহে ম্রিয়মান ভক্তগণ সমুদ্রের তীরে আসিয়া যুক্তি করিয়া কেহ কেহ চিরায়ু পর্বতের দিকে প্রভুর অন্বেষণে ব্যাকুল প্রাণে গমন করিলেন। প্রভুর পরম প্রিয় স্বরূপদামোদরও কয়েকজন সঙ্গে সমুদ্রের তীরে তীরে পূর্ব দিকে প্রভুর অন্বেষণে গমন করিলেন—

বিষাদে বিহ্বল সবে নাহিক চেতন।
তবু প্রেমবলে করে প্রভুর অন্বেষণ।

এইরূপে ব্যাকুল প্রাণে প্রভুর অন্বেষণে গমন করিতে করিতে—

দেখে এক জালিয়া আইসে কান্ধে জাল করি।
হাসে কান্দে নাচে গায় বলে হরি হরি॥
জালিয়ার চেষ্টা দেখি সবে চমৎকার।
স্বরূপ গোসাঞি তারে পুছে সমাচার॥

স্বরূপদামোদর জালিয়ার চেষ্টা দেখিয়া মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য! এই জালিয়ার অঙ্গে প্রেমবিকারের লক্ষণ দেখিতেছি। আমার প্রভু শ্রীচৈতন্যের সম্বন্ধ ভিন্ন এই প্রেম কাহারও লাভ হইতে পারে না। এ জালিয়া কি প্রকারে সেই প্রেম পাইল? এই ভাগ্যবান অবশ্যই মহাপ্রভুর সান্নিধ্য লাভ করিয়াছেন; ইহার নিকট প্রভুর সন্ধান পাইব! এই ভাবিয়া বলিলেন—

কহ জালিয়া এই পথে দেখিলে একজন।
তোমার এই দশা কেন কহত কারণ॥

তখন জালিয়া বলিতে লাগিল—এই দিকে আমি কোন মনুষ্য দেখি নাই। আমি সমুদ্রে মাছ ধরিব বলিয়া জাল ফেলিয়াছিলাম। সেই জাল টানিতে এক মৃত আমার জালে আসিল, আমি তখন তাহা না বুঝিয়া বড় মৎস্য মনে করিয়া যত্ন করিয়া উঠাইলাম। মৃত দেখিয়া 'আমার মনে বড় ভয় হইল। অতি সাবধানে জাল খসাইতে লাগিলাম, কিন্তু এত সাবধানতা সত্ত্বেও তাহার অঙ্গের একটি লোমের সঙ্গে আমার অঙ্গুলির নখের স্পর্শ হইল। স্পর্শমাত্রেই সেই ভূত আমার হৃদয়ে প্রবেশ করিল—

ভয়ে কম্প হৈল মোর নেত্রে বহে জল।
গদ গদ বাণী মোর উঠিল সকল॥
কিবা ব্রহ্মদৈত্য কিবা ভূত কহনে না যায়।
দর্শন মাত্রে মনুষ্যের পৈশে সেই কায়॥
শরীর দীঘল তার হাত পাঁচ সাত।
এক হস্ত পদ তার তিন তিন হাত॥
অস্থি সন্ধি ছুটি চর্ম করে নড়বড়ে।
তাহা দেখি প্রাণ কার নাহি রহে ধরে॥
মড়ারূপ ধরি রহে উত্তান নয়ন।
কভু গোঁ গোঁ করে কভু দেখি অচেতন॥
সাক্ষাৎ দেখিছ মোরে পাইল সেই ভূত।
মো মৈলে মোর কৈছে জীবে স্ত্রী পুত॥

সেই ভূতের কথা কহিবার নয়। আমি ওঝার নিকট যাইতেছি, যদি সে ভূত ছাড়াইতে পারে এই আশায়। আমি রাত্রে নির্জনে মৎস্য ধরি; নৃসিংহদেবকে স্মরণ করি বলিয়া আমাকে ভূত প্রেত লাগে না, কিন্তু এই ভূতের আশ্চর্য ব্যাপার—

এই ভূত নৃসিংহ নামে কাঁপয়ে দ্বিগুণে।
তাহার আকার দেখিতে ভয় লাগে মনে॥

আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি ওখানে যাইও না, ওখানে গেলে সেই ভূত তোমাদের লাগিবে। জালিয়ার এই উক্তি শুনিয়া স্বরূপদামোদর বুঝিলেন যে, মহাভাগ্যবান জালিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গ স্পর্শ পাইয়াছে, এই জালিয়ার নিকটেই প্রভুর সন্ধান পাইব। এই জালিয়া

প্রেমাবেশে অস্থির হইয়াছে, কিন্তু তাহা না বুঝিয়া ভূতে পাইয়াছে মনে করিতেছে। তখন স্বরূপদামোদর জালিয়াকে সুস্থির করিবার মানসে সুমধুর স্বরে বলিলেন—

আমি বড় ওঝা জানি ভূত ছাড়াইতে।
মন্ত্র পড়ি শ্রীহস্ত দিল তার মাথে॥
তিন চাপড় মারি কহে ভূত পালাইল।
ভয় না পাইও বলি সুস্থির করিল॥

মহাভাগ্যবান জালিয়া মহাপ্রভুর স্পর্শে প্রেমলাভ করিয়াছে, তাহাতে আবার ভয় হইয়াছে—এই দুইয়ের প্রভাবে জালিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে; স্বরূপের কৃপায় তাঁর ভয় অংশ গেল, তাহাতে কিছু স্থিরতা আসিল। তখন স্বরূপদামোদর তাঁহাকে বলিলেন, তুমি যাঁহাকে ভূত জ্ঞান করিতেছ তিনি ভূত নহেন, তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রেমাবেশে তিনি সমুদ্রের জলে পড়িয়াছেন, তুমি আপনার জালে তাঁহাকে উঠাইয়াছ। তাঁহার স্পর্শে তোমার শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমোদয় হইয়াছে, কিন্তু ভূত প্রেত জ্ঞানে তোমার মহা ভয় হইয়াছে। এখন তোমার ভয় গিয়াছে, মন স্থির হইয়াছে; এখন বল কোথায় তাঁহাকে উঠাইয়াছ, শীঘ্র আমাদিগকে সেই স্থানে লইয়া চল।

জালিয়া বলিল, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুকে আমি বার বার দেখিয়াছি, তিনি নহেন, এ অতি বিকৃত আকার।

স্বরূপ কহে তাঁর হয় প্রেমের বিকার।
অস্থি সন্ধি ছাড়ে হয় অতি দীর্ঘাকার॥

এই শুনিয়া সেই জালিয়া আনন্দিত হইল এবং সকলকে সঙ্গে লইয়া গিয়া মহাপ্রভুকে দেখাইল। সকলে গিয়া দেখিলেন মহাপ্রভু—

ভূমিতে পড়িয়া আছে দীর্ঘ সব কায়।
জলে শ্বেত তনু বালু লাগিয়াছে গায়॥
অতি দীর্ঘ শিথিল তনু চর্ম নটকায়।
দূর পথ উঠাইয়া আনন না যায়॥

তখন স্বরূপাদি ভক্তগণ প্রভুর আর্দ্র কৌপীন দূর করিয়া শুষ্ক কৌপীন পরাইলেন এবং বালুকা ঝাড়িয়া বহির্বাসে শোয়াইলেন। তৎপরে—

সবে মিলি উচ্চ করি করে সংকীর্তনে।
উচ্চ করি কৃষ্ণ নাম কহে প্রভুর কানে॥
কতক্ষণে প্রভুর কানে শব্দ প্রবেশিল।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু তবহিঁ উঠিল॥
উঠিতেই অস্থি সন্ধি লাগিল নিজ স্থানে।
অর্ধ বাহ্য ইতি উতি করে দরশনে॥

মহাপ্রভু সর্বদা তিন দশায় থাকিতেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"চৈতন্যের তিনটি অবস্থা হত"। অন্তর্দশা, অর্ধবাহ্যদশা এবং বাহ্যদশা।

তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্বকাল।
অন্তর্দশা, বাহ্যদশা, অর্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দশায় ঘোর কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্ধবাহ্য নাম॥
অর্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচনে।
আভাষে কহেন সব শুনে ভক্তগণে॥

এখন মহাপ্রভুর অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইয়াছে। মহাপ্রভু অর্ধবাহ্যদশায় কহিতেছেন—

কালিন্দী দেখিয়ে আমি গেলাঙ বৃন্দাবন।
দেখি জলক্রীড়া করে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
রাধিকাদি গোপীগণ সঙ্গে একত্র মিলি।
যমুনার জলে মহারঙ্গে করে কেলি॥
তীরে রহি দেখি আমি সখীগণ সঙ্গে।
একসখী সখীগণে দেখায় সেই রঙ্গে॥

এই প্রকারে মহাপ্রভু গোপীগণ সঙ্গে কৃষ্ণের জলকেলি লীলা অর্ধবাহ্যদশায় বর্ণনা করিতে লাগিলেন। পরিসমাপ্তিতে বলিলেন—

হেনকালে মোরে ধরি, মহা কোলাহল করি,
তুমি সব ইহা লৈয়া আইলা।
কাঁহা যমুনা বৃন্দাবন, কাঁহা কৃষ্ণ গোপীগণ,
সে সুখ মোর ভঙ্গ কৈলা॥

ইহা বলিতে বলিতে প্রভুর কেবল বাহ্যদশা

হইল। তখন স্বরূপ গোসাঞিকে দেখিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা আমাকে এখানে লইয়া আইলে কেন? তখন স্বরূপ বলিলেন—যমুনার ভ্রমে তুমি সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়াছিলে, সমুদ্রের তরঙ্গে ভাসাইয়া তোমাকে এত দূরে আনিয়াছে। এই জালিয়া তোমাকে জালে করিয়া উঠাইয়াছে, তোমার স্পর্শ পাইয়া এই জালিয়া প্রেমে মত্ত হইয়াছে। আমরা সমস্ত রাত্রি তোমাকে অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, জালিয়ার মুখে শুনিয়া এখানে আসিয়া তোমাকে পাইলাম। তুমি মূর্চ্ছিছলে বৃন্দাবনে ক্রীড়া দেখিতেছিলে, তোমার মূর্চ্ছা দেখিয়া সকলে মনোব্যথা পাইতেছিল। কৃষ্ণ নাম লইতে তোমার অর্ধবাহ্য হইল, তাহাতেই যে প্রলাপ করিলে তাহা শুনিলাম। তখন মহাপ্রভু বলিলেন—

প্রভু কহে স্বপ্নে দেখি গেলাম বৃন্দাবনে।
দেখি কৃষ্ণ রাসক্রীড়া করেন গোপীগণ সনে॥
জলে ক্রীড়া করি কৈল বন্য ভোজনে।
দেখি আমি প্রলাপ কৈল হেন লয় মনে॥

তদনন্তর স্বরূপ গোসাঞি মহাপ্রভুকে স্নান করাইয়া আনন্দিত হইয়া ঘরে লইয়া আসিলেন।

দেবার্চনা সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাসা

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

ভগবদ্দর্শন ও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান-লাভই যে ত্রিতাপ-দগ্ধ মনুষ্যের দুঃখের আত্যন্তিক উপশমহেতু, ইহা সর্বজনবিদিত শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। যুগে যুগে তত্ত্বজ্ঞ সাধুমহাপুরুষগণ স্বীয় জীবনালোকে বিভ্রান্ত মানব-সমাজকে তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু দুগ্ধ দুগ্ধ বলিলে যেমন কাহারও দুগ্ধপান-জন্য তৃপ্তির উদয় হয় না, তদ্রূপ মুখে ভগবদ্দর্শনাদি শব্দমাত্র উচ্চারণ এবং তদ্বিষয়ে নানা বাদবিতণ্ডা করিলেই কাহারও ভগবদ্দর্শন হয় না। দুগ্ধপানের জন্য দুগ্ধসংগ্রহাদি উপায়ের ন্যায় ভগবদ্দর্শনের জন্যও উপায় অবলম্বন করিতে হয়। শ্রুতি বলিতেছেন—"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণাঃ বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা অনাশকেন" (বৃঃ উঃ ৪।৪।২২) ইত্যাদি। অর্থাৎ 'বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান ও স্বেচ্ছা-পূর্বক উপবাসযুক্ত (—রাগদ্বেষরহিত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শরীরস্থিতির অনুকূল ভোজনাদি গ্রহণযুক্ত) তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসুগণ সেই ব্রহ্মবস্তুকে জানিতে ইচ্ছা করেন'। কিন্তু মাত্র এই সকল কর্মের দ্বারাই ভগবদ্দর্শনাদি হয় না, ইহাদের দ্বারা সাধকের চিত্তের মলিনতার নিবৃত্তি হইয়া তাহার শুদ্ধতা ও অন্তরঙ্গ সাধনসম্পাদনযোগ্যতা সম্পাদিত হয় মাত্র। নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত ইহারা ভগবদ্দর্শনের বহিরঙ্গ সাধন মাত্র। শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তি ভগবদ্ধ্যান, তাঁহার নামগুণানুকীর্তন শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ইত্যাদি অন্তরঙ্গ সাধনবলে ভগবদ্দর্শনের বা ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকে, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। বৈদিক যুগে যজ্ঞ বলিতে শ্রুতি-বিহিত অগ্নিহোত্র দর্শপূর্ণমাস ও জ্যোতিষ্টোম ইত্যাদি কর্মকলাপকেই বুঝাইত। এই সকল কর্মে শ্রুতিবিহিত ক্রমানুযায়ী দেবতাগণের উদ্দেশে ঘৃত, পুরোডাশ [ইহা তণ্ডুলাদিনির্মিত এক প্রকার পিষ্টক বিশেষ], চরু ও পশু প্রভৃতি হবনীয় দ্রব্য ত্যক্ত হইত। এই বৈদিক যজ্ঞ-সকলের স্থান অধিকার করিয়াছে বেদমূলক পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিহিত নানাবিধ দেবদেবীর অর্চনা। ইহাতেও নানা দেবদেবীর উদ্দেশ্যে

বেদমন্ত্রসহযোগে নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচার নিবেদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারাই হইতেছে অধুনা ভগবদ্দর্শনের ও ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞান-লাভের বহিরঙ্গ সাধনভূত যজ্ঞ। বৈদিক যজ্ঞসকলে যেমন নানাবিধ বিধি, নিষেধ এবং ক্রমাদি আছে, পুরাণ ও তন্ত্রাদিতে বিহিত বিভিন্ন দেবার্চনারূপ এই যজ্ঞসকলেও তদ্রূপ নানাপ্রকার বিধি, নিষেধ এবং ক্রমাদি আছে। বৈদিক যজ্ঞসকলের ন্যায় ইহারাও সকাম বা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কারীরী, প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞসকলের ন্যায় এই যজ্ঞসকলের ফলাধায়কতাও প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং অঙ্গহীন বৈদিক যজ্ঞসকলের ব্যর্থতার ন্যায় ইহাদের ব্যর্থতাও অধিকতর প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

যথাশাস্ত্র অনুষ্ঠিত হইলেই এই দেবার্চনাদিরূপ যজ্ঞসকল অনুষ্ঠাতার আকাঙ্ক্ষানুযায়ী স্বর্গাদি ফল প্রদান করে অথবা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধিদ্বারে সাধকের ভগবদ্দর্শন ও ব্রহ্মবিজ্ঞানোৎপত্তির সহায়ক হইয়া থাকে। 'শাস্ত্র' বলিতে এই স্থলে যাহাতে এই দেবার্চনাসকল বিহিত হইয়াছে, সেই পুরাণ ও তন্ত্রাদি শাস্ত্রকে এবং বেদবিহিত কর্মের ইতিকর্তব্যতার নির্ণায়ক মীমাংসাশাস্ত্রকে গ্রহণ করিতে হইবে। পূর্বমীমাংসাদর্শনের বার্তিককার পূজ্যপাদ কুমারিল ভট্ট বলিয়াছেন—

"ধর্মে প্রমীয়মাণে হি বেদেন করণাত্মনা।
ইতি কর্তব্যতাভাগং মীমাংসা পূরয়িষ্যতি।"

'বেদরূপ প্রমাণের দ্বারা ধর্ম বিজ্ঞাত হইলে পূর্বমীমাংসাশাস্ত্র তাহার ইতিকর্তব্যতা অংশের পূরণ করিবে' ইত্যাদি। অল্পশক্তি মানবের অনুষ্ঠানসৌকর্যের জন্য দেশ, কাল ও অধিকারি-ভেদে প্রবর্তিত বেদমূলক তন্ত্র ও পুরাণাদি শাস্ত্রসকলে বিহিত কর্মসকলের ইতি-কর্তব্যতাও যে মীমাংসাশাস্ত্র হইতে নিরূপিত হইবে, ইহা অসন্দিগ্ধভাবেই বলা যায়।

এক্ষণে আমরা "যথেচ্ছকল্পিত উপচারযোগে দেবার্চনা শাস্ত্রসম্মত কি না"—এই প্রস্তাবিত বিচারের অবতারণা করিতেছি। ইদানীন্তনকালে প্রায়শ পরিদৃষ্ট হয়-বিশিষ্ট সাধক ও কর্ম-কুশল ব্রাহ্মণগণ, যাঁহাদিগকে প্রায় শিষ্টই* বলা যায়, তাঁহারাও দেবার্চনাকালে নানাবিধ কল্পিত উপচারের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা—শতোপচারযোগে দেবার্চনাকালে বহু ব্যয়সাধ্য হস্তি, অশ্ব, গৃহ ও ক্ষেত্রাদি উপচারস্থলে কাষ্ঠাদিনির্মিত হস্তি, অশ্ব, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশদণ্ডের উপর কিঞ্চিৎ কুশাচ্ছাদন দ্বারা নির্মিত, স্থায়ী ভিত্তিবিহীন ও চটকেরও বাসের অযোগ্য তথাকথিত গৃহ এবং সার্ধহস্তপরিমিত আস্তীর্ণ কুশোপরি কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা প্রক্ষেপদ্বারা নির্মিত তথাকথিত ক্ষেত্র ইত্যাদি দেবতাকে নিবেদন করেন। এতাদৃশ কল্পিত উপচারের বিনিয়োগ শাস্ত্রসম্মত কি না—এই বিষয়ে আমরা কিঞ্চিৎ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। তাহাতে আমাদের প্রস্তাবিত বিচারের অবয়ব হইতেছে এইপ্রকার—

বিষয়—যথেচ্ছকল্পিত উপচারযোগে দেবার্চনা।

সংশয়হেতু—পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রবিরোধ ও ইদানীন্তনকালীন বিশিষ্ট সাধকগণ কর্তৃক প্রয়োগ।

পূর্বপক্ষ—এতাদৃশ উপচারযোগে দেবার্চনা শাস্ত্রসম্মত।

সিদ্ধান্ত—পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রের বিরোধ ইত্যাদি সাতটী দোষবশত এতাদৃশ দেবার্চনা অশাস্ত্রীয়।

ফলভেদ—পূর্বপক্ষে, এতাদৃশ দেবার্চনা চিত্তশুদ্ধিকর।

সিদ্ধান্তে—অঙ্গবৈকল্যযুক্ত এতাদৃশ দেবার্চনা চিত্তশুদ্ধির হেতু নহে।

এক্ষণে এতাদৃশ সিদ্ধান্তের প্রতি হেতু কি তাহা বিবৃত হইতেছে—কোন কর্মে কাহার

* "যে শ্রুতিং পঠিত্বা তদর্থম্ উপাদিশন্তি তে শিষ্টাঃ বিজ্ঞেয়াঃ" (মন্বর্থমুক্তাবলী, ১২।১০৯)—'যাঁহারা বেদ পাঠ পূর্বক তাহার অর্থ উপদেশ করেন, তাঁহারা শিষ্ট'।

অধিকার, তাহা 'অধিকারবিধির' দ্বারা নিরূপিত হইয়া থাকে। "ফলস্বাম্যবোধকঃ বিধিঃ অধিকারবিধিঃ" (ন্যায়প্রকাশ)—'যে বিধিবলে ফলের স্বামী অর্থাৎ ফলভোক্তা নিরূপিত হয়, তাহাকে বলে অধিকারবিধি'। আর সেই ফলের স্বামিত্ব তাহারই হইয়া থাকে, যে ব্যক্তি অধিকারিবিশেষণবিশিষ্ট। অর্থাৎ যে যে গুণ থাকিলে কোন কর্মে অধিকারী হওয়া যায়, সেই সেই গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিই হয় কর্মানুষ্ঠানে অধিকারী এবং সেই ব্যক্তিই হয় সেই কর্মের ফলভোক্তা। ১। অর্থিত্ব, ২। সামর্থ্য, এবং ৩। অপর্যুদস্তত্ব প্রভৃতিই সেই গুণ (শারীরকমীমাংসাভাষ্য, ১।৩।২৫)। 'অর্থিত্ব' শব্দের অর্থ কোন কিছু কামনাবান্ হওয়া। যেমন যে ব্যক্তি স্বর্গাদি কামনা করে, সেই ব্যক্তিই যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করে। কিন্তু মাত্র অর্থিত্ব থাকিলেই কোন কর্ম সম্পাদন করা যায় না, তাহা সম্পাদনের 'সামর্থ্যও' থাকা আবশ্যক। 'সামর্থ্য' শব্দের অর্থ—কর্মসম্পাদনশক্তি। তাহা দুইপ্রকার—লৌকিক ও শাস্ত্রীয়। লৌকিক সামর্থ্য আবার দ্বিবিধ,—যথা—শারীরিক সামর্থ্য ও বিত্তজন্য সামর্থ্য। অন্ধ, পঙ্গু, বধির ও মূকাদি না হওয়াই শারীরিক সামর্থ্য। দেবদর্শন, দেবতাপরিক্রমণ, মন্ত্রাদির অশ্রবণ ও অনুচ্চারণবশত এই অপ্রতিসমাধেয় বিকলাঙ্গ ব্যক্তিগণ কর্মানুষ্ঠানে অসমর্থ হওয়ায় কর্মে অধিকারী হইতে পারেন না।* কর্মসম্পাদনযোগ্য, ও সদুপায়ে অর্জিত ধনবান হওয়াই 'বিত্তজন্য সামর্থ্য'। পূর্বমীমাংসাভাষ্যকার পূজ্যপাদ শবরস্বামী বলিয়াছেন—"যো ন কথঞ্চিদপি শক্নোতি যাগম্ অভিনির্বর্তয়িতুং, তং নাধিকরোতি যজেত শব্দঃ" (জৈঃ সূঃ ৬।১।৪০ ভাষ্য)। অর্থাৎ অর্থাভাববশত যে ব্যক্তি কোন প্রকারে যজ্ঞসম্পাদন করিতে পারে না, 'যজেত' ইত্যাদি যজ্ঞবিধায়ক বিধি তাহাকে বিষয় করে না। সুতরাং বিত্তহীন ব্যক্তির যে ব্যয়বহুল কর্মে অধিকার নাই, ইহাই সিদ্ধ হইতেছে*। অধ্যয়নবিধিসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞানবান হওয়াকে বলে 'শাস্ত্রীয় সামর্থ্য'। শাস্ত্রজ্ঞান না থাকিলে 'মন্ত্রোচ্চারণে অসামর্থ্যবশত' (শাস্ত্রদীপিকা ৬।১।৬ অধিঃ) কর্মে অধিকার হয় না। উপনয়ন, আধানসিদ্ধ অগ্নিবান হওয়া† ইত্যাদিও শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের অন্তর্গত। কিন্তু সামর্থ্য থাকিলেও কর্মে অধিকার হয় না। অপর্যুদস্তত্বও থাকা আবশ্যক। নিবারিত না হওয়াকে বলে অপর্যুদস্ততা। যেমন ব্রাহ্মণ রাজসূয় যজ্ঞে পর্যুদস্ত, ক্ষত্রিয় সত্রযজ্ঞে পর্যুদস্ত ইত্যাদি। শাস্ত্র রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণকে ও সত্রযজ্ঞে ক্ষত্রিয়কে নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের তত্তৎ যজ্ঞে অধিকার নাই। যাই হউক ইহা হইল অধিকারিবিশেষণসকলের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয়। বিস্তৃত পূর্বমীমাংসাদর্শনে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। প্রস্তাবিত স্থলে আমরা বলিতেছি—বিত্তজন্য সামর্থ্যের অভাবে যথাযোগ্য হস্তি ও অশ্বাদি উপচার সংগ্রহ করিতে অসমর্থ হওয়ায় এতাদৃশ ব্যয়বহুল দেবার্চনাতে দরিদ্র সাধু ও ব্রাহ্মণাদি সাধকগণের অধিকার সিদ্ধ হয় না; কারণ বিত্তজন্য সামর্থ্যরূপ অধিকারিবিশেষণ বাধিত হওয়ায় অধিকারী সিদ্ধ হইতেছে না বলিয়া অধিকারবিধি বাধিত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে অধিকারবিধির বাধরূপ **প্রথম দোষ** পূর্বপক্ষীর উপর আপতিত হইল।

* চিকিৎসাদি দ্বারা অঙ্গবিকলতা নিরাকৃত হইলে ইঁহাদেরও কর্মে অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে, পূঃ মীঃ ৬।১।৯ অধিকরণ। বিকলাঙ্গগণের কাম্যকর্মে অধিকার না থাকিলেও নিত্যকর্মে অধিকার আছে, পূঃ মীঃ ৬।১।১০ অধিকরণ।

* কিন্তু বিত্তহীন ব্যক্তিও যদি শাস্ত্রবিহিত উপায়ে দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্মে অধিকার পূঃ মীঃ ৬।১।৮ অধিকরণে স্বীকৃত হইয়াছে।

† শাস্ত্রীয় ক্রিয়াবিশেষের দ্বারা যে বহ্নির সংস্কার করা হয়, তাহাকে বলে আধানসিদ্ধ অগ্নি। তাদৃশ অগ্নিতেই অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক যজ্ঞসকল সম্পাদিত হয়। (ক্রমশঃ)

ভগবান মহাবীরের শিক্ষা

শ্রীপূরণচাঁদ শ্যামসুখা

খৃঃ পূঃ ৫২৭ অব্দে কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে রাত্রি শেষ হইবার কিছু পূর্বে জৈন চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর ভগবান মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। স্বয়ং জন্ম, জরা, মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া জগতের প্রাণিগণকে জন্মজরামৃত্যুর করাল কবল হইতে মুক্তি পাইবার পথ প্রদর্শন করিতে তিনি সম্পূর্ণ রিক্ত অবস্থায় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসের কঠোর মার্গ অবলম্বন করেন এবং ঘোর তপস্যাসহায়ে কৈবল্য বা কেবল-জ্ঞান লাভ করেন। তৎপরে ত্রিশ বৎসর কাল উত্তর ভারতের নানাস্থানে ধর্মপ্রচার এবং সাধু, সাধ্বী, শ্রাবক, শ্রাবিকারূপ বৃহৎ সংঘ স্থাপন করিয়া মহাবীর ৭২ বৎসর বয়সে সিদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, পরিনির্বৃত ও সর্বদুঃখ-প্রহীণ হইলেন।

ভগবান মহাবীরের পিতামাতা ভগবান পার্শ্বনাথ প্রবর্তিত নিগ্রন্থ ধর্মে আস্থাবান ছিলেন। কিন্তু মহাবীর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া প্রচলিত নিগ্রন্থ সম্পদায়ে মিলিত হইলেন না। তিনি একাকীই বিচরণ করিতেন। এবং নিজের পুরুষকারের দ্বারাই কেবল-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি নিগ্রন্থ ধর্মই প্রচার করেন কিন্তু পার্শ্বনাথ-প্রবর্তিত নিগ্রন্থ সম্প্রদায়ের আচারে কিছু পরিবর্তন করিয়া যুগোপযোগী করিয়া লইলেন। পার্শ্বনাথের শিষ্য-পরম্পরার সাধুগণ ও তাঁহাদের গৃহস্থ সাধকগণ ক্রমে ক্রমে মহাবীরকে চতুর্বিংশতিতম তীর্থঙ্কর বলিয়া স্বীকার করেন ও তাঁহার প্রবর্তিত নিয়মাবলী অঙ্গীকার করিয়া তৎসম্প্রদায়ে মিলিত হন। সে সময়ে জৈন সম্প্রদায়কে নিগ্রন্থ সম্প্রদায় নামেই অভিহিত করা হইত—জৈন নাম বহু পরে প্রচারিত হইয়াছে।

মহাবীর যেমন নিজের শক্তিতে স্ব-আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ করিয়া স্ব-মহিমায় প্রকাশিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রত্যেক আত্মার্থী সাধককে নিজের পরাক্রমের দ্বারাই নিজের বিকাশ সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

ভগবান মহাবীর প্রচার করেন যে, বিকাশের হীনতম অবস্থা হইতে উচ্চতম অবস্থা পর্যন্ত প্রত্যেক জীবে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র আত্মা আছে যাহা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত আনন্দ, অনন্ত শক্তি প্রভৃতি অনন্ত গুণময়। কিন্তু এই সমস্ত আত্মা অনাদি কাল হইতে মিথ্যাত্ব বা অবিদ্যার দ্বারা অভিভূত হইয়া স্বকৃত কর্মের আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে এবং সেই কর্মের প্রভাবে নানাপ্রকার যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ও মরণ প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আবর্তিত হইতেছে। জন্ম-জরা-মৃত্যু ও তজ্জনিত ভীষণ দুঃখ হইতে কি প্রকারে চিরতরে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়া আত্মা তাহার প্রকৃত স্ব-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার অমর উপদেশের মূল কথা।

মহাবীর বলিয়া গিয়াছেন,—"শুষ্ক পত্র যেমন সামান্য বায়ুর হিল্লোলে ঝরিয়া পড়িয়া যায় তদ্রূপ জীবনও আয়ু পরিপক্ব হইলে শেষ হইয়া যাইবে; অতএব, হে মানব, ক্ষণকালের জন্যও প্রমাদগ্রস্ত হইও না।" প্রত্যেক মানসিক, বাচিক ও কায়িক প্রবৃত্তির জন্য জড়দ্রব্য আকৃষ্ট হইয়া তোমার আত্মার সহিত কর্মরূপে লিপ্ত হইতেছে এবং যথাসময়ে ফল প্রদান করিয়া তোমাকে নানাপ্রকার সুখদুঃখ

অনুভব করিতে ও পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য করিতেছে। অতএব তোমায় আচরণ এইরূপ হওয়া উচিত যাহাতে নবীন কর্মের বন্ধন নিরুদ্ধ হয় ও সঞ্চিত কর্ম বিনষ্ট হইয়া যায়। অহিংসা সংযম ও তপস্যাই ইহা হইতে একমাত্র উদ্ধারের উপায়।

অহিংসা পালন করিতে হইলে প্রথমেই জানা প্রয়োজন যে, জীব কয় প্রকার, জগতে কোন্ কোন্ পদার্থ জীব এবং কোন্ কোন্ পদার্থ অজীব বা জড় তাহার জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক, নতুবা জীবকে জড় মনে করিয়া তাহার হিংসা সহজেই হইয়া থাকে। জৈন শাস্ত্রে জীব ইন্দ্রিয়ের সংখ্যা অনুসারে পাঁচপ্রকার বিভাগে বিভক্ত, যথাঃ—একেন্দ্রিয়, দ্বীন্দ্রিয়, ত্রীন্দ্রিয়, চতুরিন্দ্রিয় ও পঞ্চেন্দ্রিয়। মৃত্তিকা, প্রস্তর, ধাতু প্রভৃতিতেও প্রাণ বা জীবন আছে, ইহাদিগকে পৃথ্বীকায় আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। এইরূপে জল, শিশির, শিল প্রভৃতিকে অপকায় অগ্নি অঙ্গার প্রভৃতিকে অগ্নিকায়; বাতাস, বাত্যা, ঘূর্ণবাত প্রভৃতিকে বায়ুকায়; বৃক্ষ; লতা, গুল্ম, শৈবাল প্রভৃতিকে বনস্পতিকায় জীব বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় ইহারা প্রাণী বা জীব এবং ইহাদের একটি মাত্র ইন্দ্রিয় অর্থাৎ কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় আছে বলিয়া ইহারা একেন্দ্রিয় পর্যায়ভুক্ত। এই সমস্ত একেন্দ্রিয় প্রাণিগণকে ছেদন, ভেদন বা বিমর্দন করিলে তাহারা বেদনা অনুভব করে। অন্ধ, মূক ও বধির মনুষ্যকে যদি প্রহার বা তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছেদন করা যায়, তবে সেই মনুষ্য যেরূপ বেদনা অনুভব করিলেও তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, একেন্দ্রিয় জীবসমূহও সেইরূপ তাহাদের প্রতি কৃত অত্যাচারের জন্য অব্যক্ত বেদনা অনুভব করে। অতএব বুদ্ধিমান পুরুষ কখনও একেন্দ্রিয় জীবের হিংসা করা ছেদন, ভেদন, বা বিমর্দনাদিও করিবে না। একেন্দ্রিয় জীবের হিংসা করিলে অশুভ কর্মের বন্ধন ও তজ্জনিত দুঃখ ভোগ করিতে হয়। এইরূপে কৃমি, জলৌকা প্রভৃতি দ্বীন্দ্রিয়; পিপীলিকা, উৎকুন প্রভৃতি ত্রীন্দ্রিয়; মক্ষিকা; ভ্রমর প্রভৃতি চতুরিন্দ্রিয় এবং পশু, পক্ষী, মনুষ্য, দেব ও নারক পঞ্চেন্দ্রিয় প্রাণিগণের কোনও প্রকার হিংসা করিলেও পাপ কর্মের বন্ধন হইবে ও তজ্জন্য ঘোর দুঃখানুভব অবশ্যম্ভাবী। ভগবান মহাবীর বলিয়া গিয়াছেন যে—"হে মানব, যাহাকে তুমি প্রহার করিবার ইচ্ছা কর, যাহাকে বলপূর্বক অধীন করিবার, যাহাকে পরিতাপ প্রদান করিবার বা যাহাকে সংহার করিবার ইচ্ছা কর, সে তোমার ন্যায়ই সুখ দুঃখ অনুভব করে, তাহার মধ্যে তোমায় ন্যায়ই আত্মা আছে; অতএব কোনও প্রাণীর হিংসা করা উচিত নয়।" "যে ব্যক্তি জ্ঞানী তাঁহার জ্ঞানের সার ইহাই যে কোন প্রাণীর হিংসা করিবে না। অহিংসা সিদ্ধান্তের জ্ঞানের ইহাই সার। ইহাই অহিংসার বিজ্ঞান।"

রাগ-দ্বেষের বশীভূত হইয়া রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দাদিজনিত বিষয়ে আসক্ত হইলে হিংসা করিতে হয়, অতএব প্রত্যেক মনুষ্যের নিজের ইন্দ্রিয়সমূহ ও মনকে সংযত করিয়া তাহাদের উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে দমন করা উচিত। মহাবীর বলিয়াছেন যে—"অন্য কেহ বলপূর্বক যাহাতে আমাদিগকে দমন করিতে না পারে, তজ্জন্য আমাদের নিজকে অর্থাৎ আমাদের মন, বচন, কায়া ও ইন্দ্রিয়সমূহকে দমন করা উচিত।" যদি আমরা আমাদের উদ্দাম প্রবৃত্তিসমূহকে দমন করিতে না পারি তবে আমরা আমাদেরই বিপদ ডাকিয়া আনিব। মনুষ্যের কামনার অন্ত নাই, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, "অসংখ্য কৈলাস পর্বতের পরিমাণে যদি সুবর্ণ ও রৌপ্যের রাশি কাহারও নিকট একত্রিত হয় তবুও লুব্ধ নরের আকাঙ্খার তৃপ্তি হয় না—মানবের তৃষ্ণা আকাশের ন্যায় অনন্ত।" "সুবর্ণ, রৌপ্য, শালি ও যবাদি শস্য এবং পশুগণ দ্বারা পরিপূর্ণ সমগ্র পৃথিবীও একজন মনুষ্যের তৃষ্ণা পুরণ করিবার পক্ষে পর্যাপ্ত নয়—ইহা জানিয়া সংযম পালন কর।"

"সমস্ত বহুমূল্য দ্রব্যের দ্বারা পরিপূর্ণ সমগ্র বিশ্বও যদি একজন মনুষ্যকে প্রদান করা যায় তথাপি সে সন্তুষ্ট হয় না। অহো! মনুষ্যের তৃষ্ণা অত্যন্ত দুষ্পূর।" "ক্রোধ প্রীতিকে নাশ করে, মান বিনয়কে নাশ করে, মায়া মিত্রতাকে সংহার করে এবং লোভ সমস্ত সদ্‌গুণকে বিনাশ করে।" "শান্তির দ্বারা ক্রোধকে ধ্বংস কর, নম্রতার দ্বারা অভিমানকে জয় কর, সরলতার দ্বারা মায়াকে (কপটতা) বিনাশ কর এবং সন্তোষের দ্বারা লোভকে জয় কর।"

অহিংসা ও সংযম পালন করিলে নবীন কর্মের বন্ধন হয় না। নূতন কর্মবন্ধনকে নিরুদ্ধ করিয়া সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করিবার নিমিত্ত তপস্যা করা বিধেয়। তপস্যা দুই প্রকার ঃ—বাহ্য ও আভ্যন্তর। বাহ্য তপস্যা ছয় প্রকার যথা ঃ—উপবাস, অল্পাহার, ইচ্ছানিরোধ, রসত্যাগ, কায়ক্লেশ ও শরীর সংকোচন। আভ্যন্তর তপস্যাও ছয় প্রকার, যথা ঃ—প্রায়শ্চিত্ত, বিনয়, পীড়িত ও আর্তগণের সেবা, স্বাধ্যায়, শরীরের প্রতি মমত্ব পরিত্যাগ ও ধ্যান। এই দ্বাদশ প্রকার তপস্যার দ্বারা সঞ্চিত কর্মকে ক্ষয় করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। বর্তমানেও জৈনগণ উপবাসাদি তপস্যার জন্য বিখ্যাত। এইরূপে অহিংসা, সংযম ও তপস্যার দ্বারা কর্মবন্ধনকে ক্ষয় করিয়া মুক্তি প্রাপ্ত হইবার উপদেশ ভগবান মহাবীর দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন ঃ—যে উৎকৃষ্ট তপশ্চরণ করে, যে প্রকৃতিতে সরল, ক্ষমা ও সংযমে রত, ক্ষুধা প্রভৃতির কষ্ট যে শান্তভাবে সহ্য করে, সদ্‌গতি প্রাপ্ত হওয়া তাহার পক্ষে পরম সুলভ।"

সমালোচনা

শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান—শ্রীবিজয় কুমার ভট্টাচার্য, এম্‌-এ, বি-টি, বি-এস-ই-এস। প্রকাশক ঃ শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, এ, মুখার্জি এ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা—১২। দ্বিতীয় সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৬০। পৃঃ ৪৩৬; মূল্য—৭৲ টাকা।

মনোবিজ্ঞানের ভিত্তিতে শিক্ষা-পরিকল্পনা প্রণয়নের যৌক্তিকতা আজ সর্বত্র স্বীকৃত। পাশ্চাত্ত্যের দেশগুলি এবিষয়ে প্রভূত গবেষণা চালাইতেছে এবং শিক্ষাক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগের প্রয়াস পাইতেছে। ভারতবর্ষে জাতীয় শিক্ষার মাত্র হাতে খড়ি হইয়াছে বলা যায়,—সুতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও গবেষণালব্ধ ফলাফলের সুচিন্তিত প্রয়োগ পরীক্ষা একমাত্র বহুলত গ্রন্থের সীমানায় সীমায়িত। শিক্ষার্থীকে একটা গোটা মানুষরূপে কল্পনা করিয়া তাহার মনোজগতের তরঙ্গ বিশ্লেষণপূর্বক তদনুকূল শিক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করা এক কথা, আর তাহাকে যন্ত্রেরই সাধন রূপে গণ্য করিয়া যান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থারই একটি সহায়ক উপযন্ত্ররূপে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। মেকলে সাহেব এতদ্দেশে শেষোক্ত শ্রেণীর শিক্ষার প্রবর্তন করিয়া সাম্রাজ্য-রক্ষার ঘাঁটি নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষত গোলা-গুলী বারুদ এবং কূটনীতির জোর থাকিলেও পরিশেষে বিদেশী শাসন যাহাদের সাহায্যে ভারতের মাটিতে দানা বাঁধিয়াছিল তাহারা হইতেছে তথাকথিত শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। মধ্যশিক্ষার নামে ইংরেজী শিক্ষা ভারতের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, রকমারী তকমা-আঁটা 'শিক্ষিত' পুতুল কিম্বা বিনয়-বিগলিত কেরাণীকুলকে শিখণ্ডীরূপে খাড়া করাইয়া

নিশ্চিন্তে শাসন ও শোষণকার্য চালাইয়াছে। তাই ভারতের শিক্ষার ইতিহাস বহুলত সাম্রাজ্যবাদী-শোষণের নিষ্ঠুর ইতিহাসেরই একাংশ মাত্র। শুধু সাম্রাজ্যবাদই নহে, ফ্যাসীবাদ, একনায়কত্ব, তথাকথিত সাম্যবাদ, জঙ্গীবাদ—সর্বত্রই শিক্ষার এই নিদারুণ অমর্যাদা শাসকের কুৎসিত অভিসন্ধি সিদ্ধিমানসে শিক্ষাব্যবস্থার বিন্যাস ও পরিচালনা। পরাধীনতার শৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষকে অবশ্যই পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের এবম্বিধ অনুদার শিক্ষা ব্যবস্থা ও উদার পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক ওয়াকিবহাল হইয়া জাতীয় শিক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন ও কার্যকরী করিতে হইবে। জাতির সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যসমূহ রক্ষাপূর্বক বৈজ্ঞানিক রীতিনীতিতে শিক্ষার্থীকে মানুষ করিয়া তোলা—ইহাই হইবে ভারতের জাতীয় শিক্ষার মূলনীতি। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, 'Mass Education নয়, Man Educationই আমাদের লক্ষ্য': বস্তুত ডিগ্রিধারী বা লিখিয়ে-পড়িয়ে সহস্র লোকের চাইতে একজন প্রকৃত বিদ্যাবান, জ্ঞানবান, জাগতিক ও পারমার্থিক ভাব-প্রবুদ্ধ মানুষের মূল্য অনেক বেশী। শিক্ষার্থীর মনের মণিকোঠার সন্ধান না জানিলে এইরূপ মানুষ-গঠনের শিক্ষা পরিকল্পনা কখনই সম্ভব নহে। সমালোচ্য 'শিক্ষা ও মনোবিজ্ঞান' গ্রন্থখানি এইরূপ সন্ধানী শিক্ষার্থী, শিক্ষক, শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষা পরিকল্পনা-প্রণেতার নিকট দিগ্‌দর্শনরূপে গণ্য হওয়া উচিত বলিয়া আমরা মনে করি। প্রকৃত-প্রস্তাবে শিক্ষাজগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেরই নিকট গ্রন্থখানি অপরিহার্য। গ্রন্থকারের কঠোর শ্রম, নিষ্ঠা, ধৈর্য এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় গ্রন্থখানির সর্বত্র: 'এমন মানব জমিন রইলো পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা'—এই খেদই যে গ্রন্থকারকে এই দুঃসাহসিক কার্যে ব্রতী করিয়াছে, তাহারও পরিচয় গ্রন্থেই পাই। তত্ত্বে এবং তথ্যে পূর্ণাঙ্গ সর্বাঙ্গসুন্দর এই শ্রেণীর গ্রন্থ আর আছে বলিয়া আমরা জানি না। মুদ্রণ এবং গ্রন্থনকার্যের ত্রুটিহীনতাও সমান প্রশংসনীয়।

—শ্রীমনকুমার সেন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র—শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত-প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীযতীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ১২৪।৫ বি, রসা রোড, কালীঘাট, কলিকাতা। ডিমাই আটপেজী ১০৮ পৃষ্ঠা; মূল্য ২।০ আনা।

লেখক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গিরিশ অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে তিনি ঠাকুরের সহিত গিরিশ চন্দ্রের প্রথম পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীযুত গিরিশের ঠাকুরের নিকট আত্মসমর্পণ, তাঁহাকে বকলমা প্রদান, ঠাকুরের শিষ্যস্নেহ এবং গিরিশ-সাহিত্যে ঠাকুরের প্রভাব বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে ভাবিত পাঠক-পাঠিকার নিকট পুস্তকখানি সমাদর লাভ করিবে বলিয়াই মনে হয়।

কতকগুলি উক্তির ভ্রম চোখে পড়িল। যথা, ২৯ পৃষ্ঠায়,—"জনক রাজা দুহাতে দুখানি তলোয়ার ঘুরাতেন—একখানি কর্মের আর একখানি ত্যাগের"। "ত্যাগের" নয়; "জ্ঞানের"। (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ ২৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ৫৪ পৃষ্ঠায় —"স্বামী বিবেকানন্দ বরাবর বলিতেন—বিল্বমঙ্গল আমি পঞ্চাশবার পড়েছি, আর প্রতিবারেই নূতন তত্ত্ব পেয়েছি"; এই উক্তি যথার্থ নয়। ৫৬ পৃষ্ঠায়,—"পরমহংস দেব মনে করিতেন না, তিনি গিরিশকে কৃপা করিয়াছেন, বরং ভৈরবাবতারের সঙ্গলাভে তিনিই কৃতার্থ হইয়াছেন"। লেখক শ্রীযুত গিরিশকে বাড়াইতে গিয়া একটু বেশী বাড়াবাড়ি করিয়াছেন। ৬৪ পৃষ্ঠায়,—"কাশীপুর উদ্যানে ঠাকুর যেদিন কল্পতরু হইয়াছিলেন, গিরিশ সেদিন উপস্থিত ছিলেন না।" এই উক্তি নিদারুণ ভ্রান্ত। বরং শ্রীযুক্ত গিরিশেরই সরল অকপট উক্তিতে "অর্দ্ধ অর্দ্ধবাহ্য দশায় তিনি সমবেত প্রত্যেক ভক্তকে ঐ ভাবে স্পর্শ করিতে

লাগিলেন"—(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ ৫ম ভাগ ৪০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ৪৬ পৃষ্ঠায়,—"ঠাকুর বলিলেন, 'তুই ভাবিস্ নে গিরিশ, তুই আমার মত সত্য মিথ্যার পার'।" সত্যাশ্রয়ী শ্রীরামকৃষ্ণদেব সত্য ও মিথ্যাকে সমপর্যায়ে ফেলিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের জানা নাই! গ্রন্থখানিতে ছাপার ভুলও যথেষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

—শ্রীমায়াময় মিত্র

বেদ-পুরাণ-কাব্যে (পৃথিবী ও) ভারতের ইতিহাস—অধ্যাপক শ্রীরামপ্রসাদ মজুমদার-প্রণীত। প্রকাশক : রজনী গ্রন্থাগার, গুমাডাঙ্গী, পোঃ মুন্সিরহাট (হাওড়া); ডবল ক্রাউন আট-পেজী পৃষ্ঠা—২৬ ; মূল্য—২, টাকা।

ভারতের প্রাগ্‌বৌদ্ধ-যুগের ধারাবাহিক ইতিহাস সুনিবদ্ধ করিতে গেলে নিরপেক্ষ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি লইয়া বেদ ও পুরাণ আলোচনা অপরিহার্য। এই গবেষণা-নিবন্ধে লেখকের সেই চেষ্টাই পরিস্ফুট। তাঁহার দীর্ঘক্যালব্যাপী অধ্যয়ন এবং সন্ধানী স্বাধীন মননধারার ফল এই পুস্তিকাটি ভারতেতিহাসানুরাগিগণকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

রাম ভরসা—শ্রীরাসবিহারী বসু-প্রণীত; প্রকাশিকা—শ্রীনলিনীদেবী সরস্বতী, পোঃ ওড়ফুলি, গ্রাম চক্‌কমলা (হাওড়া), পকেট সাইজ, ৯২ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১।৵০ আনা।

ব্যক্তিগত আবেগ দিয়া লেখা সরল কবিতায় ভগবানের নামের শক্তি ও মাহাত্ম্য-প্রচারের চেষ্টা করা হইয়াছে। নমুনা :—

"মিলনে বিরহে বল রাম ভরসা
স্বজন-নিধনে বল রাম ভরসা
অর্থ অপব্যা (ব্যঃ)য়ে বল রাম ভরসা
দেহমনোকষ্টে বল রাম ভরসা
জয় রাম জয় রাম সীতারাম রাম রাম।
সব রাম সবে রাম সবাই রাম রাম রাম।"

লেখক বিশ্বাস করেন, 'রাম ভরসা' ভগবৎ কৃপায় তাঁহার ধ্যানলব্ধ মহামন্ত্র। 'সব রাম, সবে রাম, সবাই রাম'—এই বাক্যেরও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা এবং পৃষ্ঠপোষকবৃন্দকে আমরা ৺বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিতেছি।

বেলুড় মঠে দুর্গাপূজা—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রতিমায় শ্রীশ্রী৺দুর্গামাতার আরাধনা প্রভূত আনন্দ ও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার মধ্যে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। পূজার কয়দিন মঠে আনুমানিক প্রায় দুই লক্ষ নর-নারীর সমাগম হইয়াছিল। প্রত্যহ সকাল ৬টায় পূজা আরম্ভ হইত। দক্ষিণমুখী গর্ভমন্দিরে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পুষ্পমাল্যশোভিত মর্মর মূর্তি যেন জীবন্তভাবে সমাসীন—পূর্বে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী—শ্রীরামকৃষ্ণমূর্তির সম্মুখে নাটমন্দিরের মধ্যভাগে সুসজ্জিত মণ্ডপে পশ্চিমমুখী দেবী-প্রতিমা। পূজা-স্থানের সন্নিকটে মুণ্ডিতশীর্ষ সন্ন্যাসি-ব্রহ্মচারিগণ শ্রদ্ধাবনত চিত্তে জপ ধ্যান প্রার্থনাদিতে রত—সুবৃহৎ নাটমন্দিরে পুরুষ এবং স্ত্রীভক্তগণ ধীরভাবে বসিয়া পূজা দর্শন করিতেছেন—সৌম্যদর্শন জনৈক তরুণ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী—পূজক, বৈদিক এবং তান্ত্রিক অর্চনাদিতে বহুল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন জনৈক প্রৌঢ় সন্ন্যাসী—তন্ত্রধারক। গম্ভীর মন্ত্র উচ্চারিত

হইতেছে, ধূপধুনা জ্বলিতেছে, গন্ধপুষ্পাদি বিবিধ উপচার পর পর নিবেদিত হইতেছে, মন্দিরের বায়ু-কোণে স্থাপিত চণ্ডীর ঘটের স্থান হইতে দুর্গাসপ্তশতী-পাঠের সুললিত ছন্দ শোনা যাইতেছে, দূরে সানাই প্রভাতী রাগিণীতে মায়ের বন্দনা ফুটাইয়া তুলিতেছে। অব্যক্ত, অতীন্দ্রিয়, গম্ভীর এক ভাব-পরিবেশ! ১২টার সময় পূজাশেষে সকলে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন—তৎপরে দেবীর ভোগ ও আরতি। প্রত্যহই সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে প্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল। দেবীর সন্ধ্যারতিও বিশেষ দর্শনীয় ছিল। আরতির পর মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমবেত কণ্ঠে দেবী-বিষয়ক ভজন সঙ্গীত করিতেন। নিরঞ্জনের দিনও সন্ধ্যায় বহু-সহস্র লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। প্রতিমা-বিসর্জনের পর নাটমন্দিরে স্থিরভাবে উপবিষ্ট জনতা শান্তিজল গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাষ্টমীর দিন দেবীপূজার অঙ্গীভূত কুমারীপূজা সকলের প্রাণে স্নিগ্ধ ভক্তি এবং আনন্দের সঞ্চার করিয়াছিল।

শাখা-আশ্রমসমূহে পূজা—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নিম্নোক্ত কেন্দ্রগুলিতে প্রতিমায় জগন্মাতা দুর্গার পূজা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হইয়াছে :—

মাদ্রাজ, বোম্বাই, কাশী, শিলং, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বালিয়াটি, বরিশাল, দিনাজপুর, রহড়া (২৪ পরগণা), মেদিনীপুর, জয়রামবাটি, আসানসোল, মালদহ। সকল স্থানের পূজাতেই প্রধান কেন্দ্রে অনুসৃত শাস্ত্রীয় বিধির যথাযথ মর্যাদা এবং সাত্ত্বিক দৃষ্টি ও আচরণ-পরম্পরার দিকে পূর্ণভাবে মনোযোগ দেওয়া হয় এবং এই জন্যই শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমসমূহে অনুষ্ঠিত মাতৃপূজা এত জীবন্ত, হৃদয়গ্রাহী এবং সর্বজনপ্রিয় হইয়া থাকে।

মাদ্রাজ মঠের পূজোৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যমন্ত্রী শ্রী কে বেঙ্কটস্বামী নাইডুর সভাপতিত্বে একটি জনসভায় অধ্যাপক পি শঙ্করনারায়ণ, ব্রহ্মশ্রী শাস্ত্ররত্নাকর পি রাম শাস্ত্রীগল্ (তামিল ভাষায়) এবং স্বামী আগমানন্দ দেবীপূজার তাৎপর্য সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাষণ দেন। ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডক্টর সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ একদিন দেবীর আরতির সময় উপস্থিত ছিলেন। দেবীপ্রতিমা দশমী-সন্ধ্যায় সহস্র সহস্র নরনারীর বিপুল একটি শোভাযাত্রাসহযোগে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়। শোভাযাত্রার একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—বেদ, গীতা, ও সহস্রনাম আবৃত্তিরত বিদ্যার্থী ও ব্রাহ্মণগণের কয়েকটি দলের যোগদান।

বোম্বাই আশ্রমে শারদীয়া পূজাকে উপলক্ষ করিয়া দুই দিন দুটি ধর্মসভা আহূত হয়। বক্তা ছিলেন—মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীমৎ শ্রীপ্রেম পুরীজী, দেওয়ান বাহাদুর কৃষ্ণলাল এম্ জাবেরী, পণ্ডিত দীননাথ ত্রিপাঠী সপ্ততীর্থ, অধ্যক্ষ ডক্টর এ সি বসু, শ্রীমনোহরলাল মতুভাই, পণ্ডিত রুদ্রদেব ত্রিপাঠী, অধ্যাপক জি এন্ মাথরানি, স্বামী আদিনাথানন্দ এবং স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ। মহাষ্টমীর দিন রাত্রিবেলায় শহরের বিখ্যাত শিল্পীগণ কর্তৃক কণ্ঠ এবং যন্ত্র সঙ্গীতের একটি অনুষ্ঠান, সপ্তমী ও দশমীর রাত্রে স্বামী সম্বুদ্ধানন্দ বিরচিত 'কুরুক্ষেত্র' ও 'উমা হৈমবতী' এই ধর্মমূলক নাটক-দ্বয়ের অভিনয় এবং মহানবমীর দিন অপরাহ্ণে বিভিন্ন ধর্মের সুযোগ্য এবং বহুমানিত প্রতিনিধিগণ-সহ একটি ধর্ম সম্মেলন উৎসব-কর্মসূচির অঙ্গীভূত ছিল।

রায়লসীমায় দুর্ভিক্ষ-সেবা—১৯৫২ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৩ সালের মার্চ পর্যন্ত অন্ধ্র রাজ্যের রায়লসীমা অঞ্চলে (চিত্তুর, কুড্ডাপা, অনন্তপুর এবং কুর্নুল—এই চারিটি জেলা) মিশন যে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ সেবাকার্য করিয়াছিলেন তাহার বিস্তারিত মুদ্রিত রিপোর্ট মাদ্রাজ-কেন্দ্র হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। ক্লিষ্ট পরিবারসমূহে রন্ধিত ও অরন্ধিত উভয়প্রকার খাদ্য বিতরণ, শিশুগণের জন্য দুগ্ধ ও গবাদির জন্য পশুখাদ্য সরবরাহ, জলকষ্ট নিবারণার্থ পুরাতন কূপ সংস্কার ও নূতন কূপ নির্মাণ, নিঃস্বগণকে বস্ত্র ও ছাত্রগণকে পুস্তকাদি দ্বারা সাহায্য এবং রোগ-পীড়িতদিগের জন্য ঔষধাদির ব্যবস্থা এই সেবাকার্যের অন্যতম অঙ্গ ছিল। গৃহ, রাস্তা এবং পয়ঃপ্রণালী মেরামতের কিছু কিছু কাজও মিশনকে লইতে হইয়াছিল। এই সেবা-কার্যের পরিধি ছিল উপরোক্ত চারিটি জেলার ৫১৪ খানি গ্রামে। উক্ত সেবাকার্য পরিনির্বাহের জন্য মিশন মোট ৪,৫৪,০৪৯ টাকা ৮/০ আনা ৩ পাই পাইয়াছিলেন ('অন্ধ্রপ্রভা ফণ্ড' হইতে প্রাপ্ত—৩,০৮,৩১৪/৭ পাই; মাদ্রাজরাজ্যের দুর্ভিক্ষ-ফণ্ডের দান—১,২৫,০০০৲ টাকা)। মোট খরচ—৪,৫২,৬৪৬৲ টাকা ৩ পাই।

উদ্বোধন

দুর্লভ

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
  শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
  শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

—কঠোপনিষৎ, ১।২।৭

কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং।
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবণং কিচ্ছো বুদ্ধানমুপ্পাদো॥

—ধম্মপদং, বুদ্ধবগ্গো, ৪

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা
তস্মাদ্বৈদিকধর্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥

—আচার্য শঙ্কর, বিবেকচূড়ামণি, ২

পরমসত্য সম্বন্ধে তো অনেকে শুনিতেই পায় না, আবার শুনিলেও অনেকে ধারণা করিতে পারে না। সত্যের বক্তা যেমন হাটে-বাটে মিলে না, সেইরূপ উহার উপলব্ধি-সমর্থ অধিকারীরও হওয়া চাই অতি নিপুণ। যথার্থ তত্ত্বজ্ঞ গুরু দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া সুযোগ্য শিষ্যের আত্মজ্ঞানলাভ—এই যোগাযোগ প্রকৃতই দুর্লভ।

মনুষ্যজন্ম লাভ করা কঠিন কথা, মর্ত্যের জীবন—তাহাও কষ্টকর, যথার্থ ধর্মের বিষয় শ্রবণ সহজে ঘটিবার নয়, আর বুদ্ধ (সত্যদ্রষ্টা জ্ঞানী)-গণের আবির্ভাব তো অত্যন্ত দুর্লভ।

কোটি কোটি প্রাণিনিচয়ের মধ্যে নরজন্ম দুর্লভ, পুরুষদেহ-ধারণ দুর্লভতর, ব্রাহ্মণকুলে জন্ম—তথা, বৈদিকধর্মে নিষ্ঠা ততোঽধিক দুর্ঘট। এ সকল সত্ত্বেও প্রকৃত শাস্ত্রজ্ঞানলাভ আরও কঠিন। তাহার পরে আসে আত্মা ও অনাত্মার বিচার এবং এই বিচার যদি যথাযথ থাকে, তবেই প্রত্যক্ষানুভূতি সম্ভবপর। তখনই জীব, ব্রহ্ম অর্থাৎ পরমসত্যের সহিত একীভূত হইয়া অবস্থান করিতে সমর্থ হয়। উহারই নাম মুক্তি। অতি দুর্লভ এই মুক্তি শতকোটিজন্মের অর্জিত পুণ্য বিনা প্রাপ্ত হইবার নয়।

কথাপ্রসঙ্গে

একজাতি

কমল বাবু তাঁহার কতকগুলি পর্যবেক্ষণ এবং পর্যালোচনের কথা বিবৃত করিতেছিলেন।

একদিন সন্ধ্যায় তিনি খগেন বাবুর বাড়ীতে বসিয়া আছেন, এমন সময় জনৈক সুদর্শন স্বাস্থ্যবান যুবক বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়া খগেন বাবুর পা ছুঁইয়া প্রণামানন্তর অতি বিনীত ভাবে একটি চেয়ারে বসিল। খগেন বাবু পরিচয় দিলেন, তাঁহার জামাতা—কোনও বড় ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানে উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কমল বাবু খুশী হইয়া বলিলেন, বেশ, বেশ। জিজ্ঞাসা করিলেন, বাবা, তোমার নাম কি? যুবক কিন্তু যখন নাম বলিল 'গগন কর্মকার' তখন কমল বাবু চমকাইয়া উঠিলেন, কেননা, খগেন বাবুর উপাধি হইতেছে 'বন্দ্যোপাধ্যায়'। পরিচিত মহলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থে এবং কায়স্থ-পরামাণিকে দুটি বিবাহের কথা তাঁহার জানা ছিল; কিন্তু ব্রাহ্মণ-কর্মকারে এই উদ্বাহ-বন্ধন আরও বিস্ময়কর মনে হইল।

ভিতরকার ভাব বাহিরে প্রকাশ না করিয়া কমল বাবু যুবকের সহিত গল্প জুড়িয়া দিলেন,—পরে যুবক যখন অন্দর মহলে চলিয়া গেল তখন তাহার শ্বশুর খগেন বাবুর নিকট এই বিবাহ সম্বন্ধে পূর্বাপর তথ্যরাজি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। চেহারা, আচার-ব্যবহার, শিক্ষা, চরিত্র-রীতি—কোন দিক দিয়াই জামাতাকে ব্রাহ্মণ-পরিবারে খাপছাড়া মনে হয় না। এই বিবাহের পূর্ব সূত্র অবশ্য যেমন অনেক সময়ে ঘটিয়া থাকে, তরুণ ও তরুণীর কলেজ-জীবনে পড়াশুনার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হইতে। কিন্তু উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা, ভালবাসা, তথা এক আদর্শ-নিষ্ঠা দেখিয়া আত্মীয়-গোষ্ঠী এবং সমাজের প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করিয়াও খগেন বাবু উভয়ের পরিণয় ঘটাইয়াছেন। এক বৎসর কাটিয়া গেল। আত্মীয় স্বজন যাঁহারাই জামাতার সহিত আলাপ করিয়াছেন প্রায় সকলেই এখন সন্তুষ্ট। বলিতেছেন, ভগবদিচ্ছায় এই বিবাহ বরবধূ উভয়েরই কল্যাণকর হইয়াছে।

গৃহে ফিরিতে ফিরিতে সারা পথ কমল বাবু উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-কর্মকারের সংযোগের বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। আমাদের পুরাণাদি শাস্ত্রে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের যোগের কথা পাওয়া যায়—অবশ্য প্রায়শই পাত্র থাকিত উচ্চবর্ণের, কন্যা নিম্নবর্ণের। অতীত যুগে উচ্চ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং আদর্শ- ও বৃত্তিগত ব্যবধান ছিল বাস্তব ও দুর্লঙ্ঘ্য। এখন সে ব্যবধান ক্রমশই কমিয়া আসিতেছে না কি? শিক্ষার দিক দিয়া, পারিবারিক এবং সামাজিক আচরণের দিক দিয়া কর্মকার ছেলেটি তো বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারের ছেলেদের চেয়ে একটুও পিছাইয়া নাই—বরং কোন কোন দিকে কিছু বেশীই আগাইয়া গিয়াছে। খগেন বাবুর প্রথম পুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীধারী বৈজ্ঞানিক, কিন্তু সংস্কৃত প্রায় কিছুই জানেন না; দ্বিতীয় তনয় সংস্কৃত জানেন কিন্তু ব্রাহ্মণের আচারনিষ্ঠা বিন্দুমাত্র নাই। পক্ষান্তরে কর্মকার-জামাতাটি ভাল সংস্কৃত জানে, হিন্দুধর্ম ও দর্শনের অনুরাগী, ঈশ্বর-বিশ্বাসী, দেবতা-ব্রাহ্মণ-তীর্থাদির প্রতি গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন। বৃত্তি? বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিবারের বয়স্ক পুরুষেরা প্রায় সকলেই 'মসী-জীবী'—কর্মকার-জামাতাও তো তাহাই। তবুও কেন জাতির মানদণ্ড বাহির করা? এ ক্ষেত্রে জাতি-বিচারের যৌক্তিকতা কি স্পষ্ট বুঝিয়া উঠা যায়?

কমল বাবু কিছুকাল ইউরোপে ছিলেন। কই, সেখানে তো আমাদের ন্যায় জাতির কড়াকড়ি নাই। শিক্ষা এবং চরিত্রগত সাম্য থাকিলে তথায় সমাজের যে কোন বৃত্তির লোক যে কোন বৃত্তির লোকের

সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান করিতে পারে। অবশ্য, পাশ্চাত্ত্য দেশে টাকার আভিজাত্য আছে। কিন্তু সে আভিজাত্য কাহারও একচেটিয়া নয়। যাহাকে আমরা জেলে-মালা-ডোম-ছুতোর বলি তাহাদেরও একদিন ঐ আভিজাত্য লাভ করিবার কোন সামাজিক বাধা নাই। আমাদের সমাজে ব্রাহ্মণত্ব কিন্তু প্রাচীনকালে যাহাই থাকুক এখন যেন একচেটিয়া। অধস্তন জাতিসমূহেরও গাত্রে অধস্তনত্বের লেবেল একেবারে চিরকালের জন্য অাঁটা!

কমলবাবু 'দৈনিক বসুমতী'তে প্রতি সপ্তাহে ধারাবাহিক ভাবে বাঙলা দেশের নানা জাতির যে ইতিবৃত্ত বাহির হইতেছে তাহা পাঠ করিয়া থাকেন। কৈবর্ত, বাগ্দী, তন্তুবায়, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি বহু জাতির ঐতিহাসিক ক্রমবিকাশের এই পরিচয়গুলি পড়িলে অনেকের অনেক অন্ধ ধারণা এবং যুক্তিহীন সঙ্কীর্ণতা কাটিয়া যায়, তথাকথিত উচ্চবর্ণীয়েরা নিম্নবর্ণদিগকে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি করিতে শিখেন। বাঙলা দেশের এই সকল বিভিন্ন জাতি সমাজের এক একটি বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া প্রসার লাভ করিয়াছে। বিরাট সমাজ-দেহের সংরক্ষণ এবং পরিপুষ্টির জন্য প্রত্যেকটি বৃত্তির প্রয়োজন আছে। এই বৃত্তি হীন, উহা সম্মানকর—এই দৃষ্টিভঙ্গীর মূলে কোন স্বাস্থ্যকর মনন ও বিচার নাই—উহা উচ্চবর্ণের দম্ভ এবং নিজেদের স্বার্থ কায়েমী করার চেষ্টা হইতেই উদ্ভূত। প্রত্যেক বৃত্তিধারীই সমাজ-সেবক, কেহই অবহেলার পাত্র নয়। উপরোক্ত জাতি-পরিচিতিগুলি হইতে জানিতে পারা যায়, এই সকল 'নিম্নবর্ণীয়ে'র মধ্যেও অতিশয় বিদ্বান, পরহিতব্রতী, আদর্শচরিত্র, উদার, দানশীল ব্যক্তিসমূহ হইয়া গিয়াছেন। অতএব মহত্ত্বের সকল সম্ভাবনাই প্রত্যেক জাতির মধ্যে রহিয়াছে। সুযোগ পাইলে শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক দিয়া অনেকেই ব্রাহ্মণের গুণ লাভ করিতে পারে।

স্বামী বিবেকানন্দের কতকগুলি উক্তির কথা কমল বাবুর মনে পড়িল। স্বামিজী বলিয়াছিলেন, —ব্রাহ্মণকে নীচে টানিয়া আনিয়া নয়, চণ্ডালকে শিক্ষা দীক্ষা দিয়া ব্রাহ্মণের ধাপে লইয়া গিয়া জাতিভেদ সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে চাতুর্বর্ণ্য-বিধান একটি চমৎকার বৈজ্ঞানিক সমাজ-ব্যবস্থা। ঐ বিধানে মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণার কোন স্থান ছিল না। মানুষ বিভিন্ন সংস্কার, রুচি, কর্মক্ষমতা লইয়া পৃথিবীতে আসে। এইগুলি মানিয়া লইয়া এক এক মানুষকে এক এক কাজ দিতে হইবে—ইহাই চাতুর্বর্ণ্যের মূল কথা। হিন্দু ঋষিদের দৃষ্টিভঙ্গীতে 'সমাজ' কিছু মানুষের চরম লক্ষ্য নয়—চরম লক্ষ্য হইতেছে সত্যলাভ; সমাজ ঐ লক্ষ্যপথের একটা ধাপমাত্র। যে মানুষ ঐ চরম লক্ষ্যের দিকে যত বেশীদূর আগাইয়া গিয়াছেন তিনি তত শ্রেষ্ঠ। শাস্ত্রানুযায়ী, ব্রাহ্মণের আদর্শ হইতেছে এই চরম লক্ষ্যের জন্য ঐকান্তিক সাধনা করা, তাই ব্রাহ্মণ 'সমাজশীর্ষ'। স্বামিজী শাস্ত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, সত্যযুগে একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতিই ছিল, কেননা, তখন পরম সত্যের ব্যাপক অনুশীলনই ছিল সকল মানুষের একমাত্র লক্ষ্য—সমাজজীবন ছিল খুব সরল—উহার স্তরভেদের কোন প্রয়োজনই ছিল না। ক্রমে মানুষ যখন উক্ত উচ্চ আদর্শ হইতে নামিয়া আসিল তখন সমাজের জটিলতা বৃদ্ধি পাইল,—গুণকর্মানুসারে চতুর্বর্ণের সৃষ্টি হইল। আবার মানুষকে তাহার সেই আধ্যাত্মিক জীবন-লক্ষ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে—সেই সত্যযুগে—সেই ব্রাহ্মণ-রূপ এক জাতিতে।

ইহাই যদি সত্য হয়, তাহা হইলে কমলবাবু ভাবিয়া দেখিলেন, কর্মকারের স্বকীয় শিক্ষা-সংস্কৃতির সামর্থ্যে ব্রাহ্মণের পাশে দাঁড়ানোর প্রতি বোধ করি আমাদের একান্ত অসহিষ্ণু হওয়া উচিত নয়। তবে একটি কথা। এখনই সকল নিম্নবর্ণকে ডাকিয়া ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহের ফতোয়া জারী করিতে

পারি না। উহা মূঢ়তা। অন্যদেশে যাহাই হউক, ভারতবর্ষে 'একজাতির' উহা পন্থা নয়।

ভারতের জীবনাদর্শ আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত। ঐ আদর্শলাভের উপায় চাতুর্বর্ণ্যের বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাটি একেবারে বানচাল করিয়া না দিয়া দেশকালানুযায়ী অদল বদল করিয়া লওয়া বিধেয়; স্বামিজী ঐরূপই ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণকে ঠেঙাইয়া শূদ্রের দলে দাঁড় করানো নয়—শূদ্রকে ব্রাহ্মণ-শীল শিখাইয়া ব্রাহ্মণত্বের পর্যায়ে উন্নীত করা।

বাড়ী গিয়া কমল বাবু স্বামিজীর বই খুলিয়া এই দুটি অংশ দাগাইয়া রাখিলেন :—

(১) ব্রাহ্মণত্বের যিনি দাবী করিবেন তাঁহাকে প্রথমতঃ নিজ চরিত্রে আধ্যাত্মিকতার বিকাশ এবং দ্বিতীয়তঃ অপরকে সেই পর্যায়ে উন্নয়ন—এই দুইটি দ্বারা ঐ দাবী প্রমাণ করিতে হইবে। ব্রাহ্মণদিগের কাছে আমার এই সনির্বন্ধ মিনতি তাঁহারা যেন ভারতের সনাতন আদর্শ ভুলিয়া না যান—পবিত্রতার প্রতিমূর্তি, ভগবত্তুল্য মহান ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পরিপূর্ণ একটি জগৎ সৃষ্টি! * * * যুগ যুগ সঞ্চিত যে সংস্কৃতি ব্রাহ্মণের নিকট গচ্ছিত আছে এখন তাঁহাকে সর্বসাধারণের মধ্যে বিলাইয়া দিতে হইবে।

(২) ব্রাহ্মণেতর জাতিকে আমি বলি, সবুর কর, তাড়াহুড়া করিও না। সুযোগ পাইলেই ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইও না। * * খবরের কাগজে বৃথা লেখালেখি এবং ঝগড়ায় সময় নষ্ট না করিয়া, ঘরে মারামারি এবং বিবাদরূপ পাপ না করিয়া সমস্ত শক্তিটা ব্রাহ্মণদের শিক্ষাদীক্ষা আয়ত্ত করিতে লাগাও তো—দেখিবে কার্য সিদ্ধ হইবে। * * জাতিসাম্য আনিবার একমাত্র উপায় হইতেছে উচ্চবর্ণের শক্তি যে কৃষ্টি ও শিক্ষা—উহা আত্মসাৎ করা।

কোন্ পথে?

এতদিন স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা মাঝে মাঝে যে 'ষ্ট্রাইক' করিত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের নিকট কোন বিষয়ে অভিযোগ আনিত এবং বিচার চাহিত—এই ধরণের ঘটনাগুলির উপর আমরা তেমন গুরুত্ব আরোপ করিতাম না—ভাবিতাম, ছেলেমানুষ, রক্ত গরম, একটু আধটু আন্দোলন করিতেছে, করুক। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে ছাত্রসমাজের মতিগতি ও ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষা-ব্যবস্থাপক—সকলেই বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়া পড়িয়াছেন। কয়েক সপ্তাহ পূর্বে লক্ষ্ণৌতে ছাত্রগণের ব্যাপক ধর্মঘট এবং 'বিদ্রোহ' সারাদেশকে বিস্ময়-বিমূঢ় করিয়া দিয়াছে। স্বয়ং প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরুকে একটি সভায় ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে হইয়াছিল, ঐরূপ উচ্ছৃঙ্খল ছাত্রসমাজ গঠনের চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করিয়া দেওয়া ভাল। 'Student Unrest'-সংজ্ঞক প্রবন্ধে 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় (৯ই নভেম্বর) 'হোমা' লিখিতেছেন—

"শিক্ষার্থীদের ইউনিয়নগুলি এখন 'ট্রেড ইউনিয়নের' আকার গ্রহণ করিয়াছে—শিক্ষা-সংক্রান্ত ব্যাপৃতির পরিবর্তে ঐ গুলি হইয়াছে ছাত্রদের 'দাবী' সংরক্ষণের দল। এই 'দাবী' যে কি তাহার সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। কার্যতঃ উহা কিন্তু রূপ লইয়াছে শ্রমিক, মালিকের নিকট যে দাবী-দাওয়া করে সেই ধরণের দাবীর। তাই দেখিতে পাই, শাস্তি বা বহিষ্কারের প্রতিরোধ হিসাবে ছাত্রেরা সমবেত হইয়া ধর্মঘট প্রভৃতি অবলম্বন করিতেছে। * * * অবস্থা এমন হইয়া দাঁড়াইতেছে যে শিক্ষকের ছাত্রকে পরিচালন নয়, ছাত্রগণই চায় শিক্ষককে চালাইতে। বিদ্যার্থীর উপর কোন চরিত্র-নীতি চাপানো চলিবে না, বিদ্যার্থীরাই ঐ নীতি ঠিক করিয়া লইবে। কোন ছাত্র অন্যায় আচরণ করিলে তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া চলিবে না।

শুধু তাহাই নয়, অন্যায়কারী বা অযোগ্য কোন শিক্ষককেও কর্তৃপক্ষ বিদ্যালয় হইতে অপসারণ করিতে পারেন না। * * * হয়তো এমন সময় আসিতেছে যখন ছাত্রেরা পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন কমিটিতে, সিনেট, সিণ্ডিকেট এবং শিক্ষক ও অধ্যাপক নির্বাচনী বোর্ডেও প্রতিনিধির আসন চাহিয়া বসিবে!"

'হোমা' ভবিষ্যৎ জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য দেশনেতৃগণকে ছাত্রসমাজের এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হইতে বলিয়াছেন। 'তালমুড' (য়াহুদী ধর্ম-বিধান-শাস্ত্র)-এর একটি সতর্কবাণী তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"জারুজালেম ধ্বংস হইয়াছিল, কারণ তথায় শিক্ষকগণ সম্মানিত হইতেন না।"

সম্প্রতি (৮ই নভেম্বর) ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কাটজু অমরাবতীতে একটি ছাত্রসম্মিলনে ছাত্রগণকে আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইবার, নিয়মশৃঙ্খলা অভ্যাস করিবার এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপ হইতে বিরত থাকিবার উপদেশ দিয়াছেন। ভারতীয় সংবাদপত্রসেবীসমিতির সভাপতি শ্রীমণীন্দ্র রায় কিছুদিন পূর্বে বেহালায় একটি বিজয়া-সম্মিলনীতে যুবকগণকে ডাকিয়া বাহিরের হৈ চৈ কমাইয়া স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে দুঃস্থ ও আতুর সেবাকার্যে সাধ্যমত আত্মনিয়োগ করিতে বলিয়াছিলেন। ছাত্রেরা যাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা করে সেই সকল মনীষীর এই ভাবে তাহাদের মধ্যে গিয়া আলাপ-আলোচনা ও সদুপদেশ দান একান্ত প্রয়োজন, সন্দেহ নাই।

আশা করি বর্তমান ছাত্রসমাজকে যথার্থ পথে চালিত করিবার দায়িত্ব যে উপেক্ষণীয় নয় দেশের শিক্ষাবিদ্, সমাজসেবী এবং রাষ্ট্রনায়কগণও দ্রুত বুঝিতে পারিয়া কার্যকরী উপায় অবলম্বন করিবেন।

মর্ম-বাণী

ডাঃ শচীন সেন গুপ্ত

তোমায় যে চাই—
এ কথা তো হায় বুঝি নাই;
এতদিন এ সংসারে চলিতে চলিতে
যাহা কিছু এসেছিল মোর অলক্ষিতে,
ষোল আনা তার—
বলেছি আমার।
তুমি সেথা নাই;
তবু সব চেয়ে তোমায় যে চাই—
এ কথা তো কভু বুঝি নাই।

তুমি আছো—
ভরিয়াছো—
হৃদয়-ভাণ্ডার মোর সুধারস দিয়ে;
ক্ষণেকের তরে সেই অনুভূতি নিয়ে
মেতেছিল প্রাণ।
সে—ই অবদান!
তোমায় যে চাই—
তবু ভুলে যাই;
সে কথা তো—তাই বুঝি নাই।

তোমায় বুঝিনা—
বুঝিতে চাহিনা;
শুধু এই টুকু নিয়ে যেন কাটে এ জীবন—
তুমি ছিলে, তুমি আছো, তুমিই রহিবে যখন
সব চলে যাবে—
কিছু না রহিবে,
শুধু তুমি রবে সব ঠাঁই—
সেথা আমি নাই।—
হায়, তোমায় যে চাই,
সে কথা তো তবু বুঝি নাই।

কেন তিনি এসেছিলেন

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

তিপ্পান্ন বৎসর তিনি বেঁচেছিলেন আমাদের এই পৃথিবীতে। ঈশ্বর পাওয়ার চরম ব্যাকুলতায় শরীরটাকে কতদিন তিনি গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন নি! শরীরের দিকে তাঁর কোন খেয়ালই ছিল না। তবু তিপ্পান্ন বৎসর শরীরটাকে তিনি ধারণ করেছিলেন। বুঝ্‌তে হবে একটা মজবুত কাঠামো নিয়ে কামারপুকুরের চাটুজ্যে-বংশে তিনি আবির্ভূত হ'য়েছিলেন। কিন্তু শরীরের গঠনের চেয়ে তাঁর মনের গঠন ছিল আরও অদ্ভুত। ভগ্নী নিবেদিতা ঠিকই বলেছেন: His was, probably, the one really universal mind of modern times. তাঁর চরিত্রে নানা বিভিন্নমুখী গুণের সমাবেশ বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায় আমাদিগকে সত্যই অবাক ক'রে দেয়। ব্রহ্মানন্দের আকাশে মুক্তপক্ষ বিহঙ্গমের মতোই যিনি বিহার করতেন, মাটির প্রতি তাঁর মন উদাসীন ছিল না। সংসারের খুঁটি-নাটির দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল কি প্রখর! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের ৩য় ভাগে দেখ্‌তে পাই স্নানান্তে ঠাকুর ৺কালীঘরে যাচ্ছেন। মণি সঙ্গে আছেন। ঠাকুর মণিকে ঘরে তালা লাগাতে বল্‌লেন। তিনি জান্‌তেন সংসারে চোর-ডাকাতের অভাব নেই, আর তারা কামিনীকাঞ্চনত্যাগী সাধুকেও রেহাই দেয় না। ঠাকুর মেঘলোকে উধাও শেলীর Skylark ছিলেন না। তিনি ছিলেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের Skylark—যার ডানা আকাশে থাকলেও নীড়কে যে ভোলে না। তিনি আমাদিগকে বলে গেছেন সাধু হ'তে, বোকা হ'তে নয়। নির্বুদ্ধিতাই এ সংসারের যাবতীয় দুষ্কার্যের মূলে। কথাটা Ruskinএর।

তিনি জানতেন মানুষের চরিত্র একরকমের মাল্‌মসলায় তৈরী নয়। তাদের সমস্যাও এক-রকমের নয়। এক একজন মানুষের এক এক রকমের সমস্যা। ঠাকুর প্রতিটী হৃদয়ের সমস্যা-গুলিকে দরদ দিয়ে অনুভব করতে পারতেন—যেন সেগুলি ছিল তাঁর নিজেরই জীবনের সমস্যা। তিনি বল্‌তেন, 'কি জানো, রুচিভেদ, আর যার পেটে যা সয়। তিনি নানা ধর্ম, নানা মত করেছেন—অধিকারীবিশেষের জন্য।' কেশব সেন লেক্‌চারে বললেন, 'যেন আমরা ভক্তিনদীতে ডুবে যাই'। ঠাকুর হেসে বললেন, 'ভক্তিনদীতে যদি একেবারে ডুবে যাবে তাহ'লে চিকের ভিতর যাঁরা র'য়েছেন ওঁদের কি দশা হবে?··· একেবারে ডুবে তলিয়ে যেও না'। কেশব সংসারী লোক। তাঁর জন্য, তাই, সারে মাতে থাকার ব্যবস্থা। কিন্তু নরেন্দ্রের বিবাহ হবে শুনে মা কালীর পা ধ'রে তিনি কি কান্নাই কেঁদেছিলেন! নরেন্দ্র ভিন্ন প্রকৃতিতে গড়া। তার জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। একই ক্ষুরে সকলের মাথা কামাতে যাওয়া ঠিক নয়—এ সত্য ঠাকুরের মতো আর কে বুঝ্‌তো? ঠাকুর নিজে ছিলেন ক্ষমার প্রতিমূর্তি। ঈশ্বরের আবেশে ঠাকুর মাটিতে অন্ধকারে পড়ে আছেন। ঢং ভেবে কালীঘাটের চন্দ্র হালদার অন্ধকারে এসে তাঁকে বুট জুতোর গুঁতো মারতে লাগলো। সোনার অঙ্গে দাগ হ'য়ে গিয়েছিল। সবাই বল্লে সেজোবাবুকে বলে দিতে। ঠাকুর সে ধার দিয়ে গেলেন না। আর—সবাইকে বারণ করলেন সেজোবাবুর কানে যেন কথাটা না যায়। কিন্তু সংসারীকে তিনি বলে গেছেন ফোঁস কর্‌তে, ক্রোধের আকার

দেখাতে। নইলে শত্রুরা এসে যে অনিষ্ট করবে। অবশ্য বিষ ঢাল্‌তে তিনি বারম্বার মানা ক'রে গেছেন। মাষ্টার তাঁকে বলেছিলেন :

আমার পাতের কাছে বেড়াল মুলো বাড়িয়ে মাছ নিতে আসে, আমি কিছু বল্‌তে পারি না।

ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন :

কেন! একবার মারলেই বা, তাতে দোষ কি? সংসারী ফোঁস্‌ করবে। বিষ ঢালা উচিত নয়। * * ত্যাগীর ফোঁসের দরকার নাই।

'অন্যায় অসত্য দেখলে চুপ করে থাক্‌তে নাই।' এতো ঠাকুরেরই কথা। কিন্তু আবার তিনিই বলেছেন মাতালের কথা :

'যদি রাগিয়ে দাও তা হ'লে বল্‌বে, তোর চোদ্দ পুরুষ, তোর হেন তেন,—বলে গালাগালি দিবে। তাকে বলতে হয়, কি খুড়ো কেমন আছ? তা হ'লে খুব খুসী হয়ে তোমার কাছে ব'সে তামাক খাবে।'

তিনি বল্‌তেন, 'আমি একঘেয়ে কেন হবো? আমি পাঁচ রকম ক'রে মাছ খাই।' সত্যই তিনি একঘেয়ে লোক ছিলেন না। তিনি বল্‌তেন 'দেশকালপাত্র ভেদে সব আলাদা রাস্তা।' তিনি বল্‌তেন :

'আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈষ্ণবকে বৈষ্ণবের ভাবটাই রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। তবে বলি, 'একথা বোলো না—আমারই পথ সত্য, আর সব মিথ্যা ভুল।'

মতুয়ার বুদ্ধিকে তিনি আদৌ সমর্থন করতেন না।

ঠাকুরের কথামৃত পড়তে পড়তে আমার কেবলই মনে পড়ে ফরাসী মনীষী মঁতেনের (Montain) সেই অদ্ভুত কথাগুলি :

"আমাকে দিয়ে অন্যের বিচার করবার ভুল—যা সাধারণত লোকে ক'রে থাকে, আমি করি নে। তার মধ্যে যে গুণগুলি আমার থেকে স্বতন্ত্র—তাদের আমি সমাদর করতে পারি। যদিও আমি এক বিশেষ ধরণের আচরণে অভ্যস্ত তবুও অন্যদের মতো সেই আচরণ অনুসরণ করতে দুনিয়াকে আমি বাধ্য করিনে। আমি ধারণা করতে পারি এমন হাজার রকমের আচরণের যাদের সঙ্গে আমার আচরণের মিল নেই। সেই সব আচরণে আমি বিশ্বাসও করি। সাধারণ লোক যা করে না আমি তাই ক'রে থাকি অর্থাৎ আমাদের মিলের দিকটার চাইতে অমিলের দিকটাকেই বেশী তাড়াতাড়ি স্বীকার করে থাকি। তাদের জায়গায় নিজেকে ফেল্‌তে আমার কোন বেগ পেতে হয় না। তারা আমার থেকে স্বতন্ত্র ব'লে তাদের আরও বেশী ভালোবাসি, আরও বেশী শ্রদ্ধা করি।"

এ যেন ঠাকুরের কথা। ঠাকুরও বলতেন :

"তবে অন্যের মত ভুল হ'য়েছে—একথা আমাদের দরকার নাই। যাঁর জগৎ তিনি ভাব্‌ছেন।"

বৈচিত্র্যে প্রকৃতির প্রয়োজন আছে। এ বৈচিত্র্য না থাকলে পৃথিবী প্রাণহীন হয়ে যেতো। রলাঁর (Romain Rolland) সেই কথা : and variety is a necessity of nature : without it there would be no life

স্বামিজীর পত্রাবলীতে আছে :

"যতদিন কোন শ্রেণীবিশেষ সক্রিয় ও সতেজ থাকে ততদিনই তাহা নানা বিচিত্রতা প্রসব করিয়া থাকে। যখন উহা বিচিত্রতা উৎপাদনে বিরত হয় অথবা যখন উহার বিচিত্রতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় তখনই উহা মরিয়া যায়।"

এই বৈচিত্র্যে ঠাকুর বিশ্বাস করতেন। তিনি বলতেন : 'ঈশ্বরকে নিরাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়। আবার সাকার ব'লে বিশ্বাস থাকলেও তাঁকে পাওয়া যায়।" তিনি বলতেন : 'আমি সব রকম করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদেরও মানি, বৈষ্ণবদেরও

মানি, আবার বেদান্তবাদীদেরও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আর সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক।'

দল গড়বার জন্যে ঠাকুর আসেন নি। তিনি এসেছিলেন মানুষের সঙ্গে মানুষকে মেলাতে। তিনি এসেছিলেন ধর্মের গোঁড়ামি থেকে মানুষের মনকে মুক্ত ক'রে সেই মনে ঐক্যবোধ জাগাতে। যুগের কর্ণে যে যাদুমন্ত্র তিনি উচ্চারণ করলেন সে মন্ত্র হচ্ছে ঐক্য। স্বপ্ন আর কাজ, জ্ঞান আর ভক্তি আর কর্ম, ত্যাগ আর ভোগ—সব কিছুকেই তিনি স্বীকার করলেন। স্বীকার করলেন কৃষ্ণকে, খ্রীষ্টকে, মহম্মদকে। মিলিয়ে দিলেন সাকারবাদকে নিরাকারবাদের সঙ্গে। বিচারকে (Reason) স্বীকার করলেন, বিশ্বাসকেও স্বীকার করলেন। সারা বিশ্বে যে যে-মতেরই থাকুক সকলেরই জন্য প্রাণ তাঁর কেঁদেছিল। কাউকেই বাদ দিয়ে চলতে তিনি রাজী ছিলেন না। নিবেদিতা ঠিকই লিখেছেন:

A universe from which one, most insignificant, was missing, could not have seemed perfect in his eyes.

মাতাল গিরীশ ঘোষকেও বুকে টেনে নিতে কোথাও তাঁর বাধেনি।

তিনি যে সময়ে এসেছিলেন তখন বাংলার যুবসমাজের দৃষ্টি ছিল পশ্চিমের দিকে। পশ্চিমের সাহিত্য থেকে নূতনতর ভাবধারা এসে তাদের উদ্বুদ্ধ করেছিল দেশাত্মবোধে। ইউরোপের রুচিকে, ইউরোপের আচরণকে অনুসরণ ক'রে ভারতবর্ষ আবার জগতে গৌরবের আসন অধিকার করবে—এই ধারণা তরুণ-সম্প্রদায়ের মনে তখন ভালো ক'রেই শিকড় গেড়েছিল। প্রগতির সব চেয়ে সাংঘাতিক শত্রু তারা মনে করতো প্রতিমাপূজাকে। পৌত্তলিকতাই যে ভারতবর্ষের সমস্ত অধঃপতনের মূলে—এ বিষয়ে তারা ছিল নিঃসংশয়। স্বদেশের মর্ম থেকে অতীতকে টেনে হিঁচড়ে বের করে দিয়ে সেখানে পাশ্চাত্ত্যের অনুকরণে নূতনতর ভবিষ্যতকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমাদের দেশের তরুণেরা যখন বদ্ধপরিকর তখন ঠাকুর এসে তাঁর নিজের অননুকরণীয় ভাষায় তাদের বললেন 'তিষ্ঠ'। চমকে তারা পিছন দিকে তাকালো। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখলো গোঁড়া হিন্দু ধরণের এক ব্রাহ্মণ। শান্ত, সরল, নিরভিমান, পরিহাসপ্রিয়, সদাহাস্যময় পুরুষ, প্রায় উলঙ্গ বললেই হয়। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণ কোন এক যাদুতে সেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাভিমানী যুবকদের মুগ্ধ ক'রে ফেললেন। সে যাদু বিচার-বুদ্ধির অগম্য। তখনকার দিনে আকাশে বাতাসে খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব। ব্রাহ্মণের খ্রীষ্টে অনুরাগ ছিল। খ্রীষ্টীয় ধর্মসাধনাকে ইতিপূর্বে তাঁর সাধনার অঙ্গ ক'রেছিলেন। আগন্তুক তরুণদের মুখ থেকে বাইবেল শোনার আগ্রহ তাঁর প্রবলই ছিল। কিন্তু সেই আগ্রহ তাঁর কালীভক্তি কিছুমাত্র কমাতে পারলো না। তিনি বললেন, 'যত মত তত পথ।'

সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্ত্যের ঔদ্ধত্যের সামনে প্রাচ্য নিজেকে মনে করতো তুচ্ছ, নগণ্য, অকিঞ্চিৎকর। রামকৃষ্ণকে আশ্রয় ক'রে ধূল্যবলুণ্ঠিত প্রাচ্য বুক ফুলিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ালো—পাশ্চাত্ত্যের সঙ্গে সগর্বে মুখোমুখী হ'য়ে দাঁড়ালো। পরানুকরণপ্রিয়তার তমসাচ্ছন্ন যুগ শেষ হয়ে গিয়ে দিগন্তে ফুটে উঠলো নবারুণজ্যোতি। ঘুমের রাজ্যে ঠাকুর আনলেন জাগরণ, আত্ম-অবিশ্বাসের রাজ্যে আনলেন আত্মমর্যাদাবোধ। ভারতবর্ষ আত্মসম্বিৎ ফিরে পেলো। আপনাকে সে চিনলো। ইতিহাসের বুকে তার সুরু হোলো জয়যাত্রা। তাঁকে প্রণাম—শতকোটি প্রণাম।

শ্রীশ্রীমায়ের স্মরণে

শ্রীনিশিকান্ত মজুমদার

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ জয়ন্তী উৎসব ১৩৬০ সালের পৌষ মাস হইতে উদ্‌যাপিত হইবে। সে আনন্দের দিন আগতপ্রায়। মাকে ভুলিয়া কত জন্ম জন্মান্তর ঘুরিয়াছি। এবার মায়ের অহৈতুকী কৃপায় এতদিনে ঘরের ছেলে ঘরে আসিয়া পৌঁছিয়াছি।

আজ মায়ের স্মৃতিবিজড়িত কত কথাই না হৃদয়-পটে একে একে উদ্ভাসিত হইতেছে। মা ছিলেন অন্তর্যামিনী। আপন হৃদয়ে সন্তানের মনোব্যথা অনুভব করিয়া ব্যথাহারিণী মা তাহা দূরীকরণে নিয়তই ব্যস্ত থাকিতেন। ১৩২০ সালে ৩১শে আষাঢ় মা শ্রীধাম জয়রামবাটীতে আমাকে কৃপা করেন। উহার কিছুদিন পূর্ব হইতেই মায়ের জনৈক সন্তান শ্রীমুকুন্দবিহারী সাহা তথায় উপস্থিত ছিলেন। উক্ত দীক্ষার দিবস বৈকালে কলিকাতা যাওয়ার জন্য তাঁহার নামে একটি টেলিগ্রাম আসে। বিষ্ণুপুর ষ্টেশন পর্যন্ত যাওয়ার জন্য গো-গাড়ীর কোন ব্যবস্থা করিতে না পারায় মা আমাকে তাঁহার সহিত পদব্রজে যাওয়ার জন্য আদেশ করেন। ভোর রাত্রে যাওয়া স্থির হইল। আমাদিগকে উৎসাহিত করার জন্য মা তাঁহার দক্ষিণেশ্বর পর্যন্ত পায়ে হাঁটিয়া যাওয়ার কাহিনী উল্লেখ করিয়া বলিলেন,—"আমি এত দূর পায়ে হেঁটে যেতে পেরেছি, আর তোমরা এ পথটুকু পায়ে হেঁটে যেতে পারবে না? তোমরাও পারবে।" আমি মায়ের আদেশ মাথা পাতিয়া লইলাম, কিন্তু অন্তরে এক ব্যথা উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল। মা খাইবেন, আর আমার হাতে একটু প্রসাদ দিবেন, আমি পাইয়া ধন্য হইব—এ সাধটি আমার অপূর্ণ-ই রহিয়া গেল। আমরা ভোর রাত্রে রওনা হইবার সময় মাকে প্রণাম করিতে গিয়া দেখি মা বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। তখনও উক্ত সাধটি আমার মনে আন্দোলিত হইতেছিল। আমরা প্রণাম করিতেই মা "একটু দাঁড়াও" বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন ও একটি ছোট ডালায় করিয়া কিছু মুড়ি আনিয়া আমার সম্মুখে দুই এক মুঠ খাইয়া এবং মুখের কিঞ্চিৎ মুড়ি ডালার মুড়িতে মিশাইয়া ডালাটি আমার হাতে দিয়া বলিলেন,—"এবার তো হয়েছে?" আনন্দের আতিশয্যে আমার মুখে কোন কথা ফুটিল না, শুধু 'মা' বলিয়া প্রণাম করিলাম। মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করিতে করিতে ও মায়ের অযাচিত কৃপার কথা আলোচনা করিতে করিতে আমরা দীর্ঘ ২৮ মাইল পথ চলিয়া আসিলাম। মায়ের আশীর্বাদে আমাদের কোন কষ্টই অনুভব হয় নাই।

রাঁচি হইতে একবার শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র ঘটক প্রভৃতি মায়ের কৃপাপ্রাপ্ত কতিপয় সন্তান মায়ের কাছে শ্রীধাম জয়রামবাটী যাইতেছেন। তাঁহাদের সহিত আমারও যাওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা প্রাণে উদিত হইল কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বহু চেষ্টা করিয়াও ছুটী পাইলাম না। আমি ইহাতে বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলাম। যাহা হউক, তাঁহাদিগকে গাড়ীতে তুলিয়া দিবার জন্য ষ্টেশনে গিয়া নিজেকে আর সামলাইতে পারিলাম না। বেপরোয়া হইয়া আমিও তাঁহাদের সঙ্গে চলিলাম। কর্মস্থলে কি বিষময় ফল ফলিতে পারে সে চিন্তা তখন মনে স্থানই পাইল না—শুধু এক চিন্তা—আমার মায়ের রাঙ্গা পা দুখানি স্পর্শ করিব, হৃদয়ে ধারণ করিব।

কোয়ালপাড়া মঠে পৌঁছিলে স্বামী কেশবানন্দজী বলিলেন, "মায়ের শরীর বিশেষ ভাল নেই। আপনারা রাত্রে এখানেই থাকুন; কাল প্রাতে

মায়ের বাড়ী যাবেন।” আমি মহারাজকে বলিলাম, ‘বিশেষ কোন কারণে আজই আমাকে মায়ের বাড়ীতে যেতে হবে’ এবং আমি রওনা হইলাম। শ্রীশদা প্রভৃতিও রওনা হইলেন। সাধুর বাক্য প্রতিপালন না করার ফল হাতে হাতেই ফলিল। আমরা প্রায় একতৃতীয়াংশ পথ চলিয়া আসার পর অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ প্রবলবেগে ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। আমরা পথিপার্শ্বস্থ একটি গৃহের বারান্দায় আশ্রয় লইলাম। উহা একটি ঠাকুর ঘর। অনেক রাত পর্যন্ত ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় এমন একটি অবস্থার উদ্ভব হইল যে মায়ের বাড়ী যাওয়া কিংবা কোয়ালপাড়া ফিরিয়া আসা আমাদের পক্ষে একটি দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। যাহা হউক, ঝড় বৃষ্টি থামিবার পর শীতল দেওয়ার জন্য লণ্ঠন হস্তে একজন ব্রাহ্মণ তথায় আসিলেন এবং তাঁহারই সাহায্যে অনেক রাত্রে আমরা মায়ের বাড়ী পৌঁছিলাম। পৌঁছিতেই শ্রীযুক্ত কালী মামা বাহির হইয়া আসিলেন এবং বলিলেন,—“দিদির শরীর বিশেষ ভাল নেই। আপনারা এখান থেকেই প্রণাম করুন। ঘরে জল দেওয়া ভাত আছে, তাই আজ রাত্রে আহার করুন।” পরে তিনি আমাদের শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। কি আশ্চর্য রাস্তায় আমরা মনস্থ করিয়াছিলাম, একদিন মায়ের বাড়ী পান্তাভাত খাইব! এই ভাবেই মা আমাদের সে সাধ পূর্ণ করিলেন। পরদিন প্রাতে আমরা মাকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। প্রণাম করিতেই মা বলিলেন,—“আমার দেহটা ভাল নেই। তোমরা এসেছ জেনেও তোমাদের খোঁজ করতে পারি নি। তোমরা এজন্যে দুঃখ করো না।” তারপর স্নেহভরে বলিলেন,—“এমনি গোঁ করে কি আসতে আছে? রাস্তায় কত কিছু হন্‌হনিয়ে চলে। ঠাকুর রক্ষা করেছেন, ঠাকুর রক্ষা করেছেন।” আমি বলিলাম, “মা, ঠাকুরকে, তো দেখি নি। তুমিই আমার ঠাকুর।” তখন মা দৃঢ় কণ্ঠে বলিলেন, “হ্যাঁ, আমিই তোমার ঠাকুর। সব সময় মনে রেখো ঠাকুর তোমাদের পেছনে আছেন।” শ্রীশদা প্রভৃতি মাকে প্রণাম করিয়া বাহিরে চলিয়া গেলে আমি মাকে বলিলাম, “মা, ওরা ছুটি নিয়ে এসেছে। আমার ছুটি হয় নি। তুমি যদি বল ‘তুই থাক্’ তাহলে বিশ্বে আমার এতটুকু অনিষ্ট করার সাধ্য কাহারও নেই। মা, আমার যে যেতে ইচ্ছে করে না।” মা তখন বলিলেন,—“তাই তো ছুটি হয় নি, কিন্তু না খেয়ে কি করে যাবে? কোয়ালপাড়া মঠে সকাল সকাল ঠাকুরের ভোগরাগ হয়, সেখানে প্রসাদ পেয়ে গেলে হয় না?” আমি বলিলাম,—“মা, প্রসাদ পেতে হয় তো তোমার প্রসাদই পাব। আমি আর কোথাও প্রসাদ পেতে যাব না। আমি এমনিই চলে যাব। তোমার চরণ স্পর্শ করতে পেরেছি, আর আমার কোন ক্ষোভ নেই।” কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া মা আমাকে বলিলেন,—“না, তোমাকে যেতে হবে না। তুমি ওদের সঙ্গেই আনন্দ করে যাবে।” আমি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মাকে বার বার প্রণাম করিলাম। পরে ছুটিয়া গিয়া শ্রীশদাকে এই খবর দিলাম।

স্নেহময়ী জননী আমার! সন্তানের ব্যথায় এমনি করিয়া তোমার স্নেহ উথলিয়া উঠে। আর সেই স্নেহধারা বিতরণে সন্তানকে আনন্দ-সাগরে ভাসাও। এর কোন হেতু নাই, এ তোমার অহেতুক স্নেহ, অহৈতুকী কৃপা।

মহানন্দে দিন কাটিতে লাগিল। এই সময় ভানু পিসীর সঙ্গে আমার খুব ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি পান সাজিয়া ভক্তদের মুখে গুঁজিয়া দিয়া বলিতেন,—“ঠাকুরকে খাওয়াচ্ছি।”

কয়দিন মহানন্দে কাটাইয়া রাঁচি ফিরিবার সময় সুধীরা দিদিও আমাদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর পর্যন্ত চলিলেন। তাঁহাকে তুলিয়া দেওয়ার জন্য মা গো-গাড়ীর কাছে আসিলেন।

আনন্দে ভরপুর হইয়া রাঁচি ফিরিলাম। ছুটি না লইয়া আফিসে অনুপস্থিতির জন্য দণ্ড হইতে অভাবনীয়ভাবে নিষ্কৃতি পাইয়াছিলাম। বুঝিলাম মহামায়ারই খেলা।

মায়ের নিকট কত আবদারই না করিয়াছি, আর মা অম্লানবদনে সেই সব আবদার রক্ষা করিয়াছেন। একদিন জয়রামবাটীতে মা তাঁহার রাঙ্গা পা দুখানি ঝুলাইয়া তক্তাপোশের উপর বসিয়া আছেন। আমি তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিয়া আবদার করিলাম, 'মা, আমার বড় সাধ তোমার রাঙ্গা পা দুখানি আমার হৃদয়ে তুলে ধরি'—এই কথা বলিয়াই মেঝেতে শুইয়া পড়িলাম। মা হাসিতে হাসিতে 'ছেলের যত সাধ' বলিয়া রাঙ্গা পা দুখানি আমার হৃদয়ে রাখিলেন। কিছুক্ষণ পরে মহানন্দে উঠিয়া বসিলাম, আর বলিলাম,—"মা, এবার আমার মাথায় একটু জপ করিয়া দাও।" আনন্দের সহিত মা আমার মাথায় জপ করিয়া দিলেন।

একদিন মাকে প্রার্থনা জানাই,—"মা, তোমার ঠাকুরপূজা দেখব।" মা বলিলেন,—"ও আবার কি দেখবে।" পরদিন সকালে শ্রীযুক্ত কালী মামার বৈঠকখানায় বসিয়া আছি, কে যেন বলিল—'মা পূজায় বসেছেন।' আমি ছুটিয়া গিয়া দেখি পূজা প্রায় শেষ। মা একটি পুষ্পহস্তে ধ্যানস্তিমিত নেত্রে বসিয়া আছেন—যেন নিশ্চল প্রতিমা, আর সুধীরা দিদি মাকে ব্যজন করিতেছেন। পাখাসহ তাঁহার হাতখানাই শুধু নড়িতেছে—আর সব স্থির। সে দৃশ্য অনুভূতির, ভাষায় বর্ণনীয় নহে। আমি নির্বাক হইয়া দেখিতে লাগিলাম। পূজান্তে মা বলিলেন, "পূজা দেখা হল বাবা?" আমি দূর হইতে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া চলিয়া আসিলাম। আর একদিন মাকে বলিলাম,—"মা, তোমার ছেলেরা কেউ চোখ বুজে, কেউ চোখ চেয়ে ঠাকুরকে দেখতে পান। আমার ভাগ্যে তো মা ঠাকুর-দর্শন হল না।" মা তখন বলিলেন,—"স্থানটি যদি পবিত্র হয়, মনটি যদি শুদ্ধ থাকে তবে ঠাকুরের দর্শন পাওয়া যায়।" তারপর মা খুব গম্ভীরভাবে বলিলেন,—"একদিন কোয়ালপাড়ায় ঠাকুরঘরে ঠাকুরকে প্রণাম করে আমার শোবার ঘরে যেয়ে দেখি ঠাকুর মেঝেতে শুয়ে আছেন। আমি বলিলাম, 'সে কি গো, তুমি অম্‌নি করে শুয়ে?' ঠাকুর বললেন, 'আমার বড় ভাল লাগে'।" মা একথা বলিতে বলিতে কি রকম যেন হইয়া গেলেন, আর কথা বলিতে পারিলেন না। কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া আমার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিয়া দৃঢ় অথচ মধুর কণ্ঠে বলিলেন, "আমি বলছি ঠাকুর সামনে না এলে তোমার দেহ যাবে না। এবার তোমার শেষ জন্ম।" মায়ের স্নেহবিগলিত করুণার কথা ভাষা দিয়া প্রকাশ করা আমার সাধ্যের অতীত।

আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে একটি কথা। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমীর দিন বৈকুণ্ঠদা (ডাক্তার) যখন মায়ের নিকট হইতে গেরুয়া লইয়া বাহিরে আসিলেন, আমি সতৃষ্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। আমার প্রাণে এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিল। আমি সুযোগমত মায়ের চরণতলে পতিত হইয়া প্রার্থনা করিলাম,—"মা, আমাকেও বৈকুণ্ঠদার মত গেরুয়া দিতে হবে। স্বামিজী বলেছেন, সন্ন্যাস না হলে জীবের মুক্তি নেই।" মা তখন আমাকে তুলিয়া ধরিয়া বলিলেন,—"সে তো সত্যি কথা। তবে কি জান সন্ন্যাস মানে অন্তর-সন্ন্যাস। বাহির-সন্ন্যাস অন্তর-সন্ন্যাসের সহায়তা করে, তাই যার দরকার মনে করি তাকে দেই। তোমার দরকার নেই। তোমার অমনিই হবে।" এই বলিয়া মা ঠাকুরের প্রসাদী এক গ্লাশ সরবৎ হইতে নিজে কিছু গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট আমাকে দিলেন। বাহিরে উঠানে মা তাঁহার পরিহিত একখানা কাপড় শুকাইতে দিয়াছিলেন। সেই কাপড়খানা ভাঁজ করিয়া আনিয়া

আমাকে দিয়া বলিলেন,—"তুমি এখানা নাও।" আমি দুহাত পাতিয়া কাপড়টি লইয়া মাথায় স্পর্শ করিতে লাগিলাম, আর সব ভুলিয়া গেলাম। মা তখন বলিলেন,—"তুমি যে সংসারে আছ তাহা ঠাকুরের সংসার জানবে। তুমিও ঠাকুরের—। তাজেই ঠাকুরের সংসারে যারা আছে তাদের সেবার জন্য কাজ করে যাবে। যা কিছু কর সবই ঠাকুরের কাজ জেনে করবে।" মায়ের দেওয়া কাপড়খানা মায়ের কাছ হইতে যেভাবে পাইয়াছিলাম সেটি আজও সেইভাবেই রক্ষিত আছে। কাপড়টি যখনই স্পর্শ করি তখনই মায়ের শ্রীচরণ-স্পর্শসুখ অনুভব হয়।

দধীচি

শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী

দেবাসুর-রণে দেবতারা যবে মানি' নিল পরাভব,
স্বর্গপুরীর মুছে গেল দ্যুতি, রহিল না গৌরব।
ইন্দ্র-বরুণ-যম-হুতাশন, সূর্য-চন্দ্র-আদি দেবগণ,
বিষাদ-সাগরে হ'ল নিমগ্ন, হ'ল হৃতবৈভব!

কাঁপায়ে তুলিল সারা ত্রিভুবন অসুরের উল্লাস,
ধ্বনিয়া উঠিল বিজয়-নিনাদ ভরি' অনন্তাকাশ!
শিব-বরে বলী বৃত্র অসুর, জিনিয়া লইল নন্দন-পুর,
বসি' রাজাসনে লইল মিটায়ে মনের যতেক আশ।

ব্রহ্মা-সকাশে আসি' দেবগণ, করি' শির অবনত,
পরাজয়-গ্লানি বক্ষে বহিয়া জানাল বেদনা যত।
কহে করপুটে—"হে চতুরানন, অসুরের করে সহি' নিপীড়ন,
হ'য়েছি স্বর্গ-ভ্রষ্ট আমরা, হয়েছি ভাগ্যহত!"

"হে মহাস্রষ্টা, বিশ্বদ্রষ্টা, মোরা আজ নিরুপায়,
নির্জিত মোরা, লাঞ্ছিত মোরা, মোরা আজ অসহায়!
দুর্গত মোরা—কর প্রতিকার, কেমনে স্বর্গ হ'বে উদ্ধার
আশায় আলোক দাও তুমি জ্বে'লে নিদারুণ হতাশায়!

কহিল ব্রহ্মা—"অসুর-জয়ের উপায় ত' কিছু নাই,
শিব-বরে বলী বৃত্র-অসুর, অজেয় হয়েছে তাই।"
সহস্র-আঁখি করিয়া সজল, কহিল ইন্দ্র ব্যথা-বিহ্বল,—
"পাব না তবে কি কখনো আমরা স্বর্গপুরীতে ঠাঁই ?"

"একটি উপায় এখনো রয়েছে, শুন তবে দেবগণ!"
আশ্বাসময় করুণা-বাক্যে কহিল চতুরানন,—
"যাও ধরাধামে দধীচির পাশে, তাঁহার অস্থি-ভিক্ষার আশে,
তাই দিয়ে গড় কঠিন বজ্র—মহাস্ত্র অতুলন!

"হে বজ্রপাণি, যাও ত্বরা করি', দূর কর অবসাদ,
অসুরে জিনিয়া লভ পুনরায় বিজয়-আশীর্বাদ!
বৃত্র-দর্প কর চুরমার, সংগ্রামে তারে কর সংহার,
দাও মুছে দাও স্বর্গপুরীর কলংক-অপবাদ!"

ব্রহ্মা-চরণে জানায়ে প্রণতি অসীম ভক্তিভরে,
আসিল ইন্দ্র দধীচি মুনির সন্ধান-লাভ তরে।
দেখিল, অদূরে মহাতপোধন, ধ্যান-আবিষ্ট যুগল নয়ন,
কি যেন শান্ত ভাবের আবেশ মুখমণ্ডল 'পরে!

বন-প্রকৃতির স্নিগ্ধ মাধুরী বিছায়েছে মধু-মায়া,
কোন্ ভুবনের অলক্ষ্য-রূপ হেথায় পেয়েছে কায়া!
হেথা জীবনের নাহি চপলতা, ভোগের লাগিয়া নাহি আকুলতা,
শান্তি হেথায় মেলিয়া রেখেছে শান্ত জীবন-ছায়া!

তপোবন-রূপ দেখিতে দেখিতে দেবরাজ উপনীত—
মহাতপোধন দধীচি যেথায় যোগাসনে সমাহিত।
ক্রমে ক্রমে ঋষি মেলিয়া নয়ন, দেখি' ইন্দ্রের মলিন আনন,
কহিল,—"কি হেতু তব আগমন? কেন এত ব্যাকুলিত?"

ইন্দ্রের মুখে নাহি সরে ভাষা, রহে সে অচঞ্চল,
নিদারুণ বাণী জানাতে ঋষিরে কাঁপে অন্তর-তল।
দেখি' দেবরাজে বাক্যবিহীন, দধীচি আবার ধ্যানে হ'ল লীন,
অন্তর মাঝে দিবালোক সম হ'ল সব উজ্জ্বল!

স্নেহে সম্ভাষি' কহে তপোধন,—"বুঝিয়াছি দেবরাজ,
তব আগমনে ধন্য হইল মোর আশ্রম আজ !
দেবতার লাগি' দিব এ জীবন, ইচ্ছা তোমার করিব সাধন,
আমার সকাশে কহিতে এ বাণী, কি তব শংকা-লাজ ?

"তুচ্ছ এ তনু, তুচ্ছ জীবন, মিছা মায়া তা'র তরে,
পরহিতার্থে যদি যায় প্রাণ, দিব আমি অকাতরে !"
কহিল ইন্দ্র ঋষি-পদ চুমি', "ত্রিভুবন মাঝে ত্যাগ-বীর তুমি,
এ কীর্তি তব র'বে উজ্জ্বল অক্ষয় অক্ষরে !"

ধ্যানে পুনরায় বসিলেন ঋষি সুস্থির করি' মন,
ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদি' প্রাণবায়ু হইল নির্গমন।
শিষ্য যতেক হইল আকুল, আশ্রয়হারা যেন তরুমূল,
বিয়োগ-ব্যথায় কেঁদে কেঁদে ওঠে শান্ত সে তপোবন !

* * *

অজেয় বৃত্রে করিতে নিধন দধীচির পঞ্জরে,
বিশ্বকর্মা রচিল বজ্র অতি সুনিপুণ করে।
দেবতার মাঝে প'ড়ে গেল সাড়া, সাজ-সাজ-রবে বাজিল নাকাড়া,
গর্জি' উঠিল ভেরী-দুন্দুভি মেঘ-মন্দ্রিত-স্বরে !

দেবতা-অসুরে মহা সমারোহে বাধিল আবার রণ,
মহা হুংকারে উদ্বেল নভ, কম্পিত ত্রিভুবন !
ভরি' দিগ্‌দেশ বিষ-নিঃশ্বাসে, রোষে আক্রোশে অসুরেরা আসে,
দেবতারা ছুটে মহা উল্লাসে করিয়া বিজয়-পণ !

মেঘের আড়ালে বজ্র হস্তে দাঁড়ালো পুরন্দর,
সহস্র আঁখি ঝলকি' উঠিল—উজলি' দিগন্তর !
দেখি সে দৃশ্য অতি বিভীষণ, বৃত্রাসুরের স্পন্দিত মন,
যেন কি শংকা মহা বিভীষিকা ছেয়ে গেল অন্তর !

অমোঘ বজ্র হানিল ইন্দ্র লক্ষ্যি' অসুর-রাজে,
আছাড়ি' পড়িল বৃত্রের দেহ রণস্থলের মাঝে।
ত্রিভুবনে ওঠে দধীচির জয়, দেবতারা পুন হ'ল নির্ভয়,
রাজাসনে পুন বসিল ইন্দ্র স্বর্গ-অধীশ-সাজে !

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সামঞ্জস্য

স্বামী কৃষ্ণাত্মানন্দ

তত্ত্বদর্শী ঋষিমুনিগণের উপলব্ধ উচ্চ ভাব বা তত্ত্বসকল যেরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ব্যতীত সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না, সেইরূপ সত্ত্বগুণঘন ভগবান রামকৃষ্ণদেবের উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাব এবং উপদেশসমূহও স্বামী বিবেকানন্দের জীবন এবং উপদেশরূপ প্রাঞ্জল ব্যাখ্যার সাহায্য ব্যতীত বুঝিতে পারা কঠিন। পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজী (মহাপুরুষ মহারাজ) বলিতেন,—"ঠাকুর যেন সূত্র, স্বামিজী তাহার ব্যাখ্যা",—অর্থাৎ ঠাকুরের জীবনকে যদি দর্শনাদি শাস্ত্রের সূত্রস্থানীয় মনে করা যায়, তবে স্বামিজীকে বুঝিতে হইবে ঐ সূত্রসমূহের ভাষ্য বা ব্যাখ্যাস্বরূপ। আমরা দেখিতে পাই যে, অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশাদি পাঠান্তে স্বামিজীর গ্রন্থাবলী পড়িতে তাঁহাদের উপদেশ-সমূহে আপাতত বিরুদ্ধ ভাবপূর্ণ কথাসমূহ দেখিতে পান এবং ঐ সকল কথার পরিষ্কার মীমাংসা করিতে না পারিয়া অশান্তি ভোগ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কালীঘাটে যাইয়া আগে যো সো করে কালী দর্শন করে নাও, তারপর যত ইচ্ছা পারতো দান ধ্যান কর, মজা দেখে বেড়াও ক্ষতি নাই। অপর পক্ষে স্বামিজী বলিতেছেন,—আর্ত, অনাথ, দরিদ্র, মূর্খ, রুগ্ন নারায়ণরূপী ইহাদের সেবা কর; গ্রামে গ্রামে যাইয়া অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষা দান কর; ইহাদের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে সহায়তা কর, জীবরূপী শিবের সেবা কর—ইত্যাদি।

এখন প্রশ্ন এই—কালীদর্শন করারূপ ঈশ্বরদর্শন বা জ্ঞানলাভ আগে অথবা দান-ধ্যান করারূপ স্বামিজী-কথিত নিঃস্বার্থ পরোপকার আগে করিতে হইবে। পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ এবং তাঁহার অন্যান্য গুরুভ্রাতৃগণের মতে কিন্তু দুইটিই যথার্থ এবং অবিরোধী ভাব। তাঁহারা বলেন—একটি উদ্দেশ্য, অপরটি উপায়। ঈশ্বরদর্শনের যোগ্যতা অর্জন না করিয়া কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর করিলেই কি আর ঈশ্বর দর্শন করা যায়? অপরদিকে শরীর মন ঈশ্বরতত্ত্ব ধারণা করিবার উপযুক্ত হইলে কি আর কেহ তাঁহার দর্শন হইতে বঞ্চিত হন? সুতরাং স্বামিজী-বর্ণিত নিঃস্বার্থ সেবা বা পরোপকার করারূপ দান-ধ্যান—যাহা কর্মযোগ বলিয়া খ্যাত, যাহার অনুষ্ঠানে চিত্তের মলিনতা, ক্ষুদ্রতা নষ্ট হইয়া চিত্ত ক্রমশ নির্মল ও উদার হইয়া ঈশ্বর-বস্তুরূপ উচ্চতত্ত্ব ধারণা করিবার সামর্থ্য লাভ করে, তাহা অবশ্যই পূর্বে অনুষ্ঠেয়।

স্বামিজী ঠাকুরের ভাবসমূহ শাস্ত্রযুক্তিদ্বারা প্রাঞ্জল করিয়া জগতের নিকট প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তাই তাঁহার উক্তিসকল পৃথিবীর এক-প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ধ্বনিত হইয়া দিন দিনই শ্রেষ্ঠ মনীষিবৃন্দের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে।

স্বামিজী-প্রদর্শিত নিষ্কাম কর্মযোগরূপ সাধন-পথ যদিও সম্পূর্ণ নূতন নয়, তথাপি উহা নূতনই বলা যাইতে পারে, কেন না, জীবনের প্রতিকার্যটিই—যে কোন ব্যক্তির, যে কোন অবস্থায় নিষ্কামভাবে করিবার যে কৌশল তিনি নরনারায়ণ সেবা বা শিবজ্ঞানে জীবসেবা করারূপ অপূর্ব শব্দসাহায্যে প্রচার করিয়াছেন তাহা ইতিপূর্বে আর কখনও কেহ বলেন নাই। এই নিঃস্বার্থ পরোপকার বা সেবাদ্বারা ব্যক্তিগত ক্ষুদ্রত্ব, অহঙ্কার, অভিমানাদি-রূপ রজঃ ও তমোগুণপ্রসূত আধ্যাত্মিক অনুভূতি-লাভের বিঘ্নসমূহ অপেক্ষাকৃত সহজে দূর করিয়া ঈশ্বরদর্শনের পথে অগ্রসর হওয়া যায়। অবশ্য

ইহাতেও নির্মমভাবে নিজের ক্ষুদ্র আমিত্ব, শারীরিক বা মানসিক সুখভোগের বাসনা, দ্বেষ, হিংসা, লোভ, মোহ, মমতাদি সমূলে ত্যাগ করিতে হয়। ইহাতেও সদা সচেতন না থাকিলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার যথেষ্টই ভয় বা সম্ভাবনা থাকে। স্বার্থদুষ্ট মন কর্মযোগের নামে যাহা কিছু করে সকলই ভগবানের সেবা বা নিষ্কামভাবে করিতেছি, এই অছিলায় নিজ স্বার্থ, নাম, যশ, ভোগাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। এইরূপ প্রবঞ্চনা-কালে সাধক বুঝিতে পারে না যে, সে নিজেই নিজেকে ঠকাইতেছে। প্রবল আসক্তিবশতঃ মনের এইরূপ প্রবঞ্চনা করিবার স্বভাব সকল সাধনপথেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভক্তিযোগী যিনি তিনিও যদি নিজ অন্তঃকরণের সুপ্ত ভোগবাসনা-সমূহের প্রতি অবহিত না থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রতারিত হইতে হয়। "স্বামী তুরীয়ানন্দের পত্র" পাঠে দেখিতে পাই তিনি জনৈক ভক্তকে লিখিতেছেন—"* * * তবে তাঁর আনন্দে আনন্দ সেবার এই ভাবটী ভুল না হইলেই মঙ্গল, কিন্তু প্রায় হইয়া পড়ে ঠিক বিপরীত। প্রভুর সেবা না হইয়া আত্মসেবাই হইয়া পড়ে। এইটাই সেবাধর্মের এক মহা অনর্থকর পরিণাম। খুব হুঁশিয়ার, খুব সমনস্ক, প্রার্থনাপরায়ণ, বৈরাগ্যবান হইলে তবে ইহা হইতে রক্ষা। অপরিপক্ব অবস্থায় সকল ধর্মই চ্যুতিভয়-যুক্ত। ভগবানে প্রেম গাঢ় হইলে আর কোনও ভয় থাকে না। কিন্তু সে প্রগাঢ় ভাব স্বার্থসম্বন্ধরহিত না হইলে ত হইবার উপায় নাই। যে দিক দিয়েই যাও, অহংভাব, স্বার্থ, স্বাত্মভোগেচ্ছা দূর না হইলে কোন ধর্মেরই সম্পূর্ণ স্ফূর্তি হয় না।"—ইত্যাদি। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্তিপথও যে নিষ্কণ্টক তাহা বলা চলে না। সেইরূপ জ্ঞানপথ বিচারমার্গেও সাধক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, বৈরাগ্য প্রভৃতি অন্তরঙ্গ সাধনসকলের অনুশীলনে যত্নবান না হইয়া কেবল চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্-আদি দীর্ঘ ধ্বনি-সহায়ে নিজেকে সাধকাগ্রণী বলিয়া প্রচার করিতে ব্যস্ত হন। অপরদিকে দৈহিক ও মানসিক অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়সকলেও আসক্ত থাকিয়া কষ্ট পাইয়া থাকেন। সুতরাং সাধকমাত্রকেই সদা তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি-সহায়ে নিজ নিজ মনবুদ্ধিকে অভীষ্টপথে পরিচালিত করিতে হয়। আর ইহা দুই চার মাস কি বৎসর, এমন কি এক জীবনেরও কাজ নয়। এইরূপ জানিয়া ধৈর্যের সহিত আপন গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে হইবে।

স্বামিজী তাঁহার কর্মযোগের বক্তৃতায় বলিয়াছেন, "আমাদের সম্মুখে যেরূপ কর্ম আসিবে, তাহাই করিতে হইবে, এবং প্রত্যহ আমাদিগকে ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া নিঃস্বার্থপরতা শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদিগকে কর্ম করিতে হইবে এবং ঐ কর্মের পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে তাহা দেখিতে হইবে। তাহা হইলে প্রায় অধিকাংশ স্থলেই দেখিতে পাইব, প্রথম প্রথম আমাদের অভিসন্ধি স্বার্থপূর্ণই থাকে। কিন্তু অধ্যবসায়-প্রভাবে ক্রমশঃ এই স্বার্থপরতা কমিয়া যাইবে। অবশেষে এমন সময় আসিবে যখন আমরা মধ্যে মধ্যে নিঃস্বার্থ কর্ম করিতে সমর্থ হইব। তখন আমাদের আশা হইবে যে জীবনের পথে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে হইতে কোন না কোন সময়ে এমন দিন আসিবে যখন আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইতে পারিব। আর যে মুহূর্তে আমরা ইহাতে সক্ষম হইব সেই মুহূর্তে আমাদের শক্তি এক কেন্দ্রীভূত হইবে এবং আমাদের অভ্যন্তরস্থ জ্ঞান প্রকাশিত হইবে।"

কর্মযোগের বিরুদ্ধে পূর্বোক্ত প্রকারে রজো-গুণোদ্দীপক, মনশ্চাঞ্চল্যবৃদ্ধিকর প্রভৃতি দোষ দেখাইয়া যদি কেহ বলেন যে, কর্মযোগের চেয়ে ভক্তিযোগ সহজ পথ—ইহা স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিয়াছেন, যথা—'কলিযুগের পক্ষে নারদীয় ভক্তি।' আবার তাহা অপেক্ষাও কেবল

নামজপরূপ সাধন আরও সহজ, একমাত্র নামজপ দ্বারাই সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে,—যথা "জপাৎ সিদ্ধিঃ, জপাৎ সিদ্ধিঃ; জপাৎ সিদ্ধির্ন সংশয়ঃ" এইরূপ মহাপুরুষ-বচন এবং ঐরূপ উদাহরণও রহিয়াছে—তদুত্তরে পূর্বে যাহা উক্ত হইয়াছে তাহা ছাড়া; স্বামিজী "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য" গ্রন্থে যাহা বলিয়াছেন তাহাও স্মরণ করিলে এ বিষয়ে তাঁহার কি সিদ্ধান্ত তাহা পরিষ্কাররূপে বোঝা যাইবে। তিনি বলিতেছেন,—" 'ওঁকারধ্যানে সর্বার্থসিদ্ধি', 'হরিনামে সর্বপাপনাশ' 'শরণাগতের সর্বাপ্তি' এ সমস্ত শাস্ত্রবাক্য সাধুবাক্য অবশ্য সত্য; কিন্তু দেখতে পাচ্ছো যে লাখো লোক ওঁকার জপে মরছে, হরিনামে মাতোয়ারা হচ্ছে, দিনরাত প্রভু যা করেন বলছে এবং পাচ্ছে ঘোড়ার ডিম। তার মানে বুঝতে হবে যে—কার জপ যথার্থ হয়? কার মুখে হরিনাম বজ্রবৎ অমোঘ? কে শরণ যথার্থ নিতে পারে? যার কর্ম করে চিত্তশুদ্ধি হয়েছে—অর্থাৎ যে ধার্মিক"—ইত্যাদি।

সাধনার ক্রম-অনুযায়ী রজোগুণের উদ্দীপনার দ্বারা তমকে এবং পরে সত্ত্বগুণের অনুশীলন দ্বারা রজোভাবকেও অতিক্রম করিয়া সবশেষে গুণাতীত অবস্থা লাভ করিতে হয়। সাধারণতঃ আমাদের মনে রজঃ এবং তমোগুণেরই প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। আর ইহার মধ্যে যিনি পূর্বজন্মের অশেষ সুকৃতিবশতঃ এবং ঈশ্বরকৃপায় প্রথমোক্ত গুণ দুইটির সীমা অতিক্রম করিয়া বিমল সত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছেন, তিনি আমাদের সকলের নমস্য। কিন্তু সাধকজীবনে পা বাড়াইয়াই যদি আমরা মনে করি যে, আমাদের মধ্যে সত্ত্বগুণ উদ্দীপিত হইয়াছে, তবে তাহাও স্বামিজীর উক্তি-সহায়ে পরীক্ষা করিয়া নেওয়া উচিত। স্বামিজী বলিতেছেন,—"সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে নিষ্ক্রিয় জড় হয়। এখন বাইরে থেকে, এই সত্ত্বপ্রধান হয়েছে, কি তমঃপ্রধান হয়েছে, কি করে বুঝি বল? সুখদুঃখের পার ক্রিয়াহীন শান্তরূপ সত্ত্ব-অবস্থায় আমরা আছি, কি প্রাণহীন জড়প্রায় শক্তির অভাবে ক্রিয়াহীন, মহাতামসিক অবস্থায় পড়ে, চুপ করে ধীরে ধীরে পচে যাচ্ছি এ কথার জবাব দাও,—নিজের মনকে জিজ্ঞাসা কর। জবাব কি আর দিতে হয়,—'ফলেন পরিচীয়তে।' সত্ত্ব-প্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়; কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়, সে শান্তি মহাবীর্যের পিতা। সে মহাপুরুষের আর আমাদের মত হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না, তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান ব্রাহ্মণ, সর্বলোক-পূজ্য—।" ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে সত্ত্বগুণভ্রমে তমোগুণের আবরণ-শক্তিদ্বারা কি ভাবে আমাদের প্রতারিত হইবার ভয় আছে—স্বামিজী তাহাও যেরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। তিনি উদ্বোধন পত্রিকার প্রস্তাবনায় লিখিয়াছেন—"দেখিতেছ না যে, সত্ত্বগুণের ধুয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশ তমোগুণসমুদ্রে ডুবিয়া গেল? যেথায় মহাজড়বুদ্ধি পরাবিদ্যানুরাগের ছলনায় নিজ মূর্খতা আচ্ছাদিত করিতে চাহে, যেথায় জন্মালস বৈরাগ্যের আবরণ নিজের অকর্মণ্যতার উপর নিক্ষেপ করিতে চাহে, যেথায় ক্রূরকর্মী তপস্যাদির ভান করিয়া নিষ্ঠুরতাকেও ধর্ম করিয়া তুলে, যেথায় নিজের সামর্থ্যহীনতার উপর দৃষ্টি কাহারও নাই—কেবল অপরের উপর সমস্ত দোষনিক্ষেপ, বিদ্যা কেবল কতিপয় পুস্তক কণ্ঠস্থে, প্রতিভা চর্বিতচর্বণে এবং সর্বোপরি গৌরব কেবল পিতৃপুরুষের নামকীর্তনে, সে দেশ তমোগুণে দিন দিন ডুবিতেছে, তাহার কি প্রমাণান্তর চাই?

"অতএব সত্ত্বগুণ এখনও বহুদূর। আমাদের

মধ্যে যাঁহারা পরমহংস পদবীতে উপস্থিত হইবার যোগ্য নহেন বা ভবিষ্যতে আশা রাখেন, তাঁহাদের পক্ষে রজোগুণের আবির্ভাবই পরম কল্যাণ। রজোগুণের মধ্য দিয়া না যাইলে কি সত্ত্বে উপনীত হওয়া যায়? ভোগ শেষ না হইলে যোগ কি করিবে? বিরাগ না হইলে ত্যাগ কোথা হইতে আসিবে?"—ইত্যাদি।

সুতরাং আমাদিগকে সাবধানতার সহিত নিজ নিজ মনকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে। স্বামিজীর নির্দেশমত না চলিলে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হইবার ভয় চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। অনেক সময় আমরা নিজেদের মানসিক ঝোঁকের বশবর্তী হইয়া কর্তব্যাকর্তব্যবোধ হারাইয়া ফেলি, ফলে নিজের এবং অপরের অনুশোচনার বিষয় হইয়া পড়ি। সুতরাং আমাদিগকে সর্বদাই অন্তর্দৃষ্টি-সম্পন্ন হইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

তমোগুণ-প্রভাবে আত্মপ্রবঞ্চনা করিয়া মানুষ কি ভাবে নিজের দ্বারাই নিজে প্রতারিত হয়, স্বামিজী-লিখিত 'ভাববার কথা'-শীর্ষক উদাহরণ-গুলিতে তাহা বিশেষ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাইয়াছে। এখানে তাহারও দু' একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যাইতেছে। স্বামিজী বলিয়াছেন, যথা—"ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—তুমি আমার শরণ লও, আর কিছু করবার দরকার নাই, আমি তোমায় উদ্ধার করিব। ভোলাচাঁদ তাই লোকের কাছে শুনে মহাখুসী; থেকে থেকে বিকট চীৎকার—আমি প্রভুর শরণাগত, আমার আবার ভয় কি? আমার কি আর কিছু করতে হবে? ভোলাচাঁদের ধারণা—ঐ কথাগুলি খুব বিটকেল আওয়াজে বারম্বার বল্‌তে পার্‌লেই যথেষ্ট ভক্তি হয়, আবার তার উপর মাঝে মাঝে পূর্বোক্ত স্বরে জানানও আছে যে, তিনি সদাই প্রভুর জন্য প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত। এ ভক্তির জোরে যদি প্রভু স্বয়ং না বাঁধা পড়েন, তবে সবই মিথ্যা। পার্শ্বচর দু'চারটা আহাম্মকও তাই ঠাওরায়। কিন্তু ভোলাচাঁদ প্রভুর জন্য একটিও দুষ্টামি ছাড়তে প্রস্তুত নন। বলি, ঠাকুরজি কি এমনই আহাম্মক? এতে যে আমরাই ভুলি নি!!" * * *

"ভোলাপুরী বেজায় বেদান্তী—সকল কথাতেই তাঁর ব্রহ্মত্ব সম্বন্ধে পরিচয়টুকু দেওয়া আছে। ভোলাপুরীর চারিদিকে যদি লোকগুলো অন্নাভাবে হাহাকার করে—তাঁকে স্পর্শও করে না; তিনি সুখদুঃখের অসারতা বুঝিয়ে দেন। যদি রোগে শোকে অনাহারে লোকগুলো ম'রে ঢিপি হয়ে যায়, তাতেই বা তার কি? তিনি অমনি আত্মার অবিনশ্বরত্ব চিন্তা করেন। তাঁর সামনে বলবান দুর্বলকে যদি মেরেও ফেলে, ভোলাপুরী—'আত্মা মরেনও না, মারেনও না' এই শ্রুতিবাক্যের গভীর অর্থসাগরে ডুবে যান। কোনও প্রকার কর্ম করতে ভোলাপুরী বড়ই নারাজ। পেড়াপীড়ি করলে জবাব দেন যে, পূর্বজন্মে ওসব সেরে এসেছেন। এক জায়গায় ঘা পড়লে কিন্তু ভোলা-পুরীর আত্মৈক্যানুভূতির ঘোর ব্যাঘাত হয়,—যখন তাঁর ভিক্ষার পরিপাটিতে কিঞ্চিৎ গোল হয় বা গৃহস্থ তাঁর আকাঙ্ক্ষানুযায়ী পূজা দিতে নারাজ হন, তখন পুরীজির মতে গৃহস্থের মত ঘৃণ্য জীব জগতে আর কেহই থাকে না এবং যে গ্রাম তাঁহার সমুচিত পূজা দিলে না, সে গ্রাম যে কেন মুহূর্তমাত্রও ধরণীর ভার বৃদ্ধি করে, এই ভাবিয়া তিনি আকুল হন।

"ইনিও ঠাকুরজিকে আমাদের চেয়ে আহাম্মক ঠাওরেছেন।" * * * *

"বলি, রামচরণ! তুমি লেখাপড়া শিখলে না, ব্যবসা-বাণিজ্যেরও সঙ্গতি নাই। শারীরিক শ্রমও তোমা দ্বারা সম্ভব নহে, তার উপর নেশা ভাঙ্ এবং দুষ্টামিগুলাও ছাড়তে পার না, কি করে জীবিকা কর বল দেখি? রামচরণ—'সে সোজা কথা মশায়—আমি সকলকে উপদেশ করি।' রামচরণ ঠাকুরজিকে কি ঠাওরেছেন?" ইত্যাদি।

উপরে উক্ত উদাহরণগুলি দ্বারা স্বামিজী আমাদিগকে আত্মপ্রবঞ্চনা হইতে সতত সাবধান থাকিতে বলিতেছেন। ব্যক্তিগত স্বার্থসুখ ত্যাগ করিবার ভাব যাঁহার হৃদয়ে যত অধিক বিকাশ প্রাপ্ত হইবে, তিনি ততই ঈশ্বরানুভূতির বা জ্ঞানলাভের নিকটবর্তী হইবেন। ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

জ্ঞান, কর্ম, যোগ ও ভক্তির সমন্বয়বার্তা-প্রচারকারী, হৃদয়বান, আশ্রিতজনপালক, অশেষ-লোককল্যাণকারী স্বামিজীর চরণে এই প্রার্থনা—তিনি আমাদিগকে সর্বদা অসদ্ভাবনা—বিপরীত ভাবনা হইতে রক্ষা করুন। আমাদিগকে আদর্শাভিমুখে অগ্রসর হইতে আশীর্বাদ করুন।

উদ্বোধন

শ্রীচিত্তরঞ্জন চক্রবর্তী

মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
　ক্ষমতার মদমত্ততা রে,
ব্যষ্টি-জীবন ছাড়ো—ছাড়ো দলগতপ্রাণ,
　ব্যক্তিস্বার্থচিন্তিতারে।
জগতে যেথা যত হীনজন
করে কি রে জয় সংগণমন?
আজ নয় কাল তার নয় জয় হয় ক্ষয়,
　দেখাও অকুল হৃত্ততারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
　ক্ষমতার মদমত্ততারে।

শত হোক্ পিচ্ছিল হও পথে আগুয়ান
　তোমরাই তোমাদের লাগিয়া,
হও করমেতে বীর মুছি' সবে আঁখিনীর
　শত শুভ কল্যাণ মাগিয়া।
দুস্তর দিনে বাধা অনিবার,
ক্ষতি নাই করো গতি দুর্বার,
জীবনের যাত্রায় হোক্ নীল অভিযান,
　ধরো মুখে হাসি-হৃষ্টতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
　ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

কভু ক্ষুৎপিপাসার ক্ষুদ-গুঁড়া সঙ্কটে
　নিখিলের বণ্টন মানিও,
তোমাদের পরিচয় যুগে যুগে অক্ষয়,
　তোমরাই তোমাদের জানিও।
সৎপথ, সদাচারী জীবনের
হানি যেন দেখি নাক' তোমাদের,
সাম্য ও মৈত্রীর সন্ধান মিলিবেই
　দূর করো যদি হিংস্রতারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
　ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

ধৈর্যের বন্ধনে শুধু যাও বেঁধে বুক,
　হোক্ মন পর্বতগম্ভীর,
নন্দন-নর্তনে ছন্দিত করো দেশ,
　কোন্দল ছেড়ে হও ধীর-স্থির।
ধ্বংসের কোলাকুলি কেন হায়!
কাজ নাই বোমা সাহসিকতায়,
প্রেম কাছে আগ্নেয় অস্ত্র যে কিছু নয়,
　ধরো গান একতান দো-তারে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
　ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

অনাগত দিন বহু সম্মুখে তোমাদের,
　থাক্ পথে জীবনের ক্লান্তি
দুঃখের মেঘে ঢাকা হসিত হিরণ্ময়
　ছড়াবেই আলোক প্রশান্তি।
দূর হবে যত ভয়-শঙ্কা,
বাজিবেই শুভ জয়ডঙ্কা,
মিছিলের বন্যায় উদাসীন হ'বে লীন,
　ধনী আর গরীব কি কথা রে,
মিছা কলকোলাহল জনগণ বন্ধুরা,
　ক্ষমতার মদমত্ততা রে!

বেদ-পুরাণসম্মত ভারতেতিহাসের কয়েক পৃষ্ঠা

অধ্যাপক শ্রীগৌরগোবিন্দ গুপ্ত, এম্-এ

রামায়ণে আর্যসভ্যতা-বিস্তারের একটি সুচিন্তিত পন্থা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দণ্ডকারণ্য থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম ভারত ও লঙ্কাদেশের অধীশ্বর বৈদিক সভ্যতায় প্রভাবান্বিত অনার্য রাবণ-রাজ—যাঁর অধিকার দশদিকে বিস্তৃত থাকায় তিনি দশগ্রীব রাবণ নামে খ্যাত ছিলেন, তখন উত্তর ভারতে আর্যাধিকারের প্রতি লোলুপ দৃষ্টি বিস্তার করে তাদের শান্তিনাশের জন্য চেষ্টিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও দেখা যায় অধ্যাত্মশক্তিসম্পন্ন ঋষিগণ সুদূর দণ্ডকারণ্য পর্যন্ত—যেখানে বহুদিন ধরে ইক্ষ্বাকুদের রাজ্য ছিল—বনে-জঙ্গলে পাহাড়ে-পর্বতে তাঁদের ধ্যান-ধারণার উপযোগী আশ্রম সকল স্থাপন করে অনার্যগণের মধ্যে নৈতিক প্রভাবের দ্বারা ধীরে ধীরে আর্যসভ্যতার বিস্তার করে চলেছেন। অত্রি-ভরদ্বাজ-অগস্ত্যাদি ঋষিগণ এই সভ্যতার শান্তোজ্জ্বল দীপ্তি বিস্তার করে ও সারা ভারতময় তপোবন-সৃজনে এতই দৃঢ়নিষ্ঠ যে, এখন পর্যন্ত তাঁরা যেন একার্য হতে বিরত হন নি—পুরাণাদিতে এইরূপ বর্ণিত। অগস্ত্য ঋষিই এই কার্যে অগ্রণী হয়ে আজ পর্যন্ত প্রত্যাবর্তন করেন নি এইরূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত (একেই বলা হয় অগস্ত্যযাত্রা)। এরূপ সভ্যতাবিস্তারের আদর্শ জগতের ইতিহাসে আর দেখা যায় না। তাঁদের এই অপূর্ব কীর্তির ফলেই সমগ্র ভারত আজ পর্যন্ত এক ধর্ম ও সমাজ-বিধানে বদ্ধ। শান্তভাবে এইরূপ সভ্যতা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে অপরদিকে কেবলমাত্র প্রয়োজনবোধে ও ঋষিগণের কল্যাণময় পবিত্রজীবন-যাপনের সাহায্যকল্পে ইক্ষ্বাকুগণ তাঁদের রাষ্ট্রীয় প্রভাবও বিস্তার করতে থাকেন। রামায়ণে এই সত্যই সুন্দরভাবে উদ্‌ঘাটিত এবং এরই পরিণতি-স্বরূপ রাম-রাবণের যুদ্ধ সংঘটিত হয় ও অনার্য-রাক্ষস-নিষাদ-বানর জাতিগণের পরিচয় বিহিত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে এইরূপ বিশাল ভারতীয় আর্যসভ্যতার সংস্থাপক-রূপে শ্রীরামচন্দ্র যুগ-যুগান্তর ধরে সম্মানিত হলেন—তারই সুন্দর চিত্র বাল্মীকি ঐতিহাসিক মহাকাব্য-রূপে রামায়ণে অঙ্কিত করে গেছেন। তাই আজ পর্যন্ত শ্রীরামচন্দ্র সনাতনধর্ম-সংস্থাপকরূপে দেশময় ঈশ্বরের অবতারজ্ঞানে পূজিত। ভগবৎ-নির্দেশেই যেন সূর্যবংশীয় রাজশক্তি-সহায়ে এই মহৎ কার্য সাধিত হয় ও এক নবযুগের আরম্ভ হয়। এর পর ইক্ষ্বাকুগণের আর কোন কীর্তিকলাপের কথা আমরা শুনতে পাই না। শ্রীরামচন্দ্রের শক্তিতে সমগ্র ভারত এইভাবে একত্র হবার ভিত্তিতেই ইক্ষ্বাকুগণের পরে ভরতবংশীয় রাজগণ বেদ-ব্রাহ্মণশাসন আরও সুদৃঢ় করতে সমর্থ হন। ঋগ্বেদের অধিকাংশ মন্ত্রসমষ্টির দ্রষ্টা ভরতরাজবংশীয়-গণের পুরোহিত ঋষিগণই। ভরতবংশীয়গণের অধিকার-কালেই তাঁদের বিশাল রাজ্যের এক প্রান্ত হতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত বৈদিক যজ্ঞ-ধূমে পবিত্রীকৃত ও সামগানে মুখরিত। রাজন্য-বর্গের সুশাসনেও শান্তির সুচ্ছায়ায় ব্রাহ্মণগণের যাগ-যজ্ঞাদি ধর্ম-কর্মের সহায়কল্পে শব্দশাস্ত্র-ছন্দঃ-শাস্ত্র-গণিত ও জ্যোতিষাদি শাস্ত্রের উদ্ভব ও দিন দিন নবনবরূপে বিকাশ—সুশৃঙ্খলার সুযোগে বৈশ্যগণের কৃষি বাণিজ্যাদির প্রসারে প্রজাবৃন্দের দিবারাত্র ধর্মাচরণে আত্মনিয়োগে সমগ্র দেশ রাজাদের উত্থান-পতন ও রাজ্য-সকলের ভাঙ্গাগড়ার মধ্যেও ধর্ম-ভাবে প্লাবিত। এই ধর্মভাবই শ্রীরামচন্দ্রের রামরাজ্য-স্থাপনের পর থেকে সারা ভারতে বিরাজমান।

ইক্ষ্বাকুগণের পর ভরতবংশীয়গণের অধীনে পৌরব রাজ্য দিন দিন সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে ও ঋষি বিশ্বামিত্র-ভরদ্বাজাদির পৌরোহিত্য ও মন্ত্রকুশলতার ফলে সমগ্র গাঙ্গ্য-যামুন প্রদেশ তাঁদের অধীনে আসে। ভরতের অধস্তন পঞ্চম পুরুষ হস্তী হস্তিনাপুরে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেন ও তাঁহার দুই পুত্র অজমীঢ় ও দ্বিমীঢ় কর্তৃক দুইটি পৃথক রাজ্য স্থাপিত হয়। অজমীঢ় পৈতৃক রাজ্য শাসন করতে থাকেন। দ্বিমীঢ় পূর্বযুগের পাঞ্চাল প্রদেশের এক প্রান্ত নিজের অধিকারে আনেন। এখন থেকে প্রায় ১০০০ হাজার বৎসর পর্যন্ত পৌরবগণই মূলতঃ উত্তর ভারতের পরাক্রমী রাজশক্তিরূপে বিরাজিত। তাঁদের সময় থেকেই বেদব্রাহ্মণ-শাসনে সনাতন আর্যধর্ম তার সংহত রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে ও বেদানুশীলনের সর্বাঙ্গীণ চেষ্টায় বৈদিক সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। বর্তমানে আমরা বেদ-ব্রাহ্মণ-আরণ্যক-উপনিষদাদি শ্রুতিসাহিত্যের যে সকল বিস্তৃত রূপ দেখতে পাই, সে সকলই এই ভরতবংশীয়গণের পৃষ্ঠপোষকতায় হয়। বর্ণাশ্রম-ধর্মের অবনতিস্বরূপ যে জাতি-ভেদবিচার আরম্ভ হয় তার বীজও ব্রাহ্মণদের অত্যধিক সামাজিক আধিপত্যের ফলে রোপিত হয়। কিন্তু প্রাচীন বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র বিরোধ ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়-বিরোধরূপে থেকে যায়। এর ফলেই পৌরবরাজগণের প্রতাপের অবসানে ভারতে ধীরে ধীরে বেদোত্তর যুগে ধর্মে ও সমাজে নব নব সৃজনশক্তির বিকাশ ও অত্যাশ্চর্য বৈপ্লবিক উন্নতি সাধিত হয়।

ইক্ষ্বাকুগণের গৌরবসূর্য প্রোজ্জ্বল থাকার কাল থেকেই আমরা প্রথমতঃ ভরত-বংশোদ্ভূত পাঞ্চাল রাজগণের সমৃদ্ধি দেখতে পাই ও এই সময়কার রাজেন্দ্রবর্গের অনেক নামই আমরা বেদে পাই। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডল থেকে ষষ্ঠ মণ্ডল পর্যন্ত মন্ত্রসমূহের মধ্যে ভরতবংশীয় রাজগণের ও তাঁদের পুরোহিত-গোষ্ঠী ঋষিদের উল্লেখই সর্বত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়। এমনও মনে হয় যে, এঁরাই ভারতীয় সভ্যতার স্রষ্টা।

শ্রীরামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে রাজা দশরথ কর্তৃক যে সকল রাজা নিমন্ত্রিত হন, তাঁদের মধ্যে উত্তর পাঞ্চালরাজ দিবোদাস বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহার পূর্বতন চতুর্থ পুরুষ মুদ্গলও বেদে রাজা ও ঋষিরূপে প্রখ্যাত। ইনিই মৌদ্গল্য-গোত্রের প্রতিষ্ঠাতা। এঁর স্ত্রীকে বীর রমণীরূপে স্বামীর পার্শ্বে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা দেখতে পাই। দিবোদাসের ভগিনীই অহল্যা-নামে পুরাণে খ্যাতা। দিবোদাসের প্রায় সমসাময়িক রাজা সৃঞ্জয় পুরাণাদিতে দানবত্তা-গুণে বিশেষভাবে সম্মানিত। তাঁর পৌত্র সুদাসকে দিগ্বিজয়ী রাজারূপে দশজন আর্য-অনার্য মিশ্রিত রাজগণের বিরাট শত্রুসৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে বেদোল্লিখিত 'দাশরাজ্ঞ' যুদ্ধে লিপ্ত দেখতে পাই। পৌরবরাজ 'সম্বরণের' রাজ্য অধিকার করার জন্য এই ঘটনা ঘটে। ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডলের ১৮ সূক্তে এই যুদ্ধের বর্ণনায় আমরা জানতে পারি ১০ম বশিষ্ঠ (শতযাতু বশিষ্ঠ) পৌরবরাজ সম্বরণের পুরোহিতরূপে বর্তমান থাকলেও ৪র্থ বিশ্বামিত্রই তাঁর উৎসাহদাতারূপেও পৌরবরাজ সম্বরণ, যাদবরাজ, আনবরাজ, দ্রুহ্যুরাজ, তুর্বসুরাজ ও মৎস্যরাজ এবং অনার্যপক্নাসঃ, ভলানসঃ ভণং-তালিনাসঃ, বিষাণিনঃ, শিবাসঃ প্রভৃতি (যাঁরা বধ্রিবাচঃ বলে বর্ণিত) অনার্যজাতিসমূহ তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে বর্তমান। এই যুদ্ধে সুদাস জয়ী হন এবং বিশেষ করে পৌরবরাজ সম্বরণ স্বরাজ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে সিন্ধুরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনা আর্য-অনার্য-মিশ্রণে এক বিশেষ নিদর্শন-রূপে মনে করা যেতে পারে। সুদাসের পুত্র 'সোমক'ও রাজচক্রবর্তিরূপে এবং দানবীর ধর্মরাজ-রূপে পুরাণে সম্মানিত।

এই সময়ে বশিষ্ঠ-বংশীয়গণ ভরতবংশীয়

রাজগণের পুরোহিত হওয়ায় আমরা বুঝতে পারি যে, ইক্ষ্বাকুরাজগণ আর সেরূপ পরাক্রান্ত ছিলেন না ও বশিষ্ঠসন্তানগণ ভরতবংশীয়গণ কর্তৃক আহূত ও পুরোহিত-রূপে সমাদৃত হয়ে ছিলেন। এই কারণেই বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের পুরাতন কলহ-বিদ্বেষাদি আবার উদ্দীপিত হয়। ইক্ষ্বাকুরাজ 'সৌদাস কল্মাষপাদে'র সময়েই বিশ্বামিত্রবংশীয় একজন বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের অনুপস্থিতি-কালে ইক্ষ্বাকুপুরোহিত-রূপে আমন্ত্রিত হয়ে এই কলহ পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। তিনি আভিচারিক মন্ত্রাদি-প্রয়োগে বশিষ্ঠের শত পুত্রের নাশ সাধন করেন। বশিষ্ঠ-বংশীয়গণ এই অপমান ও অত্যাচার সহজে ভুলতে পারেন নি। তা'ছাড়া আমরা জানতে পাই যে, বশিষ্ঠ স্বয়ং তাঁকে ক্ষমা করেছিলেন। এই মহৎ ক্ষমার আদর্শের জন্য বশিষ্ঠ আবহমান কাল ভারতে পূজিত। কিন্তু ভরতবংশীয় সুদাসরাজের সহিত কিরূপ ষড়যন্ত্র করে বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠের স্থলে অভিষিক্ত হন তাহা ঠিক বোধগম্য হয় না। আমরা দেখে আশ্চর্য বোধ করি যে, তৃতীয় মণ্ডলের ৩৩ সূক্তে বিশ্বামিত্রই নিজেকে সুদাসরাজের দাসরাজ্ঞযুদ্ধে জয়ী হবার কারণ বলে উল্লেখ করছেন। আবার ৭ম মণ্ডলের ১৮ সূক্তে বশিষ্ঠই সেই গৌরবের দাবী করছেন। বিশ্বামিত্র যে সুদাস কর্তৃক আদৃত হয়েছিলেন তা' মনু-স্মৃতিতে আমরা দেখতে পাই এবং বশিষ্ঠ সুদাসকে অভিশাপ দিয়ে রাজ্য থেকে চলে যান—তা'ও আমরা এই সঙ্গে জানতে পারি। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বিরোধের ইতিহাসের এইখানেই পরি-সমাপ্তি। সুদাসের পুত্র সোমকের অথবা তাঁর পৌত্রাদির পুরোহিতরূপে বশিষ্ঠবংশীয়দের আর দেখতে পাওয়া যায় না। পাঞ্চালগণের গৌরব-রবি রাজা 'সহদেবে'র সহিত অস্তমিত হয় এবং আমরা দেখতে পাই যে, দৈবশক্তিসম্পন্ন বশিষ্ঠের সাহায্যে সম্বরণ আবার পৌরবরাজ্য অধিকার করেন। সম্বরণের পুত্র কুরুর পরাক্রমে ও সুশাসনে পৌরবরাজ্যের পূর্ব গৌরব আবার ফিরে আসে ও তিনি প্রায় সমগ্র পাঞ্চালরাজ্য নিজের অধীনে আনতে সমর্থ হন। তাঁর বংশীয়গণের নূতন নাম হয় কৌরব। এই থেকেই কুরু-পাঞ্চাল বিদ্বেষ আরম্ভ হয়—যার পরিণতি হয় কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ।

পাঞ্চালরাজ সৃঞ্জয়ের সময়ে বিরাট যাদবরাজ্য 'ভীম সাত্বতে'র চার জন পুত্র—ভজমান, দেববৃধ, অন্ধক ও বৃষ্ণির মধ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। বৃষ্ণি-বংশীয়গণ দ্বারকায় নিজেদের প্রধানদের মধ্যে একজনকে সর্বপ্রধান স্থির করে এক নূতন রাষ্ট্র-বিধান প্রবর্তন করেন।

কুরুর এক বংশধর—বসু উপরিচর মধ্য ভারতে চেদীদেশ ও তাহার দুই পার্শ্বের দেশসমূহ নিয়ে এক নূতন রাজ্য স্থাপন করেন ও তাঁর বিশাল রাজ্য পঞ্চ পুত্রের মধ্যে ভাগ করে দেন। তা থেকেই মগধ—চেদী—কৌশাম্বী—করূষ ও মৎস্য এই কয়টি নূতন খণ্ডরাজ্যের আরম্ভ হয়। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র বৃহদ্রথ গিরিব্রজে রাজধানী স্থাপন করে মগধের রাজা হন। এই সময় থেকে মগধের ক্রমোন্নতি আরম্ভ।

প্রায় ৩৫০ বৎসর পরে কৌরবরাজ প্রতীপ আবার পৌরব-রাজত্বের পূর্বগৌরব ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তাঁর পুত্র শান্তনু পরাক্রান্ত নৃপতি মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি ভিষকৃপ্রবর—প্রজারঞ্জক-রূপে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। শান্তনুপুত্র ভীষ্ম পিতৃসুখের জন্য ভীষণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে অত্যাশ্চর্য ত্যাগ-স্বীকারের জন্য আদর্শত্যাগিরূপে আজ পর্যন্ত ভারতে পূজিত হয়ে আসছেন। ইনি দ্বিতীয় পরাশর ঋষির—যিনি পুরাণ-ইতিহাস-সংকলনের জন্য বিখ্যাত—সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার দ্বারাই সর্বপ্রথম প্রাচীন কালাবধি সংরক্ষিত গাথাসকল পঞ্চবিষয়-সম্বলিতরূপে সংগ্রথিত হয়ে পুরাণ নাম ধারণ করে।

আখ্যানৈশ্চৈব উপাখ্যানৈর্গাথাভিঃ কল্পয়োক্তিভিঃ।
পুরাণসংহিতাঞ্চক্রে পুরাণার্থ-বিশারদঃ॥
সর্গশ্চপ্রতিসর্গশ্চ বংশমন্বন্তরাণি চ।
বংশানুচরিতানি চৈব পুরাণং পঞ্চলক্ষণম্॥

ভীষ্ম আত্মপ্রতিশ্রুতি-অনুসারে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যকে পর পর রাজ্যে অভিষিক্ত করে তাঁদের নামে রাজ্য পরিচালনা করেন। তাঁরা অল্প বয়সে মারা যাওয়ায় বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু ভীষ্ম কর্তৃক পালিত হন। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ হওয়ায় পাণ্ডু রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের একশত পুত্র ও পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র হয়। পাণ্ডুর মৃত্যুর পর ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন পাণ্ডুর পুত্রগণের প্রতি ঈর্ষাপ্রণোদিত হয়ে তাঁদের হত্যার জন্য যৌবনকাল থেকেই সচেষ্ট থাকেন। এই ঈর্ষার বীজ থেকে যে ভ্রাতৃকলহের উদ্ভব হয় তাহাই বিরাট মহীরুহরূপে পরিণত হয় ও সারা ভারতব্যাপী আর্যসমাজকে দুই ভাগে বিভক্ত করে ভীষণ সমরানল প্রজ্বলিত করে। এই যুদ্ধে আর্যাবর্ত মহাশ্মশানে পর্যবসিত হয় এবং তার ভস্মরাশির উপর নূতন ভারতীয় সভ্যতার জন্ম হয়। বহুকালব্যাপী কুরু পাঞ্চাল বিদ্বেষ এই যুদ্ধানলে ইন্ধন সংযোগ করে ও সেইজন্য এই যুদ্ধকে কুরুপাঞ্চাল যুদ্ধও বলা হয়। পাঞ্চালের এক প্রান্তের অধিকারী দ্বিমীঢ়বংশীয় উগ্রায়ুধ উত্তর পাঞ্চাল ও দক্ষিণ পাঞ্চাল জয় করে কৌরব রাজ-প্রতিনিধি ভীষ্মের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। কিন্তু ভীষ্ম তাঁকে পরাস্ত করে দক্ষিণ পাঞ্চাল কৌরবরাজ্যের অধীনে রেখে উত্তর পাঞ্চালের ন্যায্য অধিকারী পৃষতকে তাঁর রাজ্য প্রত্যর্পণ করেন। রাজা পৃষত রাজ্য ফিরে পেলেও পাঞ্চাল-গর্ব খর্ব হওয়াতে কৌশলে কৌরবদের হীনবল করার জন্য সচেষ্ট রইলেন। তাঁর পুত্র দ্রুপদ ধনুর্বিদ্যাবিশারদ ব্রাহ্মণ দ্রোণাচার্যের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে রাজ্যবৃদ্ধি করতে সমর্থ হলেন। তথাপি প্রতিশ্রুতি-মত আচার্যকে রাজ্যাংশ দান না করাতে দ্রোণাচার্য তাঁকে ত্যাগ করে ভীষ্মের অনুরোধে কৌরব-পুত্রদের ক্ষাত্রবিদ্যা শিক্ষার ভার নিলেন ও তাঁদের যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী করে তুললেন। যুদ্ধবিদ্যাদি শিক্ষালাভের পর যুবরাজ যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের নানা রূপ দুষ্ট অভি-সন্ধি জানতে পেরে মাতা ও ভ্রাতাদের নিয়ে দূরে গোপনে বলসঞ্চয় করতে ব্যাপৃত রইলেন। কিছুদিন এই ভাবে কাটাবার পর দ্রুপদরাজ-কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর ঘোষিত হওয়াতে সেইখানে পঞ্চপাণ্ডব গমন করলেন ও দ্রৌপদীকে পত্নীরূপে লাভ করলেন। এই স্বয়ম্বর-সভাস্তে পাণ্ডবগণ তাঁদের মাতুলপুত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হন ও তারপর থেকে তাঁর পরামর্শমতই সকল কাজ করতে থাকেন।

এই ঘটনার পর পাণ্ডবগণ ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুজনের আদেশমত রাজ্যে ফিরে এলেন এবং সকলের সম্মতিক্রমে জ্যেষ্ঠ-পাণ্ডব যুধিষ্ঠির রাজ্যা-ভিষিক্ত হয়ে রাজসূয় যজ্ঞ করে সম্রাট্‌রূপে পরিগণিত হলেন। এই কারণে দুর্যোধন মাতুল শকুনি ও মিত্র অঙ্গরাজ কর্ণের প্ররোচনায় তাঁদের— রাজ্যপণ রেখে অক্ষক্রীড়ায় আহ্বান করলেন। শকুনির কুচক্রে পাণ্ডবগণ অক্ষক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে মাতা কুন্তীকে রেখে একমাত্র দ্রৌপদীকে সঙ্গে নিয়ে বার বৎসর বনবাস ও এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের প্রতিশ্রুতিতে রাজ্যত্যাগ করে চলে গেলেন। দ্বাদশ বৎসর বনবাসকালে নানা প্রকার দৈব অস্ত্রাদি শিক্ষা করে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ও অন্যান্য ভ্রাতাগণ বিশেষরূপে বলশালী হয়ে উঠলেন এবং এক বৎসর অজ্ঞাতবাসের ফলে মৎস্যরাজ বিরাটের সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করে তাঁর কন্যা উত্তরার সঙ্গে অর্জুন-পুত্র অভি-মন্যুর বিবাহ দিয়ে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করলেন। উপরন্তু যাদববংশীয় মাতুল বসুদেবের পুত্র বাসুদেব

কৃষ্ণের পরামর্শে অন্যান্য রাজন্যবর্গের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে বনবাসান্তে পুনর্বার রাজ্যাধিকারের দাবী জানালেন। কিন্তু দুর্যোধন অসম্মতি জ্ঞাপন করাতে দুই পক্ষকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। তা থেকেই কুরুক্ষেত্রে ভীষণ যুদ্ধের উৎপত্তি।

এই যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে একদিকে দুর্যোধন ও কর্ণপ্রমুখ কৌরবগণ এবং অন্যদিকে পাঞ্চালরাজ, মৎস্যরাজ প্রভৃতি রাজন্যবর্গের সহায়াবলম্বনে পাণ্ডবগণ দণ্ডায়মান হলেও বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণই এর কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত। পরাশরপুত্র দ্বৈপায়ন ব্যাসদেব এইরূপেই এই যুদ্ধকাহিনী-অবলম্বনে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত মহাকাব্য—মহাভারত রচনা করে গেছেন।

বাসুদেব কৃষ্ণের পিতা বসুদেব বৃষ্ণিবংশীয়গণের মুখ্য ছিলেন। কৃষ্ণ যৌবনে সর্বশাস্ত্রবিৎ—সর্ববিদ্যাবিশারদ ও পরাক্রমী বীর হয়ে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় অধ্যাত্মবিদ্যা ও যোগবিদ্যায় অভূতপূর্ব সিদ্ধি লাভ করে তাঁর সময়ে সারা ভারতে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। গুণী বৃদ্ধগণ অনেকে তাঁকে অতিমানবরূপে মান্য করতেন। সেইজন্য যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে নিমন্ত্রিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ সর্বজনপূজ্য ভীষ্ম কর্তৃক সভামধ্যে সকল মানবের অগ্রগণ্যরূপে সম্মানিত হন। এই ঘটনার কিছু পূর্বে বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা রুক্মিণীকে চেদীরাজ শিশুপাল বিবাহ করার মনস্থ করেন, কিন্তু রুক্মিণী শ্রীকৃষ্ণকে মনে মনে বরণ করে তাঁকে সেই সংবাদ জানাতে শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকে হরণ করেন ও গান্ধর্বমতে বিবাহ করেন। তার ফলে শিশুপাল শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে তাঁকে অপমানিত করে যুদ্ধে আহ্বান করেন। শ্রীকৃষ্ণ সেইস্থলেই তাঁর দৈবলব্ধ অস্ত্র সুদর্শনচক্রের দ্বারা শিশুপালকে হত্যা করে তাঁর গর্ব চূর্ণ করেন।

শ্রীকৃষ্ণের অতিমানবতা এই ব্যাপারেই প্রমাণিত হয় ও দুর্যোধনপ্রমুখ কৌরবগণও তাঁর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েন। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণ যে পাণ্ডবদের সঙ্গেই সৌহার্দসূত্রে বিশেষরূপে বদ্ধ—একথা দুর্যোধনের অজ্ঞাত ছিল না।

এদিকে অন্ধকগণ প্রাচীন হৈহয়বংশীয় ভোজদের সঙ্গে মিশে গিয়ে মথুরায় রাজ্যস্থাপন করেন ও ক্রমশঃ দেববৃধ-বংশীয়গণের সহিতও মিত্রতা স্থাপন করে বিরাট ভোজবংশের বিস্তারের সহায়তা করেন। চেদীরাজ—বিদর্ভরাজ—অবন্তিরাজ ও দশার্ণরাজ এই ভোজবংশীয় ছিলেন। অবশ্য রাজা উগ্রসেনই সেই সময়ে বিশেষ ভাবে ভোজরাজ-নামে খ্যাত ছিলেন।

চেদীরাজ শিশুপালের অপমানে বিশাল ভোজবংশের সকলেই নিজেদের অপমানিত বোধ করেন ও উগ্রসেনের পুত্র কংস (যিনি আবার বসুদেবের শ্যালক ছিলেন) এই শত্রুতার কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে দাঁড়ান। তাঁর দুই কন্যাকে তিনি মগধরাজ জরাসন্ধের হস্তে দেন ও তাঁকেও নিজেদের দলভুক্ত করেন। তার বিশেষ কারণ এই ছিল যে, মগধরাজ জরাসন্ধ (বৃহদ্রথের অধস্তন দ্বাদশ পুরুষ) তখন অনেকানেক রাজন্যবর্গকে পরাজিত ও বন্দী করে বিশেষ পরাক্রান্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে কংসকে নাশ করেন ও পরে পাণ্ডবদের সাহায্যে জরাসন্ধকেও বধ করেন।

প্রাচীনকাল থেকেই পূর্ব দিকস্থিত আর্যগণ ও বিশেষতঃ হৈহয়গণ নানাজাতীয় অনার্যদের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাওয়াতে—পৌরব ও যাদবাদি পুরাতন আর্যসন্তানগণ তাঁদের সহিত বিবাহাদি ব্যাপারে সম্বদ্ধ রাজবংশীয় নৃপতিদের সম্ভবতঃ সম্মানের চক্ষে দেখতেন না। কাজেই শ্রীকৃষ্ণ যখন শিশুপাল ও জরাসন্ধের গর্ব চূর্ণ করলেন, তখন এই সকল রাজন্যবর্গ সাত্বত ও বৃষ্ণিবংশের প্রতি বিশেষ শত্রুভাবাপন্ন হলেন। দুর্যোধনও সেইজন্য ভিতরে ভিতরে ক্রমশঃ এই সকল রাজাকে নানাভাবে মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ করতে লাগলেন। এইরূপে সমগ্র ভারত—কি আর্য কি অনার্য—দ্বিধা বিভক্ত হয়

গিয়ে অনেকানেক রাজন্যবর্গ পৌরবগণের ও পাণ্ডবগণের সহিত সঙ্ঘবদ্ধ হলেন। শিশুপালপুত্র, কৃষ্ণ ও পাণ্ডবদের ভয়ে ভীত হয়ে তাঁদের পক্ষই অবলম্বন করলেন। মৎস্যরাজ—করুষরাজ—কাশীরাজ—পাঞ্চালরাজ—ও পশ্চিম মগধাধিপতিও পাণ্ডবগণের সাহায্যকল্পে দণ্ডায়মান হলেন। এঁরা ছাড়া উত্তর ভারতের সমস্ত রাজন্যবর্গ—পশ্চিম ভারতের হৈহয়াদি যাদবগণ ও দক্ষিণ ভারতের অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গ-পুণ্ড্র-সুহ্ম-পূর্বমগধ প্রভৃতির অধিপতিগণ দুর্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করলেন। পাণ্ডবগণের সৈন্যসংখ্যা ৭ অক্ষৌহিণী ও কৌরবদের ১১ অক্ষৌহিণী ছিল। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে এই ভীষণ যুদ্ধ অষ্টাদশ দিন স্থায়ী হয় ও প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয়কুল নির্মূল হয়ে যায়। একমাত্র পঞ্চ পাণ্ডব ও শ্রীকৃষ্ণ জীবিত থাকেন। তাঁরাও প্রায় ৩০ বৎসর পরে অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে হস্তিনাপুরে রাজ্যাভিষিক্ত করে বানপ্রস্থ অবলম্বন করেন এবং কিয়ৎকাল পরে স্বর্গ গমন করেন।

এই যুদ্ধের পূর্বেই শ্রীকৃষ্ণ আনর্তদেশে সমস্ত যাদববংশীয় বীরগণকে একত্র করে তাঁদের সকলের প্রধান হয়েছিলেন। যাদব বীরগণ তাঁদের শৌর্যবীর্যের জন্য বিশেষ খ্যাত ছিলেন ও ভারতের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত পরাক্রান্ত অনার্যরাজগণকে নিজেদের অধীনে এনেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে বিরাট আর্যধর্মরাষ্ট্র-স্থাপনোদ্দেশ্যে পাণ্ডব ও কৌরবদের ভ্রাতৃকলহ নাশ করবার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাল-ধর্মের প্রবলতা লক্ষ্য করে নিজেকে সেই কালরূপ ভীষণ শক্তির যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞানে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আর্য-অনার্য একত্র করে ধ্বংসলীলার মধ্য দিয়ে মহাভারত-প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন। আর্যাবর্ত তখন আর্যরাজগণের অধিকারে এবং বিন্ধ্যের দক্ষিণ ও পূর্ব দিগ্বিভাগ তখনও প্রাচীন অনার্যরাজগণের অথবা মিশ্রিত আর্যানার্যরাজগণের অধীনে। এই মিশ্রিত রাজগণের কেন্দ্রস্বরূপ রাজা জরাসন্ধকে জয় করার দ্বারা মগধের প্রাধান্য নাশ করে আর্য-গৌরব পুনঃস্থাপনের ইহাই বিশেষ কারণ ছিল। তাঁর দিব্যদৃষ্টিতে তখন থেকেই মগধই ভারতের কেন্দ্রস্বরূপ প্রতিভাত হয়েছিল। উপরন্তু খ্রীঃ পূঃ পঞ্চদশ শতক থেকেই হিমালয়োত্তর প্রদেশ বেয়ে দলে দলে যে সকল শক-হূন প্রভৃতি জাতিগণ ভারতে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেছিল—তারাও ভারতের রাজপুতানার মরুপ্রদেশের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে হতে সেখানে খণ্ড খণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করে ও ভারতের পশ্চিম সাগরোপকূলে বসতি বিস্তার করে স্থায়ী ভাবে বাস করাতে পূর্ব থেকেই মিশ্রিত আর্য-অনার্য সঙ্ঘে মিশে গিয়েছিল। এদের মধ্যে আভীর নামে এক জাতি অনেক গবাদি পশু নিয়ে বিশেষ করে যাদববংশীয়গণের সহিত মৈত্রীসূত্রে বদ্ধ হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণই এই ব্যাপারে বিশেষ অগ্রণী ছিলেন। তিনি যে মহাভারত স্থাপনকল্পে তৎকালীন সমগ্র ভারতীয়গণকে একত্র করতে প্রয়াস করেছিলেন—কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনেই তার সূচনা হয়। পরাশরপুত্র ব্যাসদেব সেই বিরাট কৃতিত্বের চিত্রই তাঁর অমর লেখনীতে মহাভারত-রূপ মহাকাব্যে চিত্রিত করে গেছেন।

"যতদূর পার পশ্চাদ্দৃষ্টি কর, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার সলিল পান কর, তারপর সম্মুখ-সম্প্রসারিতদৃষ্টি লইয়া সম্মুখে অগ্রসর হও ও ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরবশিখরে আরূঢ় হইয়াছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, মহিমাশালী করিবার চেষ্টা কর।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জীবন ও দেবতা

'বৈভব'

নীরব বীণাটি মুখর করিল
জীবন আনিল যে—
সেও যদি মোর দেবতা না হয়
দেবতা তবে বা কে?
যে জন আমার হৃদয়ের রাজা
স্বপনের সাথী যে—
সেও যদি মোর দেবতা না হয়
দেবতা তবে বা কে?

দেবতা কি তবে আকাশ হইতে
ধরায় আসিবে নামি?
দেবতা আমার জীবনের রাজা
ভালোবাসি যারে আমি।
যে জন আমার হৃদয়ের মাঝে
নিশিদিন সেথা যার বাণী বাজে
যার মাঝে মোর জীবনের ছবি
সে-ই ত জীবন-স্বামী
সে-ই ত হৃদয়-দেবতা আমার
ভালোবাসি যারে আমি।

সোমনাথ

শ্রীদেবীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, এম্-এস্‌সি

সোম অর্থে চন্দ্র। চন্দ্রের নাথ সোমনাথ—মহাদেব। কবে কোন অতীতে শাপভ্রষ্ট সোমদেব শাপমুক্তির জন্ম প্রথম সোমনাথ প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা পুরাণে লিখিত আছে। কিন্তু সোমনাথ ভারতের অধ্যাত্মসাধনার মূর্ত প্রতীক। দেহের জরা আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর, তার বিনাশ নাই। তাইত সোমনাথ কোটী কোটী ভারতবাসীর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা লইয়া আবার জাগ্রত হইয়াছেন। উষার অরুণ আলোকে তাঁর শুভ্র জটাজাল ভাস্বর হইয়াছে। ফেনিল নীল সিন্ধু পাষাণ চত্বর আবার ধৌত করিয়া দিতেছে। মুহু-র্মুহু ঘণ্টাধ্বনির সাথে ভক্তের দল সমস্বরে আহ্বান জানাইতেছে—হর হর মহাদেও।

ভারতের সুদূর পশ্চিম প্রান্তে সৌরাষ্ট্র প্রদেশ
অত্যন্ত অনুর্বর দেশ; জলহীন শুষ্ক মরুভূমি
ইহারই এক প্রান্তে দেবপট্টন বা প্রভাসপট্টন
এক দিকে নীল সমুদ্র অপর দিকে শ্যামতরুরেখ
যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাণাহত হইয়া দেহত্যা
করিয়াছিলেন। এখানে বেলাভূমির মাঝে এক দি
স্বর্গের দেবতা মর্তভূমে নামিয়া আসেন। পাষা
প্রতিষ্ঠিত হয় মহাভারতের প্রাণ। সমুদ্রের জ
কল্লোলের সাথে পিনাকীর ডমরু মাভৈঃ মাভৈঃ র
বাজিতে থাকে। দূর হয় মনের শঙ্কা—জয় শঙ্কর

সোমনাথের প্রাচীন ইতিহাস রহস্যাবৃত
মহাভারতের যাদবরাজগণ যখন দ্বারকায় রাজ
করিতেন, তখন হইতেই প্রভাসপট্টন তীর্থক্ষে

পরিগণিত হইয়াছে। কিন্তু সোমনাথের মন্দিরের কোন উল্লেখ নাই। অনুমান, শৈব বল্লভী রাজগণের রাজত্বকাল ৪৮০-৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই সোমনাথের প্রথম অভ্যুদয় হয়। উক্ত রাজবংশের উপাস্য দেবতা শঙ্করের' আরাধনার জন্য নির্জন সৈকতভূমির উপর প্রথম দেউল নির্মিত হয়। বল্লভী রাজগণের পতনের পর রাজধানী সোলাঙ্কী রাজাদের করতলগত হয়। সোলাঙ্কী রাজবংশের প্রথম রাজা মূলরাজ সোমনাথের উপাসক ছিলেন। কালের ব্যবধানে নির্জন বেলাভূমি তীর্থযাত্রীর কলতানে মুখরিত হইল। মন্দির ঘিরিয়া বিশাল জনপদ গড়িয়া উঠিল। নূতন দুর্গ রচিত হইল। প্রাচীন ভিত্তিভূমির উপর দেউল ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে পশ্চিম ভারতে এক দর্শনীয় বস্তুতে রূপায়িত হইল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর মধ্যেই রাজানুগ্রহে মন্দিরের ঐশ্বর্য চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল।

মন্দিরের স্বর্ণদুয়ারে ভক্তের দল সুদূর এশিয়ার এক প্রান্ত হইতে আসিয়া দুনিয়ার সেরা রত্ন-মাণিক্যে পূজার নৈবেদ্য নিবেদন করিত; দেবতার কোষাগার পূর্ণ হইত বিচিত্র রত্নসম্ভারে। বিদেশী বণিকের দল বন্দরে নামিয়া তাহাদের যাত্রার শুভ কামনা করিত এবং বাণিজ্য-বেসাতির সাথে দেবতার বৈভব লইয়া যাইত।

ঐতিহাসিক ফেরিস্তার[1] বর্ণনা হইতে মন্দিরের একটি চিত্র পাওয়া যায়: "Superb building is built of hewn stone. Its lofty roof was supported by fifty six pillars curiously curved and set with precious stones.

"In the centre of the hall was Somnat, a stone idol. Besides the great idol above-mentioned there were in the temple some thousands of small images wrought in gold and silver of various shape and dimension.

"It is related that there was no light in the temple, except one pendent lamp which being reflected from the jewels, spread a bright gleam over the whole edifice.

"20,000 villages were assigned for its support and there were so many jewels belonging to it as no king had ever one tenth part of it in his treasury. Two thousands Brahmins served the idol ond a golden chain of 200 muns (400lb.) supported a bell plate which being struck at stated times called people to worship. 300 shavers, 500 dancing girls, 300 musicians were on the idol's establishment and received support from the endowment and from gifts of pilgrims."

মর্মানুবাদ:—

কাটা পাথরের নির্মিত অতি মনোহর অট্টালিকা—বহুমূল্য প্রস্তরখচিত অদ্ভুত বক্রাকৃতি ৫৬টি স্তম্ভোপরি সুউচ্চ উহার ছাদ। মধ্যে শিলামূর্তি সোমনাথ। এই বৃহৎ মূর্তি ব্যতীত মন্দিরে আরও কয়েক সহস্র স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত নানা আকারের ও পরিমাপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূর্তিও রহিয়াছে। শোনা যায় মন্দিরে শুধু একটিমাত্র ঝুলান লণ্ঠনই ছিল, উহার সংলগ্ন মণিমাণিক্য-গুলিতে প্রতিফলিত উজ্জ্বল আভায় সমগ্র প্রাসাদ আলোকিত হইত।

ব্যয় নির্বাহের জন্য ২০,০০০ গ্রাম মন্দিরের অধিকারে ছিল। তাহা ছাড়া মন্দিরের এত মণিরত্ন ছিল যে, উহার দশ ভাগের একাংশও কোন নৃপতির অর্থাগারে ছিল না। দু'হাজার ব্রাহ্মণ ছিলেন বিগ্রহের পূজারী। পূজার সময়ে সকলকে ডাকিবার জন্য সোনার শিকলে ঝুলানো একটি ৪০০ পাউণ্ড ওজনের বৃহৎ ঘণ্টা বাজানো হইত। মন্দিরের সেবায়

১. Farishtah—The history of the Rise of Mohamedan Power in India (Translated by Briggs).

ক্ষৌরকার ছিল ৩০০ জন, দেবদাসী ৫০০ জন এবং গায়ক বাদক ৩০০ জন। ইহারা মন্দিরের তহবিল হইতে ভরণপোষণ পাইত।

উক্ত বর্ণনায় যদিও বাহুল্যবর্জিত নয় তবুও মন্দিরের বিশালত্ব সহজেই অনুমেয়।

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই সোমনাথের ভাগ্যাকাশে ঘন মেঘের আবির্ভাব হইল। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ত্রিশ হাজার সৈন্যসহ সুলতান মামুদ গজনী হইতে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে মন্দির অবরোধ করিলেন। অবরোধ-শেষে যুদ্ধ হইল। পাঁচ হাজার রাজপুত সৈন্য যুদ্ধে প্রাণ বলি দিল। রক্তে প্রভাসপটন রাঙ্গা হইয়া উঠিল। রক্তে রাঙ্গা পিচ্ছিল পথে সুলতান মামুদ নগরে প্রবেশ করিলেন। পরদিন প্রভাতে মন্দিরে প্রবেশ করিয়া মামুদ চমকিয়া গেলেন। এত ধনরত্ন, এত ঐশ্বর্য। সারাদিন ধরিয়া বাধাহীন অবিরাম লুণ্ঠন চলিল। বিধর্মীর হস্তে মূর্তি চূর্ণ বিচূর্ণ হইল। চূর্ণ প্রস্তর বাহিত হইয়া গজনীর পথে চলিল। মন্দিরের সোনার বড় ঘণ্টাটি একবার বাজিয়া উঠিল। বিধর্মীরা সমস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল "আল্লা-হু-আকবর"।

মধ্যাহ্ন গগনে জ্যোতিষ্মান সূর্য কাল মেঘে ঢাকা পড়িল। স্তিমিত প্রদীপশিখা কম্পিত হইল। অনন্ত চন্দ্রাতপের তলে ভগ্ন দেউল পড়িয়া রহিল, মহাকালের প্রতিভূ হইয়া। কিন্তু সংহারের মাঝেই সৃষ্টির নূতন বীজ লুকাইয়া থাকে। নটরাজের প্রলয়নৃত্যের সাথেই প্রাণ-প্রবাহিনী, অমৃতধারা নামিয়া আসে, জটাজাল হইতে। সৃষ্টি সার্থক হয়।

নূতন দেউলে আবার হাজার প্রদীপশিখা জ্বলিল। নহবৎখানায় ভোরের ভৈরবী বাজিয়া উঠিল। ভোলানাথ আবার চীরবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজবেশ ধারণ করিলেন। মূল মন্দিরের চত্বরে নূতন মন্দির নির্মাণ করেন গুজরাটরাজ ভীমদেব। কিন্তু এ মন্দির পূর্বের মত স্থাপত্যে ও ঐশ্বর্যে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইল না। কালের প্রভাবে মন্দির আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে গুজরাটের তদানীন্তন মহারাজ কুমারপাল মন্দিরটির পুনরায় সংস্কার সাধন করেন অথবা নূতন করিয়া নির্মাণ করেন। সোমনাথের মন্দিরের যে অংশটুকু ধ্বংসের হাত হইতে কিছুকাল পূর্বেও বাঁচিয়া ছিল, তাহা ঐতিহাসিকদের মতে কুমার পাল কর্তৃক নির্মিত মন্দিরের ভগ্নাবশেষ। ঐতিহাসিক Cousen[২] বলেন।

"The ruined temple as it now stands, save the Muhamaddan addition is a remnant of the temple built by Kumarpal, a king of Gujrat about 1169 A. D. * * of the temple, made so famous in history by Sultan attack, not a vestige now remain."

এই মন্দির বিগত দিনের স্মৃতি বহন করিয়া আরও এক শতাব্দী কাল ধ্বংসের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিয়াছিল। সময়ের ব্যবধানে প্রদীপ্ত সূর্য শিখর হইতে বিদায় লইল। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খিলজীর সেনাপতি আলফ খাঁ ও নসরৎ খাঁ গুজরাট জয়ে বহির্গত হইয়া, মন্দির পুনরায় ধ্বংস করেন।

ইহার পর আবার নূতন করিয়া মন্দির নির্মাণের প্রচেষ্টা করেন জুনাগড়ের রাজা মণ্ডালিক ও তৎপুত্র খেঙ্গার। মূল মন্দিরের সন্নিকটে নব নির্মিত মন্দিরের দেবতার আবার পুণ্য প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু সূর্য আর ভাস্বর হইল না, কাল যবনিকার অন্তরালে দিগন্তের পাড়ে ঢলিয়া পড়িতে লাগিল।

ইতিমধ্যে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন হইয়াছে। রাজশক্তি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য দিকে দিকে ধাবিত হইল। গুজরাটের সিংহাসন তখন মুসলীম রাজশক্তি-

২. Cousen—Somenath and other temples of Kathiwar.

কবলিত। নবনিযুক্ত শাসনকর্তা মজফর খাঁন ১৩৯৪ খ্রীষ্টাব্দে সোমনাথের মন্দির পুনরায় ধ্বংস করিয়া উহা মসজিদে রূপান্তরিত করেন। মজফর খাঁর অভিযান বর্ণনা করিয়া ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলেন।

"Muzafar Khan then proceeded to Somanath, where having destroyed all Hindu temples, which he found standing he built mosque in the steed."

ইহার পর হিন্দুরা পুনরায় মন্দির নির্মাণে সাহসী হয় নাই। কেবলমাত্র মুসলীম ধর্মোন্মত্ততাই বিগত শতাব্দীর এক মহান হিন্দুস্থাপত্যের ধ্বংসের কারণ হইল।

হিন্দুর দেবতা—তিনি কি কেবলমাত্র দেউলে, সামান্য মূর্ত্তির মধ্যে বিরাজ করেন? যিনি নিরাকার, তার আবার রূপ। তিনি নিখিল বিশ্বে প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যে পরিব্যাপ্ত; শুধু দর্শনে নয়, প্রতিটি জীবের মধ্যে তিনি সুপ্ত রয়েছেন। তিনি পরমাত্মন্—বিশ্বচৈতন্য। যাঁর সৃষ্টি নাই, তাঁর আবার ধ্বংস। তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত।

এই সত্যের সন্ধানে একদিন পথে বাহির হইয়া পড়িলাম। গাড়ী ছুটিয়া চলিল। রাত্রি অবসানে দিন আসিল। দিন গত হইলে, আবার রাত্রি আসিল। পশ্চাতে পড়িয়া রহিল কত দেশ, কত জনপদ,—উষর মরুভূমির তপ্ত বালুকা। আগ্রা, জয়পুর, আজমীড়, মাড়বার, পশ্চাতে ফেলিয়া গাড়ী মেসেনা জংসনে আসিয়া ক্লান্তির নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কিন্তু পথ দীর্ঘ, অবসর লইবার সময় নাই। আবার গাড়ী চলিল ভেরাবলের দিকে। প্রায় ২৪ ঘন্টা পরে গাড়ী ভেরাবলে আসিয়া থামিল—পথে পড়িয়া রহিল রাজকোট আর জুনাগড়।

ভেরাবল একটি ছোট রেল স্টেশন। এখান হইতে সোমনাথের দূরত্ব প্রায় তিন মাইল। চমৎকার পথ। সরকারী পরিবহন বিভাগ কর্তৃক যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া টঙ্গাও পাওয়া যায়। অতীতের প্রভাসপট্টন বর্তমানে একটি গণ্ডগ্রামে পরিণত হইয়াছে। মন্দির-সন্নিকটে একটি ধর্মশালায় স্থানলাভ করিলাম।

নিকটেই সঙ্গম। কপিলা, হিরন্যা, সরস্বতী তিনটি নদী সমুদ্রের সহিত মিশিয়া সঙ্গম রচনা করিয়াছে। পুণ্য সলিলে অবগাহন করিয়া মন্দির দর্শন করিতে গেলাম। পথে প্রাচীন নগরীর ভগ্ন প্রাচীর দেখা গেল, তাহারই মধ্য দিয়া পথ।

সোমনাথের বর্তমান মন্দির দেখিয়া নিরুৎসাহ হইলাম। মূল মন্দিরের পীঠটি কেবলমাত্র নির্মিত হইয়াছে। ইহারই উপরে ভাস্কর্য-বিহীন মর্মর মন্দির নিকেতনে [দেবতার বর্তমান প্রতিষ্ঠার জন্য অস্থায়ীভাবে নির্মিত] সোমনাথ বিরাজ করিতেছেন। সম্মুখেই দ্বারপাল নন্দী। চারিদিকে পাষাণ-চত্বরে পুরাণ মন্দিরগুলির শেষ স্মৃতিচিহ্ন, পরাজয়ের কালিমা মাখিয়া স্বাধীন ভারতের মাটির মাঝে মিশিয়া রহিয়াছে। মন্দিরের এই অংশটিতে বসিলে মন পার্থিব আনন্দে ভরিয়া যায়। জগৎ সংসারের কাণ্ডারী শঙ্কর প্রহেলিকাময় ভাবসাগরের তীরে দাঁড়াইয়া আছেন। বিরাট প্রকৃতি এই অসীমের পূজার আয়োজন করিয়াছে। সমুদ্র নিত্য পদযুগল ধৌত করিয়া দিতেছে। নীল আকাশ চন্দ্রাতপ রচনা করিয়াছে, আর পূজার নির্মাল্য অগণিত জনগণের অন্তরের ভক্তি আর প্রেম।

ইহার পর পুণ্যশ্লোকা অহল্যাবাঈ-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরটি দেখিতে গেলাম। প্রাচীন মন্দির। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে মূল মন্দির হইতে অনতিদূরে বর্তমান মন্দিরটি নির্মিত হয়। মূল শিবলিঙ্গটি মন্দিরের তলদেশে অবস্থিত, সুড়ঙ্গ পথ দিয়া যাইতে হয়। ইহারই উপরে সাধারণের দর্শনার্থে আর একটি মূর্তি রহিয়াছে।

প্রভাসপট্টন হিন্দুদের একটি পবিত্র তীর্থস্থান। এইখানেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেহত্যাগ করেন।

অপরাহ্নে দেহোৎসর্গের স্থানটি দেখিলাম। নীল বনানীর প্রান্তে একটি অশ্বত্থবৃক্ষের তলদেশে একটি বেদী। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এইস্থানে বিশ্রাম-সুখ উপভোগ করিতেছেন। এমন সময়ে একজন ব্যাধ তাহাকে মৃগভ্রমে শরসন্ধান করে। বাণাহত হইয়া তিনি এ স্থান ত্যাগ করিয়া আরও কিছুদূরে হিরণ্যা নদীর তীরে দেহত্যাগ করেন। কাষ্ঠফলকে সামান্য পরিচয়টুকু ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নাই। ফিরিবার পথে কোটীশ্বর মহাদেবের জীর্ণ মন্দির পড়িল। রুদ্রেশ্বর মহাদেবের মন্দিরের নিকট সমুদ্রসৈকতে শিলার মধ্যে একটি শিবলিঙ্গ প্রোথিত দেখিলাম। প্রবাদ, এইস্থান হইতেই ব্যাধ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শরসন্ধান করে।

সোমনাথের অভ্যুত্থানে প্রভাসতীর্থে আবার জনসমাগম আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু তীর্থযাত্রীর কিংবা ভ্রমণকারীর আহার ও বাসস্থানের বিশেষ সুবিধা নাই। সর্বাগ্রেই মনে পড়ে পানীয় জলের অপ্রাচুর্য। নিকটেই ভেরাবল বন্দর; দূর সমুদ্র-গামী জাহাজ যদিও এখানে আসে না, তবুও পালতোলা নৌকা সারা বৎসর বন্দরে নঙ্গর করিয়া থাকে। সেইজন্য বন্দরের নিকটবর্তী স্থানটি অপেক্ষাকৃত উন্নত।

ভগিনী নিবেদিতা

শ্রীমতী সুহাসিনী দেবী

ত্বং বৈষ্ণবীশক্তিরনন্তবীর্যা
বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ
ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
বিদ্যাঃ সমস্তাস্তব দেবি ভেদাঃ
স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু।
ত্বয়ৈকয়া পূরিতমম্বয়ৈতৎ
কা তে স্তুতিঃ স্তব্যপরাপরোক্তিঃ॥

সৃষ্টির মূলে মহাশক্তি। আদিকাল থেকে চলে আসছে সে মহাশক্তির স্তুতি—আপদে-সম্পদে, আনন্দে-নিরানন্দে। নিবেদিতা-আধারে যাঁর প্রকাশ এক নবযুগ রূপায়িত করেছে তাঁকেই জানাতে এসেছি প্রাণের অর্ঘ্য।

কারণ না জানলে কার্যকে সম্পূর্ণ বোঝা যায় না। Back ground ঠিক না দেখালে যেমন চিত্র সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম হয় না, মহাপুরুষদের জীবনীকেও তৎকালীন বাতাবরণ দিয়ে বিচার না করলে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয় না। ভগিনী নিবেদিতার অনুধ্যান আমাদের অসম্পূর্ণ হবে যদি কালের ইঙ্গিতকে উপেক্ষা করে তাঁকে বুঝবার চেষ্টা করি। তাই খানিকক্ষণের জন্য দৃষ্টিকে আমাদের সুদূর অতীতে নিয়ে যেতে হবে।

মহাশক্তি আর নারীরূপ অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। সুরকুলের অমিত তেজ ঘনীভূত হয়ে মহিষমর্দ্দিনী আকারে প্রকাশিতা হয়েছিলেন, আর বিন্দুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে সকলে তাঁকে বরণ করেছিলেন সানন্দে। যুগে যুগে নারী অখণ্ড মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতা। যেখানে নারী উৎপীড়িতা, লাঞ্ছিতা সেখানে ঘটে সৃষ্টি-বিপর্যয়। নারী যেখানে স্ব-মহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিতা, অধিকার-বৈষম্যের কোনও প্রশ্ন ওঠে না সেখানে। বৈদিক যুগে পুরুষ আর নারীকে সমভাবে ব্রহ্মসাধনা-নিরত দেখতে পাই। কিন্তু মহাকালের কোন্ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে নারী আত্মসাধনা হতে বিরত হলেন জানি না। উপনিষৎ

বলছেন—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্"—আত্মসাধনা-বিরত নারীর প্রতি তাই বুঝি বা আত্মা হলেন বিমুখ। আত্ম-সাক্ষাৎকারের অধিকারিণী নারী বেদাধ্যয়ন এবং আত্মতত্ত্বানুশীলন হতে হলেন বহিষ্কৃত। সমাজে ঘটল তাঁর অধঃপতন আর অমর্যাদা। মহাশক্তি অনুকম্পার পাত্রীতে পরিণত হতে চললেন।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতাতে দেখি—"স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম"; মনুসংহিতায় পাই—"কন্যাপি পালনীয়া যত্নতঃ—"। 'অপি' শব্দ স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বৈষম্যের ইঙ্গিত মনকে করে ব্যথিত। নারীত্ব এ অমর্যাদা তার স্বভাবসুন্দর জ্যোতির্ময়ীরূপকে করে তুলল নিষ্প্রভ। অবমানিতা নারীসমাজ তাই হীনবীর্য জাতির জননী।

পাশ্চাত্যে নারীর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত মনে করলেও ভুল হবে, কারণ বিদ্যারূপিণী কল্যাণী, অশান্তি আর অকল্যাণের জন্ম দিতে পারে না। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি ভাবের সুন্দর রূপ দিয়েছেন তাঁর কবিতায়। বারাঙ্গনা, সত্যদ্রষ্টা ঋষ্যশৃঙ্গের মুখে স্ব-স্বরূপের স্তুতি শুনে বলেছিলেন—

"দেবতারে মোর কেহ ত চাহেনি
　　নিয়ে গেলো সবে মাটীর ঢেলা"

পাশ্চাত্যের নারীসম্মানও ঐ মাটীর ঢেলার সম্মানেরই তুল্য।

কালের গতিতে নারী-পুরুষ, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-বৈষম্য যখন দেখা দিল চরমাকারে, 'অবতারবরিষ্ঠ' শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব নিয়ে এল যুগান্তর। যুগাবতারের প্রথম বিদ্রোহ নারী ও শূদ্রের সমানাধিকারের জন্য। ব্রাহ্মণপুত্র গদাধর শূদ্রাণী ধনী কামারণীর ভিক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে দিলেন প্রতিষ্ঠা। এ মার্ক্স-প্রবর্তিত আর্থিক সমানাধিকার নয়, পারমার্থিক সমানাধিকারের পুনঃ প্রবর্তন। যে অদ্বৈত শুধু পুঁথিপত্রে সীমাবদ্ধ হতে চলেছিল তা গদাধরের মধ্যে মূর্তিমান হয়ে দেখা দিল। এ-অপার্থিব জীবনে আমরা সকল দ্বৈতাবসান প্রত্যক্ষ করি। কৈবর্তকুলোদ্ভবা রাণী রাসমণি হলেন অদ্ভুত তপস্বীর পূত তপোভূমির স্রষ্টা, ভৈরবী ব্রাহ্মণী নিলেন প্রথম গুরুর অধিকার।

লাঞ্ছিতা মহাশক্তির রুদ্রাণীরূপের উলঙ্গ নৃত্যে পাশ্চাত্য মদোন্মত্ত। আর মহা তমোময়ীর প্রভাবে প্রাচ্য নির্বীর্য; সেই সন্ধিক্ষণে বালক শ্রীরামকৃষ্ণ মহাশক্তিকে 'মা' 'মা' করে আকুল আবাহন জানালেন। সে ব্যাকুলতায় বুঝি বা পাষাণও গলে যায়। সচকিতা রুদ্রাণী কল্যাণীরূপে দেখা দিলেন। দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের পাষাণী মুণ্ডমালিনী স্নেহময়ী জননীরূপে প্রকাশিতা হলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বিভ্রান্ত মানবসমাজকে সেই প্রসন্না মূর্তির সন্ধান দিলেন; কিন্তু বহির্মুখী মানব অন্তর্দৃষ্টি যে হারিয়ে বসে আছে, তাই সাধনাকে দিতে হল নূতন রূপ। গভীর অমাবস্যা রাত্রিতে সকলের অগোচরে আপন ষোড়শী প্রেয়সীকে জগজ্জননীরূপে করলেন আরাধনা। আর সেই মানবীমূর্তিতে জগজ্জননীর পূর্ণ প্রকাশ উপলব্ধি করে নিবেদন করলেন আজন্মলব্ধ তপস্যার ফল।

যে উজ্জ্বল সম্ভাবনার উদ্দেশে আপন পত্নীতে জগজ্জননীর উদ্বোধন করলেন ঐ ষোড়শীপূজার রাত্রিতে, তার গভীরতা নিরূপণের প্রয়োজন বোধ হয় তখনও ঘটেনি, একটুমাত্র আভাস পাওয়া গেল মহাপ্রয়াণের কদিন আগে। শ্রীশ্রীমাকে ডেকে বললেন—"কলকাতার লোকগুলো অন্ধকারে পোকার মত কিলবিল করছে তুমি তাদের দেখো।" কল্যাণী জননী সে ভার গ্রহণ করলেন। কিন্তু অকূল পাথার! ঘোর তমসাচ্ছন্ন আত্মপ্রত্যয়হীন সমাজে কি করে আসবে চেতনা! রজোগুণ সহায়ে এ তম কাটিয়ে উঠতে পারলে তবেই প্রকাশ পাবে সত্ত্বগুণের স্নিগ্ধ জ্যোতি। সিদ্ধি সময়-সাপেক্ষ, গোপনে চলল তপস্যা।

যে পবিত্র যজ্ঞের বোধন করে গেলেন যুগাবতার স্বয়ং, যাকে প্রজ্বলিত করে রাখলেন যুগাবতার-

সহধর্মিণী 'রামকৃষ্ণগতপ্রাণা' সারদা তীব্র বিয়োগব্যথা উপেক্ষা করে, সে পবিত্র হোমাগ্নির আহুতির জন্ম এগিয়ে এলেন সুদূর ইউরোপ থেকে আইরিশ-কন্যা শ্রীমতী এলিজাবেথ মার্গারেট নোবল।

মুকুলিকা অপেক্ষা করছিল শুভ অরুণোদয়ের! এলো সময়, দীর্ঘ বিভাবরীর ঘটল অবসান। কি মধুর! কি অপূর্ব সে মুহূর্ত! দৃষ্টি চলে যেতে চায় সে দৃশ্যসুধা পান করতে—

১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাস, স্মৃতিমধুর অপরাহ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের পর শ্রীমতী নোবল আপন ঘরে বিশ্রাম করছেন; মনে প্রবল আলোড়ন, অপূর্ব আবেশে সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত, দিব্যভাবে সমস্ত দৃষ্টি আচ্ছন্ন, তরঙ্গ-রাজির মত চিন্তাধারা হৃদয়ে তীব্র আঘাত করছে —"এ কথা পূর্বেও শুনেছি কিছু নূতন নয়—সঙ্গিনীরা এ কি মন্তব্য করে গেল! এক ঘণ্টা। মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে কোন মন্ত্রবলে এ অদ্ভুত সন্ন্যাসী যাবতীয় উচ্চভাবধারার সুন্দর মালা গেঁথে দিল। এ অপূর্ব কৃষ্টি-সম্পন্ন, নবালোকরঞ্জিত উদার হৃদয় আমাদের যে নবদৃষ্টি দান করল, তাকে এভাবে সাধারণ শোনা কথা বলে উড়িয়ে দেওয়া শুধু অভদ্রতা নয় রীতিমত অন্যায়।

"কে এ গৈরিকধারী? মূর্তিমান বীর্য! আঁখি দুটীতে দিব্যভাবের কমনীয়তা, র‍্যাফেল-অঙ্কিত দিব্য বালকের দৃষ্টি!"

"কি অপূর্ব দৃষ্টিভঙ্গী আর অকাট্য যুক্তি—'অব্যক্তস্বরূপ ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ব্যক্তরূপে প্রতি-ভাত হন'; 'আমরা ভ্রান্তি হইতে সত্যে যাই না অল্প সত্য হইতে পূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হই'—কি অপূর্ব অভয়বাণী, 'You are the ocean of purity.'—"

যুগপৎ আর একটি দৃশ্য মনে পড়ে দক্ষিণেশ্বর তীর্থে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মিলন—ভাবী যুগের অমরকাব্যের মধুরতম অধ্যায়। যুবক নরেন্দ্রের মনে ঝড় উঠছে—"কে এ উন্মাদ! কেন তার স্পর্শে মর্মস্থল পর্যন্ত এমন আলোড়িত হয়ে উঠছে।"

শ্রীমতী নোবল অভীস্বরূপ বিবেকানন্দকে গুরু-রূপে বরণ করলেন। নব জন্মদাতার পায়ে সর্বস্ব অর্পণ করে দেবার জাগল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। কতদিন শুনেছেন সিংহকণ্ঠের উদাত্ত আহ্বান—

"জগৎ এরকম বিশজন স্ত্রী-পুরুষ চায় যারা বুকে হাত দিয়ে বলতে পারে—ভগবান ছাড়া কিছু চাই না—কে এগিয়ে আসবে এসো। জগৎ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ জ্বলন্ত প্রেমপূর্ণ জীবনের প্রার্থনা করছে, যাদের অন্তরের প্রেম উচ্চারিত প্রতিটি শব্দকে বজ্রের মত দৃঢ় করে তুলবে। একমাত্র দৃঢ় চরিত্র সত্যকে পূর্ণরূপ দিতে পারে। সহানুভূতি প্রেমের দ্বারা সফলতা লাভ করে।"

অরুণ-কিরণস্নাত মুকুলিকা নোবল ধীরে ধীরে পূর্ণ প্রস্ফুটিত শতদলে পরিণত হতে লাগলেন। এলো তখন সৌরভ বিলিয়ে দেবার সময়। গুরু বিবেকানন্দের প্রাণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর প্রিয় ভারত-ভূমির সাধারণ শ্রেণী আর নারীজাতির উন্নতি। শ্রীমতী নোবল সেই ভারতভূমির জন্ম প্রকাশ করলেন আত্মবলিদানের সঙ্কল্প। সে যে কতখানি দান তা বুঝি বা তিনি নিজেও জানতেন না; কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন দূরদ্রষ্টা আচার্য, তাই বারবার সাবধান বাণী শুনালেন। কিন্তু জয়ী হলো সেই তপস্বি-কল্পিত হোমাগ্নির আহ্বান। নোবলকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ দেখে বিবেকানন্দকে লিখতে হলো—"এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের কাজে তোমার অশেষ সাফল্য লাভ হবে। ভারতের জন্ম বিশেষ করে ভারতের নারীসমাজের জন্ম পুরুষের চেয়ে নারীর, একজন প্রকৃত সিংহিনীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করতে পারছে না, তাই অন্যজাতি হতে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা,

অসীম প্রীতি, সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্ত তোমাকে সর্বথা সেই উপযুক্ত নারীরূপে গঠন করেছে...”

চিঠি পড়ে নোবল বিস্মিতা—আনন্দিতা, ছুটে এলেন বহু আকাঙ্ক্ষিত ভারততীর্থে। বিদেশিনী মার্গারেট নোবল হলেন ভারতের নিবেদিতা, ভারতীয় জনকল্যাণ-সাধনে নিবেদিতা, আর আমাদের প্রিয়তমা ভগিনী নিবেদিতা।

বিবেকানন্দ মানসকন্যা নিবেদিতাকে সনাতন সত্যের প্রকাশভূমি, আর্য ঋষিদের তপোভূমি হিমালয়ের সঙ্গে পরিচয় করাতে নিয়ে গেলেন; গুরু-সান্নিধ্যে ভূস্বর্গ কাশ্মীর, তুষারতীর্থ অমরনাথ প্রভৃতি দর্শন করে নিবেদিতা অপার আনন্দ নিয়ে ফিরে এলেন কলকাতা। আরম্ভ হলো সঞ্জীবনী সুধা-পরিবেশনের পালা। বাগবাজার পল্লীর নিতান্ত সাধারণ একখানা ভাঙ্গা বাড়ী হলো তার কেন্দ্র। বিদেশিনী স্বীয় বহুমুখীন প্রতিভা দ্বারা এ সমাজকে করে নিলেন একান্ত আপনার, জয় করে নিলেন সকলের হৃদয়কে। তদানীন্তন রাজনীতিক, সাহিত্যিক, শিল্পী—সকলেই নিবেদিতাকে জানালেন আন্তরিক শ্রদ্ধা, সে অদ্ভুত প্রতিভায় সকলে বিমুগ্ধ। কিন্তু জানল না এর উৎস কোথায়। বিরাট প্রতিভা কি করে এতখানি মাধুর্যমণ্ডিত, নিষ্কাম প্রেমপূর্ণ—কেউ তার সন্ধান করল না।

স্বামী বিবেকানন্দ নারীর মধ্যে যে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে জননীসুলভ হৃদয়ের সমাবেশ, তেজ ও সাহসের সঙ্গে মলয়মারুতের কোমলতা একাধারে দেখতে চেয়েছিলেন—কোন্ মন্ত্রে তা উদ্বোধিত হবে? একি কেবল আকাশ-কুসুম কল্পনামাত্র? এর প্রমাণ নিবেদিতা-চরিত্র। বৈদান্তিক স্বামীজী বেদান্তকেই এর মূলসূত্র বলে জানতেন। একমাত্র অদ্বৈতে প্রতিষ্ঠিতা নারীতেই নারীজনোচিত কোমলতার সঙ্গে বীরোচিত দৃঢ়সংকল্প সম্ভব। বিবেকানন্দ-চরণে-উৎসর্গীকৃতা সেই অদ্বৈতবোধে প্রতিষ্ঠিতা ছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণচরণে নিবেদিতা অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে কর্মক্ষেত্রে ডুবেছিলেন।

বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যতম আদর্শ অনুন্নত-শ্রেণী আর স্ত্রীজাতির উন্নতি, কারণ এই দুই জাতিকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বেদান্তের-অধ্যয়ন থেকে করা হয়েছে বহিষ্কৃত, যার ফলে এদের আত্মবিস্মৃতি এসে মোহময় স্বার্থপরতা আর দুর্বলতার আকর করে তুলেছে। এই নবপ্রতিষ্ঠিত মিশন আবার নূতন গার্গী-মৈত্রেয়ীর উদ্বোধন করতে চান, যাঁরা কেবল বেদান্ত-বিচারে ক্ষান্ত থাকবেন না, বেদান্তপ্রচার তথা অনুশীলনেও রত থাকবেন।

উদ্বোধন-পত্রিকা প্রকাশের প্রস্তাবনায় স্বামীজী লিখেছিলেন—“রজোগুণের সঙ্গে সত্ত্বগুণ উদ্বুদ্ধ করাই এর আদর্শ।” পূর্ণ রজোগুণসম্পন্না নোবল শুদ্ধসত্ত্বগুণমণ্ডিতা নিবেদিতারূপে, তেজস্বিনী কল্যাণীরূপে নারীসমাজের সুপ্ত শক্তিকে জাগরিত করতে এগিয়ে এলেন।

বিবেকানন্দ হিমালয়ের নিভৃত কন্দরে স্ব-স্বরূপে লীন হয়ে আনন্দে ডুবে থাকার জন্য বসেছিলেন, কিন্তু ঐ রত্ন নির্জন প্রান্তে লুক্কায়িত থাকলে জগতের কল্যাণ কোথায়? তাই বুঝি বা জগৎরঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ পটভূমিকায় তার প্রদর্শনী হলো। শ্রীমতী নোবল দেশকালাতীত অমৃতত্বের সন্ধান পেয়েছিলেন, আর যে কোনও নিভৃত কক্ষে তার অভীষ্ট লাভ করতে পারতেন। কিন্তু যুগচক্র যাদের সাহায্যে ঘুরবে, তাদের স্থান সকলের মাঝখানে—একের গণ্ডীর মধ্যে থাকতে পারে না, তাই নরেন্দ্রনাথকে হতে হলো বিবেকানন্দ, আর নোবলকে হতে হলো নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ বনের বেদান্তকে ঘরে আনার মন্ত্র পেয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে অতি সাধারণ ঘটনার মাঝখানে। নিবেদিতাও স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিতা অন্তর্মুখী সারদাদেবীকে সাংসারিক আবেষ্টনীর মধ্যে দেখেও তাঁকে চিনতে ভুল করলেন না। বললেন—

"তুমি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমপূর্ণ পেয়ালা।" আমাদের সকলকে বলে গেলেন—"সারদাজীবনী শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত ভারতীয় নারী-আদর্শের শেষ কথা।"

তাই সারদাদেবীকে কেন্দ্র করে তাঁরই আশীর্বাদ নিয়ে নিবেদিতা ছোট্ট বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শ্রীশ্রীমা যে ঐ বহু-আকাঙ্ক্ষিত দিনটির অপেক্ষা করেছিলেন। এতদিনে বুঝি সিদ্ধি রূপ নিতে চললো।

কেবল নিবেদিতা-বিদ্যালয় অথবা ২১৪ জন সাহিত্যিক আর শিল্পীর স্তুতি দিয়ে নিবেদিতাকে বিচার করলে মনে হয় ভুল করা হবে। প্রতিভার বিকাশ ত অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, কিন্তু 'এ অহং-শূন্য অহং' এর বহুধা প্রকাশ বাস্তবিক দুর্লভ! তিনি যে ছিলেন বৈরাগিণী, প্রেমিকা, তপস্বিনী। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—ছিল তাঁর মূল মন্ত্র। এই আদর্শকে মনে প্রাণে বুঝেছিলেন যে, মুমুক্ষু না হলে জগতের প্রকৃত হিত করা যায় না, আবার জগতের কল্যাণ-সাধনে আত্মনিয়োগ করতে না পারলে মুমুক্ষুত্ব লাভ করা যায় না। তাই এমন করে মুক্তি-কামনায় নিজেকে বলি দিতে পেরেছিলেন।

নিবেদিতা আপন প্রতিভাসহায়ে নিজেই একটা দল করে নিতে পারতেন। তাঁর স্তাবকের সংখ্যাও নিতান্ত কম ছিল না। কিন্তু সত্যসন্ধিৎসু নিবেদিতা সনাতন আর্য-ঋষিদের মতো নামযশকে উপেক্ষা করে অতি সংগোপনে সকলের কল্যাণ সাধন করে গেলেন।

তাঁর বিদ্যালয়ের প্রতিটি বালিকাকে তিনি কি ভাবে দেখতেন, তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করতেন, সে সব মধুর কাহিনী আমাদের মুগ্ধ করে। সেই তেজস্বিনীর সপ্রেম প্রেরণায় কত জীবন উদ্বুদ্ধ হয়েছে, কত ভাব প্রকৃত রূপ পেয়েছে দেখলে বিস্ময়ে শ্রদ্ধায় মন ভরে ওঠে, আবার আমাদের সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য সেই বিদেশিনী তপস্বিনীকে কত অপমান সইতে হয়েছে তা শুনলে হৃদয় ব্যথিত হয়। কিন্তু নিবেদিতা—"তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ" ব্রতের ব্রতী ছিলেন; প্রতিটি উপেক্ষা—সন্তুষ্ট হাসিমুখে বরণ করেছিলেন। সাধনার পথে আসে নানা বিঘ্ন, নিবেদিতাকেও তার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ১৯০০ খ্রীঃ স্বামীজীর চিঠিতে তার আভাস পাওয়া যায়—

"আমার অনন্ত আশীর্বাদ জানবে, কিছুমাত্র নিরাশ হয়ো না।··· ক্ষত্রিয়-শোণিতে তোমার জন্ম, আমাদের অঙ্গের গৈরিকবাস ত যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যু-সজ্জা। ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নহে।"

স্বামীজীর Complete Works-এর ভূমিকা লিখতে গিয়ে বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে নিবেদিতা লিখেছেন—The truth he preaches would have been as true had he never been born......had he not lived. Texts that to-day will carry the bread of life to thousands might have remained the obscure dispute of scholars. He taught with authority and not as one of the Pundits, for he himself had plunged to the depths of the realisation which he preached and he came back like Ramanuja only to tell its secrets to the pariahs, the outcast and the foreigners.

ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধেও ঐ কথার পুনরুক্তি করার ইচ্ছা হয়—যাকে সত্য বলে জানলেন তার জন্য সর্বস্ব পণ করে আজন্ম-অর্জিত সংস্কার পর্যন্ত ভুলে গিয়ে যে আত্মনিবেদনের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে গেলেন মুমুক্ষু নারীসমাজ সেজন্য তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। তাঁর পূত জীবনী অনুসরণ করে বহু মেয়ে এগিয়ে আসছেন তীব্র মুমুক্ষা আর পরহিতব্রতের বাসনা নিয়ে, কালে আরও আসবেন। মনে হয়, অদূর

ভবিষ্যতে স্বামীজীর স্বপ্ন সফল হবে। তিনি চেয়েছিলেন—স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য আর নানা সমস্যা সমাধানের জন্য একদল ব্রতধারিণী যাদের কর্মভূমি ছাড়া কোনও গৃহ থাকবে না, ধর্মের বন্ধন ছাড়া কোনও বন্ধন থাকবে না; গুরু, স্বদেশ আর আপামর সাধারণ এই তিনের প্রীতি ভিন্ন অন্য প্রীতি থাকবে না।

নিবেদিতা-জীবন সকলের কাছে শাশ্বত শান্তি আর আনন্দের বাণী ঘোষণা করতে আহ্বান জানাচ্ছে সকলকে ঐ জীবন বরণ করে ধন্য হবার জন্য। বেদান্তসূর্যের কিরণছটায় যে নিবেদিতা-কলিকা চোখ মেলেছিল, প্রতিটি পাপড়ি তার বেদান্ত-আভাতে সমুজ্জ্বল। আর তত্ত্বপিপাসু অলিকুল তাকে কেন্দ্র করে মধু আহরণের জন্য ছুটে আসছেন দলে দলে।

নিবেদিতার প্রতি শুধু বাচনিক শ্রদ্ধা দেখিয়েই আমাদের কর্তব্য শেষ করে ফেললে আমরাই হব বঞ্চিত—তিনি যে শ্রদ্ধাতীত, শ্রদ্ধাময়! তাঁকে আমাদের জীবনে কার্যতঃ গ্রহণ করার জন্য সম্মিলিত শপথের প্রয়োজন।

আজ ভারতজননীর পরমাত্মীয়া পূতচরিত্র ভগিনীর কাছে প্রার্থনা করি তিনি তাঁর মত আমাদেরও সর্বস্ব বলি দিয়ে সর্বস্ব পাওয়ার ব্রত গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করুন। তাঁর প্রেরণা আর আশীর্বাদ আমাদের আত্মস্মৃতি-লাভের যাবতীয় বিঘ্ন দূর করুক, পরমাত্মার স্নিগ্ধ প্রকাশ মন, প্রাণ, চরিত্রকে সুষ্ঠু রূপ দান করুক, আর অন্তিমে সেই অভেদ সত্তাতে মিলিত হওয়ার সাধনা সার্থক করে তুলুক।

দেবার্চনা-সম্বন্ধে একটি জিজ্ঞাসা

স্বামী বিশ্বরূপানন্দ

(শেষাংশ)

পূর্বপক্ষী যদি বলেন—প্রতিনিধি দ্রব্যের (অনুকল্পের) দ্বারা কর্মসম্পাদন তো অশাস্ত্রীয় নহে। পূর্বমীমাংসা-দর্শনের ৬।৩।৪ 'দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধিনাসমাপনাধিকরণে' (জৈঃ সূঃ, ৬।৩।১৩-১৭) বিহিত দ্রব্যের অভাব হইলে প্রতিনিধি দ্রব্যান্তর তো অনুজ্ঞাত হইয়াছে। যদি প্রতিনিধি দ্রব্যের গ্রহণ না স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে দ্রব্যাভাবে কর্মবোধক বিধি বাধিত হইয়া যাইবে। যেমন পুরোডাশ-নির্মাণের জন্য কেহ যদি ব্রীহি (ধান্য) সংগ্রহ করিতে না পারে, তাহা হইলে হবনীয় দ্রব্যের অভাবে যজ্ঞ সম্পাদিত হইতে পারিবে না, ফলে সেই যজ্ঞবোধক বিধি ব্যাহত হইয়া পড়িবে। তাহা যাহাতে না হইয়া পড়ে সেইজন্য ব্রীহির অভাবে নীবার, সোমের অভাবে পূতিকা ইত্যাদি প্রতিনিধি দ্রব্যের গ্রহণ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। প্রস্তাবিত স্থলেও তদ্রূপ আমরা যথার্থ হস্তী ও অশ্বাদি-স্থলে কাষ্ঠাদিনির্মিত হস্তী ও অশ্বাদি প্রতিনিধিদ্রব্য গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং অধিকারবিধি বাধিত হইবে কেন?

তদুত্তরে বলিব—হাঁ, প্রতিনিধি-দ্রব্যের দ্বারা কর্মসম্পাদন শাস্ত্রে অনুজ্ঞাত হইয়াছে, কিন্তু সেই প্রতিনিধি-দ্রব্যকে বিহিত মূল দ্রব্যের যথাসম্ভব সদৃশ হইতে হইবে, ইহাও তো পূর্বমীমাংসা-দর্শনের (৬।৩।১১) 'শ্রুতদ্রব্যাপচারে তৎসদৃশস্যৈব

প্রতিনিধিত্বাধিকরণে' (জৈঃ সূঃ, ৬।৩।২৭) প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রীহির স্থলে প্রতিনিধিরূপে যে নীবারের গ্রহণ অনুজ্ঞাত হইয়াছে, তাহার হেতু উভয়েই ধান্যবিশেষ হওয়ায় তাহাদের সাদৃশ্য অতি নিকটতম। আর ভক্ষণযোগ্য হওয়ায় উভয়েই পুরোডাশ-নির্মাণের পক্ষে উপযোগী। কিন্তু তুমি যে কাষ্ঠাদিনির্মিত হস্তী ইত্যাদিকে যথার্থ হস্তী ইত্যাদির প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করিতেছ, আকারগত সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের সাদৃশ্য তো নিকটতম নহে। দেখ, দেবতাকে পুরোডাশ প্রদত্ত হয় ভক্ষণের জন্য। আর নীবার-নির্মিত পুরোডাশ ব্রীহি-নির্মিত পুরোডাশের ন্যায়ই ভক্ষিত হইতে পারে। তদ্রূপ দেবতাকে হস্তী ইত্যাদি প্রদত্ত হয় বাহনরূপে বহৃত হইবার জন্য। কিন্তু তোমার কাষ্ঠহস্তী নক্রিয়াতে অসমর্থ হওয়ায় বাহনরূপে ব্যবহৃত ইতে তো পারে না। সেইহেতু আকারগত থঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও তোমার কাষ্ঠহস্তী ত্যাদি উপচার বিসদৃশ হইয়া পড়িতেছে বলিয়া ার্থ হস্তী ইত্যাদির প্রতিনিধিরূপে পরিগৃহীত ইতে পারে না। যদিও ভাট্টদীপিকাকার বলেন—ন্দসদৃশ দ্রব্যও প্রতিনিধিরূপে গৃহীত হইতে ারে।' কিন্তু প্রস্তাবিত স্থলে যে প্রধান উদ্দেশ্যে ব্য দেবতাকে নিবেদিত হয়, তাহাই ব্যাহত হইয়া ড়িতেছে বলিয়া আকারমাত্রের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্যবলে ন্দসদৃশরূপেও কাষ্ঠহস্ত্যাদি উপচাররূপে পরিগৃহীত ইতে পারে না। ইহা হইল পূর্বপক্ষীর উপর **দ্বিতীয় দোষ**।

আর এক কথা—প্রতিনিধিদ্রব্য-গ্রহণের অবসর খনই হয়, যখন সংগৃহীত উপচারসম্ভারযুক্ত অধিকারীর কর্মানুষ্ঠানকালে কোন উপচারের হঠাৎ অপচার (নাশ) হইয়া পড়ে, ইহা 'তেষু শ্রুত-দ্ব্যাপচারে ভবতি সন্দেহঃ' ইত্যাদি শাবরভাষ্যে -জৈঃ সূঃ, ৬।৩।১৩) বর্ণিত হইয়াছে। তোমাদের তো সংগৃহীত যথার্থ উপচারের অপচার হয় নাই, অর্থাৎ দেবতাকে নিবেদনকালে তোমার হস্তী বা অশ্ব ইত্যাদি তো পলায়ন করে নাই বা অন্য কোন হেতু-বশতঃ দেবতাকে নিবেদনের অযোগ্য হইয়া পড়ে নাই! সুতরাং প্রতিনিধি দ্রব্যগ্রহণের প্রশ্নই তোমার পক্ষে উঠে না। তোমাদের তো যথার্থ হস্ত্যাদি উপচার সংগ্রহের সামর্থ্যও নাই এবং প্রবৃত্তিও নাই। 'অনুকল্পের দ্বারা কর্মসমাপন করিব', ইহা প্রথম হইতেই সঙ্কল্প করিয়া বসিয়াছ। অতএব পূর্বমীমাংসাদর্শনের ৬।৩।৪ 'দ্রব্যাপচারে প্রতিনিধি-নাসমাপনাধিকরণে'র আশ্রয় তোমরা প্রাপ্ত হইতে পার না বলিয়া কাষ্ঠহস্ত্যাদি প্রতিনিধিদ্রব্যের গ্রহণ তোমরা করিতেই পার না। ইহা হইল পূর্বপক্ষীর উপর **তৃতীয় দোষ**।

যদি বলা হয়—দ্রব্যের অপচার (নাশ) না হইলেও অনুকল্পের দ্বারা কর্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা পুরাণ ও তন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। যথা—পিষ্টতণ্ডুলদ্বারা নির্মিত বৃষদ্বারা বৃষোৎসর্গের বিধান গরুড়পুরাণে * বর্ণিত হইয়াছে। আবার শবসাধকের নিকট দেবীর অনুচরগণ নরাদি বলি প্রার্থনা করিলে ঐ প্রকারে নির্মিত নরাদি বলি-প্রদানের বিধিও তন্ত্রে পরিদৃষ্ট হয় (তন্ত্রসার, শবসাধন)।

তদুত্তরে বলিব—শিষ্টসমাজে পিষ্টতণ্ডুল-নির্মিত বৃষদ্বারা বৃষোৎসর্গের প্রচলন পরিদৃষ্ট হয় না। সুতরাং পুরাণের উক্ত বচন অর্থবাদ কি না, তাহা চিন্তনীয়। আর উক্ত পুরাণবাক্যে স্পষ্ট বিধি-প্রত্যয় থাকায় পিতৃ ও ভূতাদির যজনের জন্য উক্ত প্রকার অনুকল্প স্বীকার করিয়া লইলেও পূর্ব-মীমাংসাবিরোধী হওয়ায় দেব-যজনে যে তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না, তাহা ভগবান মনুর বচন উদ্ধৃত

* একাদশেঽহ্নি সম্প্রাপ্তে বৃষাভাবো ভবেদ্ যদি।
দর্ভৈঃ পিষ্টৈস্তু সম্পাদ্য তং বৃষং মোচয়েদ্ বুধঃ॥
বৃষোৎসর্জনবেলায়াং বৃষাভাবঃ কথঞ্চন।
মৃত্তিকাভিস্তু দর্ভৈর্বা বৃষং কৃত্বা বিমোচয়েৎ॥
(গরুড়পুরাণ, উত্তরখণ্ড, ৬।৪৪-৪৫)

করিয়া আমরা পূর্বেই প্রদর্শন করিয়াছি। আবার অবিশেষভাবে যজ্ঞ হওয়ায় শ্রাদ্ধাদি পিতৃযজ্ঞের বিধি-নিষেধাদি দেবযজ্ঞে অনুসৃত হইলে, অবিশেষভাবে যজ্ঞ হওয়ায় ইষ্টিযজ্ঞের বিধি-নিষেধাদি সোমযজ্ঞে এবং সোমযজ্ঞের বিধিনিষেধাদি পশুযজ্ঞে অনুসৃতির পক্ষে কোন বাধা থাকিবে না। তাহাতে সকল প্রকার যজ্ঞের সাঙ্কর্য হইয়া পড়িবে এবং কল্পসূত্র‡ ও মীমাংসাদর্শনের প্রবৃত্তি ব্যর্থ হওয়ায় ভগবান মনুর বচনও বাধিত হইয়া যাইবে। তাহা কাহারও অভীষ্ট হইতে পারে না। তবে হাঁ, পুরাণাদিতে তত্তৎ দেবার্চনা-বিধানস্থলে যদি যথার্থ উপচারের অপচার না হইলেও উক্ত প্রকার কাষ্ঠহস্ত্যাদি সদৃশ অনুকল্প দ্রব্যের বিধান থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ বিসদৃশ উপচারকেও অবশ্যই শাস্ত্রীয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। তাদৃশ বিধান কিন্তু পরিদৃষ্ট হইতেছে না। সাধকগণ যদি তাদৃশ বিধিবাক্য প্রাপ্ত হন, জানাইতে অনুরোধ করিতেছি। গরুড়-পুরাণে পঠিত বাক্যে 'বৃষোৎসর্জনবেলায়াং বৃষাভাবঃ' ইত্যাদি বাক্যটি লক্ষ্য করিতে হইবে। ইহাতেও কর্মানুষ্ঠানকালে যথার্থ বৃষের অপচারই সূচিত হইয়াছে, আর তাদৃশ অপচারের ফলেই এতাদৃশ বিসদৃশ অনুকল্প অনুজ্ঞাত হইয়াছে। তোমাদের দেবার্চনাতে যথার্থ ও হস্ত্যাদি উপচারের অপচার না হওয়ায় পূর্বোক্ত তৃতীয় দোষ দুর্বারই হইয়া পড়িতেছে।

পূর্ববাদী যদি বলেন—'যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত' ইত্যাদি বিধিবাক্য-বোধিত যাবজ্জীবিক নিত্যকর্মের ন্যায় দেবার্চনাসকল আমাদের নিত্যকর্ম, কাম্য কর্ম নহে, সুতরাং পূর্বমীমাংসার ৬।৩।১ 'নিত্যযথাশক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানাধিকরণে'র সিদ্ধান্তানুসারে যথাশক্তি উপচারযোগে দেবার্চনা অশাস্ত্রীয় নহে। উক্ত অধিকরণে কাম্য কর্মেই সর্বাঙ্গোপসংহারে বিধান পরিদৃষ্ট হয়, নিত্যকর্মে নহে।

তদুত্তরে বলিব—পূর্বমীমাংসার উক্ত অধিকরণানুসারে যথাশক্তি যথার্থ উপচারযোগে দেবার্চনাতেই তুমি অধিকারী, প্রতিনিধি উপচার-প্রদানের অধিকার উক্ত অধিকরণে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং যে কয়টি যথার্থ উপচার তোমার সংগৃহীত হয়, সেই কয়টির দ্বারাই তোমায় দেবার্চনা সমাপন করিতে হইবে। নিত্য দেবার্চনাতে কোনই উপচার সংগৃহীত না হইলেও মাত্র গন্ধপুষ্প বা জল ইত্যাদি দ্বারাই দেবার্চনার অনুজ্ঞা শাস্ত্রে পরিদৃষ্ট হয়। কোন কোন স্থলে 'অমুকদ্রব্যার্থম্' ইত্যাদি বাক্যও দেবার্চনাকালে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায় এবং শিষ্টগণ তাহা অনুমোদনও করেন। কিন্তু উপরে উল্লিখিত পূর্বমীমাংসাদর্শনের ৬।৩।১১ অধিকরণের বিরোধ-বশতঃ জল তত্তৎ উপচারসকলের সদৃশ না হওয়ায় তাহাকে তত্তৎ উপচারের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণ করা চলিবে না। নিত্যকর্মবোধক বিধির নিরবকাশতা নিবারণ করিবার জন্য অসমর্থ বিত্তহীন সাধকের পক্ষে তাহা শাস্ত্রানুজ্ঞায় যথার্থ উপচারমাত্র। দেবার্চনা-কালে কোন উপচারের অভাব হইলে মহারাষ্ট্র দেশীয় সাধকগণ 'অমুকদ্রব্যাভাবে নমস্করোমি' এই প্রকার মন্ত্রপাঠপূর্বক দেবতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন, দেখা যায়। নমস্কার আর কোন দ্রব্যের প্রতিনিধি নহে। এইরূপে দেখা যাইতেছে, নিত্যকর্মে প্রতিনিধিদ্রব্য-প্রদানের অধিকার না থাকিলেও কাষ্ঠহস্ত্যাদি প্রতিনিধি-দ্রব্য প্রয়োগ করায় পূর্বপক্ষীর উপর পূর্বমীমাংসার ৬।৩।১ 'নিত্য-যথাশক্ত্যঙ্গানুষ্ঠান-অধিকরণে'র বিরোধরূপ **চতুর্থ দোষ** আপতিত হইতেছে।

আর এক কথা। কোন সম্মানিত অতিথিকেই যখন ব্যবহারের অযোগ্য দ্রব্য প্রদান করা যায় না, তখন তোমার ইষ্টদেবতাকে সাদরে আবাহন করিয়া ব্যবহারের অযোগ্য কাষ্ঠ ইত্যাদি বিসদৃশ উপচার

‡ যে গ্রন্থে বেদবিহিত যজ্ঞসকলের ক্রম বর্ণিত হইয়াছে, তাহাকে বলা কল্পসূত্র বা শ্রৌতসূত্র।

তুমি প্রদান কর কি প্রকারে? এই প্রকারে স্বীয় ইষ্টদেবতাকে ব্যবহারাযোগ্য উপচার প্রদান করায় লোকব্যবহার-বিরোধরূপ **পঞ্চম দোষ** পূর্ব-বাদীর উপর নিক্ষিপ্ত হইতেছে।

আবার কাষ্ঠ-অশ্বাদি উপচার দানকালে 'অশ্বং সুখপ্রদং গৃহ্ণ পথি কণ্টকবারণম্,' ইত্যাদি মন্ত্র তুমি পাঠ করিয়া থাক। বল তো—কাষ্ঠনির্মিত অশ্ব তোমার ইষ্টদেবতার পথিকণ্টক কি প্রকারে নিবারণ করিবে? সুতরাং স্বীয় ইষ্টদেবতার নিকট মিথ্যা-কথনরূপ **ষষ্ঠ দোষ** পূর্বপক্ষীর উপর আপতিত হইল।

পূর্ববাদী যদি বলেন—'যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ' (গীতা, ১৭।১) ইত্যাদি ভগবদ্বচনে শ্রদ্ধা থাকিলে শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও দেবযজন অনুজ্ঞাত হইয়াছে। তদুত্তরে বলিব—এই স্থলে 'শ্রদ্ধা' শব্দের অর্থ—'বৃদ্ধব্যবহারে বা লোকাচারে শ্রদ্ধা'। আস্তিক্যবুদ্ধিরূপা শ্রদ্ধা এখানে পরিগৃহীত হয় নাই, কারণ শাস্ত্রবিরুদ্ধ বিষয়ে আর শাস্ত্রজ্ঞানবানের শ্রদ্ধা থাকিতে পারে না। গীতাভাষ্যে আচার্যপাদ শঙ্কর ইহা স্পষ্টই বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং শাস্ত্রজ্ঞ তুমি অজ্ঞ গ্রাম্য-জনের ন্যায় এই ভগবদ্বচনের আশ্রয় প্রাপ্ত হইতে পার না।

যদি বলা হয়—'পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি' (গীতা, ৯।২৬) ইত্যাদি ভগবদ্বচন-অনুসারে আমাদের ভক্তিভাবে প্রদত্ত এতাদৃশ উপচারসকল বিসদৃশ হইলেও অবশ্যই দেবতা গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহার প্রসাদে আমাদের কর্মের সাঙ্গতা ও চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদিতে তো কোন বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে না।

তদুত্তরে বলিব—শ্রীভগবানের উক্ত বচনে অসমর্থ ভক্তের পক্ষে পত্র, পুষ্প, ফল ও জলই অনুজ্ঞাত হইয়াছে, কাষ্ঠ-অশ্বাদির ন্যায় বিসদৃশ ও সর্বথা অযোগ্য উপচার তো অনুজ্ঞাত হয় নাই। যদি বল—উক্ত পত্রপুষ্পাদি বচনটি যে কোন তুচ্ছ দ্রব্যের উপলক্ষণমাত্র, অর্থাৎ উক্ত পত্রপুষ্পাদি শব্দে যে কোন তুচ্ছ দ্রব্যকেই গ্রহণ করিতে হইবে, তদুত্তরে বলিব—দেবতা যে তোমাদের প্রদত্ত তুচ্ছ উপচার গ্রহণ করেন না বা তাঁহার প্রসাদে যে তোমার চিত্ত শুদ্ধ হইবে না, ইহা তো আমরা বলিতেছি না। ভক্তির বশ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সুদামা-প্রদত্ত কদন্ন গ্রহণ করিয়াছেন, প্রহ্লাদপ্রদত্ত বিষ গ্রহণ করিয়া তাহাকে অমৃতে পরিণত করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ সহাস্যবদনে ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্রের খিস্তিখেউড় গ্রহণ করিয়া তাঁহার 'বকল্‌মা' গ্রহণ করিয়াছেন, ইত্যাদি ভক্ত-ভগবানের লীলাদৃষ্টান্ত বিরল নহে। কিন্তু আমরা তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি—আচমন হইতে বিসর্জনান্ত সমস্ত কর্ম বিধিপূর্বক অনুষ্ঠানের দ্বারা তুমি বৈধী ভক্তির অনুষ্ঠান করিতেছ। অশাস্ত্রীয় সুতরাং অসদুপচার প্রদানকালে মধ্যে অকস্মাৎ তুমি সুদামা প্রভৃতির ন্যায় পরাভক্তি কোথায় প্রাপ্ত হইলে যে বৈধী ভক্তির সীমা লঙ্ঘন করিতে সাহস করিতেছ? অতএব ইহাই সিদ্ধ হয় যে—হে সাধক, ইহা তোমার মনের চালাকিমাত্র। সুতরাং—

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥
(গীতা, ১৭।২৮)

'অশ্রদ্ধাপূর্বক হোম, দান তপস্যা ইত্যাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, হে পার্থ, তাহা অসৎ। ইহলোকে ও পরলোকে তাহা ফলপ্রদ হয় না'—ইত্যাদি এই ভগবদ্বচনানুসারে তোমার সমস্ত কর্মই ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে বুঝিতে হইবে। অতএব অশ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠিত হওয়ায় কর্মব্যর্থতারূপ **সপ্তম দোষ** পূর্বপক্ষীর উপর আপতিত হইতেছে।

এইরূপে পূর্ববাদীর সমস্ত যুক্তিই বালুকা-কূপের ন্যায় বিদীর্ণ হওয়ায়, বিসদৃশ ও যথেচ্ছ অনুকল্পযোগে দেবার্চনার অশাস্ত্রীয়তাই সিদ্ধ হইল।

প্রস্তাবিত প্রবন্ধে বিচারণীয় না হইলেও প্রসঙ্গ-বশতঃ আরও দুইটি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধকগণের সেই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার আবশ্যকতা অনুভূত হইতেছে। সেই বিষয় দুইটি এই—(ক) প্রায়ই পরিদৃষ্ট হয় যে—দেবার্চনান্তে হোমকালে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঘৃতাদি হবনীয় দ্রব্য অগ্নিতে সমর্পিত হয়। হোমকালে এই যে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণ, ইহা কি শাস্ত্র-সম্মত? (খ) ইদানীন্তনকালে দুর্গোৎসবাদিতে বহু স্থলে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তিকে চণ্ডীপাঠাদি ঋত্বিক্‌কর্মে বিনিযুক্ত হইতে ও দক্ষিণা গ্রহণ করিতে দেখা যায়, ইহাও কি শাস্ত্র-সম্মত? শাস্ত্রকে অনুসরণ করা বা না করা, হে সাধক, তোমার ইচ্ছাধীন; কারণ শাস্ত্রের কোন রক্ষক-বাহিনী নাই এবং "কামং তান্ ধার্মিকো রাজা শূদ্রকর্মসু যোজয়েৎ" (বোধায়ন স্মৃতি), ইত্যাদি বচনবোধ্য রাজাও নাই। তবে আমরা বলিব—হোম ও চণ্ডীপাঠাদি তো সেই শাস্ত্রেই বর্ণিত হইয়াছে যাহাকে অনুসরণ করিয়া তুমি পূজার্চনাদির অনুষ্ঠান করিতেছ। সুতরাং সেই একই শাস্ত্রের আদেশ কতকটা পালন ও কতকটা অপালন করিয়া যদি তুমি শ্রেয়োলাভের আশা পোষণ কর তো করিও, কিন্তু বিশেষ বিবেচনা করিয়া তাহা করিও। যাহা হউক উক্ত উভয় প্রকার আচরণই যে শাস্ত্র-বিগর্হিত, ইহাই আমরা বলিতে চাই। কোন্ হেতুবলে, তাহা বলিতেছি। প্রথমতঃ, (ক) হোম-কালে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণবিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই—"(বীজ) অমুকদেবায় স্বাহা" ইত্যাদি-রূপে যে হোম করা হয়, তাহাকে বলে 'দর্বিহোম'।* ইহাতে অধ্বর্যু স্বয়ংই মন্ত্রপাঠ করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রক্ষেপ করেন। 'যাগ'কালে কিন্তু হোতা পুরোনুবাক্যা ও যাজ্যামন্ত্র পাঠ করেন, অধ্বর্যু স্বয়ং কোন মন্ত্রপাঠ না করিয়া যাজ্যামন্ত্রের শেষে 'বৌষট্' এই মন্ত্র উচ্চারিত হইবার সমকালেই হবনীয় দ্রব্য অগ্নিতে অর্পণ করেন। ইহাই দর্বিহোম ও যাগের প্রভেদ। বাস্তুহোম প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকেও দর্বিহোম বলে (পূঃ মীঃ, ৮।৪।৩ সূঃ), তাহা এখানে বিচার্য নহে। যাহা হউক এই দর্বিহোম ও যাগকালে অগ্নিতে যে আহুতি প্রদান (হোম), ইহা যজুর্বেদীয় ঋত্বিকের অর্থাৎ অধ্বর্যুর কর্ম। শ্রুতি বলেন—"উচ্চৈঃ ঋচা ক্রিয়তে, উচ্চৈঃ সাম্না, উপাংশু যজুষা" (তৈঃ সং ১।৮।১)—'ঋগ্বেদ ও সামবেদ উচ্চৈঃস্বরে পঠনীয়, যজুর্বেদ উপাংশুস্বরে পঠনীয়।' যাহা উচ্চারণকারী স্বয়ং শ্রবণ করিতে পারেন, অপরের শ্রুতিগোচর হয় না, এতাদৃশ যে নিম্নস্বর, তাহাকে বলে উপাংশুস্বর; অর্থাৎ ফিস্‌ফিস্ করিয়া যে উচ্চারণ, তাহাই উপাংশুস্বর। অধ্বর্যুর বেদ যজুর্বেদ হওয়ায় এবং পূঃ মীঃ ৩।৩।১ বেদোপ-ক্রমাধিকরণ ও ২।১।১৩ নিগদাধিকরণ ন্যায়ে নিগদভিন্ন যজুর্বেদ উপাংশুস্বরে পঠনীয় হওয়ায় অধ্বর্যু কর্তৃক সম্পাদনীয় দর্বিহোমেও উপাংশুস্বরই প্রযুক্ত হইবে, ইহাই নিশ্চিত হইতেছে। [এক প্রকার যজুর্মন্ত্রকে 'নিগদ' বলে, বিশেষ বচনবলে তাহা উচ্চৈঃস্বরে পঠিত হয়]। হোমকর্তা ও যজমান যদি অনুবেদাধ্যায়ী হন, তাহা হইলেও "বিপ্রতিষেধে পরম্" (জৈঃ সূঃ, ১২।৪।৩৯) এই সূত্রোক্ত ন্যায়ানুসারে আর্ত্বিজ্য কর্মই (—ঋত্বিকের কর্মই) প্রবল বলিয়া এবং অগ্নিতে হবনীয় প্রদান অধ্বর্যুর কর্ম বলিয়া হোমকালে তাঁহাকে অধ্বর্যুর পদই গ্রহণ করিতে হয়। আর সেইহেতু আধ্বর্যব উপাংশুস্বরই অধ্বর্যু কর্তৃক হোমানুষ্ঠানকালে প্রযোক্তব্য হইয়া পড়ে। আর বীজমন্ত্র যে গোপনীয় অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণীয় নহে, এই বিষয়ে অন্য শাস্ত্রবচনও আছে, যথা—

"আয়ুর্বিত্তং গৃহচ্ছিদ্রং মন্ত্রমৈথুনভেষজম্।
দানমানাপমানঞ্চ নব গোপ্যানি যত্নতঃ॥ ইত্যাদি।

* শাস্ত্রদীপিকা, ৮।৪।১ অধিঃ, সোমনাথী; তৈঃ সং, ৩।৪।১০ সায়ণভাষ্য; জৈঃ সূঃ ৮।৪।১১ শাবরভাষ্য।

'আয়ু (বয়স), ধন, গৃহচ্ছিদ্র, মন্ত্র, ঔষধ, দান, মান ও অপমান ইত্যাদি যত্নপূর্বক গোপনীয়।' শিষ্টগণের এই প্রকার আচরণও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। কাশী প্রভৃতি ক্ষেত্রসমূহে তদ্দেশীয় সাধকগণের মধ্যে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক হোমসম্পাদন রীতি পরিদৃষ্টও হয় না। পরন্তু তাহার বিপরীত আচরণই লক্ষিত হয়, তাঁহাদের হোমকালে মাত্র স্বাহাকারটিই অপরের শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। সুতরাং যে শাস্ত্রোক্ত যে দেবার্চনাতে হোম সম্পাদিত হয়, তাহাতে উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্রের উচ্চারণপূর্বক হোমানুষ্ঠান স্পষ্টভাবে বিহিত না হইলে শ্রুতি, পূর্বমীমাংসা ও শিষ্টাচারসম্মত উপাংশুস্বরবিষয়ক উক্ত সাধারণ বিধানই যে অনুসরণীয়, ইহাই নির্ণীত হইতেছে। অতএব দর্বিহোমকালে উপাংশুস্বরযোগেই তাহা অনুষ্ঠিত হইবে, উচ্চৈঃস্বরে বীজমন্ত্রাদি পঠিত হইলে তাহা শাস্ত্রসম্মত হইবে না, ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।

(খ) ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তির চণ্ডীপাঠাদি ঋত্বিককর্মে প্রবৃত্তিও সর্বথা অশাস্ত্রীয়, কারণ পূঃ মীঃ ১২।৪।১৬ আর্ত্বিজ্যেব্রাহ্মণমাত্রাধিকারাধিকরণের সিদ্ধান্ত অনুসারে ব্রাহ্মণই 'ঋত্বিককর্মে' অধিকারী। যদি বলা হয়—অক্তস্থলে ঋত্বিক্‌কর্মে যাহাই হউক না কেন, চণ্ডীপাঠে যে সকলেরই অধিকার আছে, ইহা "যশ্চ মর্ত্যঃ স্তবৈরেভিস্ত্বাং স্তোষ্যত্যমলাননে" (শ্রীশ্রীচণ্ডী ৪।৩৬) ইত্যাদি শ্লোকে স্পষ্টভাবেই বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং চণ্ডীপাঠরূপ ঋত্বিক্‌কর্মে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি বৃত হইলে, তাহা অশাস্ত্রীয় হইবে না। তদুত্তরে বলিব—উক্ত শ্লোকে স্ব-কামনা সিদ্ধির জন্য সাধককে চণ্ডীপাঠের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, কিন্তু অপরের ক্রিয়াতে ঋত্বিক্‌রূপে বৃত হইবার অধিকার তো উহাতে স্বীকৃত হয় নাই। সুতরাং উপরোক্ত জৈমিনীয় ন্যায়ানুসারে ব্রাহ্মণেতর ব্যক্তি অপরের কর্মে ঋত্বিক্‌রূপে বৃত হইয়া চণ্ডীপাঠ ও দক্ষিণাগ্রহণ করিলে তাহা আর শাস্ত্রসম্মত হইবে না, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত।

পরিশেষে আমাদের নিবেদন—উপরোক্ত বিষয়ত্রয়ে শাস্ত্রার্থনিরূপণই আমাদের উদ্দেশ্য। আমাদের বিচারে ভ্রমপ্রমাদ থাকিলে শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণ শাস্ত্রীয় প্রমাণসহ যদি তাহা প্রদর্শন করেন তাহা হইলে আমাদের ভ্রম তো বিদূরিত হইবেই, উপরন্তু বহু সাধকের তাহাতে উপকার হইবে।

পরমাত্মা

শ্রীতারাপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

আমারে আমি যে করি অপমান
ধিক্কার দিই মনে,
আত্মার মাঝে পরমাত্মার
ফিরি অনুসন্ধানে,
তবু কেন দেখি চারিদিকে মোর
কুয়াসার জাল বোনা।
ওগো সুন্দর, বল বল তুমি
বৃথা যাবে দিন গোণা।

শীতের কুহেলী রাত্রির মাঝে
আমি একা পথচারী,
অনাবিষ্কৃত কোন্ জীবনের
অভিমুখে আমি ফিরি ;

কুয়াসার মাঝে নিজেরে ডুবায়ে
অসীমের পানে ছুটি,
ধিক্‌কৃত এই জীবন আমার
ধূলায় পড়ে যে লুটি।

কতবার হায় জ্বেলেছি প্রদীপ
হৃদয়ের মন্দিরে,
তোমার পাইনি দেখা, দীপ মোর
নিভে গেছে বারে বারে ;
ওগো সুন্দর, বল বল তুমি
কোন্ ফুলে তোমা পূজি,
যুগ যুগ ধরে নয়নের জলে
তোমারে আমি যে খুঁজি।

স্বামী প্রেমানন্দ

(পূর্বানুবৃত্তি)

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বাবুরাম মহারাজ কেবল স্নেহবিগলিতা জননী ছিলেন না, ঘটনাক্রমে কঠিনবীর্য পৌরুষের মূর্তিও ধারণ করতেন। লর্ড কারমাইকেল যখন বল্‌লেন, রামকৃষ্ণ মিশন বিপ্লবীদের গৈরিকের আবরণে প্রশ্রয় দেয় তখন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর বজ্রকঠোর রূপ দেখেছিলাম। কোন কোন ভীরু গৃহী ভক্ত বিচলিত হয়ে বল্‌লেন, বিপ্লবী সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীদের মঠ থেকে সরিয়ে দিলে হয় না? প্রেমানন্দ গর্জে উঠ্‌লেন,—ইংরাজ মঠ দখল করে নিক্, ওদের ভ্রূকুটিতে নত হব না। ঠাকুরের সন্তানদের মধ্যে ভেদ করবো কেন? কারো অতীত জীবন আমাদের বিচার্য নয়। বিরজা-হোম করে যারা বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সন্ন্যাসী হয়েছে, তারা মঠে থাকবে; তারা আমরা ভিন্ন নই। সকলে একসঙ্গেই জেলে যাব। রাজশক্তির ভয়ে সত্যভ্রষ্ট হব না। সেদিন মৃদুস্বভাব স্বামী প্রেমানন্দের রুদ্র মূর্তি দেখে বিস্মিত হয় নি। জননী সারদা দেবীও ঐ কথাই বলেছিলেন। এই ঘটনার মর্ম আজকের দিনের অনেকের পক্ষে বোঝাই কঠিন। এবিষয়ে বলতে গেলে কথা দীর্ঘ হয়ে যাবে, বারান্তরে বলবার ইচ্ছে রইল।

কতবার কত ভাবে দেখেছি; পাপী তাপী দীন দুঃখী সর্বমানবের কল্যাণ-কামনায় বিগলিত-হৃদয় এই কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসীর অপার্থিব চরিতমহিমা। যেমন কোমল তেমনি কঠোর। কত লোক তাঁর শিষ্য হতে এসেছে, তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন। তাঁর কেউ মন্ত্রশিষ্য নেই। যখন স্বয়ং সারদা দেবী শ্রীরামকৃষ্ণের দ্বিতীয় বিগ্রহরূপে দেহ ধারণ করে আছেন, তখন তিনি ছাড়া আর কে কৃপা করতে পারে? একবার আমরা জয়রামবাটী থেকে ফিরে মঠে এসেছি। গ্রামে গিয়ে শ্রীশ্রীমা যে কত কায়িক ক্লেশ অম্লানবদনে সহ্য করেন সেই সব কথা হচ্ছিল। মা মানা শোনেন না, অন্যান্য মেয়েদের সঙ্গে মিলে কলসী নিয়ে পুকুর থেকে জল আনতে যান। পায়ে বাতের ব্যথা, তবু জলভরা কলসী কাঁকালে নিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটবেন, আর কাউকে দেবেন না। গ্রাম্য মেয়েদের সঙ্গে সাংসারিক সুখদুঃখ নিয়ে এমনভাবে কথা বলেন, যেন তিনি তাদেরই একজন। আমি বল্‌লাম, একদিন গ্রামের পথে চলেছি, একজন বিধবা ব্রাহ্মণী ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার বাড়ী কোথায় বাছা? পূর্ব বাঙ্গলার কথা শুনে তিনি কিছুই বুঝলেন না। তবু দূরত্ব অনুমান করে বল্‌লেন, সারদা এখানে এলেই নানা দেশের কত লোক আসে। ওর স্বামী ছিল পাগল, ছেলেপুলেও হ'ল না, সংসার-সুখও হয়নি। এখন শিষ্য-সেবক নিয়ে তবু সুখের মুখ দেখছে। আমার বলবার ভঙ্গীতে সকলে হেসে উঠ্‌লেন। বাবুরাম মহারাজ সব শুনে বল্‌তে লাগলেন, দেখে এলে তো! সব গোপন। ঠাকুরের ভাবসমাধি হত, বিদ্যার ঐশ্বর্য প্রকাশ পেতো, কিন্তু মার মধ্যে কোন বিভূতির বিকাশ নেই। ইনি কুটনো কুটছেন, রান্না করছেন, প্রকৃত মায়ের মত আদর করে সকলকে খাওয়াচ্ছেন, সম্পর্কিত আত্মীয়দের সঙ্গে গৃহীর মত ব্যবহার করছেন। কে চিনবে, কে বুঝবে মা মহামায়ার অপার লীলা? জয় মা, জয় মা বল্‌তে বল্‌তে ভাবে বিভোর হয়ে উঠ্‌লেন; কথা বন্ধ হয়ে গেল। হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে তিনি গান ধরলেন—'আয় মা সাধনসমরে,' দেখি মা হারে কি পুত্র

হারে।' যুদ্ধের ভঙ্গীমায় গাইতে লাগ্‌লেন ;—'দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান তাতে জুড়ে ভক্তিবাণ'—ইত্যাদি। তাঁর সঙ্গীতে বেশী দখল ছিল না, কিন্তু তাঁর আবেগময় কণ্ঠস্বর সমগ্র দেহের অপূর্ব ভঙ্গিমার সঙ্গে মিলিত হয়ে এক অপূর্ব ভাবের দ্যোতনায় সকলের মন ভক্তিভাবে অভিভূত হয়ে যেতো।

সমুচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির দিব্য আনন্দময় বিগ্রহরূপে প্রেমানন্দ মঠে বিরাজ করতেন। তাঁর দর্শনে তাঁর কথা শুন্‌লে নিমেষে চিত্ত ও বুদ্ধি মালিন্য-মুক্ত হত। দেশ, জাতি ও সর্বমানবের কল্যাণের জন্য ঠাকুরের নির্দেশে এক মুক্ত পুরুষ যেন দেহধারণ করে আছেন। লৌকিক দৃষ্টির অগোচর আত্মার মহিমা আমার মত অপরিণতবুদ্ধি যুবকও যেন চকিতে অনুভব করতো।

একবার বেলুড় মঠে গুরুভ্রাতাদের আনন্দ-সম্মেলন। দক্ষিণ দেশ থেকে বড় মহারাজ (রাখাল) এসেছেন, কাশী থেকে মহাপুরুষ মহারাজ (তারক) আর সারগাছি থেকে স্বামী অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর)। প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীদের আনন্দ-সম্মেলনে সমগ্র মঠবাটী মুখরিত। সেদিন, সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দের জন্মতিথি—বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির আয়োজন। প্রভাত থেকেই কলকাতা থেকে গৃহী ভক্তরা আসতে লাগ্‌লেন। কোথাও কীর্তন-ভজনের আসর, কোথাও বা আলোচনা-সভা। মূল মঠবাটীর উত্তরপশ্চিমে খোলা জায়গায় সামিয়ানার নীচে হোমের আয়োজন। যজ্ঞাগ্নি প্রজ্বলিত হ'ল। কৃষ্ণলাল মহারাজ ঘৃতসিক্ত সমিধ আহুতি দিতে লাগ্‌লেন। পাশে পদ্মাসনে বসে স্বামী অখণ্ডানন্দ বেদমন্ত্র পাঠ করছেন। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠের অশ্রুতপূর্ব সুরঝঙ্কার, বিশুদ্ধ উচ্চারণভঙ্গী শুনে মনে হতে লাগলো, বৈদিক যুগের কোন ঋষি যেন বহু শতাব্দী পর আবির্ভূত হয়েছেন। জাগ্রত ভারতের তপো-ভূমিতে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকণ্ঠে আর্যজাতির মহোচ্চ প্রার্থনার ধ্বনিতরঙ্গে চারদিক প্রসন্ন, ভাগীরথী আনন্দে রোমাঞ্চিত।

অদূরে কাঠের আসনে বসে ব্রহ্মানন্দ—আপনাতে আপনি ডুবে আছেন, পাশে গুরুভাই ও শিষ্যবর্গ। এমন সময় ঠাকুর-দালান থেকে বেরিয়ে এলেন স্বামী প্রেমানন্দ। হাতে পেতলের রেকাবীতে মালাচন্দন—ভাবাবেশে পা টলছে, অর্ধ-উন্মীল নেত্রে অপার্থিব আনন্দের দীপ্তি। প্রথমে বড় মহা-রাজকে মালাচন্দন দিয়ে প্রণাম করলেন, তারপর অন্যান্য গুরুভাইদের। ব্রহ্মানন্দ ভ্রাতৃপ্রীতিভরে বাবুরামকে আলিঙ্গন করলেন। সকলের বদনমণ্ডল দিব্য বিভায় উদ্ভাসিত—কারো মুখে কথা নেই। মনে হল, পৃথক পৃথক দেহে এঁরা একই অদ্বৈতকে গাঢ় অনুভূতির মধ্যে প্রত্যক্ষ করছেন।

এঁদের ভ্রাতৃপ্রীতি, পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভরতা নানা উপলক্ষ্যে আমার দেখবার সুযোগ হয়েছিল। ইহলোক-নিস্পৃহ সন্ন্যাসীরা মর্ত্য মানবের কল্যাণে জ্ঞান কর্ম ভক্তি ও যোগের সমন্বয়ে নর-নারায়ণ সেবার যে মহান ব্রত শ্রীগুরু ও বিবেকা-নন্দের নির্দেশে গ্রহণ করেছিলেন তার প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের মূলে এঁদের সমবেত শুভেচ্ছার সম্মিলিত প্রয়োগই যে প্রেরণা-শক্তি যুগিয়েছে, একথা অসঙ্কোচেই নির্দেশ করা যায়। সঙ্ঘনেতাদের এই পারম্পর্য পরবর্তীদের মধ্যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে বলেই আর দশটা লৌকিক ও ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠানের মত শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে কখনো আত্মখণ্ডনের উদ্বেগ দেখা দেয়নি। আজ তাঁরা একে একে অপ্রকট হয়েছেন, কিন্তু তাঁদের সঙ্ঘানুরাগ, সাধনা ও সেবাধর্মের পারম্পর্য শিষ্যানুশিষ্যক্রমে দায়স্বরূপ অর্পণ করে গেছেন। লৌকিক ও আধ্যাত্মিক সেবা ও সাধনার এমন একটা সঙ্ঘ সন্ন্যাসীদের দ্বারা পরিচালিত—ভারতে এমন কোন অতীতের নজীর নেই। মঠ ও সন্ন্যাসী পারলৌকিক ব্যাপারের রহস্যমণ্ডিত—এই তো জানা ছিল চিরকাল। সাধন-ভজন আছে,

তার সঙ্গে আছে হাসপাতাল, শিক্ষালয়, শিল্প-প্রতিষ্ঠান, আছে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে আর্ত মানবের সেবা,—এ ভারতে অভিনব। এই দুই আপাত বিরুদ্ধতার সমন্বয় যাঁরা করেছিলেন এবং যাঁরা আজও সেই ধারা অব্যাহত রেখেছেন, স্বামী প্রেমানন্দের উৎসর্গময় জীবনের অম্লান দীপ্তি তাঁদের পথভ্রান্ত করবে না।

আমাদের মত বয়সের অনেকের মনে আছে—প্রেমানন্দের পূর্ববঙ্গভ্রমণের কথা। ভক্তদের আগ্রহে তিনি রাজী হলেন। আমার বড়দাদা শৌর্যেন্দ্রনাথ মজুমদার সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। আমরা সঙ্গী হ'লাম। ট্রেনে সিরাজগঞ্জ হয়ে ষ্টীমারে পোড়াবাড়ী। যমুনার বিশাল বিস্তার দেখে তিনি বালকের মতো অধীর হয়ে উঠলেন। ছোট ডিঙ্গী নৌকা ঢেউএর দোলায় নাচছে,—পাট বোঝাই গাধাবোট টেনে চলেছে ছোট ষ্টীমার, আমাদের ষ্টীমার চলেছে পাড় ঘেঁসে, ঘন গাছপালায় ঘেরা গ্রাম, টিনের ঘরগুলি রৌদ্রালোকে জ্বলছে—প্রেমানন্দজী ডেকে চেয়ারে বসে দেখছেন আর তাঁর বিশিষ্ট ভঙ্গীতে মাথা দোলাচ্ছেন। রাঢ়দেশের মানুষ তিনি,—সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির এই অপরূপ রূপে মুগ্ধ হ'লেন। একবার আমাদের দিকে চেয়ে বললেন, পূর্ববঙ্গের ছেলেরা যে দুঃসাহসে দেশের কাজে কেন ছুটে যায়, এই কূলভাঙ্গা নদী দেখে তা বুঝতে পারছি। আমি তোদের ভালবাসি, আজ তোদের দেশ দেখে সে ভালবাসা আরো গভীর হ'ল।

পোড়াবাড়ী ষ্টেশন থেকে পাল্কী করে টাঙ্গাইল (মহকুমা শহর) হয়ে ঘারিন্দা গ্রাম। পথের দুধারে গ্রামের নরনারী দাঁড়িয়েছে, দর্শনের আশায়। সম্মুখে চলেছে কীর্তনের দল। আমাদের বহির্বাটি মহাতীর্থ হয়ে উঠ্‌লো, জলস্রোতের মতো জনস্রোত, গভীর রাত্রি পর্যন্ত কীর্তনে সারা গ্রাম মুখরিত। গ্রামের মাঝখানে বিরাট অন্নসত্র—চারদিক থেকে ভারে ভারে চালডাল তরিতরকারী আসছে, ভোগ রান্না ও পরিবেশনে ছেলে বুড়ো কোমর বেঁধে লেগেছে। সে এক সমারোহ ব্যাপার। ভক্তরা কাণ্ড দেখে অবাক। স্বামী প্রেমানন্দজী দেখে বলেন—সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। ইতর ভদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র কোন ভেদাভেদ রইল না। এমন দৃশ্য কেউ এ দেশে দেখেনি। প্রেমানন্দ যেন তাঁর আশ্চর্য উদার হৃদয় দিয়ে জনমণ্ডলীকে আকর্ষণ করছেন। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা পর্যন্ত অভ্যাস-গত দ্বিধা সঙ্কোচ ভুলে গেল। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ সম্পর্কে যাঁদের মনে বিরূপ ধারণা ছিল, তাঁরা অনুতপ্ত চিত্তে "শূদ্র সন্ন্যাসীর" পদধূলি নিয়ে কৃতার্থ হলেন।

একদিন সন্ধ্যায় এক মৌলবী তাঁর গুটিকয় শিষ্য নিয়ে এলেন। দম্ভভরা ভঙ্গীতে বাবুরাম মহারাজের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বল্লেন, আমি ম্লেচ্ছ, আমাকে আলিঙ্গন করতে পারেন? প্রেমানন্দজী তাঁকে প্রীতি-ভরে আলিঙ্গন করে পাশে বসালেন। বৈঠকখানার বিস্তৃত ফরাসে ভক্তরা বসেছেন। মৌলবী চারদিকে চেয়ে বললেন, আপনি তো ঈশ্বর-জানিত পুরুষ, নিশ্চয়ই ভেদাভেদ মানেন না, আমার সঙ্গে এক পাত্রে আহার করতে পারেন? মৌলবী অনেকের পরিচিত, তাঁরা বিরক্ত হয়ে মৃদু প্রতিবাদ তুললেন। প্রেমানন্দজীর মুখ গম্ভীর—আদেশ দিলেন, ফল নিয়ে এসো। এক থালা ফল সম্মুখে রাখা হ'ল। প্রেমানন্দজী বল্লেন, মৌলবী সাহেব, গ্রহণ করুন। মৌলবী এক টুক্‌রো আম তুলে নিলেন, তিনিও তাঁর স্পৃষ্ট পাত্র থেকে এক টুক্‌রো ফল মুখে দিলেন। একটা বড় রকম জয়ের গর্বে মৌলবী চারদিকে চাইলেন। এমন সময় প্রেমানন্দজী মৌলবীর দু'হাত ধরে বল্লেন, এর পর? তারপর যা ঘটলো, জীবনে তা কখনো দেখিনি। মৌলবী দু'হাঁটু গেড়ে বসে মাথা কুট্‌তে লাগলেন ফরাসের ওপর—তাঁর কণ্ঠে আর্ত ক্রন্দনে ধ্বনিত হতে লাগলো, আনল হক্, আনল হক্। ক্রমে আনত শির আর উঠলো

না, তাঁর সমস্ত দেহ কাঁপতে লাগলো, হিক্কা রোগীর মত ক্ষণে ক্ষণে শিউরে বল্‌তে লাগলেন, আনল হক্। প্রেমানন্দজী হাস্য মুখে মৌলবীর দিকে চেয়ে আছেন, সমবেত জনতা নিস্তব্ধ। অনেকক্ষণ পর মৌলবী প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠে বসলেন। স্বামিজীকে নত হয়ে নমস্কার করে নীরবে চলে গেলেন। পরে জেনেছিলাম মৌলবী সুফী-সম্প্রদায়ভুক্ত, কিন্তু এমনটা কেন ঘটুলো, সে রহস্য অজ্ঞাতই থেকে গেল।

ঘারিন্দা থেকে বাবুরাম মহারাজ বিক্রমপুর চলে গেলেন। সেখানে সোনারং গ্রামে একটা কচুরী পানায় পূর্ণ পুকুর দেখে তিনি ওটা সংস্কারের প্রস্তাব করলেন। তাঁর উৎসাহবাণীতে তখনই শতাধিক যুবক ঠাকুরের নামে জয়ধ্বনি দিয়ে পুকুরে নেমে পড়লো। প্রেমানন্দও স্থির থাক্‌তে পারলেন না। কোন নিষেধ অনুনয় তিনি শুনলেন না। কোমর জলে দাঁড়িয়ে কচুরী পানা সরাতে লাগলেন। এর পর যখন বেলুড় মঠে ফিরে এলেন, তখন তাঁর দেহে কালা জ্বরের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। চিকিৎসার জন্য তাঁকে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে আনা হ'ল। দেহ শীর্ণ, সোনার বরণ কালি হয়ে গেছে,—কিন্তু সেই মধুর হাসি, অমিয় বচন ম্লান বা নিস্তেজ হয়নি। চিকিৎসা নিষ্ফল, অন্তরে অন্তরে আমরা বুঝলাম—তাঁর নরলীলার অবসান আসন্ন। বহু তাপিতের হৃদয়ে স্নিগ্ধ শান্তিবারি বর্ষণ করে, বহু চরিত্রবান যুবককে নরনারায়ণের সেবায় উদ্বুদ্ধ করে, নব যুগের সন্ন্যাসের আদর্শ পরবর্তীদের হৃদয়ে দৃঢ়াঙ্কিত করে, ঈশ্বরীয় প্রেম ও মানবীয় ভালবাসার প্রেমঘনমূর্তি স্বামী প্রেমানন্দ ইহলোক থেকে অপসৃত হয়ে গেলেন।

সাধনায় শ্রীগুরুতত্ত্বের স্থান

শ্রীকালিদাস মজুমদার

সাধনায় শ্রীগুরুতত্ত্বের স্থান অতি উচ্চে। শ্রীরামাদি অবতারগণও যথাবিধি লৌকিক গুরুর নিকট দীক্ষা লইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, লৌকিক গুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ ঈশ্বরের অভিপ্রেত। দীক্ষাগ্রহণের অনুকূলে বহু শাস্ত্রীয় বচনও আছে। গুরুর কি প্রয়োজন, দীক্ষার কি প্রয়োজন, গুরু কে, মন্ত্র কি—এ সম্বন্ধে সাধারণ লোকের মধ্যে এবং অনেক দীক্ষিত নরনারীর মধ্যেও সুস্পষ্ট ধারণা নাই, পরন্তু কিছু কিছু ভ্রমাত্মক ধারণাও আছে।

প্রশ্ন এই, প্রকৃত পক্ষে গুরু কে এবং কেন? ইহার উত্তর, ঈশ্বরই গুরু, কারণ তিনি (ক) পথ-নির্দেশক (খ) মায়াপসারক এবং (গ) সাফল্যদাতা। তিনি যে নরদেহ আশ্রয় করিয়া উক্ত কর্মসমূহের সম্পাদন করিয়া থাকেন, সেই নরদেহধারী গুরুও ঈশ্বরের প্রতিমার মত মাহাত্ম্যপ্রাপ্ত ও পূজ্য হন।

(ক) মান, যশ, ধর্ম, অর্থ, উচ্চপদ, স্বর্গাদি অপবর্গ, অথবা ইষ্টসম্মেলন, আত্মদর্শন, মোক্ষ প্রভৃতি উচ্চবর্গ যাহা কিছু রুচিভেদে, আধারভেদে মানবের কাম্য তৎসমুদায় একমাত্র ঈশ্বরই প্রদান করিতে পারেন। ইহা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে তাঁহার নিকট কিছু পাইতে হইলে প্রথমে তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে। কখন কিসে তাঁহার সন্তোষ হয় তাহার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই, কারণ তিনি কোন নিয়মের অধীন নহেন। তাঁহার রুচিও বহুপ্রকারের। এই বৈচিত্র্যপূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টিই

তাঁহার বহু রুচির প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কাহার নিকট হইতে কোন প্রকারের সেবাকর্ম, ভালবাসা বা ব্যবহার পাইতে তিনি ইচ্ছা করেন, তাহা একমাত্র তিনিই জানেন এবং বলিতে পারেন। বহু জন্মের বিবর্তনের ফলে নিজ নিজ আধ্যাত্মিক ক্রমোন্নতি বা ক্রমবিকাশাবস্থা অনুযায়ী জীবাত্মার এক একটি আধার গঠিত হয়। সেই আধারকে তাহার শক্তি ও উপযোগিতা অনুসারে যে ভাবে চালিত করিলে সর্বোত্তম শুভ হয় তাহা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। তাই আধ্যাত্মিক জগতে গুরুরূপী ঈশ্বরের এত গুরুত্ব। সেইজন্যই ঈশ্বরই একমাত্র গুরু। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সচ্চিদানন্দই গুরু"।

(খ) দ্বিতীয়তঃ, শ্রীগুরু অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করিয়া মায়োপহিত চৈতন্য জীবকে তাহার আত্ম-দেবের সহিত মিলিত* হইবার বা আত্মজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। মায়া ব্রহ্ম-শক্তি। ঈশ্বর ব্যতীত আর কেহই মায়ার কবল হইতে সাধককে মুক্ত করিতে পারেন না; সুতরাং মায়াপসারক হিসাবে ব্রহ্ম বা সচ্চিদানন্দই গুরু। কিরূপে মায়ার ক্রমশঃ অপসারণ হয়? মন্ত্রপ্রদানের ফলে সাধকের আধ্যাত্মিক নবজন্ম ও শক্তিলাভ হয়। এই নূতন পরিবেশ সাধন-জীবনের যথেষ্ট অনুকূল হয়। পরে সাধনাপ্রভাবে ক্রমশঃ মায়ার অপসারণ হইতে থাকে।

গুরুদত্ত দীক্ষা ও উপদেশ ঈশ্বরদত্তজ্ঞানে সর্বদা অনুসরণ ও মান্য করা উচিত; কারণ, মৃন্ময়ী প্রতিমাতে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান হওয়ার ফলে তাহা যেমন ঈশ্বরবৎ পূজ্য হন এবং ঈশ্বরের একটি রূপ হিসাবে গ্রাহ্য হন সেইরূপ গুরুও ঈশ্বর হন এবং ঈশ্বরবৎ পূজ্য হন। গুরূপদেশ সকল সাধনার মূল।

(গ) গুরুই সিদ্ধিদাতা। যেমন কেহ পূজিত প্রতিমাকে ঈশ্বরের সহিত ভেদ করে না, সেইরূপ দীক্ষাদাতা গুরু ও ঈশ্বরে ভেদ করা কর্তব্য নহে। যেমন কেহ প্রতিমাকে শিলাখণ্ড মনে করিলে ভগবৎ-কৃপা লাভে বঞ্চিত হয়, তদ্রূপ গুরুকে মানুষ মনে করিলেও সাধনায় সাফল্যলাভ করিতে পারে না।

অনেক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তি নশ্বর পাঞ্চ-ভৌতিক দেহধারী ক্ষুৎপিপাসাতুর ইন্দ্রিয়-পরিচালিত মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা অর্পণে অপারগ হইয়া কাহাকেও গুরুপদে বরণ করিতে পারেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গী অজ্ঞতার পরিচায়ক। পাঁচ টাকা মূল্যের মাটির প্রতিমায় বাহ্যদৃষ্টিতে কি এমন অনন্তজ্যোতি সত্য-শিবসুন্দরের পরিচয় পাওয়া যায় যে কোটি কোটি হিন্দু সেইরূপ প্রতিমাকে ঈশ্বরবোধে পূজা করে? যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে গুরুকে দেবোচিত শ্রদ্ধার্পণ করা অসম্ভব হইবে কেন? যদি পিতার প্রতিকৃতি (photo) জীবন্তভাবে না উঠিয়া থাকে, তাহা হইলে সন্তান কি সেই প্রতিকৃতির অমর্যাদা করে? ঈশ্বরের বাক্য-বিলসিত বোধে শিখ সম্প্রদায় যদি গ্রন্থসাহেবকে এবং হিন্দুরা শ্রীশ্রীচণ্ডীকে পূজা করিতে পারেন, ঈশ্বরের প্রতিনিধি মহাত্মা যীশুর প্রতীক বলিয়া যদি খ্রীষ্টানগণ পবিত্র ক্রুশের প্রতি দেবোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে পূর্বোক্ত পণ্ডিতম্মন্যগণ কেন মানবদেহ-ধারী গুরুকে শ্রদ্ধা করিতে পারিবেন না—বিশেষতঃ শাস্ত্রে যখন একথা বলা হইয়াছে যে, মন্ত্রপ্রদানকালে গুরুর কণ্ঠে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হয় (যস্য বক্ত্রাদ্বিনি-র্যাতং পূর্ণব্রহ্মময়ং বপুঃ)।

গুরুর মহিমা সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রবাক্য আছে; এ স্থলে কয়েকটি উদ্ধৃত হইল। জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা ব্রহ্মদাতা পিতা (গুরু) অধিক পূজ্য [শ্রীক্রম]। মন্ত্রত্যাগের ফল মৃত্যু, গুরুত্যাগের ফল দরিদ্রতা, গুরু ও মন্ত্র উভয়ের ত্যাগের ফল নরকবাস। নিজ গুরুর সম্মুখে অন্য দেবতার পূজা করিলে সে পূজা নিষ্ফল হয় [জ্ঞানার্ণব]। গুরু কোন শাস্ত্রবাক্যের অধীন নহেন। গুরুর ব্যবহার্য বস্তুসমূহ—শয্যা, আসন, পাদুকা, বস্ত্র প্রভৃতি লঙ্ঘন করা অনুচিত [দেব্যাগমে শিববাক্য], অর্থাৎ

সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। গুরুর সহিত বাণিজ্যাদি করা নিষিদ্ধ এবং তাঁহাকে ঋণদান বা কোন দান করা যায় না [রুদ্রযামল], তবে শ্রদ্ধা সহকারে উপহার বা প্রণামী দেওয়া যায় এবং উৎসর্গ করা যায়।

যাহাতে ভবিষ্যতে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা হ্রাস প্রাপ্ত না হয়, এতদুদ্দেশ্যে দীক্ষাগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিকে তন্ত্র নিন্দনীয় লক্ষণযুক্ত গুরুবরণে নিষেধ করিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহণের পূর্বে অনুসন্ধান চলে, কিন্তু দীক্ষা গ্রহণের পর গুরু বাহ্যতঃ যাহাই হউন না কেন, শিষ্যের চক্ষে আর জীবপদবাচ্য থাকেন না, ঈশ্বরপদবাচ্য হন। বিবাহব্যাপারে লোকে যে কুলশীলাদির অনুসন্ধান করিয়া থাকে তাহা যেমন ব্যবহারিক দৃষ্টিতে অযৌক্তিক নহে, বরং সমর্থনযোগ্য, তদ্রূপ গুরুনির্বাচনের ব্যাপারেও উক্তরূপ আচরণ দূষণীয় নহে। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও স্বামী বিবেকানন্দকে গুরুবরণের পূর্বে যথেষ্ট পরীক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে দীক্ষাদানের পূর্বে কিয়ৎকাল শিষ্যসঙ্গ করিবার কথা আছে—শিষ্য-পরীক্ষার জন্য; ইহাতে ব্যুৎক্রমে গুরু-পরীক্ষাও সূচিত হয়। এই পরীক্ষা বা নির্বাচন লৌকিক বিশ্বাসের ক্ষীয়মাণতার জন্যই সমর্থন করা যায়। বাস্তবিক কিন্তু গুরুর লৌকিক কুলশীল বিদ্যার উপর শিষ্যের উপকার তত নির্ভর করে না, যত করে শিষ্যের সক্রিয় গুরুভক্তি ও গুরুনিষ্ঠার উপর এবং গুরুদেবের শিষ্যের প্রতি ঐকান্তিক স্নেহ এবং আশীর্বাদের উপর। সেইজন্যই গুরু ব্রাহ্মণ কি শূদ্র তাহাতেও কিছু আসে যায় না, যে হেতু ঈশ্বর জাতিকুলবর্ণাতীত। ব্রাহ্মণ গুরুর শিষ্য যে শূদ্র গুরুর শিষ্য অপেক্ষা অধিক উন্নত হইবে এমন কথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। যেমন স্বর্ণময়ী ও মৃন্ময়ী প্রতিমাতে পূজায় ফলের তারতম্য প্রতিমার উপাদানের উপর নির্ভর করে না, পরন্তু পূজার উৎকর্ষ বা অপকর্ষের উপর নির্ভর করে; তদ্রূপ ব্রাহ্মণ গুরু ও শূদ্র গুরুর শিষ্যের সাধনার ফল তাহাদের গুরুদ্বয়ের বর্ণভেদের উপর নির্ভর করে না, করে তাহাদের নিজ নিজ সাধনার উৎকর্ষ-অপকর্ষের উপর। (ক্রমশঃ)

প্রণাম

শ্রীঅটলচন্দ্র দাশ

আজো আমি হেরি সুখে,—এ নবীন যুগে
যেথা আছে দেবালয় ধরণীর বুকে,
যে হৃদয়ে ভক্তি-প্রেম-নির্ঝরিণী বয়,
যেথা সুখী দম্পতির নিভৃত আলয়,
ভাই-বোনে গড়ে প্রীতি, পিতা-মাতা-পায়ে—
সন্তান সুধন্য হয় ভকতি জানায়ে
শক্তি মত সবে খাটি অন্ন গৃহে আনে—
সততা ও সন্তোষের আনন্দ বয়ানে,
যেথা কেহ ক্ষুদ্র স্বার্থ দূরে বিসর্জনি
দুর্গতে করিছে সেবা স্ব-বান্ধব মানি,
সাঁঝে-ভোরে ভগবানে ভক্তি-ভরে ডাকে,
একতার সুনিবিড় বন্ধনেতে থাকে,
সেথায় মানুষ ভুলি' মান-অভিমান—
সম্ভ্রমে নোয়ায়ে মাথা জানায় প্রণাম॥

নীলকণ্ঠের গান

শ্রীজয়দেব রায়, এম্‌-এ, বি-কম্‌

বাংলা দেশের প্রাচীন সঙ্গীত-রচয়িতাদের মধ্যে নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় নানাভাবে বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের মতন সম্পূর্ণ বিশিষ্ট শ্রেণীর সাধনসঙ্গীত, দাশুরায়ের মতন সর্বজনপ্রিয় পাঁচালী গান অথবা কবির গান-রচকদের মতন সাধারণের রুচিকর প্রেমগীতির প্রচলিত কোন ধারারই একনিষ্ঠ অনুগামী তিনি হ'ন নাই, কিন্তু তাঁহার গানে ঐ সকল বিশিষ্ট রীতির প্রত্যেকটির প্রভাব লক্ষিত হয়। অবশ্য বাংলাদেশের অন্যান্য গানের ন্যায় কীর্তনভঙ্গীই তাঁহার গানের আগা-গোড়ায় অল্পবিস্তর রহিয়াছে।

নীলকণ্ঠের গীত একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর যাত্রাগান নামে সে সময়ে পরিচিত ছিল। যাত্রাগানে সে সময়ের অন্যান্য সকল শিল্পকলার মিশ্রণ হইয়াছে। যাত্রায় গীত, গল্পকাহিনী, নাট্যাভিনয়, ভাঁড়ামি প্রভৃতি নানা অঙ্গের সম্মিলন হইত। কৃষ্ণলীলা পালাই যাত্রার প্রধান উপজীব্য ছিল এবং এ পালার নাম অনুসারে সকল যাত্রাকেই 'কালীয়দমন' বলিয়া অভিহিত করা হইত।

পূর্বে হয়ত অন্য কাহিনীও অভিনীত হইত, কিন্তু শিশুরাম অধিকারীর নেতৃত্বে এমনভাবে যাত্রা-গানের সংস্কার হইল যে, পরবর্তী সমস্ত যাত্রাই এক রকম ব্রজলীলা-অবলম্বনে রচিত হইতে লাগিল। শিশুরামের শিষ্য পরমানন্দ অধিকারীর যত্নে কালীয়দমন যাত্রা একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ লাভ করিল।

যাত্রার পূর্ব ইতিহাস অনুধাবন করিলেও দেখা যায় চিরকালই কৃষ্ণলীলা-প্রচারই মূল উদ্দেশ্যরূপে বিবেচিত হইত। বাংলাদেশে 'কানুছাড়া গীত' সম্ভব নয়! মহাপ্রভুর জন্মের পূর্বে রচিত হইয়াছিল বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, গুণরাজ খাঁনের শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং কোন কোন মঙ্গলকাব্য—এগুলির প্রত্যেকটিই নাটকীয় গীতপদ্ধতিতে রচিত। মহাপ্রভু নিজে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অভিনয় করিতেন।

মঙ্গলগানের নাট্যাভিনয়ে গায়কগণ একাই আসরে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতরণ করিতেন। মনসামঙ্গল গান, মনসার ভাসান, বেহুলা প্রভৃতি নানা নামে পূর্ববঙ্গের নানা অংশে অভিনয় সহকারে গীত হইত।

পরবর্তী কালে কীর্তনের কাহিনী-অংশকে স্বতন্ত্রভাবে অভিনয় করিয়া তাহাকে যাত্রার মর্যাদা দেওয়া হইয়াছিল। শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর প্রারম্ভিক বন্দনা, রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনা প্রভৃতি কীর্তনের প্রচলিত রীতিতেই যাত্রার আসরেও গীত হইত।

পরমানন্দ অধিকারীর যাত্রায় ঝুমুর, বাউল প্রভৃতি লোকসঙ্গীতও স্থান পাইয়াছিল। 'কালীয়-দমন' যাত্রার প্রধান পালা ছিল চারটি—মান, কলঙ্কভঞ্জন, মাথুর এবং মিলন। এ ছাড়া প্রত্যেক পালার শেষে 'দূতীসংবাদ' নামে একটি বিশেষ সুরস-প্রযুক্ত অংশ ছিল। গোবিন্দ অধিকারী এই দূতীসংবাদে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেন। গোবিন্দ অধিকারী হুগলী জেলায় জাঙ্গিপাড়া গ্রামে ১২০৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন; বিদ্যাচর্চায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি না দেখাইলেও গীতচর্চায় তিনি বাল্য বয়স হইতেই খ্যাতি-লাভ করিয়াছিলেন। গোলোকচন্দ্র দাস ছিলেন গোবিন্দের সুরগুরু, তাঁহার একটি কীর্তনের দল ছিল। গোবিন্দ অধিকারী সেই দলের অন্যতম গায়করূপে আসরে প্রথম অবতীর্ণ হইলেন। জনসমাজের রুচির তখন পরিবর্তন ঘটিয়াছে। অবিমিশ্র সঙ্গীতের সমাদর কমিয়াছে, শ্রোতারা আসরে ক্রমে

দর্শকে পরিণত হইতেছে। গোবিন্দ অধিকারী তাহাদের চাহিদা অনুযায়ী কীর্তনের দলকে যাত্রার দলে রূপান্তরিত করিলেন।

নীলকণ্ঠ এই গোবিন্দ অধিকারীর প্রিয়তম শিষ্য। ১২৬৮ সালে বর্ধমান জেলায় ধরণীগ্রামে তাঁহার জন্ম হয়; বাল্যবয়সে লেখাপড়ায় বিশেষ সুযোগ তাঁহার না হইলেও পরিণত বয়সে সংস্কৃত ভাষা এবং শাস্ত্রাদির তিনি রীতিমত চর্চা করিয়াছিলেন। সঙ্গীতে অবশ্য চিরকালই তাঁহার বিশেষ উৎসাহ ছিল, গোবিন্দ অধিকারী তাঁহাদের গ্রামে যাত্রা গাহিতে গিয়া নীলকণ্ঠের সুকণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে দলে ভিড়াইয়া লইলেন।

সেখানে নীলকণ্ঠের সাগরেদী শুরু হইল, সুরচর্চা ও বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার কবিত্ব-প্রতিভারও বিকাশ হইতে লাগিল। গোবিন্দ অধিকারীর মৃত্যুর পর তাঁহার শূন্যস্থান সর্বাংশে নীলকণ্ঠই পূর্ণ করিলেন এবং তাঁহার যাত্রার দল-পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। নীলকণ্ঠ তাঁহার গুরু 'গোবিন্দে'র সংস্পর্শে আসিবার পূর্বে গোপাল রায় এবং গঙ্গানারায়ণ রায়ের নিকটও কিছুদিন সাগরেদী করিয়াছিলেন।

অধিকারী পদপ্রাপ্তির অল্পদিনের মধ্যেই নীলকণ্ঠের খ্যাতি সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িল। যাত্রাধিপতিরা সে সময়ে কি বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করিতেন, আজ আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারিব না; দূরদূরান্ত হইতে ভক্ত শ্রোতারা কেবলমাত্র তাঁহার দর্শনলাভের আশায় আসরে আসিয়া প্রতীক্ষা করিত।

নীলকণ্ঠ ভক্ত কবিও ছিলেন; তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ ভক্তিসঙ্গীত সেদিনের আসরের শ্রোতাদেরই কেবল মুগ্ধ করে নাই—আজও বাংলার গ্রামে গ্রামে সেগুলি ঠিক তেমনি শ্রদ্ধাসহকারে গীত হইয়া আসিতেছে। বৃন্দাবন-গাথা লইয়া রচিত গানগুলি নীলকণ্ঠের এ ভাবে পদাবলীর পর্যায় উন্নীত হইয়াছে—

আমায় দে গো মোহন চূড়া বেঁধে।
আমি কেন কেঁদে মরি, কৃষ্ণরূপ ধরি, দাঁড়াব চরণ ছেঁদে—আমায় দে গো।
ব্রজলীলা আমি করব যতদিন চন্দ্রাবলীর প্রিয় হব ততদিন,
শ্যামের বদন নলিন হইবে মলিন রাই অদর্শনের খেদে॥

এগুলির সুর ঠিক কীর্তনাঙ্গের নয়, বাউলাঙ্গেরও নয়—একটি বিশিষ্ট গীতিভঙ্গীতে তাঁহার এ সমস্ত গান রচিত। যাত্রার আসরে যখন গাওয়া হইত, তখন এগুলির আবেদন এক প্রকার ছিল; তাহার পর কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হইয়া এগুলি সম্পূর্ণ বিশিষ্ট একটি রীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাঁহার এসব গান কণ্ঠবাবুর গাননামে বৈরাগী সম্প্রদায়ের ভিক্ষা উপজীবিকার অবলম্বন হইয়া প্রচারিত হইয়াছে। প্রত্যেকটি গানের মধ্যেই একটি অলৌকিক বিচ্ছেদব্যথা এবং আক্ষেপ প্রকাশ পাইয়াছে—অবশ্য গানের ভাষাভঙ্গী সেই চিরাচরিত প্রথায়—

মরি মরি সখি, তমাল দেখে আমার অঙ্গ পোড়ে। মরি গো শ্যাম বিচ্ছেদ শরে॥
তমালের অঙ্গের বরণ, শ্যামের শ্যাম অঙ্গ যেমন। তমাল করিলে দরশন, আমার অঙ্গ শিহরে॥
তমাল বন তমাল তলা, ফুরায়েছে সে সব খেলা। কণ্ঠ কহে চিকণ কালা না রহে তমাল ছেড়ে॥

বৈষ্ণব কবিদের সমস্ত বৈশিষ্ট্যই তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে; বৃন্দাবন-পদাবলীর মতন গৌরপদাবলীও তিনি রচনা করেন, যাত্রার প্রারম্ভে গৌরচন্দ্রিকা রূপে সেগুলি গীত হইত। যেমন—

শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর নবনটবর, তপন কাঞ্চন কায়।
করে স্বরূপ বিভিন্ন, লুকাইয়ে চিহ্ন, অবতীর্ণ নদীয়ায়॥

কলিঘোর অন্ধকার বিনাশিতে,　　　উন্নত উজ্জ্বল রস প্রকাশিতে,
তিন বাঞ্ছা তিন বস্তু আস্বাদিতে,　　　এসেছে তিনেরি দায় ;
সে তিন পরশে, বিরস-হরষে,　　　দরশে জগৎ মাতায় ॥

কেবল বৈষ্ণব পদাবলীই নয়, রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের মতন নীলকণ্ঠের শ্যামাসঙ্গীত এবং উমা-সঙ্গীতেরও বিশেষ প্রতিষ্ঠা হইয়াছে, এসব গানের মধ্যে তাঁহার পাণ্ডিত্য এবং তত্ত্ববিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়। শ্যামার ভয়ঙ্কর রূপটিকে শব্দচ্ছটার সংকর্ষণে প্রকাশ করিয়াছেন—

ঘোর ধ্বান্তবরণী, দুঃখান্তকরণী,　　　কার কামিনী, কামান্ত উরে।
দক্ষ করে নরে বিতরে বরাভয়,　　　কভু দনুজদলে করয়ে পরাজয়,
যখন দন্তে বামা ফেলয়ে পদদ্বয়,　　　মনে লয় হয় বা প্রলয় এই বারে ॥

নীলকণ্ঠের একশ্রেণীর গান ভক্তিরসে উচ্ছ্বসিত। যে সব গানে সুররসকে অযথা প্রাধান্য না দিয়া ভাবাবেগকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে, সেগুলিই অধিকতর জনসমাদর লাভ করিয়া বহুল প্রচারিত হইয়াছে। নিম্নের গানটি নীলকণ্ঠের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গান—

(আমার) কতদিনে হবে সে প্রেমসঞ্চার।
কবে বলতে হরিনাম, শুনতে গুণগ্রাম,　　　অবিরাম নেত্রে বহে অশ্রুধার,
(কবে) সুরসে রসিক হইবে রসনা,　　　জাগিতে ঘুমাতে ঘুষিবে ঘোষণা,
কবে যুগল মন্ত্রে হবে উপাসনা,　　　বিষয়বাসনা ঘুচিবে আমার ॥

'কবিয়াল'রা তখনকার আসরের সাধারণ শ্রোতাদের রুচির চাহিদা অনুসারে গান রচনা করিতেন। নীলকণ্ঠও তাঁহার যাত্রার আসরে তাহাদের চাহিদাকে উপেক্ষা করিতে পারেন নাই ; ভক্তিরস ছাড়া হাস্যরস এবং পারমার্থিক বিষয় ছাড়া সময়োপযোগী ঘটনা লইয়া গান তাঁহাকেও রচনা করিতে হইয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁহার একটি 'পাকাফলার' বা লুচিবন্দনা গান উদ্ধৃত করা হইল—

লুচি, তোমার মান্য ত্রিভুবনে।
তুমি সুপবিত্র শুচি, অরুচির রুচি, দেখলে বাঁচি এ জীবনে ॥
যাগযজ্ঞ শুভকর্মাদি, বিবাহ তোমা বিনা কারও না হয় নির্বাহ।
শ্রাদ্ধ দুর্গাপূজায় মিলে রাজা প্রজায় তোমায় ভাজে সযতনে ॥

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মহাপ্রয়াণে রাজভক্ত যাত্রার আসরে গীত হইল—

ভারত অন্ধকার এত দিনে।
হরি হরি হরি, পন্থা নাহি হেরি,　　　ভারতেশ্বরী মা বিনে।
হায় হায় এ কি হইল দুর্দিন,　　　সুখময় সূর্য কালাভ্রে বিলীন,
কাতরে কাঁদিছে নবীন প্রবীণ,　　　সবার বদন মলিন এক্ষণে ॥

কিন্তু এ সমস্ত গান অকিঞ্চিৎকর, তাঁহার আসল পদাবলী গানগুলি, কবির ভাষায়—"আজিও রাঢ়বঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপে, মাঠে, হাটে, খেয়াতরীতে, দীঘিপুকুরের ঘাটে ঘাটে মুক্তকণ্ঠে উদ্গীত হয়। রাঢ়বঙ্গের বৈরাগী ভিখারীরা নীলকণ্ঠের গান গাহিয়া গৃহে গৃহে বৈরাগ্যের বাণী শুনাইয়া ঘুরে। প্রতিদিন অন্নগ্রহণের আগে তাহারা অন্নদাতা ভগবানের করুণার কথা শোনে, তাহাদের বিষয়াসক্ত মন ক্ষণকালের জন্য একটু চঞ্চল হয়। একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসেই হয়ত সে চঞ্চলতার পরিসমাপ্তি হয়, কিন্তু প্রতিদিনকার নামশ্রবণের ফল একটু একটু করিয়া তাহাদের চিত্তে সঞ্চিত হইতে থাকে। তাই নীলকণ্ঠকে আমরা ধর্মগুরু বলিয়া মনে করি।"

সমালোচনা

সঙ্গীত ও সংস্কৃতি ঃ—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ-প্রণীত ; শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬ ; ডিমাই সাইজ ৩৭৬ পৃষ্ঠা ; মূল্য ১০৲ টাকা।

সঙ্গীতের সহিত সংস্কৃতির নিবিড় আত্মিক যোগ রহিয়াছে। কিন্তু সেই যোগকে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে গেলে সঙ্গীত এবং সংস্কৃতি উভয়েরই গূঢ় তত্ত্ব ও ধারাবাহিক ক্রমবিকাশের পরিচয় আবশ্যক। সঙ্গীত-শাস্ত্রে ভূয়িষ্ঠ অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বহুশ্রুত গ্রন্থকার আলোচ্য পুস্তকে সেই পরিচয় অতি যোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন। এই বইখানি লেখকের 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস'-রূপ বৃহত্তর পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়। বেদের সংহিতা যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরকালীন ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, প্রাতিশাখ্য এবং শিক্ষা গ্রন্থাদির মধ্যে ভারতীয় সঙ্গীতের (গীত, বাদ্য এবং নৃত্য) উৎপত্তি, ক্রিয়া এবং ক্রমপরিণতির যে সকল মূল্যবান তথ্য বিকীর্ণ রহিয়াছে বিস্ময়কর অধ্যবসায় এবং গবেষণা সহকারে লেখক তাহাদের উদ্ধার এবং সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। সিন্ধু উপত্যকা-সভ্যতা (মহেঞ্জোদড়ো ও হারাপ্পা) এবং ঐ যুগে সঙ্গীতের বিকাশ লেখকের সিদ্ধান্তে বৈদিক যুগের পরে। এই সিদ্ধান্তের অনুকূলে অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক, ঐতিহাসিক এবং মনীষীর উক্তি গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। লেখকের নিজের বিচারধারাও বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। গ্রন্থের একটি অন্যতম মূল্যবান সিদ্ধান্ত-সম্বন্ধে ভূমিকায় অধ্যাপক শ্রীঅর্ধেন্দ্র কুমার গঙ্গোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"বৈদিক 'শিক্ষা'-গ্রন্থাবলীর 'মাণ্ডুকীশিক্ষা' ও 'নারদীশিক্ষা' বিশ্লেষণ ক'রে স্বামীজী প্রমাণ করেছেন যে, সাম-গানে সপ্তস্বরের প্রয়োগ হইত। এই তথ্য সম্পূর্ণরূপে নূতন আবিষ্কৃত সত্য,—ইহার আবিষ্কারে ভারতের প্রাচীন সঙ্গীতের ইতিহাসের একটী নূতন বাতায়ন উন্মুক্ত হইল—তাহার জন্য ভাবিকালের ভারত-সঙ্গীতের ঐতিহাসিক স্বামীজীকে শ্রদ্ধার সহিত অভিনন্দন করিবেন।" 'ভারতবর্ষের সঙ্গে ভারতেতর দেশের যোগাযোগ' আলোচনা প্রসঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, পাশ্চাত্ত্য, রাশিয়া, পারস্য, আরবদেশ ও চীনে সঙ্গীতের বিকাশ অনুসরণ করিয়া লেখক ঐ ঐ বিকাশে ভারতীয় সঙ্গীত ও সংস্কৃতির অবদান সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহা সন্ন্যাসি-লেখকের ভারত-সংস্কৃতির উপর একটি অন্ধ আবেগ হইতে প্রসূত এ কথা বলা চলে না, তাঁহার প্রচুর যুক্তিবহুল বিবৃতি বিদ্বন্মণ্ডলীর ধীরভাবে বিচার ও পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

সঙ্গীতসম্রাট ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ সাহেব তাঁহার শুভেচ্ছা লিপিতে বলিয়াছেন,—"আমার বিশ্বাস এই ধরণের বই সাধক ঋষি মুনি ছাড়া কেউ লিখতে পারে না। কি প্রাচ্য, কি পাশ্চাত্ত্য সকল দেশের সঙ্গীত-গুণীরই এই বই পরম উপকার সাধন করবে।" গ্রন্থ ও গ্রন্থকার সম্বন্ধে এই প্রশংসা আমাদের মতে অত্যুক্তি নয়। রাগ বসন্ত এবং রাগিণী গুর্জরীর দুইখানি রঙীন ছবি এবং গীত, বাদ্য, নৃত্য ও মুদ্রা-সংক্রান্ত বহুসংখ্যক আলোক- ও রেখা-চিত্র পুস্তকের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে। ছাপা এবং বাঁধাই নিখুঁত।

—'অনিরুদ্ধ'

A Phase of The Swadeshi Movement—অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জি এবং অধ্যাপিকা উমা মুখার্জি-প্রণীত। প্রকাশক—চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা : পৃঃ ৮৪ ; মূল্য দুই টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক-লেখিকা কয়েক বৎসরের মধ্যে স্বদেশী যুগের ইতিহাসের বহু তথ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছেন এবং স্বদেশী আন্দোলনের বিভিন্ন ধারা-সম্বন্ধে গবেষণামূলক পুস্তিকা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। এই পুস্তকে প্রধানতঃ জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। অধ্যাপক হরিদাস মুখার্জি এবং তাঁহার সুযোগ্যা সহধর্মিণী সহকর্মী উমা দেবী বিশেষ পরিশ্রম সহকারে তৎকালীন সংবাদপত্র, প্রবন্ধ এবং অন্যান্য দলিলপত্র হইতে বহু মৌলিক তথ্য উদ্ধার করিয়া এই নিবন্ধের সমৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। প্রাক্‌স্বদেশী যুগ হইতেই ভারতীয় চিন্তানায়কগণের দেশের তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের সঙ্কল্প জাগ্রত হইয়াছিল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়' প্রমুখ কৃতী শিক্ষাবিদ্ প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার দোষত্রুটীর প্রতি কর্তৃপক্ষ তথা দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিলেন। বিংশ শতকের প্রথমভাগে বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ করিয়া দেশের জনসাধারণ যখন বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে মুক্তি আন্দোলন আরম্ভ করে, তখন তাহার সহিত বিদেশী শিক্ষা বর্জন এবং জাতীয় শিক্ষা গ্রহণের আন্দোলনও তীব্র হইয়া উঠে। দেশের তদানীন্তন কৃতী মনীষিবৃন্দ প্রায় সকলেই এই আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেন। বিশেষ করিয়া 'ডন' পত্রিকার সম্পাদক সতীশচন্দ্র মুখার্জির ন্যায় একনিষ্ঠ কর্মী ও সংগঠককে পাইয়া অল্পকালমধ্যে জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন একটী নির্দিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করে। অত্যল্প সময়ের মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়, কলিকাতায় এবং কলিকাতার বাহিরে কয়েকটী শহর ও পল্লীতে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশব্যাপী একটা নূতন চাঞ্চল্য এবং উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। দলে দলে ছাত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন স্কুল কলেজ পরিত্যাগ করিয়া জাতীয়-শিক্ষা-পরিষৎ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত এই নূতন ধরনের শিক্ষামন্দিরে প্রবেশ করিতে থাকে। এই নূতন শিক্ষাব্যবস্থায় যে শিক্ষাপ্রণালী এবং পাঠ্যতালিকা নির্বাচিত হইয়াছিল, আজিকার স্বাধীন ভারতের শিক্ষাব্রতী এবং শিক্ষানায়কগণের পক্ষেও তাহা অনুকরণযোগ্য। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের পরিচালকবৃন্দ সেই যুগেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, স্বদেশের সমৃদ্ধির জন্য দেশের যুবকসমাজকে বিজ্ঞান ও বিভিন্ন কারিগরীবিদ্যায় শিক্ষিত করিয়া তোলা প্রয়োজন। এজন্য উপযুক্ত কারিগরী বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষায়তনগুলির মধ্যে একমাত্র যাদবপুরের কারিগরী শিক্ষায়তনটী জাতীয় শিক্ষা পরিষদের উজ্জ্বল ও গৌরবময় স্মৃতি বহন করিতেছে। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে, বিশেষ করিয়া মুক্তি-আন্দোলনের ইতিহাসে, জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন এক বিশিষ্ট স্থান দখল করিয়া আছে। সংক্ষেপে স্বচ্ছ এবং মনোরম ভাষায় এই আন্দোলনের বিস্মৃত ইতিহাস বিবৃত করিয়া অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা মুখার্জি দেশবাসীর কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা এই পুস্তকের বহুল প্রচার কামনা করি।

—শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

অহনা (কাব্যগ্রন্থ)—রচয়িতা : শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস ; শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী হইতে প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ১৩৫ ; মূল্য আড়াই টাকা।

সাম্প্রতিক বাঙলা কবিতা পরীক্ষা-নিরীক্ষার যে পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে, কবিতারচনার সেই মাপকাঠিতে আলোচ্য গ্রন্থখানির আলোচনা সম্ভব নয়। তা' না হ'লেও 'অহনা' কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতে একটি কাব্যনিষ্ঠ সাধকপ্রাণের সন্ধান মেলে। নানা বিষয় (প্রধানতঃ ভক্তিমূলক ও আধ্যাত্মিক) অবলম্বনে বিভিন্ন ছন্দে রচিত কবিতাগুলি ভাবের গভীরতায় সমুজ্জ্বল। কবি দেবতা ও মানব উভয়ের উদ্দেশেই অন্তরের সুগভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন

কবিতাগুলির মাধ্যমে। স্থানে স্থানে ছন্দের অসংগতি রয়ে গেছে। 'ঢুঁড়ি', 'দূরি', 'হিয়ে', 'অক্ষুভিত', 'অস্বীকারি', 'তোমাও স্বাগতি' প্রভৃতি শব্দ কানে বাজে। কাগজ এবং ছাপা চিত্তাকর্ষক।

—শান্তশীল দাশ

কুষ্ঠসমস্যা ও আমাদের কর্তব্য—প্রকাশক: শ্রীপার্বতীচরণ সেন, হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারণ সঙ্ঘ (পশ্চিম বঙ্গীয় শাখা), স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা—১২।

কুষ্ঠরোগ আমাদের দেশে একটি উৎকট সমস্যা। বিনামূল্যে প্রচারিত ৩২ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানিতে এই রোগসম্বন্ধে বহু তথ্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক পরিচিতি এবং প্রতীকারের উপায় দেওয়া হইয়াছে। প্রভূত শিক্ষা ও উপকার-বিধায়ী আলোচ্য বইটির জন্য প্রকাশক সর্বসাধারণের ধন্যবাদার্হ।

সংসার ও সংগ্রাম—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় চৌধুরী-প্রণীত। প্রকাশক: শ্রীহামিরকুমার রায় চৌধুরী, ১৪-এফ সুইনহো ষ্ট্রীট, বালিগঞ্জ, কলিকাতা—১৯; ২৩০ পৃষ্ঠা; "ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণের জন্য মূল্য ৩্ টাকা।"

দেশসেবা এবং রাজনীতির ক্ষেত্রে সুপরিচিত গ্রন্থকার তাঁহার ঘটনাবহুল জীবনের বিবিধ অভিজ্ঞতা মনোজ্ঞ প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের নামটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সংসারের বিচিত্র কর্মসংঘাতকে লেখক সত্যের পথে প্রয়োজনীয় সাধনা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার জীবনের আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গী বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। মুদ্রণ এবং আকারসৌষ্ঠব লক্ষণীয়।

(১) **West Bengal** (২) **পশ্চিমবঙ্গ**—পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের প্রচারবিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত। ডবল ক্রাউন অক্টেভো; পৃষ্ঠা যথাক্রমে ১৫৬ ও ১২৮; মূল্য যথাক্রমে ২্ টাকা ও ১্ টাকা।

এই দুটি বার্ষিকী (প্রথমটি ইংরেজীতে, দ্বিতীয়টি বাঙলায়) পশ্চিমবঙ্গ-সম্পর্কিত বহু জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, সমাজ-উন্নয়ন, উদ্বাস্তু-পুনর্বাসন, জনশিক্ষার অগ্রগতি, শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি সম্বন্ধে রাজ্যসরকার কতটা কি করিতেছেন এবং এখনও কত করিবার বাকী সর্বসাধারণের তাহা জানা অবশ্য কর্তব্য।

দেশের বিবিধ সমস্যা-দূরীকরণে সরকারের যেমন গুরুদায়িত্ব আছে, জনসাধারণেরও কর্তব্য তেমন কম নয়। দুঃখের বিষয়, অনেক সময়ে আমরা ইহা ভুলিয়া যাই। আলোচ্য বার্ষিকীদ্বয় দেশসেবার প্রতি আমাদের নিজেদের কর্তব্যবিষয়ে সজাগ হইবার প্রেরণা দেয়। লেখাপড়া জানা বাঙ্গালীমাত্রেরই হাতে স্বল্পমূল্যের বই দুখানির একটি পৌঁছানো প্রয়োজন। অনেকগুলি করিয়া ছবি আছে।

বিশ্ববাণী (অভেদানন্দ-(৭ম) স্মৃতিসংখ্যা)—প্রকাশক: শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ—১৯বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬; ২১০ পৃষ্ঠা; মূল্য ২৷৷০ টাকা।

পূর্ব পূর্ব বারের ন্যায় বিশ্ববাণীর বর্তমান বৎসরের এই স্মৃতিসংখ্যাটিও অনেকগুলি মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ। 'স্বামী অভেদানন্দের জীবন: শেষ অধ্যায়' চিত্তাকর্ষক আলোচনা করিয়াছেন স্বামী বেদানন্দ। 'রামকৃষ্ণ পরমহংস ও স্বামী বিবেকানন্দ' প্রবন্ধে ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত দেশের তরুণগণকে স্বামিজীর অপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করিতে আহ্বান করিয়াছেন:—

"আজ ভারত রাজনীতিক স্বাধীনতা পাইয়াছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ নানা প্রকারের দ্বন্দ্বভাবে ভারত জর্জরিত। সেইজন্য বিদেশের মুখ না চাহিয়া patriot prophet স্বামী বিবেকানন্দের অপূর্ণ কর্মপদ্ধতি গ্রহণপূর্বক নূতন ভারতীয় সভ্যতা সৃষ্টির কর্মে তরুণেরা যেন আত্মনিয়োজিত করেন। কিন্তু কথায় আছে, 'গেঁয়ো যোগী ভিক্ পায় না',

সেইজন্য চটকদার বিদেশী আলেয়া তরুণদের মুগ্ধ করে।" উমা মুখোপাধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায় লিখিত 'স্বদেশী আন্দোলন' (১৯০৫-এর) তথ্যবহুল এবং চিন্তাপূর্ণ আলোচনা। ধর্ম, সাহিত্য, সঙ্গীত ও ইতিহাস-বিষয়ক অন্যান্য রচনাগুলিও সুখপাঠ্য।

শিক্ষাব্রতী (রবীন্দ্রসংখ্যা)—শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক কর্তৃক সম্পাদিত ; ১৫এ, ক্ষুদিরাম বোস রোড, কলিকাতা—৫ ; মূল্য : ১৲ টাকা।

রবীন্দ্রনাথের জীবন, সাহিত্য এবং বিশেষতঃ তাঁহার শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে অনেকগুলি সুলিখিত প্রবন্ধে সমৃদ্ধ 'শিক্ষাব্রতী' পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি। 'যুগান্তরে'র 'স্বপনবুড়ো' লিপিবদ্ধ করিয়াছেন 'রবীন্দ্রস্মৃতিকথা' ; কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায় লিখিয়াছেন 'লোকগুরু রবীন্দ্রনাথ' ; 'কর্মযোগী রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্মী রবীন্দ্রনাথের মনোজ্ঞ চিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন। এই সংখ্যাটি বরাবরকার জন্য ঘরে রাখিবার মতো।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

রেঙ্গুন সেবাশ্রমে ভারত সরকারের দান :—দীর্ঘকাল যাবৎ মিশন কর্তৃক পরিচালিত ব্রহ্মদেশের এই সুবিখ্যাত হাসপাতালটিতে একটি গভীর রঞ্জনরশ্মি যন্ত্রের অভাব অনুভূত হইতেছিল। কিছুদিন হইল ভারত সরকার এই অভাব দূর করিয়া প্রতিষ্ঠানটির উপযোগিতা-বর্ধনে সহায়তা করিয়াছেন। এখানে বহুসংখ্যক ব্রহ্মপ্রবাসী ভারতীয় রোগী আসিয়া থাকেন।

গত ৫ই কার্তিক (২২শে অক্টোবর) ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউর ভারত সরকারের প্রতিনিধিরূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে যন্ত্রটি মিশনকে দান করেন। এই উপলক্ষে হাসপাতাল-প্রাঙ্গণে সেবাশ্রমের বন্ধু ও পরিপোষক-মণ্ডলীর একটি বৃহৎ সম্মিলন আহূত হয়। তাহাতে সভাপতিত্ব করেন সাও হকুন্ হকিও। ব্রহ্মদেশের স্বাস্থ্যমন্ত্রী উ থিন্ মং লাট্ হাসপাতালের পক্ষ হইতে রঞ্জনরশ্মি যন্ত্রটি শ্রীযুক্তা অমৃত কাউর-এর নিকট হইতে গ্রহণ করেন। প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে ভারতের স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন যে, কেবলমাত্র সুরম্য গৃহ ও বিচিত্র যন্ত্রপাতি কোন হাসপাতালকে কর্মক্ষম ও উপযোগী করিয়া তুলে না ; প্রতিষ্ঠানের কর্মিগণের সেবাসমাহিত সু-উচ্চ মনোভাবই ইহাকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের রামকৃষ্ণ মিশন কিভাবে নিঃস্বার্থ জনসেবা দ্বারা সমাজের নৈতিক উন্নয়ন সাধন করিতেছেন শ্রীযুক্তা কাউর তাহার উল্লেখ করেন। এই ঐকান্তিক সেবা-পরায়ণতার জন্য রামকৃষ্ণ মিশন ভারত ও ব্রহ্ম উভয় দেশেই এত জনপ্রিয়। মিশনের ভারতীয় কর্মিগণ একান্ত নিষ্ঠার সহিত আপন জ্ঞান করিয়া ব্রহ্মবাসিগণের সেবা করিতেছেন সাক্ষাৎভাবে দেখিয়া তিনি গর্বানুভব করেন। এই নিঃস্বার্থ সেবার ভিত্তিতেই উভয়-দেশের সুপ্রাচীন মৈত্রী-বন্ধন দৃঢ়তর হইতে পারে।

রাজকুমারী অমৃত কাউর মিশন হাসপাতালের ক্যান্সার ওয়ার্ডের ভিত্তিস্থাপন করেন। মিঃ চণ্ডুমল নামক জনৈক স্থানীয় ব্যবসায়ীর অর্থানুকূল্যে এই নূতন ওয়ার্ডটি নির্মিত হইতেছে।

সিংহলে ধর্মশালা (মডম্) প্রতিষ্ঠা—গত ১২ই জুলাই, সিংহলের প্রধান মন্ত্রী (সম্প্রতি অবসরপ্রাপ্ত) মাননীয় মিঃ ডাড্‌লি সেনানায়ক সিংহলের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান কাতরাগামায় (Kataragama) রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ধর্মশালাটির উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সিংহল-সরকারের মন্ত্রিগণ, অন্যান্য অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ভারতীয় হাই কমিশনার যোগদান

করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠ এবং দাক্ষিণ ভারতের ও সিংহলের শাখাকেন্দ্রগুলি হইতে রামকৃষ্ণ মিশনের অনেক সন্ন্যাসী এই উৎসবে সমবেত হইয়াছিলেন। উদ্বোধনের পর নূতন গৃহের প্রশস্ত হলে একটি সভার আয়োজন হয়। সিংহলের মুখ্যমন্ত্রীই ছিলেন প্রধান অতিথি। মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী মাধবানন্দজী বেলুড় মঠ হইতে শারীরিক অসুস্থতার জন্য আসিতে অপারগ হন বলিয়া সভাপতির কার্য পরিচালনা করেন ব্যাঙ্গালোর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের অধ্যক্ষ স্বামী যতীশ্বরানন্দজী। ভারতের রাষ্ট্রপতি এবং রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ ও সাধারণ সম্পাদকের প্রেরিত শুভেচ্ছা-বাণী সভা-প্রারম্ভে পড়া হয়। রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ তাঁহার প্রেরিত লিপিতে জানান: "আমার মনে পড়ে সিংহলের হিন্দুদের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি কাতারাগামার মন্দির-বিষয়ক ব্যাপারে আমার নিকট পূর্বে আসিয়াছিলেন এবং উক্ত বিষয়ে আমাকে মনোযোগী হইতে অনুরোধ জানান—যেরূপ আমি বুদ্ধগয়া মন্দিরের স্থান সমর্পণ ব্যাপারে উদ্‌যোগী ছিলাম। সেই জন্য আমি জানিয়া আনন্দিত হইলাম যে, ঐ স্থানে রামকৃষ্ণ মিশন—একতা এবং সামঞ্জস্যবিধানই যাঁহাদের ব্রত—একটি 'মডম্‌' প্রতিষ্ঠা করিতেছেন এবং এখানে দর্শনার্থী আগত তীর্থযাত্রীদের থাকিবার ব্যবস্থা ব্যতিরিক্ত ইহা শিক্ষা-সংস্কৃতিরও একটি কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। আশা করি এই ধর্মশালা-প্রতিষ্ঠার ফলে আমাদের দুইটি পাশাপাশি জাতির মধ্যে সংস্কৃতি এবং ধর্মমূলক সৌহার্দ্যের এক নূতন বন্ধন গড়িয়া উঠিবে।"

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষজয়ন্তী উৎসব—

(উৎসবসম্বন্ধীয় কতিপয় নির্দেশ)

শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর শুভ জন্মশতাব্দী উৎসব তাঁহার পুণ্য জন্মতিথি, ১২ই পৌষ, রবিবার, ১৩৬০ (ইং ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) তারিখে নির্ধারিত হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সর্বসাধারণ্যে বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হয় নাই। তাঁহার পবিত্রতা ও স্বামীর প্রতি গভীর প্রেম ও অনুরাগ কিরূপে তাঁহাকে কেবলমাত্র সামান্য স্ত্রীর ন্যায় ঐহিক কর্তব্য পালনে নিরতা না রাখিয়া প্রথমা ও প্রধানা শিষ্যারূপে পরিগণিত করিয়াছিল; কেমন করিয়া উঁহার দ্বারা চালিত হইয়া তাঁহার ধর্মজীবন গঠিত হইয়াছিল; কি ভাবে উঁহার তিরোধানের পর তিনি দীর্ঘ ৩৪ বৎসর স্থূল শরীরে বর্তমান থাকিয়া লোকচক্ষুর অন্তরালে পরম কৃতিত্বের সহিত তাঁহার বাণী বহন করিয়াছিলেন, কি দরদ দিয়া বহু সংসারক্লিষ্ট নরনারীর আধ্যাত্মিক জীবনের উন্মেষ ও গভীরতা সম্পাদন করিয়াছিলেন সে কাহিনী স্বল্পই লোকের জ্ঞানগোচর হইয়াছে।

যথাযোগ্যভাবে এই অপূর্ব মাতৃমহিমোজ্জ্বল সাধ্বীর জীবনী ও বাণীর বহুল প্রচারের জন্য তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী প্রতিপালনের আয়োজন চলিতেছে। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর হইতে ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এই উৎসব উদ্‌যাপনের সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে।

পৃথিবীব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সাফল্যের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় শতবর্ষজয়ন্তী সমিতি সকল সহানুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তির সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করিয়া নিম্নলিখিত নির্দেশপত্র জ্ঞাপন করিতেছেন; ইহাতে স্থানীয় ব্যক্তি ও সংস্থাগুলির কার্যকলাপ নির্ধারণ ও সংগঠন করা সহজ হইবে।

(১) শুভেচ্ছা ও সহযোগিতা-জ্ঞাপক বাণী কেন্দ্রীয় সমিতিতে পাঠান যাইতে পারে।

(২) পৃথিবীর সর্বত্র সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের মধ্যে একাত্মবোধ ও ভাবৈকতানতা উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর ধর্মসম্মেলন বা প্রার্থনাসভার এক অধিবেশন করা।

(৩) শ্রীশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর বিশদ আলোচনার দ্বারা তাঁহার মহান্ ব্যক্তিত্বকে স্থানীয় লোকের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্য অপর কোন নির্দিষ্ট দিনে এক স্মারক সভার অধিবেশন করা।

(৪) উক্ত জয়ন্তী উপলক্ষ্যে সভা, সম্মেলন, পরিষদ্, প্রদর্শনী প্রভৃতির সাহায্যে পৃথিবীর মহীয়সী মহিলাদিগের জীবনী আলোচনা দ্বারা ব্যষ্টি ও সমষ্টি-জীবনে নারীদিগের আধ্যাত্মিক সম্পদ ও অবদান, বিশেষ করিয়া শ্রীশ্রীসারদাদেবীর জীবন ও বাণীর বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করিয়া নারীমাহাত্ম্য প্রকট করা।

(৫) স্থানীয় বেতারকেন্দ্র ও সংবাদপত্রাদিতে সভাসমিতির বিজ্ঞাপন বাহির করিয়া এবং সাধারণ ভাবে নারীচরিত্রের আদর্শ ও বিশেষভাবে শ্রীশ্রীসারদাদেবী-সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি লিখিয়া এই জয়ন্তীর প্রচারে সাহায্য করা।

আমাদের ঐকান্তিক বাসনা যে, স্থানীয় সমিতি-সমূহ উল্লিখিত বা তদনুরূপ পদ্ধতিক্রমে এই উৎসব পরিচালনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া পৃথিবীব্যাপী এই উৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবেন। কেন্দ্রীয় সমিতি সকল শাখাসমিতি হইতে ঐরূপ কার্য-বিবরণীর খসড়া পূর্বে পাইলে খুবই সুখী হইবেন এবং তাঁহাদিগকে সর্বপ্রকারে সাধ্যমত সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দীজয়ন্তীর সম্পাদক কর্তৃক প্রচারিত
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া।

বারাণসী সেবাশ্রমের কার্যবিবরণী—শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের প্রাচীনতম সেবাশ্রম এই কেন্দ্রটির (ঠিকানা: লাক্সা, বেনারস, ইউ পি) ১৯৫২ সালের (দ্বি-পঞ্চাশৎ বার্ষিক) কার্যবিবরণী আমরা পাইয়াছি। সেবাশ্রমের অন্তর্বিভাগে আলোচ্য বৎসরে ২৪৯৫ জন রোগীকে চিকিৎসার্থ ভর্তি করা হয় (তন্মধ্যে শল্য-চিকিৎসার্থ রোগিসংখ্যা—৪৯১)। পঙ্গু-আশ্রয়-বিভাগে ১৯টি দুঃস্থ স্ত্রী-পুরুষকে আশ্রয় দেওয়া হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত চন্দ্রী বিবি ধর্মশালা ফণ্ডের সামর্থ্যানুযায়ী আতুরদিগকে বাসস্থান ও আহার্যের কিছু কিছু ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

শিবালাস্থ শাখা লইয়া সেবাশ্রমের বহির্বিভাগে মোট ১,৪৪,০৩৪ জন নূতন রোগীর চিকিৎসা করা হয়। এই উভয় স্থানে পুরাতন রোগীর সংখ্যা ছিল—৩,৩৬,৬৩৩। বহির্বিভাগে অস্ত্রোপচারের সংখ্যা ছিল—২৫০৪ (শিবালা কেন্দ্রে—৫৮১)।

দরিদ্র পঙ্গুদিগকে আর্থিক সহায়তা এবং সম্ভ্রান্ত ঘরের অসহায় মহিলাগণকে মাসিক সাহায্যদানখাতে এবারে ১৮৩২৵৬ পাই ব্যয় করা হইয়াছে। সাহায্য-প্রাপ্তের সংখ্যা ১০২। এতদ্ব্যতীত দুঃস্থদিগকে ৭৫ খানি কম্বল, ১১টি ধুতি এবং ৯টি গেঞ্জিও দান করা হইয়াছিল। ইহা ছাড়া দরিদ্র ছাত্রদিগকে পুস্তকাদি এবং অসহায় পথিকদিগকে খাদ্যাদি দিয়াও কিছু কিছু সাহায্য করা হইয়াছিল।

রোগ-বীজাণু নিরূপণ এবং ব্যাধিসংক্রান্ত রাসায়নিক অনুসন্ধানের জন্য একটি পৃথক ল্যাবোরেটরীর সুষ্ঠু কর্মনির্বাহের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৯৫১ সালে দুটি এক্স রে ইউনিট্ কেনার ফলে এক্স-রে বিভাগের কাজ সুন্দরভাবে চলিতেছে।

এই বৎসরে (সকল তহবিল লইয়া) মোট আয়—৯২, ৫৬১৶৫পাই এবং ব্যয় ১, ১০, ৯৭৮৲টাকা। ইহা হইতেই ঘাটতির পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। গত পাঁচ বৎসরে সাধারণ তহবিলে মোট ঘাটতি-পরিশোধের জন্য ৫০, ০০০৲টাকা আশু প্রয়োজন।

সেবাশ্রমে রোগীর সংখ্যা এবং খরচের পরিমাণ যেরূপ বাড়িয়া চলিতেছে তাহাতে কর্তৃপক্ষকে অর্থাভাবে প্রচুর অসুবিধার মধ্যে পড়িতে হইতেছে। সহৃদয় দেশবাসীর নিকট আর্থিক অথবা দ্রব্যাদির (পোষাক, পথ্য প্রভৃতি) সাহায্যের জন্য কর্তৃপক্ষ আবেদন জানাইতেছেন।

বিবিধ সংবাদ

হাফলংএ (কাছাড়, আসাম) উৎসব—অপরাপর বৎসরের ন্যায় স্থানীয় শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাসমিতির উদ্যোগে হাফলংএ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ১১৮তম জন্মতিথি-স্মরণে আধ্যাত্মিক-ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। স্বামী সৌম্যানন্দের সভাপতিত্বে এক বিরাট জনসভার আয়োজন হইয়াছিল। "বিশ্বসভ্যতায় বিবেকানন্দের অবদান"—এই বিষয়বস্তু-অবলম্বনে স্বামী চণ্ডিকানন্দ এবং আরও কয়েকজন বক্তা চিত্তাকর্ষক বক্তৃতাদি করেন। উৎসবে এবং বক্তৃতাদিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে শত শত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। এক রবিবারে সারাদিনব্যাপী বেদপাঠ, কথামৃতাদি পাঠ ও আলোচনা, পূজা, হোম, প্রসাদ-বিতরণ, আলোক-চিত্র প্রদর্শনী ও বক্তৃতাদি অভুতপূর্ব আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়।

আমেরিকায় বিভিন্ন ধর্মমতের লোক—যুক্তরাষ্ট্রের ১৯৫০ সালের গীর্জার বর্ষপঞ্জী থেকে জানা যায়, ঐ সময় যুক্তরাষ্ট্রে ৭৩ হাজার বৌদ্ধ এবং ১২ হাজার বেদান্ত সোসাইটির সদস্য ছিল। যুক্তরাষ্ট্রে ও কানাডায় ঐ সময় ১০ হাজার হিন্দু ও ৩২ হাজার মুসলমান ছিল। এ ছাড়া, ক্যালিফোর্ণিয়ার সাক্রামেণ্টোর আশে-পাশে ২ হাজার এবং ষ্টকটনের আশেপাশে ৪ শত শিখ বাস করে।

আমেরিকায় বেদান্ত সোসাইটির ১১টি কেন্দ্র আছে এবং অনেকগুলি প্রার্থনামন্দির আছে; কিন্তু খাঁটি হিন্দু মন্দির বলতে গেলে যা বুঝায়, এরূপ কোন মন্দির নেই। ক্যালিফোর্ণিয়ায় শিখদের দুটি গুরদোয়ারা আছে। সমগ্র যুক্ত-রাষ্ট্রে ৪৭টি বৌদ্ধ মন্দির আছে। ওয়াশিংটনে মুসলমানদের একটি মসজিদ আছে। এ ছাড়া নিউইয়র্ক, ডেট্রয়ট এবং সাক্রামেণ্টোতেও মুসলমান-দের উপাসনালয় আছে।—(আমেরিকান রিপোর্টার)

আমেরিকায় সংস্কৃতগ্রন্থ—আমেরিকার বড় বড় ১৮টি গ্রন্থাগারে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে, তা ছাড়া, যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস গ্রন্থাগারে কয়েক সহস্র সংস্কৃত গ্রন্থ ও বহু শত পাণ্ডুলিপি আছে। এ-ছাড়া, ছাত্রদের পড়াশুনার সুবিধার জন্য পেনসিলভানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং দক্ষিণ ক্যালিফোর্ণিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ে সংস্কৃত গ্রন্থাদি আছে। নিউইয়র্ক সিটি লাইব্রেরীতে প্রচুরসংখ্যক সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।

(আমেরিকান রিপোর্টার)

গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

আগামী মাঘ মাসে উদ্বোধনের নূতন (৫৬তম) বর্ষ আরম্ভ হইবে। পত্রিকার গ্রাহকসংখ্যা বর্ধিত হওয়া সত্বেও মুদ্রণাদির ব্যয় দিন দিন বাড়িয়াই চলিতেছে। এই জন্য একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও আমরা উদ্বোধনের বার্ষিক মূল্য ৪৲ টাকা স্থলে ৫৲ টাকা করিতে বাধ্য হইতেছি। আশা করি, উদ্বোধনের গ্রাহকমণ্ডলী আমাদের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিয়া এই বর্ধিত মূল্যের জন্য তাঁহাদের সহৃদয় পৃষ্ঠপোষকতা হইতে আমাদিগকে বঞ্চিত করিবেন না। যথারীতি গ্রাহকসংখ্যা, নাম ও ঠিকানাসহ ১৫ই পৌষের মধ্যে বার্ষিক চাঁদা ৫৲ টাকা এই আফিসে পাঠাইয়া দিবার জন্য তাঁহাদিগকে অনুরোধ জানাইতেছি। টাকা পূর্বে আমাদের হস্তগত হইলে গ্রাহকগণের ভি, পি-তে কাগজ লইবার অযথা বিলম্ব এবং অতিরিক্ত ডাকব্যয় ॥৹ আনা বাঁচিয়া যায়। পাকিস্তানের গ্রাহকগণের টাকা পাঠাইবার ঠিকানা:—সম্পাদক, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, পোঃ উয়ারী, ঢাকা। ইতি—

কার্যাধ্যক্ষ, উদ্বোধন—১, উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৩



বাগবাজার বাড়ীতে (উদ্বোধন) পূজার ঘরে শ্রীশ্রীমা

উদ্বোধন

পরম আশ্রয়

মিত্রে রিপৌ ত্ববিষমং তব পদ্মনেত্রম্
স্বস্থেঽসুখে ত্ববিতথস্তব হস্তপাতঃ।
ছায়া মৃতেস্তব দয়া ত্বমৃতঞ্চ মাতঃ
মুঞ্চন্তু মাং ন পরমে শুভদৃষ্টয়স্তে॥

যা মাং চিরায় বিনয়ত্যতিদুঃখমার্গৈঃ
আসিদ্ধিতঃ সকলিতৈর্ললিতৈর্বিলাসৈঃ।
যা মে মতিং সুবিদধে সততং ধরণ্যাং
সাম্বা শিবা মম গতিঃ সফলেঽফলে বা॥

—স্বামী বিবেকানন্দ, অম্বাস্তোত্রম্—৫, ৭

হে বিশ্বজননি, তুমি হইতেছ সমতার প্রতিমূর্তি। শত্রু-মিত্র সকলের প্রতিই তোমার পদ্ম-নয়নের ষ্ট তুল্যভাবে পড়িতেছে, সুখী-অসুখী উভয়ের ক্ষেত্রেই তোমার একই করুণ হস্তপাত, মৃত্যুর ছায়া বং অমৃতত্ব—দুয়ের মধ্যেই প্রকটিত তোমার ভাগবতী দয়া। হে পরমে, তোমার কল্যাণ-চক্ষুর বলোকন যেন আমাকে কখনও পরিত্যাগ না করে।

সুচির কাল কঠিন দুঃখের কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া চলিয়াছি—এইরূপই হয়তো চলিতে হইবে আরও ত যুগ—যতদিন না জীবন-লক্ষ্যে পৌঁছাই। কিন্তু ইহা যে জগদম্বারই বিধান, তাঁহারই ললিত লা-বাঞ্জনা। জানি, তিনি সতত এই পৃথিবীতে আমার বুদ্ধিকে শ্রেয়ের অভিমুখে নিয়োজিত রিতেছেন; সফলতা আসুক, বিফলতা আসুক, সেই মঙ্গলময়ী জননীই আমার একমাত্র আশ্রয়।

কথাপ্রসঙ্গে

মা

আগামী ১২ই পৌষ (২৭শে ডিসেম্বর, রবিবার, অগ্রহায়ণ কৃষ্ণাসপ্তমী) শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর পুণ্যাবির্ভাবের একশত বর্ষ পূর্ণ হইবে। শ্রীশ্রীমায়ের শতাব্দীজয়ন্তী-সমিতির উদ্যোগে ভারত এবং ভারতের বাহিরেও সারা বৎসরব্যাপী অনুষ্ঠেয় উৎসবের শুভ উদ্বোধন ঐ তিথিতে। বিভিন্ন মানব-গোষ্ঠী এই অনবদ্য মাতৃ-মহিমোজ্জ্বল চরিত্রের স্মরণ এবং অনুধ্যান করিয়া ভারতের এক শাশ্বত আদর্শেরই প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিবেন। সে আদর্শ—নারীকে মাতৃ-মহাশক্তিরূপে উপলব্ধি ও সম্মান। জননী সন্তানের নিকট সকল দেশেই সম্মানিতা, কিন্তু ভারতে ঐ সম্মানের প্রকৃতি এবং গভীরতা সত্যই অনুপম। যুগ যুগ ধরিয়া ভারতসন্তান ঈশ্বরের মাতৃরূপ-কল্পনার মধ্যে মানুষের শ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা, গুণ ও শক্তিগুলির ঘনীভূত প্রকাশ দেখিবার চেষ্টা করিয়াছে। অসীম স্নেহ করুণা, শুচিতা, ক্ষান্তি, দান্তি, শ্রদ্ধা, শান্তি—আবার মেধা, পুষ্টি, বীর্য, বুদ্ধি, কান্তি—এ সকলই জগন্মাতার বিভূতি। অমিত গুণ ও বৈভবময়ী সেই জগদম্বারই বিশেষ এক প্রকাশ পার্থিব জননীর মধ্যে। তাই জননী জগজ্জননীর ন্যায়ই পূজার্হা। শুধু তাহাই নয়, নারীমাত্রেই ভারতসন্তান দেখিতে চায় জগদম্বিকার অভিব্যক্তি। নারীমাত্রই তাই ভগবতী—মা। নারীর প্রতি এই পবিত্র দৃষ্টিভঙ্গী আবহমান কাল হইতে ভারত-সংস্কৃতিকে প্রভূত শক্তি ও উচ্চপ্রেরণা দিয়া আসিয়াছে। উহা কিন্তু বাস্তব জীবন হইতে বিচ্যুত একটি কাব্যিক বা দার্শনিক ভাব-বিলাস মাত্র নয়—ভারত-সন্তান তাহার দৈনন্দিন আচরণে পদে পদে এই মাতৃপূজা সাধিয়াছে—মাতৃ-মহামন্ত্র তাহার প্রতি স্নায়ুতন্ত্রীতে সর্বক্ষণ অনুরণিত। মাতৃপূজারী ভারতের নিকট মা শব্দটি এক অনির্বচনীয় ভাবাবেগের দ্যোতনা লইয়া আসে। সংসারের যাহা কিছু সুন্দর, স্নিগ্ধ, বলপ্রদ—আবার সংসার যে পরম সত্য, জ্ঞান ও আনন্দে বিধৃত—এই দুইটাই ভারত তাহার মাতৃমূর্তির মধ্যে দেখিতে পায়।

প্রাক্-শ্রীরামকৃষ্ণ যুগে ভারতে যে একটি ধর্মের গ্লানি আসিয়াছিল নানা গ্রন্থে উহার বহুবিধ আলোচনা হইয়াছে। ঐ গ্লানি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল প্রধানতঃ নাস্তিক্য, স্বধর্মে অনাস্থা এবং ঐহিক ভোগোন্মত্ততায়। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক শক্তির উন্মেষ যেন দেখা দিয়াছিল উহাদিগকে প্রতিহত করিবার জন্যই, ইহাও আজ সুবিদিত। কিন্তু ঐ ধর্মগ্লানির মধ্যে বীজাকারে আরও একটি মহাসঙ্কট লুকাইয়া ছিল যাহা তখন তেমন ধরা না পড়িলেও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ক্রমশঃ ক্রিয়াশীল হইতে আরম্ভ করে। সে সঙ্কট ভারত সন্তানের মাতৃ-মহিমা-বিস্মৃতি। মহামতি বেথুন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি এই দেশে নারীর উচ্চশিক্ষার যে সূত্রপাত অষ্টাদশ

শতাব্দীর শেষার্ধে করিয়া গিয়াছিলেন তাহার পরিবিস্তৃতি শুরু হয় বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায়। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল ক্ষেত্রেই ক্রমশঃ ভারতীয় নারীরা ব্যাপকভাবে শিক্ষালাভ এবং প্রতিভাবিকাশ করিতে লাগিলেন। নারীর স্বতন্ত্র অধিকার-বোধ ধীরে ধীরে জাগ্রত ও বর্ধিত হইতে লাগিল। মাতৃজাতির এই বহুমুখী প্রগতি অবশ্যই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয় ছিল, কিন্তু প্রগতির ব্যবস্থা, পরিকল্পনা এবং পরিচালনার মধ্যে মারাত্মক ক্রটি ছিল—যাহার ফলে প্রগতিশীলা ভারতীয় নারীকে তাঁহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হইতে আমরা ক্রমশঃ দূরে টানিয়া আনিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। নারী আমাদের নিকট হইয়া পড়িতেছিলেন শুধুই নারী—রক্তমাংসের নারী ; তাঁহার আধ্যাত্মিক সত্তা—তাঁহার ভাব-রূপ—দেবীত্ব—মাতৃত্ব আমরা বিস্মৃত হইতেছিলাম। এই আত্ম-বিস্মৃতি প্রকৃতই ভারত-ধর্মের একটি বিপজ্জনক গ্লানিরূপে দেখা দিতেছিল। ভারতের ভগবান কিন্তু সেই গ্লানি দূর করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী মাতা সারদাদেবী আমাদিগকে প্রায়-ভুলিয়া-যাওয়া 'মা' ডাক শিখাইলেন—নারী-মহিমা শাশ্বত মাতৃত্বে পুনরায় কেন্দ্রীভূত হওয়ার দিগ্‌দর্শন দেখিতে পাওয়া যায় তাঁহার জীবন-সাধনায়। শ্রীরামকৃষ্ণ যদি নাস্তিক জগৎকে দিয়া থাকেন জগৎ-সার ভগবানকে, শ্রীশ্রীমা মাতৃহীন সন্তপ্ত পৃথিবীকে বসাইয়া গিয়াছেন জননীর স্নেহ-শীতল অঙ্কে। উভয়েই যুগধর্মসংস্থাপক—যুগগুরু—যুগের আরাধ্য।

সত্য খুব সহজ সরল জিনিস—কিন্তু অনেক সময়ে এই সহজতাই উহাকে চিনিতে দেয় না ; মনে হয়, যাহা এত মূল্যবান তাহা কি কখনও এত অনায়াসে পাওয়া যায় ? শ্রীরামকৃষ্ণকে চিনিতে অনেকেরই 'ধোকা' লাগিয়াছিল। জননী সারদাদেবীরও চতুষ্পার্শ্বে এমন একটি নিরাবরণ স্বাভাবিকতা দেখা যাইত যে, তিনি যে অসামান্যা একথা বিশ্বাস ও ধারণা করা বহু লোকের নিকট ছিল সুকঠিন। কৌতুকাবহ হইলেও এই কথোপকথনটি সত্যই সে সময়কার একটি উল্লেখযোগ্য মনস্তত্ত্বের প্রতি আলোকসম্পাত করেঃ জনৈক ভক্ত প্রশ্ন করিতেছেন,—শ্রীরামকৃষ্ণ যে ঠাকুর—অবতার, একথা বিশ্বাস হয়, কিন্তু সারদাদেবীকে ভগবতী বলিয়া মন কিছুতেই নিতে চায় না। মাতৃসেবক স্বামী সারদানন্দজী ঈষৎ উত্তেজিতভাবে জবাব দিতেছেন,—তবে কি তুমি বলতে চাও, ভগবান একটি ঘুঁটে-কুড়োনী মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে যথাযথ আবিষ্কার করিয়াছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—শ্রীশ্রীমায়ের জীবনের দূর-প্রসারী সার্থকতার কথাও খ্যাপন করিয়া গিয়াছিলেন তিনিই। শ্রীরামকৃষ্ণকে বুঝিবার, অনুসরণ করিবার সময় যেমন স্বামীজীকে সর্বদা পুরোভাগে রাখা বিধেয় শ্রীশ্রীমায়ের জীবন-মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার তেমনই পরম সহায়ক হইতেছে স্বামীজীর তাঁহার প্রতি বিভিন্ন সময়ের আচরণ এবং তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ উক্তিগুলি।

মায়ের জীবন ইতিহাসের কাঁটাকে পশ্চাতে ঘুরাইয়া লইয়া যাইতে বলে না। প্রগতির সহিত উহার কোন বিরোধ নাই। তবে উহা প্রগতি-দেহে একটি কল্যাণ-বর্ম পরাইয়া দেয়—প্রগতি-ধর্মে আনয়ন করে একটি অদ্ভুত সঞ্জীবন-শক্তি। প্রগতির মধ্যে যে আত্ম-বিস্মৃতি—যে অমঙ্গলের সম্ভাবনা রহিয়াছে মা উহা দেন বিদূর করিয়া।

শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী বিশেষতঃ মাতৃজাতিকে লক্ষ্য করিয়া শিক্ষা, ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি নূতন গতিবেগ সঞ্চার করিতে আবির্ভূতা।

ধ্যান ও প্রণাম

(স্রগ্‌ধরা ছন্দ)

পণ্ডিত শ্রীদীননাথ ত্রিপাঠী, সপ্ততীর্থ

ধ্যান

স্নিগ্ধশ্যামামগোত্রা,-মরুণিতচরণাং, কল্পবল্লীসমানাম্
আকীটব্রহ্মরূপাং, স্মিতশশিবদনাং, সর্বভূতাভয়াখ্যাম্।
লজ্জানম্রাবদাতাং, দলিতকলিমলাং রামকৃষ্ণাধিদৈবাং
ধ্যায়েত্তামাদিকর্ত্রীং, ত্রিভুবনজননীং, সারদাং সিদ্ধিদাত্রীম্॥

যিনি স্নিগ্ধ শ্যামবর্ণা, মায়িক দেহধারণসত্ত্বেও যিনি জন্মহীনা, যাঁহার পদযুগল অরুণবর্ণ, শরণাগতের প্রার্থনা পূর্ণ করিতে যিনি কল্পলতিকাবৎ, কীট হইতে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা পর্যন্ত সর্বত্র যিনি অনুস্যূতা, যাঁহার স্মিতোজ্জ্বল মুখমণ্ডল চন্দ্রমাসদৃশ, সর্বপ্রাণীর অভয়দাত্রীরূপে যিনি খ্যাতা, যিনি লজ্জায় অবনতা ও পরমপবিত্রা, যিনি স্বশক্তি দ্বারা কলি-কলুষ বিনাশ করেন, শ্রীরামকৃষ্ণই যাঁহার অধিদেবতা, সেই আদিভূতা সনাতনী ত্রিভুবন-জননী সিদ্ধিদাত্রী শ্রীসারদাকে ধ্যান করিবে।

প্রণাম

গঙ্গাস্রোতোঽম্বুতুল্যাং, নিজগুণকরুণাং, বাহয়ন্তীং জগত্যাং
নীচানীচাপ্রভেদৈ,-রশনবসনদাং, সর্বমাঙ্গল্যধাত্রীম্।
প্রত্যাগচ্ছন্তমেহী,-ত্যবদদতিশুচা, যাশ্রুনেত্রৈরবেক্ষাং-
কুর্বন্তীন্তাং ভবানীং, তনয়হিতরতাং, পাদপাতৈর্নতোঽস্মি॥

অবারিত কলুষনাশন গঙ্গাবারির ন্যায় জগতে যিনি আপন অহেতুক কৃপাগুণ প্রবাহিত করেন, উচ্চনীচ-নির্বিশেষে যিনি অন্নবস্ত্র দান এবং সর্ববিধ মঙ্গল বিধান করেন, একবার চলিয়া গিয়া পুনঃ প্রত্যাগত সন্তানের প্রতি 'বাবা, এস' বলিতে বলিতে অতি আকুলভাবে বিগলিতনয়নে যিনি চাহিয়া থাকেন, সদা সন্তানহিতে রতা সেই ভবানীস্বরূপা জগন্মাতা শ্রীসারদার পাদপদ্মে বিনত হইয়া প্রণাম করি।

পুরাতন স্মৃতি

স্বামী ঈশানানন্দ

শ্রীশ্রীমায়ের শেষ অসুখের সময়কার ঘটনা। একদিন দুপুরবেলা ষ্টার থিয়েটারের তখনকার নামকরা অভিনেত্রী শ্রীমতী তারাসুন্দরী মাকে দর্শন করিবার জন্য আসিলেন। মায়ের শরীর তখন বেশ দুর্বল, মাঝের ঘরে মেয়েদের সকলের সহিত কথা বলিতে বলিতে একটু শুইয়া রহিয়াছেন। তারাসুন্দরী মার কাছে বসিয়া খুব সন্তর্পণে ও ভক্তি-বিনয়-সহকারে কথাবার্তা বলিতে লাগিলেন। কিছু পরে মা বলিতেছেন,—"ষ্টেজে তো বেশ বল, এমন সেজে এস যে তখন চেনাই যায় না।* এখানে এমনিই একটু শোনাও দেখি।" তারাসুন্দরী মাকে নমস্কার করিয়া পুরুষোচিত ধরণে বেশ বীরভাববিষয়ক একটি পাঠ আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। মা খুব খুশী। বলিলেন,—"আর একদিন এসো।"

এই সময় বিশিষ্ট অভিজ্ঞ ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রাণধন বসুর উপর মায়ের চিকিৎসার ভার অর্পণ করা হইয়াছিল। প্রাণধন বাবুকে ১৬৲ টাকা ভিজিট ও ৫৲ টাকা মোটর ভাড়া বাবদ দিতে হইত। তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর আসিয়া মাকে দেখিয়া যাইতেন। একদিন বৈকালে শ্রীমতী তারাসুন্দরী হঠাৎ একটি ট্যাক্সি করিয়া ৪।৫ ঝুড়ি নানা রকমের ফল, মিষ্টি, ফুল, শ্রীশ্রীমার জন্য ভাল কাপড় এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীদ্বয় (রাধু ও মাকু) ও ছোট খোকাদের জন্য কাপড় ও জুতা প্রভৃতি বহু টাকার জিনিসপত্র লইয়া আসিয়া উপস্থিত। মা ঐ জিনিসগুলি মাঝের ঘরে রাখিয়া দিতে বলিলেন। অতঃপর তারাসুন্দরী চলিয়া গেলে মা আমাকে ও গোলাপ-মাকে বলিলেন,—"তারার ঐ খাবার জিনিসপত্র এখানের সাধু-ব্রহ্মচারী ছেলেদের কাউকে দেবার দরকার নেই ; চন্দ্র, ঝি, বামুন ও রাধু, মাকু, ছোটখোকা এদের কিছু কিছু দিও।" ঐ ভাবে মায়ের কথামত সকলকে কিছু কিছু দেওয়া হইল ; বাদ বাকী সমস্তই মাঝের ঘরে আগের মত রহিল। এই দিন সন্ধ্যার পর ডাক্তার প্রাণধন বাবু মাকে দেখিতে আসিয়াছেন। তিনি মাকে পরীক্ষা করিয়া নীচে বৈঠকখানায় পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট গমন করিলে মা আমাকে বলিলেন,—"দেখ, তারাসুন্দরীর জিনিস আর যা আছে, ঐ বুড়োর (ডাক্তারের) গাড়ীতে সব তুলে দিয়ে এসো ; ওঁরা ফুল খুব ভালবাসেন (প্রাণধন বাবু খ্রীষ্টান ছিলেন), ফুলগুলিও দিয়ে এসো।" আমরা তাহাই করিলাম। এদিকে ডাক্তার বাবু মার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া গাড়ীতে উঠিতে গিয়া ঐ সকল দ্রব্য দেখিতে পাইলেন। কে দিলেন জিজ্ঞাসা করায় পূজনীয় শরৎ মহারাজ বলিলেন,—"মা এসব আপনার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন।" ডাক্তার বাবু জিনিসপত্রাদি দেখিয়া খুব খুশী হইলেন মনে হইল।

পরের দিন ডাক্তারবাবু যথাসময়ে মাকে দেখিবার পর ঐ ঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো প্রভৃতি দেখিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমি এতদিন কার চিকিৎসা করছি?" মহারাজ উত্তর দিলেন,—"পরমহংসদেবের সহধর্মিণী, আমাদের সংঘজননী শ্রীশ্রীমায়ের।" ডাক্তার বাবু পুনরায় কহিলেন,—"এত খরচপত্রের টাকা কোথা থেকে আসে?" মহারাজ উত্তরে ভক্তদের সাহায্যের কথা জানাইলেন। "ওঃ, তা এতদিন বলেননি ত,"—

* অভিনেত্রী তারাসুন্দরী অনেক সময় পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করিতেন।

এই বলিয়া ডাক্তার বাবু বসিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। ইহার পর পূজনীয় শরৎ মহারাজ পূর্বের ন্যায় ডাক্তার বাবুকে দর্শনী ও মোটর ভাড়ার টাকা দিতে গেলে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিতে লাগিলেন,—"দেখুন, আপনারা আজীবন অতি নিষ্ঠার সহিত যাঁর আপ্রাণ সেবা করে জীবন সার্থক করছেন, আমাকে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর একটু সেবা করবার সুযোগ দান করুন।" অন্তরের সহিত এই কথাগুলি অতি গদ্‌গদ ভাবে বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখে জল আসিয়া পড়িল। বলা বাহুল্য ঐ দিন হইতে ডাক্তার বাবু আর দর্শনীর টাকা গ্রহণ করিতেন না। অধিকন্তু কয়েকদিন পরে যখন তাঁহার চিকিৎসায় তেমন ফল হইতেছে না দেখিয়া সকলের পরামর্শে মায়ের জন্য অন্য চিকিৎসকের ব্যবস্থা করা হইল, ডাক্তার প্রাণধন বাবু তখনও দৈনিক সন্ধ্যাবেলা আপনার খরচে ট্যাক্সি করিয়া মাকে দর্শন ও অসুখের অবস্থা জানিতে আসিতেন এবং ঐ সময় প্রায় দুই ঘণ্টা নীচের ঘরে বসিয়া কাটাইয়া যাইতেন। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিষয় বিশেষ কিছুই জানিতেন না। পূজ্যপাদ শরৎ মহারাজের নিকট ঐজন্য আক্ষেপ করিয়া কিছু শুনিতে চাহিলে, মহারাজ একদিন তাঁহাকে এক সেট্ 'লীলাপ্রসঙ্গ' উপহার দিয়াছিলেন।

* * *

একদিন জয়রামবাটীতে আমি মার পায়ে ও হাতে হাত বুলাইতেছি। কয়েকটি ভক্তের চিঠির কি কি উত্তর লিখিব জিজ্ঞাসা করায় মা সংক্ষেপে ২।১টি কথা বলিয়া দিলেন। কিন্তু উঁহাদের প্রশ্ন অনেক ছিল। একটু পরে আমি বলিলাম,—"মা, আমার তো তেমন জিজ্ঞাসা করবার কোনই প্রশ্ন মনে ওঠে না। জপ ধ্যানও তেমন কিছু করছি না। সর্বদা আনন্দে একটা নেশার মতন দিন কেটে যাচ্ছে; ভবিষ্যতে কি হবে না হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। তবে ঐ বিষয়ে কোন চিন্তাও নেই।" মা একটু একটু হাসিলেন, তাহার পর বলিতেছেন,—"কি দরকার তোমার?" আমি বলিলাম,—"তা তো কিছুই জানি না।" মা তখন বলিলেন,—"আর ও সকল দিকে চিন্তা করতে হবে না। যা করছ করে যাও; ও সকল দিকে মন দিলে আমার এই কাজগুলি হবে না। ভাবনা কি? পরে পরে সব হবে, সব বুঝতে পারবে।" তারপর আবার বলিতেছেন, "দেখ, বিচার করা, মনের নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা, জপ-ধ্যান কর্ম করা—সব. হল মনের, চিত্তের শুদ্ধতা আনার জন্তে,—কিনা, অনিত্য জিনিস থেকে, মনের বিক্ষেপ থেকে মনকে গুটিয়ে শুদ্ধ করে তাঁর সান্নিধ্যলাভের জন্যে ব্যাকুল হওয়া; তারপর তাঁর কৃপা যে কিসে হবে তিনিই জানেন। তবে কি জানো, সব চেয়ে তিনি কিসে সন্তুষ্ট হন? ওই যা করছ—এতেই একমাত্র তিনি সন্তুষ্ট হন—অর্থাৎ সেবাতে। সেবাতে বনের পশুপাখী থেকে স্বয়ং ভগবান—সব বশ। কাজেই মন খারাপ না করে যা করছ করে যাও। আপনার জনদের চাওয়ার বলার কি আছে?"

"যার যার নাম মনে আসে তাদের জন্যে জপ করি। আর যাদের নাম মনে না আসে তাদের জন্যে ঠাকুরকে এই বলে প্রার্থনা করি—'ঠাকুর, আমার অনেক ছেলে অনেক জায়গায় রয়েছে, যাদের নাম আমার মনে হচ্ছে না, তুমি তাদের দেখো, তাদের যাতে কল্যাণ হয় তাই কোরো'।"

—শ্রীশ্রীমা

শ্রীশ্রীসারদামণি-দশকম্

শ্রীআত্মপ্রজ্ঞ

মানুষীং তনুমাশ্রিত্য লোকোদ্ধারবিধায়িনীম্ ।
পতিলীলাসহায়াং চ বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ১

নারায়ণে যথা লক্ষ্মীর্যথা গৌরী চ শঙ্করে ।
রামকৃষ্ণে তথা যাম্বা বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ২

ধরিত্রীব সহিষ্ণুর্যা স্পন্দক্ষোভাদিবর্জিতা ।
স্বাত্মাভাসনিরোধা চ বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ৩

পতিপ্রিয়া পতিপ্রাণা পতিসেবাতিশোভনা ।
পতিধ্যানপরা যা বৈ বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ৪

পতিশিক্ষাপ্রমোদা যা জ্ঞানভক্তিসমুচ্চিতা ।
সর্বার্থসাধিকা দেবী বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ৫

অম্বা যা ভক্তশিষ্যাণাং জগদম্বাসমা সদা ।
বরাভয়ামৃতস্যন্দা বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ৬

স্বান্তঃস্থা শাস্ত্রমর্মজ্ঞা আবাল্যব্রহ্মচারিণী ।
পাষণ্ডোপাধিবিধ্বংসা বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ৭

সদাশান্তাব্ধিসংকাশা সদা প্রবোধমালিকা ।
সদা সত্যবিধাত্রী যা বন্দে তাং সারদামণিম্ ॥ ৮

দীনার্তদুঃখহা মাতঃ কৃপয়া পরয়া যুতা ।
অবোধং রক্ষ সন্তানং মায়াচক্রবিভেদতঃ ॥ ৯

অদ্য তে পুণ্যজন্মাহঃ স্মরন্ মাতৃ-সুগৌরবম্ ।
পাদেঽত্র প্রার্থনাং দেবি প্রীত্যা সাবহিতা শৃণু ॥ ১০

বঙ্গানুবাদ

পতির লীলায় যিনি হইতে সহায়,
লোকের উদ্ধার হবে এই প্রেরণায়,
ধরিয়া মানুষ-তনু এলেন ধরায়,
সেই সারদামণিরে আজ ভজি বন্দনায় । ১

নারায়ণ বক্ষে যথা শোভিতা কমলা,
শঙ্করের অঙ্কে যথা গৌরী স্নিগ্ধোজ্জ্বলা,
রামকৃষ্ণ সঙ্গে তথা মাতা সারদামণি,
দৃঢ়রূপে বন্দি তাঁর চরণ দুখানি । ২

সহিষ্ণুতা-গুণে যিনি ধরিত্রীর সমা,
স্পন্দন-বিক্ষোভ-হীনা অতি নিরুপমা,
আত্মার আভাস দানে সদা সঙ্কুচিতা,
প্রণাম লউন সেই শ্রীসারদা মাতা । ৩

পতির অতীব প্রিয় যিনি পতিপ্রাণা,
পতির সেবায় যিনি অতি সুশোভনা,
সর্বদা মগন যিনি প্রিয়পতি-ধ্যানে,
প্রণাম, প্রণাম সেই সারদাচরণে । ৪

পতির শিক্ষায় যিনি পেয়ে পূর্ণানন্দ,
জ্ঞান ভক্তি সমুচ্চয়ে ফুল্ল অরবিন্দ,
সর্বার্থসাধিকা দিব্য ভাবের আগার,
সেই সারদামণি-পদে নমি বারবার । ৫

ভক্ত ও শিষ্যের যিনি মাতৃস্বরূপিণী,
জগদম্বা সম সদা ক্ষীর-মন্দাকিনী,
বর ও অভয়মন্ত্রী, অমৃত-স্যন্দিনী,
বন্দন-প্রসন্না হোন্ সেই সারদামণি । ৬

শাস্ত্রের মর্মজ্ঞা যিনি সদা স্বান্তঃস্থিতা,
পাষণ্ডের মতিগতি বিধ্বংস-নিরতা,
বাল্যকালাবধি ব্রহ্মচর্যে বিহারিণী,
প্রণাম-সম্প্রীতা হোন্ সেই সারদামণি । ৭

চিত্ত যাঁর সদা শান্ত সাগর সমান,
গলে সদা দোলে মালা প্রবোধ-বিজ্ঞান,
সতত কল্যাণকল্পে যিনি মুক্তহস্তা,
সেই সারদামণি-পদে প্রণতি প্রশস্তা । ৮

অয়ি মাতা দীনার্তের দুঃখবিনাশিনী,
কৃপা করি সুতে রক্ষ অবোধে জননী,
মায়াচক্র-পিষ্ট সে যে ছিন্ন ভিন্ন দেহ,
তাহারে হেরিবে হেথা হেন নাহি কেহ । ৯

আজি দেবি তব পুণ্য জন্মতিথি-দিনে,
মাতার গৌরব-কথা আসিছে স্মরণে,
শ্রীচরণে প্রার্থনা নিবেদি জননি,
প্রীতি ভরে অবহিতা ধন্য কর শুনি । ১০

ভাব-লোকে

'অনিরুদ্ধ'

'নিত্যই তিনি জগন্মূর্তি'—নৃপতি-বৈশ্যে কহেন ঋষি—
'তথাপি বহুধা জন্ম-গ্রহণ যুগে যুগে তাঁর নানান্ দিশি।'
যেথায় কেঁদেছে আর্ত-পীড়িত ডাকিয়াছে কেহ ত্রাণের তরে
সেথাই জননি হইলে প্রকাশ সমান করুণা সবার 'পরে।

ঊর্ধ্ব আকাশে একদা ঝলকে ইন্দ্র-ব্যামোহ-বিদূর-করা
অতি অপরূপ হৈম কান্তি হস্ত তত্ত্ব-মুদ্রা-ধরা।
ইঙ্গিতে উমা বুঝালে সেদিন অহং বুদ্ধি তুচ্ছ অতি
পরমসত্য-সন্ধানে চাই আদিতে তোমারি শরণাগতি!

চিত্ত আমার চলেছে ছুটিয়া সৃষ্টি-অতীত সেই সে কালে
দুরন্ত মধুকৈটভ সনে যুঝিছেন হরি কারণ-জলে।
সহস্র কত বৎসর কাটে বিজয়-আশার নাহি কো লেশ
অসুর-মানসে হানি মায়া তবে ঘটালে মা তুমি রণের শেষ।

ত্রিলোক ব্যাপ্ত অঙ্গ-জ্যোতিতে কিরীট শোভিছে গগন-ছোঁওয়া
একাই নাশিছ দানব-নিবহ মহিষাদিনী সর্বজয়া।
দণ্ডের ছলে বিতরো আশিস যুগপৎ মাতা ভীষণা মৃদু
সকল-দেবতা-তেজোময়ি অয়ি তোমার উপমা তুমিই শুধু।

পার্বতী তব অঞ্চল ধরি জাহ্নবী-তীরে দাঁড়ানু আসি
যথা হিমাচল-মূলে স্তুতিরত দেবগণ পানে চাহিছ হাসি।
আপনি ঘোষিলে আপন স্বরূপ নারী-অপমান বেজেছে প্রাণে
বিকাশি শক্তি অষ্ট মূর্তি শাসিলে দুষ্ট দৈত্যগণে।

কে নিশীথে দেবি ভাসি আঁখিনীরে 'রাম-রাম-রাম' বিলাপ করো?
কে গোপ-রমণী বিপিনচারিণী আকাশ বাতাস বিরহে ভরো?
রাজরানী তব ভিক্ষুণী-সাজ নেহারি যে মাতা বিদরে হিয়া
কে পুনঃ কাঁদিছ নদীয়া-কুটিরে গৌর-ললনা বিষ্ণুপ্রিয়া?

ফুরালো কি রণ ফুরালো রোদন সাজিলে কি ধ্যান-কর্মময়ী
গহন শান্তি সত্ত্ব-কান্তি আনিলে সেবার মাধুরী বহি?
তোমারি মহিমা খ্যাপিয়া কি হন শ্রীরামকৃষ্ণ যুগের পাতা?
ভুবন ভরিয়া উঠে জয়গান জয় মা জয় মা সারদা মাতা।

আদর্শ নারী সারদা দেবী

শ্রীমতী বেলারাণী দে, এম্‌-এ

এখন থেকে একশো বছর আগে বাঁকুড়া জেলার এক অখ্যাত গ্রামে একটি অত্যন্ত দরিদ্র ব্রাহ্মণ-পরিবারে শ্রীশ্রীসারদা দেবীর জন্ম হয়। তাঁর জীবন ছিল একেবারে আড়ম্বরশূন্য। তাঁর ছিল না তথাকথিত শিক্ষার ঐশ্বর্য, ছিল না রূপের ঐশ্বর্য, ছিল না সাংসারিক বিত্তের ঐশ্বর্য। কিন্তু আজ আমরা দেখছি যে এই সামান্য গ্রাম্য ব্রাহ্মণী সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে ক্রমশঃ বিশ্ববরেণ্যা হয়ে উঠেছেন। শুধু বাংলা বা ভারতবর্ষ থেকেই নয়, পৃথিবীর ওপিঠ থেকে পর্যন্ত কত লোক ছুটে আসছে এই পল্লীরমণীর উদ্দেশে মাথা নত করতে—সারদা দেবীর জন্মস্থান অখ্যাত, অজানা পাড়াগাঁ জয়রামবাটীর ধুলি স্পর্শ করে ধন্য হতে। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের সহধর্মিণী ছিলেন বলেই কি তাঁর এই সম্মান? না, তাঁর জীবন-সাধনায় এবং চরিত্রে এমন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যার জন্যে তিনি আজ দেবত্বে প্রতিষ্ঠিতা? বর্তমান যুগ যুক্তিবাদী। তাই বিচার করে বুঝে নিতে হ'বে যে, আমাদের নতুন যুগের পটভূমিকায় কি নতুন আদর্শ, কি সাধনা তিনি আমাদের নারী-জগতের সামনে রেখে গিয়েছেন—আমাদের নতুন যুগে সারদা দেবীর কি অবদান।

সারদা দেবীর নীরব শান্ত জীবন আলোচনা করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, জগতের অধ্যাত্ম-সাধনার ইতিহাসে তিনি এক অপূর্ব স্থান অধিকার করে আছেন। ভারতবর্ষ বরাবরই সাধক-সাধিকার দেশ। কিন্তু সারদা দেবীর জীবনে এমন একটা নতুন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে যা পূর্বে কখনও দেখা যায়নি। তিনি যেন সংসারে ডুবে-থাকা দুঃখকষ্টে জর্জরিত অগণিত নারী-সমাজের পক্ষ থেকে এই আদর্শই প্রতিষ্ঠা করতে এসেছিলেন যে, সংসারী হয়েও সংসারের শত দুঃখকষ্ট-দারিদ্র্যের মধ্য দিয়েও জীবনে মহত্ত্বে, এমন কি দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হওয়া যায়। নারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সার্থকতা মাতৃত্বে—এই মাতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ হয়েছে সারদা দেবীর জীবনে। সীমাহীন বিরাট মাতৃত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক সাধনার উজ্জ্বল আলোর সমাবেশে তাঁর জীবন উদ্ভাসিত। এই অভিনব বৈশিষ্ট্যের জন্যেই তিনি আজ দেবীর পদে অধিষ্ঠিতা। আমাদের ধর্মজগতের ইতিহাসে অবতার-পুরুষদের সঙ্গে যে সমস্ত শক্তি লীলা-সহচরীরূপে এসেছিলেন, তাঁদের জীবনে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য অদৃষ্টপূর্ব, অশ্রুতপূর্ব। সীতাচরিত্র সতীত্বের মহিমায় সমুজ্জ্বল, রাধিকা প্রেমের গৌরবে গৌরবান্বিতা, কিন্তু নারী-জীবনের যে সার্থকতা মাতৃত্ব, এই মাতৃত্বের সঙ্গে সন্ন্যাসিনীর কঠোর যোগ-সাধনার এ রকম সংমিশ্রণ আর কোথাও দেখা যায় না। আর একটি বিশেষ লক্ষণীয় বিষয় এই যে, সীতা, রাধা, রুক্মিণী, সত্যভামা, বিষ্ণুপ্রিয়া বা গোপা যে সমস্ত অবতারদের শক্তিরূপে তাঁদের সঙ্গে এসেছিলেন সেই সব অবতার-পুরুষদের জীবন-সাধনায় এবং তাঁদের আদর্শ প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের কাজে এঁরা কেউ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি। কিন্তু আমরা সারদা দেবীর জীবনে দেখি, তিনি যে শুধু স্বামীর সাধনায় সব বিষয়ে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছিলেন তাই নয়, শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের পর তিনি যেভাবে সুদীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে অনলসভাবে তাঁর আরব্ধ কর্ম সাধন করে গেছেন, সে এক অভূতপূর্ব কাহিনী। ঠাকুর নিজেই শ্রীশ্রীমাকে বলেছিলেন, তাঁর শরীরটা চলে গেলে তিনিও যেন

শরীর ছেড়ে চলে না যান। ঠাকুরের বাকী কাজ তিনি যেন পূর্ণ করেন। সাধারণের কাছে সারদা দেবী শ্রীশ্রীমা-নামেই সমধিক পরিচিতা। সারদা দেবীকে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণের উত্তর-সাধিকা বলতে পারি।

শ্রীশ্রীমা ছিলেন একাধারে সংসারী গৃহস্থ, আবার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিনী। তাঁর জীবনে আধ্যাত্মিক যোগ-সাধনার দিকটি বাদ দিয়ে সংসারে তিনি কি ভাবে বিচরণ করেছেন, কাজ করেছেন, যদি শুধু সেই বিষয় আলোচনা করা যায় তাহলেও দেখা যায় যে, এ রকম আদর্শ চরিত্র সংসারে বিরল। সারদা দেবীর পুণ্য চরিত্রে পাতিব্রত্য, সেবা, ত্যাগ, তেজ এবং সর্বশেষে মাতৃত্বের অপূর্ব বিকাশ ঘটেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি মায়ের ভক্তি, প্রীতি, সেবা আমাদের সীতা-সাবিত্রীর পাতিব্রত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। ঠাকুরের সাধক-অবস্থায় শত দুঃখ-কষ্ট, দারিদ্র্য ও উৎকণ্ঠাকে বরণ ক'রে তিনি স্বামীর ধর্মকে নিজের ধর্ম বলে গ্রহণ ক'রে এবং স্বামীর সাধনার পথে ত্যাগী যোগিনীর মত আজীবন তাঁকে সর্বতোভাবে সাহায্য ক'রে প্রকৃত সহধর্মিণীর আদর্শ দেখিয়ে গিয়েছেন। মা যখন কিশোরী মাত্র তখন থেকেই তিনি ঠাকুরের মহৎ ভাবকে এবং স্বর্গীয় প্রেমকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই সংসারী লোকদের অবজ্ঞা এবং উপহাস নীরবে উপেক্ষা ক'রে আনন্দে পরিপূর্ণ হ'য়ে থাকতেন। ঠাকুর যখন তাঁর সাধন-মন্দির দক্ষিণেশ্বরে মহাসাধকের জীবন যাপন করছেন, মা ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করার জন্যে জয়রামবাটী থেকে পদব্রজেই সেখানে চলে আসেন। লোকচক্ষুর অন্তরালে নহবতের অতি অল্পপরিসর ঘরটির মধ্যে অত্যন্ত কঠিন ও কঠোর ছিল তাঁর জীবন। সারাদিনের শত কর্মের মধ্যে ঠাকুরের সেবার ওপরেই তাঁর সতর্ক দৃষ্টি সদা জাগ্রত থাকত। প্রতিদিন স্বহস্তে রান্না ক'রে ছোট ছেলের মত ভুলিয়ে ভুলিয়ে ঠাকুরকে খাওয়াতেন, আবার কখনও ঠাকুরের সঙ্গে সারারাত্রি জাগরণ ক'রে ঠাকুরের ভাবসমাধি থেকে কত দেবদেবীর নাম ক'রে তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের শেষ অধ্যায়েও মা কাশীপুর বাগানে বহু কষ্ট ও অসুবিধার মধ্যে থেকে অক্লান্তভাবে ঠাকুরের সেবা করেন। রামকৃষ্ণগতপ্রাণা সারদা দেবীর কাছে ঠাকুরই ছিলেন জীবন-সর্বস্ব।

শুধু পতিসেবাই নয়, বাল্যকাল থেকে জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন পরিজনের, পিতামাতা, অশিক্ষিত অবুঝ গ্রাম্য আত্মীয়স্বজনদের এবং ভক্ত সন্তানবর্গের যে ভাবে সেবা করেছেন তাতে আমাদের বিস্মিত হতে হয়। ছোটকালে ভাই-বোনদের লালনপালন করেছেন। অভাব-অনটনের সংসারে গরুর জন্যে জলে নেমে দল ঘাস পর্যন্ত তাঁকে কাটতে হয়েছে। আবার গ্রামের দুর্ভিক্ষে আর্তদের সেবায় পাখার বাতাস দিয়ে তাদের খাইয়েছেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবার সঙ্গে সঙ্গে সমাগত ভক্তদের সেবাতেও আত্মনিয়োগ করেছেন। বিভিন্ন ভক্তদের রুচি-অনুযায়ী তিনি বিভিন্ন প্রকার খাদ্য প্রস্তুত করতেন। সারাজীবন ধরে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজ মা ঈশ্বরের কাজ বলে মনে করে অত্যন্ত নিষ্ঠা ও প্রীতির সঙ্গে অক্লান্ত ভাবে ক'রে গিয়েছেন। পরবর্তী জীবনে জয়রামবাটীতে এবং উদ্বোধনে যখন তাঁর সাহায্য এবং সেবার জন্যে বহুলোক উদ্‌গ্রীব থাকতেন তখনও তিনি নিজেই নিত্যকার কাজগুলি এবং ভক্তদের সেবা নিজের হাতে আনন্দের সঙ্গে ক'রে যেতেন।

এই সেবা এবং কর্ম তিনি কখনও শুষ্ক কর্তব্যের খাতিরে করেন নি। নানারকম পরিবেশে নানা-রকম কর্মের মধ্যে তাঁর মাতৃত্বের করুণা এবং স্নেহই ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন সরলতা, নম্রতা, পবিত্রতা এবং সহিষ্ণুতার প্রতিমূর্তি। তিনি

ছিলেন অদোষদর্শিনী, কারোর দোষ তিনি কখনও দেখতে পারতেন না। সাধারণতঃ মা অত্যন্ত লজ্জাশীলা, কোমলস্বভাবা এবং মধুরভাষিণী ছিলেন, কিন্তু প্রয়োজনমত কার্যক্ষেত্রে তাঁর ব্যক্তিত্ব, সাহস এবং তেজ অসাধারণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। ডাকাতবাবা এবং পাগলা হরীশের কাহিনী সর্বজনবিদিত। আমরা জানি কিভাবে মা মাড়োয়ারী লছমীনারায়ণের দশহাজার টাকা এবং রামনাদের রাজার উন্মুক্ত কোষাগার প্রত্যাখ্যান করেন।

বিরাট সংসারের দায়িত্ব সুগৃহিণীর মত সুসম্পন্ন ক'রে মা গার্হস্থ্যধর্মের উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন ক'রে গিয়েছেন। আমরা যদি তাঁর এই সেবার আদর্শ, কর্মের আদর্শ, মাতৃত্বের আদর্শ, সহধর্মিণীর আদর্শ গ্রহণ করতে পারি তাহলে আমাদের জীবন সার্থক হ'য়ে উঠবে।

সংসার-জীবনে আদর্শচরিত্র হ'লেও সারদা দেবীর জীবনের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ দিক তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনা। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, সংসারে নানা কাজের মধ্যে অন্য কোন মহৎ কাজ করার আর অবসর থাকে না। শ্রীশ্রীমা যেন তাঁর জীবন দিয়ে এই প্রশ্নেরই সমাধান ক'রে গেছেন। যে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক রাজ্যে তিনি উঠেছিলেন, যে দেবীত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন, সে সাধনায় তাঁকে সংসার ত্যাগ করে বনবাসিনী হ'তে হয় নি। সংসারের শতকর্মের মধ্যেই চলেছিল তাঁর নীরব নিরলস কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা। শ্রীরামকৃষ্ণের মত বিরাট আধ্যাত্মিক সূর্যের অন্তরালে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে প্রচ্ছন্ন রেখেছিলেন, কখনও নিজের সত্তাকে প্রচার করেন নি, এমন কি পরবর্তী জীবনেও তিনি সমাগত ভক্তদের সব সময়েই বলতেন, "ঠাকুরই সব।" এরকম আত্মবিলুপ্তির উদাহরণ অতি বিরল।

শ্রীশ্রীমা যখন প্রথম দক্ষিণেশ্বর আসেন তখন একদিন ঠাকুর তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি কি আমাকে সংসারের পথে টেনে নিতে এসেছ?" মা তখনই দৃঢ়স্বরে উত্তর দিয়েছিলেন, "তোমাকে সংসারের ভেতর টানব কেন? তোমার জীবনের ব্রতে সহায় হ'তে এসেছি।" তাঁদের দুজনের প্রেম ছিল দেহের অতীত, অপার্থিব, অলৌকিক। ঠাকুরের কাছে আধ্যাত্মিক রাজ্যের সুগভীর তত্ত্ব এবং সাধনপদ্ধতি শিক্ষা ক'রে ক্রমশঃ গভীর সাধনার ফলে শ্রীশ্রীমা দিব্য ভগবৎ-উপলব্ধি ও তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারিণী হ'য়ে উঠলেন। সর্বশেষে যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ ফলহারিণী কালীপূজার দিন গভীর অমানিশার রাত্রিতে নিজের ঘরে দেবীর আসনে বসিয়ে শ্রীশ্রীমাকে পূজা করলেন সেদিনকার কাহিনী ধর্মজগতের ইতিহাসে এক অভূতপূর্ব ঘটনা। সে সময় ঠাকুর সমাধিস্থ, মাও বাহ্যজ্ঞানশূন্যা। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সুদীর্ঘ সাধনার ফলরাশি এবং নিজের জপের মালা সারদা দেবীর চরণে সমর্পণ করে প্রণাম করলেন। এই সময় থেকেই সারদা দেবীর জীবনে সর্বজনীন মাতৃত্বের ক্রমবিকাশ সুরু। মহাসাধক শ্রীরামকৃষ্ণের পূজা যিনি গ্রহণ ক'রতে পারেন এবং যাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা ক'রতে পারেন তিনি যে কত বড় আধ্যাত্মিক শক্তি তা আমাদের পক্ষে ধারণা করা একেবারেই অসম্ভব। পরবর্তী কালে ভক্ত সন্তানরা মায়ের জীবনে তাঁর কত অলৌকিক দর্শন এবং দেবীভাবের বিকাশ লক্ষ্য করেছেন তা বর্ণনাতীত।

কাশীপুর বাগানে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের মহাসমাধিযোগে পুণ্যদেহ পরিত্যাগ করে যাবার পর ক্রমশঃ রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘরূপ বিরাট মহীরুহের বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিছুকাল তীর্থে তপস্যায় কাটিয়ে শ্রীশ্রীমা তাঁর অপূর্ব মাতৃত্ব এবং যোগসাধনার সিদ্ধি নিয়ে ঠাকুরের সংসারত্যাগী ভক্ত সন্তানদের একাধারে জননী এবং গুরুর স্থান অধিকার করলেন। এর পর থেকে ১৯২০ সালে তাঁর

তিরোধান পর্যন্ত তিনি সঙ্ঘ-জননীরূপে শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘকে, সকলের অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করেন। স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তগণ নতুন কিছু করতে গেলে সকলের আগে শ্রীশ্রীমায়ের অনুমতি নিতেন। এমন কি আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং সাধনসম্বন্ধে কোন সংশয় উপস্থিত হলে তাঁরা মায়ের সিদ্ধান্ত শেষ কথা বলে অবনত মস্তকে গ্রহণ করতেন। স্বামীজী মায়ের অনুমতি এবং আশীর্বাদ নিয়েই আমেরিকায় বেদান্ত প্রচার করতে গিয়েছিলেন। বেলুড় মঠ প্রতিষ্ঠার সময় তিনি শ্রীশ্রীমাকে নিয়ে এসে তাঁর চরণস্পর্শে মঠের জমি পবিত্র ক'রে নিয়েছিলেন।

ক্রমশঃ শ্রীশ্রীমার চরিত্রের মাধুর্য এবং সাধনার দীপ্তি চারদিকে বিকীর্ণ হতে সুরু করল। দেশ-বিদেশ থেকে কত লোক ছুটে আসতে লাগল তাঁর কৃপা লাভ ক'রে ধন্য হতে। বিদেশী ভক্তদের মা বাংলাভাষায় দীক্ষা দিলেও, তারা ঠিক বুঝে নিত এবং তাদের বক্তব্য তারা নিজেদের মাতৃভাষায় প্রকাশ করত। ভাষার ব্যবধানের জন্যে ভাবের আদান-প্রদানের কোন অসুবিধেই হ'ত না। পাশ্চাত্ত্য দেশের অনেকে মায়ের চরণে মাথা নত ক'রে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন। সিষ্টার নিবেদিতা বলেছিলেন, "মার ভালবাসা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের মধ্যে সেতুস্বরূপ।" এইভাবে জাতি-ধর্ম-ভাষার বাধা অতিক্রম ক'রে শ্রীশ্রীমা সর্বজনীন মাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'লেন। মার গর্ভধারিণী জননী একবার মার সম্বন্ধে দুঃখ করে বলেছিলেন, 'ও মা-ডাক শুনল না।' এই কথা শুনে ঠাকুর বলেছিলেন যে, এত মা-ডাক শুনবে যে তার জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠবে।

ছোট বড় যে তাঁর কাছে আসত সেই একটা অপূর্ব আকর্ষণ অনুভব করত। মা অন্তরযামিনী ছিলেন। একবার দেখেই লোকের অন্তরের শোক দুঃখ জ্বালা যন্ত্রণা প্রশ্ন সমস্যা সব বুঝতে পারতেন; যেরূপ প্রয়োজন তাকে সেই ভাবে সান্ত্বনা বা উপদেশ দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করে দিতেন। কি জয়রামবাটীতে, কি 'উদ্বোধনে' ঠিক গর্ভধারিণী জননীর মতই মা ভক্ত সন্তানদের সেবা-যত্ন করতেন—রান্না করে খাওয়ানো থেকে সুরু করে তাদের উচ্ছিষ্ট পর্যন্ত পরিষ্কার করতে দ্বিধা করতেন না। ধনি-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, সন্ন্যাসি-গৃহস্থ, এমন কি সজ্জন-দুর্জনের প্রতি জাতিধর্মনির্বিশেষে মায়ের অপার স্নেহের এবং করুণার মন্দাকিনী-ধারা সমভাবে প্রবাহিত ছিল। লোকে যাকে অনাদর করত তারই ওপর মার অধিক কৃপাদৃষ্টি পড়ত। কেউ যদি গর্হিত অপরাধ করে অনুতপ্ত চিত্তে মার শরণাপন্ন হত মা তখনই তাকে আশ্রয় দিতেন। এই মাতৃসুলভ স্নেহ আর ক্ষমার দ্বারাই মা বিপথগামীকে সুপথে আনতেন। তখনকার দিনেও মা জয়রামবাটী গ্রামে মুসলমান মজুরদের পরিবেশন করে খাইয়েছেন। অন্য লোকের সমালোচনার উত্তরে বলেছেন, "শরৎও (স্বামী সারদানন্দ) আমার যেমন ছেলে, আমজদও তাই।" মায়ের জীবনে বহু ভক্ত সন্তান অলৌকিক ভাবে তাঁর কৃপা লাভ করে ধন্য হয়েছেন—সে সমস্ত কাহিনী আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। শেষ শয্যায় শ্রীশ্রীমা একটি ভক্ত মেয়েকে বলেছিলেন, "যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের, জগৎকে আপনার করতে শেখ।" শ্রীরামকৃষ্ণ-শক্তিস্বরূপা, যুগধর্মপালিনী শ্রীশ্রীমার এই শেষ বাণীর মধ্যেই যেন তাঁর সাধনা এবং আদর্শ মূর্ত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন বরদাত্রী, জ্ঞানদাত্রী, স্নেহরূপা, 'ক্ষমারূপা তপস্বিনী'। মাতৃত্বের মহাসাধনা-বলেই শ্রীশ্রীমা সকলের মা হয়েছিলেন, সঙ্ঘজননী থেকে বিশ্বজননী হতে পেরেছিলেন। একাধারে এত গভীর, এত উদার, এত স্নিগ্ধ মাতৃত্ব এবং কঠোর সন্ন্যাসের সংমিশ্রণ—জগতের ইতিহাসে অতুলনীয়।

শ্রীশ্রীমার জীবন এবং আদর্শ আলোচনা করে আমরা তাঁর মধ্যে এমন গুণরাশির বিকাশ, এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের সন্ধান পাই যার জন্যে আমরা বলতে পারি যে তিনিই আমাদের বর্তমান যুগের নারী-সমাজের আদর্শ। সিষ্টার নিবেদিতা ঠিকই বলেছিলেন, "নারীর আদর্শ-সম্বন্ধে সারদা দেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা···পুরাতনের শেষ প্রতীক এবং নতুনের সার্থক সূচনা।" পুরাতনের সমস্ত মাধুর্য নিয়ে এবং নূতনের সমস্ত ঐশ্বর্য নিয়ে শ্রীশ্রীমার অনুপম অভিনব চরিত্র নতুন যুগের পট-ভূমিকায় অপূর্ব ভাবে বিকশিত হয়ে উঠেছে। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, "শ্রীশ্রীমাকে কেন্দ্র করেই নতুনতর গার্গী-মৈত্রেয়ীর সম্ভাবনা রয়েছে।" তাঁর চরিত্রের মধ্যে যেমন ভারতীয় ভাবধারার এবং সংস্কৃতির মহিমা অতি উজ্জ্বল রূপে ফুটে উঠেছে তেমনই আবার আধুনিক ভাবধারার সন্ধানও পাওয়া যায়। শ্রীশ্রীমার যুগে স্ত্রীশিক্ষার প্রচলন এবং নারীজাগরণের আন্দোলন সুরু হয়েছে মাত্র। স্ত্রীশিক্ষার প্রতি মার একান্ত অনুরাগ ছিল। তিনি নিজে পড়তে পারলেও লিখতে জানতেন না, কিন্তু মেয়েদের শিক্ষালাভে সর্বদা উৎসাহ দিতেন। তিনি চাইতেন, মেয়েরা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিজেদের সমস্যা নিজেরা সমাধান করুক। অত কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজে বাস করেও তিনি নিজে সকল রকম কুসংস্কারের উর্ধ্বে ছিলেন। শ্রীশ্রীমা সমাজ-সংস্কারক ছিলেন না, অতি নিরীহ গ্রাম্য রমণীর মত গৃহকোণে জীবন কাটিয়ে গেছেন, কিন্তু আমাদের জন্যে রেখে গেছেন তাঁর অপূর্ব জীবনাদর্শ।

বর্তমান যুগ নারী-প্রগতির যুগ। এই অগ্রগতির দিনে এই আদর্শ-বিক্ষুব্ধ জগতে আমাদের নারী-সমাজের পক্ষে আদর্শ-নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক। যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের কর্ম-ধারার এবং চিন্তাধারার পরিবর্তন অপরিহার্য। ভারতের এই নব জাগৃতির দিনে অন্য সব দিকের মতই নারীসমাজেও বিরাট পরিবর্তন সুরু হয়ে গিয়েছে। আমাদের ভারতীয় বৈশিষ্ট্য ও ভাবধারা রক্ষা করে আমাদের নারীসমাজকে সংস্কার করাই সর্বতোভাবে বাঞ্ছনীয়; যান্ত্রিক অনুকরণে কেউ কখনও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে না। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় নূতন ভারতীয় শাসনতন্ত্রে নারীকে পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সর্বত্রই মেয়েরা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রছেন। আজকের দিনে নারীদের উচ্চ শিক্ষালাভ করে বর্তমান যুগের উপযোগী করে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে, আত্মনির্ভরশীল হতে হবে, কিন্তু নারীত্বকে বিসর্জন দিয়ে নয়; নারীকে তার আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের আধুনিক উচ্চশিক্ষিতা মেয়েরা অনেকেই এমনভাবে ভারতীয় আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে বিদেশী নারীর আদর্শ অনুকরণ করে থাকেন যে, তাঁদের ভারতীয় বলে চেনাই কঠিন। এই বিভ্রান্তির দিনে শ্রীশ্রীমার চরিত্রই আমাদের আধুনিক নারী-সমাজের সামনে একটি পরিপূর্ণ সর্বাঙ্গসুন্দর আদর্শ চিত্র। শ্রীশ্রীমার পবিত্র, জ্ঞানদীপ্ত, তেজস্বিনী, করুণাময়ী মাতৃমূর্তি আমাদের শক্তি দেবে, সাহস দেবে, আমাদের জীবনে শুচিতা আনবে, মহত্ত্ব আনবে। তাঁর জীবনাদর্শ আমাদের নারীসমাজকে সত্যের পথের, শান্তির পথের সন্ধান দেবে—আমাদের জীবনে চলার পথে ধ্রুবতারার মতই পথ নির্দেশ করবে।

"পাশ্চাত্ত্যে, নারী—স্ত্রীশক্তি। নারীত্বের ধারণা সেখানে স্ত্রী-শক্তিতেই কেন্দ্রভূত। ভারতের একটা সাধারণ মানুষের কাছেও সমস্ত নারী-শক্তি মাতৃত্বে ঘনীভূত।"

—স্বামী বিবেকানন্দ

জয়রামবাটী

(শতবার্ষিকী-বৎসরে)

ব্রহ্মচারী অভয়চৈতন্য

জয়রামবাটী জাগো !
গ্রামীণ চোখের তন্দ্রা ঘুচায়ে আতিথেয়তায় লাগো।
সবুজের ঐ সীমিত বাঁধন,
ধানের দোলায় দেখে যে স্বপন :
প্রাণান্বিত-নভ নীল তুলিকায়
রামধনু রঙ নিঙাড়ে মাথায়;
ক্রন্দসীর ঐ ক্ষম্বিত ব্যথায়
'আমোদর' তন্ময়।
শতবার্ষিকী সময় ঘনায়
উৎসব-আঙিনায়।

জয়রামবাটী জাগো !
ছিন্ন স্মৃতির পাপড়ি খুলিয়া আভ্যুদয়িকে লাগো।
কুটীরাভরণে রূপের মাধুরী
আধুনিকতায় হয়নিকো ভারী।
আবাহন নয়—আরাধনা তব,
অমৃতের অনুভব !
আকুল আকুতি,—মা-মা-ডাকে ভরা, উত্তাল জনরব।

জয়রামবাটী জাগো !
সপ্তমীচাঁদে, প্রয়াসী আলোকে কন্যাবরণে লাগো।
পৌষ নিশির পূত-প্রস্তুতি
এনেছে ধরায় অমর বেসাতি।
ত্যাগের মহিমা, স্নেহের ভূপালী
উছলে ভূলোকে দীপ্র দীপালী।
রুদ্রকালের প্রলয়-নাট্যে, মহামঙ্গল দীপ্তি,—
অধুনাতনের নিয়ম-নিগড়ে— অবারিত পরিতৃপ্তি !

জয়রামবাটী জাগো !
নির্বাণময়-দীপের দেউলে মায়ের আশিস মাগো।
আবহমানের ধূসর প্রান্তে
তোমার আসন রবে একান্তে।
হোম-শিখানলে, নব উপচারে
অন্তর্মুখী কল্যাণ—ধারে
অনন্ত তব আশিসেতে ঝরে অযাচিত অবদান ;
অনতিক্রম্য পার হবো লভি—নির্মোহ অবসান।
জয়রামবাটী জাগো !
মাতৃস্নেহের পীযূষপ্লাবনে আতিথেয়তায় লাগো।

মাতৃচিত্র

শ্রীভাগবত দাশগুপ্ত

মহাপুরুষের জীবনকে কয়েকটি ছোট ছোট ছবির সমষ্টি বলা চলে, আর প্রত্যেকটি ছবিকে অবলম্বন করে রচনা করা যায় এক একটি গীতি-কবিতা—সুন্দর, গভীর, মর্মস্পর্শী সে ছবি। শ্রীশ্রীমার জীবন-সম্বন্ধে একথা আরও বিশেষ করে খাটে। মায়ের জন্ম থেকে সুরু করে দেহ-ত্যাগ পর্যন্ত প্রত্যেকটি ঘটনাই এক একটি ঘরোয়া চিত্র বলে মনে হয়। সে চিত্রে অবোধ্য বা রহস্যময় কিছু নেই, খুবই সহজ সরল অনাড়ম্বর গ্রাম্য চিত্র। তাকে যে বিশেষ দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে হ'বে তাও নয়। সহজ, সরল ঘরোয়া ছবি, কিন্তু তাই বলে তাতে গভীরতার অভাব নেই।

* * *

"এই আমি তোমার কাছে এলুম।"

গ্রীষ্মতপ্ত জনপদের উপরে মলয় হাওয়ার মত, ঊষর মরুভূমির উপরে সরস বর্ষাধারার মত এ কার কণ্ঠস্বর! বহুদূর থেকে ভেসে আসা এ কার গীত-গুঞ্জন! এত মধুবর্ষী কেন? পাঁচটি শব্দের মধ্যে এতখানি প্রাণ, এতখানি ভালবাসা, এত করুণা-ঢালা কথা, এত হৃদয়জয়ী আকর্ষণ!

তুমি এলে। অকারণে, এমনি এলে। ভালবেসে এলে। অপরূপ মাধুর্যের বন্যা নিয়ে অনন্ত ঐশ্বর্যময়ী এলে। এলে একান্ত হয়ে, ছোট্ট মেয়েটি হয়ে। রাজর্ষি জনকের কাছে এলে সীতা হয়ে, এলে বৃষভানুর কাছে রাধা হয়ে। ছোট্ট পায়ে ঝনন্ ঝনন্ করে নূপুর বাজিয়ে জানালে তোমার আগমনের সংকেত। গলা জড়িয়ে ধরে জানালে তোমার ভালবাসা; জানালে, এবার পাত্র নিঃশেষ করে দিতে এসেছো। দরদ দিয়ে বল্‌লে—

"এই আমি তোমার কাছে এলুম।"

* * *

মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহম্। অগ্রহায়ণ মাস। ঘরে ঘরে ধান। ধান তো নয়, পাকা সোনা—সত্যিকার ঐশ্বর্য। ঘরে ঘরে আনন্দ। গরীব চাষীর ঘরেও আজ হাসির ছড়াছড়ি। সারা বছরের আশার ছবি আঁকছে মনে মনে। আজ 'নূতন ধান্যে হবে নবান্ন'। যিনি আনন্দময়ী, শোকতাপিত অগণন জনগণের হৃদয়ে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপন করবার জন্য যাঁর আসা, তাঁর দেহধারণের এই তো উপযুক্ত সময়।

সত্যি তিনি এলেন। অগ্রহায়ণের কৃষ্ণাসপ্তমী বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। দুঃখিনী ব্রাহ্মণীর কোলে ঐ তো সেই দেবতনয়া। স্নিগ্ধ চোখ-জুড়ানো গায়ের রঙ। মৃদুমধুর হাসি লেগে রয়েছে সুন্দর অধর-কোণে। ঊর্ধ্বে উত্থিত দুটি হাতে ঐ তো জানালেন বরাভয়। জানালেন, আমি এসেছি। ঘরে ঘরে গৃহললনারা তখনও কমলাদেবীর ব্রত-অর্চনায় ব্যাপৃতা। অকস্মাৎ শুভ শঙ্খধ্বনি জানিয়ে দিল তাদের ব্রতসিদ্ধির বার্তা।

* * *

"কই আমার অলংকার, আমার গলার হার!" —কাঁদছে পঞ্চবর্ষীয়া বালিকা-বধূ সারদা। চৌরশ্রেষ্ঠ হরি তা হরণ করে নিয়েছেন—কত কৌশলে, কত সন্তর্পণে! নিয়েছেন নূতন নূতন অলংকারে সাজাবেন বলে! যাঁর অলংকার হবে প্রেম, প্রীতি, করুণা, ভালবাসা; ভক্তি হবে যাঁর গলার হার, তাঁর কেন আর স্বর্ণ-অলংকারের বাহার? তুচ্ছ স্বর্ণমৃগ কত দুঃখের, কত অশ্রুজলের কারণ হয় সে কি এত সহজে ভুলে যাই? তাই এবার অলংকারের বোঝা ঘুচিয়ে দিলেন প্রথমেই—জানালেন বৃহতের আহ্বান। পাগলা ভোলার পার্শ্বে এই নিরাভরণা গৌরীই সাজাচ্ছে ভালো।

ঐ ছোট মেয়ে গৌরীর মধ্যেই যে জগন্মাতা, দশমহাবিদ্যা—আভাসে চকিতে না বোঝালে আর কেমন করে বুঝতে পারি? ভোলানাথেরও ভুল হয়ে যায় যে, ঐ ছোট্ট মেয়ে সারদার মধ্যেও ঘুমিয়ে আছে জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা।

দেশে দুর্ভিক্ষ, কিন্তু যে ঘরে স্বয়ং অন্নপূর্ণা জাগ্রতা সে ঘরে অন্নের অভাব হয় না। ক্ষুধাকাতর নরনারী সারি সারি বসে গেছে অন্নপূর্ণার উন্মুক্ত গৃহপ্রাঙ্গণে। আর অন্নপূর্ণা? সে সকলের কাছে গিয়ে গিয়ে ছোট্ট হাত দুটি নেড়ে নেড়ে পাখার হাওয়া কর্‌ছে, অন্নের উষ্ণতায় কারো কষ্ট না হয়!

আয়, সবে ছুটে আয়। মায়ের ঘরে আজ অমৃতের পরিবেশণ। এমন সুযোগ আর মিলবে না। এই অমৃতের এককণা পেলেও আমাদের কামনা বাসনা সব চলে যাবে, আমরা অমর হ'ব।

* * *

"হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট স্থাপিত রহিয়াছে।" কিন্তু এ মিলন এত স্বল্পকালস্থায়ী, মাত্র সাতমাস পরেই আবার অদর্শন। তার উপরে আবার পতিনিন্দা—পতি পাগল, পতি উন্মাদ! পতিনিন্দা শুনবার ভয়ে সতী গৃহমধ্যে অন্তরীণ হলেন। বাইরে

দিন রাত নানা কাজে ব্যাপৃতা, অন্তরে বিরহের হোমানল, প্রতি মুহূর্তে অন্তরে করছেন জীবন-দেবতার ধ্যান, পূজা। কখনও কখনও এই প্রাণফাটা বিরহের আর্তি জানিয়ে দেন ঝোড়ো হাওয়ার মুখে, কখনও বা গতিশীল মেঘের বুকে। অসীম নীলিমায় তারকার অক্ষরে লিখে দেন বিরহের পত্র। এই বিরহে আকাশবাতাস বৃক্ষলতা সকলেই ব্যথাতুর, কিন্তু তবু ডাক আসে কই? কই তাঁর প্রাণমাতানো বাঁশীর সংকেত? এই যে দীর্ঘশ্বাস, এ কি তাঁর বাঁশীতে ব্যথার সুরে বেজে উঠবে না? কবে শেষ হবে এই প্রতীক্ষা?

* * *

"তুমি এতদিনে এলে?"—সুধামাখানো সুরে প্রশ্ন ভেসে এল। সারদা দেবী এসেছেন দক্ষিণেশ্বর, পায়ে হেঁটে গায়ে জ্বর নিয়ে, বহুদিনের আর্তি, বহু দিনের অভিমান বুকে নিয়ে—এসেছেন আত্ম-নিবেদন করবার জন্য। ভয়ও আছে, যদি তিনি গ্রহণ না করেন, যদি বিফল হয় এ পুষ্পাঞ্জলি, পায়ে ঠেলে দেন এ অর্ঘ্য, জীবনদেবতা যদি বিমুখ হ'ন। যদি তাঁর সাধনায় বিঘ্ন হয়, যদি ধ্যানভঙ্গে রুষ্ট হন! তবু, এত পথহাঁটা কি ব্যর্থ হবে! ভয়ে, শরমে, ভালবাসায় সারদা দেবী তাকালেন ধূর্জটির মুখের পানে, প্রথম কথাটি শুনবার জন্য রইলেন উৎকর্ণ হয়ে। প্রশ্ন এল,—

"তুমি এতদিনে এলে?"

এ প্রশ্নের উত্তর তো নেই—সারদা দেবী তাই নিরুত্তর। মনে মনে বুঝলেন, এ শুধু প্রশ্নচ্ছলে আপন করে নেওয়া, একান্ত করে নেওয়া। এ গ্রহণ—বর্জন নয়। শুধু জানানো, আমিও তো তোমার জন্যে প্রতীক্ষা করে আছি, ভরা মন নিয়ে বসে আছি।

তিনি বললেন, "তুমি আমার আনন্দময়ী মা।"

সারদা দেবী আরও গভীর করে বললেন, "তুমি আমার সব।"

* * *

আজ ফলহারিণী কালীপূজা। কিন্তু রামকৃষ্ণের আজ আর প্রতিমায় কি প্রয়োজন? রক্তমাংসের জীবন্ত দেবীপ্রতিমা আজ সশরীরে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূতা। রামকৃষ্ণের অন্তরে আজ অভিনব পূজার সঙ্কল্প। শিবরূপে বুক পেতে দিয়েছি রাঙা পা দুখানি ধারণ করবার জন্য, কৃষ্ণরূপে বলেছি, 'দেহি পদপল্লবমুদারম্', আজ রামকৃষ্ণরূপে জবাচন্দন দিয়ে পূজা করব, পুষ্প-অর্ঘ্যের মত নিবেদন করব জীবনের সমস্ত সাধনা।

কিন্তু কে কার পূজা করবে? রামকৃষ্ণ আর সারদা দেবী কি আলাদা? সমুদ্র আর সমুদ্রের ঢেউ কি ভিন্ন, অগ্নি আর তার দাহিকা শক্তি? তাই পূজ্য-পূজক দুই আজ মহাসমাধিতে এক হয়ে মিলিত হয়েছেন। এ মিলনের তুলনা কোথায়? ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে, পূজার গাম্ভীর্যে বুঝি সমস্ত জগৎ কেঁপে উঠছে। প্রদীপ-শিখার মত স্থির গম্ভীর দুইটি দীপশিখা প্রথমে মিলে এক হ'ল, তার পর তা ব্যাপ্ত হ'ল দিগ্‌দিগন্তে।

* * *

"কে যায়?" কর্কশকণ্ঠে প্রশ্ন এল পথহারা সাথাহারা সারদা দেবীর কাছে।

যিনি বিষ্ণুপ্রিয়া, যিনি বিশ্বাত্মিকা,—সকলের যিনি আত্মার আত্মীয়া তাঁর কাছে আর কে পর কে আপন কে মনোরম আর কে ভয়ানক? তাই স্বভাবকোমল কণ্ঠে উত্তর দিলেন,—

"তোমার মেয়ে সারদা।"

যে ভালবাসায় পাষাণও দ্রব হয়, সাধারণ ডাকাত সেখানে কঠিন হয়ে থাকবে? এক মুহূর্তে তার অন্তরের শত সহস্রযুগের অন্ধকার কেটে গিয়ে প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, জেগে উঠল তার শাশ্বত পিতৃহৃদয়। যে হৃদয়ে কোমলতা ছিল দুর্বলতা, কল্যাণের কণামাত্রও যেখানে দুর্লভ ছিল, পিতৃস্নেহে সে হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠল।

শতযুগের অন্ধকার ঘর যেমন একটি দেশলায়ের আগুনে আলোকিত হয়, একটি সুকোমল আঁখিপাতে প্রস্ফুটিত হল ডাকাতের হৃদয়পদ্ম।

তারপর সে বিদায়দৃশ্য—সেই বারবার ফিরে ফিরে চাওয়া। আর অশ্রুবর্ষণ, সেই হৃদয়ে হৃদয় অনুভব—এ দৃশ্য অনুপম।

*　　*　　*

উন্মুক্ত নীল আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ, জ্যোৎস্নার প্লাবনে ভেসে যাচ্ছে পৃথিবীর বক্ষ। গঙ্গার জলে তার অপূর্ব প্রতিসরণ। ছোট্ট ছোট্ট ঢেউএর মাথায় মাথায় শতকোটি তারকার ঝলক। সেই ভুবনপ্লাবী জ্যোৎস্নার এক টুকরো এসে পড়েছে ধ্যানরতা সারদা দেবীর মুখে বুকে। অমনি তাঁর অন্তরে উদ্গীত হ'ল প্রার্থনামন্ত্র—

ওগো পূর্ণশশী, আমাকে তোমার মত সুন্দর কর, পবিত্র কর, স্নিগ্ধ কর। প্রখর সূর্যতেজ তোমার স্পর্শগুণে হয় সুধাধারা, আহা, দিনমণির প্রভায় চোখ যাদের ঝলসে গেল তাদের জন্য আমাকে স্নিগ্ধ কর। শতকোটি তরঙ্গশিশুর মুখে স্নেহের চুম্বন দেওয়ার জন্য আমায় জ্যোৎস্না দাও। কিন্তু ওগো নিশামণি, তোমারও মুখে নাকি কলঙ্কের কালিমা, কিন্তু আমার অন্তর যেন নিখুঁত হয়, যেন না থাকে তাতে আলোকালোর মিশেল।

*　　*　　*

মুক্ত অম্বরতলে জগন্মাতা ধ্যানাসীনা। ধীরে ধীরে মন উড়ে চলল পাখা মেলে, দেহ থেকে দেহাতীতের পানে। খণ্ডের দেশ ছেড়ে মন চলল অখণ্ডের দেশে, রূপ থেকে অরূপে। সূর্য, চন্দ্র, তারা অরূপসাগরে সব মিশে গেল—'শূন্যে শূন্য মিলাইল', নিখিল ভরে উঠল প্রার্থনার সুরে সুরে—

নিবিড় আঁধারে মা তোর চমকে অরূপরাশি,
তাই যোগী ধ্যান ধরে হয়ে গিরিগুহাবাসী
সমাধি মন্দিরে ওমা কে তুমি গো একা বসি ?

মা পুজোয় বসেছেন। জীবন-দেবতার পায়ে দেবেন পুষ্পার্ঘ্য। বিল্বপত্রপুষ্পাঞ্জলি তুলে নিয়েছেন হাতে। ধীরে ধীরে চোখের পাতা বুজে গেল, বন্ধ হয়ে গেল ইন্দ্রিয়ের দ্বার। মাথা থেকে খসে পড়ল বস্ত্রাঞ্চল। মন গিয়ে নিলীন হল কোন এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে। আস্তে আস্তে স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠল, মৃদু মধুর হাসি দিব্য আননে। দুফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল হাতের পুষ্পাঞ্জলিতে। অপার্থিব অশ্রুকুসুমের স্পর্শে পার্থিব ফুল হ'ল আরও সুন্দর। জীবনদেবতার পায়ে স্থান পেয়ে তাদের আনন্দ আর ধরে না।

*　　*　　*

সন্তান গিয়েছে মার কাছে, নৌকোয় করে গঙ্গা পেরিয়ে। নীলাম্বর বাবুর বাগানবাড়ীতে আছেন মা, বাৎসল্যের ভাগীরথী। জুলাই মাস, বর্ষাকাল। দেখা হয়ে গেল ; এবার বিদায়ের বেলা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি সুরু হল গঙ্গার উপরে, ঝরে ঝরে পড়তে লাগল মুক্তাবিন্দুর মত। বৃষ্টির কণা যেন মাতৃ-বিরহের অশ্রুকণা। তবু বিদায়, মা বিদায়। জানি না তোমার সাথে আবার কবে দেখা হবে ! সন্তান চোখের জলে ভেসে আবার নৌকায় উঠল। আর তাকিয়ে রইল, মায়ের বাড়ীখানার দিকে সাশ্রুনয়নে। ঐ যে মা উঠে এলেন ছাদে। আবার চার চোখে মিলন, অশ্রুধারা। টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছে, অন্ধকার এসেছে ঘনিয়ে। স্নেহবিহ্বলা মা দাঁড়িয়ে আছেন ছাদে—অন্ধকারে মুখ তাঁর ভাল দেখা যায় না ! এ দৃশ্য স্থায়ী রইল, যতক্ষণ না সন্তানের নৌকা মিলিয়ে গেল দিগন্তে। মায়ের মূর্তি তখন আস্তে আস্তে মিশে গেল অসীম নীলিমার মাঝখানে।

*　　*　　*

মায়ের কোন সন্তান চলে যাবেন, আর হয়ত জীবনে দেখা হবে না। মাকে ছেড়ে যেতে সন্তানের মন চাচ্ছে না। তবু চলে যেতে হবে। সন্তানের চোখে জল, মনে দুঃখ—মা কি আর তেমন

মনে রাখবেন, তেমন করে ভালবাসবেন। সন্তানের দুঃখ দ্বিগুণ আঘাতে বাজল মায়ের বুকে। প্রথমে নিজেকে সামলে নিয়ে অভয় দিয়ে বললেন, "ভয় কি বাবা, আমি আছি, হেসে নেচে চলে যাও।" কিন্তু বিদায়বেলা মায়ের অশ্রু আর বাধ মানে না—চোখের জলে ভেসে বলতে লাগলেন, "আমায় ভুলো না, ভুলবে না জানি, তবু বলচি।"

"কিন্তু মা তুমি? আমি যদি ভুলেও থাকি, তুমি কি মা হয়ে ছেলেকে ভুলবে?"

"মা কি কখনও ভুলতে পারে ছেলেকে।" উত্তর এল।

* * *

দর্শনপিয়াসী সন্তানের অন্তিম সময় উপস্থিত। মা রয়েছেন বহুদূর, এ জীবনে বুঝি আর দেখা হয় না। সমস্ত বুক ভেঙ্গে কান্না এল—অঝোরে ঝরে পড়তে লাগল অশ্রু। কিন্তু সন্তানের আন্তরিক ডাকে মা কি সাড়া না দিয়ে থাকতে পারেন? মুখে স্বর্গীয় হাসি নিয়ে হাতে বরাভয় নিয়ে মায়ের মূর্তি ফুটে উঠ্‌ল সন্তানের মানসচক্ষে। শুধু মানসচক্ষে কেন? যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃ-রূপেণ সংস্থিতা—জগতের কোথাই বা তাঁর অগম্য! সন্তানের সমস্ত দুঃখ চলে গেল, আবার হাসিতে ভরে উঠল মুখমণ্ডল। অন্তরের গভীরে স্পর্শ করলো সামনে গীয়মান মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সঙ্গীত—

পোহাল দুঃখরজনী
গেছে 'আমি আমি' ঘোর কুস্বপন
নাহি আর ভ্রম জীবন মরণ
জ্ঞান অরুণ বদন বিকাশে—হাসে জননী।
বরাভয়করা দিতেছে অভয়
তোল উচ্চতান গাও জয় জয়
বাজাও দুন্দুভি, শমন বিজয়,
মার নামে পূর্ণ অবনী।

সন্তানের আত্মা ধীরে ধীরে মিশে গেল মায়ের শাশ্বত চরণকমলে।

* * *

মা শেষশয্যায় শায়িতা। তবু প্রাণীর জন্য, জগতের প্রতিটি সন্তানের জন্য, আত্মীয় অন্তরংগদের জন্য, চিন্তার বিরাম নেই, ভালবাসার সহানুভূতির অভাব নেই। ভালবেসে, কৃপা করে এমনি এসেছিলেন, ভালবেসেই চলে যাবেন। স্বামী সারদানন্দকে ডেকে চোখে চোখ, হাতে হাত রেখে করুণনয়নে বল্‌লেন,

"শরৎ, এরা রইল।"

পার্থিব মায়ের পক্ষেও যেমন, অপার্থিব জগন্মাতার পক্ষেও সেই একই উদ্বিগ্নতা, একই ভাব, একই ছবি।

* * *

উপরে যে কয়টি ছবি তুলে ধরা হ'ল, এমনি অসংখ্য ছবির সমবায়ে মায়ের জীবন। এগুলি যে অসাধারণ সে কথা বুঝি। কিন্তু তবুও মনে হয়—মা যেন খুবই সাধারণরূপে, অন্তরংগ হয়ে এসে বসেছেন আমাদের মর্মের মাঝখানে। তিনি আমাদের ভাষায় কথা বলেন, আমাদের মতই চলেন ফেরেন। তিনি আমাদের ভালবাসেন, আমাদের ভালবাসা চান। এই ভালবাসতে ও ভালবাসাতে তিনি সাধারণ হয়েছেন, সহজ সরল হয়েছেন। তাই সহজ সরল তাঁর জীবন-চিত্র—শুচিশুভ্র তাঁর জীবন-গাথা।

"বৈদিক ঋষি পুরুষশরীরের ন্যায় নারীশরীরেও সমভাবে আত্মার বিকাশ অবলোকন করিয়া সর্ববিষয়ে পুরুষের সহিত নারীকে সমানাধিকার প্রদান করিয়া তাঁহার পূজা ও সম্মান করিলেন। পরমাত্মার সাক্ষাৎ সন্দর্শনে এবং পবিত্র স্পর্শে নারীও যে পুরুষের ন্যায় অতীন্দ্রিয় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্না হইয়া ঋষিত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা অবনত মস্তকে স্বীকার করিলেন।"

—স্বামী সারদানন্দ (ভারতে শক্তিপূজা)

শ্রীশ্রীমায়ের উদ্দেশে

(এক)

শ্রীমা

শ্রীউপেন্দ্র রাহা

অখ্যাত পল্লীর মাঝে ব্রাহ্মণের ঘরে
এসেছিলে কন্যারূপে। শতবর্ষ পরে—
কোটি কোটি প্রাণে আজ তুমি অধিষ্ঠিতা
মাতৃরূপে, দেবীরূপে—জগৎ-বন্দিতা।
রামকৃষ্ণ-সাধনার কেন্দ্র-স্বরূপিণী,
পরিচয় তুমি তাঁর জীবন-সঙ্গিনী।
তোমারেই দেখিলেন পূর্ণ মাতৃরূপে
পূজিলেন তাই তোমা পুষ্প-দীপ-ধূপে
ভক্তি-উপচারে ; মহাশক্তির প্রতীক
তুমি মাগো, কত আর্ত-বিভ্রান্ত পথিক
তব স্নেহছায়াতলে লভিয়া আশ্রয়
করিল জীবন ধন্য পুণ্য মধুময়।
দীর্ঘ শতাব্দীর শেষে আজি গো জননী,
কোটি কণ্ঠে গীত তব বন্দনার ধ্বনি।

(দুই)

জন্মতিথিতে মাতৃসমীপে

শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী

ভবতারিণীর ছায়ারূপা দেবী
তুমি ত শুধুই মানবী নও।
দুঃখ দহন তাপিত বিশ্বে
শান্তির বারি তুমিই বও!
রামকৃষ্ণের পূজা-অঞ্জলি
তোমারি চরণে পড়িল ঝরি!
মহাসাধনার সিদ্ধিরূপিণী
কে বলে মা তুমি ক্ষুদ্র নারী?
নিখিল জগতে চিনিয়া লইলে
মাতৃহৃদয় আলোকে, অয়ি!
তোমার দুয়ারে ভিখারী বিশ্ব,
মাতারূপে তুমি মহিমময়ী!
কত অমৃত সিঞ্চিলে মাগো
কত মরুবুকে ফুটালে ফুল!
তব করুণার অলকানন্দা
কুলুকুলু রবে ছাপাল কূল!
অফুরান স্নেহ, নাহিক বিচার
কেবা সাধু, কেবা পুণ্যবান!
সন্তান শুধু এই পরিচয়ে—
দীনহীনেরেও করিলে ত্রাণ!
ললাটে রাখিলে শীতল পরশ
গেল অনন্ত যুগের তাপ!
পুণ্যপ্রভায় ঝলিল বিশ্ব
বিবরে লুকাল কামনা-সাপ!

মা বলিয়া শুধু যে ডেকেছে তোরে
সেই পেয়ে গেছে চরণছায়া !
না জানি কাহার অসীম পুণ্যে
স্বরগের ছবি ধরিল কায়া ?
আজি তব শুভ জনম-লগনে
এসেছি ভকতি-আনত-শিরে।
তোমার লীলায় পূত এ তীর্থে
কলকল্লোলা তটিনী-তীরে।

হেথা প্রতি তৃণে জাগে রোমাঞ্চ
কার দুটি পদপরশ লাগি ?
প্রতি পল্লবে, প্রতিটি কুসুমে
কার মধুরিমা রয়েছে জাগি ?
এস অনন্ত করুণারূপিণী,
এস শান্তির বিমল জ্যোতি !
বিশ্বমানস হ'ল উতরোল
স্মরি এ পুণ্য জনম-তিথি !

(তিন)

অঞ্জলি

শান্তশীল দাশ

মাগো তোমার চরণ দু'টি
স্মরণ করে পাই অভয় ;
এমন দু'টি চরণ যে আর
পাইনে খুঁজে বিশ্বময়।
ধেয়ান করি মনের মাঝে,
আঁধার ঘুচে আলোক রাজে ;
মন্দ-ভালোর দ্বন্দ্ব টুটে
সব বেদনা পায় যে লয়।

সভ্য ধরার সব অভিমান
ঘুচ্‌লো মাগো তোর সকাশে ;
নিরক্ষরা গাঁয়ের মেয়ের
পায়ের তলে সবাই আসে।
বিজ্ঞানীরা দেখলো চেয়ে
অবাক হয়ে, এ কোন্ মেয়ে ;
এমন ধনে কে এই ধনী
যে-ধন কভু হয় না ক্ষয়।

(চার)

গান

শ্রীমতী উমারাণী দেবী

এসো মা সারদে শুভদে বরদে
রাঙাপদে নতি করি মা।
আপদে বিপদে সুখে সম্পদে
ও চরণ যেন স্মরি মা॥

ভজন পূজন তব আরাধন
দাও মা শিখায়ে দাও,
নিবেদিতে এই হৃদয়কুসুম
আপনি ফুটায়ে নাও ;

এ ভব-সংসারে কিবা ভয় আর
তুমি আছ জানি জননী আমার
অভয়-স্বরূপা রূপে অপরূপা
রহ অন্তর ভরি মা॥

তোমারি আলোকে তব সন্ধানে
চলি যেন মাগো পুলকিত প্রাণে
(এই) জনম-মরণ-সিন্ধু গহন
পার করো হাত ধরি মা॥

একটি দিনের স্মৃতি

শ্রীমতী কুন্তলিনী দাশগুপ্তা

অশেষ সৌভাগ্যবশতঃ আমি শ্রীশ্রীমার দর্শন ও তাঁহার কৃপা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম। আমি তখন ১৮ বৎসরের বালিকামাত্র। বয়স্ক লোকদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা সমস্যা আমার ছিল না এবং মার কাছে আমি সেরূপ কিছুর সমাধানও চাহি নাই। শিশুর মত সরল প্রাণে আমি চাহিয়াছিলাম তাঁহার কৃপা ও আশীর্বাদ। আর তিনিও চিরকল্যাণময়ী জননীর মত স্নেহের সঙ্গে তাহা দান করিয়া আমার প্রাণমন ভরিয়া দিয়াছিলেন। বেশ মনে আছে, তাঁহার প্রত্যেকটি কথা, প্রত্যেকটি ব্যবহার বুকের ভিতর এক একটি আনন্দের তরঙ্গ তুলিয়াছিল। আর আমাদের ন্যায় অধম সন্তানদেরও তিনি কত প্রশংসাই না করিয়াছিলেন! কেন করিয়াছিলেন তাহা জানি না। শুধু এইটুকুই জানি যে, আমরা উহার যোগ্য ছিলাম না এবং উহা আমি তাঁহার সুগভীর স্নেহের নিদর্শন বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলাম। তাঁহার নিকট হইতে যখন ফিরিয়া আসি তখন আমার হৃদয় পরিপূর্ণ, দেহ-মন এক অপূর্ব আশার আলোকে উদ্ভাসিত। মার অপার্থিব স্নেহ-বিজড়িত সেই একটি দিনের স্মৃতিই এই বিবরণে লিখিতেছি।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দ। আশ্বিন মাসে আমি দীক্ষার জন্য শ্রীশ্রীমার নিকট একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে মা জয়রামবাটী হইতে লিখেন যে, তিনি ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় আসিবেন এবং তখন আমিও যেন আসি, আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।

নানা কারণে ফাল্গুন মাসে আমার আর আসা হয় নাই। ১৯১৮ সালে ৺পূজার অল্প পূর্বে আমি কলিকাতায় পৌঁছি এবং তাহার পরদিন সকালবেলা উদ্বোধনে মায়ের বাটীতে যাই।

তখন বেলা প্রায় ৮॥ টা হইবে। আমার সঙ্গে আমার স্বামী, তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র ও আমার দাদা। পুত্রটিকে গাড়ীতে দাদার নিকট রাখিয়া আমি স্বামীর সহিত মায়ের বাড়ীতে প্রবেশ করিলাম। স্বামী নীচে রহিলেন, আমি উপরে গেলাম।

মা তখন ঠাকুরঘরে পা ছড়াইয়া বসিয়া তরকারী কুটিতেছিলেন। সেখানে আরও কয়েকটি ভদ্রমহিলা বসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাদের নিকট মা কে জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা শ্রীশ্রীমাকে দেখাইয়া দিলেন। আমি মায়ের পদতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিলাম। মা আমাকে হাত দিয়া সামনের জায়গা দেখাইয়া বলিলেন, "বস"। তখন যে কয়জন ভদ্রমহিলা সেখানে ছিলেন তাঁহারা একে একে মাকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেলেন। আমি মাকে বলিলাম, "মা, আমি দীক্ষা নিতে এসেছি।" মা সহজভাবে বলিলেন, "বুঝেছি" এবং সেই সঙ্গে কুটনো কাটা শেষ করিয়া বঁটি তুলিয়া উঠিয়া পড়িলেন।

উঠিয়াই তিনি খাটের পার্শ্বে সাম্‌না-সামনি দুইখানি আসন পাতিলেন এবং ছোট একটি গঙ্গাজলের কমণ্ডলু লইয়া একখানি আসনে আমাকে বসিতে বলিয়া অপরখানিতে নিজে বসিলেন। আমি বসিলে তিনি আমার হাতে গঙ্গাজল দিয়া আচমন করাইলেন এবং ভগবানের নাম উচ্চারণ করিতে বলিলেন। ইহার পর তিনি আমাকে বিধিমত দীক্ষা দিয়া জপ করা শিখাইয়া দিলেন। জপ করার সময়ে আমি আঙুল ফাঁক করিয়া জপ করিতেছিলাম দেখিয়া মা আমাকে আঙুলগুলি একত্র চাপিয়া রাখিয়া জপ করা দেখাইয়া দিলেন। কিন্তু আমি ঠিক পারিতেছিলাম না, আঙুলগুলি

ফাঁক হইয়া যাইতেছিল। তখন মা বলিলেন, "ওকি, জপের ফল বেরিয়ে যাবে যে।" ইহার পর আমি ঠিকমত জপ করিলাম।

দীক্ষান্তে এক অপূর্ব আনন্দে আমার প্রাণমন ভরিয়া উঠিল। আমি মাকে প্রণাম করিয়া বলিলাম, "মা, আমার যেন জ্ঞান, বিবেক, বৈরাগ্য লাভ হয়।" ইহা বলিতে বলিতে, কেন জানি না, কাঁদিয়া ফেলিলাম। মা সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "হবে বৈকি মা, হবে বৈকি" বলিয়াই পুনরায় বলিলেন, "আহা মা, তোমার কি ভক্তি!" আমি তখন আরও কাঁদিতে লাগিলাম। অনেক কষ্টে আত্মীয়স্বজনের প্রবল বাধা অতিক্রম করিয়া আমি মার কাছে আসিতে পারিয়াছিলাম, তাহা মনে করিয়া আমার আরও কান্না পাইতে লাগিল।

ইহার পর মা উঠিয়া আমার হাতে একটি সন্দেশ দিয়া বলিলেন, "খাও।" আমি বলিলাম, "মা, তোমার প্রসাদ খাব।" মা তখন সন্দেশটি জিবে ঠেকাইয়া আমাকে দিলেন। আমি তাহা দরজার কাছে দাঁড়াইয়া খাইতে লাগিলাম। মা এই সময়ে পার্শ্বের ঘরে মাকুকে মুড়ি দিতেছিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুড়ি খাবে মা?" এবং আমি কিছু বলার আগেই মেঝেতে মাকুর পার্শ্বে কিছু মুড়ি ঢালিয়া দিলেন। তখন আমরা সেখানে বসিয়া তেলেভাজা, নারিকেলের ফালি ও মুড়ি খাইলাম।

ঐ সময়ে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার সঙ্গে এসেছ মা?"

আমি উত্তর দিলাম—"স্বামীর সঙ্গে।"

মা—"স্বামী কি করেন, কোথায় থাকেন?"

আমি—"তুমি তাকে চেন মা। গেল বছরের আগের বছর জয়রামবাটীতে তোমার কাছ থেকে দীক্ষা নিয়ে এসেছেন।"

শুনিয়া মা তখন কিছু ব[ি]লেন না।

ইহার অল্প পরেই পুরুষ ভক্তরা মাকে প্রণাম করিতে আসিলেন। আমরা তখন পার্শ্বের ঘরে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। পুরুষ ভক্তরা চলিয়া গেলে, আমি মার ঘরের দরজা দিয়া ঢুকিতেই অবাক্ হইয়া দেখিলাম যে, ঐ দরজার সাম্‌নেই মা আমার ছেলেটিকে গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া আদর করিতেছেন। ছেলেটি আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মা, সাদা মা?" আমি বলিলাম, "হাঁ, সাদা মা।" তখন মাকু প্রভৃতিও সেখানে আসিলে মা তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "আহা, বেশ ছেলেটি গো, বেশ ছেলেটি।" তারপর তিনি ছেলেটিকে একটি সন্দেশ খাইতে দিলেন। আমি মাকে উহা প্রসাদ করিয়া দিতে বলিলে, মা উহা পূর্বের ন্যায় জিবে ঠেকাইয়া দিলেন। (পরে স্বামীর কাছে শুনিয়াছি যে, তিনি যখন মাকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন, তখন মা নিজ হইতেই ছেলেটিকে দেখিতে চাওয়ায় তিনি তাহাকে মার কাছে দিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা কেহই ছেলের বিষয় পূর্বে মাকে বলি নাই)।

কিছুক্ষণ পরে আমরা পার্শ্বের ঘরে আসিলাম। তখন মা আমার দেওয়া কাপড়খানি হাতে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই কাপড় তুমি এনেছ মা? বেশ কাপড় হয়েছে।" তারপর মা আমার দিকে ও মাকু প্রভৃতির দিকে তাকাইয়া আমার স্বামীর সম্বন্ধে বলিলেন, "ওকে আমি চিন্‌তে পেরেছি। ও যে দু'বছর আগে জয়রামবাটী গেছল।" সেই সঙ্গে আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "আচ্ছা মা, ও ওকালতি ছেড়ে দিলে কেন?" আমি তখন ছেলেমানুষ, কথা গুছাইয়া বলিতে শিখি নাই। তাই থতমত খাইয়া সরল ছেলেমানুষের মত বলিয়া ফেলিলাম, "তা না হলে মা তোমাকে যে ডাকা হয় না।" মা শুনিয়া একটু মৃদু হাসিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা ঠিক মা, ও যারা পারে, তারাই পারে। এরা কি পারে কখন?" এইখানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, আমার স্বামীর ওকালতি-

ত্যাগের বিষয় আমরা কেহ পূর্বে মাকে কিছু বলি নাই।

ইহার পর মা পুনরায় ঠাকুরঘরে গেলেন। একটু পরে আমিও সেখানে গেলাম। গিয়া দেখি শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হইয়া গিয়াছে এবং মা ঘরের মাঝখানে বসিয়া দুইখানি ছোট পাতায় করিয়া জলখাবার খাইতেছেন। আমার পূর্ব হইতেই ইচ্ছা ছিল যে, মা খাইতে খাইতে আমাকে তাঁর পাতের প্রসাদ দেন। কিন্তু লজ্জায় কথাটা মুখ ফুটিয়া বলিতে পারিলাম না। তাই একটু ঘুরাইয়া বলিলাম, "মা, আমি একটু ঠাকুরের প্রসাদ খাব।" মা প্রথম একখানি পাতা হইতে কিছু তুলিয়া দিতে গেলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বলিলেন—"না, এতো ঠাকুরের প্রসাদ নয়।" বলিয়াই পার্শ্বের অপর পাতাখানি হইতে একটু তুলিয়া দিলেন। ইহার পর মা খাইতে লাগিলেন, আমি তাঁহার সামনে বসিয়া রহিলাম। মা খাইতে খাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার ছেলে কি বলে আমাকে?" আমি বলিলাম, "সাদা মা বলে।" মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন?" আমি হাসিয়া বলিলাম, "বোধ হয় তোমার ছবিখানা সাদা দেখে।"

খাওয়া শেষ হইলে আমি যখন ঠাকুরঘরের ভিতর একটু ঘুরিয়া ঘুরিয়া সব দেখিতেছিলাম, তখন মা আমার কাছে আসিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদের একখানি গ্রুপ-ফটো দেখাইয়া আমাকে বলিতে লাগিলেন, "এই প্রেমানন্দ, এই ব্রহ্মানন্দ, এই শশী—রামকৃষ্ণানন্দ, এই শরৎ—সারদানন্দ, ইত্যাদি।" এইভাবে প্রত্যেকের নাম ধরিয়া ছবি দেখান শেষ হইলে, মা খাটের উপরে বসিলেন। আমি তাঁহার সামনে নীচে বসিলাম। তখন মাকু প্রভৃতি আসিয়া আমার হাতের চুড়ি, বালা, প্রভৃতি দেখিতে লাগিল। এই সময়ে মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নামটি কি মা?" আমি নাম বলিলে মা মাকু প্রভৃতিকে বলিলেন, "তোরা নামটি মনে রাখিস, যদি কখনও চিঠি-টিঠি লেখে।"

ইহার পরে সেখানে আর যে সকল কথা হইতে লাগিল তাহা সবই মেয়েলী কথা, লিখিবার মত কিছু নয়। তবে ইহার মধ্যেও মার সুগভীর স্নেহ অনুভব করিয়াছিলাম। তাই দুই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম: (১) আমার হাতের সোনা-বাঁধানো লোহাটা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় তাহা গড়াইতে দিয়াছিলাম। ইহা আমার নিকট হইতে জানিবার পরেও উপস্থিত কেহ কেহ আমার হাতে শাঁখার সঙ্গে লোহা না থাকায় ত্রুটি ধরিয়া মন্তব্য করিতে লাগিলেন। তখন মা তাঁহাদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "নোয়াটা ফেটে গিয়েছে, তাই।" তখন তাঁহারা চুপ করেন। (২) অপর একজন মহিলা মার সামনে আমার বাঁকা সিঁথির বিষয় উল্লেখ করেন। মার কাছে আসিবার সময়ে আমি বিদেশে; তাড়াতাড়ির মধ্যে আর চুল আঁচড়াইয়া আসিতে পারি নাই। তাই আমার মাথায় পূর্বদিনের বাঁকা সিঁথিটাই রহিয়া গিয়াছিল। এখন মার সামনে ঐ বাঁকা সিঁথির কথা উঠায় আমি প্রথমে লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলাম। মা কি মনে করিতেছেন ভাবিয়া ভয়ে ভয়ে তাঁহার মুখের দিকে তাকাইতেই তিনি আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তা এখন হয়েছে এই সব।" তখন আমি হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

মার এই গভীর স্নেহাশ্রয়ে নানা কথাবার্তায় আর কিছু সময় কাটিলে আমার যাইবার জন্য ডাক আসিল। মা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার গাড়ী এসেছে?" আমি "হাঁ" বলিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কিন্তু সিঁড়ির নিকট আসিতেই মনে হইল যাইবার সময় আমি মাকে একবার ভাল করিয়া দেখিলাম না। তাই ফিরিয়া গেলাম। গিয়া দেখি, ঠাকুরঘরে কেহ নাই। আমি তখন বাহিরের দিকের দরজা দিয়া মুখ বাড়াইতেই দেখি, মা বারান্দায় রেলিং ধরিয়া রাস্তার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। আমি উঁকি দিতেই মা আমার দিকে মুখ ফিরাইলেন। কিন্তু তাঁহার চোখে চোখ পড়িতেই আমি লজ্জায় ছুটিয়া চলিয়া আসিলাম।

প্রাণের আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই রহিয়া গেল। কারণ, মাকে আমার এই প্রথম ও শেষ দর্শন। তবে ইহাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সম্বল হইয়া আছে।

কামারপুকুরে শ্রীশ্রীমা

শ্রীতামসরঞ্জন রায়, এম্-এস্‌সি, বি-টি

কামারপুকুর! হুগলী জেলার কামারপুকুর। স্বভাবতঃ জনবিরল সেথাকার পল্লীগৃহ তখন প্রায় জনহীন, প্রায় নিস্তব্ধ। রঘুবীর-বিগ্রহের সেবা-পূজা নিয়ে পরিবারের দু'একজন মাত্র তখন বাস করেন সেখানে। আর সবাই হয় প্রবাসে, নয় লোকান্তরে। যারা আছে, কায়ক্লেশেই তাদের দিন কাটে। চির-অসচ্ছল কামারপুকুরের সংসারে তখন যেন আরও অসচ্ছলতা! সেই নিদারুণ অসচ্ছলতার মধ্যেই বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসে মা অনেকদিন বাস করেছিলেন। অভাব-অনটনের বড় কষ্টের মধ্যেই কেটেছিল সে দিনগুলি। সঙ্গি-সাথী তো কেউ ছিলই না—তার উপর, অর্থাভাবে কখনো সামান্য শাকভাত, কখনও বা কেবলমাত্র নুনভাত খেয়েই তাঁকে দিন কাটাতে হত। অথচ সে সংবাদও বাইরে কেউ রাখত না।

মা চিরদিন যদৃচ্ছলাভে তুষ্ট ছিলেন। চিরদিন অল্পে সন্তুষ্ট ছিলেন। সামান্য তুচ্ছ বস্তুও কেউ কখনও দিলে কত আনন্দ করে মা দশজনকে ডেকে দেখাতেন। বলতেন,—'দেখগো, অমুকে এইটি দিয়েছে।' কাজেই শারীরিক কষ্টকে বড় একটা গ্রাহ্য করতেন না, গায়ে মাখতেন না তিনি। ঠাকুর বলেছিলেন, 'আমি যখন থাকব না, তখন তুমি কামারপুকুরে থাকবে। শাক বুনবে। শাকভাত খাবে আর হরিনাম করবে।' মা সত্য সত্য এ-কালে তা-ই করতেন। অভাব-অভিযোগ তাঁকে স্পর্শ করত না। কামারপুকুরের নীল নভপট আনন্দময় ঐশ আবির্ভাবে পূর্ণ বলে তাঁর কাছে ক্ষণে ক্ষণে মনে হত।

মনে হত, বনানীর পত্রচ্ছায়ায় রহস্যময় অজস্র ইঙ্গিত যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। বাতাসে মহাজীবনের শাশ্বতগান যেন তরঙ্গায়িত। অর্থাৎ, ব্রজধামের শেষদিকের দিনগুলির মত কামারপুকুরেও প্রায়ই বিচিত্র দর্শন ও অনুভূতিতে তাঁর সমগ্র সত্তা আবৃত হয়ে থাকত, পূর্ণ হয়ে থাকত। বিরাট বিশ্ব ব্যগ্র বাহু দুটি প্রসারিত করে অহর্নিশ তাঁকে যেন আহ্বান করত—উদাত্ত, অনুদাত্ত, মন্দ্রস্বরে।

যেন বলত,—মা তুমি স্বয়ম্প্রকাশ, প্রকাশিতা হও। তুমি বিশ্বের ঈশ্বরী—বিশ্বকে রক্ষা কর, বিশ্বকে ধারণ কর :

> 'বিশ্বেশ্বরী ত্বং পরিপাসি বিশ্বং
> বিশ্বাত্মিকা ধারয়সীতি বিশ্বম্।'
>
> —চণ্ডী, ১১।৩৩

কাজেই, খাওয়া-পরার অভাব-অনটন তাঁর মনকে কীভাবে আর স্পর্শ করবে? অতীন্দ্রিয় দর্শনের জ্যোতি-তরঙ্গে, সহজানন্দে ঘুরে বেড়াত তাঁর মন। অবশ্য, তাদের বিস্তারিত ইতিহাস আমাদের জানা নেই, কারুরই জানা নেই। কারণ, মা কখনো এ সব দর্শনাদির কথা বড় একটা উল্লেখ করেন নি জীবনে। শুধু যে দু'টি একটি বিচিত্র দর্শনস্মৃতি দীর্ঘকাল তাঁর অন্তরে জাগ্রত ছিল, তাদেরই কাহিনী কখনো কখনো উল্লেখ করেছেন উত্তরকালে, কথাপ্রসঙ্গে।

উদাহরণ হিসাবে, তাদেরই দু'-একটির উল্লেখ এখানে আমরা করব। একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই ঘটেছিল সে সব দর্শন এবং মাও সেভাবেই তাদের বর্ণনা করেছেন।…

* * *

সেদিন জ্যৈষ্ঠের অপরাহ্ণ বেলা।

জনবিরল কামারপুকুরের গোঠে মাঠে দিনশেষের সূর্যরশ্মি ধারায় ধারায় ছড়িয়ে পড়েছে। ক্লান্ত ধরিত্রী, ক্লান্ত তার উষ্ণ নিঃশ্বাস। বাতাসে ঈষৎ গুমোট ভাব।

মা বাটির সম্মুখের অপরিসর পায়ে চলার পথটির ধারে আনমনে দাঁড়িয়েছিলেন সম্পূর্ণ একাকী। এমন সময় সে দর্শনটি উপস্থিত হল।

মা দেখলেন, ভাবে নয়, কল্পনায় নয়—সাদা চোখে প্রত্যক্ষ দেখলেন—দিব্যদেহধারী, দীর্ঘাঙ্গ শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যোমপথে নেমে আসছেন ঊর্ধ্বলোক থেকে। সর্বাঙ্গ থেকে অপরূপ লাবণ্য বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

ভূপৃষ্ঠ থেকে অল্প একটু উপর দিয়ে লঘুপদে এগিয়ে চলেছেন তিনি পুরঃপ্রসারিত দিগন্তের পথে। আর তাঁর পদনখকোণ থেকে গঙ্গার জলধারা অশ্রান্ত প্রবাহে বেরিয়ে এসে পৃথিবীর মাটি সিক্ত করছে, বিধৌত করছে।

আরও দেখলেন, তদীয় লীলাসহচর, অন্তরঙ্গ সেবকগণ অনুবর্তী হয়ে সেই জলরাশি মস্তকে ধারণ করছেন, তাতে অবগাহন করে পবিত্র করছেন তনু, মন।

মুহূর্তে পৌরাণিক যুগের বিস্মৃতপ্রায় অতীত কাহিনী ভেসে উঠল মায়ের চেতন-মানসে। সত্য যুগের পুণ্যস্মৃতি কলিযুগের ধরিত্রীতে রূপায়িত হল কি পুনর্বার? হরজটা-নিঃসৃত গঙ্গা ভগীরথের শঙ্খনিনাদে বিধৌত করল কি মেদিনী?

সঙ্গে সঙ্গে পথের ধারের ফুলগাছ থেকে মুঠো মুঠো জবাফুল তুলে এনে সে জলরাশিতে নিক্ষেপ করলেন মা; যুক্ত করে প্রণাম করলেন সে দেব-আবির্ভাবকে, প্রণাম করলেন সে পূত জলধারাকে। স্বর্গের ধ্যানমন্ত্র শব্দিত হল মাটির পৃথিবীতে—

সুস্পষ্ট, 'মন্দ্রিল বাঁশী সুন্দরের জয়ধ্বনি গানে।'

ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হল দৃশ্যপট। ধীরে ধীরে মায়ের হাতের পুষ্পাঞ্জলি পেয়ে পরিতৃপ্ত দেবতামণ্ডলী মহাকাশের মহাশূন্যে অদৃশ্য হয়ে গেল, বিলীন হয়ে গেল।

এ অপূর্ব দর্শনটি মা'র কাছে নিগূঢ় তাৎপর্যে পূর্ণ বলে মনে হয়েছিল। ঠিক এ ধরনেরই আর একটি দর্শন অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে আরও একবার মায়ের জীবনে উপস্থিত হয়েছিল। প্রাসঙ্গিক বলে সে কথাটিও এখানেই আমরা উল্লেখ করছি।

মা তখন বেলুড়ে, নীলাম্বর বাবুর ভাড়াটে বাড়ীতে। দিনশেষের ক্লান্ত রবি সেদিনও অস্তাচলশায়ী। সেদিনও তার লোহিত আভায় সর্বচরাচর অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে গঙ্গার জলধারা। পশ্চিম দিগ্বধূ সোনার স্বপ্ন দেখ্‌তে শুরু করেছে।

এমন সময় সহসা মা দেখতে পেলেন—দিব্য দেহে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জ্যোতির্বর্ত্মে নেমে এলেন পৃথিবীতে। মাটিতে পাদক্ষেপ না করে সরাসরি অবতরণ করলেন গঙ্গায় এবং অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিব্য তনুখানি জলরাশির সঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিশে গেল, তদাকারাকারিত হয়ে গেল।

পরমুহূর্তে মা দেখলেন, স্বামিজী,—স্বামী বিবেকানন্দ—'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' উচ্চারণ করতে করতে সেই জলরাশি তটভূমির অগণ্য নর-নারীর মাথায় ছিটিয়ে দিচ্ছেন। পূত বারিস্পর্শে সদ্যমুক্ত হয়ে ব্যোমপথে তারা বিলীন হয়ে যাচ্ছে ঊর্ধ্বলোকে।

'বিশ্বের রহস্যলীলা যেন লভিতেছে আপন প্রকাশ
দেবতার উৎসব-প্রাঙ্গণে।'

এ দর্শনের পর অনেকদিন মা আর গঙ্গায় নামতে পারেননি। কেবলি তাঁর মনে হত—গঙ্গাবারি, ব্রহ্মবারি। দেবদেহ মিশে গেছে সে সলিলে। কাজেই, এতে পা দেওয়া চলতে পারে না কোনমতেই। দীর্ঘকাল পরে তাঁর সে ভাব অবশ্য অনেকটা দূরীভূত হয়েছিল।

তবে একটু 'গঙ্গাবাই' মা'র চিরদিনই ছিল, গঙ্গাতীরে বাস সর্বদাই তাঁর কাম্য ছিল।

মায়ের কামারপুকুরের জীবনালোচনা-প্রসঙ্গে একটি কঠোর তপশ্চর্যার কথাও এখানে মনে পড়ে—তাঁর পঞ্চতপা অনুষ্ঠান। মায়ের উত্তরজীবনে

এই 'পঞ্চতপা'র কাহিনী তাঁর নিজ মুখ থেকেই শোনবার সুযোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটেছিল।

মা বলেছিলেন,—পঞ্চতপা অনুষ্ঠানের আগে—দেশে থাকবার সময় প্রায়ই একটি দশ-বার বছরের কিশোরী সন্ন্যাসিনীকে তিনি দেখতে পেতেন। তার তৈলহীন, রুক্ষ মাথাভরা একমাথা চুল। গায়ে গেরুয়া, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষের জপমালা। মা দেখতেন, অনেক সময়ই দেখতেন—সে মেয়েটি তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আকারে ইঙ্গিতে একটা কিছু অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছে যেন। প্রথম প্রথম বিশেষ খেয়াল করেন নি মা। কিন্তু শেষে হঠাৎ একদিন ভিতর থেকেই যেন সে ইঙ্গিতের অর্থ ভেসে উঠল। কে যেন বলে উঠল,—'পঞ্চতপা, কঠোর ব্রত পঞ্চতপা! তারই অনুষ্ঠান কর তুমি।'

পঞ্চতপা কি বস্তু মা'র জানা ছিল না। সেজন্য নিত্যসঙ্গিনী যোগেন মাকেই জিজ্ঞাসা করলেন পঞ্চতপার কথা। বললেন,—'পঞ্চতপা কাকে বলে যোগেন? আমি কিছুদিন ধরে এই রকম দেখ্ছি।'—

তারপর বেলুড়ে নীলাম্বরবাবুর বাড়ীতেই পঞ্চতপার আয়োজন হল। মা এবং যোগেন মা দুজনে এক সঙ্গেই সে দুরূহ ব্রতের অনুষ্ঠান করলেন।

চারদিকে পাঁচ হাত অন্তর অন্তর চারটি অগ্নিকুণ্ড। তাতে ঘুঁটের আগুন, উপরে অনাবৃত সূর্য। তারই মধ্যে সূর্যোদয় থেকে একেবারে সূর্যাস্ত পর্যন্ত একাসনে জপধ্যান—এই পঞ্চতপা।

মা বলতেন,—'প্রথমদিন সকালে স্নান করে গিয়ে দেখি আগুন খুব জ্বলছে। গন্-গনে আগুন। দেখে ভয় হয়েছিল প্রাণে। ভেবেছিলাম কি করে এর ভিতরে যাব আর সূর্যাস্ত পর্যন্ত থাকব। যোগেন কিন্তু বলল—'ভয় নেই মা, এস।'—বলে আমার হাত ধরল। তখন মনে মনে ঠাকুরের নাম নিয়ে প্রবেশ করলাম। ঢুকে দেখি আগুনের কোন তাপ নেই। কিন্তু পাঁচদিন আগুনের মধ্যে বাস করে শরীর যেন পোড়া কাঠের মত হয়ে গিয়েছিল। রং হয়েছিল কালীর মত।'

প্রাচীন যুগের তপস্বিনী গৌরীর এ যেন এক নবতম আলেখ্য, বিরহকৃশা গোপা, বিষ্ণুপ্রিয়ার এক অভিনব অভিব্যক্তি। দেখে আমরা অবহিত হই, বিস্মিত হই।

অবশ্য, মায়ের সমগ্রজীবনই একটি অব্যাহত সাধনজীবন। যোগ-সংসিদ্ধিতে পরমপুরুষের সঙ্গে একাত্ম হয়েই তিনি অবস্থান করতেন অহর্নিশ। সুতরাং, সাধনজীবন বলে একটি অংশকে একটু স্বতন্ত্র করে, কিছুটা রেখাঙ্কিত করে দেখাবার তাৎপর্য যে খুব বেশী আছে তা নয়। তথাপি, তাঁর গুরুভাব ও মাতৃভাবের ব্যাপক অভিব্যক্তির প্রাক্-কালটিকে সাধারণভাবে তপস্যার কাল বলেই আমরা উল্লেখ করলাম। নতুবা, ঘটনাবিরল মায়ের যে জীবন মুখ্যতঃ ধ্যানময়, ভাবময়—বাহ্যিক আচার-আচরণে যার প্রকাশ নিতান্ত কম—তার ক্রমবিকাশের অদৃশ্য গতিপথটি অনুসরণ করা এবং শব্দগণ্ডীতে তাকে প্রকাশ করা সহজ নয়, হয়ত বা সম্ভবই নয়।

প্রাচীন ও বর্তমান—এ-দুই যুগের ঠিক সন্ধিক্ষণে, এ দুই যুগের সার্থক সমন্বয়বিগ্রহরূপে মা তাঁর অমৃতমধুর জীবনটি নিয়ে বাংলার বুকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। অশেষ সুকৃতিবশে তাঁকে আমরা আমাদের মধ্যে পেয়ে ধন্য হয়েছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণের ধ্যান-স্বচ্ছ দৃষ্টিতে নারী-আদর্শের যে সর্বতোভদ্র রূপটি বাস্তব হয়ে ফুটে ছিল মা তারই নিখুঁত জীবন্ত বিগ্রহ ছিলেন। তাঁর জীবনকে অতিক্রম করে শ্রীরামকৃষ্ণের মত মহামনীষীর ধ্যানকল্পনাও আর কোন বৃহত্তর, উন্নততর নারী-আদর্শে পৌঁছাতে পারে নি। নিবেদিতা তাই বলেছিলেন,—'She (Holy Mother) is the last of an old order and the beginning of a new ...To me it has always appeared that she is Sri Ramakrishna's final word as to the ideal of Indian womanhood.' ৬

শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্যস্মৃতি

শ্রীমতী বীণাপাণি ঘোষ

শ্রীশ্রীঠাকুরের পুণ্যদর্শন লাভ করেছিলেন আমার পূজনীয় শ্বশুর মহাশয়।

শ্রীশ্রীঠাকুর যে কয়জন ভাগ্যবানকে রসদ্দার বলে নির্দেশ করতেন, তাঁদের মধ্যে একজন, যাঁর নাম ছিল ঠাকুরের কথায় 'সুরেশ মিত্তির', সেই সুরেন বাবু ছিলেন আমার শ্বশুর মহাশয়ের পরম বন্ধু। আমার শ্বশুর মহাশয় তখন কলকাতার সিমলা ষ্ট্রীটে সুরেন বাবুর বাড়ীর নিকট থাকতেন। তাঁরই সঙ্গে একদিন দক্ষিণেশ্বরে আমার শ্বশুর মশাই গিয়েছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করবার সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল। তখনকার দিনে সাধুদর্শন করতে গেলে তাঁর অলৌকিকত্বই সাধুত্বের পরিচায়ক বলে গণ্য হত, ভগবৎ-তত্ত্বান্বেষণে খুব কম লোকেই সাধুর নিকট যেতেন। আমার শ্বশুর মহাশয় ছিলেন বড় ইঞ্জিনীয়ার। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট প্রণাম করে বসতেই ঠাকুর যেমন সকলকেই বল্‌তেন "মাঝে মাঝে এসো," তাঁকেও ঐরূপ বলেই তারপর বলেছিলেন, "ওরে তুই বদ্‌লি হয়ে গেছিস্‌।" বাড়ী এসেই শ্বশুর মশাই দেখেন পূর্ণিয়ায় তাঁর বদল হবার খবর দিয়ে সরকার হতে তার এসে গেছে। এতে তিনি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলেন, কারণ তখন তিনি তা আশা করেন নি। এই অলৌকিক ঘটনা তাঁর হৃদয় স্পর্শ করেছিল বটে, কিন্তু বদলি হয়ে বিদেশে চলে যাওয়ায় আর সংসারের নানাবিধ ঝঞ্ঝাটে ডুবে যাওয়াতে এবং বহুদিন কলকাতা ছাড়া হয়ে থাকায় তাঁর আর শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে যাওয়া সম্ভব হয়নি। তারপর যখন তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন, তখন ঠাকুর মানবলীলা সংবরণ করেছেন।

বহুদিন কেটে গেল, শ্বশুরের প্রথম সন্তান আমার ডাক্তার ভাসুর যখন বালিকা বধূ আর শিশুসন্তান রেখে অকালে মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে পিতামাতাকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করে চলে গেলেন, তখন তাঁদের প্রাণে সান্ত্বনা দিতে আত্মীয়ের হাতের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মধ্য দিয়ে ঠাকুর আমাদের ঘরে এলেন। সেই থেকে আমরা তিন পুরুষ ঠাকুরের শ্রীচরণে বাঁধা পড়েছি।

আমার বড় জা ভারী ভক্তিমতী ছিলেন। তাঁরই সংস্পর্শে আমার শোকাতুরা শাশুড়ী ঠাকুরানী শ্রীশ্রীমায়ের চরণতলে গিয়ে একটু শান্তি লাভ করতেন। কিছুদিন পরে কৃপাময়ী মা আমার শোকাতুরা শাশুড়ীমাতাকে ও আমার বড় জাকে শ্রীচরণে আশ্রয় দেন। তখন আমি বালিকা, মনে মনে ইচ্ছা থাকলেও কিছু বলবার মত সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি।

মাঝে মাঝে শাশুড়ীর সঙ্গে শ্রীশ্রীমায়ের চরণ-দর্শনে যেতুম, তাঁদের কথা অবগুণ্ঠনাবৃতা হয়ে শুনতুম। আমাদের বাড়ীতে আবার অবগুণ্ঠন খোলবার উপায় ছিল না বা শাশুড়ীর সামনে অপরের সঙ্গে কথা বলারও নিয়ম ছিল না। তাই শাশুড়ীর সাহচর্যে শ্রীশ্রীমায়ের সান্নিধ্যলাভ সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌বার সুযোগ হ'ত না।

আমার বাপের বাড়ীর দিকে তখনও কেউ ঠাকুরের ভক্ত হন নি। দক্ষিণেশ্বরে বা বেলুড় মঠে বেড়াতে যাওয়া ছাড়া আর কিছু সেখান হ'তে হত না।*

* পরে অবশ্য আমার মাতাঠাকুরানী ঠাকুরের কাজের জন্য অকাতরে ব্যয় করতেন। তাঁর পিতামাতার স্মৃতিতে ৺কাশীতে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে সংক্রামক রোগীর ওয়ার্ড তিনিই নির্মাণ করে দিয়েছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণ দর্শন বা স্পর্শন একমাত্র শাশুড়ীমাতার সঙ্গে ছাড়া কখনও হয়নি, কাজেই শ্রীশ্রীমায়ের কাছে, তাঁর শ্রীচরণে আশ্রয় নেবার মনের যে ইচ্ছা, কিছুতেই তা নিবেদন করবার সুযোগ পেতুম না।

এইভাবে অনেকদিন কেটে গেল। আমার শিশু কন্যাটির বয়স তখন মাত্র চারমাস; তাকে নিয়েও একদিন যাই। তার মাথাটি শ্রীচরণে ঠেকাতেই মা তাকে কোলে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আবার কোলে দিয়ে দিলেন। এইভাবে মায়ের দর্শন মাঝে মাঝে পেলেও আমার প্রাণের আকুলতা যায় না।

স্বামীরও তখন দীক্ষায় মন নেই। অবশ্য আমায় বাধা দেন নি, সর্বান্তঃকরণে বলেছিলেন, "তুমি শ্রীশ্রীমায়ের আশ্রয় নাও, আমার যখন যেখানে ইচ্ছা হবে তখন নেব।" তখনও জানতেন না যে, ঠাকুর আমাদের ধরে আছেন, আমাদের কোথাও যাবার উপায় নেই।

এইভাবে দিন যায়, শেষে আর থাকতে না পেরে আমার বড় জাকে মনের কথা বললুম। তিনিও তখন কিছু করে উঠতে পারলেন না, তবে আশা দিলেন যে, নিশ্চয়ই চেষ্টা করে দেখবেন।

এই সময় আমার একটি দেবর ঠিক আমার ভাসুরের মতনই কৃতবিদ্য ডাক্তার হ'য়ে সেই রকমই বালিকা বধূ ও এক বছরের শিশুপুত্র রেখে পঁচিশ বছর বয়সে অকালে চলে গেল। এইবার আমার শাশুড়ী একেবারে ভেঙ্গে পড়লেন। আমার শ্বশুর মশায়ও তখন ছয় সাত বৎসর ইহলোক ত্যাগ করে চলে গেছেন। আমার শাশুড়ী ঠাকুরানী আর সহ্য করতে পারলেন না, একেবারে শোকবিহ্বলা ও জ্ঞানহারা হয়ে পড়লেন।

পূজনীয় শরৎ মহারাজ এলেন শাশুড়ী মাতাকে সান্ত্বনা দিতে। আমার গৃহখানি পবিত্র করে আমাদের কাছে বসে কতই আশ্বাসের কথা, ঠাকুরের প্রসঙ্গ সব শুনিয়ে গেলেন। সেই সময় পূজনীয়া গৌরীমাও এসেছিলেন একদিন আমাদের বাড়ীতে। শ্রীশ্রীঠাকুরের অনেক পুণ্যকথা আমাদের শুনিয়ে ধন্য করে গিয়েছিলেন। তাঁর স্কুল তখন নতুন শুরু হয়েছে গোয়াবাগানে। সেখানে আমার ছোট বোন দুটি পড়ত, সেই সূত্রে তিনি আমার বাপের বাড়ীও যেতেন এবং মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের পুণ্যকথা সানন্দে বলতেন। সেই সব দিনের স্মরণে আজও আমার মনে হয়, তখন আমরা কত সৌভাগ্যেরই অধিকারী হয়েছিলুম।

তারপর থেকে আমার আকুলতা আরও বাড়ল। আমার আকুলতায় বোধ হয় এইবার ঠাকুরের আসন টললো। একটি সুযোগ ঠাকুর দিলেন—ভক্তপ্রবর শ্রীযুত কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী শিবরাণী আমার আর একটি দেবরের বধূ হয়ে আমাদের গৃহ কিছুদিনের জন্য পবিত্র করতে এসেছিল। বালিকাটি যেন মূর্তিমতী আনন্দ ছিল। সে আমায় ভারি ভালবাসত। আমার ঐ দেবরটি আগ্রা কলেজের অধ্যাপক ছিল। যখন তার বিয়ে হয় বধূটি নিতান্ত বালিকা, সুতরাং তিন চার বছরের মধ্যে তাকে আগ্রা নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি। যখন সে একটু বড় হল, তার আগ্রা যাবার কথা হয়। সে তখন শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানীর চরণে আশ্রয় নেবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। শ্রীযুত কিরণ বাবুর বাড়ীতে সর্বদাই স্বামী ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ মহারাজদের যাওয়া-আসা ছিল; শ্রীশ্রীমাও ওঁদের কাশীর বাড়ী 'লক্ষ্মীনিবাসে' কৃপা করে নিজে গিয়ে কিছুদিন বাস করে তাঁদের ধন্য করেছিলেন। ওঁরা সর্বদাই মায়ের শ্রীচরণ দর্শন ও স্পর্শন করতে পেতেন। এইবার আমার ঠাকুর সুযোগ করে দিলেন; শিবরাণীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হল। শাশুড়ীমাতা মত দিলেন, আমাদের দীক্ষার দিন স্থির হল।

তবু আবার বাধা হয়, শ্রীমতী রাধুর তখন শরীর বড় খারাপ, সে তখন কোনও গোলমাল সহ্য করতে পারছে না, সেজন্য শ্রীশ্রীমা তাকে নিয়ে উদ্বোধনের বাড়ী ছেড়ে নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিং বোসপাড়া লেনে রয়েছেন। কাজেই আমাদের দীক্ষা দিতে তখন মা সম্মত হবেন কিনা সে একটা ভাববার কথা হল।

কিন্তু শিবরাণীর আগ্রা যাবার দিন পুনঃ পুনঃ বদল হওয়ায় বাড়ীতেও একটু গোলমালের সৃষ্টি হয়। করুণাময়ী মা সব শুনে সম্মতি দান করলেন।

সে কথা শুনে আনন্দে, আর কি যেন একটা অনির্বচনীয় ভাবে সমস্ত রাত্রি ঘুমুতে পারলুম না। রাত্রি থাকতেই স্নানাদি ও গৃহদেবতার পূজাদি সমাপন করে কম্পিত বক্ষে শাশুড়ী মাতার সঙ্গে বোসপাড়া লেনে গেলুম। সেই অবগুণ্ঠনাবৃতই অবস্থা। সুতরাং শ্রীমতী রাধুর সম্বন্ধেও যে মাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করব তারও উপায় নেই।

যাই হোক্, শুভ সময় এল; শ্রীশ্রীমা আমাদের একে একে ডাকলেন। সেই জীবনের শুভ মুহূর্ত, মা ও আমি নির্জন কক্ষে, আর কেউ নেই, জীবনে কখনও মাকে সম্বোধন করে একটি বাক্যও আমার মুখ হতে উচ্চারিত হয়নি, আর সেই শুভ সময় যদি অসতর্ক হ'য়ে কাটিয়ে দিই, তবে আর তা নাও পেতে পারি।

আমার অন্তর বলে উঠল, ওরে মূর্খ, এই তোর সময়, এই তোর অবসর, করুণাময়ীর কাছে যা চাইবার চেয়ে নে, আর কখনও এমন সুযোগ পাবি না।

রাধুর অসুখ, মাও ক্ষিপ্রতার সহিত সব সেরে নিচ্ছিলেন। নিবেদিতা বিদ্যালয়ের বোর্ডিংএর ঠাকুর-ঘরে শ্রীশ্রীমা আমাদের একে একে নিয়ে প্রবেশ করলেন। সেখানে ঠাকুর ও নানা দেবদেবীর ছবি ছিল। মা আমারই আমার ইষ্টদেবীকে দেখিয়ে দিলেন, ঠাকুরকে দেখিয়ে বল্লেন—উনিই সব, এবং সবীজ মহামন্ত্র দান করলেন। আর বল্লেন, "মা, অনিবেদিত বস্তু কখনও খেও না, এক খিলি পান খেতে হলেও নিবেদন করে খাবে, আর শ্রাদ্ধের অন্ন কখনও খেও না।" কোনও বিশেষ বাধা-নিষেধে মা আমাদের আবদ্ধ করেন নি, শুধু এইটুকু মা নিজেই নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করিয়ে আসছেন।

করুণাময়ী মা আমায় যেমন আশ্রয় দিলেন, তখনই তাঁর শ্রীচরণ দুখানি চেপে ধরে কাতরে আমি বলে উঠলুম, "মা! মা! শ্রীচরণে আশ্রয় দিলেন তো?" মাথায় হাত বুলিয়ে, চোখ মুছিয়ে দিয়ে করুণাময়ী বলে উঠলেন, "হাঁ মা, দিলুম বৈকি!" আর আমি কিছু মনে করতে পারলুম না। এখনও মনে মনে স্মরণ করলে জননীর সেই কোমল পাদ-পদ্মের স্পর্শ হৃদয়ে অনুভব করি। মার শ্রীচরণের অঙ্গুলিতে বোধ হয় বাতের জন্য একটি লোহার তারের আংটি ছিল, এখনও যেন সেইটিরও স্পর্শ অনুভব করি। তারপর যেন আচ্ছন্নের মত বাইরে এলুম। মা আমাদের প্রসাদ দিয়ে একটু দুঃখিত হয়ে বল্লেন, "আজ তো এখানে প্রসাদ পেতে হয়। কি করব মা, রাধু যে গোলমাল সহ্য করতে পারছে না।" আমাদের সেই সময়ই চলে আসবারই ব্যবস্থা ছিল। কখন যে কি ভাবে গাড়ীতে এসে বসেছি তা জানতেও পারিনি। এই আচ্ছন্নভাব আমার সপ্তাহকাল ছিল।

আমার জীবনে মার সঙ্গে এই প্রথম ও এই-ই শেষ কথা। এর পর আর আমি কখনও মাকে দর্শনও করতে পাইনি। অতি তুচ্ছ সাংসারিক কারণ মার শ্রীচরণ-দর্শনে বাধা ঘটিয়েছিল।

শিবরাণী আগ্রা যাবার দু' তিন মাসের মধ্যেই শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে মিলিত হল। বালিকা বধূ বলে আমার শাশুড়ী ঠাকুরানী তার সঙ্গে আগ্রা গিয়েছিলেন। তিনি সেখানেই শুনেছিলেন যে,

শিবরানীর বিয়োগে ব্যথিতা হয়ে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সাশ্রুনেত্রে বলেছিলেন, "রানীর শাশুড়ী বর্ষীয়সী গৃহিণী হয়ে অন্তঃসত্ত্বা বধূকে তাজের গম্বুজে উঠতে দিলে কেন? বৃহস্পতিবারেই বা আগ্রা নিয়ে গেল কেন?"

আমার শাশুড়ী-ঠাকুরানী বড়ই নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। শ্রীশ্রীমা বিরক্ত হয়েছেন শুনে কলকাতায় এসে তিনি নিতান্ত ভীতা হয়ে উদ্বোধনে যেতে সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলেন, কাজেই আমারও আর যাওয়া ঘটে উঠল না। শ্রীশ্রীমার পার্থিব লীলা সংবরণ করার মধ্যে আর শাশুড়ী-ঠাকুরানী সেখানে গেলেন না, আমারও আর *শ্রীপাদপদ্ম-দর্শনেরসুযোগ হল না।*

আরও কিছুদিন পর যখন অশীতিপর পিতা-মাতা রেখে আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কালগ্রাসে পতিত হলেন, তখন আমার শোকাতুরা মাতাকে নিয়ে পূজনীয় শরৎ মহারাজের নিকট আমি যাতায়াত করতে লাগলুম, তখন উদ্বোধন মা-শূন্য। প্রাণ হাহাকার করত; মনে মনে বলতুম, মাগো এই ত শাশুড়ী ছাড়া আসা হল, তখন কেন আনলে না মা? আর যে তোমায় দেখতে পেলুম না। পূজনীয়া গোলাপ-মা, যোগীন-মা কত সান্ত্বনা দিতেন, কত যত্ন করতেন, কিন্তু অনেক দিন যাবৎ প্রাণের হাহাকার যায় নি, ক্রমে সব স'য়ে গেল।

তখন পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে বালিকা কন্যা দুটীর দীক্ষার জন্য প্রার্থী হলুম। মহারাজ সানন্দে সম্মতি দান করলেন, ছোটটি নিতান্ত বালিকা, তবুও কৃপা করলেন। যদি কোনও দিন গিয়ে বলেছি, "মহারাজ, ও আমার কথা শোনে নি," তখনই তিনি বলতেন, "ওদের মহারাজ ছোটবেলা কত দুষ্টু ছিল জাননা ত মা!" তারপর তাকে বলতেন, "হ্যাঁরে, দুষ্টুমি করেছিস্, তোকে বেরাল-ছানার মত খাটের পায়ায় বেঁধে রাখবো। তোকে শাস্তি দিলুম—যা, সব ঠাকুরদের ছবিতে ধূপ দিয়ে আয়," বলে একটি দীর্ঘ ধূপ জ্বালিয়ে ওর হাতে দিতেন। উদ্বোধনে তৎকালে ওর নাম ছিল, 'মহারাজের বেরালছানা'। এত স্নেহ-যত্ন ওরা এত শিশুকালে পেয়েছিল যে, এখন হয়ত তা ভাল করে স্মরণ করতে পারে না।

এমনি করে সকল মাতৃহারা সন্তানদের ব্যথা বিশালবক্ষে শরৎ মহারাজ নিজে নিয়ে সকলকে সান্ত্বনা দিতেন। তাঁর স্নেহ ভালবাসায় যেন মায়ের স্নেহেরই স্বাদ পেতুম। মায়ের প্রাণটি নিয়েই তিনি মায়ের বাড়ীতে সকলের মন ভরিয়ে রাখতেন।

আমাদের মেয়েরা বাল্যকালে দীক্ষাহেতু গুরুসঙ্গ পায়নি বলাতে একদিন একজন প্রাচীন সন্ন্যাসী বলেছিলেন, *"ঐ সব সিদ্ধগুরুর সঙ্গের প্রয়োজন* হয় না, ওঁদের একবার চোখের দেখা দেখলেও কাজ হয়।" তখন যেন মনের একটা কুয়াসা সরে গেল, নিজের সম্বন্ধে তখন মনে হল, তাইত তবে দুঃখ করি কেন? শ্রীশ্রীমায়ের দর্শন একবার হলেই ত হয়েছে।

মা অন্তরের অনুভূতির ধন; রোগে, শোকে, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে মার স্পর্শ সদাই অনুভব করি, করুণারূপিণী স্নেহক্রোড়ে ধারণ করে রয়েছেন। সেত বারে বারেই অনুভব করেছি, তারই দু একটি কথা দিয়ে প্রসঙ্গ শেষ করব।

মা বেশী কিছু নিয়মে বাঁধেননি। শুধু দুটি কথা —"অনিবেদিত বস্তু খেও না ও শ্রাদ্ধান্ন খেও না।" আমরা দুই জায়ে প্রাণপণ নিষ্ঠার সহিত মায়ের কথাগুলি পালন করতে চেষ্টা করতুম। নিজের পিতৃশ্রাদ্ধেও সারাদিন উপবাসী থেকে রাত্রে বাড়ী এসে খেতুম। লোকে কত কিছু মন্তব্য প্রকাশ করত। পরে যখন 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' প্রকাশিত হল, তাতে দেখি কৃপাময়ী মা জনৈক ভক্তকে বলছেন, "তা তোমরা সংসারী লোক, নিজের বাড়ীতে হলে আর কি করবে? প্রসাদ খেও।" তখন আমরা বলাবলি করি মা'ত আমাদের এরকম বলেন নি।

মা নিজে শ্রীমুখে বলেছেন, 'হ্যাঁ মা, আশ্রয় দিলুম বৈকি।" এ আশ্বাসের মর্ম বহুবার অনুভব করেছি অন্তরে। মায়ের কথায় দেখি, মা যেমন করে বাসনা হতে রাধুকে রক্ষা করতেন, ঠিক মন করেই আমাদেরও রক্ষা করেন।

রামনাদের রাজা কোষাগার খুলে দিতে চাইলে রাধু যেমন একটি পেন্সিল ভিন্ন কিছু চায়নি, সেই-রকম আমার লক্ষপতি পিতা একবার মার্কেটে নিয়ে গিয়ে আমায় যখন বললেন, "তোমার যা ইচ্ছা নাও" সেই সময় দুচার হাজার টাকার জিনিষ কিনলেও কোন ক্ষতি হত না, তখনি মনে হল, মা নির্বাসনা হতে বলেছিলেন। আমার চোখের উপর মাতৃমূর্তি ভেসে উঠল, বলে ফেললুম, "কিছুই চাই না বাবা, সবই ত আছে, মিছামিছি এই লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা অবধি বোঝা বাড়বে।" আমি বাড়ী এসে সকলের কাছে তিরস্কৃত হয়েছিলুম, এমন সুযোগ হারিয়েছি বলে। কিন্তু তারা ত জানে না, আমার প্রাণে বসে কে আমায় কিছু কিনতে দেননি। নীরবে আমি কৃপাময়ী মাকে স্মরণ করেছিলাম।

আরও একটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করি মায়ের অপার কৃপা স্মরণ করে। যখন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কৃপা করে আশ্রয় দিলেন, তখন থেকে কেবলই মনে হ'ত, কবে মা কৃপা করে আমার স্বামীর মতিগতি ঐ পথে নিয়ে যাবেন। মার কাছে নিয়ত সেই প্রার্থনা জানাতুম। আরও মনে হ'ত এই কারণে যে, বাড়ীর অনেকে একে একে কেউ বা পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে, কেউ বা তখনকার মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষা নিচ্ছে। একবার যখন একটি দেবরের ও তার বধূর দীক্ষার দিন স্থির হয়েছে মহাপুরুষজীর কাছে, তখন আমার স্বামী কার্যোপলক্ষে রয়েছেন সুদূর বিলাসপুরে। দীক্ষার আগের দিন আমার কেবলই মনে হচ্ছিল, "মা করুণাময়ী, করুণা করে ওঁর মতিগতি এই দিকে করে দাও মা।" তখন মা বহুদিন লীলা-সংবরণ করেছেন। হঠাৎ সন্ধ্যার সময় স্বামী বিলাসপুর হতে এসে পড়লেন। পরের দিন তিনি নিয়মিত প্রাতরাশের পর আমার অনুরোধে ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর দীক্ষা দেখতে আমাদের সঙ্গে মঠে গেলেন। তাদের দীক্ষা নিতে যাবার সময় আমি কাতরে মাকে আমার আবেদন জানাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ আমার স্বামী এসে জানালেন যে, মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকেও কৃপা করতে চেয়েছেন। অস্নাত, তার উপর খেয়েও এসেছেন বলে তিনি ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমি তৎক্ষণাৎ বল্লুম, "তা হোক্, কৃপালাভের কালাকাল নেই, এখনই দীক্ষা নাও।" এইভাবে মহাপুরুষজীর কৃপা লাভ করে রাত্রের গাড়ীতেই কর্মস্থলে চলে গেলেন। আমি বিস্ময়ে জননীর অপার কৃপা স্মরণ করতে লাগলুম।

এই ঘটনার কিছুদিন পর আমরা আর একদিন মঠে গিয়েছি, সাংসারিক নানা ঝঞ্ঝাটে আমার স্বামীর অন্তর অত্যন্ত বিচলিত। আমরা প্রণাম করে মাথা তুলতেই শিবপ্রতিম আশুতোষ মহাপুরুষ মহারাজ বলে উঠলেন, "তোর কি চাই? বল্ কি চাই?" তখন যেন বরাভয়কর হয়ে চতুর্বর্গ-প্রদানে উদ্যত! আমার প্রাণে ভেসে উঠল ঠাকুরের সেই কথা, "রাজার সঙ্গে দেখা হ'লে কি লাউ-কুমড়ো চাইবে?" আর মা বলেছেন, "নির্বাসনা।" তখনও মহাপুরুষজী উত্তরের প্রতীক্ষায় আমার মুখ পানে চেয়ে আছেন, মা বললেন, "ঠাকুরের পায়ে যেন রতিমতি হয় মহারাজ, আর কিছু চাই না।" মহারাজ অত্যন্ত খুসী হয়ে বললেন, "হবে, হবে,—তোদের হবে।"

এই যে সাক্ষাৎ শিবের কৃপা হজম করা, একি মায়ের আশ্রয় না পেলে হ'ত? আশ্রয় দিয়েছেন বলেই, মা নিজ শ্রীমুখে স্বীকার করেছেন বলেই, এই রকম ক'রে সব সময় নিজের সন্তানকে

রক্ষা করেন। তখন কিছু চেয়ে ফেললেই কত যে বাসনার জালে জড়িয়ে পড়তে হত তা কে জানে?

আর একবার পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজ—তখন তিনি মঠ ও মিশনের সভাপতি—আমার দেবরের লালগোলাস্থিত বাসাবাড়ীতে কৃপা করে ইং ১৯৩৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তাঁর সারগাছির আশ্রম থেকে এসে সে রাত্রি আমাদের কাছে রইলেন। অল্পপরিসর স্থান, মাত্র তিনটি ঘর। পূজনীয় মহারাজ পাশের ঘরেই, মধ্যে দরজা, ভোরবেলা দরজা খুলে গিয়ে প্রণাম করতেই রহস্য করে বল্লেন, "তোমাদের বাড়ী এক বছর রয়েছি।" বিস্মিত আমি, বলে উঠলুম, "সেকি মহারাজ!" তিনি হেসে বল্লেন, "'৩৪ সালে এলুম, আজ ৩৫ সাল। এক বছর হোলো না?" আমরা সবাই হেসে উঠলুম।

প্রভাতে বাগানে ইজিচেয়ার পেতে সদানন্দ শিশুপ্রকৃতি মহারাজ আমাদের নিয়ে নানা গল্প করছেন, আমরাও তাঁর শিশু-প্রকৃতিতে নিঃসঙ্কোচ। অন্তরে বাইরে কোনও অর্গল নেই। বলে বসেছি, "মহারাজ, ১লা জানুয়ারী আজ; আজকের দিনে ঠাকুর কল্পতরু হয়েছিলেন; আপনিও আজ আমাদের কল্পতরু হোন।" তখনই বালক-সুলভ ভাব ছেড়ে গম্ভীর হয়ে মহারাজ বললেন, "বল, তোমার কি চাই।" অমনি করুণাময়ী জননীর পুণ্যবাণী জেগে উঠল, "নির্বাসনা, নির্বাসনা।" তখন জননীই মুখে বলিয়ে দিলেন, "মহারাজ, আর কিছু নয়, আমি গরম গরম খাবার করে দেব, আর আপনি আমার কাছে বসে খাবেন।" মহারাজের রূপ যেন বদলে গেল; বলে উঠলেন, "বেশ তাই চলো; তুমি যা দেবে তাই খাব।" আমি আনন্দে আত্মহারা—জননী আমায় রক্ষা করেছেন। আর পূজনীয় গঙ্গাধর মহারাজও শিশুসুলভ প্রকৃতিতে বসে বসে গরম খাবার খেয়ে আমার প্রাণের সেবা নিয়ে আমায় ধন্য করেছেন।

সংসারে আমরা পুত্রহীন; অভাব-অনটন ত আছেই। বৃদ্ধ ও অবসরপ্রাপ্ত স্বামী, তবুও মায়ের কৃপায় বেশ দিন চলে যায়। মায়ের একখানি প্রতিকৃতি রান্নাভাঁড়ারের কাছে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করে প্রতিদিন এই বলে প্রণাম করি, "মা, অন্নপূর্ণারূপে এইখানে বসে থাক, তোমার ঘরে যেন খাবার কষ্ট না পায় কেউ।" তা মা ঠিক সকলকে তৃপ্ত করে খাইয়ে দেন, কোথা হতে কি হয় আমি জানি না। আর দিনে দিনে মায়ের অপূর্ব লীলার প্রসার দেখে বিস্ময়ে আপ্লুত হয়ে থাকি। জানি না কবে মার কাজ মা শেষ করিয়ে চরণে টেনে নেবেন। সেই প্রতীক্ষায় গুনে গুনে দিন কাটাচ্ছি।

শ্রীশ্রীসারদালক্ষ্মীর পাঁচালী

শ্রীমতী সুধাময়ী দে, ভারতী, সাহিত্যশ্রী

জয় মা সারদাদেবী লক্ষ্মীস্বরূপিণী
ধর্ম অর্থ সিদ্ধি আর মুক্তি-প্রদায়িনী।
সর্বগুণাধারা মাতা আসি অবনীতে
সর্বভাবে পালিতেছ না পারি বর্ণিতে।
গৃহলক্ষ্মী-রূপে যে মা তুমি আছ ঘরে
সে কথা বিশেষ করি না ভাবি অন্তরে।
এবার জেনেছি হৃদে তুমি লক্ষ্মী মাতা
অন্নবস্ত্র যাহা কিছু সকলের দাতা।
তোমার মহিমা কিছু বুঝেছি যখন
সে কথা জানাতে সবে করিব কীর্তন।
চিন্তিয়া দারিদ্র্য-কথা গরীব ব্রাহ্মণ
আপন কুটিরে যবে করেন শয়ন।
নিশীথে বালিকা-রূপে স্বপনেতে আসি
ধরেন জড়ায়ে তাঁরে মৃদু মন্দ হাসি।
অলঙ্কার-বিভূষিতা কন্যা লক্ষ্মীরূপা
হেরিয়া ব্রাহ্মণ মনে জানে তব কৃপা।

ধনে ধানে ভরপুর সারা গ্রাম খানা
চাল কোটে গুড় কেনে পিঠে করে নানা।
শীতের নূতন গন্ধে ভাসে চারিধার
আঙ্গিনা লেপিয়া রাখে অতি চমৎকার।
এ হেন সৌন্দর্যে যবে ঘেরে গৃহখানি
তমসার বেশ ধরি সাজে সন্ধ্যারানী।
বধূগণে দীপ জ্বালি লয়ে যায় চলে
প্রণাম করিছে গিয়া তুলসীর মূলে।
বৃহস্পতিবার দিনে শুভক্ষণ সাঁঝে
রামচন্দ্র-গৃহে উলু শঙ্খধ্বনি বাজে।
দিন-অবসান যবে সন্ধ্যার কালে
ভুবনমোহিনী রূপ শোভে শ্যামা-কোলে।
আনন্দে ভকতি-ভরে গদগদ চিতে
রামচন্দ্র কন্যা হেরি বলেন মুখেতে।
কে এলে মা ধন্য করি মোর গৃহতল
মুখ হেরি পুলকিত হৃদয়কমল।
ব্রাহ্মণ না জানে মনে তার এই সুতা
এক কালে হবে যে গো জগতের মাতা।
মুখেতে সুমিষ্ট কথা সদা করি দান
ব্যথিত ও তৃষিতের ভরি দিলে প্রাণ।
সন্তানের হৃদে মধু ঢালিয়াছে যত
দেহমন মধুময় হইয়াছে তত।
লজ্জায় আবৃত তনু ও মুখমণ্ডল
ভক্ত তরে সদা খোলা চরণকমল।
দরশন করিলে মা তোমার বদন
পবিত্র ভাবেতে হৃদি হয় যে মগন।
সন্তানেরে খাওয়াইতে পাড়াতে যাইয়া
এনেছ পশরা বহি মাথায় করিয়া।
এহেন মায়ের স্নেহ নাহি ধরাতলে
স্নেহের পাথার তুমি ভকতেরা বলে।
লক্ষ্মীরূপা তুমি মাগো নিপুণা হইয়া
সাজিয়াছ কত পান নিজ হাত দিয়া।
লক্ষ্মীজ্ঞানে মনে ভাবি আমি অনুক্ষণ
পূজিতে বাসনা বড় ও রাঙ্গা চরণ।

যেই বৃহস্পতি দিনে ও পদ বাড়ালে
সেই দিন দিব পুষ্প চরণ-কমলে।
তুমি যদি কৃপা করি লও মোর পূজা
তবে ত পূজিব আমি ওগো দশভুজা।
নাহি কোন চপলতা স্বভাবে তোমার
বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী তুমি নমি বারেবার।
তুমি সতী বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি জগন্মাতা
নারায়ণী তুমি মাগো অযোধ্যার সীতা।
কাশীধামে অন্নপূর্ণা কালী কালীঘাটে
রয়েছ সতত মাগো ঘটে আর পটে।
দেশব্যাপী জুড়িয়াছে মহা হাহাকার
লও মাগো সকলের অন্নবস্ত্রভার।
উদর জ্বলিয়া যদি করে হায় হায়
ধর্মের বারতা সেথা কভু নাহি যায়।
লক্ষ্মীদেবী পূজিবারে নাহি বেশী মন
সংসার দহিছে তাই প্রতি ক্ষণে ক্ষণ।
তুমি না বোঝালে মাতা কে বোঝাতে পারে
মায়াতে বেঁধেছ আঁখি অজ্ঞান-আঁধারে।
সংসারপালন আর অতিথির সেবা
ক্ষুধার্তেরে খেতে নাহি দেয় অন্ন যেবা।
লক্ষ্মীশ্রী নাহি রহে সেই গৃহে তার—
লক্ষ্মী দেবী ছাড়ি যান হইয়া বেজার।
দরিদ্রেরে দিতে গিয়া দেই নারায়ণে
নাহি বুঝি এই সত্য আঁখির বাঁধনে।
লক্ষ্মীর কৃপাতে রহে লক্ষ্মীশ্রী ভরা
যেই পূজা করে সেই মনে জানে তারা।
এ যুগের লক্ষ্মী যিনি তারে নাহি জানি
আজিকে হৃদয়মাঝে জাগিছেন তিনি।
সারদালক্ষ্মী-পূজা যদি হয় ঘরে ঘরে
অশান্তি ও দুঃখকষ্ট না ঘেরে তাহারে।
এ ক্ষুদ্র অন্তরে মম যা হয় বিশ্বাস
সকলেরে তাই দিয়া করিব আশ্বাস।
যুগগুরু যুগলক্ষ্মী তুমি মা সারদা
তোমার যুগলপদে নমি গো সর্বদা॥

শ্রীশ্রীমা

শ্রীমতী করুণা মুখোপাধ্যায়, বি-এ

৺ষোড়শীপূজা সম্পন্ন করিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। ইহার তাৎপর্য সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। মাত্র ইহাই বলিতে পারা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে, পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রথম প্লাবনে আমাদের দেশ যখন ভাসিতেছিল, মানুষ ধর্মকে বাদ দিয়া ভোগবাদ ও জড়বাদে একেবারে ডুবিয়া যাইতেছিল, চারিদিক তমসাচ্ছন্ন, স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রভৃতি লইয়া সবেমাত্র প্রশ্ন উঠিতেছে, তখন আবির্ভাব হইল এমন এক আদর্শ নারীর, যিনি সর্বকালে সর্বদেশে আদর্শস্থানীয়া। তিনি হইলেন শ্রীসারদা দেবী—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহধর্মিণী এবং পরবর্তী জীবনে 'শ্রীশ্রীমা' নামে পরিচিতা।

শ্রীসারদা দেবীর জীবন আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তথাকথিত উচ্চশিক্ষা, আভিজাত্য, সাংসারিক বিভব না থাকিলেও একজন একান্ত লজ্জাশীলা পল্লীরমণীর ভিতর এমন একটি পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের বিকাশ সম্ভব হইতে পারে যাহা ভারতের নারীজাতির নিকট এক অভূতপূর্ব মহান আদর্শ।

তাঁহার জীবনে আমরা এমন কতকগুলি গুণের সমন্বয় দেখিতে পাই যাহা সর্বযুগের অতিবিশিষ্ট নারীচরিত্রেও পাওয়া যায় না। তাঁহার সহজ সরল মধুর অথচ গভীর অধ্যাত্মভাবে পূর্ণ জীবন আলোচনা করিলে বিস্ময়াভিভূত হইতে হয়। কোমল ও কঠোর এই দুই ভাবের সমন্বয় তাঁহার জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা যাহাকে শিক্ষা বলিয়া থাকি, তাহা তাঁহার কিছুই ছিল না। কিন্তু অশিক্ষিতা, গ্রাম্য মেয়ে হইলেও তাঁহার সহজ সরল প্রখর বুদ্ধির কাছে আধুনিক যুগের শিক্ষিতা নারী অতি সহজেই পরাভব স্বীকার করিবে।

দরিদ্র পিতামাতার গৃহে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলিতে হইয়াছিল তাঁহাকে, কিন্তু তাঁহার মধ্যে বিন্দুমাত্রও অর্থের প্রতি লোভ দেখা যায় নাই।

শৈশবে মাত্র ৫ বৎসর বয়সে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত শ্রীশ্রীমার বিবাহ হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বয়স তখন ২৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে। তখনকার সমাজে এইরূপ বিবাহ কোন অভাবনীয় ঘটনা নহে।

শ্রীশ্রীমাকে শ্রীরামকৃষ্ণদেব অধ্যাত্মজীবন-সম্বন্ধে শিক্ষা দেন। শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষায় শ্রীসারদা দেবী এমন জ্ঞান লাভ করিলেন, যাহার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতীকজ্ঞানে তাঁহাকে নিজে পূজা করিয়া ও নিজের আধ্যাত্মিক শক্তি দান করিয়া সমাধিমগ্না দেবী সারদার পদে প্রণিপাত করিলেন। অনন্ত আধার হইতে অনন্ত শক্তি সংক্রমিত হইলে আধারের কোনই হ্রাস হয় না। অথচ সংক্রমিত পাত্রের যোগ্যতা না থাকিলেও শক্তিদান বা গ্রহণ অসম্ভব। শ্রীরামকৃষ্ণ যতকাল স্থূল শরীরে ভক্তগণ-মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন ততকাল শ্রীসারদাদেবীর দিব্য জীবনের প্রকাশ অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। ক্রমে সেই শক্তির আলোকে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। এই মহাশক্তির কল্পনা করিতে মানুষ ততদিনই অসমর্থ থাকে, যতদিন সর্বশক্তিময়ী মহামায়া মানুষের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না করিয়া দেন।

বিবাহের পর পুনরায় যখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দর্শনলাভ করিলেন তখন তাঁহার বয়স চতুর্দশ বৎসর। সেই বিকাশোন্মুখ যৌবনের স্মৃতি উত্তরকালে তিনি প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐ কাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই স্থির ধীর দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।" সাধারণ মানবের মন যে বয়সে ভোগরাজ্যে স্বভাবতঃ ডুবিয়া থাকে, সেই সময় তিনি কিন্তু অমৃতের

আস্বাদনই করিতেছিলেন। আবার যখন তিনি পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট আসিলেন তখন তিনি অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতী। এখন হইতেই তাঁহাদের দৈবী লীলা প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইল। একজন জীবনের শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভ করিয়া বসিয়া আছেন, অপরে তাহাই আয়ত্ত করিতে লাগিলেন। এইভাবে চলিল অপূর্ব লীলা।

চিন্তায়, কর্মে ও বাক্যে পবিত্রতাই হইতেছে আধ্যাত্মিক জীবনের ভিত্তি। শ্রীশ্রীমা ছিলেন পবিত্রতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি। এইরূপ সহধর্মিণী লাভ না করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের আধ্যাত্মিক জীবন অনেকাংশে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত। শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং একথা স্বীকার করিয়াছেন।

তাঁহার চরিত্র ছিল এক অদ্ভুত উপাদানে গঠিত। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন সাধারণ নারীর ন্যায় সংসার-জীবন যাপন করিবার জন্য নহে। পরন্তু ঈশ্বরপ্রেমে বিভোর স্বামীর প্রকৃত সহধর্মিণীরূপে। তাঁহার জীবন ছিল নিষ্কলঙ্ক, বিন্দুমাত্র ত্রুটি তাঁহার চরিত্রে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তিনি ছিলেন আদর্শ কন্যা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ মাতা। সকল দিক হইতে তাঁহার চরিত্র আদর্শস্থানীয়। তাঁহার জীবন হয়ত বিরাটকর্মবহুল ছিল না, কিন্তু জীবনের প্রত্যেকটি দৈনন্দিন ঘটনা অতিশয় শিক্ষণীয়। লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন তিনি যাপন করিয়া গিয়াছেন। সাধারণের চক্ষে তাঁহার কোন বাহিরের আড়ম্বর পরিলক্ষিত হইত না, কিন্তু অন্তরে অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে তিনি সদাই ভরপুর থাকিতেন।

শ্রীশ্রীমাকে বহু বিপদ ও বিপত্তির মধ্য দিয়া চলিতে হইয়াছিল। কিন্তু ক্ষুরধারবুদ্ধিসম্পন্না ও অনন্ত-আধ্যাত্মিক শক্তিতে বলীয়সী শ্রীশ্রীমা সেই সকল বিপদ অতি সহজেই অতিক্রম করিয়াছেন। 'ডাকাত বাবার' কাহিনীতে তাঁহার উপস্থিতবুদ্ধি ও নম্র বিনয়-ব্যবহার প্রকাশ পায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল গুরুশিষ্যের সম্বন্ধ। শ্রীশ্রীমা তাঁহার কর্তব্য হইতে কখনও বিচ্যুত হন নাই। পতিসেবা, গুরুজনের যথোচিত যত্ন লওয়া, ভক্তমণ্ডলীর ও অতিথিদিগের পরিচর্যা প্রভৃতি কোন কাজেই তাঁহাকে কখনও ক্লান্তি বা বিরক্তিবোধ করিতে দেখা যায় নাই। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালে নহবতখানার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দিনের পর দিন তিনি অতিবাহিত করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার সে কষ্টের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই ছিল না। পরবর্তী কালে শ্রীরামকৃষ্ণসংঘের জননীরূপে তিনি সকলের জন্য কত কঠোর পরিশ্রম করিতেন, হাসিমুখে কত ক্লেশ সহ্য করিতেন!

মাতৃত্বই ভারতীয় নারী-জীবনের চরম আদর্শ এবং শ্রীশ্রীমা ছিলেন এই আদর্শের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। পুরুষ, নারী, বালক, বৃদ্ধ সকলের কাছেই তিনি ছিলেন স্নেহময়ী জননী 'শ্রীশ্রীমা'। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদর্শনের পর নানা তীর্থস্থান ভ্রমণ করিয়া তিনি যখন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন হইতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার মাতৃশক্তির বাহ্যবিকাশ ত্রিতাপদগ্ধ মানবের নিকট অভিব্যক্ত হইতে লাগিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সুখে দুঃখে, শোকে আনন্দে, সম্পদে বিপদে তিনি মানবের চিরশান্তিদায়িনী মাতৃমূর্তিতেই বিরাজিতা ছিলেন।

শ্রীশ্রীমায়ের আগমন নারীসমাজে এক নব যুগের সূচনা করিয়াছে। তাঁহার জীবনে প্রাচীন নারীগণের আদর্শই যে প্রতিফলিত হইয়াছে তাহা নহে, পরন্তু ভাবী নারীসমাজের পূর্ণাঙ্গ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভগিনী নিবেদিতা এক স্থানে বলিয়াছেন—'ভারতীয় নারীর আদর্শ-সম্বন্ধে শ্রীসারদাদেবীই শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ-কথা' এবং 'শ্রীশ্রীমা ছিলেন পুরাতনের শেষ প্রতীক ও নূতনের সার্থক সূচনা।'

বর্তমান এই যুগসন্ধিক্ষণে শ্রীশ্রীমায়ের জীবনই নারীজাতিকে একমাত্র কল্যাণকর নূতন পথ দেখাইতে পারে।

সারদা-সঙ্গীত

কথা—স্বামী চণ্ডিকানন্দ ; সুর ও স্বরলিপি—শ্রীবীরেশ্বর চক্রবর্তী, সঙ্গীতবিশারদ

দরবারী কানাড়া—তেওড়া

শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রেম-সুরধুনী করুণারূপিণী মা আমার।
আসিলে ধরায় ধরি নর-কায় জুড়াতে তাপিত হিয়া সবার॥
নিত্য শুদ্ধ চিন্ময় কায় শ্রীরামকৃষ্ণ অরুণিমা তায়।
অরূপ উথলে ও রূপ-আভায় পরাণ মাতায় জগজনার॥
নিত্য নন্দিতা নিখিল-বন্দিতা শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাধিতা।
গুণাতীতা তুমি গুণময়ী দেবী তুমি মাতা পুন তুমি পিতা॥
সাধু-সজ্জন-জননী তুমি মা অসাধু দুর্জনও সুত তোমার।
বহে নিরন্তর অন্তহীন ধার তব করুণাধার॥

\+ ২ ৩ + ২ ৩

II ণ্া রা সা দ্া দ্া ণ্া । I সা সা সা রা । রা রা I
শ্রী রা ম কৃ ষ্ ণ 0 প্রে ম সু র 0 ধু নী

সা রসা রা মজ্ঞা । মজ্ঞা মা I রা । জ্ঞা সা । । সা I
ক রু0 ণা রূ 0 পি ণী মা 0 আ মা 0 0 র

সা রা মজ্ঞা মজ্ঞা । মজ্ঞা মা I মা পা পা পা । পা পা I
আ সি লে ধ 0 রা য় ধ রি ন র 0 কা য়

দ্া দ্া দ্া ণ্া । সা সা I রা রা জ্ঞা সা । । সা II
জু ড়া তে তা 0 পি ত হি য়া স বা 0 0 র

II মা । পা দা । ণদা ণা I সা সা সা সা । সা সা I
নি 0 ত্য শু 0 দ্ধ 0 চি ন্ ম য় 0 কা য়

দা রা রা রা জ্ঞা সা । I দা দা দা ণা । পা পা I
শ্রী রা ম কৃ ষ্ ণ 0 অ রু ণি মা 0 তা য়

পা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা । জ্ঞা মা I রা রা রা জ্ঞা । সা সা I
অ রূ প উ 0 থ লে ও রূ প আ 0 ভা য়

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা । পা পা I রা রা রা জ্ঞা । সা সা II
প রা ণ মা 0 তা য় জ গ জ না 0 0 র

\+ ২ ৩ \+ ২ ৩

II সা । রা মা মা পা পা I দা দা দা ণা ণা পা পা I

নি 0 ত্য ন ন্ দি তা নি খি ল ব ন্ দি তা

জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা মা পা । I রা রা রা জ্ঞা । সা । I

শ্রী . রা ম কৃ ষ্ ণ 0 আ রা ধি তা 0 0 0

ণ্‌া রা সা দ্‌া । ণা প্‌া I ম্‌া প্‌া দ্‌া রা । সা সা I

গু ণা তী তা 0 তু মি গু ণ ম য়ী 0 দে বী

রা রা রা মজ্ঞা । জ্ঞা মা I রা রা রা জ্ঞা । সা । II

তু মি মা তা 0 পু ন তু মি পি তা 0 0 0

/ / / / /

II মা । পা ণদা দা ণদা ণা I সা সা সা সা সা সা । I

সা 0 ধু স জ্ জ ন জ ন নী তু মি মা 0 -

/ / / / / /

দা রা রা রা রা সা সা I দা দা দা ণা । পা পা I

অ সা ধু দু র্ জ ন সু ত তো মা 0 0 র

/ / / / / / / / / / / / /

পা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা I রা রা রা রা জ্ঞা সা সা

ব হে নি র ন্ ত র অ ন্ ত হী ন ধা র

I মজ্ঞা জ্ঞা জ্ঞা মা মা পা । I রা রা রা জ্ঞা । সা সা II II

তু ব অ ন ন্ ত 0 ক রু ণা ধা 0 । র

সাধনায় শ্রীগুরুতত্ত্বের স্থান

শ্রীকালিদাস মজুমদার

(পূর্বানুবৃত্তি)

কেহ কেহ বহুগুরু করার পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে বলা যায় যে শিক্ষক বা সাহায্যকারী অনেকে হইতে পারেন, কিন্তু গুরু হন একজনই। দীক্ষাদান আধ্যাত্মিক নবজন্ম-দান। জন্মদাতা পিতা একজনই হন, পিতৃব্য দ্বাদশজন থাকিতে পারেন। সতীর পতি একজনই থাকে, ব্যভিচারিণী বহুপতি করিয়া থাকে। ব্যভিচার ভাল হইতে পারে না। পুরোহিত আত্মীয় নহেন, ধর্মকার্যের সহায়ক প্রতিনিধি। এজন্য প্রয়োজনবোধে বা ঘটনাচক্রে তাঁহার পরিবর্তন চলে, কিন্তু গুরুপরিবর্তনের চেষ্টা পিতৃপরিবর্তনের চেষ্টার ন্যায় হাস্যকর অথবা দ্বিচারিণী হওয়ার ন্যায় অশুভ এবং অপকৃষ্ট।

কোন কোন লোককে আক্ষেপ করিতে শুনিয়াছি, ‘আমার গুরুদেব দেহত্যাগ করিয়াছেন; আর কাহার নিকট উপদেশ লইব?’ একথাটি গুরুকে জীবকল্পনা করার কুফল এবং ভ্রমাত্মক। ঈশ্বরই গুরু, এজন্য গুরুর মৃত্যু নাই। যদি উপদেশলাভের জন্য ঐকান্তিক আকুলতা থাকে, তাহা হইলে

গুরুরূপী ঈশ্বর গুরুর দেহত্যাগের পরেও সাধকের প্রয়োজনানুসারে অপর কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মুখ দিয়া আবশ্যকমত উপদেশ দেন। যদি শিষ্যের অন্তর্দৃষ্টি কিঞ্চিৎ পরিণত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি বুঝিতে পারেন যে, সেই উপদেশ তাঁহাকেই ঈশ্বর-কর্তৃক প্রদত্ত হইল। এতদ্ভিন্ন ঈশ্বর স্বপ্নে ও রূপক-সাহায্যেও উপদেশ দেন। শেষোক্ত উপদেশের দৃষ্টান্ত লালাবাবুর জীবনীতে পাওয়া যায়।

কেহ কেহ এরূপ প্রশ্ন করেন, ঈশ্বর মানব-দেহধারী গুরুরূপে কেন উপদেশ দেন? একেবারে দিব্যমূর্তিতে আসিলেই ত পারেন। ইহার উত্তর এই যে, তাঁহার দৈবীমূর্তি-দর্শন হইলেই জীব উদ্ধার পাইয়া যায় এবং সাধনার ফল লাভ করে। এরূপ করিলে সাধনার প্রয়োজন থাকে না; কিন্তু বিনা সাধনায় ঈশ্বরের প্রীতিলাভ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। ইহাতে জীবন-নাট্যের একটি বিশেষ অংশ বাদ পড়িয়া যায়, কর্মসঙ্কোচে ঐশ্বরিক লীলারও সঙ্কোচ হয়। এখানে কথা এই—First deserve, then desire. স্বামী বিবেকানন্দও বলিয়াছেন, চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কাজ হয় না।

গুরূপদেশ শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে প্রতিপালন করার চেষ্টা করা উচিত। পাটোয়ারী বুদ্ধি লইয়া ঈশ্বরকৃপা লাভ করা যায় না। ফলাফল হিসাব করিয়া সাধনায় অল্পাধিক মতি ন্যস্ত করিলে সাফল্য-লাভ হইবে না। এই পাটোয়ারী বা বিষয়বুদ্ধিকে common sense view বলা যায়; উহা common বা সাধারণ ব্যাপারেই প্রযোজ্য, ঈশ্বর-প্রীতিলাভ-রূপ অসাধারণ ব্যাপারে প্রযোজ্য নহে। সাধনমার্গে গুরু ও ইষ্টের প্রতি শিশু-সুলভ সরলতা ও বিশ্বাস অপরিহার্য; এখানে তর্ক চলে না। যীশু বলিয়াছেন, "Verily I say unto you, except ye become as little children, ye shall not enter into the kingdom of Heaven" (St. Matthew, 18). সরলমতি সাধকের প্রতি ঈশ্বর অধিক দয়াশীল।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব-কথিত জটিলের উপাখ্যান প্রণিধানযোগ্য। শিশু জটিল তাহার গুরুকল্প মাতার বাক্যে সরল ও অসন্দিগ্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া যে প্রকার ঈশ্বরকৃপা লাভ করিয়াছিল, তাহা তাহার বহিরঙ্গধর্মাচারী এবং অন্তরে অবিশ্বাসী প্রাকৃত জনের প্রতীক (type of the common man) শিক্ষক পান নাই। ঠাকুর বলিয়াছেন, চাই জ্বলন্ত বিশ্বাস। ভগবান যীশুও বলিয়াছেন, বিশ্বাসের অসাধ্য কিছু নাই, বিশ্বাসই সাধনের সর্বস্ব। লোক-বিশ্রুত ধ্রুব ও প্রহ্লাদের উপাখ্যান এবং একলব্যের শস্ত্রসাধনা এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য। শ্রীরামের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় মহাত্মা তুলসীদাসের চন্দনাদি লইয়া দিনের পর দিন অপেক্ষা—সরল বিশ্বাসের আর একটি দৃষ্টান্ত। গুরুর বাহ্যতঃ অসঙ্গত ও অদ্ভুত আদেশও নির্বিচারে পালিত হইলে তাহা কিরূপ সুফলপ্রসূ হয়, তাহা স্বামী বিবেকানন্দ-কথিত উদ্দালক ও আরুণির উপাখ্যানে বর্ণিত হইয়াছে। বাহ্যতঃ অযৌক্তিক হইলেও গুরুর আদেশের শুভ-*পরিণামশীলতা আছে। কোন যোগী গুরু তাঁহার* এক শিষ্যের কর্ণে মন্ত্র না দিয়া নাসারন্ধ্রে মন্ত্র দিয়াছিলেন। শিষ্য এইরূপ অদ্ভুত আচরণে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইবার কারণ নাই! সম্মুখদ্বার বন্ধ করিয়া পার্শ্বদ্বার শিষ্যকে খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। খিড়কিদ্বার বা পার্শ্বদ্বার দিয়া কি পিতৃগৃহে (ইষ্ট-সন্নিধানে) যাওয়া যায় না? গন্তব্যে পৌঁছান লইয়াই কথা।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠে, সাধনপ্রণালী বা দীক্ষা-প্রণালীর মধ্যে এত বৈচিত্র্য কেন? পূর্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে আধ্যাত্মিক বিবর্তনে মনুষ্যের বিভিন্ন আধার গড়িয়া উঠে। আধার অর্থে শক্তি ও উপযোগিতা। আধারের সহিত বিশিষ্ট রুচিও জড়িত থাকে। এতদ্ব্যতীত লীলাময় পালনকর্তার রুচিও

বিচিত্র। এসকল কারণে দীক্ষাপ্রণালী, সাধনমার্গ এবং গুরূপদেশও বহুবিধ হয়। সাধনা এই কারণেই ব্যক্তিগত, কোন সর্বজনীন নিয়মের অধীন নহে।

পূর্বে গুরুবাক্য নির্বিচারে পালনীয় বলা হইয়াছে। ইহাতে সমাজতত্ত্বের দিক হইতে আপত্তি হইতে পারে। এই পাপপূর্ণ কলিযুগে অসৎ, অজিতেন্দ্রিয়, প্রবঞ্চক, নীচাশয়, লোভী প্রভৃতি ব্যক্তির অভাব নাই। এই শ্রেণীর লোকদের মধ্যে কেহ কেহ গুরুগিরি করিলে সমাজে দুর্নীতির দৃষ্টান্ত দেখা দিতে পারে। প্রশ্ন উঠিতে পারে, এরূপস্থলে শিষ্যের কর্তব্য কি?

শিষ্য দুই শ্রেণীর আছে: (ক) পাপক্ষয়, ধর্ম, পুণ্য, পার্থিব শক্তিসম্পদ, যোগবিভূতি প্রভৃতি অর্জন, স্বর্গাদি-লাভ—এক কথায় ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কিছু লাভের আশায় যাহারা দীক্ষা-গ্রহণ করেন, তাঁহারা প্রয়োজনবাদী, (খ) যাঁহারা ঈশ্বর, আত্মজ্ঞান, ভক্তি, মোক্ষ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট-বর্গলাভেচ্ছু তাঁহারা অপ্রয়োজনবাদী। এই উৎকৃষ্টবর্গের উপাসকদিগের সাধারণতঃ অসদ্‌গুরু-সংযোগ হয় না, কারণ ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞানস্বরূপ এবং 'জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্ম ভস্মসাৎ করে'—এই নিয়মানুসারে ইঁহার সাধক-অবস্থাতেও কখনই পূর্ণ কর্মফল ভোগ করেন না। এসম্বন্ধে প্রমাণ আছে: (১) শ্রীরামকৃষ্ণ-সহধর্মিণী শ্রীশ্রীমা বলিয়াছেন, "কর্মফল ভুগতে হবেই। তবে ঈশ্বরের নাম করলে যেখানে ফাল্ সেঁধুতো, সেখানে ছুঁচ ফুটবে।" (২) জ্যোতিষিক অভিজ্ঞতায় জানা যায়, মুমুক্ষু বা ঈশ্বরলাভেচ্ছু ব্যক্তি মারকগ্রহের দশাভোগ-কালেও সামান্য সর্দিজ্বর প্রভৃতি ব্যতীত গুরুতর কষ্ট কিছু পান না; একটি অদৃশ্য সাধন-সঞ্জাত কবচকুণ্ডলের শক্তির দ্বারা সর্বদা রক্ষিত হন। এই শ্রেণীর সাধকগণের পক্ষেই নির্বিচারে গুরুবাক্যপালন বিহিত। কিন্তু প্রথমোক্ত প্রয়োজন-বাদী সকাম সাধকগণ যদিও 'ঈশ্বরের নাম' করিয়া থাকেন, তথাপি তাহা নিষ্কামভাবে নহে, প্রেমভরে নহে, পরন্তু স্বার্থের জন্য। ইঁহারা ঈশ্বরতত্ত্বের সাধক নহেন, পরন্তু অনীশ্বরতত্ত্বের বা অবস্তুর সাধক—এজন্য ইঁহারা কর্মফলের যথেষ্ট অধীন। ভিক্ষুক সারাদিন ঈশ্বরের নাম করিয়া পয়সা ভিক্ষা করে, কিন্তু তাহার দারিদ্র্য ঘোচে কই? সুতরাং অবস্তুর উপাসকদের মধ্যে কাহারও কাহারও দুর্ভাগ্যক্রমে অসদ্‌গুরুর সংযোগ হইতে পারে। সমাজতত্ত্বের দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইঁহাদের পক্ষে অসদ্-গুরুর সন্নিধি পরিত্যাগ করা সমর্থনযোগ্য, কিন্তু ইঁহারা দীক্ষামন্ত্র (বৈরিমন্ত্র না হইলে) ত্যাগ করিতে পারেন না, সুতরাং নূতন দীক্ষাদাতা গুরুও করিতে পারেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ—"অন্যান্য বিষয় শিক্ষার জন্য তুমি গুরু করতে পারো, কিন্তু দীক্ষাগুরু আর করতে নেই।" ফলে ইঁহারা দীক্ষা-দাতা গুরুর সাহচর্য বা সংস্রব বর্জন করিয়া শুধু স্বীয় ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে পারেন; তাহা ঐকান্তিকতা প্রভৃতি গুণযুক্ত হইলেই সফল হইতে পারে। গুরু-সন্নিধি এবং গুরূপদেশ ব্যতীতও সাধনায় ফললাভের দৃষ্টান্ত একলব্যের শস্ত্রসাধনা। তবে একলব্য দীক্ষা-গ্রহণ করেন নাই বলিয়া যে বিনা দীক্ষায় বা দীক্ষা-মন্ত্র বিসর্জন দিয়া কেহ ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন এরূপ নহে; কারণ শস্ত্রসাধনা ও ঐশ্বরিক সাধনায় কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও প্রভেদও বিস্তর আছে, এই দুইটি বিষয় সর্বাংশে সমান নহে। ইষ্টমন্ত্রজপ বিনা নিয়মে এবং গুরূপদেশ ব্যতীতও সিদ্ধ হইতে পারে। তবে যাঁহারা অন্য কোন বিশেষ প্রকারের কাম্য জপ, ধ্যান, ক্রিয়া বা যোগ প্রভৃতি করেন—যাহাতে বিশেষজ্ঞের উপদেশ আবশ্যক—তাঁহারা উপযুক্ত সাধক বা সিদ্ধের নিকট উপদেশ লইয়া স্বকার্য-সাধন এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির চেষ্টা করিতে পারেন। তাহাতে কোন বাধা নাই, কারণ, 'আতুরে নিয়মো নাস্তি।'

মহাপুরুষ মহারাজের স্মরণে

[আগামী ১৬ই পৌষ (৩১শে ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার) ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্যতম পার্ষদ, শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শিবানন্দজীর (মহাপুরুষ মহারাজ) পুণ্য জন্মতিথি। সময়োপযোগী স্মরণার্ঘ্যরূপে নিম্নের এই অনুধ্যান, প্রসঙ্গ এবং পত্রদ্বয় প্রকাশ করা হইল।—উঃ সঃ]

(এক)

অনুধ্যান

শ্রীশরদিন্দু গঙ্গোপাধ্যায়, এম্-এ

বহুবৎসর পূজ্যপাদ মহাপুরুষজী শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষরূপে শত শত শিষ্য-ভক্তের দীক্ষা-গুরুরূপে প্রাণে প্রাণে শান্তিবারি সিঞ্চন করেছেন; রোগ-শয্যায় উত্থানশক্তিরহিত অবস্থায় তিনি সেবকদিগকে বলতেন তাঁকে চতুষ্পার্শ্বে ফিরিয়ে বসাতে, আর দশদিকে কাতরভাবে চেয়ে তাঁকে শোনা যেত প্রার্থনা করতে—"মা, যে যেখানে আছে তাদের কল্যাণ কর, মা!"

* * *

পিতামাতার স্নেহের পুতুল হলেও তাঁর শৈশব কেটেছে ছাড়া-ছাড়া ভাবে। তাঁর বাপ-মা একই বাড়ীতে তাঁরই সঙ্গে স্থানীয় স্কুলের ২৫।২৬ জন ছাত্রকে প্রতিবৎসর লালনপালন করতেন। তারকনাথ আদরযত্নে ছিলেন তাদেরই অন্যতম, তদধিক স্নেহের অংশ তিনি দেখেন নি। ফলতঃ আশৈশব তাঁর পরিবেশ, পরিবেষ্টন ও শিক্ষাধারা তাঁকে ভাবী সন্ন্যাস-জীবনের জন্য প্রস্তুত করেছিল। বিদেশে চাকরিগ্রহণ, বিবাহ, কলকাতায় চাকরি, ব্রাহ্মধর্মের প্রভাব, ভিতরের অশান্তি, সমাধিলাভের অমোঘ সন্ধান, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রথম দর্শনেই তাঁর মুখে স্বতঃস্ফূর্ত সমাধির নানাবিধ বর্ণনাশ্রবণ—এই সবই তাঁর সন্ন্যাসপূর্ব জীবনের এক একটি গৌরবময় পৃষ্ঠা।

তিনি ঠাকুরের সঙ্গে ৫।৬ বৎসরকাল মেলা-মেশার অবকাশ পেয়েছিলেন। স্বামীজী যখন বরাহনগর, আলমবাজার ও বেলুড়ের ভাড়াটিয়া বাটীতে ক্রমান্বয়ে ঠাকুরের নির্দিষ্ট সঙ্ঘরচনায় ব্রতী হলেন তখন মঠরক্ষণাবেক্ষণে প্রথম কর্ণধার হয়েছিলেন 'তারকদা'। তিনি বহুবার নিঃসম্বল ও ঈশ্বরে পূর্ণ নির্ভরশীল হ'য়ে আহিমাচল কুমারিকা পর্যন্ত পরিব্রজ্যা ক'রেছেন, ধ্যাননেত্রে অধোদৃষ্টিতে পথ চলতে চলতে পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের সামনে দেখেও দেখতে পান নাই, সেজন্য তাঁরা ক্ষোভ প্রকাশ ক'রেছেন, শাস্ত্রজ্ঞানের বড়াই না করে তিনি ভাগবত জীবন যাপন করেছেন, স্বপাক একাহারে তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেছেন, মঠের মধ্যে খুঁটিনাটি কাজগুলি তরুণ-বৃদ্ধ-ভেদ ভুলে দিনের পর দিন অকাতরে করে গেছেন, রোগ-সেবায় মাতৃস্নেহ-পারাবার ঢেলে দিয়েছেন, অথচ এত গম্ভীর তাঁর মুখশ্রী যে হঠাৎ তাঁর সঙ্গে কথা কওয়ার সাহস কারও হত না। তিনি নিজ হাতে নবাগত সন্ন্যাসি ব্রহ্মচারীদের জন্য পাক করেছেন, কেহ অসুস্থ হ'লে তাঁর বিষ্ঠাময় কাপড় নিজ হাতে পরিষ্কার করেছেন, আবার তাঁদের অবোধ্য উপনিষৎ-গীতার সুকঠিন তত্ত্বগুলির সারাংশ সরল প্রাঞ্জল ভাষায় সুললিত করেছেন। কাশী, বৃন্দাবন, কনখল, মাদ্রাজ প্রভৃতি অঞ্চলের দিগ্‌গজ পণ্ডিতগণ তাঁর জীবনে ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখে মুগ্ধ হয়েছেন ও তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে কত শত দুরূহ প্রশ্নের হৃদয়-গ্রাহী মীমাংসায় আনন্দ পেয়েছেন।

* * *

সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ধমান মঠ ও মিশনের গুরুভার তাঁর উপর অধিকতর ন্যস্ত হ'লেও তিনি নিজে ছিলেন ঠাকুর ও মার সেই ছোট ছেলেটির মত। তিনি জানতেন—মা ঠাকুরের চেয়েও বড়, কিন্তু কত চাপা! আদ্যাশক্তির অংশস্বরূপা সেই মা'র কৃপা না হলে অস্থিচর্মসার কৃচ্ছ্রসাধন ও তপস্যা দ্বারা মুক্তি হবে না—একথা তিনি উচ্চকণ্ঠে বলতেন; আরও বলতেন—মা বিরূপা হ'লে ব্রহ্মা-বিষ্ণুও রক্ষা করতে পারবেন না। সেই ঠাকুর ও মার সেবা ও প্রচার করেছেন মঠের অধ্যক্ষ হিসাবে ৫ বৎসরের শিশুর মত, অমায়িক ব্যবহারে ও পূর্ণ নিরহঙ্কার ভাবে।

মহাপুরুষ মহারাজ বলতেন—"বাবা, ঠাকুরের দরবারে আমি কুকুরের মত পড়ে আছি। আমি দীক্ষা দিই না—ঠাকুরকে বলি—তিনিই দেন।" অথচ এই অনাড়ম্বর জীবনের এত প্রভাব ছিল যে, তাঁরই শ্রীমুখের একটি বাণীতে কত শত লোকের সমগ্র প্রাণধারা উল্টে গেছে, স্তূপীকৃত পাপরাশি পশ্চাতে রেখে তাঁরা হয়েছেন অমৃতত্বের অধিকারী। পাপকে মহাপুরুষজী বলতেন পর্বতপ্রমাণ তুলার রাশি—একটু অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ দিয়ে নিঃশেষ করা যায়—জীবন আবার নূতন ছাঁচে গড়ে ওঠে। ঠাকুরের এই শিশু সন্তানটি পাপ-তুলা-পাহাড় তাঁর কৃপানলে দগ্ধ ক'রে কত জীবনে বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব জাগরূক করেছেন।

* * *

মহাপুরুষজীর কোষ্ঠীর বিচারফল ছিল—হয় তিনি বড় সন্ন্যাসী হবেন—না হয় রাজা হবেন—তা তিনি দুই-ই হয়েছিলেন। একবার তিনি ধ্যান-ভঙ্গের পর দেখলেন, একটি বৃদ্ধা সজল নেত্রে তাঁর কাছে যেন কিছু চাইছেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "কি চাও?" উত্তর হ'ল "মুক্তি।" বজ্রগম্ভীর স্বরে মহাপুরুষ মহারাজ বললেন, "তাই হবে।" কোন রাজা পৃথিবীর ধনরাশি দিয়ে এই মুক্তি দিতে পারে?

তাঁকে দেখে মনে হ'ত তাঁর শরীরকে আশ্রয় করে ঠাকুরই যেন বিরাজ করছেন! নির্বাক নিস্পন্দভাবে ভক্তপরিবৃত হয়ে খাটের উপর বসে আছেন—সকলেই স্তব্ধ, প্রশ্ন স্তিমিত, বাসনা তিরোভূত—অথবা একটা গম্ভীর অব্যক্ত ভাব সেখানে বয়ে যাচ্ছে—অদ্ভুত! সেই দৃশ্যমান শরীরকে নানা ব্যাধি আশ্রয় করেছিল, রোগের যন্ত্রণা দেখলে চোখে জল আসত; কিন্তু তিনি নিজে সে সব অগ্রাহ্য করে হাসিমুখে সকলকে আশীর্বাদ করতেন! আত্মা থেকে দেহ একেবারে পৃথক তাঁর এই অনুভূতি তাঁকে না দেখলে ধারণা করা যায় না। পক্ষাঘাতে যখন তাঁর বাক্-রোধ হয়েছিল তখনও তিনি অস্ফুট ভাষায়, দৃষ্টি-ভঙ্গীতে কৃপা বর্ষণ করতেন।

(দুই)

প্রসঙ্গ

শ্রীঅমূল্যবন্ধু মুখোপাধ্যায়

২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯২৭। বেলা ৪ টার সময় মঠে পৌঁছুলাম। ঠাকুর দর্শন করে পূজনীয় মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে গিয়ে প্রণাম করে বসেছি। এক ঘর লোক। তিনি ১০ মাস পরে উটকামণ্ড হতে সবে মাত্র বেলুড়মঠে ফিরেছেন।

জনৈক ভদ্রলোক গভীর শোক পেয়ে এসেছেন শান্তি পাবার আশায়। মহাপুরুষজী তাঁকে লক্ষ্য করে বলছেন,—"দেখ, তুমি এটি করবে, যাই হোক বাবা, ভগবানকে যেন ভুলো না। শোক দুঃখ আসছে, আসবে—তা বলে তাঁকে যেন ভুলো না। তিনিই এক মাত্র সত্য। দেখ, সংসারের অনিত্যতা আর লোককে বুঝাতে হয় না। সকলেই দিন রাত চোখের উপর তা দেখছে। যে অবস্থায়ই থাক তাঁকে রোজ ডাকবে, প্রার্থনা করবে। এই হচ্ছে সার। নিজের এই শরীরই যখন থাকবে না, তখন কার জন্য

শোক করবে? প্রাণের সহিত তাঁকে ডাকতে হবে, তা না হলে কেবল মালা ঘুরিয়ে নিয়ম রক্ষা করলে চলবে না, খুব ডাকবে একমনে। আহার-নিদ্রা প্রভৃতির জন্য সময় আছে, না করলে চলে না, সেরূপ ভগবানকে সময় করে compulsory (আবশ্যিক) ভাবে ডাকতে হবে, তবে ত শান্তি প্রাণে আসবে। বাবা! তুমি যেন তাঁকে ভুলো না। তাঁকে ভুলে গেলে সবই গোলমাল হয়ে যাবে।"

আমাদের বন্ধু কা-বাবু মহারাজকে প্রণাম করে বসলেন।

কা-বাবু—মহারাজ! মা আমার বিয়ের জন্য বড় ব্যস্ত হচ্ছেন।

মহারাজ—তোমার কি ইচ্ছা?

কা-বাবু—আমার বিয়ের ইচ্ছে নেই।

মহারাজ—তা হলে খুব firm (দৃঢ়) থাকবে, কান মতেই yield (সঙ্কল্পচ্যুতি) করবে না। মা :খিত হবেন বলে তুমি মনে কিছু করো না। মাকে ব বুঝিয়ে বলবে, তিনিও তো সবই সংসারের বস্থা দেখছেন।

এবার পূজনীয় জ্ঞান মহারাজ এসে বললেন, মহারাজ, মঠের কুকুরটি ২।৩ দিন হল পালিয়ে গছে, অনেক খোঁজ করেও আমরা পেলুম না।"

মহাপুরুষজী—কুকুর প্রভুভক্ত হয়, কিন্তু এই কুরটি বড় indifferent (উদাসীন) ছিল; সাধুদের কুর কিনা, ও বেটাও সন্ন্যাসী ছিল।"

উপস্থিত ভক্তগণ মহাপুরুষজীর কথায় হাসিয়া ঠিলেন। এবার মহাপুরুষজী বেড়াবার জন্য নীচে ামলেন, বেলা তখন ৬টা বাজে। ফুলের বাগানের দকে বেড়ালেন। একজন ভক্ত ডাক্তার এসে প্রণাম করে শরীর কেমন আছে জিজ্ঞাসা করলেন। হাপুরুষজী বললেন, তুমিও যেমন। এ শরীর কদিন যাবেই, তবে কেন এত ব্যস্ত হব? এখন মামার ৭৬ বৎসর চলছে, good old age (বেশ ড়ো বয়স)। শরীর যায় ত যাবে।

আমরা সকলে তাঁকে প্রণাম করে শ্রীশ্রীঠাকুর-ঘরে আরতি দর্শন করতে গেলাম।

৫ই মার্চ, ১৯২৭। কথাপ্রসঙ্গে চ-বাবু মহারাজের শরীরের অবস্থা কিরূপ জিজ্ঞাসা করলেন।

মহারাজ—দেখুন চ-বাবু, আমার কোন অসুখ নেই, এই শরীরটারই যত ব্যাধি। তিনি ঠিক আছেন, ঠিক থাকবেন। হোক না শরীরের যা ইচ্ছা, আত্মা ঠিক আছেন। সেখানে সুখ-দুঃখ-ব্যাধি কিছুই নেই। শরীরটা আছে বলেই এসব হচ্ছে ও হবে। সেই চৈতন্যময় ভিতরে আছেন বলেই ত চৈতন্যে আছি। এসব বিচার করলে আর শরীরের ব্যাধির জন্য ভাবতে হয় না। এখন মাত্র তাঁর দিকে চেয়ে আছি ও তাঁর অপূর্ব লীলা দেখছি। আপনি ত বুদ্ধদেবের বিষয় অনেক চর্চা করতেন; দয়া করে আর একদিন আসিবেন, আপনার সঙ্গে ঐ সব বিষয় কথা হবে। আহা! বুদ্ধদেবের মত এমন দয়ার মানব আর কে আছেন? তিনি জগৎকে শান্তি দেবার জন্য কি কঠোর সাধনাই করে গেছেন! স্বামীজী তাঁর কথা হলে একেবারে মেতে যেতেন আমরাও তাঁর কথা শুনে বড় আনন্দ পাই।

পাবনার জনৈক ভক্ত এসে মহারাজকে প্রণাম করলেন।

ভক্ত—আমি কথামৃত পড়ে বড় আনন্দ পেয়েছি, তাঁর কৃপাও পেয়েছি।

মহাপুরুষজী—এই যে অহেতুক কৃপার কথা শাস্ত্রে আছে, অতি সত্য। যখন অবতার আসেন তখনই তার প্রমাণ হয়। আমরা দেখছি, তিনি বিনা কারণে, বিনা হেতুতে কৃপা করে থাকেন। গীতায় তিনি বলেছেন, 'দেখ পার্থ আমার এই ত্রিলোকে কিছুই পাবার লোভ নেই, কিন্তু তবুও আমি কর্মে লিপ্ত আছি, কেননা আমি কর্ম না করলে এই জীবসকল কেহই কর্ম করবে না। তাই আমি সদা কর্মে লিপ্ত রয়েছি।' দেখুন, অবতার যখন আসেন সব দিক পূর্ণ হয়ে যায়।

ভক্ত—মহারাজ, কেন তিনি কষ্ট করে জন্ম গ্রহণ করেন্? তিনি এই শরীর পরিগ্রহ না করেও ত তাঁর সৃষ্টি রক্ষা করতে পারেন।

মহাপুরুষজী—তিনি শরীর-পরিগ্রহ করে লীলা করেন; মানুষ তাঁকে দেখে, তাঁকে ভালবেসে তাঁর সংসর্গে এসে জীবন তৈরী করে নেয় এবং তাঁর সেবা-বন্দনা করে মুক্ত হয়ে যায়। মানুষের রূপ ধরে আসাতে মানুষ তাঁকে ভালবাসার সুযোগ পায়। তা ভিন্নও মানুষ মানুষের মতই একজনকে তার আদর্শ চায়, তা না হলে কি করে সেই বিরাট ঈশ্বরের কথা ভাবতে পারে?

ভক্ত—মহারাজ; শ্রীশ্রীঠাকুর যে অবতার এই কথা আপনারা তখন বুঝেছিলেন কি?

মহাপুরুষজী—না, তখন কি আমরা অবতার এ সব বুঝি? তবে এটি সত্য বুঝেছিলুম যে, শ্রীশ্রীঠাকুরের ভালবাসার মত ভালবাসা জীবনে কোথাও পাইনি। শ্রীশ্রীঠাকুরের নিকট গেলে মনে হত যেন ঠিক মায়ের কোলে এলুম। বহু দিন পরে ছেলে যেমন বাড়ী যেয়ে মায়ের কাছে দাঁড়ায় ও আনন্দ পায় ঠিক সেরূপ মনে হত। অবশ্য এটা আমার feelings (ভাব) বলছি। তাঁর এমন ভালবাসা ছিল, আমরা তাঁকে না দেখে থাকতে পারতুম না। সংসারে এইরকম নিঃস্বার্থ ভালবাসা বিরল। ছোট ছেলেরা এদিক সেদিক খেলা করে, মনে ভয়ও থাকে, কিন্তু যখন মায়ের নিকট আসে তখন নির্ভয়ে মায়ের কোলে থাকে। আমাদেরও তেমনি মনে হত। এই যে আপনারা আসেন, আমাদের ভালবাসেন—এ দেখে আমাদেরও কত আনন্দ হয়।

ঠাকুর তাঁর ভালবাসাই আমাদের মধ্যে বিন্দু বিন্দু দিয়ে রেখেছেন; তাই আপনাদের আমরা এত ভালবাসতে পারছি। আপনারা কত বাধা-বিপদ ঠেলে আমাদের দেখতে আসেন। আপনাদের এখানে এলে আনন্দ হয়, আমাদেরও আপনাদের দেখলে আনন্দ হয়।

এবার সকলে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় গ্রহণ করলেন। মহারাজ সকলকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করে বললেন, 'আপনারা সকলে আনন্দে থাকুন।'

(তিন)

পত্র

(জনৈক চিরকুমার শিক্ষাব্রতীকে লিখিত)

(১)

বেলুড় মঠ
৮।৩।১৯২৪

শ্রীমান—,

* * সেবাশ্রমের সম্প্রতি কার্য্যের বিষয় শুনিয়া বড়ই আশা হয়। প্রভু দেশে এইরূপ নিষ্কাম সেবার ভাব যুবকবৃন্দের হৃদয়ে খুব জাগাইয়া দিন ইহাই কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি। স্বামিজীর ইহাই প্রাণের কথা ছিল, বঙ্গীয় যুবকদের উপর তাঁর সম্পূর্ণ ভরসা ও আশা—ইহাদের দ্বারাই দেশের যথার্থ কল্যাণ সাধিত হইবে।

আমার আন্তরিক স্নেহাশীষ জানিবে। আমার শরীর এক প্রকার ভালয় মন্দয় চলিয়া যাইতেছে প্রভুর ইচ্ছায়। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(২)

বেলুড় মঠ
২৯।২।২৮

শ্রীমান—,

* * হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে প্রার্থনা করি তোমার বিশ্বাস, ভক্তি, প্রীতি, পবিত্রতা দিন দিন বৃদ্ধি হউক; তুমি তাঁর রাজ্যে খুব অগ্রসর হও। আমার বৃদ্ধ শরীর প্রায়ই তত ভাল থাকে না;

ঠাকুর যত দিন জগতে এ দেহ রাখেন, ততদিন থাকিবে। আমি দেহাতিরিক্ত আত্মা—জন্মমরণ তাতে কিছুই নাই। প্রভু দয়া করিয়া এ জ্ঞান নিশ্চয় করিয়া ধারণা করাইয়া দিয়াছেন, সেজন্য কোনরূপ অনুশোচনা নাই। প্রার্থনা, তোমরাও এ জ্ঞান তাঁর কৃপায় লাভ কর এবং নিষ্কামভাবে তাঁর কাজ কর। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

(৩)

(জনৈকা স্ত্রী-ভক্তকে লিখিত)

বেলুড় মঠ
২১।১০।২৫

* * তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমাকে যাঁর শ্রীচরণে আমি অর্পণ করিয়াছি তিনি ঈশ্বরাবতার, সকলের অন্তরাত্মা—সকলের হৃদয়ের চৈতন্য, পরম কারুণিক অহৈতুকী দয়াসিন্ধু, পতিত-পাবন। যখনই মনে কোনরূপ অশান্তি বোধ করিবে আন্তরিকতার সহিত বালকের ন্যায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করিবে। সদা পতিপরায়ণা হইয়া থাকিবে, মেয়েদের জীবনের শোভা পতিব্রতা হওয়া। উপদেশ ইত্যাদি সাধুদের বা কোন সৎপুরুষ বা স্ত্রীর নিকট হইতে লইতে পার, কিন্তু পতি ছাড়া কোন পুরুষের, যিনিই হউন, অঙ্গস্পর্শ কখনই করা উচিত নয়, উহা মহাপাপ। * * আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করি তুমি সংসারে কর্ত্তব্যপরায়ণা, পবিত্র, ভগবদ্ভক্ত হইয়া সুখে থাক। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী
শিবানন্দ

সমালোচনা

ঋষিদের প্রার্থনা—(নব সংস্করণ)—অধ্যাপক শ্রীসুধীরকুমার দাশগুপ্ত, এম্-এ, পিএইচ্-ডি প্রণীত; বীণা লাইব্রেরী, ১৫, কলেজ স্কোয়ার. কলিকাতা। পৃষ্ঠা—১১৪; মূল্য ১৸৹ আনা।

এই বইটির প্রথম সংস্করণ ১৩৩৫ সনে বাহির হইয়াছিল। নূতন সংস্করণে 'ঋষিদের সাধনা' নামে একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হইয়াছে। বেদের সংহিতা এবং উপনিষৎসমূহ হইতে প্রার্থনা-সূচক অনেকগুলি সুনির্বাচিত মন্ত্র টীকা এবং প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ (কতকগুলি অনুবাদ কবিতায়) সহ দেওয়া হইয়াছে। চারি বেদের বিভিন্ন শান্তি-পাঠগুলিও এই 'প্রার্থনা'-চয়ের অন্তর্ভুক্ত। বৈদিক ঋষিদের প্রার্থনার মধ্যে যে শাশ্বত সত্যদৃষ্টি, উদার শান্তি ও তেজোবীর্যের প্রেরণা রহিয়াছে, তাহা ভারত-সংস্কৃতির মূল্যবান সম্পদ। সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক-পাঠিকার নিকট এই সম্পদের পরিচয় সুপণ্ডিত গ্রন্থকার অতি যোগ্যতার সহিত উপস্থাপিত করিয়াছেন। 'ঋষিদের প্রার্থনা' বাংলার ঘরে ঘরে ধ্বনিত ও অনুধ্যাত হউক, ইহাই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

শ্রীশ্রীচণ্ডী—শ্রীরাসমোহন চক্রবর্তী, পুরাণ-রত্ন-সম্পাদিত। প্রকাশক—মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এণ্ড কোং, ৭৩, নেতাজী সুভাষ রোড্, কলিকাতা—১: ডবল ক্রাউন অক্টেভো; ৭৪৩ পৃষ্ঠা; মূল্য ৮৲ টাকা।

মূল, অন্বয়ার্থ, বঙ্গানুবাদ ও 'মন্ত্রার্থবোধিনী' টিপ্পনী সংবলিত শ্রীশ্রীচণ্ডীর সুসম্পাদিত এই বৃহৎ সংস্করণটি দেখিয়া আমরা অতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। নানা শাস্ত্রদর্শী সম্পাদক বহুতথ্যপূর্ণ টিপ্পনীর মাধ্যমে চণ্ডীর দার্শনিক এবং অনুষ্ঠানমূলক যাবতীয় বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উপনিষৎ এবং পুরাণাদির প্রভৃত উদ্ধৃতিগুলি খুবই প্রাসঙ্গিক এবং আলোকবর্ষী হইয়াছে। কাগজ

এবং ছাপা ভাল। চণ্ডীগ্রন্থ যাঁহারা গভীরভাবে আলোচনা করিতে চান তাঁহাদের নিকট এই সংস্করণটি প্রচুর সহায়ক হইবে।

—স্বামী প্রেমরূপানন্দ

The Soviet Impact on Society: by—D. D. Runes. প্রকাশক—Philosophical Library, New York. পৃঃ ২০২ + ১৩; মূল্য ৩·৭৫ ডলার।

Mr. Runes দার্শনিক গ্রন্থাদির লেখক ও সম্পাদকরূপে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। মার্ক্সীয় মতবাদের ব্যবহারিক প্রয়োগের ফলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্ত্য সমাজে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এই পুস্তকে তিনি সেই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। পাঠকদিগের উদ্দেশে লেখক গ্রন্থারম্ভে বলিয়াছেন যে, পুস্তকখানি প্রায় পনর বৎসর পূর্বে সোভিয়েট-নাৎসী মৈত্রী চুক্তি সম্পাদিত হওয়ার পূর্বে লিখিত। তখন উপযুক্ত প্রকাশকের অভাবে ইহা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই। কিন্তু বর্তমানে ইহা অপরিবর্তিত আকারেই প্রকাশিত হইয়াছে। ইতোমধ্যে যে সকল ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে তাহাতে লেখকের মত-পরিবর্তনের কোনও কারণ ঘটে নাই।

পুস্তকখানি চারি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে লেখক কার্ল মার্ক্সের ব্যক্তিগত জীবন, তাঁহার দার্শনিক মতবাদ, তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী, এবং মার্ক্সীয় অর্থনীতি-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। লেখকের মতে কার্ল মার্ক্সের দার্শনিক মতবাদের সহিত তাঁহার নিজ জীবনের বিশেষ সঙ্গতি দেখা যায় না। তাঁহার দর্শন এবং অর্থনীতিও অবাস্তব এবং ভ্রান্ত। দর্শনের ক্ষেত্রে মার্ক্স হেগেলীয় 'সর্বাত্মবাদের' উত্তরাধিকারী; প্রভেদ এই যে, হেগেল যে স্থলে 'চৈতন্যকে' চরম সত্তা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, মার্ক্স সে স্থলে 'জড়'কে মৌলিক সত্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন। উভয় মতই পরিণামে একনায়কত্বের পরিপোষক। হেগেলের মতানুবর্তী হিটলারী একনায়কত্ব এবং মার্ক্সবাদী সোভিয়েট একনায়কত্ব—মূলে সমগোত্রীয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের সমান মজুরী এবং সমান অধিকার-সম্বন্ধে মার্ক্স যাহা লিখিয়াছেন তাহা সোভিয়েট রাশিয়াতে কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই। লেনিন উহা কার্যকর করিতে চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হন এবং সেই হইতে শ্রমের পূর্ণ মূল্য এবং শ্রমিকসাধারণের সমান মজুরীর কথা সম্পূর্ণ চাপা পড়িয়া যায়। আজ অদৃষ্টের পরিহাসে সোভিয়েট সমাজেই শ্রমিক এবং মালিকের মধ্যে বিরাট ব্যবধান সৃষ্ট হইয়াছে। শ্রমিক কেবলমাত্র 'শ্রমশক্তিতে' পরিণত হইয়াছে এবং তাহাকে বঞ্চিত করিয়া মালিকশ্রেণী উত্তরোত্তর ফাঁপিয়া উঠিতেছে। অবশ্য সে দেশে ব্যক্তিগত মালিকানা লোপ পাওয়ায় বর্তমান শাসকগোষ্ঠীই রাষ্ট্রের নামে মালিকের স্থান অধিকার করিয়াছে।

দ্বিতীয় খণ্ডে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে লেখক সোভিয়েট রাশিয়ায় সরকারী কর্মচারীদের স্তরভেদ, মার্ক্সীয় ভ্রাতৃভাবের বৈশিষ্ট্য, সোভিয়েট সমাজে আইন ও বিচারপদ্ধতি, শ্রমিকশ্রেণীর দারিদ্র্য এবং অসহনীয় অবস্থা, দেশের সাহিত্যিকদের উপর শাসকশ্রেণীর খবরদারি এবং তাহার ফলে প্রকৃত সাহিত্যের অপমৃত্যু প্রভৃতি বিষয় আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনায় লেখক স্বকীয় মতের সমর্থনে যে সকল তথ্যের সমাবেশ করিয়াছেন তাহা সোভিয়েট সংবাদপত্র, কিংবা মার্ক্সবাদী নেতা বা লেখকের উক্তি হইতেই সংগৃহীত। যেরূপ পরিশ্রম সহকারে লেখক নানাতথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা প্রশংসনীয়। কোনও স্থলে কেবল মাত্র তাঁহার অনুমান বা কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া কোনও কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রতিটি উক্তি এবং সমালোচনাই বাস্তব ঘটনা কিংবা প্রকৃত তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পুস্তকের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ডে 'বুডাপেষ্টের বিদ্রোহ' 'চীনে সোভিয়েট সাম্রাজ্যবাদ' 'আমেরিকায় মার্ক্সবাদীদের ক্রিয়াকলাপ' প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। একথা বলা বাহুল্য যে, আলোচ্য পুস্তকখানি মার্ক্সবাদ এবং ষ্ট্যালিন-পরিচালিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিরুদ্ধ সমালোচনা-গ্রন্থ। মার্ক্সীয় সাম্যবাদ এবং ষ্টালিন-তন্ত্রের বিরোধী পাঠকবৃন্দ এই পুস্তকে নিজ নিজ মতের সমর্থক বহু উপাদেয় তথ্য এবং যুক্তির সন্ধান পাইবেন। স্বভাবতঃই মার্ক্সপন্থী এবং সোভিয়েট ভক্ত পাঠকবৃন্দ পুস্তকখানিকে সাদরে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। কিন্তু এই তথ্যবহুল গ্রন্থে লেখক সোভিয়েট সমাজ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যে সকল তথ্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন তাহার উত্তরে মার্ক্সবাদী পণ্ডিতগণের কি বলিবার আছে নিরপেক্ষ পাঠকগণ সাগ্রহে লক্ষ্য করিবেন।

পুস্তকের ভাষা মনোগ্রাহী; বিষয়বস্তুর বিন্যাস-কৌশল সহজেই পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যাঁহারা লেখকের মত ও যুক্তির সহিত একমত হইতে পারিবেন না তাঁহারাও পুস্তকখানি পড়িতে বসিয়া আদ্যোপান্ত শেষ না করিয়া পারিবেন না। পুস্তকখানি প্রায় পনর বৎসর পূর্বে লিখিত; ইতোমধ্যে বিশ্বের ইতিহাসে যে বিরাট পরিবর্তন ঘটিয়া গেল তাহার পরিপ্রেক্ষিতে লেখক এই পুস্তকের কিছুমাত্র পরিবর্তন সাধন করা প্রয়োজন মনে করেন নাই। আমরা কিন্তু এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয় হইতে পারি নাই।

শ্রীদেবীপ্রসাদ সেন (অধ্যাপক)

অরবিন্দ-দর্শনের উপাদান—শ্রীভবানীশঙ্কর চৌধুরী ও শ্রীমতী নীলিমা চৌধুরী প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মজুমদার, ভারতবাণী প্রকাশনী, ৫৪।৪ বি, হাজরা রোড, কলিকাতা। পৃষ্ঠা—৫৭; মূল্য ১৷৹ আনা।

শ্রীঅরবিন্দের বিভিন্ন লেখায় তাঁহার যে একটি সুনির্দিষ্ট দার্শনিক মতবাদ গড়িয়া উঠিয়াছে আলোচ্য পুস্তকে লেখক ও লেখিকা সংক্ষিপ্ত হইলেও উহার একটি সুষ্ঠু পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের বিশ্লেষণে অরবিন্দ-দর্শনের উপাদান প্রধানতঃ আমাদের দেশের সনাতন শাস্ত্রসমূহই, তবে পাশ্চাত্ত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনেক তথ্য ও মনন তাহাদের অযৌক্তিক এবং ভ্রান্তিপূর্ণ অংশগুলি বাদ দিয়া শ্রীঅরবিন্দ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দর্শনের এই বলিষ্ঠ সামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনের মৌলিকতা কোথায় গ্রন্থ-প্রণেতৃদ্বয় তাহারও ইঙ্গিত দিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ-দর্শনসম্বন্ধে যে সকল পুস্তক ও আলোচনাদি সাধারণতঃ প্রকাশিত হয় তাহাদের মধ্যে প্রায়শঃই আচার্য শঙ্করের মায়াবাদের প্রতি একটি অসহ আক্রমণ থাকে। বর্তমান গ্রন্থের বিশ্লেষণ-ভঙ্গী অধিকতর সহিষ্ণু। 'অতিমন বা ঋতচিৎ'-সংজ্ঞক শেষ অধ্যায়ে লেখক ও লেখিকা তন্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের কয়েকটি শিক্ষার তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা শ্রীঅরবিন্দের বহু-আলোচিত 'অতিমনের অবতরণ' (descent of the supermind)—যাহা অনেকে খুব জটিল ও দুর্বোধ্য বলিয়া মনে করেন—সহজভাবে বুঝাইতে চাহিয়াছেন। শ্রীঅরবিন্দ-সাধনার ভবিষ্যৎ লক্ষ্যসম্বন্ধে তাঁহাদের স্বাধীন অভিমত সুনিশ্চিত; অবশ্য শ্রীঅরবিন্দমতানুযায়ীরা উহা কি ভাবে গ্রহণ করিবেন জানি না।

শ্রীশ্রীচণ্ডী (পকেট সংস্করণ)—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার কর্তৃক সম্পাদিত; 'সুদর্শন' কার্যালয়, ৩, অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা—৩; পৃষ্ঠা—২৩৫; মূল্য ৷৷৹ আনা।

স্বল্পমূল্যের এই ক্ষুদ্র সংস্করণটি নিত্যচণ্ডীপাঠক-গণের নিকট সমাদরণীয় হইবে। মূল সংস্কৃত মন্ত্রগুলি মাত্র দেওয়া হইয়াছে। 'শ্রীশ্রীচণ্ডীতত্ত্ব'-নামক ভূমিকাটি খুব হৃদয়গ্রাহী ও সময়োপযোগী

হিমাদ্রি (শারদীয়া সংখ্যা)—শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য এবং শ্রীইন্দুমাধব ভট্টাচার্য দ্বারা সম্পাদিত। কার্যালয়ঃ ১৬, গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা।

মহামহোপাধ্যায় ডাঃ গোপীনাথ কবিরাজ, কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়, শ্রীপ্রেমাঙ্কুর আতর্থী, শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীশ্রীজীব ন্যায়তীর্থ, শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক প্রভৃতির লিখিত ধর্ম, দর্শন ও সাহিত্য-বিষয়ক সুচিন্তিত রচনা এবং কবিতা পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। ছোট গল্পগুলিও ভাল লাগিল।

Batanagar Recreation Club Magazine—আগাগোড়া ইমিটেশন আর্ট কাগজে চমৎকার ছাপা, বহুচিত্রশোভিত, ডবল ক্রাউন অক্টেভো সাইজ।

১০০পৃষ্ঠার এই ষাণ্মাসিক (জানুয়ারী-জুন, ১৯৫৩) পত্রিকাখানি দেখিয়া এবং পড়িয়া বাটা-নগর রিক্রিয়েশন ক্লাবের পরিচালকগণের রুচি ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। ইংরেজী এবং বাঙলা সুনির্বাচিত রচনা-গুলি (কয়েকটি রবার-শিল্প এবং শিল্পকল্যাণমূলক) তৃপ্তি-এবং শিক্ষাপ্রদ। বিখ্যাত শিল্পী ও সাহিত্যিক অসিতকুমার হালদার 'শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং দেশের শিল্পকলা' প্রবন্ধে ভারতশিল্প-সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে প্রাসঙ্গিক অবতারণা করিয়াছেন, তাহা খুবই মূল্যবান। 'A Devotee'-লিখিত 'Swami Vivekananda and his Mission' লেখাটি আগ্রহের সহিত পড়িলাম।

মেদিনীপুর কলেজ পত্রিকা (চতুর্দশ বর্ষ, ১৩৬০)—পরিচালক ঃ অধ্যাপক শ্রীবাবুরাম বন্দ্যো-পাধ্যায় ; সম্পাদক—শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার মাল।

প্রধানতঃ শিক্ষা, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস এবং সমাজকল্যাণকে অবলম্বন করিয়া মেদিনীপুর কলেজের অধ্যাপক এবং ছাত্র-ছাত্রীগণের প্রবন্ধ, গল্প এবং কবিতা এই বার্ষিকীতে স্থান পাইয়াছে। একটি ইংরেজী প্রবন্ধ আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন সংবাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিট্যুট অব কালচার—এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৩৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-সম্পদ্ বিশ্ব-মানবের নিকট উপস্থাপিত করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। অন্যান্য সংস্কৃতির মধ্যেও যাহা প্রাণপ্রদ তাহা গ্রহণ করিয়া জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিতে হইবে, ইহাই ছিল আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের স্বপ্ন। সুতরাং তুলনামূলক সত্যসন্ধ আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন কৃষ্টির প্রতি মানুষের যথার্থ শ্রদ্ধা উদ্রিক্ত করাও এই সংস্কৃতি-ভবনের উদ্দেশ্য। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানে সুদক্ষ এক কর্মিগোষ্ঠী গঠন করিয়া তোলাও প্রতিষ্ঠানটির অন্যতম লক্ষ্য।

সংস্কৃতি-ভবন নিয়মিতভাবে পাঠচক্র, আন্ত-র্জাতিক আলোচনা-সভা, লাইব্রেরী ও পাঠাগার, সংস্কৃত-চতুষ্পাঠী, গ্রন্থ-প্রকাশন প্রভৃতি দ্বারা সুগভীর সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সংস্কৃতি ভবন ধর্ম, দর্শন, সমাজ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়েও গবেষণা পরিচালন করিবার সুযোগ-দান করিয়া থাকেন। হিন্দি-শিক্ষাদান, শিক্ষা ও সংস্কৃতি-মূলক প্রদর্শনী ও চলচ্চিত্র-প্রদর্শনও প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত। সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতাকে সক্রিয় ও গভীর সহানুভূতিশীল করিয়া তুলিতে এই প্রতিষ্ঠানটির উদ্যম অপরিসীম। সংস্কৃতি-ভবনের মাসিক বুলেটিন

প্রত্যেক কৃষ্টি-অনুরাগী ব্যক্তি সাগ্রহে পাঠ করিবেন সন্দেহ নাই। সংস্কৃতিভবন-সংলগ্ন ছাত্রাবাসে (Students' Home) কয়েক জন কলেজের ছাত্র ও গবেষক বাস করেন। সংস্কৃতি-ভবন নিম্নোক্ত পরিকল্পনাগুলিও কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর ঃ—

ভারতীয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিভাগে ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক আলোচনা পরিচালনের জন্য সংস্কৃতি-ভবন একটি পৃথক বিভাগ প্রতিষ্ঠা করিবেন। তুলনামূলক আলোচনা দ্বারা বিভিন্ন ধর্ম ও দর্শনের মূলীভূত ঐক্য-প্রদর্শনও এই বিভাগের অন্যতম উদ্দেশ্য। শিল্পসংরক্ষণাগার-স্থাপন, ভারতীয় সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা, ভারতীয় সংস্কৃতি ও আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি-বিষয়ক বক্তৃতাবলীর ব্যবস্থা; আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান, সংস্কৃতি মিশন প্রেরণ, সংস্কৃতি-ভবনের আদর্শবাহী একটি সাময়িক পত্র প্রকাশ এবং বিদেশাগত বিদ্বদ্বর্গের জন্য অতিথিভবন-স্থাপন প্রতিষ্ঠানটির অতি গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত।

উপরি-উক্ত পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করিবার জন্য সংস্কৃতি-ভবন দক্ষিণ কলিকাতার বালিগঞ্জ অঞ্চলে ২·৩৩ একর ভূমি সংগ্রহ করিয়াছেন। গৃহনির্মাণেরও পরিকল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। গৃহ-নির্মাণ-কার্যে আনুমানিক ২,৩০০,০০০৲ টাকার প্রয়োজন। ভারত সরকার ১,০০০,০০০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। জনসাধারণ হইতেও ৫০০,০০০৲ টাকা পাওয়া গিয়াছে। এখনও ১,৫০০,০০০৲ টাকা সংগ্রহ করা দরকার।

১৯৪৯-৫২ বর্ষগুলিতে নিয়মিতভাবে মহাভারত, উপনিষদ্, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বাল্মীকি-রামায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণের জীবন আলোচিত হইয়াছে। স্বামী বিবেকানন্দের কর্মযোগ, কর্মে পরিণত বেদান্ত এবং জ্ঞানযোগ পাঠচক্রে আলোচিত হইয়াছে। বর্ষগুলিতে সাপ্তাহিক আলোচনা-সভাগুলি বিশেষ উৎসাহ সঞ্চার করিয়াছিল।

পূর্বপাকিস্তানের কেন্দ্রগুলির বর্তমান অবস্থা—স্বামী বিবেকানন্দ-কর্তৃক শ্রীরামকৃষ্ণ-মিশন প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ হইতেই পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে পূর্বপাকিস্তান) কতকগুলি শাখাকেন্দ্র গড়িয়া উঠে। বর্তমানে ঐ অঞ্চলে মঠ ও মিশনের ১১টি কেন্দ্র রহিয়াছে। দেশবিভাগের ফলে যে বিরাট বিপদের সৃষ্টি হয় তাহার দ্বারা তথাকার অধিবাসীদিগের ন্যায় ঐসকল কেন্দ্রগুলিকেও দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইতে হইয়াছে।

১৮৯৯ সালের প্রথম ভাগেই ঢাকা-কেন্দ্রটির প্রথম সূচনা হয় এবং ইহার কার্যকারিতা দ্রুত প্রসারিত হইতে থাকে। সাম্প্রতিক কয়েক বৎসরে মিশনের কর্মতৎপরতার পরিচয় হইল, বাহিরের ঔষধালয়, ছেলেদের এম্-ই স্কুল, পাঠাগার, সাংস্কৃতিক ও ধর্মবিষয়ক আলোচনা, এবং দুঃস্থদের আর্থিক সাহায্য। মঠে পরিচালিত কার্য তালিকার মধ্যে নিয়মিত পূজার্চনা, ভজন, ধর্মমূলক অনুষ্ঠান ও জন্মদিন-উদযাপন উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা জেলার নারায়ণগঞ্জে আশ্রমের আরম্ভ হয় ১৯০৮ সালে এবং ১৯২২ সালে উহা মিশনের শাখা-কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। এখানেও মিশনের দাতব্যচিকিৎসালয়, পাঠাগার, দরিদ্রদিগকে অর্থ-সাহায্য এবং সর্বোপরি একটি ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা অব্যাহত রহিয়াছে।

ঢাকা জেলার বালিয়াটি এবং সোনারগাঁয়েও মিশনের আরও দুটি কেন্দ্র বিদ্যমান। দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি লাইব্রেরী ও পড়িবার ঘর, নিয়মিত ভজন-পূজনের ব্যবস্থা এই উভয় আশ্রমেই চলিতেছে। বালিয়াটিতে মেয়েদের একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালিত হইতেছে।

পাকিস্তানস্থিত মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রগুলি দিনাজপুর, বরিশাল, খুলনা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর এবং শ্রীহট্ট জেলায় রহিয়াছে। দিনাজপুরে মিশনের একটি দাতব্য ঔষধালয়, একটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা

বিদ্যালয় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি লাইব্রেরী পরিচালিত হইতেছে। হবিগঞ্জে মিশন সেবাসমিতি ঐ অঞ্চলের মুচি ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুন্দর বৈষয়িক ও ধর্মমূলক শিক্ষা দান করিতেছেন। ছেলেমেয়েদের জন্য দুটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, একটি লাইব্রেরী ও পাঠাগার পরিচালনা এবং দুঃস্থ দরিদ্রদের নগদ অর্থদান বা অন্যপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা এখান হইতে হইয়াছে।

বরিশালস্থিত কেন্দ্রটি স্থাপিত হয় ১৯০৪ সালে। ইহার প্রধান কার্য হইতেছে—একটি ছাত্রাবাস, একটি লাইব্রেরী, সাপ্তাহিক ধর্মবিষয়ক আলোচনা এবং দুঃস্থদিগকে অর্থাদি দ্বারা সাহায্য করা।

বাগেরহাট এবং ময়মনসিং কেন্দ্রও প্রশংসনীয় ভাবে কাজ করিতেছে।

ফরিদপুর-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২১ সালে। এখানে রহিয়াছে মেয়েদের একটি এম্-ই স্কুল, দাতব্যচিকিৎসালয় এবং একটি ছোট পাঠাগার। গরীবদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থাও এখানে করা হইয়া থাকে।

১৯১৬ সালে স্থাপিত শ্রীহট্টের সেবা সমিতি ৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি দাতব্যচিকিৎসালয় চালাইয়া আসিতেছে। অধিকন্তু দৈনন্দিন পূজার্চনা, ভজন, ধর্মমূলক ক্লাশ, মহাপুরুষদের জন্মদিবস উদ্‌যাপন ও এবং দুঃস্থ ব্যক্তিদিগকে নগদ অর্থদান ও অন্যান্যভাবে সাহায্যের ব্যবস্থাও এখানকার কর্মতালিকার অন্তর্ভুক্ত।

উপরে প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত বিবৃতি হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান যে, এই সকল কেন্দ্রের সেবাকার্য অপরিহার্য এবং বর্তমানে বরং ইহার চাহিদা অত্যন্ত অধিক। এই কেন্দ্রগুলিকে সুষ্ঠুরূপে পরিচালন করিতে হইলে উপযুক্ত অর্থ একান্ত আবশ্যক। আমরা সমস্ত দানশীল এবং জনসাধারণের কল্যাণকামী সহৃদয় ব্যক্তিগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি তাঁহারা যথাসাধ্য আর্থিক আনুকূল্য করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ভ্রাতা ভগিনীগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হউন।

প্রেরিত সাহায্য নিম্নোক্ত ঠিকানায় সাদরে গৃহীত হইবে—

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন,
পোঃ বেলুড়মঠ, জেলা হাওড়া

জনশিক্ষা—রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠের সম্পাদক স্বামী বিমুক্তানন্দ জনসাধারণের নিকট নিম্নোক্ত আবেদন করিতেছেন :

রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাকেন্দ্র বেলুড়ের রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ ১৯৪৯ সাল হইতে একটি জন-শিক্ষা বিভাগ পরিচালনা করিতেছেন। এই বিভাগ একদিকে যেমন গ্রামে ও শিল্পাঞ্চলে সাধারণ শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করিতেছেন, অপরদিকে তেমনি শিক্ষিত যুবসম্প্রদায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তাহাদের মাধ্যমে ঐ কার্য পরিচালিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। বর্তমানের উত্তেজনাপূর্ণ আবহাওয়ায় যখন যুবসম্প্রদায় কর্তব্যকে অবহেলা করিয়া নানা-রকম দাবী-দাওয়াকেই প্রধান করিয়া দেখিবার জন্য নানাভাবে উৎসাহিত হইতেছে, সেই সময় যাহাতে তাহারা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া দায়িত্বপূর্ণ সমাজ-সংগঠনের কার্যে অংশগ্রহণ-পূর্বক স্বীয় চরিত্রগঠনের সুযোগ পায় এইরূপ ব্যবস্থার আশু প্রয়োজন হইয়াছে। উক্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া জনশিক্ষা-বিভাগ তাহার সামর্থ্যানুযায়ী স্কুল ও কলেজের ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে কার্য আরম্ভ করিয়াছে এবং তাহাতে যে সাড়া পাইয়াছে তাহা খুবই আশাপ্রদ।

বর্তমানে এই বিভাগের পরিচালনায় গ্রামে, শিল্পাঞ্চলে ও আদিবাসী অঞ্চলে কয়েকটি বয়স্কশিক্ষা ও সমাজশিক্ষা-কেন্দ্রের কার্য চলিতেছে। অক্ষর-পরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে কথকতা, গল্প, রামায়ণ-মহাভারত পাঠ, ছায়া-ও চলচ্চিত্র প্রদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে নানা বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের জন্য খেলাধূলা ও ড্রিল শিখাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে এবং

তাহাদিগকে নানা দ্রষ্টব্যস্থান দেখাইতে লইয়া যাওয়া হয়। একটি ভ্রাম্যমাণ জনশিক্ষা-বিভাগ গত কয়েক মাসে বাংলা ও বিহারের বহু গ্রাম, খনি-অঞ্চল, আদিবাসী ও শিল্পাঞ্চলে শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র-প্রদর্শন ও ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছে। ছাত্রসম্প্রদায়ের জন্য নিয়মিত সমাজশিক্ষা-বিষয়ক আলোচনা ও পাঠ-চক্রের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ও তাহার ভ্রাম্যমাণ বিভাগ গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা চলিতেছে। স্বেচ্ছাসেবকদিগের প্রস্তুতির উপায় হিসাবে গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলগুলি সাপ্তাহিক পরিদর্শন, পরিভ্রমণের ব্যবস্থা, শিল্প ও স্বাস্থ্যপ্রদর্শনী ও কর্মশিক্ষা-শিবির-পরিচালন আমাদের কর্মসূচীর নিয়মিত অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করা হইয়াছে। এই সমাজসংগঠনের কার্যে নিযুক্ত অন্যান্য সঙ্ঘ বা সমিতিকে সাহায্য করিবার জন্য স্বল্পমূল্যে ম্যাজিক লণ্ঠন সরবরাহ ও একটি স্লাইড লাইব্রেরীর ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কয়েক জন একনিষ্ঠ স্বেচ্ছাসেবকের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং জনসাধারণ ও সরকারের আংশিক আর্থিক সাহায্যের দ্বারা এই কার্য সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু ব্যয়সাধ্য এই কাজটিকে রূপ দিতে এখনও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আমরা আশা করি মহানুভব জনসাধারণ সমাজশিক্ষার এই আরব্ধ কার্যের জন্য অকুণ্ঠভাবে অর্থসাহায্য করিবেন। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠানগুলিতে দানকৃত অর্থের উপর দাতার কোন আয়কর দিতে হয় না। সকল প্রকার দান নিম্ন ঠিকানায় সাদরে গৃহীত ও স্বীকৃত হইবে।

সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ
(জনশিক্ষা-বিভাগ)
পোঃ বেলুড় মঠ, হাওড়া

কয়েকটি সেবাকেন্দ্রের কথা—কনখল (হরিদ্বারের উপান্তে) শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম স্থাপিত হয় ১৯০০ সালে আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অন্যতম সন্ন্যাসি-শিষ্য স্বামী কল্যাণানন্দজীর চেষ্টায়। সামান্য প্রারম্ভ হইতে গত ৫২ বৎসরে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে সমগ্র উত্তর প্রদেশে সকল প্রকার আধুনিক চিকিৎসাব্যবস্থা-সমন্বিত একটি বৃহৎ সেবায়তনে পরিণত হইয়াছে। হরিদ্বার ও পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহের অধিবাসী, তথা হরিদ্বারে সমবেত এবং কেদারনাথ বদরীনাথাভিমুখ অগণিত তীর্থযাত্রী ব্যতীত টিহরী, গাড়োয়াল, নেপাল প্রভৃতি সুদূর অঞ্চলের শত শত ব্যক্তি এই সেবাশ্রমের দ্বারা উপকৃত হইয়া থাকে। আলোচ্য বর্ষে অন্তর্বিভাগের রোগিসংখ্যা—১৭১৬, বহির্বিভাগে—৬৩,৫৬৯ ; অস্ত্রোপচারসংখ্যা—৪৭২ ; বীক্ষণাগারে রোগ-বীজাণু পরীক্ষা—১৪৯১। ভারতীয় রেড্ ক্রস্ সোসাইটি (দিল্লী)-র বদান্যতায় প্রাপ্ত ১০ পিপা গুঁড়া দুধ, ১ পিপা কড্ লিভার অয়েল এবং ২৫,০০০ মাল্টিভাইটামিন্ ট্যাবলেট্ রুগ্ন প্রসূতি এবং শিশুদিগের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। সেবাশ্রমের উদ্যোগে প্রতিবার স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আলোচ্য বৎসরে এই উপলক্ষ্যে ৩০০০ দরিদ্রনারায়ণকে পরিতোষপূর্বক ভোজন করান হইয়াছিল। সেবাশ্রমে একটি অতিথিভবন, লাইব্রেরী এবং নৈশবিদ্যালয়ও আছে। আলোচ্যবর্ষে সাধারণ তহবিলের আয় ব্যয় : জমা—৪৯,৪০৮॥/ আনা ; খরচ—৫১,২০৮॥৵৬ পাই ; ঘাটতি ১৮০০৵৬ পাই।

রামকৃষ্ণ মিশন মাতৃভবনের (৭এ শ্রীমোহন লেন, কলিকাতা—২৬) দ্বৈবার্ষিক কার্যবিবরণী (১৯৫০ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত) আমরা পাইয়াছি। প্রতিষ্ঠানটি একটি প্রসূতিসদন। প্রসূতি এবং নবজাতকের পরিচর্যা ও চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ ডাক্তার এবং সেবাব্রতধারিণী সেবিকাগণ এখানে রহিয়াছেন। মাতৃভবনে প্রসবের পূর্বে ভাবী জননীগণকে যথাযোগ্য উপদেশ ও সতর্কতারীতি শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। জন-

পরিবারের মেয়েদের এখান হইতে প্রসূতি-পরিচর্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থাও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে হাসপাতালের বহির্বিভাগে প্রাক্-প্রসব-পরিচরিতা নারীগণের সংখ্যা ছিল ৭৯৭৭ (নূতন—২৩৩০, পুরাতন—৫৬৪৭)। প্রসব-সংখ্যা—১৩৫৬ (তন্মধ্যে অবৈতনিক—৭১৪)।

কালিকট রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের (পোঃ কল্লাই, মালাবার, মাদ্রাজরাজ্য) ১৯৫০-৫১ সালের কার্যবিবরণী এস্থলে প্রদত্ত হইল। আশ্রমের দাতব্য চিকিৎসালয়ে আলোচ্য বর্ষদ্বয়ে রোগীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৫২,১৮৩ ও ৬৭,৩৪০। সেবাশ্রম কর্তৃক পরিচালিত 'ষ্টুডেণ্টস্ হোম'-এ উক্ত দুই বৎসরে যথাক্রমে ৩৩ এবং ৩৪ জন বিদ্যার্থী থাকিয়া পড়াশুনা করিয়াছিল। আশ্রম কর্তৃক পরিচালিত একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়, লাইব্রেরী এবং পাঠাগারের বিষয়ও উল্লেখযোগ্য। প্রতি রবিবার আশ্রমে সর্বসাধারণের জন্য ধর্মালোচনা এবং বিশেষ বিশেষ দিনে উৎসবাদিও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বরাহনগর আশ্রমে অনুষ্ঠান—বিগত ২৬শে কার্তিক এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের নব-নির্মিত উপাসনা-গৃহের শুভ উদ্বোধন সম্পন্ন হয়। মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী শঙ্করানন্দজী মহারাজ আনুষ্ঠানিক দেবতা-প্রতিষ্ঠা নির্বাহ করেন। যথারীতি পূজা-হোমাদির পর দ্বি-প্রহরে সাধুসেবা, অপরাহ্নে 'রামনাম-সংকীর্তন,' সায়াহ্নে আরাত্রিক ও তৎপরে রাত্রে হাওড়া কাসুন্দিয়া সম্প্রদায় কর্তৃক 'শ্রীরামকৃষ্ণ-কীর্তন' অনুষ্ঠিত হয়।

প্রয়াগে কুম্ভমেলা—১৯৫৪ খ্রীঃ জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে প্রয়াগে (এলাহাবাদ) পূর্ণকুম্ভ-মেলা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রসিদ্ধ স্নানগুলির তারিখ—১৪ই জানুয়ারী (মকর সংক্রান্তি), ১৯শে জানুয়ারী (পৌষ পূর্ণিমা), ৩রা ফেব্রুয়ারী (অমাবস্যা) এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী (বসন্ত পঞ্চমী)। এলাহাবাদ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রম (মুঠীগঞ্জ, এলাহাবাদ) মেলাস্থানে একটি সেবা- ও আশ্রয়-শিবির স্থাপন করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। পীড়িতগণের চিকিৎসা ও সেবাকার্যের জন্য আনুমানিক ২০,০০০৲ টাকা প্রয়োজন। সেবাশ্রম কর্তৃপক্ষ ধর্মানুরাগী জনসাধারণের নিকট সহায়তাপ্রার্থী।

আশ্রয়-শিবিরে থাকিতে ইচ্ছুক বন্ধু ও ভক্তগণ সেবাশ্রমের কর্মসচিব স্বামী ধীরাত্মানন্দের সহিত ১লা জানুয়ারী, ১৯৫৪র পূর্বে পত্র ব্যবহার করিবেন।

নব প্রকাশিত পুস্তক

(১) **শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা**—স্বামী অপূর্বানন্দ-প্রণীত।

প্রকাশক—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বাঁকুড়া; ২৫৬ পৃষ্ঠা; মূল্য ৩৲ টাকা।

সংক্ষেপে এবং সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় লেখা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব এবং তদীয় লীলা-সঙ্গিনী শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর জীবনকথা।

(২) **শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তী গ্রন্থমালা**—বিস্তৃত পরিচিতি পরবর্তী নিবন্ধে (৭০০ পৃঃ) দ্রষ্টব্য।

ভ্রম-সংশোধন

গত অগ্রহায়ণ মাসের উদ্বোধনে 'কেন তিনি এসেছিলেন' প্রবন্ধের (৫৯৮ পৃঃ) প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'তিপ্পান্ন' স্থলে 'পঞ্চাশ' হইবে। উক্ত ভুলের জন্য লেখক এবং আমরা আন্তরিক দুঃখিত।

শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তীর সমারম্ভ

আগামী ১২ই পৌষ, ১৩৬০, রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) শ্রীশ্রীমায়ের একাধিকশততম জন্ম-তিথিতে তাঁহার শতবর্ষজয়ন্তীর শুভ উদ্বোধন হইবে। এই উদ্বোধন-উৎসবের কর্মসূচী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বেলুড় মঠে—১২ই পৌষ, ১৩৬০, রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩)।

সকাল ৫-১৫ মিঃ হইতে—মঙ্গলারতি, দেবী-সূক্তপাঠ, উষাকীর্তন।

সকাল ৭-৩০ মিঃ হইতে—শ্রীশ্রীমার বিশেষ পূজারম্ভ ও হোম।

সকাল ৯-৩০ ঘটিকায়—কালীকীর্তন।

বেলা ১টায়—প্রসাদ-বিতরণ।

অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায়—জনসভায় শ্রীশ্রীমায়ের জীবনালোচনা (সভাপতি—শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজী)।

১৩ই, ১৪ই ও ১৮ই পৌষ (সোম, মঙ্গল ও শনিবার) অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় পাঠ ও আলোচনা (বিষয়, যথাক্রমে—শ্রীশ্রীমায়ের উপদেশ, শ্রীমদ্ভাগবত ও মহাভারতে নারী-চরিত্র)।

১৯শে পৌষ, রবিবার প্রাতে ৮ ঘটিকায় বেলুড়মঠ হইতে শোভাযাত্রাসহকারে দক্ষিণেশ্বর-গমন।

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে—(উদ্বোধন কার্যা-লয়, বাগবাজার, কলিকাতা)।

১২ই পৌষ, ১৩৬০ রবিবার (২৭শে ডিসেম্বর)।

সকাল ৫-১৫ হইতে—মঙ্গলারতি, ভজন, বেদপাঠ।

„ ৭টা হইতে—শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষ পূজারম্ভ ও হোম।

সন্ধ্যা ৫॥৹টায়—আরতি।

„ ৬৷৹টায়—কালীকীর্তন।

স্থানাভাব বশতঃ বসিয়া প্রসাদ-গ্রহণের ব্যবস্থা করা সম্ভবপর হইবে না।

কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট হলে—১৫ই পৌষ, বুধবার (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৩) সাধারণ সভা; বিষয়—শ্রীশ্রীমায়ের জীবন।

জয়রামবাটী এবং অন্যান্য শাখা-মঠে—স্থানীয় কর্মসূচী-অনুসারে বিশেষ পূজা আলোচনাদি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—উপরোক্ত কর্মসূচী শ্রীশ্রীমায়ের শতবর্ষ-জয়ন্তীর শুভ সমারম্ভকে উপলক্ষ্য করিয়া। বেলুড় মঠে ও কলিকাতায় প্রধান উৎসব এবং তদনুষঙ্গী সম্মেলন, প্রদর্শনী প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হইবে ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণ-পৌষ (খ্রীঃ ১৯৫৪, ডিসেম্বর) মাসে (শ্রীশ্রীমায়ের আগামী জন্মতিথিতে)। শ্রীশ্রীমায়ের জন্মভূমি জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের মর্মরমূর্তি-প্রতিষ্ঠার তারিখ ঠিক হইয়াছে ২৫শে চৈত্র, ১৩৬০ (৮ই এপ্রিল, ১৯৫৪)।

ঐ সময়ে ঐ পুণ্যস্থানে তীর্থযাত্রা ও মহোৎসবেরও অনুষ্ঠান হইবে। বিস্তারিত জ্ঞাতব্য পরে প্রকাশিত হইবে।

জয়ন্তী-প্রকাশনমালা

(১) শ্রীমা সারদা দেবী—স্বামী গম্ভীরানন্দ সংকলিত শ্রীশ্রীমায়ের প্রামাণিক বিশদ জীবনী-গ্রন্থ (বহু চিত্রে শোভিত); পৃষ্ঠা ৭২০; মূল্য ৬৲টাকা।

(২) Great Women of India—ভারত-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন যুগে মহীয়সী নারী-গণের জীবনী ও কীর্তিকাহিনী। বহু প্রখ্যাত পণ্ডিত ও মনীষীর দ্বারা লিখিত।

উপরোক্ত পুস্তকদ্বয় ১৫ই পৌষ শ্রীশ্রীমায়ের জন্মতিথির দিন প্রকাশিত হইবে।

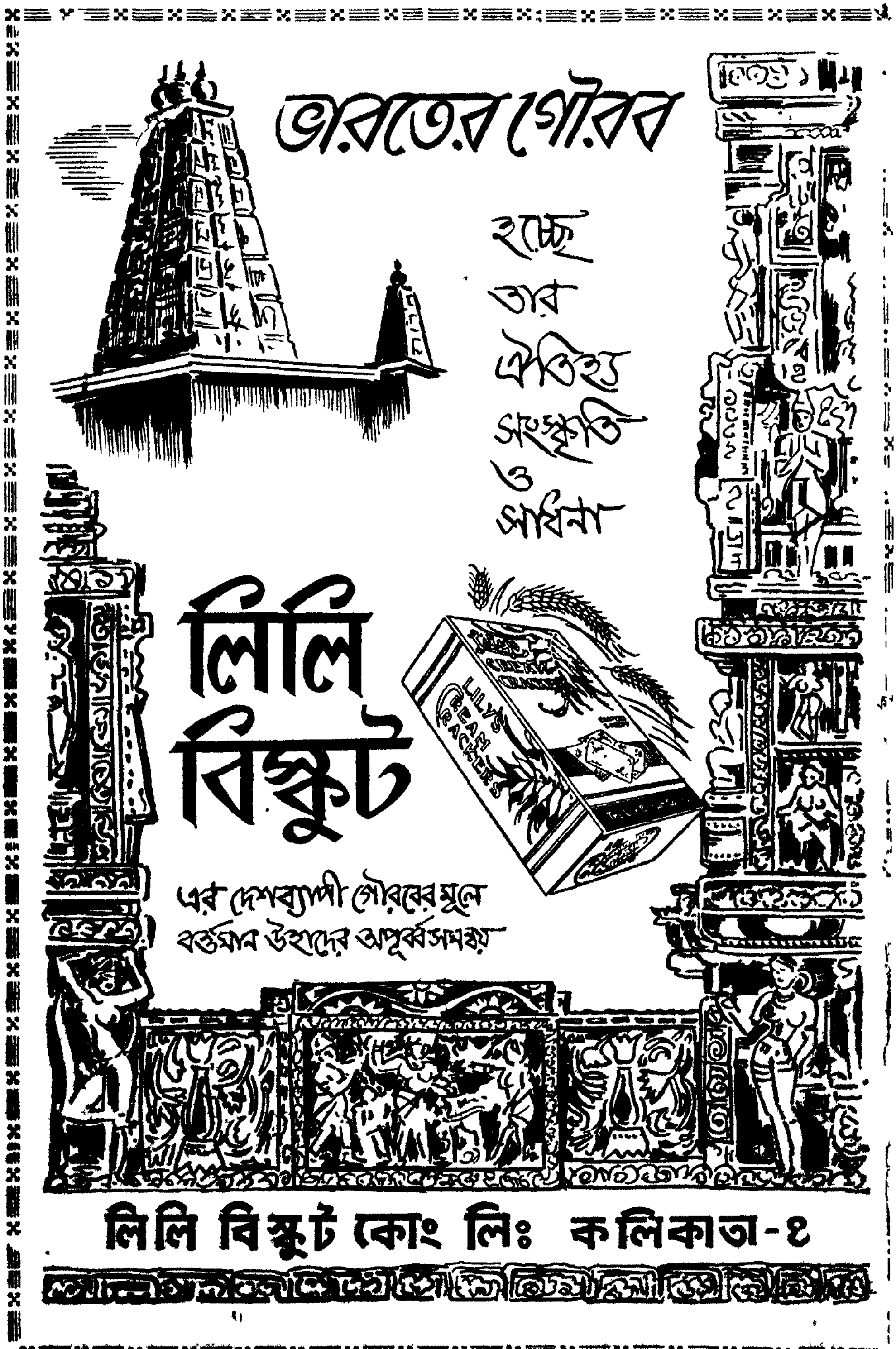
ইতঃপূর্বে প্রকাশিত—

(৩) শ্রীশ্রীমা সারদা—স্বামী নিরাময়ানন্দ প্রণীত, মূল্য—১৲ টাকা।

(৪) A Glimpse of the Holy Mother শ্রীমতী সি কে হাণ্ডু-প্রণীত, মূল্য ॥৹ আনা।

মুদ্রাকর ও প্রকাশক—স্বামী আত্মবোধানন্দ; ২০এ, গৌর লাহা ষ্ট্রীট, এক্সপ্রেস প্রিণ্টার্স লিমিটেড হইতে মুদ্রিত এবং ১নং উদ্বোধন লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Udbodhan-Phone : B. B. 5793 :: December, 1953 :: Regd. No. C. 295



সম্পাদক—স্বামী শ্রদ্ধানন্দ